কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

উপনিষদের আলো—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ, পি, এইচ, ডি। ইহাতে উপনিষদের সারগর্ভ কথাগুলি সহজ ও সরলভাবে বলা হইয়াছে, ডিমাই ৮ পেজী, ১৫৭ পৃঃ ৸৹।

গিরিশচন্দ্র—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গিরিশ-লেকচারাররূপে" গিরিশচন্দ্র ও নাটাকলায় তাঁহার চিত্ত বিকাশ সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ করেন এই পুস্তকে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে জগতের নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজী ২৬৫ পৃঃ ২৲ টাকা।

বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষার ক্রম পরিবর্তন ও বর্তমান চলতি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা। ডিমাই ৮ পেজী ১৯২ পৃঃ ৸৹।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও প্রসার সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা। ৩য় সংস্করণ (৫½" × ৪½") ২৩৩ পৃঃ ২৲ টাকা।

সহজিয়া সাহিত্য—শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ। শতাধিক সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের তিনখানি আদি গ্রন্থের বিবরণ, প্রয়োজনীয় টীকা সহ সঙ্কলিত। ডিমাই ৮ পেজী, ২০১ পৃঃ ২৲ টাকা।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে চৈতন্যের পরবর্তী যুগের কবি দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাসহ প্রমাণিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড, ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩৪৮ পৃঃ ৫৲ টাকা, ২য় খণ্ড ৫২২ পৃঃ ৬৲ টাকা।

বৃহৎ-বঙ্গ—রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট্। প্রাচীনকাল হইতে পলাশীর যুদ্ধকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস।

রয়াল ৮ পেজি, ১২৭৪ পৃষ্ঠা, দুইখণ্ডে সমাপ্ত, প্রায় ৩০০ চিত্র সম্বলিত। দাম ১২৲।

বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট্, সম্পাদিত।

প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গভাষার লেখকগণের নমুনা সংগ্রহ। পুরাতন ও দুরূহ শব্দের অর্থ পাদ-টীকায় দেওয়া হইয়াছে।

রয়াল ৮ পেজি, ২০৭১ পৃষ্ঠা, দুই খণ্ডে সমাপ্ত। দাম ১৩৸৹।

বাণী-মন্দির—শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্।

সাহিত্যের আদর্শ, ইহার আকৃতি প্রকৃতি ও সত্য-সাধনা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা। গ্রন্থকার ইহাতে ভারত ও ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন।

ডিমাই ৮ পেজি, ৮৩২ পৃষ্ঠা, দাম ৬৲।

সত্যপীরের কথা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। ডিমাই ৮ পেজি, ৭৩ পৃষ্ঠা, দাম ।৹

রবি-রশ্মি (পূর্ব ভাগ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

১৩০৭ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সকল কাব্য ও কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্ত রচনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

রয়াল ৮ পেজি, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, দাম ৯৲।

সাঙ্গীতিকী—দিলীপকুমার রায়।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২৪৫ পৃষ্ঠা, দাম ২৲।

মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কমলা লেকচার"রূপে পঠিত।

ডিমাই ৮ পেজি, ১৩৪ পৃষ্ঠা, দাম ১।৹।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। ভারতীয় মধ্যযুগের সাধকদিগের ধারাবাহিক বিবরণ। ডিমাই ৮ পেজী, ১৩৫ পৃষ্ঠা। ১।০ আনা।

গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—শ্রীঅমরেন্দ্র রায়। ১।০ আনা।

শিক্ষার বিকিরণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আচার্য রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় অভিভাষণ। ডিমাই ৮ পেজী। ।৹ আনা।

বঙ্কিম-পরিচয়—বঙ্কিমের রচনাসমুদ্র মন্থন করিয়া কতকগুলি রচনামৃত বঙ্কিম-শততম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের নাতিদীর্ঘ জীবন-কথা এবং পরিশিষ্টে তাঁহার জীবন, কর্ম ও সমকালীন ঘটনাবলীর একটি বিস্তৃত পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজী, ২১২ পৃষ্ঠা। ।০ আনা।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ। ডিমাই ৮ পেজী, ১৩৫ পৃষ্ঠা। ৸০ আনা।

হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। ডিমাই ৮ পেজী, ২৪৮ পৃষ্ঠা। ১।৹ টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের কথা—শ্রীসুকুমার সেন। এম এ, পি, এচ, ডি। ডিমাই ৮ পেজী, ২০০ পৃষ্ঠা। ৸০ আনা।

বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ—ক্রাউন ৮ পেজী, ৭৫২ পৃষ্ঠা। ২৲ টাকা।

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ—[illegible] সরকার। ডিমাই ৮ পেজী, ১৬০ পৃষ্ঠা। ১ টাকা।

বিচিত্রা-সূচী

শ্রাবণ, ১৩৪৬

রচনা

চিত্র-সূচী

বিচিত্রা-সূচী

শ্রাবণ, ১৩৪৬

চিত্র-সূচী

W« *>T'wT<! ^t?. fa. ^^<i *cm*

:FJW.V? ^ifsre f^:^r.^tC5 fas *\}r&\ i

ft^ftw* C*fi1 ^5 4TO ^fiftl »U Cf*fl fcfa^ —
Jj*t3?#faOTI fa^ fbGSft *ffit* *W* ^tft~S
^ fakirs fcftjni *if?w i ^IT ^ frw i

I t/Sftyi^ <2i?fo ft5^ ^f5C5l ^t£s «5ltCl **I** <|*t 3

'iffan* ci^ift ifos ^rac^s *n-fSra* ifafra

C^Y\CU ^"5—fWtfa **TMirS"5—**
Ni^r^J *^1fsi **f3S<«fl**

TOW W 'rtrtft, ^ ft^tn i



ঝিলম উপত্যকার পথ।

" কাশ্মীরের কথা "
হইতে উদ্ধৃত।

সি, এচ্ আর্নো এণ্ড কোং'র
সৌজন্যে—

বিচিত্রা

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৭৬ | ১ম সংখ্যা

ঝুলন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রাবণ পুষ্পক রথে আসিলে আবার।
কণ্টকরোমাঞ্চদীর্ণ পুষ্পগুচ্ছ দিল উপহার
নীপ বনরাজী,
বারিধারাতন্ত্রী উঠে বাজি
দিকে দিকে বনানী বীণায়,
তালে তালে নাচে শিখী পুচ্ছ মেলি, আনন্দ কেকায়
বনস্থলী উথলিয়া যায়।

আমার ঝুলনখানি কদম্বের মূলে
বাঁধিয়া বসিয়া আছি, পূবন পবনে দুলে দুলে
শূন্য দোলা আগুপিছু করে ছুটাছুটি।
মোর বক্ষ 'পরে পড়ে লুটি
বোবার আকুতি ভরে যেন,
এখনো এলেনা তুমি কেন?

এস এস নেমে এস শ্রাবণী আমার
নয়ন রোহিণী মোর বিমানে তোমার
দিলাম লাগায়ে,
এস লঘুপায়ে
সে সিঁড়ির ধাপে ধাপে, নেমে এস বাজায়ে মঞ্জীর,
উতলা সমীর
তোমার অঞ্চলখানি উড়াক কৌতুকে,
তুমি হাসিমুখে
সে পুরাণ নীপতরুতলে
এস ছুটি লুণ্ঠিত অঞ্চলে।

আবার দুলিব দুজনায়
পুরাতন সেই দোলিকায়।
সেই তুমি সেই আমি চিরন্তন কিশোর-কিশোরী
ঝুলনের তালে তালে গাহিব কাজরি।

হইতে নলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে কার্য্যসিদ্ধির সংবাদ জানাইল।

এই প্রকারে নল ও দময়ন্তী উভয়ে উভয়ের প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। সেই অবধি দময়ন্তী দিবারাত্রি নলের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত এবং ক্রমশঃ তাহার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার পিতামাতা ভীত হইলেন এবং রোগের কারণ অনুমান করিয়া বিদর্ভরাজ ভীম স্বীয় কন্যার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দময়ন্তীর অপূর্ব্ব রূপের কথা ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ এই চারি দিক্‌পালের কর্ণগোচর হইয়াছিল। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া তাঁহারাও পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা জানিতেন যে, দময়ন্তী নলের প্রতি অনুরক্ত এবং ভাবিলেন যে, নলের ন্যায় রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন বিশ্ববিশ্রুত রাজাকে ত্যাগ করিয়া সে কখনই তাঁহাদিগের কাহাকেও পতিরূপে নির্বাচন করিবে না। সেই কারণে তাঁহারা এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা নলের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং পরোপকার ব্রতের মহিমা কীর্তন করিয়া অবশেষে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি দময়ন্তীর নিকট আমাদের দূত হইয়া যান তাহা হইলে আমাদের বড় উপকার হয়। তাহার নিকট গিয়া এরূপ ভাবে আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, যাহাতে সে আমাদের মধ্যে কাহারও গলায় বরমাল্য দান করে।"

এই কথা শুনিয়া নল অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং দিক্‌পালগণের স্বার্থপরতাকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। হায়! ইঁহারা এতই অধঃপতিত হইয়াছেন যে, আমাকে স্বয়ম্বর-সভায় যাইতে দেখিয়াও আমার দ্বারা এই গর্হিত কার্য করাইতে চাহিতেছেন। যাহাই হউক, যখন ইঁহারা আমার নিকট যাচক, তখন আমি চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়া ইঁহাদিগের প্রতি কিছুতেই বিমুখ হইতে পারিব না।

নল স্বীকৃত হইয়া দময়ন্তীর নিকট পৌঁছিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে তিরস্করিণী বিদ্যা শিখাইয়া দিয়া দেবতারা কুণ্ডিনপুরের সমীপস্থ এক উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নল নবার্জিত বিদ্যার বলে অদৃশ্য ভাবে ভীম নৃপতির অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিলেন এবং সোজা দময়ন্তীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি লোচনগ্রাহ্য হইলেন। তাঁহাকে এইরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দময়ন্তী ও তাহার সখীরা বিস্মিত এবং কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইল। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাহারা এখানে-সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন দময়ন্তী সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আপনি কে? আপনি মনুষ্য, না দেবতা, না নাগলোক-নিবাসী? কোন্ দেশ ত্যাগ করিয়া তাহাকে বিয়োগবিধুর করিয়া আসিয়াছেন? আপনার নামের আশ্রয় পাইয়া বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষরের পরম সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে? আপনার রূপ দেখিয়া আজ আমার নেত্র সফল হইল। আপনার নাম বলিয়া আমার কর্ণে সুধাবৃষ্টি করুন। আপনি কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবেন? আপনাকে দেখিয়াই আমি যে আসন ত্যাগ করিয়াছি তাহাতেই উপবেশন করুন। বলুন তো, আপনার এই সাহসের কারণ কি? আপনি কাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য এখানে পদার্পণ করিয়াছেন?"

দময়ন্তীর আসনে উপবেশন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া নল উহার এক সখীর পরিত্যক্ত আসন টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিলেন, কিন্তু নিজের নামধাম প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "আমি দিক্‌পালগণের নিকট হইতে আসিয়াছি। আপনারা আমাকে আপনাদের অতিথি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। আমি আমার প্রভু দিক্‌পালদিগের বক্তব্য বলিতে আসিয়াছি। আমার অভ্যর্থনার জন্য আপনাদের ব্যস্ত হইতে হইবে না, আপনারা বসুন। আমি যে কার্যের জন্য আসিয়াছি তাহা যদি আপনারা সফল করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই আমি উহা আমার যথেষ্ট আতিথ্য বিবেচনা করিব। আপনারা কুশলে আছেন তো? আপনার শরীর সুস্থ আছে তো? আপনার মনে তো কোনো গ্লানি নাই? আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আপনি অবহিত-চিত্ত হইয়া আমার নিবেদন শ্রবণ করুন—

"আমি এখনকার কথা বলিতেছি না। আপনার শৈশব হইতেই আপনার যশঃসৌরভ ত্রিভুবনে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং তখন হইতেই ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ আপনার অনুরাগী হইয়া আছেন। এই চারিজনকে আপনি সাধারণ দেবতা ভাবিবেন না—ইঁহারা দিক্‌পাল—ইঁহারা স্ব স্ব দিকের স্বামী। শুধু তাহাই নহে—ইন্দ্র দেবতাদের অধীশ্বর, বরুণ সলিলাধিপ, যম ধর্মরাজ এবং অগ্নি যজ্ঞভাগের প্রধান অধিকারী। ইহা হইতেই আপনি ইঁহাদের প্রভুত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

ইঁহাদের এখনকার অবস্থা আর কি বলিব! আপনার প্রতি অনুরাগী হওয়াতে ইঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। কিছুকাল হইতে আপনি শৈশব ও যৌবনের সংযোগ স্থলে উপনীত হইয়াছেন। অতএব আপনি এখন দ্বৈতশাসনের অধীন। একদিকে শৈশব স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিতেছে, অপর দিকে যৌবন তাহার আধিপত্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। দ্বৈত শাসন ভয়াবহ, এইরূপ শাসনের অধীন ব্যক্তিদের প্রাণ ও সম্পত্তি নিরাপদ নহে। দিক্‌পালগণকেও ইহার কুফল সহ্য করিতে হইতেছে। আপনার শৈশবযৌবনাত্মক রাজ্যে বিচরণশীল তাঁহাদের মন এখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, কন্দর্প নামক দস্যু তাঁহাদের সমস্ত ধৈর্যধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। অতএব তাঁহাদের এখনকার মনে বেদনা সেই ব্যক্তি সম্যক্ অনুভব করিতে পারে যাহার যথাসর্বস্ব চোর বা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। এই ঘোর দস্যুপীড়ার কারণ আপনিই।

পূর্বাদি দিক এই দিক্‌পালগণের পত্নী। পূর্বে ইঁহারা স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, এখন ইঁহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকান না। এখন একমাত্র আপনার প্রাপ্তির আশা ইঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আপনার যৌবন দিন দিন বেগে বর্ধিত হইতেছে। যেমন উহা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কুসুমশায়কও তাঁহার ধনুর জ্যা দৃঢ় করিতে লাগিয়া গিয়াছেন এবং সেই অনুপাতে আপনার প্রতি সুরপতি ইন্দ্রের অনুরাগও উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিয়াছে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, একদিকে আপনার যৌবন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপর দিকে পুষ্পধন্বার ধনুকের জ্যার আকর্ষণও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়াতে দেবরাজের অনুরাগ পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছে। এখন চন্দ্র দর্শনে তাঁহার অত্যন্ত সন্তাপ ও কোপ হয়। শুধু তাহাই নহে—প্রাতঃকালীন সূর্যের বিম্ব চন্দ্রের বিম্বের ন্যায় স্নিগ্ধ বলিয়া, বাল-সূর্যকে তাঁহার চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হয়। তখন তাঁহার সহস্র নয়ন রোষে অরুণ হইয়া যায় এবং রোষকষায়িত নেত্রে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। অপরাধ করে একজন, ক্রোধের লক্ষ্য হয় আর একজন। ক্রোধান্ধেরা প্রকৃতিস্থ থাকে না।

ঐ দুর্বিনীত কামের আচরণই বা কিরূপ? ইন্দ্র যদি অন্ধই হইয়া থাকেন, কামের কি তাঁহার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করা উচিত? সে একবার তাহার অবিবেকের ফলভোগ করিয়াছে—ত্রিলোচনকে বিরক্ত করিতে গিয়া যে শাস্তি পাইয়াছে, তাহা হইতে কখনো অব্যাহতি পাইবে না। শঙ্কর তাহাকে দগ্ধ করিয়া অনঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাহার অনঙ্গতা যেমন তেমনই আছে, অথচ সে আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। তিনটি মাত্র চক্ষুবিশিষ্ট হরের কোপানলে পড়িয়া তাহার এই দুর্দশা হইয়াছে। এখন সহস্রলোচনবিশিষ্ট ইন্দ্রের উপর উৎপাত আরম্ভ করাতে তিনিও যদি শঙ্করের ন্যায় কুপিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে অবিবেকী অনঙ্গের কি দশা হইবে!

এখানে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, এত অত্যাচারেও সুরেশ কামকে শাস্তি দেন না কেন? তাঁহার অস্ত্র বজ্র এত ভীষণ যে, তাহার এক আঘাতে পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এস্থলে তিনি করিবেন কি? ভগবান ভোলানাথ তাহাকে অভেদ্য কবচ পরাইয়া দিয়াছেন। বজ্র ভৌতিক পদার্থ ও শরীরী প্রাণীর উপরই প্রযোজ্য, কিন্তু কামের তো শরীর নাই—সে যে অনঙ্গ। অতএব তাহার প্রতি বজ্রের প্রহার নিষ্ফল। কপর্দী ভোলানাথের বুদ্ধির বলিহারী!

শরীর সন্তপ্ত ও মন মলিন থাকিলে উদ্যান বা উপবনে কথকাল উপবেশন করিলে আনন্দানুভব হয়। ইন্দ্রের

নন্দনকাননাপেক্ষা মনোরম উদ্যান ত্রিভুবনে নাই, কিন্তু সেখানে গিয়া আনন্দানুভব করাও ইন্দ্রের ভাগ্যে নাই, কারণ সেখানে কোকিলের স্বর তাঁহার কর্ণকে সূচির ন্যায় বিদ্ধ করে। অতএব সেখানে যাইতে তাঁহার সাহস হয় না।

সন্তপ্ত ব্যক্তি শীতোপচারে আরাম পায়। শীতোপচারের যে সকল সাধন ইন্দ্রের রাজ্যে আছে, তন্মধ্যে চন্দ্র অত্যন্ত সন্তাপহারী বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রেরই রাজ্যে বাস করিয়া হর হিমাংশুশেখর হইয়া বসিয়া আছেন। হরের এই অপরাধে ইন্দ্র শিবপূজা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, প্রতিপচ্চন্দ্র দেখিলেও তাঁহার সন্তাপের বৃদ্ধি হয়।

আপনার বিরহে ইন্দ্রের যে কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা আর কি বলিব? ধৈর্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার শরীরের সন্তাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। নানাপ্রকারের উপচারেও তাহার হ্রাস হইতেছে না। অমরাবতীতে অনেক কল্পপাদপ আছে, তাহাদের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। তাহারা ইন্দ্রের এই সন্তাপ অনায়াসে দূর করিতে পারিত, কিন্তু সন্তাপহরণের জন্য তাহাদের কিশলয় দ্বারা নিত্য ইন্দ্রের শয্যা প্রস্তুত হওয়াতে কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা পত্রশূন্য স্থাণু হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণে এক্ষণে তাহারা শক্তিহীন। তাহাদের প্রবল দারিদ্র্য দেখিয়া এই খেদোক্তি স্বতঃই বাহির হইয়া পড়ে যে, হায়, দারিদ্র্য-মোচনের শক্তি-বিশিষ্টদেরও দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়! বিধিলিপি খণ্ডন করা অসাধ্য।

ইন্দ্রের এই দুর্দশার কথা শুনিয়া হয়তো আপনি মনে মনে বলিবেন, 'এই মূঢ় ইন্দ্রকে সদুপদেশ দিবার কি কেহ নাই? তাঁহার গুরু বৃহস্পতি তাঁহাকে কেন বলেন না যে, ইন্দ্রাণী বিদ্যমানেও তিনি অকারণ কেন এত কষ্ট পান?' উত্তরে আমি বলি, সুরগুরু এ বিষয়ে উদাসীন নহেন, তিনি তাঁহাকে অনবরত উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু সে উপদেশ ইন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতে পায় না, কারণ তাঁহার শত্রু স্মর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দিবারাত্রি তাহার ধনুকে টঙ্কার দিতেছে। এই 'ধনুষ্টঙ্কার শুনিতে শুনিতে তাঁহার কর্ণের পটহ ফাটিয়া যাওয়াতে তিনি বধির হইয়া গিয়াছেন।

এই তো গেল ইন্দ্রের কথা। এখন আর এক দিক্‌পালের কথা বলি শুনুন—ভগবান রুদ্রের অষ্টমূর্তির মধ্যে যাঁহার উপাসনা আহিতাগ্নি জন নিত্য অতি নিষ্ঠার সহিত করিয়া থাকে, তাঁহার কথাও আপনি শুনিয়া থাকিবেন। সেই অগ্নিদেবও একটী দিকের অধীশ্বর। আপনার কৈঙ্কর্য করিবার আজ্ঞা তিনিও পাইয়াছেন। সে আদেশ যার-তার নিকট হইতে আসে নাই, স্বয়ং রাজাধিরাজ মদন সে আজ্ঞাপত্র পাঠাইয়াছেন। অতএব তাহা অনুল্লঙ্ঘনীয় জানিয়া অগ্নিও আপনার দাসত্বে ব্রতী হইয়াছেন।

আপনাকে উপলক্ষ করিয়া হুতাশনকে কন্দর্প কঠোর শাস্তি দিতেছে। সে যেন অগ্নির নির্দয়তার প্রতিশোধ লইতেছে—যেন বলিতেছে, অপরের যাতনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তুমি সতত নির্মমভাবে তাহাদিগকে দগ্ধ কর। এখন তুমি নিজে বুঝিতে পারিবে যে দাহের ব্যথা কিরূপ ভীষণ। আপনার বিরহ-সন্তাপে দগ্ধ হইয়া তিনি এখন অন্যের দারুণ ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন এবং ভবিষ্যতে অপরকে দগ্ধ করিতে সাহস করিবেন না। অতএব আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে তিনি বিনীত হইবেন।

অগ্নির প্রতি মন্মথের এরূপ বৈরভাবের কারণ কি? সে কথা পুরাতন হইলেও আপনার অবিদিত নাই। পুরারির তৃতীয় লোচনের মধ্যে নিঃশঙ্কে অবস্থান করিয়া অগ্নি এক সময়ে পঞ্চসায়ককে ভস্ম করিয়াছিলেন। সে অত্যাচার এখনও সে ভোলে নাই। সেই অবধি সে অগ্নির বিষম শত্রু হইয়া রহিয়াছে এবং সর্বদা প্রতিশোধের সুযোগ খুঁ বেড়াইতেছে। সে সুযোগ এখন সে পাইয়াছে। আপনার অক্ষিমধ্যে কুসুমায়ুধের বাস করিবার সুযোগ ঘটাতে সে এখন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এখন-পর্যন্ত প্রতিশোধ লওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, আরও কিছুকাল সে তাঁহাকে জ্বালাইবে।

অগ্নির অবস্থা অতি শোচনীয়। আপনার কারণ, তাঁহার উপর পুষ্পধন্বার অজস্র কুসুমশর বর্ষণ হইতেছে। তিনি তাহাতে এত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন যে, পুষ্পমাত্র

দেখিলেই তিনি ভয়ে বিহ্বল হন। যদি তাঁহার কোনো ভক্ত কুসুমাঞ্জলি লইয়া তাঁহাকে অর্চনা করিতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তাঁহার হৃৎকম্প হয়।

তাহার পর যমের কথা বলি শুনুন। তিনি তো স্মরাগ্নির ইন্ধন হইয়া আছেন। এই অগ্নি তাঁহার শরীরকে দগ্ধ করিতেছে। তিনি দক্ষিণ দিশার অধিপতি। সুতরাং মলয়াচল তাঁহার রাজ্যে বাস করে। সে স্বীয় আশ্রয়দাতার দারুণ যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিতেছে না। ক্লেশের উপশমের জন্য নিজ কোমল পল্লব-রূপী হস্ত দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। যমরাজের জলন্ত দেহের সংস্পর্শে তাহার হস্ত জ্বলিয়া যাওয়া সত্বেও সে তাঁহার দারুণ ব্যথা সহ্য করিতেছে এবং তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিতেছে না। আশ্রয়দাতার বিপত্তিকালে তাঁহার সেবা করাই আশ্রিতের ধর্ম।

পশ্চিম দিশা নিত্য সায়ংকালে অরুণিমারূপ কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত হইয়া তাহার স্বামী বরুণদেবকে মোহিত করে। তাহা সত্ত্বেও জলাধিপ আপনার অনুরাগী। তবে তিনি একটী মহা ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। শুভাশুভ ক্ষণ গণনা না করিয়াই তিনি তাঁহার মনকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বোধ হয় চিত্রা বা স্বাতী নক্ষত্রে তাঁহার মন যাত্রা করিয়াছিল, কারণ সেই অবধি সে আর ফিরিয়া আসে নাই।

বরুণ উদধিমালার অধীশ্বর এবং সেখানেই তিনি বাস করেন। তিনি অনন্তকাল হইতে ক্ষুধিত বাড়বাগ্নিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। সে অগ্নির শিখাবাণ অতিশয় ভীষণ। সে অগ্নি তিনি এক প্রকারে সহ্য করিয়া আছেন। কিন্তু কিছুকাল হইতে আর একটী অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছে, তাহার জ্বালা তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। যদবধি তিনি আপনাতে অনুরক্ত হইয়াছেন, তদবধি তিনি বারিপতি হইয়াও স্মরাগ্নির তীব্র জ্বালা দূর করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

এই চারিজন দিক্পাল ত্রৈলোক্যের মুকুটমণি হইয়াও আপনার কারণে বিপন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার উপর আপনাকে অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ পাইয়া মন্মথ তাহার বিক্রমের অনুচিত ব্যবহার করিতেছে। আপনার সহায়তা না পাইলে সে এরূপ মদান্ধ হইতে পারিত না এবং দিক্পালদের সম্বন্ধে এরূপ চপলতা প্রকাশ করিতে পারিত না।

এই দুঃসময়ে তাঁহারা হঠাৎ শুনিতে পাইয়াছেন যে, কাল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর। এই সংবাদ তাঁহাদের কর্ণে সুধারস প্রবাহিত করিয়াছে। তাঁহাদের শুষ্কপ্রায় হৃৎকোরক কিয়ৎপরিমাণে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার প্রাপ্তির আশায় তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়াছেন এবং এই নগরের বহির্ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে প্রেমপত্র অবশ্যই প্রেরণ করিতেন কিন্তু দেবলিপিতে লিখিত পত্র আপনি পড়িতে পারিবেন না। এই আশঙ্কায় আমাকেই তাঁহাদের জঙ্গম পত্র স্বরূপ করিয়া আপনার চরণপ্রান্তে পাঠাইয়াছেন, এবং কল্পনাতে আপনাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে আপনার নিকট এই সংবাদ নিবেদন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন—

"হে দময়ন্তী, স্মরনামক ভীল বাণ দ্বারা আমাদের হৃদয় এরূপ ভাবে বিদ্ধ করিয়াছে যে, তাহার ব্যথায় আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছি। বাণের ভগ্ন অগ্রভাগ বাহির করিবার এবং ক্ষত শুষ্ক করিবার একমাত্র ওষধিলতা তুমি। অতএব দয়াপরবশ হইয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর—

এতৈককমেতে পরিরভ্য পীন
স্তনোপপীড়ং যদি সন্দিশন্তি ।
ত্বং মূর্ছিতানঃ স্মরভিন্নশল্যে-
মূর্দে বিশল্যৌষধিবল্লিরেধি ॥"

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

দাবী

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

হেরিতেছি দিকে দিকে কণ্টকিত দাবী—
নারীত্বের দাবী আর পৌরুষের দাবী।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে লাগাইয়ে চাবি
সঙীন্ উদ্যত করি সশস্ত্র প্রহরী সম দাঁড়াইয়ে দাবী।

কাছে কাছে এসে তবু দূরে দূরে থাকা
গলে না কঠোর হিয়া, প্রেম রহে ঢাকা।
কভু ফোটেনাকো ভাষা, কভু প্রেম নাহি পায় পথ
শুধু মাথা খুঁড়ে মরে বারম্বার ব্যর্থ মনোরথ।
তীব্র অভিমান নিয়ে অন্ধ হতাশায়
বেদনার বহ্নিদাহে নয়নের জলে
সঙ্গীহীন কাটে দিন বিজনে বিরলে।

গড়িতেছে সুবিপুল ভেদ
দাবীর পর্বতচূড়া রচিতেছে দুরূহ বিচ্ছেদ।
তুচ্ছ মান অপমান অভিমান লাগি
নরনারী গৃহছাড়ি হতেছে বিবাগী।
আত্মঘাতী উন্মাদের অট্টহাস্যময়
প্রণয়ের এই পরাজয়।

আসিবেনা কোনদিন জীবনের ট্র্যাজেডীর পথে
দাবীর চরম ক্ষান্তি হায় এ জগতে!
আপনারে নিঃস্ব করি আত্মনিবেদন
মুক্ত করি রিক্ত করি উচ্ছ্বসিত চিত্ত সমর্পণ!

সেই দিন আনন্দ সঙ্গীতে
মিলে যাবে বিদ্যুতে বহ্নিতে।
সেই দিন জন্ম লবে সুবিপুল প্রাণ
সর্ব্বজয়ী প্রণয়ের দান।

কবি রহে জাগি—
অনাগত সুদিনের লাগি।

প্রাচীন বাঙলার মঙ্গল-কাব্য

ডক্‌টর মনোমোহন ঘোষ এম-এ, পি এইচ-ডি, কাব্যতীর্থ

বঙ্গদেশে তুর্কী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে যখন শাস্ত্র ও সমাজ বন্ধনের প্রধান অবলম্বন হিন্দু রাজ-শক্তির অভাব ঘটিল তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রান্ত ভূমিতে অবস্থিত লৌকিক বা বেদবহির্ভূত দেব দেবীর পূজা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। এই সকল দেব দেবীর পূজাপদ্ধতির এক প্রধান উপকরণ ছিল তাঁহাদের মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন। কিরূপে প্রবল বাধা সত্বেও তাঁহাদের পূজা লোকমধ্যে প্রচলিত হইল, কিরূপে ভক্ত জনকে তাঁহারা নানা বিপদের মধ্য হইতে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিলেন, এই সকল কাহিনী পূজান্তে পঠিত বা গীত হইত। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাঙলার ব্রত কথা ও মঙ্গল কাব্য সমূহের উৎপত্তির কারণ এক বা অভিন্ন। কেবল সালঙ্কার পদ্যে গ্রথিত এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষা সম্পন্ন লোকের রচিত বলিয়া মঙ্গলকাব্য নিচয় খানিকটা সাহিত্যিকগুণ প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিল।

বেদবহির্ভূত যে সকল দেব দেবীর পূজা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রচার লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডী অন্যতম। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অধুনা প্রচলিত মনসা মঙ্গল রচয়িতাগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন বিজয় গুপ্তের গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয় স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে (১)। এই কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী না হইলেও যে সকল কারণে লোককাব্য হিসাবে ইহা সমাদৃত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্পভীতি প্রধান। সর্প দংশনের প্রতীকার দুর্লভ। তাই সর্প দেবতা মনসার প্রীতি উৎপাদন করিয়া লোকে সর্প ভয় পরিহারের চেষ্টা করিত। এই হেতু মনসা মঙ্গল অপেক্ষাকৃত সর্পবহুল পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়া ছিল। ইহারই ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ জনের অধিক মনসা গীতির রচয়িতার নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহারা সকলে পূর্ণাঙ্গ মনসা মঙ্গল বা মনসা চরিত রচনা করেন নাই। মনসা কাহিনীর অংশ বিশেষ অবলম্বনে কবিযশঃ প্রার্থী হইয়াছিলেন।

বিজয় গুপ্তের পরবর্ত্তী মনসা মঙ্গল রচকগণের মধ্যে বংশীদাস বা বংশীবদন চক্রবর্ত্তীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ তাঁহার 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন। ইনি বিখ্যাত রামায়ণ রচয়িত্রী চন্দ্রাবতীর পিতা। বংশী দাসের মনসা মঙ্গলে বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যান বস্তুই মুখ্যত অনুসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি কল্পনা বলে ঐ আখ্যান বস্তুকেই পল্লবিত করিয়াছেন। কিন্তু সরল ভাষা ও অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গী তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার গ্রন্থারম্ভে দেবতা বর্ণনার অংশে বেশ সহজ উপমা দিয়া তত্ত্ব কথা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে বন্দিনু দেবদেব নিরঞ্জন।
পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার অনাদি নিধন॥
নির্গুণ সগুন কিছু নাহি রূপ রেখা।
আছে হেন শব্দ করো সনে নাহি দেখা॥
সকল ঘটের মধ্যে আত্মরূপে আছে।
ব্রহ্মা আদি কীট যত পতঙ্গ জন্মিছে॥
তাহাতে সকল হয় কেহ নাহি ছাড়া।
কলার ছোপায় যেন একত্রেতে জোড়া॥
একই প্রদীপ যেন জলে দীপ্যমান।
তাহাতে অনেক দশা লাগে স্থানে স্থান।
অনন্ত অদ্ভুত যেন নাহি লেখা জোখা।
একত্র হইলে পুন সেই এক শিখা॥
একই ঘাটের জল যেন ভরি ঘটে।
নানা মতে ভরিলেও তবু নাহি টুটে॥
একই পৃথিবী বৃক্ষ নানা মতে লিখি।
একই আকাশে জল নানা মত দেখি॥

(১) বিচিত্রা, ফাল্গুন ১৩৪৫, পৃঃ ১৮৬-১৯১।

একই ছাঁচের মধ্যে বিম্ব উঠে নানা।
রঙ্গ ভঙ্গ নানা রূপ নাহিক গণনা॥
একই বিস্তার যেন ঘটে নানা মতে।
নানা অলঙ্কার ভঙ্গী কর‍য়ে একত্রে॥

নারায়ণ দেব মনসাচরিত মূলক কাব্যের অন্যতম রচয়িতা। কিন্তু তাঁহার রচনায় উপাখ্যানগত কোন বিশেষত্ব নাই এবং তাহার সাহিত্যিক মূল্যও বেশী নহে। এতদ্ব্যতীত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ষষ্ঠীবর, রাধাবিনোদ প্রভৃতির রচিত মনসার ভাসান সম্বন্ধেও একই কথা বলিতে পারা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত মনসা মঙ্গল সমূহের তুলনায় খুব ক্ষুদ্রাকার। উল্লিখিত রচয়িতাগণের গ্রন্থ ব্যতীত যে সকল মনসা মঙ্গল আছে তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ সেই সকলই সাহিত্যিক বিশেষত্বহীন গতানুগতিক রচনা মাত্র।

চণ্ডী কাব্যের আদি রচয়িতার নাম জানা যায় না। তবে যে সকল কবির রচিত চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মাণিকদত্তেরই রচনাকে খুব প্রাচীন মনে করা হয়। কিন্তু তাহা তত প্রাচীন নহে। হয়ত ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বের হইতে পারে। এই রচনার যে নমুনা পাওয়া যায় তাহা হইতে উহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলা যায় না। ইহার মধ্যে মেয়েলি ছড়ার ধরণের যে কবিতা আছে তাহা বড়ই কৌতুক প্রদ। যেমন—

আমারে বোল ডান রে বুড়িরে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হইয়ে মুখ দোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুঞি চৌদ্দ ঘর পড়সি॥
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বারবার।
দ্বারে বোসে খাইনু মুঞি বুড়া পোদ্দার॥
উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল।
দুআরে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল॥
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বার বার।
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার॥

মাণিক দত্তের কাব্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনার সহিত রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার বেশ মিল রহিয়াছে। উভয় কাব্যই হয়ত পরস্পরের নিকটবর্ত্তী সময়ে রচিত।

চণ্ডীমঙ্গলকারদের মধ্যে কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম সমধিক বিখ্যাত। বৈষ্ণব সাহিত্য বাদ দিলে তাঁহার চণ্ডী মঙ্গলই বাঙলা সাহিত্যের অন্ত্যমধ্যযুগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য রচনা। অগ্রে সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হরগৌরীর চরিত্র বর্ণনা করিয়া কবি দুইটি প্রধান কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। একটি ব্যাধ কালকেতুর এবং অপরটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান।

ভবানীর অনুরোধে শিব ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে শাপ দিয়া দেবীর পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্ত্যধামে পাঠাইলেন। এই নীলাম্বরই জন্মিলেন ধর্ম্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু রূপে। বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কালকেতু এমন বলবান ও মৃগয়াপটু হইল যে তাহার উপদ্রবে সিংহ ব্যাঘ্রাদি বনের সমস্ত পশু প্রাণ ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল। উপায়ান্তর অভাবে উৎপীড়িত পশুগণ একদিন ভগবতীর সমীপে গিয়া করিল নিজ নিজ দুঃখের নিবেদন।

পশুদের অভিযোগ শুনিয়া দেবী করুণাবশতঃ তাহাদের সকলকে অভয়দান করিলেন এবং এই বর দিলেন যেন কালকেতু তাহাদিগকে আর দেখিতে না পায়।

তাহার পরে যথাকালে কালকেতু আবার মৃগয়ার জন্য প্রবেশ করিল গিয়া বনে। বনের প্রবেশ পথে সে দেখিতে পাইল সুবর্ণ গোধিকা রূপিণী ভগবতীকে। অশুভ লক্ষণ গোধিকা দেখিয়া কালকেতু ক্রুদ্ধ হইল এবং মনে সে চিন্তা করিল যদি ভাল শিকার মিলে তবে এই গোধিকাকে দেবতা মনে করিবে, অন্যথায় ইহাকে আগুনে পোড়াইয়া আহার করিবে। তাহার পর সে মৃগয়ার জন্য বনে প্রবেশ করিল। তখন বিচিত্র মায়া-মৃগীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবতী হইলেন কালকেতুর সম্মুখে আবির্ভূত। ইহাকে বধ করিবার জন্য কালকেতু যথাসাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু দেবতার মায়ায় সবই হইল বিফল। হতাশ কালকেতু তখন ক্রোধে পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণ গোধিকাকে জাল-দড়িতে বন্ধন পূর্ব্বক ধনুকে চড়াইয়া স্বগৃহে চলিল এবং গৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে চুপড়িতে ঢাকা দিয়া রাখিল। তারপর স্ত্রী ফুল্লরাকে তাহার সইএর নিকট কিছু চাল ধার করিতে পাঠাইয়া কালকেতু গোলাহাট-হাটে চলিয়া গেল।

এদিকে দেবী ততক্ষণে অপূর্ব্ব সুন্দরী সালঙ্কারা ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীর রূপ-ধারণ করিলেন। সইএর নিকট চাল ধার করিয়া গৃহে আসিয়া ফুল্লরা দেখিল সেই রূপসী যুবতীকে। নবাগতা রমণী কয়েক দিন সুন্দরী ফুল্লরার গৃহে থাকিবার অনুমতি চাহিলেন। অতি দারিদ্র্যেও স্বামীর ভালবাসা ছিল ফুল্লরার সম্বল। যদি এই অপরূপ রূপসীর প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হয় এই ভাবিয়া ব্যাধপত্নী হইল একান্ত আকুল। দেবীকে সে নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া এবং নিজ দারিদ্র্য বর্ণন করিয়া অপরিচিত ব্যক্তির গৃহ বাস হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিল। কিন্তু দেবী তাহাতে বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ব্যাধের গৃহে থাকিবার সঙ্কল্প অটুট রহিল। অশ্রুমুখী ফুল্লরা তখন হাটে কালকেতুর নিকট গিয়া দিল দর্শন। সব বৃত্তান্ত জানিয়া কালকেতু নিজে আসিয়া ছদ্মবেশিনী দেবীকে উপদেশ দিলেন এবং দেবী নীরব থাকিলে সেই উপদেশে তাঁহার অবহেলা কল্পনা করিয়া পত্নী বৎসল ব্যাধ তাঁহাকে মারিবার ভয়ও দেখাইল।

দেবী তাহাতে কর্ণপাত না করায় কালকেতু তাঁহার বধের জন্য শর সন্ধান করিল কিন্তু তাহার চেষ্টা হইল নিষ্ফল; এইবার দেবী নিজ পরিচয় দিলেন। কালকেতু তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, দেবী দশভুজা রূপ ধারণ করুন এইরূপ প্রার্থনা করিল। তিনি সেই রূপ পরিগ্রহ করিলে বিস্ময়ে ফুল্লরাসহ কালকেতুর হইল মূর্চ্ছা কিন্তু দেবীর আহ্বানে তাহার চৈতন্য হইল। সংজ্ঞা পাইয়া কালকেতু দেবীর স্তুতি করিল। দেবী তখন তাহাকে নিজ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ও অন্যবিধ প্রচুর ধন দান করিলেন। কালকেতু তখন হইতে পরমভক্ত হইয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিল এবং গুজরাটে বন কাটাইয়া নগর প্রস্তুত করাইল। কিন্তু সেই নগরে কেহ বসবাস করিতে আসিল না। তখন দেবীর নিকট এই বিষয় অভিযোগ করায় দেবী করাইলেন কলিঙ্গদেশে এক প্রবল ঝড় বৃষ্টির আবির্ভাব। তাহার ফলে কলিঙ্গের গৃহহারা সকল লোকজন আসিয়া কালকেতুর রাজ্যে বসতি স্থাপন করিল।

কালকেতুর রাজ্যে সকল শ্রেণীর লোকজনের বসতি স্থাপিত হইলে পর ভাঁড়ু দত্ত নামক এক দুষ্টবুদ্ধি কায়স্থ আসিয়া হাটের লোকজনের উপর উৎপাত আরম্ভ করিল। লোকজনের অভিযোগ শুনিয়া কালকেতু তাহাকে আহ্বান করিয়া ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় ভাঁড়ু দত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাসাইল যে কালকেতুকে আবার দরিদ্র ব্যাধ হইতে হইবে। তার পরে ভাঁড়ু দত্ত গিয়া কলিঙ্গ রাজকে দিল কালকেতুর গুজরাট রাজ্য আক্রমণের প্ররোচনা। ঐ রাজা কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে হারিয়া কালকেতু লুকাইয়া থাকিলে ভাঁড়ু দত্ত প্ররোচনা দিয়া তাহাকে কলিঙ্গ রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করাইল। কলিঙ্গরাজ রাখিলেন তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া। কারারুদ্ধ কালকেতু চণ্ডীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার স্তব করিল। দেবী স্বপ্নে কলিঙ্গরাজকে আদেশ করিলেন যেন কালকেতুকে সসম্মানে নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কালকেতু তখন তাহার গুজরাট রাজ রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইল। এইবারে ভাঁড়ু দত্ত আবার কালকেতুর নিকট আসিলে মস্তকমুণ্ডন ও অপমান করিয়া তাহার বিদায় দেওয়া হইল। তৎপরে কালকেতুর শাপান্ত হইলে সে নিজ পুত্র পুষ্পকেতুকে রাজ্য দিয়া পত্নী সহ স্বর্গে আরোহণ করিল।

দেবসভায় নৃত্যকালে তাল ভঙ্গ হওয়ার অপরাধে রত্নমালা নামক অপ্সরীকে মর্ত্ত্যে খুল্লনা নামে লক্ষপতি সদাগরের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। উজানী নগরের বণিকপুত্র যুবক ধনপতি যে পারাবতসমূহ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন একদা তাহার একটি আসিয়া খুল্লনার বস্ত্রাভ্যন্তরে লইল আশ্রয়। পায়রার অনুসরণে গিয়া ধনপতি খুল্লনাকে দেখিলেন এবং তাহার সঙ্গে একটু সরস বাক্-কলহ হইল। কারণ ধনপতি ছিলেন খুল্লনার খুল্লতাত কন্যার স্বামী এবং সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে ছিল পরস্পর পরিহাসের সম্পর্ক। খুল্লনার রূপ ও সপ্রতিভ ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য ধনপতির চিত্ত ব্যাকুল হইল। অবিলম্বে তাঁহার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব করা হইলে কন্যাপক্ষ তাঁহার কুলশীল ও ধনের কথা বিবেচনা করিয়া

তাহাতে দিলেন সম্মতি। কিন্তু ধনপতির পূর্ব্ব পত্নী লহনা তাহাতে বাধা জন্মাইলেন। তাঁহার সম্মতি না পাইলে বিবাহ হয় না। ধনপতি তখন তাহাকে বুঝাইলেন যে তাহার বিবাহের অর্থ লহনার জন্ত একটি রাঁধুনী আনা মাত্র; নব বধূ আসিলে তাহাকে আর রাঁধিতে হইবেনা। এই চাটুবাণী শুনিয়া লহনার মন একটু আর্দ্র হইল। তাহার উপর ধনপতি তাহাকে কিছু সোনার গহনা ও একখানা ভালো সাড়ী দান করিলে বিবাহে সহজেই তাহার সম্মতি পাওয়া গেল।

রাজার আদেশে বিবাহের অব্যহিত পরেই প্রবাসে গমন কালে ধনপতি খুল্লনাকে সপত্নী লহনার হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ লহনা খুল্লনাকে কিছুদিন ভালবাসিল কিন্তু সেই ভালবাসা হইল লহনার দাসী দুর্ব্বলার চক্ষুশূল। তাহার দুষ্ট প্ররোচনায় লহনা খুল্লনাকে বিষ নয়নে দেখিতে লাগিল এবং তাহাকে স্বামীর বিদ্বেষভাজন করিবার উপায় খুঁজিল তাহায় ফলে এমন এক জাল পত্র খুল্লনার নিকট উপস্থিত হইল যাহাতে ধনপতির নাম স্বাক্ষর সহ এই লেখা ছিল যে খুল্লনা পত্র পত্র পাওয়া পর হইতে দীনবেশে আধপেটা খাইয়া ছাগল চরাইবে এই চিঠি যে তাহার স্বামীর হাতের লেখা তাহা খুল্লনা বিশ্বাস করিল না। নিজ মত সমর্থনের জন্ম সে সাধ্যমত যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিল। কিন্তু লহনার প্রভুত্ব বলে খুল্লনা ঐ পত্রের নির্দ্দেশমত চলিতে বাধ্য হইল।

স্বচ্ছল অবস্থায় মধ্যে পালিত খুল্লনা পূর্ব্বোক্তভাবে ছাগল চরাইতে গিয়া করিল অশেষ দুঃখভোগ। একদিন একটি ছাগল হারাইয়া আকুলভাবে তাহার অন্বেষণ করিতেছিল এমন সময়ে পাঁচটি দেবকন্যার সহিত তাহার দেখা হইল। ঐ কন্যাগণ তখন হইয়াছিলেন চণ্ডীপূজার জন্ম ভূতলে অবতীর্ণ। খুল্লনা তাঁহাদের নিকট চণ্ডীকে পূজিবার উপদেশ পাইয়া ভক্তিভরে দেবীর করিল অর্চনা। সদয় চণ্ডী তাহাকে স্বামীপুত্র লাভের বর দান করিলেন।

এদিকে ছাগল অন্বেষণ ও চণ্ডীর পূজায় বনেই খুল্লনার রাত্রি অতিবাহিত হইল। লহনা খুল্লনাকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া অনুতপ্ত হইল। কারণ স্বামী বিদেশে যাইবার সময় খুল্লনাকে তাহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। প্রভাতে খুল্লনাকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়া লহনা তাহাকে আবার আগের ন্যায় করিলেন আদর ও যত্ন। এদিকে খুল্লনা কর্তৃক চণ্ডীপূজার রাত্রেই ধনপতি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরিবার জন্য তিনি হইলেন ব্যাকুল। ধনপতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে লহনার দাসী দুর্ব্বলা হঠাৎ খুল্লনার খুব হিতৈষী হইয়া পড়িল। তাহারই পরামর্শে সজ্জিতা নবযুবতী খুল্লনা সতীনের আগেই ধনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার পরে বর্ষীয়সী লহনার ঘটিল স্বামী সমাগম। লহনার সহিত নানা কথায় ধনপতি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে খুল্লনাই যেন সেই দিন রন্ধন করে। লহনা এই প্রস্তাবে বিশেষ সুখী হইল না ও তাহাতে বাধা দিতে চাহিল, কিন্তু স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে খুল্লনাই রাঁধিতে গেল এবং দেবী চণ্ডীর কৃপায় তাহার রান্না খুব উত্তম হইল। সেদিন ধনপতির দর্শনার্থ যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি খুব তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। খুল্লনার রন্ধনের খুব প্রশংসা হইল।

রাত্রিতে খুল্লনা সদাগরের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক ইহা জানিয়া লহনা তাহাকে নানা উপদেশে নিবৃত্ত করিতে চাহিল। কিন্তু খুল্লনা সতিনীর উপদেশে বিশ্বাস করিল না ও স্বামী সঙ্গে মিলিত হইল।

দীর্ঘ বিরহের পরে স্বামীর সঙ্গে মিলিত খুল্লনা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় দুর্ভোগের কথা বলিতে লাগিল এবং লহনার প্রদত্ত কৃত্রিম চিঠি তাহার হস্তে দিল। ধনপতি লহনার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেন কিন্তু দাক্ষিণ্যবশতঃ তাহার প্রতি কোন কঠোর ব্যবহার করিলেন না। কেবল মৃদুভাবে জানাইলেন যে তাহার অনুমতি লইয়াই তিনি খুল্লনাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাই সপত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার করাই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। ইহার কিছুকাল পরে খুল্লনার সন্তান সম্ভাবনা হইল। এমন সময়ে ধনপতির হইল পিতৃবিয়োগ। পিতৃশ্রাদ্ধকালে ধনপতির নিমন্ত্রিত জ্ঞাতিবর্গের সহিত কোন কারণে কলহ বাধিয়া উঠিল।

তাঁহারা ধনপতিকে জব্দ করিবার জন্ম এই বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে বনে ছাগল চরাইবার সময় অসহায়া খুল্লনা হয়ত নিজেকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে নাই। কাজেই তাহার সতীত্বের পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং যদি খুল্লনা পরীক্ষা না দেয় তবে ধনপতিকে লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হইবে।

এইবার ধনপতি সমস্ত গোলযোগের মূল লহনাকে তিরস্কার করিলেন এবং লক্ষ টাকা দিয়া খুল্লনাকে পরীক্ষার সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু খুল্লনা হইল না তাহাতে স্বীকৃত। সর্প দংশন, অলন্ত লৌহ দণ্ড স্পর্শন, এবং জতুগৃহদাহ প্রভৃতি পরীক্ষায় জীবিত থাকিয়া সে নিজ চারিত্রিক বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিল। চণ্ডীর কৃপায় শত্রুগণ ধনপতির অনিষ্টসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া খুল্লনার প্রতি ভক্তি দেখাইতে বাধ্য হইল।

ইহার পরে রাজার আদেশে ধনপতিকে সিংহলে যাত্রার কথা ভাবিতে হইল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহে দুর্ভোগ ঘটিবার ভয়ে খুল্লনা ধনপতির বিদেশ যাত্রায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য; তাঁহাকে যাইতেই হইবে। এই কথা জানিয়া খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলার্থ চণ্ডীর পূজা করিতে বসিল। এইবার লহনা ধনপতিকে গিয়া বুঝাইল যে খুল্লনা কোন ডাইনীর পূজা করিতেছে। চণ্ডীর পূজা সাধারণ বৈদিক দেবতার পূজার মত নহে। ধনপতি তখন গিয়া স্বচক্ষে অদ্ভুত ধরণের চণ্ডীপূজারতা খুল্লনাকে দেখিলেন এবং ক্রোধে পদাঘাত পূর্ব্বক দেবীর ঘট স্থানচ্যুত করিলেন।

তৎপরে যথাকালে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাইয়া ধনপতি সিংহল যাত্রা করিলেন। ডিঙ্গা সাতখানি লইয়া ধনপতি যখন প্রবেশ করিলেন সমুদ্রে, তখন চণ্ডিকার কোপে তাঁহার পণ্য পূর্ণ ছয়খানি ডিঙ্গা জলমগ্ন হইল। কেবল মধুকর নামক একখানি ডিঙ্গা লইয়া তিনি সিংহলে পৌছিলেন। কিন্তু তাহার কিছু আগেই কালীদহ নামক স্থানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল। প্রবল সমুদ্র তরঙ্গের মধ্যে এক পদ্মবন, তাহার মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিস্থিত এক পরমা সুন্দরী নারী একটি হস্তী ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য ধনপতি ছাড়া আর কাহারও চোখে পড়ে নাই।

ধনপতি সিংহলে পৌছিলে সেখানকার রাজা তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন কিন্তু সদাগরের বর্ণিত কমলবনস্থিতা রমণীর হস্তী ভক্ষণের কথা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না। রাজা ও ধনপতির মধ্যে এই কথা হইল যে যদি ধনপতি রাজাকে কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারেন তবে তিনি অর্দ্ধরাজ্য পাইবেন আর না পারিলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। ধনপতির অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনের মূলে ছিল চণ্ডিকার ছলনা। রাজা গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কাজেই ধনপতির ভাগ্যে ঘটিল কারাবাস। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্নে ধনপতিকে এই আভাষ দিলেন দিলেন যে তাঁহাকে পূজা করিলে তবে দুর্গতির অবসান ঘটিবে। কিন্তু ধনপতি তাহাতে বিচলিত হইলেন না।

এ দিকে ধনপতির গৃহে খুল্লনা পুত্রবতী হইল। তাহার পুত্রের নাম হইল শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার খোঁজ করিল এবং পিতার অন্বেষণে সিংহল যাত্রা করিল। পথি মধ্যে শ্রীমন্ত ও কালীদহের নিকটবর্ত্তী হইয়া পদ্মবনের হস্তীভক্ষিণী রমণীকে দেখিল এবং তাহার পিতারই মত সিংহলরাজকে সেই দৃশ্য দেখাইতে না পারিয়া হইল কারারুদ্ধ। কারাগারে শ্রীমন্ত মায়ের ইষ্ট দেবতা চণ্ডীর স্তব করিলেন। ভক্ত বৎসলা দেবী তখন আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে করিলেন এবং দেবীর অনুচর দানবগণের প্রহারে রাজার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। চণ্ডীর কৃপায় রাজা কমলকাননের অদ্ভুত কর্ম্মকারিণী সুন্দরীকে দেখিলেন এবং তাহার পরে কারামুক্ত পিতাপুত্রে মিলন হইল। দেবীর আদেশে সিংহলেশ্বর শ্রীমন্তকে করিলেন অর্দ্ধ রাজ্য এবং নিজ কন্যা সুশীলা সম্প্রদান। বিবাহের পর সুশীলা শ্রীমন্তকে সিংহলে থাকিবার জন্য প্ররোচনা দিল কিন্তু মাতৃ দর্শনে উৎসুক শ্রীমন্ত তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া পিতাকে লইয়া দেশে আসিল। পথে চণ্ডীর কৃপায় ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি ফিরিয়া পাইলেন এবং চণ্ডীর প্রতি তাঁহার ভক্তি সঞ্চার হইল। স্বদেশে আসিয়া শ্রীমন্ত সেখানকার রাজাকেও কমল বনের কামিনী দর্শন করাইলেন। তাহার ফলে এই রাজাও শ্রীমন্তকে করিলেন কন্যাদান। দীর্ঘকাল সুখ

ভোগ করিয়া শাপ ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। চণ্ডীপূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হইল।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও ভাষা এবং রীতির দিক দিয়া কবিকঙ্কণের রচনা প্রায় বিশেষত্ব বর্জ্জিত। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু অথবা বিজয় গুপ্ত আদি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার সহিত তাঁহার রচনার কোন উল্লেখযোগ্য প্রভেদ নাই। তাঁহার বিশেষত্ব হইল উপাখ্যানগত চরিত্র চিত্রণে। ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা ও দুর্ব্বলার চরিত্র নির্ম্মাণে তাঁহার কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত নারী চরিত্র কয়েকটি অঙ্কন করিয়া তিনি তৎকালীন সমাজের পারিবারিক সুখ দুঃখের যে নিপুণ চিত্র আঁকিয়াছেন প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে তাহা একান্ত দুর্ল্লভ। কবিকঙ্কনের বর্ণিত পুরুষচরিত্রও কোন কোন স্থলে ফুটিয়াছে বেশ। তবে কোন নায়কের চরিত্রেই নিরবচ্ছিন্ন পৌরুষ বর্ত্তমান নাই।

ফুল্লরাতে রহিয়াছে দরিদ্র গৃহের সাধ্বী স্ত্রীর প্রতিকৃতি আর লহনা খুল্লনায় ধনীগৃহের সপত্নীদ্বয় অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্ব্বলা আমাদের চিরপরিচিতা গৃহবিবাদ সংঘটনকারিণী প্রভুর অর্থ অপহরণশীলা দাসীর প্রতিচ্ছবি। মুরারী শীল বঞ্চক ব্যবসায়ীদের এবং ভাড়ু পরোপজীবী ধূর্ত্তদের প্রতীক রূপে অঙ্কিত। কালকেতুর চরিত্রে আমরা সন্ধান পাই নীচকুল জাত আত্মপ্রত্যয়হীন হঠাৎ ধনবান্ ব্যক্তির ছবির। ধনপতির চরিত্রে সাধারণ বহু পত্নিক বিলাসী গৃহকর্ত্তার আদর্শই চোখে পড়ে। এই সকল চরিত্রের সমবায়ে মুকুন্দরামের কাব্য আধুনিক কালের উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রচনা ভাষা ও রীতির দিক দিয়া তত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হইলেও রসের দিক দিয়া হীন নহে। মুকুন্দরাম বিবিধ রসের বর্ণনায় হাত দিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণিত করুণ রসই ফুটিয়াছে খুব চমৎকার। ফুল্লরার 'বারমাসী' করুণ রসের চিত্র হিসাবে অতুলনীয়। এই বারমাসীতে আছে—

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘর তাল পাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥

বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥

এবং

সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে
পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত বাতাসে।
যুবতী পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে॥

হাস্যরসের বর্ণনায় মুকুন্দরাম নিপুণতা দেখাইয়াছেন। যথা কালকেতুর সভায় ভাড়ু দত্তের আগমন বর্ণনায় আছে :—

ভেট লয়্যা কাচ কলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া ধুতি কোচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছিড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া॥

গুজরাটে কালকেতুর রাজ্যে আগত বৈদ্যগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে :—

কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে কার যোগ
নানাছলে করয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাচন করি তবে জীয়াইতে পারি;
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পয়ান॥

আর মুসলমানগণের শ্রেণী বিশেষের বর্ণনায় আছে :—

বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লার যেই মাথা
দান পায় ছয় কড়ি ছয় বুড়ি।

এই সকল ছাড়া মামুলি রকমের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসও আছে কবি কঙ্কনের কাব্যে। যেমন সুদর্শন নব বর দর্শনে কুলস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ পতির নিন্দা। ধনপতিকে দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনায় আছে—

সবে বলে খুল্লনায় বর মিলেছে ভালো।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর করেছে আলো॥
এক যুবতী বলে দিদি মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ।
* * *
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক সুপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন॥
দড় ব্যঞ্জন আমি সই যেই দিন রাঁধি।
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কান্দি॥
* * *
আর যুবতী বলে সই আমার পতি কালা।
আনের সংসার সুখ মোর বিষম জ্বালা॥

মামুলি হাস্য রস সৃষ্টির অপর দৃষ্টান্ত 'বাঙ্গালদের' লইয়া মুকুন্দ রামের রসিকতা। ঝড়ের সময় ধনপতির বাঙ্গাল মাঝিদের আর্ত্তনাদ বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন :—

কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত।
হলদী গুঁড়া হারাইল শুকুতায় পাত।
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাও পো।

হাস্য রসের উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি একটু স্থূল শ্রেণীর। সূক্ষ্ম ধরণের হাস্যরসও মুকুন্দ রামের কাব্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেমন, ধনপতি কিরূপে পত্নী লহনার নিকট দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের অনুমতি পাইলেন তাহার বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন :—

পরিতোষে লহনাকে দিল পাট শাড়ী
পাঁচ পল দিল সোনা গড়িবারে চুড়ি।
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মোর মনে।
আছিলা যেমত পূর্ব্বে বিবাহের দিনে॥
বস্ত্র পায়্যা যত্নে লৈল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥

স্ত্রী চরিত্রের এই দুর্ব্বলতায় অতিরঞ্জন ~~দ্বারা~~ মুকুন্দরাম যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা খুব উচ্চ শ্রেণীর।

হাস্য-রসের পরেই অদ্ভুত রস বর্ণনায় মুকুন্দরামের কৃতিত্ব। সপত্নীর পরাজয়ের উদ্দেশ্যে লীলাবতী নামক সখী লহনাকে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন তাহার মধ্যে আছে—

কচ্ছপের নখ আর কুম্ভীরের দাঁত।
কোঠরের পেঁচা আর গোধিকার আঁত॥
বাদুড়ের পাখা আর শজারুর কাঁটা।
তেমাথায় পোড়ায়ে ললাটে দিহ ফোঁটা॥
শঙ্খের মুখটি জেষ্ঠী মুষিকের মুণ্ড।
ঢোমা গাবড়ের শিং চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্বরী হইয়া কাণ্ডরী মুখে বাটে।
অলক্ষিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে॥

এই যে তালিকা সেক্সপীয়ার কর্ত্তৃক ম্যাকবেথে বর্ণিত ডাইনীগণের কটাহের কথা মনে করাইয়া দেয়।

বাৎসল্যরসের বর্ণনায়ও মুকুন্দরাম কৃতিত্বহীন নহেন। তাঁহার শ্রীমন্তের ঘুম পাড়ানী গানের রচনাটি উল্লেখযোগ্য। তাহাতে আছে :—

আয় আয় রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব রাঙা গগন ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর, না কান্দ আর॥
গগনমণ্ডলে পাতিব ফাঁদ।
ধরিয়া আনিব গগন চাঁদ।
সে চাঁদখানি আনি তোরে পরাব ফোঁটা।
কালি গড়ায়্যা দিব সোনার ভাটা॥

এইরূপ বিবিধ রসের বর্ণনায় মুকুন্দরামের কাব্য প্রাচীন-বাংলা সাহিত্যে তথা মঙ্গলকাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

চণ্ডীমঙ্গলের পরে 'ধর্ম্মমঙ্গল' নামক কাব্যসমূহ আলোচ্য; কিন্তু সে সমুদয়ই অল্পবিস্তর চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে রচিত এবং তাহাদের সাহিত্যিক গুণ ততটা উচ্চশ্রেণীর নহে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বিশ্ব-লীলা

শ্রীমতী সাহানা দেবী

চারিদিকে শুধু
ধূসর অনন্ত ধূ ধূ
আত্মলীন কায়াহীন কায়া,
ছায়া, ছায়া, শুধু ছায়া!
নাহি সীমা নাহি শেষ,
নাহি স্পন্দনের লেশ,
নাহি গতি, শুধু স্থিতি,
শুধু অবারিত এক অপার বিস্তৃতি
শূন্যতার সমাবেশ
বিরাট-নির্দেশ!

ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নি-কুণ্ড তীরে
নামিল কে ধীরে—
নিশ্চেতন স্থাবরের অবশ পরাণ,
দৃষ্টিহীন নিস্পন্দ নয়ান,
বিকম্পিত হেরি' ওই অরুণ-কিরীট শিরে
অনাগত অতিথিরে।

জলে স্থলে নভে,
উদ্ভাসি' সহসা নব উন্মাদনা অতুল বৈভবে
কাঁপে সৃষ্টি তরঙ্গ লীলায়,
দিকে দিকে দিগন্তের বিভঙ্গিত গতির বন্যায়
সমুচ্ছল বর্ণে গন্ধে মাতি',
সৃজনের নানা রূপ নানা ছন্দে গাঁথি'
ওঠে আলো ওঠে গান,
ওঁঙ্কারিয়া ওঠে প্রাণ,
নিশ্চল নির্বাণ মাঝে
ওই বাজে
প্রণব-মন্দ্রিত ধ্বনি জাগর-মন্ত্রের।

একেশ্বরের
একনিষ্ঠ একক-মগ্নতা
যাদু দণ্ডে দিলে ভাঙি', অয়ি সৃষ্টিব্রতা,
খুলিলে দুয়ার
খেলিবারে বিশ্ব-লীলা বক্ষে তমসার॥

সিকিমের পথে

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)

আজকাল কালিম্পঙে অনেক লোক যাতায়াত কর্চ্চেন। হিমালয়ের বক্ষে এই ছোট্ট সহরটি পূর্ব্বে এমন প্রতিপত্তি লাভ করেনি। দার্জিলিংএ অনেকবার গিয়েছি, মনে করলাম একবার কালিম্পঙটা দেখলে ক্ষতি কি? গ্রীষ্মের অবকাশে কলিকাতার দারুণ গরম যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন একদিন তল্পীতল্পা বেঁধে কালিম্পঙে যাত্রা করা গেল।

শিলিগুড়িতে নেমে ছোট লাইনে গিয়েলখোলা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। তারপর সেখান থেকে অশ্ব পৃষ্ঠেই হোক আর মোটরেই হোক কালিম্পঙএ যেতে হয়। আমি আর ওসব হাঙ্গামা না করে' একেবারেই মোটরে যাত্রা করলাম শিলিগুড়ি থেকে। কালিম্পঙ মাত্র ৪২ মাইল। দার্জিলিঙএর মতই রাস্তা। এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উচুঁতে উঠে গেছে।

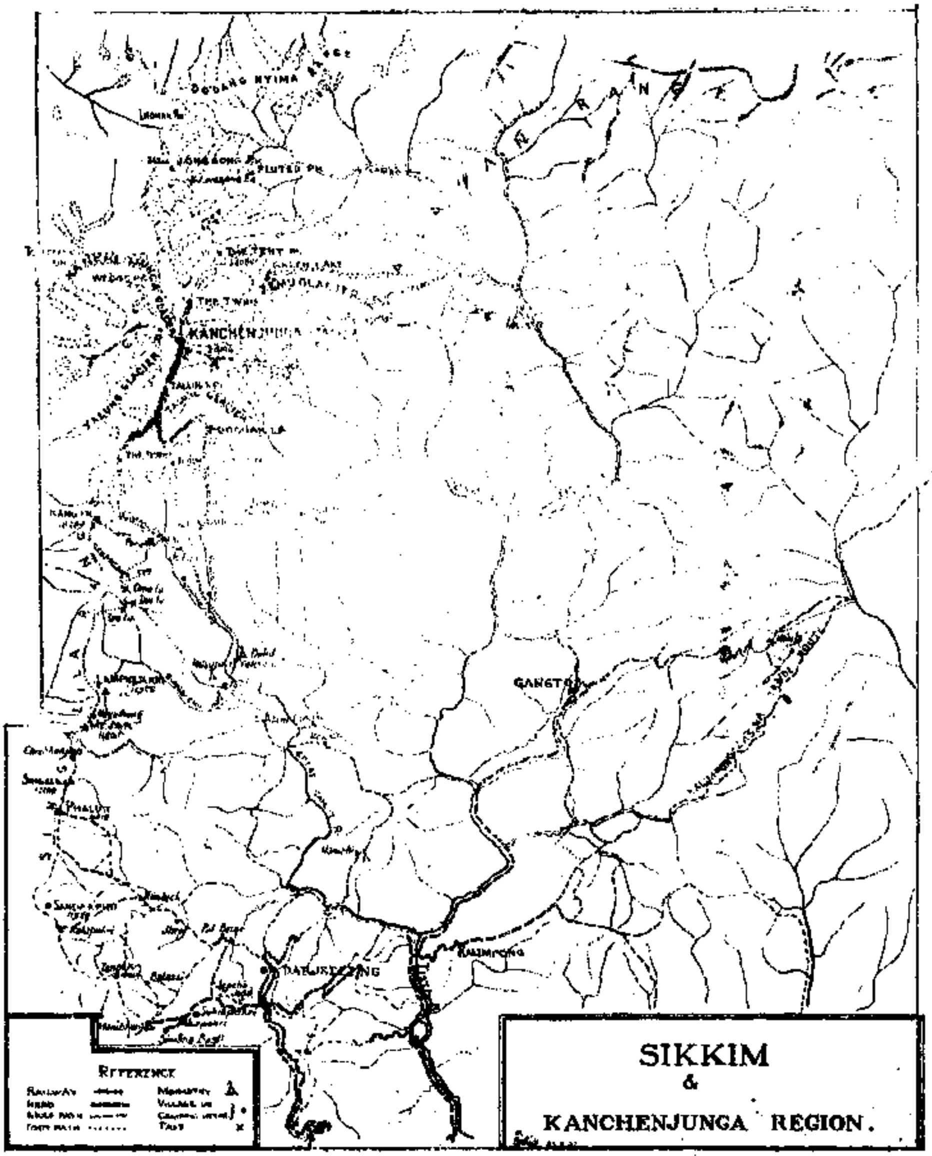
এখন তিস্তার উপর পুল হয়েছে—এণ্ডারসন ব্রিজ। এই পুলের উপর দিয়ে অনায়াসে মোটর যেতে পারে। সেখান থেকে ১২ মাইল পথ ক্রমান্বয়ে উচুঁতে উঠে গেছে। রাস্তা পিচ দেওয়া, খুবই মসৃণ।

কালিম্পঙ পৌছে 'হিল ভিউ' হোটেলে যাওয়া গেল। ট্যাক্‌সিওয়ালারা সকলেই হোটেলটি চেনে। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপালবাবুর পুত্র ফণীন্দ্রবাবু সেই হোটেলটি করেছেন। বাঙ্গালীর উদ্যম বটেও বটে এবং জয়গোপাল বাবুর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় বলেও ঐখানেই ওঠা গেল। শুনলাম, আরও একটি বাঙ্গালী হোটেল আছে।

এই হোটেলে গিয়ে দেখি বন্ধুবর অধ্যাপক জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী সেখানে তখন বসবাস করছেন। সঙ্গী পেয়ে খুবই আনন্দ হলো। হোটেলটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছ



তিস্তা—এণ্ডার্সন সেতু



সিকিম অঞ্চল
(পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে)

চ্ছন্দ্য এবং যত্নেরও কোনও অভাব নেই। কিন্তু সব চেয়ে উপভোগ্য দেখলাম মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গ। হোটেলওয়ালা-ঢ-ঙের মন। তাঁর মনের গঠন ও প্রকৃতি অন্য রকম। কাজেই তাঁর সঙ্গে গল্প গুজব ক'রে সময় বেশ কাটতো। একদিন তাঁর হোটেলে একটু মজলিশেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। স্থানীয় লোক সব এসে জুটেছিলেন। যতদূর

মনে হয়, শ্রদ্ধাভাজন হীরেন্দ্রনাথও উপস্থিত হয়েছিলেন। হীরেন্দ্রবাবুর বাড়ীটি আর একটু উচুঁতে। দূরবীণদাঁড়ায় যেতে পথে পড়ে। বাড়ীটার নাম 'হিমানী'। দৃশ্যটি সেখানে অত্যন্ত মনোরম।

কালিম্পঙ যে জন্যে বিখ্যাত সেটি হচ্চে ডাঃ গ্রেহামের আশ্রম। পৃথিবীর অনেক স্থলেই ইহা সুপরিচিত। কালিম্পঙ হোমস্ বলতে সকলেই একটি বিপুল হিতকর প্রতিষ্ঠান বুঝে। বহু বর্ষ পূর্বে যখন রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, বাহিরের জগতের কাছে এই সহরটির পরিচয় ছিল না, তখন এই সাহেব খুঁজে খুঁজে এই স্বাস্থ্যকর স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। এখানে অনাথ আতুর বালক বালিকাদের অজস্র টাকা আসতে লাগল। চারিদিকে এই আশ্রমের নাম ছড়িয়ে পড়লো। বাংলার সরকার, ভারতের সরকার মুক্ত হস্তে এর সাহায্য করলেন। কয়েক বছর আগেকার এক রিপোর্টে দেখছিলাম যে, প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হয়ে গেছে। এখানকার বাড়ীঘর দেখবার মত। উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রায় মাইল খানেক জুড়ে এই আশ্রমটি যেন নিজের গৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ডাঃ গ্রেহামের কীর্ত্তি প্রচার করছে।

এখান থেকে অনেক সময় মাল চালান যায় সমতলে এবং সমতল হ'তে মাল আনবার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। গ্রেহাম আশ্রমের নিকটেই রজ্জুপথের (Ropeway) ষ্টেসন।



হিমালয়ে মেঘের মেলা

নিয়ে এসে তিনি স্বহস্তে লালন পালন করতে লাগলেন। আমাদের দেশে ইংরেজ পুরুষেরা এসে অবাধে মেলা মেশা করেন এদেশের আয়া ও কুলি রমনীদের সঙ্গে। সেই মেলা মেশার অনিবার্য ফলে বহু সন্তান-সন্ততি হয় যাহাদের ভরণ পোষণের ভার পিতা বা মাতা কেহই স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত নয়। অনেকে আবার লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্যে গোপনেই শিশুদের সরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় ডাঃ গ্রেহাম তাঁর আশ্রম খুললেন, শিক্ষার জন্য স্কুল খুললেন, কাজ শিখাবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে' তুললেন, চিকিৎসার জন্য শুশ্রূষার জন্য হাঁসপাতাল ডাক্তার নার্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেন। পৃথিবীর নানাদেশ থেকে

রিয়াঙ ষ্টেসন হ'তে কলে মালপত্র এই দড়ি বয়ে উপরে ওঠে। দড়ি ঠিক নয়; খুব মোটা মোটা তার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা'তে ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিলে বৈদ্যুতিক শক্তিতে অবলীলাক্রমে তিন চার হাজার ফুট উপরে উঠে আসে। কুলি দিয়ে বা পাহাড়ী ঘোড়া দিয়ে এই কাজ করতে হলে অনেক মজুরী, অনেক সময় এবং অনেক খরচ লাগতো। সেইজন্য 'রজ্জুপথ কোম্পানী' হয়েছে—মালের মাশুলে যে লাভ হয়, তার জন্যেই বহু লোক টাকা দিয়েছে।

এখানকার বাজারে বাঙালীর সংখ্যা বেশী দেখলাম না। কিন্তু হিন্দুস্থানীর সংখ্যা মন্দ নয়। সুদূর ছাপরা, বালিয়া, রাওলপিণ্ডি হইতে মাড়োয়ারীরা গিয়ে বেশ-

গুছিয়ে বসেছেন— বহুদিন থেকে তিব্বতের পশুলোম ভারতের মধ্য দিয়ে বিদেশে রপ্তানী হয় এবং শাল বনাত কম্বল হয়ে আমাদের দেশে বিক্রী হয়। এই ব্যবসা করবার জন্য লোটা কম্বল ও ছাতু নিয়ে পশ্চিমারা বহুদিন থেকে কালিম্পঙ, সিকিম ও তিব্বতের ভিতরে প্রবেশ করেছে। এদের হাত দিয়ে যে ব্যবসা চলে তার বার্ষিক মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার কম নয়। সিকিম এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়। দার্জ্জিলিংএর ম্যাপ দেখলে বুঝা যায় যে, হিমালয় ভারতের উত্তরে এক প্রকাণ্ড কুহক সৃষ্টি করে' রেখেছে। যারা অলস, উদ্যমহীন তাদের পক্ষে হিমালয় যেন এক প্রকাণ্ড পাষাণ প্রাচীর হয়ে চিরদিন উত্তরের জগৎকে তার শেষ নেই। দার্জ্জিলিঙএ গরমের সময় প্রায় দিনই এই শৃঙ্গগুলি মেঘে ঢাকা থাকে। এই বরফ দেখতে-দেখতে মনে হয়—একবার ঐ দিকে এগিয়ে গেলে হয় না?

মনে করলাম, অন্ততঃ সিকিমের রাজ্যটা এক ফাঁকে দেখে আসা যাক্। সিকিম নামটি আমার খুব ভালো লাগে। ভুটান খোটানের মত কাটখোট্টা রকমের নয়। সিকিম নামটির মধ্যে যেন কত রহস্য জড়িত রয়েছে! সিকিম থেকে কমলালেবুর সময়ে বহু কমলালেবু কলিকাতায় আসে, সে সময়ে কমলালেবুর বনে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁদের কাছে এর অনেক গুণগান শুনেছি। এই কমলা লেবুর ব্যবসা থেকে রাজার বেশ কিছু লাভ হয়। প্রতি



হিমাচলের একটি ঝর্ণা

পৃথক্ করে রেখেছে। কিন্তু যাদের আশা আছে, চেষ্টা আছে এবং তীক্ষবুদ্ধি আছে, তারা হিমালয়ের এই বিশাল রহস্যকে কাজে লাগিয়ে ঐশ্বর্য লাভ করেছে। যখন রেল হয়নি, মোটর হয়নি, তখন ছোট ছোট পাহাড়ী ঘোড়া নিয়ে লোক তিব্বতের হিমমরু লঙ্ঘন করতে কুণ্ঠিত হতো না। আর আমরা? আমরা বাংলোর বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে তুষারের শোভা দেখতে-দেখতে এলিয়ে পড়ি।

সত্যই কালিম্পঙ থেকে বরফের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। উত্তরের দিকে রজতের শৃঙ্গগুলি স্তরে স্তরে উঠে যেন কোন স্বর্গের রাজ্যে পৌঁছে গেছে। প্রভাতে এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে-দেখতে কত যে কল্পনার জাল বুনতে পারা যায়, বছর লক্ষ ঝুড়ি কমলা চালান যায়। আপেলের চাষও হয়। প্রায় হাজার মণ আপেল সিকিম থেকে পাওয়া যায়। গরু বাছুর যথেষ্ট আছে। গরু মহিষের দুধ থেকে যে ঘি উৎপন্ন হয়, তা' ঐ গরীব দেশে বিক্রী হয় না। কাজেই ঘিয়ের চালানও আসে। এই সব থেকে ঐ রাজ্যের যা কিছু আয়। সিকিম রাজ্য আয়তনে অনেকখানি হলেও দেশ বড় গরীব। বার্ষিক রাজস্ব বোধ হয় ১৫ লক্ষ টাকার বেশী হবে না। এখন চারিদিকে যে সব জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (National Economic Planning) হচ্ছে, সে সব সিকিমের মত রাজ্যে প্রবর্তন করলে দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো ভাত পেতে পারে। সিকিমে অনেক

খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় এরূপ শোনা যায়। কিন্তু ওরা জননী ধরিত্রীর বুক চিরে সোনা রূপা বার করা মহা-পাতক মনে করে। সে যাই হোক একদিন সকালে পেম্পার ট্যাকসিতে বেরিয়ে পড়া গেল। কালিম্পঙে পেম্পা একজন বড় ট্যাকসিওয়ালা। কালিম্পঙ থেকে বেরিয়ে সোজা নীচে নেমে আসতে হয় তিস্তার এণ্ডার্সন পুলের নিকটে। ওখান থেকে একটি রাস্তা পুল পার হয়ে শিলিগুড়ির দিকে গেছে। ঐ রাস্তারই খানিকটা গেলে আবার দার্জিলিংএ যাবার রাস্তা দেখা যায়। সে রাস্তায় ছোট মোটর (Baby car) যেতে পারে। কিন্তু পুলের ডান দিকে নীচে দিয়ে আর একটি রাস্তা সিকিমের দিকে চলে গেছে। সে রাস্তায়ও পিচ্ দেওয়া। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল, সেজন্য রাস্তা কিছু পিছল ছিল। কিন্তু চালকের সতর্কতার উপর আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত উপায় নেই।

রাস্তা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে—বামে তিস্তা নদী। স্রোত দুই এক যায়গায় এত বেশী যে, মনে হয় নদী আনন্দে মেতে উঠে কল্লোল করতে-করতে ছুটেছে কোন অজানার মোহে। কঠোর কঠিন পাষাণের বুকে যে কোমলতা থাকতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু সেই নিস্তব্ধ, মৌন, নীরস নির্জ্জন পাষাণ পঞ্জরের মধ্য দিয়ে লীলাময়ী ত্রিস্রোতা যে কোমলতার বাণী বহন করছে যুগে যুগে, তা মানুষের পরম ধ্যানের বস্তু। যে মাধুর্য সৌন্দর্য ছড়াতে-ছড়াতে নদী চলেছে নেচে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সঙ্গে আমার দুইটি ভাগিনেয় ও একটি জামাই ছিলেন। প্রকৃতির এই নিভৃত সৌন্দর্যের মাঝে আমরা সকলেই মৌন মূক বিস্ময়ে নব নব পট পরিবর্ত্তন দেখতে-দেখতে চললাম। কোথায়ও পাহাড় একেবারে রাস্তার উপর এসে ঝুঁকে পড়েছে, আমরা তার নীচে দিয়ে চলেছি।

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক তিস্তার পুল থেকে প্রায় ৪০ মাইল। কিন্তু এই পথ অতিক্রম করতে যে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগলো, তা কোন দিক দিয়ে কেটে গেল, বুঝতেও পারা গেল না। কেবল 'রঙপু'তে একবার নামতে হয়েছিল। সিকিমের ও ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে রঙপু নদী হচ্ছে সীমান্ত। এখানে পুলিশের ঘাঁটি আছে। ভারত-বাসীদের প্রবেশ করতে কোনও পাসপোর্ট বা অনুমতি পত্র লাগে না। তবে রেজেষ্ট্রীতে নাম লিখে দিয়ে যেতে হয়। বিদেশীরা ছাড়পত্র ব্যতীত ঢুকতে পারে না।

রঙপুতে লোহার পুল পার হয়ে আমরা সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করলাম। সিকিমের পুলিশ দেখলাম—পাহাড়ী পাহারাওয়ালা, বেশের পারিপাট্য আছে। কিন্তু চেহারা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালীর মত মনে হলো। রঙপু ছাড়িয়ে কিছু দূর পর্যন্ত কমলালেবুর খেত। তার পরে বনজঙ্গল ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না। সিকিমের রাজধানী



কালিম্পঙ—ছোট ঘোড়া ও পাহাড়ী বালক

দেখতে চলেছি, সে কথা মনে হলো না, বরং মনে হলো যে দীর্ঘকাল বনবাসে বা মহাপ্রস্থানে চলেছি। পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি দূরে দূরে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। গ্যাংটক ততটা উঁচু নয়, বোধ হয় ৬০০০ ফিটের বেশী হবে না। রাজধানীর যত কাছে যেতে লাগলাম, ততই রাস্তা চওড়া দেখা গেল। আরও, স্থানে স্থানে কুলিরা পাহাড় কেটে রাস্তা চওড়া করতে লেগে গেছে। পথে দু এক পশলা বৃষ্টিও পেয়েছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের রাস্তায় জল পড়লে

বেশীক্ষণ সে ভাব—থাকে না। সুতরাং আমাদের পন্থা বেশ নিরাপদ ও সুগম হয়েছিল।

প্রথমে গিয়ে আমরা রাজকীয় ডাকবাঙ্গালায় উঠলাম। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। সুতরাং স্থান পেতে কষ্ট হলো না। ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ারকে আগে থেকে না লিখলে বেশ বেগ পেতে হয়। ঐ সময়ে একজন ইংরেজও সেখানে ছিলেন। শুনলাম তিনি ওখানকার শিক্ষাসচিব। তাঁর চেহারা ও ধরণ-ধারণ দেখে শিক্ষার সঙ্গে যে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তা মোটেই বোধ হলো না। অবশ্য আমার ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। চেহারা দেখে লোকের সম্বন্ধে ধারণা করলে প্রায়ই ঠক্‌তে হয়।



কালিম্পঙ—বাজার

আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল, সেগুলি উদরসাৎ করে বেরিয়ে পড়া গেল। সোজাপথে গিয়ে স্থানীয় টেলিগ্রাফ অফিস, স্কুল প্রভৃতি দেখা গেল। আরও খানিকদূরে সৈন্যাবাস। সেদিকে গমন নিষিদ্ধ। কাজেই আমরা ফিরতে বাধ্য হ'লাম।

এদিকে এসে রাজবাড়ীর সম্মুখ দিয়ে বৌদ্ধমঠে প্রবেশ করলাম। রাজবাড়ীটা খুব বড় নয়। তার পরে, দুর্গ তৈয়ারী করে তার অভ্যন্তরে বাস করবার প্রথাও দেখলাম না। সাধারণ বড় লোকের বাড়ীর মত—একটি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, তাতেই বর্ত্তমান রাজা সার তাসি নামগয়াল বাস করেন। তাঁর বিচারালয় ও দপ্তরখানাও ঐ সঙ্গে। গ্রীষ্মকালে রাজা তিব্বতের অন্তর্গত চুম্বিতে গিয়ে বাস করেন। শুনলাম যে রাজপরিবারের স্থান সংকুলান হয় না বলে' রাজবাড়ী বাড়ানো আবশ্যক হয়েছে—তার জন্যে কাঠ কাটরা মালমশলা সংগৃহীত রয়েছে।

আমরা একটু উঁচু দিয়ে একটা সমতল যায়গায় উপনীত হ'লাম। সেখানেই দ্বিতল মঠ (monastery)। মঠে ঢুকবার পথে দেখলাম একটি গোয়াল ঘর। তার সামনে কতকগুলি গরু চরছে। গরুগুলি বেশ ভাল জাতের। একটি ঘরে কতকগুলি হরিণ শাবক রয়েছে। পাশেই আশ্রম—সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ও মঠের অধ্যক্ষেরা বাস করেন। মঠটি দর্শনীয় বটে। কিন্তু বড় আধুনিক। পুরাতন বেশী কিছু দেখলাম না। দ্বিতলে ও নীচের তলায় দুটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে। দেয়ালে কাচের উপর বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনা চিত্রিত রয়েছে। তিব্বত থেকে লোক আনিয়ে প্রায় দুলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সকল চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্রগুলির সব খুব উঁচুদরের না হলেও কতকগুলি বেশ দেখবার মত। সারনাথের চিত্রের মত তত পরিষ্কার নয়। নীচে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির নিকটে অনেকগুলি বাতি জ্বলছিল—রোমান ক্যাথলিকদের গির্জ্জায় যেমন জ্বলে।

কয়েকজন মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু মাদুরে বসে' পাঠ করছেন। দুজন 'তেঙ্গুর ও কেঙ্গুর' নকল করতে ব্যস্ত রয়েছেন। তেঙ্গুর ও কেঙ্গুর বৌদ্ধ ধর্ম্মেতিহাসের প্রকাণ্ড গ্রন্থ। নকল করতে দীর্ঘকাল লাগে। আমি করজোড়ে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, অবশিষ্ট অংশ নকল করতে আর কত দিন লাগবে। ভিক্ষু বললেন 'আঠার মাস।' এমনই দুরূহ ব্যাপার। এই গ্রন্থ সেদিন তিন হাজার টাকায় একখণ্ড বিক্রী হয়েছে।

সিকিমের রাজ্য কতদিনের তা জানা যায় না। বর্ত্তমান রাজ্য ইংরেজদেরই সৃষ্টি বলা যেতে পারে। নেপাল যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ লাভ করেছিলেন, তাই ওঁরা সিকিমের রাজাকে দিয়ে বর্ত্তমান রাজ্যটিকে রূপ দান করেছেন। ইংরেজদেরই করদ মিত্র রাজ্য বলে' সিকিমের আয় অল্প হলেও সম্মান আছে। একবার ইংরেজদের সঙ্গে একটু গোলযোগ বেধে উঠেছিল; সিকিমের লোক ইংরেজ রাজ্যে ঢুকে লোকজন ধরে' নিয়ে যেতো এবং দাসরূপে তাদের বিক্রী করতো। ইংরেজ সরকার তার প্রতিবাদ করলে রাজা কর্ণপাত করলেন না। উপরন্তু ইংরেজ কর্মচারী ডাঃ ক্যাম্বেল ও ডাঃ হুকারকে বন্দী করলেন। তখন ইংরেজ সেনা গিয়ে জোর করে' সিকিমের কতকটা রাজ্য দখল করে' নিয়েছিল। দার্জিলিংও বোধ হয় সিকিম রাজ্যের অংশ ছিল; ওদের কাছ থেকে নিয়ে আমাদের সরকার বাহাদুরের শৈলবিভাগে পরিণত করা হয়েছে।

তিব্বতে যেতে হলে' গ্যাংটক্ হয়েই যেতে হয়। সব চেয়ে নিকটের যে গিরিপথ—নাথু-লা গ্যাংটক থেকে মাত্র তিন দিনের পথ। লা অর্থে গিরিপথ বা পাস (Pass)। নাথু-লা যেতে হলে পদব্রজে নয়ত ঘোড়ায় যেতে হয়; অন্য কোনও উপায় নেই। জেলেপ-লাও বেশী দূর নয়। জেলেপ-লা ১৪০০০ ফিট উঁচুতে। পথের শোভাও শুনেছি অপূর্ব। পাহাড়ী ধুতরা ফুলে এবং লাল বরাস ফুলে (Rhododendron) পাহাড়ের গাত্র অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। প্রজাপতির ত কথাই নাই। এত বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ও এত সুমিষ্টকণ্ঠ পাখী এই পাহাড়ের নির্জন কক্ষে বিচরণ করে যে তেমন বোধ হয় আর কোথায়ও নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন সেদিকে অগ্রসর হতে পারি নি, তখন সে কথা বলে আর লাভ কি?

মঠ থেকে বেরিয়ে আমরা রাজকীয় উদ্যানে (Park) এলাম। উদ্যানটি সযত্নে রক্ষিত। বিদ্যুতের আলোতে



কালিম্পঙ বাজার—কুলির পৃষ্ঠে সওয়া

সহর আলোকিত। কাজেই সন্ধ্যায় উদ্যানের খুব শোভা হয়। উদ্যান দেখে' ডাকবাঙ্গলোতে ফিরে এলাম ও চৌকীদারকে বক্‌শিশ্ করে আমাদের গাড়ীতে উঠলাম। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার কুয়াসায় আরও নিবিড় হয়ে উঠছিল, এমন সময়ে আমরা কালিম্পঙে ফিরে এলাম।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শরৎ

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

বর্ষার উৎসব শেষে উড়ায়ে উতল উত্তরীয়
এলে ধরণীর দ্বারে হে শ্যামল প্রিয়,
সুপ্রসন্ন আকাশের ছায়াপথ বেয়ে
শেফালির সুরভিতে নেয়ে ;
ভুবনের বনে বনে চলে তব আলোকের রথ
হে শ্যামল, সুন্দর শরৎ !
ধান্যভারে আনমিত আউষের শিরে
পূবালী পবন দিল দোল—
পরিপূর্ণ সরোবরে জাগাইল ধীরে
কমলের পুলক-হিল্লোল।
নবীন ধানের ক্ষেতে দিশা নাহি পায় শ্যামলতা
তার চঞ্চলতা
নয়নে অতৃপ্ত রাখি মিশে যায় দিগন্তের কোনে
আকাশ ও ধরণীর মিলন-চুম্বনে !
সপ্তপর্ণে, হে কুমার, হেরি তব বন্দনার মালা
অতসীর ফুলে তব আরতির দীপগুলি জ্বালা,
অমল-আলোকপাতে জয়ের নিশানগুলি হাসে
প্রভাতের প্রফুল্লিত কাশে।
মরালের মঞ্জুকণ্ঠে তব বরণের গীত ভাসে
প্রসন্ন মঙ্গল সুরে প্রভাতের ভৈরবী-বিভাসে ॥

অনিন্দিত হে অতিথি, তোমার বীণায় বাজে জানি—
সত্য-শিব-সুন্দরের বাণী ;
আজিকার অভিশপ্ত অবনীতে সে আনন্দ-গান
নাহি পায় প্রাণ।
তোমার শান্তির সুর যুযুৎসুর জয়কোলাহলে
হারাইয়া যায় পলে পলে।
সুন্দর এ ধরণীর শস্যভারে শ্যামলিত সুধা
মিটাইতে পারে নাক মানুষের সাম্রাজ্যের ক্ষুধা
দিকে দিকে হেরি তাই সমুদ্রের পশ্চিম পূরবে—
নির্য্যাতনে, নিষ্পেষণে মানবাত্মা কাঁদে আর্ত্তরবে।
শান্তিময় নীলাম্বর হ'তে
নামে মানুষের বজ্র অতর্কিতে, মরণের স্রোতে
ভেসে যায় অগণিত প্রাণ !
সমুদ্রের কিনারে কিনারে তরণীতে নহে তব দান
বাজে সেথা মৃত্যুর বিষাণ।
নিঃশ্বাসের বায়ু আজ বিষবাষ্পে মৃত্যু ব'য়ে আনে
মানুষের অগ্রগতি ধায় আজি পশুত্বের পানে ॥

এই অশান্তির মাঝে জাগে শুভ্র শান্তির প্রার্থনা
তাই করি তব অভ্যর্থনা।
তুমি, বন্ধু, আনিয়াছ জানি—
ভারতের তপোবনে মূর্ত ছিল যে শান্তির বাণী।
আকাশের নীলকান্তে, পৃথিবীর শ্যামলে হরিতে
পবনের দোলা লেগে
আপন আনন্দ বেগে
শস্যশীর্ষে যে সৌন্দর্য্য জেগে ওঠে প্রাণের সঙ্গীত
সে তোমার দান।
আত্মার আনন্দ-গীতে বিথারিলে প্রসন্ন কল্যাণ
তাই ধরণীর সাথে পূর্ণ প্রাণে করিনু গ্রহণ
হে সুন্দর, তব সম্ভাষণ ॥

—

গোয়ালিয়রের ফিলোজ বংশ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, পি, আর, এস

গোয়ালিয়র রাজ্যে ফিলোজরা এক খ্যাতনামা সর্দ্দার বংশ। ঐ বংশের অনেকে তথায় উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত আছে। ইটালী হইতে সমাগত একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কেমন করিয়া মধ্যভারতের এই দেশীয় রাজ্যে এক সর্দ্দার বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সে ইতিহাস নিতান্ত কৌতূহল-প্রদ।

ফিলোজরা নেপলস প্রদেশের অন্তর্গত ক্যাষ্টেল্যগারে নগরের এক প্রসিদ্ধ বণিক এবং মহাজন বংশ ছিল। এই বংশীয় মাইকেল নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষে ফিলোজ-শাখার প্রতিষ্ঠাতা।* কথিত আছে প্রথম জীবনে ঐ ব্যক্তি ফরাসী সৈনিকরূপে এদেশে আসিয়াছিল। আর এক মতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যব্যপদেশে স্বীয় পিতার একটি পোতারোহণে মাইকেল সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আগমন করে। তথায় জঁ। বাপতিস্ত দে লা ফন্তেন নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত তাহার সবিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। ঐ ব্যক্তি নামসর্ব্বস্ব মোগলসম্রাট সাহ আলমের দরবারে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তখন কলিকাতায় অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। উহাঁর নিকট দেশীয় দরবারে সুখৈশ্বর্য্য, প্রভাবপ্রতিপত্তির কথা শুনিয়া মাই-কেলের ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃত্তি পরিগ্রহণে আগ্রহ হইয়া-ছিল। লা ফন্তেনের চেষ্টায় অযোধ্যার নবাবসরকারে তাহার একটী কর্ম্ম জুটিয়াছিল। এই সময় ফিলোজ ম্যাগডালেনা মরিস নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ফৈজাবাদ নগরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্ম হয়। প্রিয় সুহৃদের নামানুসারে উহার নামকরণ হইয়াছিল জঁ। বাপতিস্ত দে লা ফন্তেন ফিলোজ। ইতিহাসে ঐ ব্যক্তি তাহার নামের ইংরাজী প্রতিরূপ জন বাপতিষ্ট বা শুধু বাপতিস্ত নামে পরিচিত। দেশীয় মুখে তাহা "জান বত্তিস-জী"তে বিকৃত হইয়াছিল।

তাহার কিছু পূর্ব্বে অযোধ্যাধিপতি সুজাউদ্দৌলা পরলোক গমন করেন। (২৮।১।১৭৭৫)। তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলা সিংহাসন লাভকালে ইংরাজদিগের সহিত যে নূতন সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান সর্ত্ত ছিল যে, ইংরাজ ভিন্ন তাঁহার ইউরোপীয় সমুদয় সৈনিককে তিনি কর্ম্মচ্যুত করিবেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ ব্যক্তিবৃন্দকে কর্ম্মদান হইতে নিরস্ত থাকিবেন। ফলে অপরাপর বহু ইউরোপীয় সৈনিকের সহিত মাইকেল ফিলোজকেও ভাগ্যান্বেষণের নূতন ক্ষেত্রের সন্ধানে যাইতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি গোহদের জাঠ রাণা ছত্রসিংহের সেনাদলে প্রবেশ করেন। ফিলোজবংশের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে পুত্রজন্মের অনতিকাল পরে ফিলোজ গোহদের রাণার সেনাবিভাগে একটী অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরী পাইয়া নবাব সরকারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কথা সত্য নহে। অযোধ্যাধিপতির তুলনায় গোহদের রাণা নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা মাত্র ছিলেন। তাঁহার নিকট অপেক্ষাকৃত ভাল কর্ম্মপ্রাপ্তি সম্ভব ছিল না।

ফিলোজ যখন প্রথম গোহদ যান তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। মাদাম ফিলোজ আগ্রায় বাস করিতে থাকেন। তখনকার দিনে আগ্রা ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়গণের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এইখানে কিছুকাল পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ফাইডেল ভূমিষ্ঠ হয়।

*Asiatic Quarterly Review, vol. VII (1889), p. 381. ফিলোজ বংশের এই পারিবারিক ইতিহাসে অনেক মিথ্যা কথা স্থান পাইয়াছে। " " চিহ্ন মধ্যে প্রদত্ত অংশ এই প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

গোহদের রাণারা পূর্ব্বে সামান্য ভূস্বামী মাত্র ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের দিনে আরও অনেকের মত তাঁহারাও আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পরাক্রান্ত পেশবাদিগের নেতৃত্বে মারাঠা অভ্যুদয়ের যুগে তাঁহারা বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারেন নাই। পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয়ের সুযোগে ছত্রসিংহ তাহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন এবং স্বাধীন নরপতিতে পরিণত হন। ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার কর্ণেল মাদেকের সেনাদল ক্রয়ের কথা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। অতঃপর মেজর জর্জ স্যাণ্ডার্স নামক একজন বৃটীশ জাতীয় সৈনিক দলের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার দুইটি ব্যাটালিয়নের মধ্যে একটির অধ্যক্ষ ছিলেন মাইকেল ফিলোজ। ছত্রসিংহের একটি বিশেষ দোষ ছিল। তখনকার দিনে এ দোষ আরও অনেকের ছিল। তিনি সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দিতেন না। ফলে অচিরেই দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হজেস নামক একজন ইংরাজ পর্য্যটক স্যাণ্ডার্সের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "১৩ই এপ্রিল গোহদে একজন ইংরাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি এককালে ঘড়ি মেরামতের ব্যবসা করিত। কিন্তু সে সময় ঐ ব্যক্তি রাণার দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক সেনার অধ্যক্ষতা করিতেছিল। পরম আগ্রহের সহিত সে আমাকে সামরিক জীবনে তাহার সুগভীর বীতস্পৃহার কথা জানাইয়াছিল। বৃটীশ অধিকারমধ্যে তাহার পূর্ব্বতন পেশায় ফিরিয়া যাইবার স্বীয় আন্তরিক বাসনাও ঐ ব্যক্তি আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। রাণার চাকরীতে সে সামান্য কিছু অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহা লইয়া ফিরিয়া যাইতে সে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তাহাকে গমনের অনুমতি দেওয়া হইতেছিল না। আমাকে সে অনুরোধ করিয়াছিল যেন লক্ষ্ণৌ যাইবার সময় আমি তাহার একটি পুলিন্দার ভার গ্রহণ করি। সন্তুষ্টচিত্তে আমি তাহা করিয়াছিলাম এবং তাহার বন্ধুর নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম।" *

* Hodges : Travels, p. 144

মাইকেল দীর্ঘ নয় বৎসর কাল গোহদে থাকিলেও (১৭৭৫-৮৩ খৃঃ) তাঁহার এই সময়ের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। ফিলোজ বংশের ইতিহাসে সে প্রসঙ্গে কিছু উক্ত হয় নাই। ইংরাজদিগের সহিত সমরাবসানের (১৭৮২ খৃঃ) পর উত্তর ভারতে আত্মপ্রাধান্য বিস্তারেচ্ছু সিন্ধিয়ার রাণার সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য ছিল। মহাদজী গোয়ালিয়র পুনরধিকার করিয়া গোহদদুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের কথা ইতিপূর্ব্বে দি বইন প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মিগুয়েল নামক একজন ইটালীয়ান সৈনিক, যাহাকে রাণা প্রত্যয় করিয়া একটি ব্যাটালিয়নের পরিচালন ভার দিয়াছিলেন, দল ত্যাগ করিয়া সিন্ধিয়ার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহার ঠিক সপ্তাহকাল পরে ছত্রসিংহও শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।* এই মিগুয়েলই যে আমাদের মাইকেল ফিলোজ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ফিলোজ বংশের ইতিহাসে মাইকেলের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে লিখিত হইয়াছে "গোহদে তাঁহার বেশী দিন থাকা হয় নাই। মহাদজী সিন্ধিয়া তখন সুবিখ্যাত জেনারেল দি বইনের নেতৃত্বে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সেনাদল সংগঠন করিতেছিলেন। তাঁহার ইউরোপীয় অফিসরগণ মোটের উপর ভাল ব্যবহার পাইতেন; পক্ষান্তরে রাণা খামখেয়ালি প্রভু ছিলেন। মাইকেল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়রে যান এবং একটি রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। উহা তিনি ক্রমশঃ বিবর্দ্ধন করেন। পরিশেষে তাহা একটি সুদক্ষ এবং সুদৃঢ় ব্রিগেডে পরিণত হয়।"

ফিলোজের জীবনের এই সময়ের সকল কথা সঠিক জানা যায় না। তিনি মহাদজী সিন্ধিয়ার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে কথা সত্য, তবে তাহার সময় জানা নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে দি বইন সিন্ধিয়ার জন্য সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী সেনা

* Poona Residency Correspondence, Vol I, p. 382

সংগঠন করেন। কাপ্তেন ফ্রেমন্ত এবং কাপ্তেন জন হেসিঙ্গ নামক দুইজন অফিসর ঐ দুই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফিলোজ যদি এই সময় দি বইনের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিতান্ত অধস্তন পদে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। ইহার পর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যখন আবার তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় তখন তিনি দি বইনের প্রথম ব্রিগেডে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে একজন অফিসর। দি বইন তাঁহাকে একটি ব্যাটালিয়নের পরিচালন ভার দিয়াছিলেন।

লা ফস্তেনের নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। সে জন্য মাইকেলের জন্মের অল্পকাল পরে তিনি বন্ধুর নিকট তাহার প্রথম পুত্রটিকে দত্তক লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মাইকেলের ইহাতে কোন আপত্তি হয় নাই। অতঃপর বালকের শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি উহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তথনকার দিনে হিন্দুস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে ইউরোপীয় বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা থাকিবার কথা নহে। পরিশ্রমী এবং মেধাবী ছাত্র বলিয়া বাপতিস্তের সুখ্যাতি ছিল। কথিত আছে সে অচিরেই নিজ গুণে শিক্ষকমণ্ডলী এবং সতীর্থবর্গের স্নেহপ্রীতি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিল। প্রথমে সে ইটালীয়ান এবং ফরাসী এই দুইটি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। চারি বৎসর পরে লা ফস্তেন বালককে দিল্লী লইয়া যান। তথায় তাহার সামরিক শিক্ষা এবং তথনকার দিনে অপরিহার্য্য আরবী এবং ফারসী ভাষা শিক্ষার তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাপতিস্তের বয়স এই সময় মাত্র দ্বাদশ বৎসর ছিল।

একদিন সম্রাট দরবারে লা ফস্তেনকে সাহরাণপুরের রোহিলাসর্দ্দার মুইনুদ্দিন খাঁ বা ভাম্বু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে বাপতিস্ত বলিয়াছিল তাহার প্রস্তাব ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত না হইলে সে অনুরোধ করিতে চাহে যেন অভিযানের নেতৃত্ব তাহাকে প্রদত্ত হয়; সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অচিরে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তাহাও সে জানাইল। একটী ফারসী বয়েৎ বাপতিস্ত নিজ অনুরোধের সমর্থনে বলিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"তরবারি যতক্ষণ কোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহার ধার জানা যায় না, মুক্তার মূল্যও ততক্ষণ নির্ণীত হয় না যতক্ষণ না তাহা কর্ণে ঝুলান হয়।" অল্পবয়স্ক বালককে এরূপ দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে পাঠাইতে লা ফস্তেন প্রথমে কিছুতে সম্মত হন নাই। পরে তাহার কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি উহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় নিকোষিত অসি বাপতিস্তকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস! এই লও আমার তরবারি। ইহাই তোমার নিয়োগপত্র। যুদ্ধে বিজয় লাভ অথবা মরণকে আলিঙ্গন করিও।" বাপতিস্তের সৈনিকবর্গ শত্রুপক্ষকে এরূপ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়াছিল যে দুই ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর উহারা আক্রমণকারিদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় তিন গুণ অধিক হইলেও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অনন্তর বাপতিস্ত সাহরণপুর অধিকার করিয়া তথায় দুই মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহাকে নিজ সৈনিকগণের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত তীব্রতর একটি বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; উহারা কয়েক মাস বেতন পায় নাই। লা ফস্তেনকে বেতন প্রদানে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তাহারা বালক অধ্যক্ষকে বন্দী করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে আভাস পাইয়া বাপতিস্ত পলায়ন করিয়াছিল এবং দীর্ঘ ২৪ ঘণ্টা একাদিক্রমে অশ্বচালনা করিয়া দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

এইরূপে নিতান্ত অল্প বয়সে তাহার প্রথম সামরিক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া বাপতিস্ত স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া পুত্রের কৃতকার্য্যতার জন্য মাইকেলকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সাহ আলম কাপ্তেন পদসহ তাহাকে একটি রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে সৈন্যদল অপেক্ষা স্কুলভবনই যে অধিকতর উপযুক্ত স্থান তাহা বুঝিলেও সম্রাটের আদেশের স্পষ্ট প্রতিবাদ করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া লা ফস্তেন বাপতিস্তের রেজিমেণ্টে গমনে বিভিন্ন অজুহাতে দীর্ঘকাল বাধা দিয়াছিলেন। পরিশেষে বাদসাহের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া তিনি বাপতিস্তকে পুনরায় কলিকাতায় একটি

ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। বাপতিস্ত এখানে চারি বৎসর কাল যাপন করেন এবং শিক্ষণীয় সকল কিছু এবং ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। তাহার বয়স যখন সতের বৎসর তখন তাহার অভিভাবক মেজর অডাম পিকক নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকপুরুষের কন্যা মার্গারেটের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন (১৭৯৩খৃঃ)।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পেশবা-দরবারে স্বীয় স্বার্থরক্ষাকল্পে মহাদজী সিন্ধিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে অধিক সেনাবল লয়েন নাই। কর্ণেল জন হেসিঙ্গের পরিচালনাধীনে স্বীয় দেহরক্ষীদল এবং ফিলোজের ব্যাটা-লিয়নটি মাত্র তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি যে শান্তিকামী হইয়া প্রভুসকাশে যাইতেছেন, কোন গুপ্ত অভিপ্রায় তাঁহার নাই, তাহা প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দি বইনের অনুগ্রহে কর্ম্মলাভ করিলেও মাইকেল তাঁহার বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার সহিত চক্রান্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত সকল প্রকার সম্পর্করহিত স্বতন্ত্র একদল সৈন্যের নেতৃত্ব তাঁহাকে প্রদান করিতে মহাদজীকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। অতঃপর সিন্ধিয়ার আদেশে তিনি পৃথক একটি ব্রিগেড গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পুণায় আগমনের স্বল্পকাল পরেই মহাদজীর মৃত্যু হইয়া-ছিল (১২।২।১৭৯৪)। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। স্বীয় অন্যতম ভ্রাতুষ্পৌত্র পঞ্চদশবর্ষীয় বালক দৌলৎরাওকে তিনি দত্তক লইবার সঙ্কল্প করিলেও সে কার্য্য তখনও যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় নাই। মৃত মহারাজের বিধবা পত্নী লক্ষীবাই দত্তক গ্রহণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফিলোজ বংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে শুধু মাইকেলের জন্যই দৌলৎরাওয়ের পক্ষে সিংহাসনপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইয়াছিল। "পেশবার মন্ত্রী নানা ফড়নাবীশ গোপনে তাঁহার শিবির এবং ঐরূপে সিন্ধিয়ার বাহিনীর অন্যতম প্রধানাংশ করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া মাইকেল কালবিলম্ব না করিয়াই মুলজাপুর নামক স্থান হইতে গোপনে দৌলৎরাওকে আনাইয়া শিবিরে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নবীন সিন্ধিয়ারূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তখন পেশবা উহাঁকে মৃত সিন্ধিয়ার উত্তরাধিকারীরূপে মানিয়া লইতে এবং খিলাতাদি প্রদান দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি নানাও এই নিয়োগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিজেকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হইতে দেখিয়া তিনি দৌলৎরাওকে বন্দী করিবার জন্য চক্রান্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গোপনে কর্ণেল ফিলোজকে ঐ কার্য্যের জন্য দুই লক্ষ টাকা দিবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা দূরে থাক ফিলোজ নবীন প্রভুর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন।" এসকল কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। উক্ত ইতিহাসে বহু অপ্রকৃত কথা স্থান পাইয়াছে।

পর বৎসর নিজামের সহিত সংঘটিত সুপ্রসিদ্ধ খড়দা বা কর্দ্দালা যুদ্ধে (১২।৩।১৭৯৫) মাইকেল ফিলোজের সৈনিক-গণকে উপস্থিত দেখা যায়। সুতরাং তিনিও ঐ সংগ্রামে ছিলেন মনে করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে জেনারেল রেমঁ প্রসঙ্গে যুদ্ধের সকল কথা উক্ত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে পেশবা মধুরাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ফড়না-বীশ তাঁহাকে যে প্রকার সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন তাহাতে তাঁহার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া গভীর অবসাদের সহিত তিনি উক্তবিধ কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাদজীর দেহান্তের স্বল্পকাল মধ্যে মধুরাওয়ের মৃত্যু মারাঠাদের জাতীয় ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। বহু গোলযোগের পর রঘুনাথ রাওয়ের পুত্র বাজীরাও মসনদে বসিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি ছিলেন এবং কাহাকেও প্রত্যয় না করিয়া সকলকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করা ইহাই ছিল তাঁহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। সংসারে দেখা যায় ঐ ধরণের লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত নিজেরাই ঠকিয়া থাকেন। বাজীরাওয়ের ক্ষেত্রেও সে সনাতন নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

নানা এবং সিন্ধিয়ার বিরোধ দর্শনে বাজীরাও উল্লসিত হইয়াছিলেন। উহাদের দুইজনের কর্তৃত্ব হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করা তাঁহার অভীষ্ট ছিল। সিন্ধিয়া সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা ছিল উহাকে তিনি কোন-মতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারিবেন। কিন্তু

তাহাতে নানার কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল। সে কারণ বাজীরাও সর্ব্বপ্রথম নানার সর্ব্বনাশ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার অন্যতম মন্ত্রী সূর্য্যরাও ঘাটগের প্রতি তিনি একার্য্যে সর্ব্বাধিক নির্ভর করিতেন। বৈজাবাই নামে ঘাটগের একটী পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। দৌলৎরাওয়ের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। হবু-জামাইয়ের প্রধান মন্ত্রী হইবার সূর্যরাওয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাজীরাও তাঁহাকে বুঝাইলেন নানার প্রভাব তাঁহার পক্ষে বিষম অন্তরায়। নানাকে বন্দী করা সাব্যস্ত হইল। সিন্ধিয়া এবং ঘাটগে একবার নানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ভদ্রতার খাতিরে নানার প্রতি সাক্ষাৎ করিতে আসা আবশ্যক ছিল। তাঁহাকে বন্দী করিবার আয়োজন চলিতেছে এ ধরণের আভাস তিনি পাইয়াছিলেন। সেজন্য উহা করিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না। কিন্তু ফিলোজ তাঁহাকে নিজ সুনামের নামে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার আশঙ্কা অপনোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি দেখা করিতে যাইবামাত্র ধৃত হইয়াছিলেন (৩১।১২। ১৭৯৭)। ফিলোজের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশীয় দরবারে নিযুক্ত ইউরোপীয় অফিসরগণের মধ্যে বিষম ক্ষোভ এবং বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। ভাগ্যান্বেষী হইলেও উহারা নিজেদের কথার মূল্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উহাদের এই সুনামের জন্যই নানা অপরাপর সর্ব্ববিধ আশ্বাসের পরিবর্ত্তে ফিলোজের প্রতিশ্রুতি অধিকতর নির্ভর-যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। ফিলোজকে কথার খেলাপ করিতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া নিজামের সেনাপতি রেমঁ তাহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কথাপ্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

নানার সমভিব্যাহারী কয়েকজন প্রভাবশালী সর্দ্দার তাঁহার সহিত ধৃত হইয়াছিল। তাঁহার রক্ষী এবং অনুচরবর্গ, সংখ্যায় প্রায় একসহস্র হইবে, আক্রান্ত এবং ছত্রভঙ্গীকৃত হইয়াছিল। নানা যে সময় সিন্ধিয়ার শিবিরে বন্দীকৃত হন সেই সময় বাজীরাও তাঁহার দলভুক্ত অপরাপর অমাত্য-বর্গকে কার্য্যব্যপদেশে প্রাসাদমধ্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। উঁহারাও সকলে একযোগে বন্দী হইয়াছিলেন। সকলকার আবাসবাটি লুণ্ঠিত হইল। সে রাত্রি এবং পরদিন পুণা নগরে গোলযোগের অন্ত রহিল না। যুদ্ধের সময় শত্রুহস্তে পতিত হইলে নগরীর যে দশা ঘটে মারাঠা-রাজধানীর অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। নানাকে বন্দীভাবে আহ্মদ-নগর দুর্গে লইয়া যাওয়া হইল। অনন্তর বাজীরাও অমৃত-রাওকে প্রধান মন্ত্রীপদ দিয়াছিলেন।

কিন্তু "বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?" নানাকে দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখা সম্ভবপর হইল না। স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে মারাঠা রাজনীতি এবং পুণা দরবারের সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই সময় তথায় কি প্রকার চক্রান্তজাল বিরাজ করিতেছিল এবং কি হীন স্বার্থচিন্তার বশে মারাঠাকুলধুরন্ধরগণ জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তাহা হইলে সহজ হইবে। নানার অধঃপতন ঘটাইয়া বাজীরাও অতঃপর সিন্ধিয়ার প্রভাব হইতে মুক্তির চেষ্টায় যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে তিনি যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেগুলি পালন করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল ঐ কার্য্যের মধ্য দিয়াই তিনি অভীষ্টসাধনে সফল হইবেন। মার্চ্চ মাসে দৌলৎরাওয়ের সহিত সূর্য্যরাওয়ের কন্যা বৈজাবাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহে ব্যয় বাহুল্য হইয়া-ছিল। পুণায় রক্ষিত তাঁহার বাহিনীর জন্য সিন্ধিয়ার মাসে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইত। নানাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইলে বাজীরাও তাঁহাকে দুই ক্রোর টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া তাঁহাকে অর্থ জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে বাজীরাও জানাইলেন অত টাকা সংগ্রহের সামর্থ্য তাঁহার নাই; সিন্ধিয়া যদি ঘাটগেকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন তাহা হইলে তিনি হয়ত নগরের ধনাঢ্যগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তাহা আদায় করিতে পারিবেন। সিন্ধিয়ার ইহাতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। তাঁহার নবীন উজীর এবং শ্বশুর যে কি ভাবে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। আতঙ্কে হাহাকারে রাজধানী মুখরিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং পেশবা যে অনর্থের

মূল তাহা কেহ জানিত না। বাজিরাও নিজেও ভাবেন নাই তাঁহার কার্য্যের ফল এরূপ দাঁড়াইবে বা ঘাটগে এতটা বাড়াবাড়ি করিবেন। সিন্ধিয়ার নিকট তিনি প্রতিবাদ জানাইলে কোন ফল হইল না। দৌলৎরাও তাহা লোকদেখান ভণ্ডামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলের মত অমৃতরাও-ও তাঁহার ভ্রাতার গোপন চুক্তির কথা কিছু জানিতেন না। ঘাটগের আচরণে ক্রোধে ক্ষোভে এবং সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া তিনি ভ্রাতার নিকট নানার মত দৌলৎরাওকে ধৃত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার নিজ দরবারেও এই সময় বিষম আত্মকলহ এবং দারুণ মনোবাদ দেখা দিয়াছিল। তাহাতে আনন্দিত পেশবা মনে করিয়াছিলেন প্রধূমিত অনলে ইন্ধন যোগাইয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। অমৃতরাও সিন্ধিয়াকে বন্দীকরণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক চরম মুহূর্ত্তে বাজীরাওয়ের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল! তিনি ভয়ে ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। তাঁহার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই দুর্ব্বলচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণটিতে দোলায়মান চিত্তে তিনি কর্ত্তব্য হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ব্যর্থতার এবং মারাঠা জা.:ের পতনের অন্যতম কারণ। শুধু তাহাই নহে, দোলৎরাওয়ের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এবং অমৃতরাওয়ের স্কন্ধে সকল দোষের বোঝা আরোপ করিয়া নিজের সাফাই করিতে তাঁহার বাধে নাই।

পুণায় গোলযোগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সিন্ধিয়ার অবস্থাও দিন দিন সঙ্কুল হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ব্ব সূত্র হইতে এক নূতন বিপদ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল। মহাদজী সিন্ধিয়া মৃত্যুকালে তিনটী বিধবা পত্নী রাখিয়া যান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম ছিল লক্ষ্মীবাই। কনিষ্ঠা ভাগিরথীবাই নিতান্ত অল্পবয়স্কা পরমাসুন্দরী ছিলেন। সিংহাসন লাভকালে দৌলৎরাও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে খুল্লপিতামহীগণের পদোচিত মর্য্যাদার সহিত বাস করিবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এ যাবৎ তাঁহারাও সিন্ধিয়ার শিবিরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, ক্রমে তাঁহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও অভাব হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রতিবাদে কোন ফলোদয় হইল না। সহসা একদিন বয়োজ্যেষ্ঠা মহারাণীদ্বয় আবিষ্কার করিলেন যে ভাগিরথী বাইয়ের সহিত দৌলৎরাওয়ের অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এতাদৃশ মহাপাতকীকে তাঁহারা অতঃপর আর পুত্রস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না জানাইলেন। ঘাটগে উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে চাহিলে তাঁহারা উঁহাকে তাঁহাদের কাছে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নিরস্ত হইবার পাত্র সর্য্যরাও ছিলেন না। তিনি মহারাণীদের শিবির আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। উঁহাদের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর আচরণ, এমন কি তাঁহাদের অঙ্গে কষাঘাত পর্য্যন্ত, করা হইয়াছিল। মহাদজীর সময় প্রধান প্রধান প্রায় সকল রাজপদই সৈণবী ব্রাহ্মণদিগের অধিকৃত ছিল। উঁহাদের অনেকেরই ভিতর রক্তসম্পর্ক ছিল। তাহাদের নেতা বল্লভ তাত্যার বন্দীত্বে এবং ঘাটগের পদোন্নতিতে উঁহারা পূর্ব্ব হইতে অসন্তুষ্ট হইয়াই ছিল। এক্ষণে পরলোকগত মহাদজীর বিধবাগণের প্রতি এবম্বিধ নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করিয়া উঁহাদের ক্রোধ-বিরাগের অবধি রহিল না। সৈণবী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিল। বহু বাগবিতণ্ডা, কলহ গোলযোগের পর স্থির হইল মহারাণীগণ বুরহানপুরে নীতা হইবেন; তথায় তাঁহাদের যথোচিত সম্মানের সহিত বাসের বন্দোবস্ত হইবে।

১৪ই মে বাঈরা পুণা হইতে যাত্রা করিলেন। ঘাটগে রক্ষীগণকে বুরহানপুরের পরিবর্ত্তে উঁহাদের আহ্মদনগরে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়ার শিবিরে মহাদজীর বিধবাগণের প্রতি অনুকূল ব্যক্তির তখনও অভাব হয় নাই। সৈণবীদিগের পক্ষাবলম্বী মজঃফর খাঁ নামক জনৈক পাঠান সেনানায়ক পথিমধ্যে রক্ষীগণকে বিতাড়িত করিয়া উঁহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন এবং পেশবার ভ্রাতা অমৃতরাওয়ের শিবিরে উঁহাদের লইয়া গিয়াছিলেন। জুন্নার যাইবার পথে তিনি

তখন অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া স্বয়ং ঘাটগে সসৈন্যে মজঃফর খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। পাঠান সেনাপতিও রাজমহিষীগণকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া অনুসরণকারীগণকে প্রত্যাক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উহাদের পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া মহোল্লাসে অমৃতরাওয়ের সন্নিধানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে স্বয়ং বাজীরাও উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া এই বিদ্রোহ বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বাইদিগের পক্ষাবলম্বীগণকে তিনি যথাসাধ্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বিপন্না রাজমহিষীগণকে অমৃতরাওয়ের আশ্রয় প্রদান যে খুবই ন্যায় এবং ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে তাহাও তিনি বলিতেন। কিন্তু তাঁহার ভয় ছিল পাছে সিন্ধিয়া এবং ঘাটগে ভীষণ কিছু করিয়া বসেন। সেজন্য তিনি ইংরাজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল পামারকে বন্ধুভাবে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘাটগের পরামর্শে সিন্ধিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

৭ই জুন রাত্রে কর্ণেল দুপ্রা (Du Prat) নামক সিন্ধিয়ার জনৈক ফরাসী সেনানায়ক ৫ ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ অমৃতরাওয়ের শিবির অধিকারে প্রেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু ঐ কার্য্যে ব্যর্থমনোরথ হইয়া এবং বিষম ক্ষতিস্বীকার করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। আবার আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইল। সিন্ধিয়ার আন্তরিকতায় আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতরাও পুণার উপকণ্ঠে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিবির হইতে অদূরে নিজ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এ কার্য্যটি তাঁহার উচিত হয় নাই। তখনকার দিনে প্রতিশ্রুতির মূল্য তাঁহার অজানা থাকিবার কথা নয়। হয়ত স্বেচ্ছায় না হইলেও কতকটা বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। পের° প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া হিন্দুস্থানে গমন করিলে কর্ণেল ড্রুজো° (Drugeon) নামক জনৈক ফরাসী সেনানী প্রথম ব্রিগেডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঘাটগে তাঁহাকে অমৃতরাওকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত অবসরের সন্ধানে থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ক্রমে মহরম্ আসিল। সে দিন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। অমৃতরাওয়ের শিবিরের সকলে মিছিল দেখিতে ব্যস্ত। তাজিয়া বিসর্জ্জনের সময় ড্রুজো°র সৈনিকগণ মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে আসিয়াছিল। সকলে মনে করিয়াছিল শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উহাদের আগমন। অকস্মাৎ উহাদের গোলন্দাজগণ পঞ্চবিংশতি তোপ হইতে নদীর অপর পারে অমৃতরাওয়ের শিবিরের উপর গোলা বৃষ্টি করিল। সেজন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না। উহাদের কোন প্রকার বাধা দান সম্ভব হইল না। বাইরা তখন অন্যত্র বাস করিতেছিলেন। সুতরাং ইহা নিছক অমৃতরাওকে আক্রমণ। পেশবার ভ্রাতাকে সিন্ধিয়ার আক্রমণ করা তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মাত্র। সকলেই তাহা সেইভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কাশীরাও হোলকর সসৈন্যে আসিয়া অমৃতরাওয়ের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। পেশবা নিজামের সহিত সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। রঘুজী ভোঁসলার সহিতও সন্ধির আলোচনা চলিতে লাগিল।

এবার সিন্ধিয়া নিজ কার্য্যের ফলে ভীত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বৃটীশ রেসিডেণ্টের মধ্যস্থতার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কর্ণেল পামার উহাঁকে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী পরিবর্ত্তন, বাইদিগের সহিত রফা এবং পেশবার আধিপত্য মানিয়া লইয়া বিগত আচরণের জন্য যথোচিত ক্ষতিপূরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। হয়ত দৌলৎরাও তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেন না। কিন্তু বাইরা তাঁহাদের দাবী এতদূর বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে তাহাতে সম্মত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতঃপর সিন্ধিয়া বাজীরাওকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ লইয়া নানাকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। নানার মুক্তি পেশবার পক্ষে চিন্তার কারণ হইলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। তাহার অল্পকাল পরেই নিজামের সহিত পেশবার কৃত সন্ধি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অপ্রকৃতিস্থমতি উজীরের অনুসৃত দোলায়মান নীতি তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল। এবার বাজীরাওকে সিন্ধিয়া এবং নানার সহিত আপোষ রফায় সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল। দৌলৎরাও

তখনও নিজামী সন্ধি পণ্ড হইবার সংবাদ জানিতে পারেন নাই। সুতরাং মিটমাটের কথায় তিনিও আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তবে সে সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনার পূর্ব্বে পেশবার পক্ষে যে নানাকে পূর্ব্বপদে পুনর্গ্রহণ অপরিহার্য্য তাহা তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। নানা তাঁহার পূর্ব্বপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন একথা কর্ণগোচর হইবার পর ফিলোজের আর এদেশে টিকিতে সাহস হইল না। পুত্র ফ্রাইডেলের হস্তে সেনাদলের ভারার্পণপূর্ব্বক তিনি ইংরাজাধিকৃত বোম্বাই নগরে পলায়ন করিলেন।

ফিলোজ বংশের ইতিহাসে এ সকল কথা অন্যভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে সূর্য্যরাওয়ের আদেশে মাইকেল নানাকে বৈঠকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তথা হইতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন। সিন্ধিয়ার ইউরোপীয় অফিসরগণ সকলে কথার মানুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সেজন্য নানার মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু সূর্য্যরাও নানাকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং ফিলোজের সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে আহ্মদাবাদে পাঠান হইয়াছিল। ফিলোজের পক্ষে এই বিশ্বাসঘাতকতা, যাহাতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সহিত হইলেও কতকাংশে উপলক্ষ্য হইয়াছিলেন, নিতান্ত মনস্তাপের কারণ হইয়াছিল এবং সুগভীর ক্ষোভের সহিত তিনি মারাঠাদের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছিলেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন মানসে তিনি বোম্বাই গমন করেন। দৌলৎরাও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অশেষবিধ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়াছিল। তখন তিনি ফ্রাইডেলকে পিতার শূন্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (পৃঃ ৩০৫)।

এ সকল কথা সত্য নহে। ফিলোজের এতাদৃশ নীতিজ্ঞানের পরিচয় অপর কোন বিষয়ে আমরা পাই না। নানার বন্দীত্বের সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া নহে, বরং তিনি দীর্ঘ নয় মাসকাল পরে বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছেন জানিতে পারিয়া ভয়ে ফিলোজ কর্ম্মত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি নিরপরাধ হইলে ঐ সংবাদে তাঁহার আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না, বরং প্রীত হইবারই কথা। একথা ঠিক যে সিন্ধিয়া বা তাঁহার মন্ত্রীর সম্পূর্ণ অগোচরে এতাদৃশ গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন সম্ভব ছিল না। তবে ইহাও ঠিক যে ফিলোজ একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, শুধু আদেশ পালনের যন্ত্রমাত্র ছিলেন না। সকল কথা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে নানাকে বন্দীকরণের পরিকল্পনাকারী এবং প্রধান উদ্যোগী তিনিই ছিলেন। সমসাময়িক একটি সংবাদপত্রে স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ফিলোজ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সহকর্ম্মীগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরপরাধী বলিয়া মনে করিত না। জেনারেল রেমঁ লিখিত পত্রের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কাপ্তেন জর্জেঁয়া তাঁহাকে স্পষ্টভাবে হীন বিশ্বাসঘাতক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের প্রথম ইতিবৃত্ত লেখক সিন্ধিয়ার অন্যতম সেনানী মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ ফিলোজকে একজন অপদার্থ এবং জঘন্য প্রকৃতির ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন উহার সৈনিকগণ তাহার মতই ছিল; সামরিক বা রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কার্য্য তাহারা কখনও করে নাই। ফিলোজের সহিত ইহাদের তিনজনেরই ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

মাদাম ফিলোজ দাক্ষিণাত্যে স্বামীর সহগামিনী হন নাই। তিনি আগ্রা নগরে বাস করিতেন। তখনকার দিনে আগ্রা উত্তর ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়দিগের একটা বড় রকম আড্ডা ছিল। ১লা ডিসেম্বর ১৭৯৬ খৃঃ উক্ত নগরে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। তথায় পুরাতন ক্যাথলিক গির্জ্জা সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কবর আছে।* জাঁ বাপতিস্ত এবং ফ্রাইডেল ব্যতীত ফিলোজ-দম্পতীর আরও কয়েকটি পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল—(১) মাইকেল (১৭৭৯ খৃঃ) (২) কর্ণেলো (১৭৮২ খৃঃ) (৩) মারলবরো (১৭৮৯ খৃঃ) এবং (৪) মেরী (১৭৯২ খৃঃ)। ইহারা সকলেই পিতার সহিত ইটালী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। শুধু প্রথম দুইজন বাপতিস্ত এবং ফ্রাইডেল সিন্ধিয়ার

*E. A. H. Blunt:—"List of Charistian Tombs in the U. P." No. 177

চাকরীতে দিল্লী এবং পুণায় অবস্থিত রহিল। বোম্বাই হইতে গোয়ায় গিয়া তথা হইতে মাইকেল ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন (১৮০০ খৃঃ)। ক্যাষ্টালামারে নগরে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষ হইতে আনীত অর্থে দীর্ঘকাল সুখে অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। উক্ত নগরের "Holy Spirit Church"এ তাঁহার কবর দেখা যায়। সাধারণে তাহা "Grand Mogul"এর কবর নামে পরিচিত।

তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে ফাইডেলের কথা বলা যাইতেছে। গ্রাণ্ট ডফ ইঁহাকে ভুল করিয়া ফিলোজের দেশীয়া রমণীগর্ভজাত সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথা কিন্তু সত্য নহে। কিন্তু ইনি যে পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ঘাটগেকে বন্দীকরণ ব্যাপারে তাঁহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্জ্জারাওয়ের অত্যাচার এবং উৎপীড়ন ক্রমে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সিন্ধিয়াও ক্রমশঃ বুঝিয়াছিলেন তাঁহার শ্বশুরকে সংযত করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার বহু প্রতিবাদ এবং আদেশে কোন ফলোদয় হইল না। সর্জ্জারাওয়ের অত্যাচারের সামান্য নিদর্শনস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাইদিগের সহিত চক্রান্তে লিপ্ত থাকার সন্দেহে তিনি চারিজন পদস্থ সর্দ্দারকে ধৃত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং চতুর্থ ব্যক্তিকে মস্তকে লোহার গজাল পুতিয়া বধ করা হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহাকে দমন না করিলে মহা অনর্থপাৎ হইবে বুঝিয়া সিন্ধিয়া ফাইডেল ফিলোজ এবং জর্জ্জ হেসিঙ্গের প্রতি তাঁহাকে বন্দী করিবার ভার দিয়াছিলেন। সে কার্য্য ঐ দুইজন তরুণবয়স্ক সৈনিক যথেষ্ট দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইহার স্বল্প পরে পিতার অন্তর্দ্ধানের ফলে তিনি তদীয় সেনাদলের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এগারটী ব্যাটালিয়নের মধ্যে তিনি ৮টী নিজে লইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট তিনটী হিন্দুস্থানে ভ্রাতা জাঁ বাপতিস্তের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ঘাটগের বন্দীত্বের পর সিন্ধিয়া এবং পেশবার মধ্যে মিটমাটের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছিল। ইংরাজ সরকারের অনুসৃত নূতন নীতি তজ্জন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল। সার জন সোরের আমলে ইংরাজরা দেশীয় রাজন্যবৃন্দের ব্যাপারে পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কিন্তু নূতন লাট ওয়েলেসলি সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্থির সঙ্কল্প লইয়া এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। টিপু সুলতানকে চূর্ণ করাই তাঁহার রাজনীতির প্রথম সূত্র ছিল। আসন্ন সমরে টিপু যাহাতে নিজাম এবং মারাঠাদের নিকট হইতে কোন সাহায্য না পান তজ্জন্য উহাদের স্বপক্ষে আনয়ন, অন্ততঃ নিরপেক্ষ রাখা, আবশ্যক ছিল। নিজামকে লইয়া ওয়েলেসলিকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। কিন্তু পেশবাকে সম্মত করান অত সহজ ছিল না। সিন্ধিয়া যাহাতে দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে পেশবার এবং তাঁহার নিকট রক্ষিত বৃটীশ রেসিডেণ্টদ্বয় আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কাবুলের আমীর জমান সাহ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছিল। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ সিন্ধিয়াকে ভয় দেখাইবার জন্য সে কথা খুব জোরের সহিত প্রচার করিতে লাগিল। ভিতরে ভিতরে বাজীরাওকে ইংরাজদের "সাবসিডিয়ারী এলায়েন্স" নীতি গ্রহণ করাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এই সময় নানাদিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের গোলযোগে সিন্ধিয়াকে বিষম বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ক্রজের কর্তৃক অমৃতরাওয়ের শিবির আক্রমণের পর বাইগণ কোলাপুরাধিপতির আশ্রয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। পেশবার সহিত তাঁহার তখন যুদ্ধ চলিতেছিল। সিন্ধিয়ার প্রধান প্রধান সৈনবী ব্রাহ্মণজাতীয় সর্দ্দারগণ বাইদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার দরবারীগণের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বলভ তাত্যার পরেই লকবা দাদার স্থান ছিল। তিনি ছিলেন সৈনবী ব্রাহ্মণ। বাইদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সর্জ্জারাওয়ের প্ররোচনায় তিনি পদচ্যুত এবং নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিদ্রোহী পক্ষে যোগদানে বাধ্য হইয়া তিনি অচিরে একটি

পরাক্রান্ত বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। নানাদিক হইতে বহু লুণ্ঠনলোলুপ বার্গীসেনা আসিয়া বাইদিগের পতাকাতলে সমবেত হইল। লকবা দাদা নিজে একজন সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন এবং বহু যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সেনা পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সিন্ধিয়ার সৈন্যদল তিনি বারম্বার পরাজিত করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী হইতে সিরোহি পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। গোদাবরী হইতে কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বাইদিগের অনুচরবর্গের লুণ্ঠনের ফলে উৎসাদিত হইতেছিল। বিদ্রোহের অনল হিন্দুস্থানেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পেরঁ এই সময় লকবার পক্ষভুক্তগণের হস্ত হইতে হিন্দুস্থানের নবনিযুক্ত সুবেদার অম্বাজী ইঙ্গলিয়ার সহিত আগ্রাদুর্গ অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বারম্বার প্রভুকে দাক্ষিণাত্য হইতে অবিলম্বে সেনা সাহায্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তাহার উপর যশোবন্ত রাওয়ের লুণ্ঠন ত ছিলই। তাঁহার অত্যাচারে সমগ্র মালব-দেশ উৎসাদিত হইয়া মরুভূমে পরিণত হইতেছিল।

এই সকল কারণে সিন্ধিয়া পুনরায় সন্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লভ তাত্যাকে মুক্তি দিয়া তিনি উহাঁকে পুনরায় প্রধান মন্ত্রিত্ব দিয়াছিলেন। বাইদিগের সহিত রফার চেষ্টাও চলিতে লাগিল। নিজাম এবং ইংরাজদিগের সম্বন্ধে অনুসর্ত্তব্য নীতি সম্বন্ধে অতঃপর নানা এবং বল্লভ তাত্যা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দক্ষিণ মারাঠাপ্রদেশে শান্তিস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক ছিল। কোলাপুরাধিপতির সহিত পেশবার সমর তখনও নিবৃত্তিলাভ করে নাই। চিতুরসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি রাজার পক্ষে এই সমরে যথেষ্ট সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি খণ্ডযুদ্ধে পেশবার প্রধান সেনাপতি বিখ্যাত সর্দ্দার পরশুরামরাও পরাজিত এবং নিহত হইয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর ১৭৯৯)।

মৃত ভাও সাহেবের পুত্র আপ্পাসাহেবের নেতৃত্বে পেশবার অশ্বারোহী বাহিনী এবং মেজর ব্রাউনরিগের পরিচালনাধীনে ৫ ব্যাটালিয়ন শিক্ষিত পদাতিক সেনা নানা এবং বল্লভ কোলাপুরাধিপতির বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। ঐরূপ পরাক্রান্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ সম্ভব নহে দেখিয়া রাজা পানালা দুর্গের প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে আপ্পাসাহেব দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কোলাপুর অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর কোলাপুরের পতন আসন্নপ্রায় এমন সময় পুণার ঘটনাবলী এবং বিপ্লবের ফলে কোলাপুররাজ্য অবশ্যম্ভাবী পতন অথবা পেশবা সরকারের অধস্তন রাজ্যে পরিণতি হইতে দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল। সে সকল কথা অন্যত্র বলা যাইবে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় যশোবন্ত রাও হোলকরের সহিত সমরে ফাইডেলের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে ডুড্রেনেক প্রসঙ্গে তাহার দীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ফাইডেলের ব্যাটালিয়নগুলির মধ্যে একটি কাপ্তেন ম্যাকইন্টায়ারের নেতৃত্বে নিউরীর যুদ্ধে এবং অপর একটি কর্ণেল জর্জ হেমিঙ্গের দলের সহিত উজ্জয়িনীর যুদ্ধে (২।৭।১৮০১) বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অবশিষ্টগুলি সহ তিনি স্বয়ং ইন্দোরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন (১৪।১০।১৮০১)। সিন্ধিয়ার সুদক্ষ সেনাপতি কর্ণেল রবার্ট সাদারল্যাণ্ড এই যুদ্ধে হোলকরের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ফাইডেল হোলকরের সহিত প্রভু-দ্রোহকর চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র শত্রুকে আক্রমণে অগ্রসর সাদারল্যণ্ডের সৈনিক-গণের উপর গোলাগুলিবৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বাসঘাতকের অপচেষ্টা সফল হয় নাই। তাহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। সামরিক আদালতে বিচার এবং ভীষণ শাস্তির ভয়ে কারাগার মধ্যে স্বহস্তে নিজ কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফাইডেল পার্থিব বিচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। মতান্তরে প্রবল জ্বরজনিত বিকারের ঘোরে সে ঐ কার্য্য করে। ফাইডেলকে প্রভুদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া সকলে উল্লেখ করিয়াছেন। মেজর স্মিথ সে কথা বলিয়া আবার কেন তাহাকে বোকা ধরণের ভাল মানুষ আখ্যা দিয়াছেন বুঝা কঠিন। কম্পটন স্পষ্টতঃই উহাকে হীন বিশ্বাসহন্তা, যে উপকারী প্রভুর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, বলিয়াছেন। উহাই হইল ফাইডেল কিলোজের প্রকৃত রূপ।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যবনিকা

(নাটক)

শ্রীসুবোধ বসু

প্রথম অঙ্ক

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ।

এক বৌদ্ধচৈত্যের অভ্যন্তরে ভিক্ষুণীগণ ভগবান তথাগতের সুবৃহৎ প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্যার্চনায় প্রবৃত্ত।

বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে ; সুগন্ধি ধূঁয়ায় গৃহাভ্যন্তর পরিপূর্ণ ; দুই পার্শ্বে স্বর্ণদীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে ; সম্মুখে সুবৃহৎ স্তম্ভ ; উপরে ঘণ্টিকা বিলম্বিত ; জনৈকা ভিক্ষুণী যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সে ঘণ্টিকায় অলস এবং গম্ভীর ধ্বনি তুলিতেছে।

ভিক্ষুণীগণের গান

পূর্ণিমা চন্দ্র জাগো.
মম চিত্তাকাশে তব আলোকাশীর্ব্বাদ রাখো।
হল কণ্টকবন পুষ্পকানন তব পুণ্যে
নীহারিকা সঙ্গীত করে মহাশূন্যে
ছিন্নবাসসম দেহ,
লভে নব জন্মারুণ রাগ।
শান্তি বারি তব জ্যোতি
চরণে রাখিনু প্রণতি।
জীবন মন অরণ্যে লুব্ধ বাসনা যত
তব পুণ্য বাণী শুনি সরমে অবনত
করুণামহাসিন্ধু,
তুমি সুব্রত মহাত্যাগ।

কিছুকাল ধরিয়া নৃত্যার্চনা চলিল। নৃত্য ক্ষান্ত হইবার পর বাণীহীন সঙ্গমের সহিত ভিক্ষুণী সুমিত্রা অগ্রসর হইয়া ভগবান বুদ্ধের পাদদেশে দীপ স্থাপন করিল এবং মূর্ত্তির দিকে মুখ রাখিয়া পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিল ; তখন অন্যান্য ভিক্ষুণীরাও অনুরূপ অনুষ্ঠান করিল এবং একে একে আসিয়া সুমিত্রার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল।

সকলে একত্র ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ঈষৎ প্রসারিত হস্তযুগলের উপর মস্তক অবনত করিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিল।

ভিক্ষুণীগণ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ; ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ; সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

প্রণামান্তে ভিক্ষুণীগণ দণ্ডায়মান হইল। তখনও কিন্তু ভিক্ষুণী সুমিত্রা সুগভীর আত্ম-নিবেদনে লুণ্ঠিত হইয়া আছে।

ক্রমে অত্যন্ত ধীরে ধীরে,— যেন সুন্দর স্বপ্ন হইতে ক্রূর বাস্তবতার মধ্যে জাগিয়া ওঠার ন্যায়—সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে কতক্ষণ সে জোড়হস্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুমিত্রা

[তথাগতের প্রতি অর্দ্ধস্বগত স্বরে] প্রভু, তোমার শ্রীপাদপদ্মে হয়তো আমাদের এই শেষ আরতি। তোমার পবিত্র ধর্ম্মে, হে তথাগত, অপবিত্র আচার, অর্থহীন অনুষ্ঠান, সত্যহীন অভিনবত্বের তাণ্ডব সুরু হয়েচে ; তোমার অভিধর্ম্ম আজ তান্ত্রিকের ব্যাখ্যাজালে আচ্ছন্ন। দুর্ব্বল বৌদ্ধ রাজন্ত সত্য ধর্ম্মে আস্থা হারিয়ে আজ তন্ত্রপন্থী হয়ে উঠেচে— তোমার চতুঃসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে, আজ তারা বজ্র-বিশ্বাসী। ঐহিক সমৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়ে তোমার গভীর সত্যের পথ হতে কতগুলি কপট ঐন্দ্রজালিক তাদের বিচ্যুত করে নিয়ে গেল। হে তথাগত, ওরা ভ্রান্ত, ওরা আপাতমধুরকে পেয়ে চিরন্তনকে বিস্মৃত হয়েচে—ওদের অপরাধ তুমি ক্ষমা করো।

জোড়হস্তে প্রণাম করিল।

সুজয়া !

সুজয়া

সুমিত্রা !

সুমিত্রা

আন্, সুজয়া,—শ্বেতপদ্মগুলি নিয়ে আয়। মত্ত হস্তীর গর্জ্জন শুনতে পাস্ না ? ওরে, এই বেলা সকল শ্রদ্ধা নিবেদন করে যা।

সুজয়া একপার্শ্বে রক্ষিত সুবৃহৎ তাম্রপুষ্পাধারের দিকে অগ্রসর হইল।

ভিক্ষুণী বিনীতা ?

বিনীতা

এই তো আমি, সুমিত্রা! বল?

সুমিত্রা

সঙ্ঘমাতা প্রজাপতি কি একটিবারও আস্‌তে পারবেন না?

বিনীতা

মনে ত হয় না!

সুমিত্রা

বড় লেগেচে,—তাই একেবারে শয্যাশায়ী হয়েচেন। বিন্দু বিন্দু করে' বুকের রক্ত দিয়ে এই সঙ্ঘ তিনি গড়ে তুলেছিলেন; তাঁর সারা জীবনের সমস্ত সাধনা এই সঙ্ঘের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—কোন্ প্রাণে একে তিনি ছেড়ে দেবেন অনাচারীর হস্তে? বড় লাগে, বিনীতা, বড় লাগে!

সেবিকা

মহারাজ মহীপাল চৈত্যস্থবির শ্রীজ্ঞানের মতো ওঁকেও কি সত্যই পদত্যাগের আদেশ দিয়েচেন?

সুমিত্রা

না, তা দেন নি। তবে দিলেই ভালো ছিল;—মনের গভীর দুঃখটাকে তবু প্রতিবাদ, তবু বিক্ষোভ, দিয়ে আবৃত করতে পারতেন। কিন্তু রাজা ওঁকে সে-সান্ত্বনার অবকাশও দিলেন না।

সেবিকা

তবে কি প্রজাপতিই সঙ্ঘনেত্রী থাকবেন?

সুমিত্রা

নতুন চৈত্যস্থবিরের অধীনস্থ হয়ে ওঁকে থাকতে হবে—রাজার এই আদেশ।

সেবিকা

চৈত্যস্থবির চিরকালই তো প্রধান, সুমিত্রা। এতে বিক্ষোভ কেন?

সুমিত্রা

চৈত্যস্থবির যদি প্রকৃত বৌদ্ধ হতেন, তবে চৈত্যব্যবস্থায় রাজার হস্তক্ষেপে আমরা বিক্ষুব্ধ হতাম, কিন্তু শঙ্কিত হতাম না। সঙ্ঘনেত্রী প্রজাপতি মহাস্থবির শ্রীজ্ঞানের নিকট হ'তে আদেশ গ্রহণ করতে কোনও দিনই বিরাগ প্রকাশ করেন নি; বৌদ্ধসূত্রে' এ-ব্যবস্থা তো আজকের নয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা সর্বনাশের; তথাগতের ধর্ম আজ বিপন্ন!

শ্বেতপদ্ম হস্তে সুজয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনীতা

সুমিত্রা, এ-কথা কি সত্য, যে নতুন আশ্রমস্থবির বৌদ্ধ নন্—তান্ত্রিক শাক্ত হিন্দু? নিত্য পশুবধ ক'রে যজ্ঞ করেন, কারণবারি নাম দিয়ে মদ্যপান করেন?

সুমিত্রা

কতটা অতিভাষণ, কতটা প্রকৃত, জানিনা। কিন্তু এ-খবর জানি, উনি শাক্ত হিন্দু নন্, উনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ।

সেবিকা

তান্ত্রিক বৌদ্ধ! সে কি, সুমিত্রা,—এমন অদ্ভুত সমন্বয়ের কথা, কৈ আগে তো কখনও শুনিনি। তুমি নিশ্চয়ই ভুল সংবাদ পেয়েছ। নইলে রাজা কি কখনো—

সুমিত্রা

অনাচারের পাঁকে এ নতুন জীবসৃষ্টি। রাজনিযুক্ত নতুন আশ্রমস্থবির হিন্দুও নন্, বৌদ্ধও নন্। ওঁর ধর্ম শুধুমাত্র অনুষ্ঠান; ওঁর মন্ত্র মারণ উচ্চাটন; ওঁর সাধনার উদ্দেশ্য, শত্রু বিনাশ, বশীকরণ, ঐহিক সম্ভোগ। [উচ্ছ্বাসের সঙ্গে] দেখচিস্ কি, সুজয়া, দে দে, শুভ্র পদ্মগুলি ভগবান তথাগতের পায়ে নিবেদন করে' একবার শেষ-প্রণাম জানিয়ে দে। আর সময় পাবি না;—মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ধর্ম, সকল নিষ্ঠা গুঁড়িয়ে যাবে।

সুজয়া অগ্রসর হইয়া বুদ্ধের পায়ে পদ্মগুলি নিবেদন করিল। ভিক্ষুণীরা জোড়হস্তে প্রণাম করিল। গম্ভীর স্বরে ঘণ্টা ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।

সুমিত্রা

ভগবন শাক্যমুনি, পথ বলে দাও, উপায় বলে দাও। অপমানের হাত থেকে, হে প্রভু, তোমার তপস্যালব্ধ মহা-সত্য ধর্মকে, দুর্বল আমরা, বাঁচাব কি করে? কোন্ শক্তিতে অনাচারের গতিরোধ করব?

পশ্চাতে সিংহদ্বারে আঘাতের শব্দ।

সুজয়া, কে দুয়ার নাড়ে? যা, একবার দেখ গিয়ে, কিন্তু না দেখে যেন খুলিস নি। আজ আমরা চৈত্যের দ্বার বন্ধ করে' দিয়েচি। বৌদ্ধচৈত্যের বৌদ্ধধর্মের দ্বার কারুর কাছেই কোনও দিন রুদ্ধ থাকে নি—কোনও ধর্ম্ম, কোনও বর্ণকেই এ-ধর্ম্মের ভয় করতে হয় নি। কিন্তু আজ ছদ্মবেশী অনাচার, বন্ধুবেশী শত্রু, আত্মীয়বেশী প্রবঞ্চনা আমাদের ঘিরে ফেলেছে—

সুজয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সেবিকা

যদি রাজার দূত হয়?

সুমিত্রা

ফিরে যাবে।

সেবিকা

দুয়ার বন্ধ করে' এই চৈত্যবিহার কতদিন তুমি বাঁচাবে?

সুমিত্রা

যত দিন পারি। তারপর যখন আর পারব না, শ্রীবুদ্ধের চরণে শেষ প্রণাম জানিয়ে বিদায় হয়ে যাব—যেমন করে' শেষ সূর্য্যরশ্মি অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায়!

সেবিকা

রাজার সঙ্গে শত্রুতা করা দূরদর্শিতা নয়, সুমিত্রা। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ধর্ম্ম কখনও বাঁচতে পারে না—তা ভুলে যেয়ো না।

সুমিত্রা নিশ্চুপ রহিল।

কথা শোন, সুমিত্রা,—সিংহদ্বার খুলে দাও।

সুমিত্রা

(সহসা উত্তেজনার সহিত) দেবো না।

সেবিকা

রাজরোষে পড়ে তুমি মরবে।

সুমিত্রা

মরতে যদি হয়ই, ভয় পাব না।

সেবিকা

তবু রাজাদেশ মানবে না—এত তেজ?

সুজয়া ফিরিয়া আসিয়া নীরবে সুমিত্রার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সুমিত্রা

কে, সুজয়া? কে দ্বারে আঘাত করে?

সুজয়া

রাজ-দৌবারিক। ঘোড়ায় চড়ে এসেচে।

সুমিত্রা

কি চায়?

সুজয়া

হেঁকে বলচে,—রাজাদেশ নিয়ে এসেচি।

সুমিত্রা

ওতে কান দিয়ো না।

সেবিকা

অপমান করবে রাজদৌবারিককে? সুমিত্রা, তুমি বুদ্ধির স্থিরতা হারিয়ে ফেলেচ। দাও, চাবি দাও,—সিংহদ্বার আমি খুলে দিয়ে আসি।

সুমিত্রা

[অদ্ভুত দৃষ্টিতে সেবিকার মুখপানে চাহিয়া] এত ত্বরা কেন? সিংহদ্বার ভাঙ্‌ক ওরা,—বাহু বলে, অহঙ্কারে, শক্তিমদগর্ব্বে। ভগবান তথাগতের অপমান সিংহদ্বার খুলে বরণ করে আনতে, আমি যাব কেন, তুমি যাবে কেন? অভ্যর্থনা করতে যাব তাকে, প্রভুর ধর্ম্ম যার হাতে নিগৃহীত হবে,—বিকৃত হয়ে মিথ্যা হয়ে উঠবে?

চৈত্যের পার্শ্বস্থিত এক ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই দ্বারপথে অতি ধীরে অতি অন্যমনস্কভাবে, মাথা নিচু করিয়া বৃদ্ধা সঙ্ঘনেত্রী প্রজাপতি প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া তিনি বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা উঠাইলেন না।

বহির্দ্দেশে দৌবারিকের কণ্ঠস্বর বহুবার শোনা গেল।

ভিক্ষুণীরা নিম্নস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময় সহসা সঙ্ঘমাতা প্রজাপতি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

সুমিত্রা

[চমকিত হইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া] এ কি, মা! এ কি? না, না, ছি! এ দুর্ব্বলতা তোমায় শোভা পায় না, সঙ্ঘমাতা। কত তোমার শক্তি, কত তোমার সাহস,

দুর্ব্বলতা কি তোমার সাজে! আমাদের বুক তুমিই যে সাহসে ভরে দেবে, সঙ্ঘনেত্রী!

প্রজাপতিকে ধরিয়া উঠাইলেন। কিন্তু তথাপি প্রজাপতি দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া নত রহিলেন।

তোমার কাছ থেকে চিরদিন আমরা শক্তি পেয়েছি। নিষ্ঠা পেয়েছি, অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তুমি যদি আজ সাহস না দেবে, দাঁড়াব কোথায়?

প্রজাপতি

[অশ্রুসজল মুখ উঠাইয়া] সুমিত্রা, বৃদ্ধা হয়েছি, আমি যে বৃদ্ধা হয়েছি; দেহ এবং মন দুই-ই জরা এসে অধিকার করেচে। শক্তি আমাকে ত্যাগ করেচে—সাহস আমাকে ত্যাগ করেচে। তাই নিরন্তর শুধু প্রার্থনা করচি;—হে প্রভু, তোমার সত্য ওরা হত্যা করবার আগেই যেন বিদায় হতে পারি।

সুমিত্রা

সঙ্ঘমাতা, সত্য মরে না,—কোনও দিন মরে না। সত্যকে হত্যা করবে, এমন সাধ্য কার? সত্যকে যারা হারিয়ে ফেলে আস্ফালন করে বেড়ায়, ক্ষতি তাদের, ক্ষতি সত্যের নয়। যে পথিক পথ হারায়, সেই ভোগে; পথের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

প্রজাপতি

সেই পথহারাদের পথ দেখাবার জন্যই যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সুমিত্রা।

সুমিত্রা

তাঁর আলো দিয়ে সারা জগতে তিনি আলো জ্বালিয়ে দিয়েচেন।

প্রজাপতি

ঝড় উঠেছে সেই আলো নিবিয়ে দেবার জন্য; প্রভুর আলো নিবিয়ে দিয়ে ওরা অন্ধকারে যাত্রা সুরু করেচে—এ-দুঃখ কেমন করে' সইব? (সহসা) সুমিত্রা!

সুমিত্রা

কেন মাতা!

প্রজাপতি

সঙ্ঘের নেতৃত্বের ভার আর আমি বইতে পারি না। এবার আমাকে মুক্তি দিবি?

সুমিত্রা

সে কি মা?

সেবিকা

এ কি রাজার আদেশ?

বিনীতা

না, না, মা,—এ দুর্দ্দিনে তুমি আমাদের ত্যাগ করো না। আমাদের কি হবে?

প্রজাপতি

আমি ক্লান্ত। সঙ্ঘকে রক্ষা করি, এমন আমার শক্তি নেই; অন্যায়ের প্রতিবাদে বুক বাড়িয়ে দাঁড়াই, এমন আমার উৎসাহ নেই; তোমাদের বরাভয় দেব, এমন আমার সাহস নেই। একটা সুগভীর অবসাদে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। এটা আজকের নয়, হঠাৎ নয়; বহুকাল হলো এই সুগভীর অবসাদ আমার উপরে চেপে বসেচে। তবু প্রাণপণে তোমাদের আমি আগলে রেখেচি; আমার ক্লান্তি যাতে তোমাদের স্পর্শ না করে, আমার প্রাণহীন নিয়মানুগত্য যাতে তোমাদের মধ্যে মানসিক স্থবিরতা না আনে, প্রাণপণে তার চেষ্টা করেচি। কিন্তু আর পারিনে।

সুমিত্রা

এ কি কথা, মা? তোমার প্রিয় বিহারকে তুমি কি অভিমান করে ছেড়ে যাবে?

প্রজাপতি

এ আমার অভিমান নয়, সুমিত্রা। এটা প্রকৃতই জরার ক্লান্তি। রাজাদেশ আমার দুর্ব্বলতাকে স্পষ্ট করে তুলেচে মাত্র;—নিজেও আমি এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম।—চৈত্যস্থবির শ্রীজ্ঞানকে আমি শুধিয়েছিলাম—'প্রভু, এ সর্ব্বনাশা অবসাদ আমার কোথা থেকে এল?' তিনি স্থির হয়ে বলেছিলেন—'সঙ্ঘমাতা গোতাপতি, এই অবসাদ, এই উৎসাহাভাব সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে লেগেচে,—নিজের ভারে আজ এ নিজেই হাঁপিয়ে উঠেচে। তুমি এই ক্লান্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতীক।'—

সুমিত্রা

[আহত স্বরে] শান্ত হও, মা। ও-কথা শুনতে চাই না।

প্রজাপতি

সুমিত্রা, আমি ক্লান্ত, আমি অবসন্ন। অন্যায় রাজাদেশের বিরুদ্ধে বুক বাঁড়িয়ে দাঁড়াব, এমন শক্তিও আমার নেই। আমি একটা মরা গাছের মতো—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি মাত্র। ভেতরটা ক্ষয়ে গেছে, একটু মাত্র বাতাসের অপেক্ষা।

সেবিকা

তবে রাজাদেশ শিরোধার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রজাপতি

[সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া] দূর হয়ে যা তুই, ভিক্ষুণী,—দূর হয়ে যা। তান্ত্রিককে তুই চৈত্যস্থবিরের আসনে বসাতে চাস্? ধর্ম্মের বদলে যজ্ঞাচার প্রবর্ত্তিত দেখতে চাস্? ধিক্ ভিক্ষুণী, তোকে ধিক্!

সেবিকা অসন্তুষ্ট মুখে মস্তক নত করিল।

সুমিত্রা!

সুমিত্রা

সঙ্ঘমাতা!

প্রজাপতি

তোর মধ্যে যৌবনের মর্য্যাদা, তারুণ্যের শক্তি, ত্যাগের দীপ্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—যেন নিজ যৌবনকে দর্পণে প্রতিফলিত মনে হচ্ছে। যদি গুরুভার দেই, বইতে পারবি তো, মা?

সুমিত্রা

[বিস্ময়ের সঙ্গে] এ কথা কেন?

প্রজাপতি

আজ থেকে তোকে সঙ্ঘনেত্রীত্বের ভার গ্রহণ করতে হবে।

সুমিত্রা

[চমকিয়া] আমি? আমি?

প্রজাপতি।

তুই মা, তুই-ই। তোর চেয়ে আর যোগ্যতর কে? দ্বিধা করিস নে, মা—এই আমার শেষ আদেশ। এই নে চক্র [চক্র দান করিল]—এই জীবন-চক্র। জন্মজন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীবুদ্ধের চরণে জীব নির্ব্বাণ লাভ করুক, এই তোর সাধনা হোক। আশীর্ব্বাদ করি, ক্লান্তি যেন তোকে স্পর্শ না করে, অবসাদ যেন তোর কাছে অগ্রসর না হয়,—অবসন্ন সঙ্ঘকে তুই যেন বাঁচাতে পারিস। তোর উৎসাহের দীপ জ্বালিয়ে, জনগণকে তুই উৎসাহিত করিস, মা। আমি ক্লান্ত, আমি অথর্ব্ব; তোর স্কন্ধে সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম। দেখিস্, মা, ভগবান তথাগতের যেন অপমান না হয়।

সুমিত্রা

এ কি করলে, সঙ্ঘমাতা? এ তুমি করলে কি? এ-দায়িত্ব বইবার যোগ্যতা আমার কোথায়?

বিনীতা, সুজয়া প্রভৃতি ভিক্ষুণীগণ

সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রা, অভিবাদন করি।

সুমিত্রা জোড়হস্তে অভিবাদন গ্রহণ করিল।

সুমিত্রা

[সহসা গম্ভীরস্বরে তথাগতের প্রতি] হবে না, প্রভু, তোমার অপমান আমি হ'তে দেব না। আমার জীবন তোমার কাছে পণ রইল। [সহসা শব্দ শুনিয়া] ও কি? ও কে? ও কিসের মন্ত্রোচ্চারণ?

বাহির হইতে সিংহদ্বারে সজোরে আঘাতের শব্দ; ঐ সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠে উচ্চ নির্ঘোষে মন্ত্রোচ্চারণ শোনা গেল।

নেপথ্যে

হ্রীং ক্লীং শ্রীং স্বাহা

হ্রীং ক্লীং শ্রীং স্বাহা

চমকিয়া ফিরিয়া সুমিত্রা সিংহদ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল।

গম্ভীরস্বরে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চৈত্যের বহির্দৃশ্য; সিংহদ্বার বন্ধ রহিয়াছে: অতি ক্ষীণ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে।

সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাপালিকাকৃতি এক দীর্ঘকায় পুরুষ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে। তাহাকে দেখিতে রুদ্র এবং কিছুটা হাস্যোদ্দীপক; তার সুদীর্ঘ জটা আজানুলম্বিত।

সে তান্ত্রিক রুদ্রলোচন।

রুদ্রলোচন

[অঙ্গুলি দিয়া নানা প্রকার ন্যাস এবং দুয়ারের প্রতি নানা প্রকার হস্তভঙ্গী করিয়া]

হ্রীং ক্লীং শ্রীং স্বাহা
হ্রীং ক্লীং শ্রীং স্বাহা ॥

ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং চরণং পাতু
আং ঈং উং বাহুযুগ্মকম্
গ্নাং গ্নীং গ্নূং উদরম্ পাতু
হ্রীং স্বাহা ক্লীং কটিং মম ॥

বামহস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া দ্বারের উপরে নিক্ষেপ করিল।

ওঁ হ্রাং হুঁ খেচ ছেক্ষ
স্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীং ফট্ ॥

পুনর্ব্বার দ্বারে জল নিক্ষেপ করিল।

উদ্ঘাটনং উদ্ঘাটনং উদ্ঘাটনং স্বাহা
উন্মোচনং উন্মোচনং উন্মোচনং স্বাহা ॥

এমন সময় দ্বার ঈষৎ বিচ্ছিন্ন হইল। অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে ভিক্ষুণী সুমিত্রা দৃষ্টিগোচর হইল।

রুদ্রলোচন

[বিভৎস উল্লসিত হাস্য করিয়া] হা হা হা। খুলতেই হবে,—খুলতেই হবে। না খুলে থাক, সাধ্য কি! হু হু বাবা, একেবারে খাঁটি উৎপাটন মন্ত্রটা ঝেড়ে দিয়েচি। লোহার অর্গল পর্য্যন্ত এই মন্ত্রে—

সুমিত্রা

কে আপনি? কি চাই আপনার?

রুদ্র

কে আমি! হা হা! তার চেয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারতে, জগতের কর্ত্তাটা কে?

সুমিত্রা

জগতের কর্ত্তা আপনি না কি?

রুদ্র

[কুপিত স্বরে] প্রগল্‌ভা নারী, জিহ্বা সংযত কর। মন্ত্রপ্রভাবে আমি তোমাকে জীবন্ত দগ্ধ করতে পারি—সাবধান! দাহন মন্ত্রের প্রথম পংক্তি উচ্চারণ করা মাত্র তোমার আয়—। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সে মন্ত্র প্রয়োগ করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। সরে দাঁড়াও,—আমি চৈত্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করব।

সুমিত্রা

[না সরিয়া] আজ চৈত্য সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।

রুদ্র

[উত্তেজিত স্বরে] সাধারণ! আমি সাধারণ? ওরে মূর্খা নারী, আমি সাধারণ নই। চৈত্য মধ্যে আমার প্রবেশাধিকারে বাধা দিবি তুই? আমি কে জানিস্?

সুমিত্রা

না। জানতেও চাই না।

রুদ্র

আমি নব-নিযুক্ত চৈত্যাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমহাভাগ শ্রীল শ্রীশ্রীযুক্ত শ্রীরুদ্রলোচন, তন্ত্রপারঙ্গম। এতো ধৃষ্টতা তোর, ভিক্ষুণী, আমার পথ রোধ করিস্! কে তুই?

সুমিত্রা

আমি নবনিযুক্তা সঙ্ঘনেত্রী ভিক্ষুণী সুমিত্রা।

রুদ্র

সুমিত্রা! সুমিত্রা কে? [মাথা চুলকাইয়া] নামটা কি না জানি—প্রজ্ঞামিত্রা, না না, প্রজ্ঞাপারমিতা,—উহুঁ:, তাও না। প্রজাপার—হ্যাঁ, এইবার হয়েচে—প্রজাপতি। কেমন? ওঃ, তুমিই প্রজাপতি?

সুমিত্রা

প্রজাপতি সঙ্ঘভার আমাকে অর্পণ করেচেন: আমি নতুন সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রা। এখানে আপনার প্রয়োজন?

রুদ্র

প্রগল্‌ভা নারী, আমার প্রয়োজন? ধৃষ্টতার একটা মাত্রা থাকা উচিত। কে তোকে সঙ্ঘনেত্রীত্ব দান করেচে? রাজসভাতে তোর নাম পর্য্যন্ত কেউ কোনদিন শোনে নি। সঙ্ঘনেত্রী! যেন সঙ্ঘনেত্রীত্ব গাছের ফল, পেড়ে আহার করলেই হলো। সরে দাঁড়া। আমি আদেশ করলাম—তুই সঙ্ঘনেত্রী নস।

সুমিত্রা

আমি আদেশ করলাম, আপনি চৈত্যাধ্যক্ষ নন্।

রুদ্র

[অসিয়া উঠিয়া] তুই মরবি।

সুমিত্রা

সবাই মরবে।

রুদ্র

দাহন মন্ত্রের শুধুমাত্র একটা পংক্তি উচ্চারণ করবো তবে? আগুনে পুড়ে মরবি জানিস?

সুমিত্রা

ভগবান তথাগতের করুণাবারি সে আগুন নিবিয়ে দেবে।

রুদ্র

[পরাজিত হইয়া অস্থির ক্রোধে] মহারাজ মহীপালের আদেশে আমি চৈত্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছি। রাজাদেশ অমান্য করলে তার শাস্তি কি জানিস?

সুমিত্রা

চৈত্যের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার রাজার নেই, এ ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ অনধিকারচর্চা।

রুদ্র

অ্যা! এতো বড় কথা! ভিক্ষুণী! ভিক্ষুণী! মহারাজ চৈত্যবিহারের প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছেন, তোর উচিত শাস্তি ব্যবস্থা হতে দেরি হবে না। ছাড়,—পথ ছাড়; বাঁচতে যদি চাস্, এখনও সরে দাঁড়া। রাজাদেশে চৈত্যের ভার গ্রহণ করতে এসেছি; রাজাদেশে বাধা দানের দণ্ড মৃত্যু। শূলে চড়বি দেখছি।

সুমিত্রা

মৃত্যুর চেয়েও বড় দণ্ড আছে।

রুদ্র

[সহসা হুঙ্কার করিয়া] বটে বটে বটে! ভিক্ষুণী, সরে দাঁড়া। শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি—সরে দাঁড়া। আমার প্রবেশ পথে বাধা দিস্ না।—এইবার শেষবার। সাবধানবাণী অবহেলা করলে, বলপ্রয়োগ করে আমি প্রবেশাধিকার লাভ করব। আমি তন্ত্রপ্রভাবে মহা বলবান্।

সুমিত্রা

দেহ বলের উপরেও বল আছে; সেই বল আমায় ভরসা।

রুদ্র

সেই বল বাহুবলে গুঁড়িয়ে দেব; যজ্ঞের আগুনে ভস্ম করে দেব; মন্ত্র প্রভাবে অদৃশ্য সমস্ত শক্তিকে বন্ধন করে দাসত্ব করাব।—"আমি মহাবল, আমি রুদ্র, আমি সৃষ্টি কর্তার সহচর,—আমি ভয়ঙ্কর,—আমি ভয়ঙ্কর—

সহসা উন্মত্তের মতো সুমিত্রার প্রতি ধাবিত হইল। সুমিত্রা নড়িল না,—একটুমাত্র কম্পিত হইল না; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন আত্মিক বলের দ্বারা এই বর্বর আক্রমণ সে অনায়াসে প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

পিছনে রাজা মহীপালের দ্রুত প্রবেশ।

মহীপাল

ও কি হচ্ছে, তান্ত্রিক! থামুন, ক্ষান্ত হোন্।

রুদ্রলোচন চমকিয়া ক্ষান্ত হইল এবং পশ্চাতে ফিরিল।

সামান্য এক ভিক্ষুণীর উপরে আপনার শৌর্য্য প্রয়োগের এমন কি কারণ ঘটেছে, শুনতে পাই কি?

রুদ্র

শুনুন মহারাজ, শুনুন। এই ধৃষ্টা নারী রাজাদেশ অমান্য করেছে। শীঘ্র এর শাস্তি বিধান করুন...গুরুতর শাস্তিবিধান করুন। ওকে পুড়িয়ে মারুন—ওকে মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করুন—তরবারির দ্বারা বিখণ্ডিত করুণ। এ রাজদ্রোহিণী।

রাজা ভিক্ষুণীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

মহীপাল

কি এর অপরাধ?

রুদ্র

আমাকে চৈত্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার আদেশকে এ বলেছে——রাজার অনধিকারচর্চা! চৈত্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এ আমাকে বাধা দান করেছে।—এর একমাত্র দণ্ড মৃত্যু, মৃত্যু। স্ত্রী শবের উপর বসে আরাধনা করা তন্ত্রমতে বিশেষ প্রশস্ত। এর শবের উপর আসন করে আপনার কল্যাণে আমি ইষ্টিঅষ্টম মন্ত্র পাঠ করব; তাতে আপনার অশেষ কল্যাণ হবে—বগলামুখী প্রকরণ, সুন্দরী প্রয়োগ এবং ছিন্নমস্তা প্রয়োগের ফল লাভ একই সঙ্গে প্রাপ্ত হবেন—আপনি অনায়াসে রাজচক্রবর্তী হবেন। আর

বিলম্ব কেন,—এই মুহূর্তে আপনার তরবারি নিষ্কাশিত করুন—

মহীপাল সে-সকল কিছুই করিলেন না: শুধু তেমনি নিষ্পলকদৃষ্টিতে বিমূঢ়ের মতো ভিক্ষুণী সুমিত্রার মহিমান্বিত আননের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রুদ্র

[অধীর হইয়া] শাস্তি দিন, শাস্তি দিন। অবিলম্বে রাজদ্রোহিতার শাস্তি দিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। মহারাজ, বিলম্ব কেন?

মহীপাল

(চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া) ভিক্ষুণী, এ অভিযোগ কি সত্য?

সুমিত্রা

(নির্লিপ্ত উদাস গম্ভীর স্বরে) কোন্ অভিযোগ?

মহীপাল

তান্ত্রিক রুদ্রলোচনকে তুমি চৈত্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দাও নি।

সুমিত্রা

দিই নি।

মহীপাল

কেন দাও নি?

সুমিত্রা

তথাগতের পবিত্র বিহারে তান্ত্রিকের প্রবেশাধিকার নেই। বৌদ্ধ ধর্ম তাতে অপবিত্র হয়।

রুদ্র

(সহুঙ্কারে) অপবিত্র হয়! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! মহারাজ, আর বিলম্ব করলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। এই দণ্ডে অসি নিষ্কাশিত করুন।

মহীপাল

বৌদ্ধ ধর্মকে অপবিত্র করার ইচ্ছা আমার নেই। আমিও তোমার চাইতে কম বৌদ্ধ নই; রুদ্রলোচনও কম নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ নন্।

সুমিত্রা

তন্ত্রে যার বিশ্বাস, মারণ উচ্চাটন যার মন্ত্র, ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি যার উদ্দেশ্য, সে কেমন বৌদ্ধ, মহারাজ? প্রভুর শিক্ষাকে সে যে অপমানিত করচে!

রুদ্র

করেচে! তোকে বলেচে! ত্রিপিটকের কি জানিস তুই! বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম এদের কতটা জেনেচিস্, মূর্খা নারী! সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র আমার কণ্ঠস্থ; জাতক আমার কণ্ঠস্থ, চোখ বুজলে পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী পর্য্যন্ত আমি স্মরণ করতে পারি। মৈত্রের রূপে ভগবান বুদ্ধ পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হবেন—তা পর্য্যন্ত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম শেখাতে এসেচিস আমাকে?

মহীপাল

ভিক্ষুণী, তন্ত্র সাধনা করলেই সে অ-বৌদ্ধ হয় না। তন্ত্রে ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐহিক শ্রী কি এতই অকাম্য?

সুমিত্রা

ঐহিক শ্রীলাভ ধর্ম্ম নয়; প্রভু বুদ্ধের ধর্ম্ম নয়।

মহীপাল

শোন, ভিক্ষুণী। সত্য কথা তোমাকে বলি। জীবের পরিণতি কি, আমি জানি না, কেউ জানে না, জানে নি—

সুমিত্রা

(আহত স্বরে) এ কি কথা মহারাজ! শাক্যমুনি বোধিদ্রুমতলে বোধিত্ব লাভ করলেন তবে কোন্ জ্ঞান লাভ করে?

মহীপাল

তিনি যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তার প্রকৃত প্রমাণ কিছু নেই, ভিক্ষুণী। তিনি যা জেনেছিলেন, তা-ই যে প্রকৃত সত্য, তার নিশ্চয় প্রমাণ কোথায়? ইহ জন্মই হয়তো শেষ;—সম্ভোগের, আনন্দের, একমাত্র অবকাশ। যদি তাই হয়—

সুমিত্রা

(দৃঢ়স্বরে) তা নয়।

মহীপাল

হাঁ কি না, কেউ জোর করে' বলতে পারে না। তাই

দুটোই আমরা রেখেচি—বুদ্ধিমানের মতো, কোনটাকেই হাতছাড়া করতে চাই নে। বুদ্ধকে নমস্কার করব, তাঁর বাণীকে শ্রদ্ধা করব, নির্ব্বাণ লাভের জন্য আনন্দময় এক চরম পরিণতি লাভের আশায়। আর তন্ত্রকেও অবজ্ঞা করব না—ঐহিক সুখও, যতটা পারি, আদায় করে নেব। তাই বর্ত্তমানের দাবী, বৌদ্ধস্থবির নয়, তান্ত্রিক বৌদ্ধ। রুদ্রলোচনকে সেই কারণে চৈত্যস্থবির নিযুক্ত করেচি।

সুমিত্রা

মহারাজ, আপনি ভ্রান্ত! দু নৌকায় পা দিয়ে আপনি ঘাটে পৌছতে চান্?

রুদ্রলোচন অস্থির ক্রোধে অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল।

মহীপাল

(ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে) আমি ভ্রান্ত হই, কিম্বা ভ্রান্ত না হই, রাজাদেশ অবজ্ঞা করার তোমার অধিকার ছিল না। আমার দৌবারিককে তোমরা অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েচ।

সুমিত্রা

রাজাদেশ অন্যায় হলে, তার প্রতিবাদ করার অধিকার প্রজার আছে।

মহীপাল

না, নেই। ভিক্ষুণী, নিজেকে তুমি ভুলে যেয়ো না। রাজার আদেশ, রাজার আদেশ! ন্যায় অন্যায় বিচার করবে তুমি! ন্যায় অন্যায়ের কতটুকু তুমি জান?

সুমিত্রা

সবটা জানি না, মহারাজ। কিন্তু এটুকু জানি, সঙ্ঘের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে আসা রাজার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা।

মহীপাল

(উত্তেজিত স্বরে) অনধিকারচর্চ্চা! ভিক্ষুণী, ভিক্ষুণী, রসনা সংযত কর।

রুদ্র

(বিকট অঙ্গভঙ্গি করিয়া সচিৎকারে) আর বিলম্ব নয়, মহারাজ। এই দণ্ডে অসি নিষ্কাশিত করুন। প্রগল্‌ভার দেহ বিখণ্ডিত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ুক—আমি শবদেহের উপর পদ্মাসন করে বসে ইষ্টিজ্ঞান মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করি।

মহীপাল

ভিক্ষুণী, রাজাদেশ,—পথ ছাড়।

সুমিত্রা

বুদ্ধের আদেশ—পথ ছাড়ব না।

মহীপাল

ভিক্ষুণী, তুমি মরবে।

সুমিত্রা

মানুষ অমর নয়।

রুদ্র

তবু বিলম্ব, মহারাজ! তবু বিলম্ব! দিন্, আপনার তরবারি আমাকে; দিন্—

রাজা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্থির হইয়া সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না।

মহীপাল

ভিক্ষুণী, তোমার সাহস অপরিসীম।

সুমিত্রা

আমার নয়, আমার ধর্ম্মের। প্রভু বুদ্ধের আমি দাসানুদাসী।

রুদ্র

শাস্তি দিন, এই মুহূর্ত্তে শাস্তি দান করুন। আর বিলম্ব হলে, রাজ্যের অমঙ্গল হবে। তন্ত্রমতে বিলম্ব অমার্জ্জনীয়। আমি বিঘ্ন উৎপাটন মন্ত্র আরম্ভ করি, আপনি অসি—

মহীপাল

শোন, ভিক্ষুণী। স্ত্রীলোকের উপর শাস্তি বিধান করতে আমি দ্বিধা করি। কিন্তু রাজদ্রোহিতা অমার্জ্জনীয়।
—আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম,—ভেবে দেখ। এমন তোমার শক্তি নেই, রাজাদেশ ঠেকিয়ে রাখতে পার। রাজার আদেশ পূর্ণ হবে, মরবে শুধু তুমি। কাল প্রাতে রুদ্রলোচন চৈত্যে প্রবেশ করবেন—কোনও বাধা যেন তিনি না পান। বাধা দিলে আমি ক্ষমা করব না—এটা মনে রেখো।

কতক্ষণ সকলে নিস্পন্দ রহিল। তারপর সুমিত্রা সদর দ্বার বন্ধ করিল।

রুদ্র

একি মহারাজ, প্রগল্‌ভা নারীর এই ধৃষ্টতা আপনি ক্ষমা করলেন ?

মহীপাল

অন্তত আজকের জন্য করলাম—

রুদ্র

একটা দিন, সম্পূর্ণ একটা দিন ! আমার হস্তে একটা তরবারি থাকলে এতক্ষণ ওর মুণ্ড এখানে গড়াতে থাকত। মহারাজ, যথাসম্ভব শীঘ্র নবযুগের প্রবর্তন করবেন বলে আমার নিকট আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে অযথা একটা দিনের বিলম্ব হতে দিলেন কেন ? কেন রাজদ্রোহিণী, প্রগল্‌ভা এই দুঃসাহসিকা ভিক্ষুণীকে তার উপযুক্ত শাস্তিদানে বিরত হলেন ?

মহীপাল

কারণ আছে, তান্ত্রিক !

রুদ্র

কারণ ? কি কারণ ?

মহীপাল

(রহস্যময় কণ্ঠে) রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। চলুন, শিবিরে যাই।

পটপতন

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

তাহারি কেশের গন্ধ মিশেছে কেয়ার গন্ধে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সে যদি আসিত ফিরে মুখর হোতো যে আজ মৌন ম্লান জীবনের ভিটে,
সে যদি আসিত ফিরে এমনি বাদল রাতে অন্তরের শূন্য পাদপীঠে,
হয়তো প্রেমের দীপ নিবিয়া যেতনা মোর বিরহের বিষণ্ণ ছায়ায়,
সে কি গো ভুলেছে সব সুখ দুঃখ, আলো-ছায়া সুদূরের মেঘের মায়ায়।
দামিনীর দ্যুতি মাঝে জাগে তার রূপ-ছন্দা নিমেষের চপল ইঙ্গিতে,
ভেসে যায় সমীরণ কালি-মাখা মেঘপথে গুরু গুরু শ্রাবণ-সঙ্গীতে।
আকাশের কোণে কোণে তাহারি আঁচলখানি ভ্রমিতেছে বিজুলীর সনে,
তাহারি কেশের গন্ধ মিশেছে কেয়ার গন্ধে বাদলের নব বরিষণে।
অসীম গগনে তার নয়নের তারা দু'টী জ্বলে কি-না, কেবা তাহা জানে !
আমারি সজল আঁখি হতাশে রহিল চাহি' সেই দূর দিগন্তের পানে।

প্রথম পেয়েছি তারে শরতের শুভ্রালোকে অভিসারে লজ্জা-মুকুলিত,
বসন্তের পুষ্পতটে যে-মাল্য দিয়েছি গাঁথি, বক্ষে তার হরষে দুলিত।
অধর পরশি তার দিবসের শেষ আলো চলে যেত কালের কল্লোলে,
উঠিত যে চিত্ত-চাঁদ নিশীথের সঙ্গোপনে আত্মহারা মানসীর কোলে।
প্রত্যূষের গানে গানে উড়ায়ে দিত সে তার পুলকিত প্রেমের বলাকা ;
সে ছিল মরমে মোর রূপসী মানস-প্রিয়া অলক্ষিত গুরুতার ঢাকা।
দুরন্ত বৈশাখী বায়ে সে গেছে দিগন্ত পারে ফিরে আর আসে না কুটীরে,
জীবনের প্রতি রাত্রি তার স্মৃতি অশ্রু নিয়া চেয়ে থাকে শূন্য নদীতীরে।

মেঘনাদবধ কাব্যে শিল্পকৌশল

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার এম্-এ

[২]

ঘটনাবিন্যাস

আখ্যায়িকা পরিকল্পনায় যে ভাস্বর রসদৃষ্টি, আখ্যায়িকা নির্ম্মাণে যে সুনিপুণ শিল্পকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে, ঘটনা-বিন্যাসে, সর্গসংস্থাপনেও আমরা তাহার পরিচয় পাই। ইতিহাসের ঘটনাপর্য্যায়ের সহিত সাহিত্যের ঘটনাপর্য্যায়ের হুবহু মিল নাই। ইতিহাসের ঘটনাপর্য্যায় মুখ্যতঃ কালানুগ কিন্তু সাহিত্যের ঘটনাপর্য্যায় মূলতঃ ভাবানুগ। এই ভাবানুগতা রক্ষার জন্য কবি ঘটনার স্থান ও কালকে নিঃসঙ্কোচে যথেচ্ছভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। গণিত শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণের মধ্যে যেমন একটি কঠোর যুক্তি শৃঙ্খলা থাকে, রসরচনার মধ্যে সেইরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ বর্ত্তমান থাকা চাই। সাহিত্যে ঘটনাগুলিকে এভাবে সজ্জিত করিতে হইবে যেন কোথাও ভাবের সহজ, স্বচ্ছন্দ, অবারিত প্রবাহ ব্যাহত না হয়। ক্ষুধা না থাকিলে সুখাদ্যও যেমন পাকস্থলীতে যাইয়া সমগ্র দেহ-যন্ত্রকে বিকল করে, তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়—তাহা যদি স্বয়ং সুন্দরও হয়—কাব্যের মধ্যে স্থান পাইলে সমগ্র কাব্যকে পীড়িত করে। ভাবানুগ ঘটনাবিন্যাস সাধারণতই অত্যন্ত জটিল কাজ। অন্যায় পক্ষ নায়ক নির্ব্বাচিত হওয়ায় মেঘনাদবধ কাব্যে এই কাজ আরও কঠিন হইয়াছে। কিন্তু যে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত কবি তাঁহার অন্তরের রসানুশাসন সকল মানিয়া চলিয়াছেন সেই নিষ্ঠাবলেই তিনি এই অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নদীর জলধারা যেরূপ কখনও এককূল কখনও অন্যকূল আবার পুনরায় সেই পূর্ব্বকূল বাহিয়া এই ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিতে থাকে, কবি সেইরূপ আমাদের চিত্তের ভয় বিস্ময়, শ্রদ্ধা অনুরাগ, বেদনা করুণার ধারাকে কখনও রাক্ষস পক্ষ কখনও রাম পক্ষ কখনও আবার রাক্ষস পক্ষ বাহিয়া বঙ্কিম গতিতে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তরবাসী নিরলস নিরন্তক্রিয়াশীল রসপুরুষ সুকৌশলে ভাবসাম্যটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোথাও জীবন্ত সঙ্গতি (harmony) নষ্ট হইতে দেন নাই।

বীরবাহু বধ ও ইন্দ্রজিতের সেনাপতিপদে অভিষেক প্রথম সর্গের বক্তব্য বিষয়। মেঘনাদবধ যে কাব্যের বিষয়-বস্তু তাহাতে বীরবাহুবধ যে দীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যবোধের অভাবজনিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কাব্যের প্রারম্ভে শোকমগ্ন রাবণের চিত্রটি কোন কোন বীরনাদ-শ্রবণ প্রয়াসী পাঠকের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু এই ঘটনার অবতারণা করিয়া কবি যে রস-পরিবেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সক্ষম শিল্পীগণ তাঁহাদের কাব্যের আরম্ভেই আমাদের মনকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় ভরা বাস্তবলোক হইতে তাঁহার কল্পলোকে লইয়া যান, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন, এবং সমগ্র কাব্যের মধ্যে কোথাও আমরা যেন এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচ্যুত না হই সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। বীরবাহুবধে আমরা যে কাব্যরসের আস্বাদ পাই তাহাই মেঘনাদবধে আরও নিবিড়তর, গভীরতর ও ব্যাপকতর হইয়া দেখা দিয়াছে। বীরবাহুবধকে মেঘনাদবধের সংক্ষিপ্তসার বলা যাইতে পারে। এই ঘটনার সাহায্যে আমরা একেবারে কবির বক্তব্য বিষয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করি। চিত্রাঙ্গদা ও রাবণের বিলাপে আমরা যে একটি পরিপ্রেক্ষণিকা পাই তাহার সাহায্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সকল ঘটনাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পারি; ঘটনার বর্ত্তমান পরিবেশ বুঝিতে পারি, লঙ্কা সমরের সত্যস্বরূপ আমাদের মনে

ফুটিয়া উঠে, রাজা রাবণের ব্যক্তিত্বের এক অপরূপ পরিচয় পাই। লঙ্কাসমরের কোথাও প্রত্যক্ষ বর্ণনা নাই। রাক্ষস-কুলশেখর রাবণের পিতৃহৃদয়ের দর্পণে যুদ্ধের যে রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহাই এই কাব্যে লঙ্কাযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ। যে কালসময়ে ভবতল রসাতলে যায় সেই কাল-সমররূপে এই যুদ্ধ চিত্রিত হইয়াছে। কালতরঙ্গ একটির পর একটি দুর্দ্ধর্ষবেগে অদম্য শক্তিতে পাগল হইয়া ধাইয়া আসিতেছে; একটি সুসংহত, সুসমৃদ্ধ, সুশোভিত রাষ্ট্র, একটি কীর্ত্তিমান্ শক্তিমান্ সংস্কৃতিমান্ জাতি লয়প্রাপ্ত হইতেছে; রাবণের প্রিয়পুত্র যত দলে দলে দেশ রক্ষার জন্ম যুদ্ধে যাইতেছে, আর কালসমরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া দলের পর দলকে গ্রাস করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেমন কতকগুলি পর্ব্বে বিভক্ত, মধুসূদনের কল্পনায় লঙ্কাযুদ্ধও এইভাবে সুবিভক্ত। আমাদের ভাবলোকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির ন্যায় উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান বীর রাক্ষস পক্ষে না থাকায় কবি অনেকটা উপাদানের অভাব অনুভব করিয়াছেন কিন্তু তথাপি এই যুদ্ধকে সর্ব্ব-বিভক্তভাবে আমাদের মনে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। যুদ্ধের শেষ পর্ব্বগুলি হইতেছে কুম্ভকর্ণ পর্ব্ব, বীরবাহু পর্ব্ব, মেঘনাদ পর্ব্ব। এক এক সেনাপতির বিনাশে শোকের এক একটি তরঙ্গ আসিয়া রাবণের উপর বহিয়া যাইতেছে, ইন্দ্রজিৎ বিনাশে অন্তিমতম, নিদারুণতম শোকতরঙ্গ আসিয়া রাজাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবে। এখন রাবণের মধ্যে শক্তিদৃপ্ত, ধনগর্ব্বিত, পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী রাবণ মরিয়া গিয়াছে; যে সকল কৃত্রিম ব্যবধান তাঁহাকে সাধারণ মানব হইতে দূরে রাখিয়াছিল তাহা খসিয়া পড়িয়াছে; এখন তাঁহার মধ্যে যে রাবণ রহিয়াছেন তিনি বিশ্বের চিরন্তন স্নেহময় পিতৃহৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি। এই জন্যই এ কাব্যে তাঁহার হৃদয়ের সহিত তালে তালে পাঠকের হৃদয় স্পন্দিত হয়। বীরবাহুর মৃত্যুর পর যে শোককাতর রাবণকে আমরা দেখিতে পাই তিনি আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন৷

প্রথম সর্গে একটি সুসমৃদ্ধ দেশ ও একটি মহাতেজস্বী জাতির বিনাশের চিত্রে আমাদের মন বেদনা ও করুণায় আচ্ছন্ন হয়। আমরা যখন জানিতে পারি যে রাজা রাবণের এই বিপদ আসমান হইতে খসিয়া পড়া আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, রাজা রাবণ নিজ হস্তে সুবিপুল অকল্যাণরাশির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা হুহুঙ্কারে বাহিরিয়া আসিতেছে, এখন আর বহু চেষ্টা সত্বেও তিনি তাহাদিগকে রোধ করিতে পারিতেছেন না তখন আমাদের বেদনা ভয়ে পরিণত হয়। আমাদের নিজেদের ভুলভ্রান্তিই পাগল হইয়া আমাদিগকে গ্রাসিতে আসে! কোন্ মানুষ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত? প্রথম সর্গের শেষভাগে মেঘনাদের অভিষেকের সংবাদে আমাদের মনে একটু আশার উদয় হয় যে এই ধ্বংসের হাত হইতে লঙ্কা রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এই আশা প্রতিপদের চন্দ্রের মত উদয় হইতে না হইতেই অস্তমিত হয়। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে দেব ও মানবের সমস্ত পরাক্রম সংহত হইয়া এক মহাশক্তি-রূপে তাহাকে ব্যাহত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমাদের আশাভঙ্গজনিত দুঃখ দুঃসহ হইয়া উঠিত কিন্তু কবি আমাদের উপলব্ধি করাইলেন যে রাবণের বিপদে আমাদের হৃদয় বেদনাভারাক্রান্ত হয় সত্য কিন্তু আমরা তাহার জয় কামনা করিতে পারি না। সত্য যে-রামচন্দ্রের জীবনের ধ্রুবতারা, যিনি সত্যের জন্ম সকল ভোগ সম্পদ্ হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়া মহত্তম দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছেন তিনি ইন্দ্রজিতের হস্তে নিহত হইবেন, যে-সীতা ধর্ম্ম স্বরূপিনী, যিনি রাজবালা, রাজবধূ হইয়াও পতিদেবতার বিপদ-সঙ্কটের অংশ-ভাগিনী হইবার জন্ম বনবাসিনী হইয়াছেন তিনি আজ কালনাগিনী পরিবৃত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতেছেন, তিনি দুঃসহতম দুঃখে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন তাঁহার এই যন্ত্রণার অবসান হইবে না এ কথা ভাবিতেও আমাদের মন এমনই আতঙ্কিত হয় ও বেদনাভিভূত হয় যে লঙ্কার বিনাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর থাকে না, যে কোন উপায়ে এই পরিণাম ব্যাহত হউক ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা হইয়া উঠে। আমাদের মনের এই অধীর-তার সঙ্গে তাল রাখিয়া কবি প্রথম রজনীর প্রথম ভাগেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবাণ রামচন্দ্রের হস্তগত করাইয়াছেন।

প্রমীলার অভিযান তৃতীয়সর্গের বিষয়বস্তু। অসামান্য

শত্রুব্যূহের মধ্য দিয়া একশত সখীর সহিত তিনি পতিপদ পূজামানসে নগরীর মধ্যে যাত্রা করিবেন। তিনি মহাশক্তির অংশসম্ভূতা; আত্মশক্তির উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস; তিনি ইন্দ্রজিতের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী। যে দুর্দমনীয় শক্তিতে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর উদ্দাম জলস্রোত অবলীলাক্রমে পাষাণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনার গতিপথ রচনা করে সেই শক্তি প্রমীলার মধ্যে মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। দুর্ব্বার শক্তির সহিত সুগভীর প্রণয়াবেগ সম্মিলিত হইয়া প্রমীলা-চরিত্রকে মানবীয়তা ও কমনীয়তা দিয়াছে। তৃতীয়সর্গে প্রমীলার যে পরিচয় পাই তাহাতে আমরা বিস্মিত, ও চমৎকৃত হই। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবাণ রামচন্দ্রের হস্তগত হওয়ার পর এই ঘটনা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহা অবিমিশ্র বিস্ময় নয়, তাহার সহিত বেদনা, করুণা মিশ্রিত রহিয়াছে! এই ঘটনা সন্নিবেশের ফলে আমাদের মন মানবের অদৃষ্টলিপি সম্বন্ধে প্রশ্নসমাকুল হইয়া উঠে: বিধি এই অপরূপ শক্তি, এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য, এই প্রেমময় হৃদয় সৃষ্টিই করিলেন কেন বিনাশই বা করিলেন কেন? এই শক্তি কেন কেবল সম্ভাবনার রাজ্যেই রহিয়া গেল, জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে আপনার পূর্ণরূপ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই কেন বিনষ্ট হইল? বিধাতার কি নিজের সৃষ্টির জন্য কোন মায়া-মমতা নাই, সম্ভাবনীয়তাকে সার্থকরূপে দেখিবার কোন আগ্রহ নাই? লীলাময় বিধি কি কেবল নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই নিরন্তর গড়িতেছেন ও ভাঙিতেছেন? সৃষ্টির মধ্যে কি অন্য কোন মহান উদ্দেশ্য নাই?

আমাদের প্রশ্নময় মনে যখন বিধাতার বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিয়া উঠিতে সুরু করে আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বজনবন্দনীয়া পুণ্যময়ী জনক তনয়াকে হাস্যোজ্জ্বল, গীতমুখরিত, আনন্দহিল্লোলিত কনকলঙ্কার এক চিরনিশাবৃত গহনকাননে মূর্ত্তিমতী মনোবেদনা বেশে। সীতা আজন্মদুঃখিনী, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রকৃত দুঃখভোগ করিতে হয় নাই! রাজ্যসুখ ছাড়িয়া তিনি বনবাসিনী হইয়াছিলেন কিন্তু প্রিয়তমের সঙ্গসুখে তাঁহার সর্ব্বসুখতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার মন যে সুগভীর প্রসন্নতা, সুনির্ব্বচনীয় শান্তি, স্বতঃস্ফূর্ত্তি আনন্দরসে পরিপূর্ণ ছিল তাহাই যেন উপচাইয়া সমগ্র বনভূমিকে, সেখানের পশুপক্ষী, তরুলতাকে প্রসন্ন, সুন্দর, আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিল। প্রিয়তমের সহিত মিলনোল্লাসে তাঁহার মনে নিরন্তর যে মলয় পবন বহিত তাহারই যাদুস্পর্শে পঞ্চবটী বনে তরুলতা সর্ব্বদা ফুলফলে আলো হইয়া থাকিত, সকল সময় কোকিল সুধাবর্ষণ করিত। তাঁহাদের বনবাসজীবনের যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার কাছে যে কোন দেশের Idyll বা Pastoral সাহিত্য নিষ্প্রভ হইয়া যায়। দুষ্ট রাবণ মায়াজাল পাতিয়া তাঁহাকে প্রিয়তমের হাত হইতে ছিনাইয়া এই স্বর্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া তমোময় অশোককাননে বিকট করাল চেড়ীদের মাঝে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। সুদুঃসহ ব্যথাতে সীতা তীক্ষ্ণতীরবিদ্ধ পাখীর মত বার বার অচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছেন। তাঁহার এই যন্ত্রনা-কাতর অবস্থা দেখিয়া আমরা অবসন্ন হইয়া পড়ি, আমাদের মন সকল সজীবতা হারাইয়া ফেলে। বিধির যে বিধান ইন্দ্রজিৎ বধের ব্যবস্থা করিতেছে তাহাকে আর অর্থহীন, বালকসুলভ, কৌতুকপ্রিয়তাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবাণ রামচন্দ্রের হস্তগত হইয়াছে, ইন্দ্রজিতের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাবণের পরাজয় ও সীতার উদ্ধার সাধিত হইবে—এই কথা ভাবিয়া আমাদের মন আশ্বস্ত হয়, কিন্তু ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইবে এই সাধারণ সংবাদ যেন আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইতে পারে না, কি কৌশলে তাহার বিনাশ সাধিত হইবে তাহা জানিবার জন্ত আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। পঞ্চমসর্গের আরম্ভে ইন্দ্রের যে চিন্তাকুলতা তাহা পাঠকের। আমাদের ব্যাকুলতা উদ্বুদ্ধ হইবার পর মায়ার ছলনায় কি ভাবে অন্যায় সমরে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইবে ইহা আমাদের সামনে কবি উদ্ঘাটিত করিলেন; পঞ্চবটী বনের পরমসুখের দিনগুলি, অশোকবনের দারুণ-দুঃখের দিনগুলি এই উভয় চিত্রই আমাদের মনে দীপ্তিমান, এবং এই হৃদয়বিদারক পরিবর্ত্তন রাবণের মায়াজালেই সংঘটিত হইয়াছে; এই জন্যই ইন্দ্রজিৎ অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় আনায় মাঝারে সিংহের ন্যায় নিহত হইবে এই সংবাদে আমাদের মন বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী হইয়া উঠে না।

সীতার সুদুঃসহ দুঃখকে সহনীয় করিবার জন্য স্বপ্নে ভবিতব্যতার দ্বার খুলিয়া দেখান হইয়াছে। সীতার স্বপ্ন বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া আসিতেছে। লঙ্কার বীরকুল উৎসাদিত। একমাত্র বীর এক্ষণ ইন্দ্রজিৎ। মায়ার প্রসাদ লাভ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে নিহত করিবেন। দেবপ্রসাদ লাভের জন্য কৃচ্ছ্র সাধন, প্রলোভনজয়, পুরুষকার প্রভৃতি যে সকল মহনীয় গুণ আবশ্যক লক্ষ্মণের অভিযানের মধ্যে আমরা তাহার প্রচুর পরিচয় পাই। মধুসূদনের কল্পনায় লক্ষ্মণ চিরতারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি। অকুতোভয়তা তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট; ধর্ম্মের জয় তাঁহার দ্বিধা সংশয়হীন অখণ্ড বিশ্বাস। এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসই তাঁহাকে অদ্ভুত হন্তার শক্তি দিয়াছে। অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সুতীব্র ঘৃণা, প্রচণ্ড বিদ্বেষ। ধর্ম্মদ্রোহীর অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে দুর্দ্দমনীয় উন্মাদনা। তিনি মায়ার বরলাভে সমর্থ হওয়ায় আমরা সীতা উদ্ধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ। এইখান হইতে আমাদের ভাবধারা নূতন মোড় লইয়াছে; আমাদের অন্তরের বেদনা, করুণা পঞ্চমসর্গের মধ্য ভাগ হইতে নূতন স্রোতে বহিতে সুরু করে। রাক্ষসপক্ষের মনুষ্যত্ব রামসীতার পরিপূর্ণ মানবতার তুলনায় নিষ্প্রভ। কিন্তু রামচন্দ্র জয়যুক্ত, তাঁহার ধর্ম্ম পুরস্কৃত হইতে চলিল। রাক্ষসপক্ষের অপূর্ব্বগুণাবলী কেবল বিনষ্ট হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্মদ্রোহী রাক্ষসপক্ষের যে-সকল মহার্হগুণের শোচনীয় পরিণাম আসন্ন তাহারা এখন আমাদের সমগ্র মনকে অধিকার করে; জয়যুক্তা রামসীতা আমাদের মনে স্থান পান না। নিদারুণ বিধি আমাদিগকে এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন করিয়াছিলেন; ইন্দ্রজিতের বিনাশ ভিন্ন সীতা উদ্ধারের উপায় নাই, এই জন্য আমরা ইন্দ্রজিতের নিধন সমর্থন করি। এই ভাবে আমরা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হই, সীতার উদ্ধার সুনিশ্চিত জানিয়া আমাদের অবসন্ন মন অনেকটা প্রসন্ন হয়, কিন্তু আমরা উল্লসিত হইবার অবসর পাই না. আমরা যে সকল মহামূল্য রত্ন হারাইয়া সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হই আমাদের মন তাহাদের ভাবনায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেব ও মানবের শক্তি ও কৌশলের সম্মিলিত চেষ্টায় ইন্দ্রজিৎ-বধের সুবিপুল ষড়যন্ত্র সুসম্পূর্ণ হওয়ার পর আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রজিৎ, জননী ও প্রিয়তমার নিকট যুদ্ধে যাইবার অনুমতি চাহিতেছেন। তাঁহাদের স্নেহমায়া মমতাভরা গৃহজীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে। এই সোনার সংসার অচিরেই ছারখার হইবে ভাবিয়া আমরা বিষণ্ণ হই। আমরা ভাবি চিরলীলাময়ী মানবনিয়তি তাঁহার নিগূঢ় ইচ্ছায় স্বরচিত বিচিত্র পথে চলিতে চলিতে পদে পদে অমূল্য দানরাজি বিতরণ করিতেছেন, আবার আমাদের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যকে অসীম ঔদাসীন্য দেখাইয়া পরের মুহূর্ত্তে তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। যে মুহূর্ত্তে মাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য অনাহারে অনিদ্রায় দেবপূজা করিতেছেন সেই মুহূর্ত্তেই নিয়তি তাঁহার নিধনের আয়োজন করিতেছেন—অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! সিড্যালনির সাহিত্যের নায়কের মত ইন্দ্রজিতের বাহুতে যেমন অমিত শক্তি তাঁহার হৃদয়ে তেমনি অনন্ত প্রেম। তাঁহার চরিত্রে ভীম ও কান্ত উভয় গুণ সমাবেশের ফলেই ট্রাজিডির রস এমন নিবিড় হইয়াছে। যে চরিত্রে কেবল দুর্বার শক্তির প্রকাশ দেখি তাহা পঞ্চভূতের তাণ্ডবলীলার মত আমাদিগকে ভীত, স্তম্ভিত করে কিন্তু তাহার সহিত আমরা আত্মীয়তা অনুভব করি না, তাহার সুখদুঃখ আমাদের বেদনা ও করুণার পরিধির বহির্ভূত, তাহার পতনের মধ্যে মানব অদৃষ্টের চিত্র প্রতিফলিত হয় না। আবার চরিত্রটি যদি কেবল সুকুমার গুণসমূহের দ্বারাই গঠিত হয় তাহা হইলে তাহার হৃদয়াবেগসকল পৌরুষহীন, সৌখীন বিলাসীর প্রেমাভিনয়ে পরিণত হয়, তাহার পতন আমাদের মনে একটি অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পার উদ্রেক করে মাত্র। ইন্দ্রজিতের চরিত্রে সুকোমল হৃদয়াবেগ ও প্রচণ্ড রণবিক্রম সমান তালে চলিয়াছে। তাঁহার প্রেমময়ী, আশঙ্কাময়ী জননী ও প্রণয়িনীর চিত্র আমাদের মনে উজ্জ্বলভাবে জাগরূক থাকায় তাঁহার বিনাশ আরও শোচনীয় হইয়াছে। মাতার দৃষ্টি ও প্রিয়তমার দৃষ্টি দিয়া না দেখিলে অকালমৃত্যুর নিদারুণ ব্যথা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না।

পঞ্চম সর্গে ও ষষ্ঠ সর্গে অগণিত গুণের মধ্য দিয়া ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের অতি অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। পঞ্চম সর্গের শেষে দেখিতে পাই কান্তকোমল চিত্রটি;

ষষ্ঠ সর্গের আরম্ভে রামচন্দ্রের আশঙ্কার দর্শনে তাঁহার কঠোর অধৃষ্য রূপটি ফুটিয়া উঠে, যজ্ঞাগারে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে চিত্র দেখি তাহাতে যেন প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, মধ্যযুগের ইউরোপের নাইটের আদর্শ, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের দেশপ্রেমিকের আদর্শ সম্মিলিত হইয়া এক সুমহান্ ব্যক্তিত্বের মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধ্যানে তিনি কপর্দ্দী, প্রেমে কন্দর্প, বিক্রমে কার্ত্তিকেয়। ক্ষত্রিয়ের রণোন্মাদনা, অকুতোভয়তা, ও মৃত্যুর প্রতি অবজ্ঞা, নাইটের সুমধুর আচার, আতিথ্যসৎকার ও কপট সমরের প্রতি অকৃত্রিম ঘৃণা, দেশ-প্রেমিকের স্বজাতিবাৎসল্য, জাতীয় কীর্ত্তিসংস্কৃতির গৌরব বোধ ও জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণাকে পবিত্র জ্ঞান—এই সকল গুণ পরিপূর্ণ মাত্রায় মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার মধ্যে বিকশিত দেখিতে পাই। সূর্য্যদেব যেমন সমগ্র দিগন্তকে অপূর্ব্ব বর্ণ সমারোহে সমুজ্জ্বল করিয়া অস্তমিত হন, তেমনি এই সূর্য্যের মত তেজস্বী বীর আপনার মহামহিমোজ্জ্বল রূপটি শেষ মুহূর্ত্তে আমাদের দেখাইয়া চিরতরে তিরোহিত হইলেন। এই অনন্ত গুণ-গরিমামণ্ডিত রূপটি দেখিয়া আমরা উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে আত্মবিস্মৃত ও তন্ময় হইয়া যাই। আমাদের মনে হয় জীবন মৃত্যু, জয়পরাজয় নিতান্তই তুচ্ছ, জীবনের এই মহিমাই সত্য। এই অপার্থিব গুণরাজির সহিত পার্থিব লাভ ক্ষতি সংযুক্ত করিলে ইহাদের অপমানিত করা হয়, ঐহিক সুখ-সম্পদের পুরস্কারের স্পর্শে ইহারা কলুষিত হয়। এই গৌরবময় প্রকাশের মধ্যেই ইহাদের চরম সার্থকতা। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসর হইতে খসিয়া পড়িয়াই যেন এই মহীয়ান্ পুরুষ মুক্তি পাইয়াছেন, অমৃতলোকের উন্মুক্ত উদার ক্ষেত্রে আপনার বিচরণের উপযুক্ত স্থান পাইয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয় অনেকে এই ট্র্যাজিডিকেও প্রধানতঃ বীর রসাত্মক বলিয়া মনে করেন এবং কবি স্বয়ং বলিয়াছেন 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।'

আমাদের এই তন্ময়তা ধীরে ধীরে কাটিয়া যায়। এই উল্লসিত ভাব আমাদের সমগ্র মনকে অধিকার করিয়া রাখিতে পারে না। ইহার পাশাপাশি বিষাদ, বেদনা ও বিক্ষোভের ভাব মাথা তুলিতে শুরু করে। বিধির বিধান কি ঘোর ক্রূর ও কুটিল পথেই না ঘটনাস্রোতকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে যাহাতে এই অপরূপ গুণশালী পুরুষের মৃত্যু অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। ইন্দ্রজিতের বিনাশ ত শুধু একটি ব্যক্তি বিশেষের বিনাশ মাত্র নয়; তিনি লঙ্কার পঙ্কজ রবি; রাজা রাবণ, রাণী মন্দোদরী, বীরাঙ্গনা প্রমীলার হৃদয়পদ্মের রবি। তাঁহার বিনাশেই একটি সুসমৃদ্ধ দেশের বিনাশ, এক মহাপরাক্রমশালী জাতির বিনাশ। গ্রীক্ নাটকের কোরাসের সঙ্গীতের মত বিভীষণের আবেগকম্পিত বিলাপ আমাদের অন্তরের অন্তরতম বেদনা প্রতিধ্বনিত করে। তাঁহার বিনাশ আবার অপকৌশলের সাহায্যে সাধিত হইয়াছে এই ভাবিয়া আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হয়। রাবণের পাপকর্ম্মের প্রতিশোধলিপ্সু বিধিরোষের উত্তালতরঙ্গে বাহিত হইয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়াছেন এই প্রতীতি আমাদের অন্তরে কবি দৃঢ় করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি তাঁহার কাব্যে কোথাও মানবীয় ইচ্ছাশক্তির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইতে দেন নাই, মানুষকে তাহার কৃতকর্ম্মের ফলাফলের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করেন নাই, অতি প্রাকৃত শক্তি মানুষের কাঁধে চড়িয়া তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন [illegible] সাধন করায় নাই। ইন্দ্রজিৎ বধ ব্যাপারে লক্ষ্মণ দৈবী [illegible] সাহায্য ও সমর্থন পাইয়াছেন কিন্তু দেবানুষ্ঠিত [illegible] তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমস্ত শক্তি দিয়া কার্য্যে পরিণত করেন; এবং পূজারত ইন্দ্রজিৎকে যে তিনি বীরসাজে সজ্জিত হইবারও সুযোগ দিলেন না সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহার এবং রাক্ষসের সহিত ক্ষত্রধর্ম্ম পালনের আবশ্যকতা নাই এই যুক্তি কেবল জয়লালসাপ্রসূত আত্মবঞ্চনা। ধর্ম্মপ্রিয় দেবকুল ধর্ম্মের জয় অব্যাহত রাখার জন্য রামচন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন দেখি যে লক্ষ্মণকে তাহার অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইল তখন আমরা ভাবি বিধির বিধান আমাদের মনে ভয়, বিস্ময়, বিষাদ, বেদনা, করুণার উদ্রেক করিতে পারে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভের কোন কারণ নাই। এরূপ যখন দেখি অতুলনীয় সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বীরত্বের সহিত [illegible] রক্তস্রোতপূর্ণ রাবণের ভীষণ অপরিমেয় বাণবর্ষণ মুহুর্মুহুঃ তীক্ষ্ণ শরজালে কাটিয়া ফেলিতেছেন ও বিদেশের

রাবণও শতমুখে তাহার বীরপনার প্রশংসা করিতেছেন তখন মনে হয় তিনিই ইন্দ্রজিতের যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার হাতে মৃত্যু যে কোন বীরের পক্ষে গৌরবজনক।

অষ্টম সর্গের প্রেতপুরীর বর্ণনা অনেকের মতেই ঘটনার বিকাশের প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত হয় নাই, তাহা অন্য কাব্যের অনুকরণে বাহির হইতে সংযুক্ত। নবম সর্গে যে করুণ রসের ঢেউ আসিতেছে তাহা হয়ত আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে এবং বিধির বিধানের বিরুদ্ধে আমাদের মন বিদ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় কবি বিধির বিধানের সত্য স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন এবং যিনি জয়যুক্ত হইলেন তাঁহার পূর্ণ মহিমা আমাদের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিধি মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলা করেন না, তাহার জয়পরাজয়, সুখ দুঃখ, সফলতা বিফলতা তাহার নিজ কর্ম্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পাপীকে তাহার পাপ কর্ম্মের ফলে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। পাপীর প্রতি বিধির বিন্দুমাত্র দয়া মায়া নাই। 'পাপ সহ রণে যে সুমতি, অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে'। 'সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে'। রামচন্দ্রকে ছলনা করার জন্য মারীচ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সতী-নারী-রক্ষাহেতু প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অতীব গৌরবে জটায়ু স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। যে ইক্ষ্বাকু-কুলের নৃপতিগণ ধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য জানিয়া বংশানুক্রমে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছেন রামচন্দ্র সেই কুলের শ্রেষ্ঠ রত্ন। ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু তাঁহার ত্যাগ স্বীকার, দুঃখ বরণ চিরভাস্বর থাকিবে। এই দুঃখব্রতী ধর্ম্মাত্মা নিজের অসহ যন্ত্রণা ক্লেশকেও তৃণ জ্ঞান করেন কিন্তু ঘোর পাপীকেও বিন্দুমাত্র দুঃখ ভোগ করিতে দেখিলে বেদনায় ম্রিয়মান হন। অসহায় দুর্ব্বল মানবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম করুণা। পাপের প্রতি সুতীব্র ঘৃণাও পাপীর দুঃখের সহিত তাঁহার দরদী হৃদয়ের সমবেদনাকে গ্রাস করিতে পারে নাই। যে-বিধি এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে তাঁহার অমূল্য রত্ন ফিরাইয়া দিলেন, তাঁহার প্রাণাধিকপ্রিয় ভ্রাতাকে পুনর্জীবিত করিলেন তাহাকে আমরা অন্ধ অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না।

স্বর্ণ যশোগৌরবরবি চিররাহুগ্রস্ত; রামচন্দ্র জয়যুক্ত; সীতা কারাগারমুক্ত; রক্ষঃকুল নির্ম্মূল; স্বর্ণলঙ্কা বিনষ্ট। রাবণের প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা তাহার পাপের মাত্রাকে ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এখনও তাহার প্রতি রোষ, ক্ষোভ, দ্বেষ, জীয়াইয়া রাখা হীন মনের অকারণ ক্রূরাচরণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বিপদের সামনে আমরা সকল পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাই। ইন্দ্রজিৎ বীর পিতার বীর পুত্র। স্বহস্তগঠিত সমৃদ্ধ দেশ ও পরাক্রান্ত জাতির নেতৃত্বে বীর পুত্রকে বরণ করিয়া দেশ ও জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মধুর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় হইবেন, তাঁহার এই সুখস্বপ্নে কি রূঢ় আঘাতই না লাগিল! তিনি আজ চলিয়াছেন পুত্রের সৎকার করিতে, লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ নীরবে অশ্রুসজল নয়নে নগ্নপদে দেশমাতৃকার বরেণ্যতম সন্তানের শবযাত্রার অনুসরণ করিতেছে। বীরাঙ্গনা প্রমীলা চিতারোহণের সাজে সজ্জিতা হইয়া সহমরণের জন্য চলিয়াছেন। প্রমীলা শুধু যে বীরত্বে তুফানের মত দুর্ব্বার, স্নেহে ও প্রেমে কুসুমের মত কোমল তাহাই নহে, তিনি পরম বিপদে তপস্বিনীর মত প্রশান্ত। তরুণ যৌবনে পুরুষোত্তম ইন্দ্রজিৎ, বামাকুলোত্তমা প্রমীলার বিনাশ, নিয়তির মর্ম্মভেদী কিন্তু যে ভাবে তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন সেই জাতীয় মরণেই জীবন কৃতার্থ। এই জন্য এই বিষাদের অন্তরেও একটি সান্ত্বনা রহিয়াছে। এই মহান্ মৃত্যুবরণের দৃশ্য দেখিয়া আকাশ হইতে সম্মিলিত দেবকুল পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। কবি চিতারোহণের দৃশ্য দিয়াই পর্দ্দা ফেলিয়াছেন। কাব্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া তিনি লোমহর্ষণকর melodramaর রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। ইহা কবির বলিষ্ঠ সংযমের পরিচায়ক। পুত্র ও পুত্রবধূর সৎকার সম্পন্ন করিয়া রাজা রাবণ সিন্ধুনীরে স্নান করিয়া শূন্য লঙ্কায় ফিরিলেন। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে রাজা রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিতেছে। মধুসূদনের কাব্য পড়িয়া মনে হয় যে গ্রীক পুরাণের নাইওবির মত এই রাক্ষসরাজ পুত্রশোকে বিরলে অবিরল অশ্রুজল মোচন করিতেছেন, অন্তহীন কালের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার আর বিরাম নাই।

মহাকবি দান্তে তাঁহার মহাকাব্যটিতে একদল মানুষকে নরকদণ্ড দিয়াছেন যাহাদের কোন পাপ ছিল না, তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ, তাহারা আপনাদের ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই, জীবনে তাহাদের আত্ম-প্রকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, তাহারা খ্যাতি অখ্যাতি কিছুই অর্জন করিতে পারে নাই, কাহারও রাগ বিরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বিধাতা যে মূলসূত্র অনুসারে দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন তাহার সহিত এই নীতির মিল আছে কিনা সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। সাহিত্য-বিচারকের হাতে ইহাই প্রধান মানদণ্ড। যে-চরিত্র, ঘটনা ও আখ্যান উজ্জ্বল সাহিত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই সাহিত্য বিচারে পুরস্কৃত হইবে আর যাহার সাহিত্যরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয় নাই তাহার মধ্যে যতই সাহিত্য-উপাদান থাকুক, যতই তত্ত্বকথা, নীতিকথা, দেশপ্রীতি ও পতিতের প্রতি দরদ থাকুক তাহা সাহিত্যবিচারকের হাতে দণ্ডিত হইবে। সাহিত্যরূপটি যে পর্য্যন্ত না উজ্জ্বল আকারে দেখা দেয় সে পর্য্যন্ত আমাদের ভাবলোকের সুপ্ত রসাবেগসকল জাগ্রত হয় না। মধুসূদন যে তাঁহার দীর্ঘ কাব্যের মধ্য দিয়া আমাদের রসাবেগের ধারাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার প্রধান কারণ এই যে যে-যাদুমন্ত্রে আমাদের রসবোধ সাড়া দেয় তাহা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। অক্ষম লেখকের সাহিত্য পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা যেন এক কুহেলিকাচ্ছন্ন দেশের মধ্য দিয়া যাইতেছি সেখানে কোন জিনিসেরই রূপ নাই লাবণ্য নাই, কিছুই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে না। মধুসূদনের কাব্যপাঠকালে মনে হয় আমরা যেন কবিকল্পনার কনককিরণদীপ্ত এক অপূর্ব্ব দেশে বিচরণ করিতেছি, সেখানের তরুলতা, গিরিনদী, পশুপাখী, নরনারী আপন আপন বিশিষ্ট রূপশ্রী লইয়া শোভা পাইতেছে, সকলই আমাদের চিত্তকে দৃঢ় করে, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন রসাবেগকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে। তাঁহার নিপুণ লেখনীর এক একটি শব্দ যোজনাতে এক একটি চিত্র আমাদের মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাঁহার কাব্যের প্রতি পৃষ্ঠায় এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ গরুড়ের পাখা—বিস্তারি বিশালপক্ষ উড়িলা আকাশে পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িলা ভূতল, আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী। বীর ভদ্রের শূল—ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে। বাসবী—দেখিলা বীরেশে তেজস্বী, কিরীট চূড়ে খেলে সৌদামিনী, স্বর্ণবর্ণে মহাকায়ে, নয়ন রূপসি, আভরণ, করে শূল, গজপতি গতি। বারুণী—সুস্নিগ্ধ নিকেতনে কনক পঙ্কজবনে, প্রবাল আসনে, বারুণী রূপসী, মুক্তাফল দিয়া কবরী বাঁধিতেছিলা।

কবি কোন ঘটনা বা চরিত্রকে একবার মাত্র আমাদের সামনে হাজির করিয়া সরাইয়া ফেলেন না। প্রধান অপ্রধান প্রায় সকল চরিত্রকে আমরা বার বার দেখিতে পাই। কবি কোথাও চরিত্রগুলিকে ভুলেন নাই, আমাদেরও ভুলিবার অবসর দেন নাই। যে-বন্ধু এককালে আমাদের সুপরিচিত ছিল কিন্তু এখন যাহার সঙ্গে আমাদের কোন সংযোগ নাই তাহার সুখদুঃখ অপেক্ষা যে-পরিচিত বন্ধুকে জীবনের আঁকা বাঁকা পথে মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যও অকস্মাৎ দেখিতে পাই তাহার সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য যেমন আমাদের মনে অধিকতর উল্লাস উদ্বেগের উদ্রেক করে তেমনি সাহিত্যের যে চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের যোগসূত্রটি সকল সময় অবিচ্ছিন্ন থাকে তাহার উত্থানপতনে আমাদের অধিকতর ঔৎসুক্য জন্মে। মেঘনাদ বধ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কবি অগণিত পাত্রপাত্রীকে সর্ব্বদা কর্মচঞ্চল রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। যাহার বাহুতে অমিত শক্তি সেই বীরশ্রেষ্ঠই যেমন সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাবে হরধনুতে জ্যা-রোপণ করিতে পারেন, তেমনি যাঁহার কল্পনাশক্তি অজস্র সেই শিল্পিশ্রেষ্ঠই প্রকৃতির প্রাচুর্য্য ও প্রাণলীলাকে স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে সাহিত্যরূপের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারেন। চরিত্রগুলির গতিবিধির মধ্যে কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই, মুহূর্তের জন্যও কোন চরিত্রকে কবির অভিপ্রায়ানুসারে কলের মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। সকলেই যেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, রক্তমাংসে গঠিত, প্রাণময় মানুষের মত স্বভাবে বিচরণ করিতেছে। আমরা

ফলেই তাহাদের আবির্ভাব আকস্মিক বলিয়া মনে হয় কিন্তু যে আচরণ অপ্রত্যাশিত সেই আচরণই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। এই উক্তির সমর্থনে কাব্যের মধ্যে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

এখানে দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘনাদ বধ কাব্যের আখ্যায়িকার মোটামুটি সীমান্ত রেখাটি দেওয়ার পর যদি একজন সাধারণ কবিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে সুসম্পূর্ণ করিবার ভার দেওয়া হইত তাহা হইলে আমরা প্রমীলাকে দেখিতে পাইতাম দুইবার, প্রমীলার নিকট ইন্দ্রজিতের বিদায় ও প্রমীলার চিতারোহণ। এই কাব্যে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই পাঁচবার। তাঁহাকে যে যে ভাবে দেখিতে পাই তাহা অনেকটা আকস্মিক অর্থাৎ আমরা পূর্ব্ব হইতে ভাবিতে পারি নাই যে তাঁহাকে এইস্থানে এইভাবে দেখিতে পাইব। তৃতীয়সর্গের প্রারম্ভে চিররণজয়ী ইন্দ্রজিতের কণিকের বিরহে এই বীরাঙ্গনা একেবারেই অধীর। আমরা তাহার এই ভাব দেখিবার পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারি নাই। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া অনুভব করি যে শৌর্য্যবীর্য্য অপেক্ষাকৃত বাহিরের জিনিস, ইহার মধ্যে প্রমীলা চরিত্রের সত্য পরিচয় নাই, তাঁহার জীবনের নিগূঢ়তম সত্য হইতেছে তাঁহার নারীহৃদয়ের অন্তঃস্পর্শ প্রেম যাহা সহজ উপলব্ধির দ্বারা প্রিয়তমের প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বহির্ভূত আসন্ন বিপদের সন্ধান পায়। নারীহৃদয়ের গূঢ় রহস্য সকল যেন কবির কাছে আপনাদিগকে পূর্ণবেগে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। পঞ্চমসর্গে ইন্দ্রজিৎ সুপ্ত প্রমীলাকে জাগাইয়া রণে যাইবার অনুমতি লইবার জন্য তাহার সহিত মন্দোদরীর মন্দিরে গেলেন। রাণী মন্দোদরী শঙ্কাকুলচিত্তে অনিচ্ছা সত্ত্বে অনুমতি দিলেন এবং পুত্র বিরহ দুঃখ কিছু পরিমাণে প্রশমিত করিবার জন্য প্রমীলাকে সঙ্গে রাখিলেন। ইন্দ্রজিৎ বিদায় লইয়া যজ্ঞশালাভিমুখে গেলেন, মন্দোদরী ও প্রমীলা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা মনে করি বিদায় দৃশ্যের অবসান হইল। কিন্তু পরের অনুচ্ছেদের আরম্ভেই পড়ি 'সহসা নূপুর ধ্বনি শুনিলা পশ্চাতে'; আমরা চমকিত হই এবং এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার স্বাভাবিকতার কথা ভাবিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হই। সুশীলা কুলবধূ শাশুড়ীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার সহিত রহিলেন কিন্তু তিনি পুনরায় বাহিরে আসিয়া যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তম দৃষ্টির বহির্ভূত হন সে পর্য্যন্ত সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষুর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া অপরিসীম লালসার সহিত নিমেষহীনদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিবেন প্রমীলার পক্ষে ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক ঘটনা কি হইতে পারে? প্রণয়িনী নারীহৃদয়ের দেবতা যেন কবির হাত হইতে লেখনী ছিনাইয়া স্বয়ং এই চিত্রগুলি লিখিয়া দিয়াছেন। সপ্তমসর্গের প্রথমে আবার তাঁহাকে দেখিতে পাই। তাঁহাকে চিতারোহণের পূর্ব্বে আবার দেখিব এ কথা ভাবি নাই। এখানে যখন দেখি যে পতির জন্য তাঁহার আশঙ্কা সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন আমরা এই ভাবিয়া লজ্জিত হই যে, এই প্রেমময়ী আশঙ্কাকুলা নারী প্রিয়তমকে বিদায় দিয়া কি দুঃসহ দুঃখে সময় কাটাইতেছিল তাহা আমরা তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। পঞ্চমসর্গে চিন্তাকুল ইন্দ্রকে দেখিয়া অনুরূপ ভাবের উদয় হয়। ইন্দ্র ইন্দ্রজিৎ-বধের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া সরিয়া যাইবেন এবং সপ্তমসর্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আবার দেখা দিবেন আমরা এইরূপ ভাবিতেছিলাম। কিন্তু ইন্দ্র ত' একটি যন্ত্র বিশেষ নহে যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অচল প্রাণহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিবেন। স্বপনে শয়নে নাগ নাহি ভয়ে যতক্ষতোধিক তিনি যে-ইন্দ্রজিৎকে ভয় করেন তাঁহার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিনাশ সাধিত হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মনের উদ্বেগ, অশান্তি ও আশঙ্কার সীমা আছে? ইন্দ্রজিতের সেনাপতি পদে অভিষেক এই ঘটনা যদি সত্য ঘটনা হইত তাহা হইলে বৃহৎ জীবনের সহিত বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে যে ভাবে ইহা আত্মপ্রকাশ করিত কবি কাব্যে এ ঘটনাকে সেই ভাবে রূপ দিয়াছেন। বন্দীরা গাহিল যে লঙ্কার দুঃখ বিভাবরী প্রভাত হইল। এই ঘটনা আপাততই কি ভাবে সকলকে প্রভাবিত করিবে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই কিন্তু কবি ভুলেন নাই। চতুর্থ সর্গের আরম্ভে দেখি লঙ্কা আনন্দময়; নিদ্রাদেবী দ্বারে দ্বারে অনাদৃত হইয়া ফিরিতেছেন; আশা মায়াবিনী পথে, ঘাটে, দেউলে, কাননে মধুর স্বপ্নের জাল বুনিতেছে, চেড়ীরা উৎসব কৌতুকে মত্ত; এই সুযোগে সরমা সীতার সহিত সাক্ষাতে গিয়াছেন। ষষ্ঠসর্গে দেখিতে পাই ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ দেখিবার জন্য কেহ কেহ প্রাচীরে উঠিতেছে, ইন্দ্রজিৎ শত্রু বিনাশ করিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবেন ভাবিয়া কেহ বা যুদ্ধ-জয় জানিবার জন্য সভাস্থলে যাইতেছে। জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে কেহই এমন সুনিপুণ ভাবে সাধারণের-কল্পনার-বহির্ভূত-স্বাভাবিকতাকে শিল্পরূপ দিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার

ত্রিলোচন ও বিভূপদ

শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষাল বি-এ

কলিকাতা নগরীর প্রায় মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড ঠাকুর বাড়ী। তিনটি সুউচ্চ মন্দির। মধ্যেরটি রাধাকৃষ্ণের। পার্শ্বের দুইটিতে একটিতে শিবলিঙ্গ ও অপরটিতে ধ্যানী শিবের মূর্তি। ঠাকুরবাড়ীটি একতলা, উপরে প্রকাণ্ড ছাদ পড়িয়া আছে। নীচের তলায় অনেকগুলি ঘর আছে। সেইগুলিতে দেবতার ভোগ প্রস্তুত হয়, ভাঁড়ার রাখা হয় এবং সরকার, চাকর, পূজারী, দারবান প্রভৃতির বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়।

মন্দিরগুলি এবং ঠাকুরবাড়ীটি অনেক কারুকার্যে পরিপূর্ণ। দেবতাদের মূর্তিগুলিও অতি সুন্দর। কিন্তু দেবতা লইয়া আমাদের কারবার নয়। ধনী বিনোদবিহারী সাহার গর্বিত ঐশ্বর্যের সিংহাসনে তাঁহারা বোধ হয় সুখেই থাকেন। দেবতার সুখ দুঃখের খবর সঠিক বলিতে পারি না, তবে তাঁহার তলায় যে কয়টি মনুষ্য বাস করে তাহাদের সংবাদ কিছু কিছু রাখি।

মন্দিরে চারিজন পূজারি থাকেন—বুড়া ঠাকুর, তাঁহার পুত্র মাধব ঠাকুর, বৈরাগী ঠাকুর, (চাকরেরা অসাক্ষাতে ইঁহাকে দুর্বাসা ঠাকুর বলে) ও যুবক চৈতন্যচরণ।

দারবানজী জাতিতে খর্বা। ভৃত্য দয়াল ও কামাখ্যা জাতিতে উড়িয়া। দয়াল কিন্তু পুরা বাঙ্গালী—কথায় বার্তায় মন রাখিয়া কাজ করিতে তাহার জুড়ি মিলে না। কামাখ্যা খাঁটি উৎকল দেশীয়।

* * * *

উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও "বাবু" বলা চলে না। কিন্তু কলিকাতার আধুনিক মন্দির বাবুহীন হইতে পারে না। ইহার একখানি কক্ষ অধিকার করিয়া সরকার বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু পুত্র শ্রীমান ত্রিলোচন বসু সহ বাস করেন। উপেন্দ্রবাবু লোকটি বেশ—কেবল রাখিলে কাহারো মান রাখিয়া কথা বলেন না। ঘোরতর সংসারী, কোন মতে পৃথিবীর চোখ এড়াইয়া নিজের কাজটা সারিয়া লইতে পারাই তাঁহার মতে একমাত্র সৎ কাজ। পুত্র ত্রিলোচনকে তিনি এই শিক্ষাই দেন। দেশ হইতে তাহাকে এই স্থানে নিজের কাছে রাখিয়া কলিকাতা সহরের এই নিদারুণ খরচ তিনি সহ্য করিতেছেন যে কেবল তাহাকে কাজ চিনিবার সুযোগ দিবার জন্য একথা প্রতি সন্ধ্যায় তাহার পড়ার সঙ্গে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

ত্রিলোচন কাজ চিনিবার বোধ কতদূর লাভ করিয়াছে তাহা জানি না, তবে সে যে "ক্যালকাটা একাডেমীর" থার্ড ক্লাশের ছাত্র, অষ্টাদশ বর্ষীয় "বাবু" মিঃ ত্রিলোচন বসু এই বোধ তাহার ভাল করিয়া জন্মিয়াছে তাহা তাহার সাজে সজ্জায়, আচারে ব্যবহারে, কথা ও গানের ভঙ্গীতে সুস্পষ্ট। ত্রিলোচন কাঁচা করিয়া কাজ চেনে না, পাকা করিয়া কাজ চিনিবার জন্য সে প্রতিবৎসর একবার করিয়া ক্লাশে থাকিয়া পরের বৎসর প্রমোশন নেয়। বয়সটা তাই তাহার কিছু বাড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু চেহারা তাহার এত খর্ব যে তাহাকে পনের বৎসরের অধিক বয়সী বলিয়া মনে হয় না।

* * * *

সেদিন প্রথম প্রভাতে দেবমহিমায় পূর্ণ মন্দিরে এক মহামারী কাণ্ড হইয়া গেল। উপেন্দ্রবাবু কাজে গিয়াছিলেন। ত্রিলোচন একাকী ছোট একটি আয়না সম্মুখে রাখিয়া তাহার কোঁকড়ান টেরিকে পিছনে টানিয়া ব্যাক ব্রাস করিবার প্রয়াস পাইতেছিল—এমন সময় হৈ হৈ শব্দ উঠিল। ত্রিলোচন ব্রাস প্রভৃতি ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া এক অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাইল। ভোগ রাঁধিবার ঘর হইতে দুর্বাসা ঠাকুর খুন্তি ভাজিবার পরম ঘি মাখা

খুন্তী তুলিয়া কাহার পিছনে যেন ধাবমান হইয়াছেন; চৈতন্য ঠাকুর "ধর্ ধর্" রবে পাগলের মত উঁহার কাছা ধরিয়া টানিতে টানিতে উঁহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছেন, তাহার পিছনে আসিতেছেন মাধব ঠাকুর ও দয়াল। বুড়া ঠাকুর তাঁহার জিওমেট্রির লাইনের মত দৈর্ঘ্যসর্বস্ব দেহের অনেকখানি উঁচুতে এতটুকু একখানি গামছা পরিয়া উঠানের কলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন। অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণগণ যখন কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পুনরায় দেবতার ভোগ রাঁধিতে ফিরিয়া আসিলেন তখন বোঝা গেল যে স্থূল বুদ্ধি উড়িয়া কামাখ্যাই দুর্বাসার খুন্তীর লক্ষ্য।

দুর্বাসার ক্রোধ বহ্নি সহ্য হইল না, কামাখ্যার কাজ গেল।

* * * *

নূতন চাকর আসিল। বাঙ্গালীর ছেলে, নাম বিভূপদ, বয়স পনের ষোল। চেহারা বেশ বড় সড়, উদরটি যেন কিছু অধিক বড়, পেটের ঠিক উপরেই দুই পাশে দুইখানি পাঁজর দেখা যায়। রং কাল, বড় বড় চোখ, দৃষ্টি দেখিলে মনে হয় না যে এ ব্যক্তি কামাখ্যা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিবে। তাহার উপর ইহার হাসিটি একটু অপরূপ বস্তু; কথা নাই বার্ত্তা নাই মধ্যে মধ্যে একাণ হইতে ওকাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মুখবিবর খুলিয়া উঁচু নীচু ফাঁক ফাঁক দাঁতে সে সবিনয়ে হাসে।

তাহার বৃদ্ধ পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্রবাবুর কাছে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ হাত জোড় করিয়া কহিল—"একবার রেখে দেখুন বাবু ছোট হলেও ছেলে আমার বড় কাজের। বড় বুদ্ধিমন্ত। নিতান্ত দুরবস্থা বলেই কাজে দিয়েছি, নয়ত বিভূ আমার পাশ করে জলপানি পেত।"

উপেন বাবু মাটিতে উচু হইয়া বসিয়া চা করিতেছিলেন। তিনি বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—"বল কি কর্ত্তা; তোমার তোমার জজ ম্যাজেষ্টর হত আর কি! কিরে কাজ টাজ পারবি তো? এই মন্দির ধোয়া মোছা, বাজার যাওয়া, গঙ্গাজল আনা, পূজোর বাসন মাজা—?"

বিভূ তাহার বিনয়ের হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হুঁ—উঁ।"

ত্রিলোচন চায়ের অপেক্ষায় তক্তার উপর বই খুলিয়া বসিয়াছিল। সে ইহার হাসি দেখিয়া হাসিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল—"আবার হাসি দেখ!" উপেন বাবু তাঁহার নাকি সুর চড়াইয়া বলিলেন—"হাসছিস্ কিরে ব্যাটা, কাজ করতে হবে, খেলা নয়!"

ধমক খাইয়া বিভূর দাঁত বাহির হইয়া থাকিলেও হাসি রহিল না।

তাহার পিতা অনেক বলিয়া কহিয়া, মাহিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া বিদায় লইলেন। পিতার পিছনে বিভূ খানিক পর্য্যন্ত গেল। তাহার কুৎসিত মুখখানি যে কি করুণতায় ভরিয়া উঠিল কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। পিতা শুধু মাতৃহারা, কোমল প্রাণ ছেলেটির কষ্ট বুঝিলেন। তাই বুঝি—"ভাল করে কাজকর্ম্ম করবি, এই তো দুটো পাড়া বাদেই আমি রইলুম," বলিয়া আর একবার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

* * * *

বিভূপদ কাজে লাগিয়াছে। সে যে খাটিতে পারে একথা বোধহয় স্বয়ং দুর্বাসাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহার দোষ সে বোকার মত সত্য কথা বলে। জিনিষ ভাঙিলে অথবা কাজ করিতে ভুলিলে মিথ্যা বলিয়া ঢাকিতে পারে না। তাহার বোকামিতে দুর্বাসা খুসীই হন, কারণ বেশী চতুর হইলে তাঁহার ঠাকুর-ঘরের জিনিষপত্রের উপর হাতটানটা বুঝিতে পারিয়া বাবুদের নিকট বলিয়া দিবার সম্ভাবনা। লক্ষ্মীছাড়া কামাখ্যাটা তো ওই কার্য্যই করিত বলিয়া দুর্বাসার ধারণা। একদিন স্পষ্টই সে দুর্বাসাকে চোর বলিয়াছিল।

তাহাকে সকলের যেমনই লাগুক বিভূর মনিবকে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। সকালে ইহার শ্বেতপাথরের চাতাল ধুইয়া দিলে পর যখন সমস্ত দিক ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করে তখন বিভূর প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। ইহার সমস্ত কাজই করিতে তাহার ভাল লাগে আর ভাল লাগে ঐ সরকার বাবুর পুত্র ত্রিলোচনকে। ছিপ ছিপে ফরসা ছোট ছেলেটি, কেমন পড়ে, কত ইংরাজী জানে, কেমন গান করে, কেমন সুন্দর কোঁকড়ান চুল। মোটের উপর বিভূর নিকট ত্রিলোচনের সবই সুন্দর।

ত্রিলোচন নূতন ভৃত্যের হাসিটি দেখিয়া প্রথম তাহার প্রতি মন দেয়। তবে সে মন দেওয়াতে বিশেষ সাধু-সদয় ছিল না। মজা দেখিবার অভিপ্রায়ে সে প্রথম প্রথম এই "পাড়াগেঁয়ে ভূতটিকে," "হেই" "এই" "ওরে জানোয়ার" প্রভৃতি মধুর নামে সম্বোধন করিয়া; "এটাকে কি বলে বল্?" "ওমুকটা দেখেছিস্ কখনও?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিত। ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল বিষ্ণুর বিমুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টি, তাহার সামান্য জ্ঞানের পরিচয়ে বিষ্ণুর নির্ব্বাক বিস্ময় এবং সর্ব্বোপরি সকল কাজে বিষ্ণুর তাহাকে প্রাধান্য দান ও বিষ্ণুর ক্ষুদ্র জগতের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাহারই নিকট জানিতে আসা দেখিয়া কখন কেমন করিয়া যে এই অসভ্য অভদ্র ছেলেটির প্রতি তাহার মনটা ভিজিয়া গেল তাহা সে নিজেও জানিতে পারিল না। জ্ঞানের জন্য সে স্কুলের বন্ধু বা পাড়ার বন্ধু কাহারও নিকট প্রাধান্য পায় নাই, ঠাকুর মহাশয়দের কাছে কখনও সে একটা আধটা ইংরাজী কথা ঝাড়িয়া দেয় বটে কিন্তু উঁহারা তেমন রসগ্রহণ করিতে পারেন না। এহেন অবস্থায় কেহ যদি তাহার জ্ঞান-সমুদ্র দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে একমাত্র প্রামাণিক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করে তবে সে যে তাহার প্রতি একটু অনুরক্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

* * * *

সেদিন রবিবার। দুপুরে ত্রিলোচন বারান্দায় বসিয়া তাহার নূতন জুতায় কালি মাখাইতেছিল। পিতার কৃপণতার জন্য ত্রিলোচন বাবুকে এসব কাজগুলি নিজে হাতেই করিতে হয়। সে একমনে কালি মাখাইতেছে এমন সময় কাজকর্ম্ম সারিয়া বিষ্ণু আসিয়া পোষা কুকুরের মত তাহার কাছে বসিল। বিষ্ণু আসিলেই ত্রিলোচন যেন কেমন আপনার অপার মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়ে ও তদনুরূপ মুখের ভাব প্রকাশ করে। সে দেখিয়াও দেখিল না, কেবল আপন মনে বলিল—"মুচি ব্যাটাদের দেখা নেই, এমন জুতো পরে কখনও ভদ্র লোক বেরুতে পারে। আজকে আমার একবার ওখানে যেতে হবে।"

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিল—"আজকে কোথায় যাবে?

ত্রিলোচন কহিল—"সিনেমায়।"

বিষ্ণু কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—"থেটারে যাবে? বাবা বলে থেটারে—"

"থেটারে নয়রে ইডিয়েট থেটারে নয়, সিনেমায়, বায়স্কোপে—"

বিষ্ণু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"অ। আমার দাওনা আমি মুচিদের মতন বুরুস ঘসে দিই। তুমি কত্ত আস্তে ঘসচ।"

ত্রিলোচন তাচ্ছিল্যভরে কহিল—"ওঃ আমার থেকে উনি ভাল করে ঘসবেন। খালি চাষার মত গায়ের জোর দিলেই যদি জুতো বুরুস হতো—" কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ত্রিলোচন প্রাণপণে ঘসিতে লাগিল। বিষ্ণুর চক্ষে হীন হইয়া যাওয়া অসহ্য ব্যাপার। বিষ্ণু খানিকক্ষণ পরে তাহার ঘর্ম্মাক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"দাও না আমায় আমি করে দিই।"

ত্রিলোচন ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই জুতাটা তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল—"নে দেখ পারিস কিনা।"

বিষ্ণু সাগ্রহে জুতা ও বুরুস কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"বাকাদের মামার বাড়ীর দেশে একটা মুচি—"

ত্রিলোচন ধমক দিয়া বলিল—"নে নে তোর বাবার গল্প দিন রাত ধরে আমার শোনবার সময় নেই। চট করে, করে দে।"

বিষ্ণু কথা বন্ধ করিয়া, ঘাড় একদিকে হেলাইয়া জুতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিপ্রহরের আহার শেষ করিয়া ঠাকুর মহাশয়রা উঠানের কলে আঁচাইতে আসিতেছিলেন। রসিকতাপ্রিয় মাধব ঠাকুর বারান্দায় তাহাদের মুখোমুখি বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ত্রিলোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কি গো কর্ত্তা দুপুর বেলায় কি চাকর বাকরকে বিদ্যে দান করা হচ্ছে নাকি?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট গলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

"সখীরে যাহার সহিত যাহার পিরিতি
সেই সে পরাণে জানে।"

বৈরাগী ঠাকুরকে আর সর্দ্দিদের ভোগ হইতে অনেক-

খাঁনি ময়দা সন্নাইতে পারিবার দরুণ বড়ই খোস মেজাজে ছিলেন। তিনি বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া বলিলেন "ও জানোয়ারটা আবার জুতো বুরুষ করতে পারে নাকি? হ্যাঁরে তুই কাল বাবুদের ওখানে গিছলি?"

বিভু বলিল—"হ্যাঁ। কর্ত্তা বাবুর সঙ্গে দেখা হল।"

"তিনি কি বল্লেন?"

"বল্লেন কাল কি পরশু একবার এখানে আসবেন সরকার বাবুর মুখে শুন্‌লেন মন্দিরের কাজ নাকি ভাল হচ্ছে না?"

দুর্ব্বাসা সহসা খাপ্পা হইয়া বলিলেন—"ভাল হচ্ছে না কি রকম শুনি? কে তাঁর কাছে লাগিয়েছে শুনি?"

বিভু ভাল মানুষের মত বলিল—"কেউ লাগায় নি, তিনি কাল পেসাদ খেয়ে বলেছেন যে বামুন—"

আর বলিতে হইল না। দুর্ব্বাসা একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, বিভুর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমরা খাটিয়া খেটে মরব আর তুমি ব্যাটা বাবুদের কাছে গিয়ে লাগাবে—যা ভেবেছি তাই, ব্যাটা তুমি মিটমিটে শয়তান!"

বিভু তো কাঁদিবার জোগাড়। হঠাৎ ত্রিলোচন তাহাদের মাঝখানে পড়িয়া চড়া গলায় বলিল "ও কি করেচে মশায়? আপনারা কাজে ফাঁকি দেবেন আর ওর ঘাড়ে যত দোষ। আমরা কি চোখে দেখতে পাই না?" (সে আপনাকে কর্ত্তা বাবুদের পক্ষের লোক মনে করে)

সরকার বাবু প্রবল লোক, ইচ্ছা করিলে নালিশ করিয়া ব্রাহ্মণদের কাজ ঘুচাইয়া দিতে পারেন, তাই দুর্ব্বাসা তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে কিছু সমীহ করেন। তিনি ত্রিলোচনকে রাগিতে দেখিয়া "আমাদের কাজে কোন জায়গাটা ফাঁকি দেখিয়ে দিন" প্রভৃতি আরো অনেক কথা বলিতে বলিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

• • • •

কিন্তু বিভুর উপর তাঁহার যে সন্দেহ হইল তাহা গেল না। কামাখ্যা আপদ ঠাকুরবাড়ী হইতে বিদায় লইবার পর হইতে, চৈতন্য ঠাকুর ও তিনি দুইজনে মিলিয়া মন্দিরে নানা সৎকার্য্য করিতেছিলেন। উপেনবাবু বা ত্রিলোচন কেহই সব সময়ে তাঁহাদের পাহারা দেয় না। বরাদ অভিজ্ঞ অনুগত ভৃত্য—কাজেই যদি এই সব কাজের কথা কেহ বাবুদের কাছে লাগায় তবে সে যে বিভুপদ হইবে একথা চোখ বুজিয়া বলা চলে। তাঁহার সন্দেহ আরো দুই একটা কারণে বাড়িতে লাগিল, চৈতন্যচরণও তাঁহার সহিত এক মত হইলেন।

উপেন্দ্রবাবু রাত্রি দশটার আগে বাবুদের বাড়ী হইতে ফেরেন না। ত্রিলোচন রাত্রে কোথায় পিতার পরিচিত মাষ্টারের বাড়ী পড়িতে যায়, সুযোগ বুঝিয়া সৌখীন চৈতন্যচরণ তাঁহার এক সৌখীন গায়ক বন্ধুকে তাঁহাদের কীর্ত্তনের আসরে আনিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বন্ধুটি যে স্থলে রাধাকৃষ্ণের নাম করিবার আজ্ঞা ছিল সেই স্থলে ভাল ভাল আধুনিক গান ও সাকী সরাব সমাচ্ছাদিত গজল গাহিতে আরম্ভ করিলেন। খবরটা কেমন করিয়া যেন সরকারবাবু ও কর্ত্তাবাবুদের কানে গেল। একদিন রাত্রে হঠাৎ উপেন্দ্র বাবু আসিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের যাহা মুখে আসিল তাই বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন।

এমনই সব ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। চৈতন্য ও দুর্ব্বাসা ঠাকুর স্থির জানিলেন যে সরকার বাবুর ছেলের আদুরে চাকর বন্ধুটিই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের মূল। বিভুর জীবন যতপ্রকারে পারা যায় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন না, এবং কি সূত্র ধরিয়া ইহাকেও বিতাড়িত করা যায় তাহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিত্য তাড়না সহ্য করিয়াও বিভুপদর দিন কিন্তু মন্দ কাটে না। ত্রিলোচন যেন ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের নিজ ক্ষমতা দেখাইবার জন্যই যখন তখন বিভুর পক্ষ লইয়া তাহাকে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করে। বিভু শুধু কৃতজ্ঞ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। ত্রিলোচনের মত ছেলে তাহার বন্ধু। ছুটির দিনে দুপুরে, বারান্দায় তাহার পাশে শয়ন করিয়া সে মুগ্ধ ভাবে তাহার স্কুলের গল্প ও ফুটবল ম্যাচের গল্প শোনে। বিকালে ত্রিলোচন যেদিন বেড়াইতে যায় সে সেদিন সমস্ত তাহাদের ঘর ঝাঁট দিয়া কুঁজায় জল তুলিয়া, বিছানা করিয়া, ত্রিলোচনের বইপত্র ঝাড়িয়া তাহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করে। উপেনবাবু মনে মনে বিভুর প্রশংসা করেন। যেদিন বিকালে ত্রিলোচন ছাদে ঘুড়ি ওড়ায়, বিভু তাড়াতাড়ি

কাজ সারিয়া তাহার ঘুড়ি জুড়িয়া দিতে, সুতা ধরিতে ও ধরাই দিতে ছাদে চলিয়া আসে। বিভুর প্রেমের বন্যায় পড়িয়া ত্রিলোচনও ভুলিয়া যায় যে সে "বাবু" ও বিভু ভৃত্য। প্রেম আসিয়া তাহাদের পায়ের তলার উচ্চ নীচ ভূমি ভাঙিয়া সমতল করিয়া দেয়—তখন বিমুগ্ধ দুইটি কিশোর চিত্ত দেখে যে তাহারা পরস্পরে পরস্পরের ভালবাসিবার পাত্র এই মাত্র, আর কিছু নয়।

নীচে রাধাশ্যামের পুষ্পসজ্জা করিতে করিতে মাধব ঠাকুর গাহিতে থাকেন—

"পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥"

বিভু আসিবার পূর্ব্বে ঠাকুর বাড়ীতে একবার রাধাশ্যামের স্বর্ণালঙ্কার চুরি গিয়াছিল। বিভুর আসিবার পর আর একবার গহনা চুরি গেল। কিছুদিন তাই লইয়া মন্দিরে মহা গোলমাল—খোঁজ খবর পুলিশ তদন্ত চলিল। সকলেই স্থির করিলেন যে মন্দিরের কাহারো সহিত চোরের ষড়্যন্ত্র আছে। কিন্তু সে ব্যক্তি কে তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। সকলেই দ্বারবানজীর প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি ফেলিল। কেবল দুর্ব্বাসা ঠাকুর পৈতা স্পর্শ করিয়া কহিলেন যে এ ঐ মিটমিটে শয়তান বিভুপদর কাজ যদি না হয় তাহা হইলে তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিবেন। বিভুপদ সে দিন অনেক করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিল কিন্তু শেষে দুর্ব্বাসার গলার তেজে ও চৈতন্যের হাসি বিদ্রূপের বন্যায় হার মানিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে ত্রিলোচনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ত্রিলোচনের সেদিন কিসের ছুটি ছিল। সে বেলায় আহার সারিয়া একখানি বাংলা উপন্যাসে ডুবিয়াছিল। বইখানি শেষ করিয়া চোখ তুলিতেই তাহার বিভুর অপমানিত ক্ষুব্ধ মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখনো তাহার উপন্যাসের ঘোর কাটে নাই, উপন্যাসের নায়ক তখনো তাহার বুকে জীবন্তভাবে বর্ত্তমান, সমস্ত শুনিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। বটে, অসহায় নিরীহের প্রতি অত্যাচার! সে বীরদর্পে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের তাসের আড্ডায় গিয়া হাজির হইল এবং রুদ্রগম্ভীর স্বরে বলিল—"আমি এই বলে দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা ফের যদি চুরির কথা নিয়ে বিভুকে কিছু বলেন তাহলে······তাহলে······আপনাদেরই একদিন কি আমারই একদিন।" ত্রিলোচন যতখানি উপন্যাসের নায়কের ভঙ্গীতে কথাটা বলিতে চাহিয়াছিল ততখানি হইল না, উপরন্তু যেন একটু খারাপই হইল, দেখিয়া সে ক্ষুণ্ণ হইল। উপন্যাসের লোকগুলা অত ভঙ্গী করিয়া কথা বলিতেই বা কেমন করিয়া শেখে! কিন্তু কথার কায়দা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের ছিল না, যেটুকু কায়দা সে দেখাইয়াছিল, তাহাই সেই ব্রাহ্মণ রূপ বারুদে অগ্নিকণার কাজ করিল। মহা কোলাহল উত্থিত হইল। এইবার কিন্তু ত্রিলোচন উপন্যাসের ভঙ্গীটি হুবহু নকল করিতে সমর্থ হইল। সে আর কোন কথা না বলিয়া "ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।" ব্রাহ্মণগণের উপর এই ভঙ্গীটি কার্য্যও নেহাৎ কম করিল না। তাঁহারা কিছুকাল আন্দোলন করিলেন পরে তাহার গুরুগম্ভীর ভাবে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া থামিয়া গেলেন। সরকারের পুত্রকে শঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

এই সাফল্যে যেমন ত্রিলোচন গর্ব্বিত হইল তেমনি বিভু কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হইল। বিভুর ত্রিলোচনের প্রতি ভালবাসা যেন আরো নিবিড় হইল। ত্রিলোচনের যেন বিভুর উপর অধিকার আর একটু কায়েমী হইল।

* * * *

বিভু চাকর, তাহার উপর বোকা। তাই তাহার জগতে বাবা, ঠাকুর, মন্দির, অত্যাচারী পুরোহিতের দল ও ও হৃদয়ের বন্ধু ত্রিলোচন ভিন্ন কেহ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ত্রিলোচনেরও পড়া, স্কুল, খেলা ও বিভুপদই একমাত্র চিন্তা ছিল। ত্রিলোচনের জগৎ এত ছোট হইতে পারে না; সে প্রথমতঃ বাবু এবং দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত বুদ্ধিমান; কাজেই বিভুর চিন্তা যখন কেবলই ত্রিলোচনের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিত, ত্রিলোচনের মন তখন ছুটিত নানা পথে। ইহার দুই একটি পথের

সন্ধান আমরা জানি। একটি, তাহার উপন্যাস জর্জ্জরিত অষ্টাদশ বর্ষীয় মন সহসা রোমান্স ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়, তাহার নবীন গুম্ফোদ্গমন সম্ভাবনায় উৎফুল্লিত ঠোঁট দুইটি আজকাল লুকাইয়া চুরাইয়া একটা আধটা সিগারেট চাপিয়া ধরিতে শিখিতেছিল। এই দুইটা কাজ না করিলে কিছুতেই যেন বড় হওয়া যাইতেছে না, ইহাই ত্রিলোচনের স্থির ধারণা। সিগারেটটা প্রায়ই স্কুল পালাইয়া পথে ঘাটে, পার্কে বন্ধুদের সহিত চলিত। কিন্তু রোম্যান্স ব্যাপারটার জোগাড় হইয়া গেল ভাগ্যক্রমে বাড়ীতেই। ঠিক বাড়ীতে নয়, পাশের বাড়ীতে। সেখানে একজন নিরীহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক কিছু কাল হইল পুত্র কন্যা লইয়া ভাড়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা রাণীকে স্কুলে যাইবার সময় ত্রিলোচন একদিন দেখিয়া ফেলিল। স্কুলে পড়া, জুতা পরা, ঘুরাইয়া কাপড় পরা, সুন্দরী সপ্রতিভ রাণী—ত্রিলোচন তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কি বুঝিয়া লইল এক মুহূর্ত্তেই। রোম্যান্স চলিল পুরাদমে—, তাহার রকম দেখিয়া ওবাড়ীর ছাদে রাণী ও তাহার ছোটবোন মিনি যখন হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে থাকে, তখন ত্রিলোচন এ ক্ষেত্রেও আপনার সাফল্যে গর্ব্বে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। বিকালে চুল আঁচড়াইতে, ধুতি পরিতে ও সার্ট গায়ে দিতে আজকাল প্রচুর সময় ব্যয় হইতে লাগিল। এবং তাহারই জন্য (?) সন্ধ্যায় আর কোথাও না গিয়া ত্রিলোচন মল্লিকের ছাদেই ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশ্য মুখখানা তাহার সর্ব্বদাই ওবাড়ীর ছাদের দিকে থাকিত। কিন্তু "চোখের ভাষায়" আর কতদিন চলে? একদা নিরিবিলি দুপুর বেলায় বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া ত্রিলোচন একখানি অতি মনোজ্ঞ প্রেম-পত্র রচনা করিল। এবং সে লিপিখানি সযত্নে প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে প্রেরণেও বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু ভাগ্য বাম, দেবী তুষ্টা না হইয়া কিঞ্চিৎ রুষ্টা হইলেন। তাই সেই "বুকের রক্তে লেখা" লিপিকাখানি নায়িকার ভ্রাতার দ্বারায় নায়কের পিতার নিকট পহুঁছিল। এবং তাহার সাথে আসিল কতগুলি অকথ্য হৃদয়হীন কথা। ত্রিলোচন বেচারী তাহার প্রেম-পত্রের এই দ্বিতীয় গতির সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। উপেন বাবু যখন রাণীর ভ্রাতাকে "কিছু মনে করবেন না মশায়, লক্ষীছাড়া ইস্কুলে বদসঙ্গে মিশে ওরকম হয়েছে, আচ্ছা আমি বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দেব—" বলিয়া নীচের ঘরে বিদায় দিতেছিলেন, তখন সে নিয়তির পরিহাসে, ছাদে বসিয়া রাণীদের ছাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বহু কষ্টার্জ্জিত একটা সিগারেট টানিতেছিল। তখন বৈকাল হইয়া আসিয়াছে, ছাদে উঠিলেও উঠিতে পারে এই আশায় সে বারে বারে নানা ভঙ্গীতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছিল। বিভুপদটা ঠিক এই সময়ে কোথা হইতে "আজ উই কাল ঘুড়িটাকে কাটিতেই হবে লোচন" বলিয়া ছাদে উঠিয়া আসিল। কিন্তু লোচনের হাতে সধূম সিগারেট দেখিয়া সে চমকাইয়া এতটুকু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকি তুমি সিগরেট খাচ্ছ?" ত্রিলোচন পরম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া, টোকা মারিয়া সিগারেটের ছাই ফেলিতে ফেলিতে কহিল—"খাচ্ছি তো কি হয়েছে রে ক্যাবলা? সব বাবুরাই তো খায়। না বিশ্বাস হয় তো দয়ালকে জিগেস্ কর্।"

দয়াল ত্রিলোচনের কুকর্ম্মের সঙ্গী, কারণ ইহার দাম স্বরূপ সে মধ্যে মধ্যে সিগারেট প্রসাদ পায়। সে ছাদ ঝাঁট দিতেছিল, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে বলিল—"আরে তুমি তো তবু বড় হয়েছ লোচন বাবু। আমাদের কর্ত্তাবাবুর ছোট ছেলে তো সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে ছিগরেট খাচ্ছেন।" তাহার পর বিভুর দিকে ফিরিয়া কহিল—"অমন করিস কেন? চোখে কি দেখিস্ না সব বাবুই ছিগরেট টানে? লোচন বাবু কি তোর মতন, উনি যে ভদ্দর লোক।" বোকা বিভুপদ আর আপত্তি করিল না। খুসী মনে সে ঘুড়ি ওড়ানর আলোচনায় মত্ত হইল। এই সময়ে নীচে দুর্ব্বাসা ঠাকুর তাহাকে ডাকিতেছেন শোনা যাওয়াতে সে উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। নীচে নামিতেই তাহার দেখা হইল উপেন বাবুর সঙ্গে। তাঁহার হাতে একখানা কাগজ—মুখ ঝড়ের পূর্ব্বের আকাশের মত। তিনি ডাকিলেন—"বিভু শুনে যা!" বিভু ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে যাইলে পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোচন ছাতে কি করচে ঠিক করে বল্।

বিভু শুষ্ক মুখে বলিল—"কই কিছু তো করেনি।"

উপেন বাবু প্রচণ্ড ধমক দিলেন—"আবার মিথ্যে কথা বলে—"

বিভু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"সে তো ঘুড়ি জুড়চে আর সিগরেট খাচ্ছে, আর কিছু তো করে নি।"

উপেন বাবু আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—"কি করচে?"

বিভু নিতান্ত সরল ভাবে এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া বলিল—"শুধু সিগরেট খাচ্ছে আর ঘুড়ি জুড়চে।"

দুইটা কাজের মধ্যে একটাও যে আপত্তিজনক হইবে তাহা বিভূপদর ধারণা ছিল না। সিগারেট সম্বন্ধে তাহার ভুল ধারণা এই মাত্র ত্রিলোচন দূর করিয়া দিয়াছিল, এবং ঘুড়ি জোড়া প্রায়ই ত্রিলোচন উপেনবাবুর সম্মুখেই করে। কিন্তু সে সভয়ে দেখিল উপেনবাবু যেন রাগে ফুলিতে ফুলিতে ছাদে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের রক্ত-ওঠা পয়সা সিগারেট খাইয়া নষ্ট করার অপরাধ, ত্রিলোচনের প্রেমপত্রাঘাতকেও ছাড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিল ত্রিলোচনের আর্তনাদের শব্দ, আর উপেনবাবুর নির্দ্দয় কীল চড়ের শব্দ। বিভু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ছাদে ছুটিল। মাধব ঠাকুর প্রভৃতিও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। কিন্তু উপেন বাবু সেদিন রাগিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার হাত হইতে ত্রিলোচনকে রক্ষা করা কাহারও সাধ্য হইল না। মাধব ঠাকুর ধরিতে গিয়া ধমক খাইয়া পিছাইয়া আসিলেন। দুর্ব্বাসা দূর হইতে বলিতে লাগিলেন—"আহা ছেলে মানুষ! করেন কি সরকার মশায়!" ইত্যাদি। চাপা হাসি তাঁহার অধর প্রান্তে বুঝি আর চাপা থাকে না। কেবল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ভীষণ প্রহার দেখিবার সাধ্য বিভূপদর ছিল না সে মধ্যে মধ্যে বাঘের মত আসিয়া ত্রিলোচনকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, ও ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া উপেনবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া খুন হইতে লাগিল।

* * * *

এই ঘটনার পর ত্রিলোচনের, সংসারের সকলের প্রতি মন রাগে ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। রাগ হইল ও বাড়ীর "লক্ষ্মী ছাড়া" মেয়েটার উপর, রাগ হইল পিতার উপর, রাগ হইল বামুন ঠাকুরদের উপর যেহেতু তাঁহারা তাহার গম্ভীর "ভারিক্কি" চালের করুণ অবস্থাটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছেন। আর রাগ হইল বিভূপদর উপর; হতভাগাটা কিনা শেষে এত উপকারের এই প্রতিদান দিল! তোর পিতার নিকট সিগারেটের কথা বলিবার দরকারই বা কি ছিল! এখন আবার ভাল মানুষ সাজিবার চেষ্টা! সব শয়তানী, সে জানিয়া শুনিয়াই, পিতার কাছে তাহার সিগারেটের কথাটি লাগাইয়া দিয়াছিল। ত্রিলোচনের রাগ আর কাহারও উপর ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ না পাইয়া বিভুর উপরই প্রচণ্ড ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। যখন তখন ধমক গালাগাল, মুখ ভেঙচানির অন্ত রহিল না। এখন সে দুর্ব্বাসাকে সর্ব্বদাই বিভুকে শাস্তি দিতে উৎসাহ দেয়। বিভু সব বুঝিতে পারে—অথচ কিছু করিবার তাহার উপায় নাই—"বড়র প্রেম বালির বাঁধ" সে কি করিবে?

ইতিমধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটিল। চৈতন্যচরণ সন্ধ্যা-রাত্রে আরতি সারিয়া ঘরে আসিয়া পাঁচ টাকার নোট সমেত চাদরখানি কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলেন না। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ হইল। শেষে স্থির হইল চুরি গিয়াছে। বাহির হইতে আরতি দেখিতে অবশ্য অনেক লোকই এ সময় মন্দিরের চাতালে জড় হয়—বহু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে উঠানে হুড়াহুড়ি করে—কিন্তু তাহারা কেহই ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের ঘরের দিকে যায় না—উপরন্তু এই সময়টা দ্বারবানজী খুব সতর্কভাবে চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে। কাজেই যদি চুরি গিয়া থাকে তবে বাড়ীর কাহারও দ্বারাই গিয়াছে। যে ব্যক্তি ঠাকুরের গহনা সরাইয়াছে সেই ব্যক্তিই আজিকার কাজ করিয়াছে। এখনও গহনা চুরির তদন্ত চলিতেছে ইহারই মধ্যে তাহার বুকের এত বড় পাটা যে ছোট ছোট চুরি চালাইতেছে। নানা আলোচনা ও জল্পনা হইতে লাগিল—বিভূপদ তখন বাড়ী ছিল না—গঙ্গা জল আনিতে গঙ্গায় গিয়াছিল। দুর্ব্বাসা মাথা নাড়িয়া উপেনবাবুকে বলিলেন—"এমন কাজ ঐ বোকা হারামজাদা বিভু ছাড়া আর কে করবে মশায়? আমি বল্লে তো বিশ্বাস করবেন না কেউ,

ঐ রোজ আপনার ঘরে কাজ করে করে আপনার মন রাখে, ঐ একদিন দেখবেন কি হারাবে—ঘটুটে বাটুটে। আর দেখুন না ব্যাটা যদি নাই নিয়ে থাকবে তো এই রাতদুপুরে গঙ্গায় যাবার মানে কি? জিনিষটা সরিয়ে ফেলবার ছল বইতো নয়!"

কথাটা সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে বোধ হইল। এই সময় ভারী জলের ঘড়া মাথায় লইয়া বিভুপদ রঙ্গস্থলে আসিয়া পঁহুছিল। চৈতন্যঠাকুর তাড়াতাড়ি উহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, যেন চোর ধরা পড়িয়াছে। জেরা আরম্ভ হইল—"কোথায় গিয়েছিলি? ঠিক করে বল?"

বিভু অবাক হইয়া বলিল—"কেন গঙ্গাজল আনতে!"

দুর্ব্বাসা মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন—"ব্যাটা তুমি চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি! গঙ্গায় তোমায় ডুবিয়ে মেরে ফেলে দেব। এই রাতদুপুরে তুমি গঙ্গাজল আনতে গিয়েছিলে? ঠিক কথা বল্ কোথায় ফেলি টাকা আর চাদর?"

বিভু বুঝিতে পারিল চুরি গিয়াছে—সে সভয়ে বলিল —"আমি তো জানি না ঠাকুর মশাই কি চুরি গেছে। আমি তো সেই সন্ধেবেলা বেরিয়ে গেছি।"

"তোমার বেরুন জন্মের মত বের করে দেব হারামজাদা।" দুর্ব্বাসা ঠাকুরের প্রচণ্ড এক গাঁট্টা বিভুর মাথায় পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আর দুচারখানা হাতও কাজ আরম্ভ করিল। বিভু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উপেন বাবুকে বলিল— "আমি কিছু জানি না বাবু, কেন আমায় মারছেন?"

উপেন বাবুর মন এই ছেলেটার প্রতি প্রসন্ন ছিল। কিন্তু দুর্ব্বাসার যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার উপর চুরির সন্দেহ পড়িতে পারে। তাই দোলায়মান চিত্তে তিনি বলিলেন—"ওহে আগেই মারধোর করছ কেন কথাটা ভাল ভাবে প্রকাশ করে কিনা দেখ না।"

ত্রিলোচন সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া সেইমাত্র বাড়ী ফিরিতেছিল—উঠানে জনতা দেখিয়া সে কৌতূহলী হইয়া দেখিতে আসিয়াছিল ব্যাপারটা কি। দয়ালের নিকট সংক্ষেপে সব শুনিয়া সে খুসী হইল। লক্ষ্মীছাড়া বিভুপদর আজ ঠিক হইয়াছে। সে পিতার কথার উপর কথা বলিয়া ফেলিল উত্তেজনায়—"ওকে মার লাগানই ঠিক। ওই নিয়েচে। আজ সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর মশাইদের ঘরের সামনে আমি ওকে দেখেছি।"

সহসা ত্রিলোচনের গলা পাইয়া বিভু ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে বড় একটা আজকাল তাহার সহিত কথা বলে না। এই অসময়ে যদি বা কথা বলিল তাহাও তাহার বিরুদ্ধে। বিভু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সে তো বিকেল বেলায় ঝাঁট দিতে গেছলুম।"

ত্রিলোচন আগাইয়া আসিয়া বলিল—"বিকেল আবার কোথায়,—এই তো সন্ধ্যাবেলায় বের হবার আগে আমি দেখলুম মশায় ও চুপি চুপি চৈতন্যঠাকুরদের ঘরে ঢুকছে, আমি মনে করলুম কোন কাজ কর্ত্তে গেল বুঝি।" এমন নির্ব্বিকার চিত্তে যে তাহার ভালবাসার বন্ধু নির্দ্দোষীর নামে মিথ্যা কথা বলিতে পারে তাহা বিভুপদর ধারণা ছিল না। বিস্ময়ে তাহার কান্না থামিয়া গেল। সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমায় ঘরে ঢুকতে দেখেছ?"

ত্রিলোচন তাচ্ছিল্যভরে অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া বলিল—"দেখেচি না তো মিথ্যে করে বলচি? মিথ্যে বলে আমার লাভ কি?"

বিভুপদ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি বলচ? নিজের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি?"

ত্রিলোচন উত্তর দিবার আগেই দুর্ব্বাসা আর চৈতন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"বুকে তোমার হাত দেওয়াচ্ছি! ব্যাটা চোর, মিটমিটে শয়তান!" তাহার পর সেই অতটুকু ছেলের উপর যে প্রহার চলিতে লাগিল তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য, এবার বিভুর মুখ দিয়া না বাহির হইল শব্দ, না বাহির হইল চোখ দিয়া জল। কাঠের মত শক্ত হইয়া সে পড়িয়া মার খাইতে লাগিল। শেষে দারবানজী ও উপেন বাবু আসিয়া না ধরিলে বোধ হয় ক্রোধোন্মত্ত লোককয়টা তাহাকে একেবারে শেষ করিয়া ছাড়িত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপেনবাবু নিরীহ প্রকৃতির বিভুকে একটু ভাল চোখেই দেখিতেন, তিনি বলিলেন—"থাক

থাক আজ এই পর্য্যন্তই থাক। কাল যদি ও কোথায় টাকা আর চাদর রেখেচে দেখিয়ে না দেয় তো……”

দুর্ব্বাসা ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন—“ও কি আর রেখেচে মশায়! সে কোন কালে পার করে দিয়েচে। ওর জেল হওয়া উচিত। কাল আপনি পুলিশে খবর দেবেন। আজ একটা ঘরে বন্ধ থাক।”

বন্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল না—কারণ বিভুর পালান দূরের কথা, চলিবার শক্তি ছিল না। দ্বারবানজীর পার্ব্বত্য কঠিন মনেও তাহার প্রতি দয়ার সঞ্চার হইল। অতগুলো লোক মিলিয়া এই এতটুকু একটা ছেলেকে মারা সে যেন ভাল বরদাস্ত করিতে পারে না। সেই কোনমতে হাত ধরিয়া তুলিয়া বিভুপদকে তাহার শুইবার জায়গায় পৌঁছাইয়া তাহার মলিন বিছানাটাকে পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গেল।

ত্রিলোচন ভাবিয়াছিল বিভু মার খাইলে তাহার মন বুঝি আনন্দে আপ্লুত হইয়া যাইবে। কিন্তু তেমনটি ঠিক হইল না। সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া জাগিয়া বিভুর অস্ফুট গোঙানির শব্দ শুনিয়া, বিছানায় কেবল এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল।

* * * *

সকালে উঠিয়া ত্রিলোচন শুনিল ঘরের সম্মুখের বারান্দায় কে যেন করুণ স্বরে তাহার পিতার নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছে। চৈতন্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণেরও গলা পাওয়া গেল। সে বুঝিল সকাল হইতে কাক চিলের মুখে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে এবং বিভুর বাবা আসিয়া তাহার পিতার নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছে—“বাবু মশায়রা, ছেলেমানুষ যদি একটা কাজ করেই ফেলে থাকে তাহলে আপনারা কি ক্ষমা ঘেন্না করবেন না? ওর শাস্তি তো যথেষ্ট হয়েচে বাবারা। আর পুলিশ-ফুলিশের হেঙ্গামা নাই করলেন।”

বিভুর পিতা পুলিশ হাঙ্গামাকে বড়ই ভয় করিত। এবং কেই বা না করে!

চৈতন্য দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—“পুলিশ হাঙ্গামা করব না ত আমার পাঁচ পাঁচটা টাকা আর তিন্ টাকা দামের চাদরখানা কি অমনি যাবে? মাগ্না পেয়েচ তোমার নবাব পুত্তুর ছেলে দিয়ে দিক না?”

দুর্ব্বাসা ঠাকুর কহিলেন—“দেবে! ও বাবা! কি রকম একগুঁয়ে হারামজাদা—এখনও সেই এক কথা ‘আমি নিইনি তো’।”

“নিস্‌নি তো ত্রিলোচনবাবু কি মিথ্যে বল্লেন শুয়ার।”

ত্রিলোচনের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল, সে শুনিল বিভুপদ কোথা হইতে যেন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—“সে মিথ্যে কথা বলেচে।”

সে কথা বলিবামাত্র আবার তাহার জর গায়ের উপর বোধ হয় মার চলিত, কিন্তু তাহার পিতা হাতজোড় করিয়া নাকে খৎ দিয়া বহু কষ্টে তাহাকে রক্ষা করিলেন। এবং শেষে স্থির হইল যে বিভু দুই মাস বিনাবেতনে কাজ করিবে এবং তাহার দুই মাসের মাহিনার দ্বারায় চৈতন্যের ক্ষতি-পূরণ হইবে। এই দুইমাস পরে বিভু চলিয়া যাইবে। এই আপোষ হইবা মাত্র দুর্ব্বাসা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—

“আপনারা রাধাশ্যামজীর গয়না চুরির কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন উপেনবাবু? আমার মনে হয় একবার পুলিশে খবর দিলে ভাল হত। চোর যদিও বাইরে থেকে এসেছিল বোঝা গেচে, তা হলেও তার যে এর সঙ্গে সড় ছিল একথা আমি বহুকাল থেকেই বলেচি।”

বিভুর বাবা বিভুর মাথায় হাত দিয়া বলিল—“আমি এই আমার একছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলচি বাবু যে সোনার গয়নার কথা ও জানে না। ও আমার তেমন ছেলে নয়—” পাড়ার যে দুই একটি ছেলে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—“না ও ছেলেটি তোমার হীরের টুকরো।”

আর একজন যোগ করিল—“খালি হাতটানটা আছে ওই যা।”

সরকার বাবু তাহাদের হাঁকাইয়া দিয়া বলিলেন—“যা যা তোরা, এখানে কি কত্তে এয়েচিস্?” দ্বারবানজী তাড়া দিতেই তাহারা পলাইল। দুর্ব্বাসা আবার গহনা চুরির কথা তুলিলেন, তখন দ্বারবানজী হিন্দীতে বলিল যে পুলিশ

তো, সে ব্যাপার তদন্ত করিবার সময় সকলকেই জেরা করিয়াছে এবং সকলেরই নাম ধাম লিখিয়া লইয়া গেছে এবং কাহার উপর সন্দেহ হয় তাহাও বাবুকে বলিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে এ চাকরবাকরের কাজ নয়। থাকিলে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের মধ্যেই চোরের ষড়যন্ত্র থাকার সম্ভাবনা—কারণ গহনা কোথায় থাকে এবং চাবী কোথায় থাকে ইত্যাদি ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরাই জানেন, চাকরেরা তাহার কিছুই জানে না।”

দুর্ব্বাসার দল খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। দ্বারবানও যে সাধু হইতে পারে না তাহা লইয়া বিস্তর বিতণ্ডা চলিল। এবং এই গোলমালে বিভুর পিতা আর একবার সরকার বাবুর পায়ে ধরিয়া বিভুকে লইয়া গিয়া তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

সরকার বাবুর কৃপাতেই সে যাত্রা বিভু দুর্ব্বাসা কোম্পানীর কোপ হইতে বাঁচিল। সরকার বাবুর কেমন যেন ধারণা হইয়াছিল যে বিভু দোষী নয়। অনেক কাল অনেক লোক চরাইয়া মানুষ চিনিবার একটু শক্তি তাঁহার হইয়াছিল। তবু দুর্ব্বাসাদের প্রবল আক্রোশ এবং নিজ পুত্রের সাক্ষী তাঁহাকে বিভুকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাধ্য করিল, এবং দুই মাস বিনা মাহিনায় কাজও করাইয়া লইতে তিনি রাজী হইলেন। ছেলেটা থাকিলে অবশ্য তাঁহার ঢের উপকার করিত—এবং সে চলিয়া গেলে তাঁহার স্বার্থে যে একটু আঘাত পড়িবে তাই ভাবিয়া তিনি চৈতন্ত প্রভৃতির উপর বিশেষ প্রসন্ন হইলেন না। কারণ নূতন যে চাকর আসিবে সে বিনোদবিহারী সাহার মন্দিরেরই কাজ করিবে, বোকা বিভুপদর মত সরকার বাবুর ঘরের কাজ করিতে আসিবে না।

* * * *

মানুষ নূতনের পক্ষপাতী। তাই এই ঘটনাটা একটু পুরাতন হইয়া আসিবামাত্র মন্দিরবাসীগণের ইহা লইয়া আন্দোলনও কিছু কমিয়া গেল। বিভুর জ্বর ভাল হইল। সে আবার উঠিয়া তাহার নিত্য কর্ম্ম করিতে লাগিল, অবশ্য দুর্ব্বাসাদের বাক্যযন্ত্রনা এবং 'উপরি পাওনা'—চড় কীল—যে দ্বিগুণ বাড়িল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পিতার অশ্রু ও অনুরোধ স্মরণ করিয়া বিভু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখ বুজাইয়া সত্যকারের চোরের মতই কাজ করিয়া যায়। কিন্তু আর সকলের কাছে চোরের মত মাথা নীচু করিয়া থাকিলেও বিভুপদ মাথা নামাইল না কেবল একজনের কাছে—সে ত্রিলোচন। সে এমন ভাবে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যায় যেন ত্রিলোচনকে সে চেনে না। তাহার জগতে ত্রিলোচনের যেন অস্তিত্ব নাই। তাহাকে দেখিয়াও সে দেখে না, কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলেও বলে না। এমন কি যখন ত্রিলোচন দুর্ব্বাসাদলের সহিত মিশিয়া তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনায় কথার সুতীব্র 'ফোড়ন' দেয় তখন সে যেন কালা হইয়া থাকে। সকালের শিশিরস্নিগ্ধ আলোয় যখন মন্দিরের সদ্যধৌত শ্বেত পাথরের দালান পূর্ব্বেকার মতই ঝলমল করে তখন বিভু পূর্ব্বেকার মত আর ছুটিয়া ত্রিলোচনকে সেখানে আসিয়া বসিতে বলিতে যায় না। দ্বিপ্রহরে ঠাকুর বাড়ীর থামগুলির কার্ণিসে যখন একটানা পায়রা ডাকিয়া যায় তখন বিভু একাকী বারান্দায় বসিয়া একখানি পুরাতন কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িবার চেষ্টা করে। অথবা উদাস চক্ষে স্তব্ধ নীলাকাশে গতিশীল ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের পানে চাহিয়া থাকে। ত্রিলোচন ঘরে আছে কিনা দেখিতে আর যায় না। বৈকালে চৈতন্ত ঠাকুরদের হাজার রকমের ফরমাসের মধ্যে যদি কোন দিন সে হঠাৎ একটু ফুরসৎ পায়, তো ত্রিলোচনের ঘুড়ির সন্ধানে যায় না; চুপ করিয়া মন্দিরের চাতালে বসিয়া ঠাকুর মশায়দের তাস খেলা দেখে।

কিন্তু এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি? ত্রিলোচনের ইহাতে কিছুই তো আসে যায় না। বিভু ব্যতীত সে যে বাঁচিতে পারে না এমন তো নয়? কিন্তু এইখানেই মস্ত ভুল—বিভু যখন পোষা কুকুরের মত ত্রিলোচনের পায়ে পায়ে বেড়াইত তখন ত্রিলোচনের তাহার প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ভাল হয়ত সে একটু বাসিত—কিন্তু অপর তরফ হইতেই যেন সে ভাবটা বেশী আসিত। ত্রিলোচন যেন কৃপা করিয়া এক ফোঁটা ভালবাসা দিয়া ঐ বোকা হাবা চাকরকে উদ্ধার করিয়া দিত। কিন্তু আজ যখন সেই নির্ব্বোধ পোষা মানুষটি সহসা তাহাকে নিঃশব্দে

তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল তখন তাহার সমস্ত মন তাহারই পিছনে ছুটিতে লাগিল। তাহার অপরাধী মন সহসা আপনাকে বিভু অপেক্ষা অনেক হীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল; তাহার মনে হইতে লাগিল বিভু তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া যেন লোকের চোখে তাহাকে বড়ই নীচু করিয়া দিতেছে। সে যে মিথ্যাবাদী, বিভু অপেক্ষা অনেক খারাপ এ যেন লোকে বুঝিতে পারিতেছে। সে বারে বারে আপনার ব্যবহার ঠিকই হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিত, সহস্র যুক্তির দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিত। কিন্তু বুকের ভিতর কি একটা যখন তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত সে তখন রাগিয়া বিভুর উদ্দেশ্যে গাল দিয়া—দুর্ব্বাসাদের কাছে বিভুর নামে যাহা খুশী তাই নিন্দা করিয়া অস্থির হইয়া পড়িত। কিন্তু এ সকলও যখন বিভুর নিঃশব্দতার বর্ম্মে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত তখন সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইত না। ক্রমে বিভুর নীরবতা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। হৃদয় তাহার বলিতে লাগিল—যদি অন্যায় সে করিয়া থাকে তবে বিভু অমন চুপ করিয়া থাকিবে কেন? কেন সে একদিন তাহার সহিত ঝগড়া করে না? একদিন ঝগড়া হইলে বিভু বেশ যদি দু-কথা তাহাকে শোনাইয়া দেয়, যদি বলে "তুমি ভদ্দর লোক? তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি ছোট লোক!" তাহা হইলেই তো সব গোল চুকিয়া যায় কিন্তু হতভাগাটা অমন ভয়ঙ্কর চুপ করিয়া থাকে কেন? ত্রিলোচন একদিন লজ্জার মাথা খাইয়া, উঠানের কলে কাপড় কাচিতে রত বিভুপদকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল "ওঃ! কত্তার চুরি টুরি করে আজ কাল ভারী রাশ ভারী হয়েচে। কথাবার্ত্তা আর বলাই হয় না।"

কলের জলের শব্দে বিভু কথাটা শুনিতে পাইল কি না বুঝিতে পারা গেল না। ত্রিলোচন আবার জোর গলায় বলিল—"চুরি করে ভারী অহঙ্কার হয়েচে দেখি যে, কথা কওয়া হয় না যে আর!"

বিভু তথাপি নির্ব্বিকারভাবে যেমন পিছন ফিরিয়া কাপড় কাচিতে ছিল তেমনি কাচিতে লাগিল। লজ্জায় অপমানে ত্রিলোচন রাঙা হইয়া গেল। সে ছুটিয়া চৈতন্য চরণের কাছে গিয়া বলিল—"জানেন ঠাকুর মশায় ঐ চাকরটা এমন বদমায়েস..." ইহার পর আরো অনেক কিছু সে অনর্গল বলিয়া গেল। চৈতন্য সাগ্রহে সায় দিলেন।

এই দিনেই ত্রিলোচনের চেষ্টার সমাপ্তি হইল না। তাহার জেদ চড়িয়া গেল—যেমন করিয়া হোক বিভুকে কথা বলাইতেই হইবে। ইহার মধ্যে একদিন তাহার একটু জ্বর হইল। সে সারা দুপুর অনেকবার আশা করিল যে বিভু কাজের ছলে তাহাকে দেখিতে আসিবে। কিন্তু বিভু সে দিকও মাড়াইল না। বিকালে সে শুনিল বিভু বারান্দা ঝাঁট দিতেছে। গলাটা যথাসম্ভব চড়াইয়া সে কহিল—"সারা দুপুর জল তেষ্টায় মরে যাচ্চি এক গেলাস জল যদি না দেয় তো চাকর বাকর আচে কি কর্ত্তে? দূর করে দাও সবাইকে!" (যদিও মন্দিরের চাকর দিয়া নিজ-কাজ করাইবার অথবা দূর করিবার অধিকার তাহার ছিল না।) "কুঁজোটা খালি পড়ে আচে···"

"সে কিরে কুঁজোয় তো সকালে নিজে হাতে আমি জল তুলে রেখে গেচি। সব জল খেয়ে ফেলেচিস্ নাকি?" বলিতে বলিতে উপেনবাবু ঘরে ঢুকিলেন।

ত্রিলোচন শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে খায় নাই।

*　　*　　*　　*

পরের দিন সন্ধ্যায় সদ্য জ্বর হইতে ওঠা, দুর্ব্বল ত্রিলোচন চুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়াছিল। এই সময়ে একজন অপরিচিত আসিয়া উঠান হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"সরকার বাবু কোথায়?"

ত্রিলোচন বলিল—"ঘরে। কেন তোমার কি দরকার?"

লোকটার কথায় উড়িয়া টান। সে বলিল—"আমি একটা জরুরী খবর দিতে এসেছি। এ বাড়ীর চাকর দয়াল আমার ভাই। শালা বড়ই চোর। এই দেখুন সেদিন একখানা চাদর আমার কাছে রেখে আসছিল, এটা বোধ হয় এখান থেকে চুরি করেচে।"

ত্রিলোচনের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিবার ঘটিল; দয়ালের ভ্রাতা "বিভীষণ" চাদরখানি চৈতন্যের হস্তে প্রদান করিল এবং দয়ালের চুরির অনেক কাহিনী বলিল। সে একথাও বলিতে ভুলিল না যে পাঁচ

টাকার নোটটা সে তাহাকে একদিন দেখাইয়া তারপর লোপাট করিয়াছে। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে "বথরা" ব্যাপারে দয়াল ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ ঠকাইয়াছে এবং সেই রাগেই এই ভ্রাতৃ রত্নটি সহসা সাধু হইয়া উঠিয়াছেন। যাহা হোক সরকার, চাকর, দারবান, ব্রাহ্মণ সকলের সম্মুখে প্রমাণ হইয়া গেল চোর বিভু নয়, দয়াল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন ত্রিসংসারে দয়ালের সন্ধান মিলিল না। সে চালাক ছেলে, ভ্রাতার সহিত গোলমাল হইবার পরই সে মন্দির হইতে সরিয়াছিল। বিভু গম্ভীর ভাবে সব শুনিল, এবং শেষে কিছু মাত্র উল্লাস প্রকাশ না করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। অন্ধকারে ত্রিলোচন একাকী বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল তাহার সমস্ত মুখখানা পুড়িয়া গিয়াছে। ওদিকে মন্দিরে মন্দিরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আরতির জন্য ঠাকুর মশায়রা ভাঁড়ার ঘরে কাপড় ছাড়িতেছেন। তাঁহাদের দয়ালের উদ্দেশ্যে গালা-গালি এখান হইতে শোনা যাইতেছে। ঐ তো বিভু ব্যস্ত ভাবে সুবাসিত-ধূম ধুনাচি লইয়া মন্দিরে মন্দিরে রাখিয়া আসিতেছে। সে যতই নির্ব্বিকার ভাব দেখাক, তাহার চলার ভঙ্গীতে আজ আনন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ঐ তো সে কি কাজের জন্য বারান্দার ওধারে আসিল এবং ত্রিলো-চনকে লক্ষ্য করিয়াও যেন না দেখার ভাবে চলিয়া গেল। কেন এখনও তো সে আসিয়া ত্রিলোচনকে বলিতে পারিত "কেমন? দেখলে?" কিন্তু কিছুই সে বলিবে না। ঐ সে মহানন্দে শরীর দুলাইয়া আরতির ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিল। ঘোর ঘটায় শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ করিয়া আরতি শেষ হইলে চাতালে কীর্ত্তনীয়ারা খঞ্জনী, খোল, হারমোনিয়াম সহযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। ত্রিলোচন নড়িল না, উঠিল না; সেই অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল গান হইতেছে—

"এমন নিঠুর নাগরেরই সনে
কেন বা করিলি কলহ,
এখন রে রাই মন প্রাণ ধরে
কেমনে রহিবি বলহ।"...

* * * *

পরের দিন সকালে শোনা গেল বিভুপদ রাত্রেই পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে। বুড়ার নাকি বড়ই অসুখ। বাঁচে কি বাঁচে না এই রকম। এদিকে ঝুলন আসিয়া পড়িল। দয়াল পলাইয়াছে। বিভু অনুপস্থিত, নূতন চাকর দুইটা আসিয়া যত আনাড়ীর মত কাজ করিতেছে উপেনবাবু ততই বকিয়া সারা হইয়া যাইতেছেন। বিকালে কর্ত্তাবাবু স্বয়ং মন্দিরে ঝুলনের আয়োজন দেখিতে আসিবেন। ত্রিলোচনও যথাসম্ভব ঘটাঘটি করিয়া পিতার কাজের সহায়তা করিতে-ছিল।

বৈকালে বাবু আসিবে পরে যখন তাহার পিতা তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন সে অল্প একটু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। চাকর বাকরদের কথা উঠিলে উপেনবাবু দয়ালের অনেক নিন্দা ও বিভুপদর অনেক প্রশংসা করিলেন ও শেষে বলিলেন—"ছেলেটা কিন্তু আর এখানে থাকতে রাজী নয়—ঐ যে একবার তাকে চোর বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। তাই সে চলে যেতে চায়। কিন্তু এত বাধ্য আর কাজের যে বলা যায় না। আর আমার ব্যবহারও বেশ ভদ্দর। আবার পড়াশোনাও খুব আগ্রহ আছে। একটু ফর্দ্দ করে দিলে আর দেখতে হয় না নিজে হিসেব নিকেশ করে লিখে পড়ে সব এনে দেবে। তবে বুড়ো বাপটা কাল মরে গ্যাচে শুনলুম, আমারই এক বন্ধুলোকের বাড়ী লোকটা কাজ করত।"

কর্ত্তাবাবু সম্প্রতি গরীবের ছেলেদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন—মানুষ তিনি বেশ ভালই ছিলেন। তিনি বিভুর কথা শুনিয়া তাহাকে এই মন্দিরে রাখিতে ও নিজের স্কুলে পড়াইয়া মানুষ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উপেনবাবুও বেশ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তা হবে ওর নিজে কাজ চেনার চেষ্টা আছে। যাদের কেউ নেই তাদেরই হয়। ওই যে আমার ধনুর্দ্ধর ছেলে দেখচেন বড়বাবু ওটির কিছুই হচ্চে না।"

ত্রিলোচন এ প্রসঙ্গ উঠিতেই সরিয়া পড়িল। কিন্তু নির্জ্জনে আসিয়া সে ভাবিতে বসিল বিভুর কথা। তাহার বাবা যে তাহার কি, সে কথা ত্রিলোচন ভাল করিয়াই

জানে। তাঁহাকে হারাইয়া সে কি করিতেছে ত্রিলোচন ভাবিতে পারিল না।

ঝুলনের দিন বিভুপদ আসিল। সেদিন মন্দিরে ভারী ধুমধাম। সকাল হইতে বড় বড় কড়া হাঁড়িতে নানা প্রকার ভোগ প্রস্তুত হইতেছে। আরো দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। দুই চারিজন বেশী চাকরও আসিয়াছে। উঠানটা হোগলা দিয়া ঢাকা হইয়াছে। বারান্দার থাটালে থাটালে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মাটির "সং" সাজান হইয়াছে। রাত্রে যাত্রা হইবে, তাই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হোগলার বাঁশের মাঝে মাঝে আলো লাগাইয়া দিতেছে। পাড়ার যত ছোট ছেলে মেয়ে আজ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া মন্দিরের উঠান সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। এত হট্টগোলেও যখন বিভুপদ আসিল তখন ত্রিলোচন ভিড়ের মধ্যে লুকাইয়া তাহার মুখখানা লক্ষ্য করিতে ছাড়িল না। সে যে একেবারে রোগা আধখানা হইয়া গিয়াছে তাহা একবার মাত্র দেখিলেই বোঝা যায়।

উপেন বাবুও ব্যস্তভাবে যাইতে যাইতে সহসা বিভুর সেই শুষ্ক ম্লান মূর্ত্তি দেখিয়া দাঁড়াইলেন ও তাড়াতাড়ি দুই একটা মামুলী সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তাহাকে কর্ত্তাবাবুর ইচ্ছা জানাইয়া এখানেই কাজ করিতে বলিলেন।

বিভু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাটিতে বসিয়াছিল—উপেন বাবুর কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া যাহা উত্তর দিল তাহা ত্রিলোচন দূর হইতেও স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে ক্রন্দন বিজড়িত কণ্ঠে প্রাণপণে বল আনিয়া বলিল—"না বাবা যাদের জন্যে মনকষ্ট নিয়ে গেচে তাদের সঙ্গে আর আমি থাক্‌তে পারব না। আমি চলেই যাব, বাবু আমায় মাপ করবেন, আপনার দয়া আমি ভুলব না, কিন্তু বাবা যে আমার" বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখ ছাপাইয়া জল আসিল।

সমস্ত দিন ঝুলনের গোলমাল ও আনন্দের মধ্যে বার বার ত্রিলোচনের মনে হইল সে যদি একবার হাত ধরিয়া বিভুকে বলে—"বিভু তুই যাস্‌নি। তোর মনে কি ক্ষমা নেই? তুই কি একবার মাপ করতে পারিস্ না? তার চেয়ে কি তুই একলা পথে পথে অন্ন কষ্ট পেয়ে বেড়ানকে সুখের মনে করিস? এমন ভয়ানক মন তুই কোথা থেকে নিয়ে এলি? তুই তো এমন ছিলি না।" তাহা হইলে বোধ হয় বিভু, এমন সহায়হীন ভাবে পথে বাহির হইয়া যায় না। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা আসিয়া তাহাকে এই মেয়েলী ঢংয়ের কথাবার্ত্তা বলিতে দিল না। সে জোর করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, "যায়, যাক্ না, আমার কি! সামান্য একটা চাকর তার এত তেজ ভাল নয়!" কিন্তু মন তাহার মানিল না, বারে বারে বর্ষার অশ্রান্ত ক্রন্দনের সাথে কাঁদিতেই লাগিল।

* * * *

ঝুলনের রাতটা এখানে কাটাইয়া তাহার পর যেদিকে দু-চোখ যায় সেইদিকে চলিয়া যাইবে, এই স্থির করিয়া বিভুপদ শেষবারের মত তাহার ছেঁড়া কাঁথাটি পাতিয়া বারান্দার এক কোণে শয়ন করিয়াছিল। শোক যতই থাক নিদ্রা আসিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাকে সর্ব্ব দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছিল। ভোর রাত্রে বর্ষার হাওয়ায় গাটা শির শির করাতে পাশ ফিরিয়া ছেঁড়া কাপড়টা আর একটু ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতে গিয়া অভ্যাস মত তাহার মনে পড়িল তাহার কাজের সময় হইয়াছে—এবং ধড়মড় করিয়া উঠিতে গিয়া সে গলায় একটা ভারী জিনিষের স্পর্শ পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সরকার বাবুর প্রবল প্রতাপান্বিত পুত্র ত্রিলোচন বাবু তাহার পার্শ্বে অর্দ্ধেক শরীর মাটিতে এবং অর্দ্ধেক শরীর তাহার ছেঁড়া কাঁথায় রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সমস্ত মুখে তাহার একটা শ্রান্ত ক্লান্ত ভাব। যে হাতখানা এইমাত্র বিভু গলা হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল সেটা তাহার বালিশের উপর পড়িয়া আছে। তাহার টেরির পারিপাট্য এখন আর নাই, সেগুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার রোগা ফর্সা ছোট মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার চোখের কোলগুলা কালো—মনে হয় যেন সে অনেক দুশ্চিন্তার পর শেষে হতাশ হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে দেখিয়া বিভুর মনে পড়িল বাবা নাই। তাহাকে আজই এই মন্দির ছাড়িয়া যাইতে হইবে। সে উঠিতে যাইবামাত্র ত্রিলোচনের হাতখানা বালিশ হইতে গড়াইয়া আসিয়া তাহার কোলের কাছে পড়িল। সে আবার বসিল—তাহার পর খানিক ত্রিলোচনের শ্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে অস্পষ্ট স্বরে ডাকিল "লোচন"। ত্রিলোচন জাগিল না—কেবল ঘুমের ঘোরে শীত অনুভব করিয়া গুটিসুটি মারিয়া বিভুর গা ঘেঁসিয়া শুইল। বিভু দুই মিনিট ধরিয়া কি ভাবিল, শেষে আপনার গায়ের ছেঁড়া কাপড়খানা ভাল করিয়া লোচনের গায়ে জড়াইয়া দিয়া মন্দিরে নিজের কাজ করিতে চলিয়া গেল।

ইন্দিরা ঘোষাল

প্রজাপতি সংবাদ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম্‌-এ, বি-এল্‌

১

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে প্রজাপতি সংবাদ বলিয়া একটি গল্প আছে। কথা বা কাহিনী হিসাবে গল্পটির মূল্য যৎসামান্য হইতে পারে। কিন্তু গল্পটির মধ্যে জগৎ-সভ্যতার ঐতিহাসিক মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন একটি অভ্রান্ত ব্যঞ্জনা আছে, যাহা প্রচলিত কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। সেই জন্য গল্পটির মর্য্যাদা অপরিসীম বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। সেই গল্পটির মধ্য দিয়া জগৎ-সভ্যতার মৌলিক নিদানতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস ও দিগ্‌দর্শন দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে, যথাসম্ভব উপনিষদের ভাষাতেই, গল্পটির সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ বলা প্রয়োজন হইয়া থাকে। গল্পটির মর্ম্ম এই :—

"সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির এই বাণী জগতে প্রচারিত হইয়াছিল—'এই যে আত্মা, তাহা অপহত-পাপ্‌মা। তাহা বিজর, বিমৃত্যু ও বিশোক। ... জিঘৎসা (ক্ষুধা) ও তৃষ্ণা বর্জ্জিত। তাহা সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহার কামনা ও সংকল্প কখনই ব্যর্থ হয় না। সেই আত্মা অন্বেষ্টব্য ও বিজিজ্ঞাসিতব্য। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে যথাবিধি ভাবে জানিতে পারে, সে ব্যক্তি সমস্ত কাম্য বিষয় ও সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয়।'

প্রজাপতির এই বাণী দেবগণ ও অসুরগণ জানিয়াছিলেন। এই বাণী তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিল। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন আমরা সেই আত্মাকে জানিতে চাহি যাহাকে জানিতে পারিলে সমস্ত কামনার বিষয় ও সমস্ত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তখন দেবগণের প্রবর ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রবর বিরোচন সমিৎ-পাণি হইয়া (গুরু-গৃহে যাইতে হইলে প্রথা অনুসারে শিষ্যকে যজ্ঞীয় সমিৎ-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া যাইতে হয়) প্রজাপতি সকাশে উপস্থিত হইয়া, তথায় বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিলেন।

তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা উভয়ে কি ইচ্ছা করিয়া এখানে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিয়াছ। উভয়ে বলিলেন—ভগবন্‌, আপনি বলিয়াছেন এই যে আত্মা ইহা অপহত-পাপ্‌মা; ইহা বিজর, বিশোক ও বিমৃত্যু। ইহা জিঘৎসা ও পিপাসা বর্জ্জিত। তাহা সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। সেই আত্মা অন্বেষ্টব্য ও বিজিজ্ঞাসিতব্য। যে সেই আত্মাকে বিচারপূর্ব্বক জানিতে পারে সে সমস্ত কাম্য ও সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয়। আমরা সেই আত্মাকে জানিবার জন্য এখানে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিতেছি।

প্রজাপতি বলিলেন—অক্ষির মধ্যে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই আত্মা, তাহাই অমৃত, তাহাই অভয় ও তাহাই ব্রহ্ম।

ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধ শিষ্যদ্বয় বলিলেন—ভগবন্‌, যে পুরুষ জলের মধ্যে পরিখ্যাত হয়েন ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েন, আপনি কি সেই পুরুষের কথা বলিতেছেন।

প্রজাপতি বলিলেন—উ (অর্থাৎ হাঁ)। এই পুরুষ এই সকলের মধ্যেই পরিখ্যাত হয়েন।

ইহা শুনিয়া শিষ্যদ্বয় নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিলেন এই সশরীর ও মূর্ত্তিমান পুরুষই আত্মা। এবং তাহা বুঝিয়া, বোধ হয় তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে এই শরীরই যদি সেই পরম উপাদেয় আত্মা হয় যাহাকে জানিবার জন্য আমাদের এইখানে অবস্থিতি, তবে আমরা এই বত্রিশ বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যে জটামণ্ডিত ও কদাকার হইয়া সেই প্রিয় আত্মাকেই ত' কদাকার করিয়াছি।

প্রজাপতি তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তোমরা উদ-শরাবে (সরাতে জল রাখিয়া) দেখিয়া

আইস। তাহাতে তোমরা যদি তোমাদের আত্মাকে দেখিতে না পাও, তবে আমাকে আসিয়া ব'ল। তাঁহারা তাহাই করিলেন।

তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি দেখিলে।

তাঁহারা বলিলেন—আমরা উদশরাবে নখ হইতে লোম পর্য্যন্ত আত্মরূপের প্রতিরূপ দেখিলাম।

প্রজাপতি বলিলেন—এইবার তোমরা পরিস্কৃত হইয়া, সুবসন ও সাধু অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া উদশরাবে নিরীক্ষণ করিয়া আইস।

তাঁহারা তাহাই করিলেন।

তখন প্রজাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন তোমরা কি দেখিলে ?

তাঁহারা বলিলেন—এখন আমরা পরিষ্কৃত, সুবসনে সজ্জিত, সুন্দর ও অলঙ্কৃত আত্মরূপ দেখিলাম।

প্রজাপতি বলিলে—উহাই আত্মা, উহাই অমৃত, উহাই অভয় এবং উহাই ব্রহ্ম।

তাহা শুনিয়া শিষ্যদ্বয় সন্তুষ্টচিত্তে ও শান্ত হৃদয়ে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তাঁহাদের উভয়কে শান্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন,—হায়, ইহারা দুইজনেই আত্মাকে উপলব্ধি করিল না, দুইজনেই বিচারপূর্ব্বক আত্মাকে গ্রহণ করিল না। "দেহই আত্মা," এখন হইতে ইহাদের অভ্রান্ত উপনিষৎ-বাক্য হইবে। দেবগণ ও অসুরগণ পরাভব প্রাপ্ত হইবে।

বিরোচন অসুর-সমাজ প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন এই শরীরই হইতেছে আত্মা। এই শরীরাত্মাকেই মহনীয় করিতে হইবে, ইহাকেই পরিচর্য্যা করিতে হইবে। তাহা হইলেই, ইহলোকে কাম্য বিষয়সকল এবং পরলোকে লোক-সকল প্রাপ্ত হইবে।

ইন্দ্র কিন্তু সুরলোক প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, পথিমধ্যে এই ভয় দেখিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন দেহই যদি আত্মা হয়, তবে দেহ সজ্জিত ও সুন্দর হইলে আত্মাও অবশ্য সজ্জিত ও সুন্দর হইবে। কিন্তু দেহ যদি অন্ধ বা খঞ্জ হয়, অথবা দেহের কর্ণ ও নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হয়, তবে আত্মাও অবশ্য অন্ধ ও খঞ্জ হইবে, এবং তাহাও অবশ্য অসুন্দর ও স্রাবযুক্ত হইবে। এমন আত্মাকে আমি উপাদেয় বিবেচনা করি না এবং তাহাতে কোনই ভোগ্য দেখিতেছি না।

এই ভাবিয়া তিনি আবার সমিৎ-পানি হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলিলেন—মঘবন্, তুমি বিরোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলে, আবার কি ইচ্ছা করিয়া ফিরিয়া আসিলে।

ইন্দ্র তাঁহার আশঙ্কা নিবেদন করিলেন।

প্রজাপতি বলিলেন—উত্তম! আরো বত্রিশ বৎসর এই খানে ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর। তবে বলিব।

ইন্দ্র তাহাই করিলেন।

তখন প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন—মঘবন্, তোমার আশঙ্কা মিথ্যা নহে। কারণ দেহই যদি আত্মা হয়, তবে দেহ খঞ্জ, অন্ধ, বা স্রাবযুক্ত হইলে আত্মাও অবশ্য খঞ্জ, অন্ধ ও স্রাবযুক্ত হইবে। কিন্তু আত্মার এরূপ বিরূপ অনুভব মনুষ্যের জাগ্রৎ অবস্থাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহা নাও হইতে পারে। কারণ স্বপ্ন-স্থানে অবস্থিত আত্মা, দেহ খঞ্জ বা অন্ধ হইলেও, স্বপ্ন দেখিতে পারেন তিনি অন্ধ বা খঞ্জ নহেন। দেহ স্রাবযুক্ত হইলেও তিনি স্বপ্ন দেখিতে পারেন তিনি কুৎসিত ও স্রাবযুক্ত নহেন, তিনি পরম সুন্দর পুরুষ। এতএব স্বপ্নস্থানে অবস্থিত আত্মাই হইতেছে—অভয়, অমৃত ও ব্রহ্ম।

ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে আবার ফিরিলেন এবং পথিমধ্যে আবার এই ভয় দেখিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, স্বপ্নস্থানে অবস্থিত আত্মা, অবশ্য দেহের খঞ্জতা ও অন্ধতার দ্বারা নাও পরামৃষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু স্বপ্নও কখন কখন ত' দুঃস্বপ্ন হইয়া থাকে—তখন স্বপ্নস্থানে অবস্থিত পুরুষ দেখিতে পান তিনি যেন রোদন করিতেছেন, তিনি যেন বন্ধগ্রস্ত হইয়াছেন। এমন আত্মা দ্বারা আমি কোনই ভোগ্য দেখিতেছি না।

আবার হস্তে সমিৎ লইয়া ফিরিলেন—এবং প্রজাপতিকে

তাঁহার আশঙ্কার বিষয় অবগত করাইলেন। প্রজাপতি বলিলেন বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর—তবে বলিব। ইন্দ্র তাহাই করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন—স্বপ্নস্থানে অবস্থিত আত্মাও কখন কখন দুঃখভোগী হয়, ইহা সত্য। কিন্তু স্বপ্নহীন সুষুপ্তি স্থানে অবস্থিত আত্মার কোনই শোক বা দুঃখ থাকে না। সেই অবস্থায় অবস্থিত আত্মা সমস্ত ও সংপ্রসন্ন ভাবে অবস্থিত হয়েন। অতএব সুষুপ্তি স্থানে অবস্থিত আত্মাই অভয়, অমৃত ও ব্রহ্ম।

ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে আবার তাঁহার শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন সুষুপ্ত আত্মা অবশ্যই কোন শোক দুঃখ অনুভব করেন না বটে, এবং তখন আত্মার অবস্থা হয় বাস্তবিক পক্ষে "সমস্ত ও সংপ্রসন্ন।" কিন্তু তখন আমি আছি কি নাই এ জ্ঞানও থাকে না। তখন আত্মা যেন বিনাশের দ্বারা আপীত হয়েন। এমন আত্মার দ্বারা কখনই কাম্য বিষয়ের উপভোগ সম্ভব হইতে পারে না। এমন আত্মাতে আমি কোনই ভোগ্য দেখিতেছি না।

তিনি আবার ফিরিলেন এবং প্রজাপতি বলিলেন—হে ইন্দ্র, আর পাঁচ বৎসর হইলেই তোমার শতাধিক এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস পূর্ণ হয়। তুমি সেই পাঁচ বৎসর এখানে ব্রহ্মচর্য্য কর। তাহার পরে বলিব।

ইন্দ্র তাহাই করিলেন। তখন প্রজাপতি চরম আত্মবাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"মঘবন্—এই শরীর মর্ত্ত্য। মৃত্যু ইহাকে যেন সকল সময়েই গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। অতএব এই মরণ-শীল শরীর কখনই অমৃত আত্মা হইতে পারে না। এই শরীর হইতেছে অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান বা সাময়িক আবাস মাত্র।

শরীরে অধিষ্ঠিত অমৃত আত্মা যাহা ভোগ করেন তাহা সংসারের প্রিয় ও অপ্রিয় মাত্র। এবং সংসারের প্রিয় ও অপ্রিয় চরম ভোগ্যও বাঞ্ছনীয় বিষয় নহে। তাহা ভূমানন্দ নহে। সংসারের প্রিয় ও অপ্রিয় হইতেছে তুচ্ছ, সসীম ও অল্প এবং অনেক সময়ে তাহার পরিণাম হইতেছে দুঃখ।

যতদিন আত্মা শরীরে অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন অবশ্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় ভোগ করিতে হয়। সশরীর আত্মার কখনই প্রিয় ও অপ্রিয়ের বিরতি হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা সর্ব্বথা যখন শরীর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া অশরীর আত্মা হয়েন, তখন প্রিয় ও অপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অশরীর আত্মাই ভূমানন্দে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন।

মনে করিও না, অশরীর আত্মা বলিতে কোনও অ-বস্তু বুঝাইয়া থাকে। জগতে অনেক অশরীর বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু, অভ্রং স্তনয়িত্নু, মেঘ, ও বিদ্যুৎ ইহারা অশরীর বস্তু কিন্তু অরূপ বস্তু নহে। (এখানে উপনিষৎ সশরীর বস্তু বলিতে এমন একটি বস্তু বুঝাইতেছেন যে বস্তুর প্রকাশ অন্য বস্তুর দ্বারা সিদ্ধ হয়। যেমন দেহস্থিত আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশ সিদ্ধ হয় দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই সকল অশরীর বস্তু, বিদ্যুতের ন্যায় আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া যে জ্যোতিরূপে অভিসম্পন্ন হয়, সেই জ্যোতিরূপই হইতেছে অশরীর বস্তু নিজ রূপ। সেই রূপ, দেহাকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া আত্মা যে জ্যোতিরূপে অভিসম্পন্ন হয়েন তাহাই সম্প্রসাদ স্বরূপ আত্মার নিজ রূপ। এবং সেই আত্মার নাম পুরুষোত্তম।* এই পুরুষোত্তম আত্মা সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন ও সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ভক্ষণ করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে তিনি স্ত্রীগণ, যান বাহন বা জ্ঞাতিগণ সহ সঙ্কল্প মাত্রেই রমমান হইতে পারেন। ইহাকেই বলে আত্মার সত্যকামতা ও সত্য-সংকল্পতা। তাঁহার সংকল্প মাত্রেই সমস্ত ভোগ্য বিষয় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হয়। সেই অশরীর আত্মা তখন আর পূর্ব্ব শরীরে উপগমন স্মরণ করেন না।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পারো, অশরীর আত্মা ভক্ষণ গমন প্রভৃতি শরীরসাধ্য ব্যাপার কিরূপে বিনা শরীরে

* গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমি বেদে ও লোকে পুরুষোত্তম নামে প্রথিত" (১৫।১৮)। বেদ বলিতে সম্ভবতঃ এই ছান্দোগ্য শ্রুতিই লক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রসাদ-স্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা ও পুরুষোত্তম আত্মার প্রভেদ অরবিন্দ-গীতায় অতি পরিষ্কার ভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

সাধন করিতে পারেন, এবং পূর্ব্ব শরীরের স্মৃতি ব্যতিরেকেই বা কি করিয়া জ্ঞাতিগণ সহ রমমান হইতে পারেন। তাহার উত্তর এই।

আমরা দেখিতে পাই বৃষ প্রভৃতি জন্তু কোন এক নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও কোন নিয়োগ কর্ম্মের জন্ম হলাদিতে যুক্ত হয়। সেই নিয়োগ্য কর্ম্ম হইতেছে ভূমিকর্ষণ। সেই রূপ এক এক নিয়োগ্য কর্ম্মের জন্ম দেহে ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইয়াছে। প্রাণ শরীরে যুক্ত হইয়াছে শরীরে অধিষ্ঠিত পুরুষের এক নিয়োগ্য কর্ম্মের জন্ম। (শঙ্করাচার্য্যের মতে সেই নিয়োগ্য কর্ম্ম হইতেছে শরীরাধিষ্ঠিত পুরুষকে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্ম)। সেইরূপ এই দেহছিদ্রের কৃষ্ণবর্ণ আকাশে যুক্ত হইয়াছে, চক্ষুতে অধিষ্ঠিত পুরুষের দর্শনের জন্ম। সেইরূপ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকেও জানিবে। স্মরণ করা হইতেছে মনের নিয়োগ্য কর্ম্ম—মনও হইতেছে একটি ইন্দ্রিয়—তাহা শরীরে অধিষ্ঠিত পুরুষের দিব্য চক্ষু।

অতএব অশরীর আত্মা যখন আর শরীরে অধিষ্ঠিত থাকেন না তখন ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের নিয়োগ্য কর্ম্ম করিতে পারে না। সেইজন্য অশরীর আত্মা পূর্ব্ব দেহে উপজনন ও স্মরণ করেন না।

স্বরূপে অবস্থিত অশরীর আত্মার কোন শারীরিক ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না, অথচ তাঁহার সত্যকামতা সত্য সঙ্কল্পতার প্রভাবে, সঙ্কল্প মাত্রই তাঁহার নিকট যে কোন ভোগ্য বিষয় সমুপস্থিত হইয়া থাকে ইহাই আত্মার পরিপূর্ণ ভূমানন্দে অবস্থান। ইহাই অশরীর আত্মার ব্রহ্ম-লোক।

দেবগণ এই অশরীর আত্মার উপাসনা করুন। তাহা হইলেই তাঁহারা সমস্ত কাম্য বিষয় ও কাম্য লোক প্রাপ্ত হইবেন।"

ইহাই হইতেছে ছান্দোগ্যের সুবিখ্যাত প্রজাপতি সংবাদের মর্ম্ম। এবং এই মর্ম্মের শেষাংশ সুগম করিবার জন্ম পূর্ব্ব প্রপাঠকে বর্ণিত ভূমানন্দ প্রভৃতিরও উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এই সরল, সঙ্গত, বাক্য ও বর্ণানুগত শ্রুতির মর্ম্মকে নিষ্পীড়ন করিয়া তাহা হইতে তাঁহার পরম প্রিয় মায়াবাদের অনুকূল যুক্তিকে বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা আমরা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সেই জন্য শ্রুতির উপরি-উক্ত মর্ম্ম যদি শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্ম না হইয়া থাকে, আশা করি তজ্জন্য পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

২

আমাদের বিশ্বাস উপনিষৎ-প্রোক্ত শরীরাত্মবাদ ও অশরীর-আত্মবাদকেই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, মধ্য-কেন্দ্র করিয়া, জগতে দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং সেই দুই বিভিন্ন সভ্যতার ধারাবাহিক স্রোত অদ্যাপি জগতে অন্তঃপ্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন ভারতে এই দুই বিভিন্ন সভ্যতার নাম হইয়াছিল দৈবী ও আসুরি সভ্যতা।

কিন্তু দেব ও অসুর বলিতে কাহাদিগকে আমরা বুঝিব? তাহারা যে কোন অমানুষিক বা অতীন্দ্রিয় জীব, তাহা আলোচ্য শ্রুতি হইতে কোন মতেই প্রতিপন্ন হয় না। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, দেবাসুরের যাহা মনোবৃত্তি তাহা অবিকল মানুষেরই মনোবৃত্তি এবং আকারে ও অবয়বেও তাহারা আমাদেরই মতন শরীরধারী জীব। অতএব দেব বলিতে যদি আমরা এক প্রকার বিশিষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন মনুষ্য-সমাজ ধরিয়া লই, এবং অসুর বলিতে অন্য প্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ বিবেচনা করি,—তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতির অর্থ, কোথাও কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না।

প্রজাপতি প্রথমে দেবাসুর উভয়কেই বলিয়াছিলেন শরীরই আত্মা। শঙ্করাচার্য্য বলেন "শরীরই আত্মা" ইহা মিথ্যা কথা এবং প্রজাপতি কখনই মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। সেইজন্য "অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" এই শ্রুতি মন্ত্রের ফেরকার করিয়া তিনি অন্য অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে অবশ্যই প্রজাপতি মিথ্যা-কথনের বদনাম হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

কিন্তু সেই প্রজাপতি, যখন সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে, বিশ্ব জীবের চিত্তপটে, অভ্রান্ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন 'দেহই আত্মা', তখন তাঁহাকে মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ

স্ফুরিবার জন্য কোনই শঙ্করাচার্য্য ছিলেন না। কারণ, দেহ এবং আমি বা আত্মা যে অভিন্ন, এ ধারণা শুধু মানুষের নহে, কিন্তু পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রত্যেক দেহধারি জীবেরই তাহাই সহজাত ধারণা। প্রজাপতি বিশ্বজীবের চিত্তোপরি,—একবারেই তাহার প্রথম স্তরেই,—স্বহস্তে উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন এই দেহাত্মবাদের মন্ত্র। জগতের কোন জীবই তাহার 'দেহ' ও তাহার 'আমি', পৃথক্ বিবেচনা করিয়া কোন কর্ম্মই করে না। দেহাত্মবাদ স্বীকার ব্যতিরেকে কোনই জগৎ-ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না। 'আমি', 'আত্মা' প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বত্রই সশরীর আত্মা বা দেহবান আমিকেই বুঝাইয়া থাকে। কোনই দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার জন্য এই সৃষ্টির বিপুল ব্যবস্থা হয় নাই। সশরীর আত্মাই সৃষ্টির বিধানে, দাতা, কর্ত্তা ভোক্তা ও গ্রহিতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। পণ্ডিতের বিচার-শালায় এই দেহাত্ম জ্ঞান মিথ্যা বা মায়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জগতের বিপুল ও বিশ্বব্যাপি হট্টশালায় দেহাত্মবাদই স্বীকৃত তথ্য, এবং সশরীর আমির নামেই এখানে সমস্ত ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। এবং উপনিষদের ঋষি যখন বলিয়াছিলেন প্রজাপতির আদিম বাণী হইতেছে দেহই আত্মা,—সেই বাণী শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রজাপতি লোকে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই, সে বাণী ঋষি প্রজাপতি সৃষ্ট প্রত্যেক জীবের চিত্তফলকে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে চার্ব্বাকপন্থী বলিয়া এক দল লোক ছিলেন—যাঁহারা মনুষ্য মাত্রেরই সহ-জাত দেহাত্মগণকেই চরম আত্মজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতেন তাঁহাদের মতবাদই লোকায়ত মতবাদ—অর্থাৎ সমস্ত জীবের মধ্যে ও সমস্ত লোকের মধ্যে বিস্তৃত মতবাদ। সকলেই জানেন, সেই জন্যই চার্ব্বাক ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, দেহরূপী আত্মার পুষ্টির জন্য ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিতে হইবে। আবার চার্ব্বাকপন্থিদের practical বিচার-বিধি সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক গল্প আছে। একদা একজন চার্ব্বাকের সঙ্গে এক পণ্ডিতের বিচার ও তর্ক বাধিয়াছিল। পণ্ডিত বলেন আত্মা দেহ ব্যতিরিক্ত, চার্ব্বাক বলেন দেহই আত্মা। পণ্ডিত বলেন—কিং তত্র প্রমাণং। চার্ব্বাক পণ্ডিতের গণ্ডস্থলে অকস্মাৎ এক বিষম চপেটিকা প্রয়োগ করিয়া বলেন—ইদং তত্র প্রমাণং। চপেটিকা প্রয়োগ বশতঃ পণ্ডিত ক্রোধান্বিত হইয়া যুগপৎ কালে প্রমাণ প্রয়োগ, তথা সংস্কৃত ভাষা বিস্মৃত হইয়া বিশুদ্ধ গ্রাম্য ভাষায় বলিয়াছিলেন—শালা, হারামজাদা নাস্তিক, তুই যে আমায় হঠাৎ চড় মারলি?

চার্ব্বাক ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন—সে কি ঠাকুর! আমি ত' আপনাকে মারি নাই।

পণ্ডিত ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—সে কি রে ব্যাটা মিথ্যাবাদি! এই আমার মারলি। আর এই বলছিস্ আমায় মারিস্ নাই।

চার্ব্বাক বলিলেন—ঠাকুর! এই একটু আগে আপনি দেহ ও আত্মা যে অভিন্ন তাহার প্রমাণ চাহিতেছিলেন। আমি আপনার গালে চড় মারিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম যে আপনার দেহ ও আপনি অভিন্ন। এবং আপনিও তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন "আমায় মারলি কেন?" অতএব আপনার মতেই আপনি তর্কে হার মানিলেন। নতুবা, আপনার দেহে আঘাত করিলে আপনি কোন ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে বলিতে পারেন—"আমায় মারলি কেন।"

ফল কথা দেহাত্মসংস্কার ত্যাগ করা মনুষ্যের পক্ষে এতই অসাধ্য। এবং এই দেহাত্ম সংস্কারকেই অসুরগণ উপনিষৎ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। ঐ সংস্কারই হইয়াছিল তাহাদের Rationalism। প্রজাপতি বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া বিরোচনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—অসুন্দর দেহরূপী আত্মাকেও সুন্দর করা যাইতে পারে। তবে চেষ্টা করিলে কি এই দেহরূপী আত্মার জরা মৃত্যুকেও পরাজয় করিতে পারা যায় না? তাহা যদি যায়, তবে জগতের কোন কামনা সিদ্ধ হইতে বাকী রহিল, এবং কোন লোকান্তর অলব্ধ রহিল! বিরোচন প্রজাপতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া অসুরগণকে প্রচোদিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা এই দেহস্বরূপ আত্মাকে বড় করিতে চেষ্টা কর, তোমরা এই দেহস্বরূপ আত্মার পরিচর্য্যা কর। তাহা হইলেই সমস্ত কাম্য বিষয় ও লোক লাভ হইবে।" অসুর

সভ্যতার ইহাই হইয়াছিল মন্ত্রশক্তি। এবং সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে একদা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জাতি যে অসাধ্য সাধন করিয়াছিল তাহার দুই চারিটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে ব্যাস এক স্থানে (৪।১) বলিয়াছেন অসুর-ভবনে এমন সকল ঔষধ ও রসায়ণ প্রস্তুত হইয়াছিল যাহা শুধু রোগ ও জরা নিবারণ করিত না, তাহার দ্বারা তাহারা শরীরের প্রকৃতি পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিতে পারিত। ইহার নাম ছিল কায়াসিদ্ধি। অসুর-দেহ বলিতে আজ পর্য্যন্ত অসম্ভব বলশালী নীরোগ ও বলিষ্ঠ দেহই বুঝাইয়া থাকে। এবং সেই দেহের স্বাস্থ্য সাচ্ছন্দ্য, আরাম ও উপভোগের জন্য অতি বিচিত্র হইয়াছিল তাহাদের সংসার যাত্রার বিধান। সেখানে কোনই বিধি নিষেধের আড়ম্বর ছিল না। সেখানে তীব্র বাসনা ও কামনাই ছিল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের একমাত্র অর্থশাস্ত্র ও কর্ত্তব্যশাস্ত্র। এই তেজস্বী ও বলশালী জাতি একদা ভারতবর্ষে, শত্রু পরিবৃত হইয়াও, নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। দুর্ভেদ্য ছিল এই অসুরগণের পুরী। অধুনা-লুপ্ত ইন্দ্রজাল ও মায়াবিদ্যার চরম উৎকর্ষ অসুরগণই লাভ করিয়াছিল এবং তাহার প্রভাবে তাহারা ক্ষত্রিয়গণের ভুজবল ও ব্রাহ্মণগণের যোগবলকে অনায়াসেই ব্যর্থ করিয়া দিত। হীনবীর্য্য ও নিরীহ ব্রাহ্মণগণকে তাহারা আন্তরিক ঘৃণা করিত। ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ নষ্ট করা তাহাদের ছিল একটী জাতীয় আমোদ।

এই অসুরগণ আরো একটি জিনিষকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, যাহাকে আমরা বলি "Philosophy"। জগতের সমস্ত Practical জাতিই তাহা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের ন্যায়, অসুর-তন্ত্রও ধ্যানস্তিমিত নয়নে কোনই অ-জাগতিক তত্ত্বের অন্বেষণে কোন কালেই ব্যস্ত হয় নাই। তাহারা প্রাণ মন দিয়া দৃঢ়ভাবে চাহিয়াছিল জগৎকে এবং জগৎও তাহার অন্তর্নিহিত রহস্য ও শক্তি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিল সেই আসুরিক সাধনাকে।

পরকাল সম্বন্ধে, তাহারা কোনই বিশেষ স্বর্গ রাজ্যের উদ্ভাবন করে নাই। দেহ-ব্যতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব তাহারা কল্পনাতেও আনে নাই। মৃত্যুকে সৃষ্টিকর্ত্তা যে অন্ধ ও কৃষ্ণ-যবনিকা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন—তাহারা সে যবনিকা উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে নাই। সেই জন্য তাহাদের মতে, তাহাদের ইহলোক যেমন ছিল দেহরূপী সজীব আত্মার রাজ্য, তেমনি পরলোক ছিল দেহরূপী মৃত আত্মার রাজ্য। যাহারা অশরীর আত্মা মানিতেন, মৃত শরীর স্বভাবতই তাঁহাদের পক্ষে হইয়াছিল এক ঘৃণিত ও অশুচি বস্তু। কিন্তু যাঁহারা ইহলোকে সশরীর আত্মার অক্ষুণ্ণ রাজ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এমন কোনই পরলোক মানিতে পারেন নাই, যেখানে দেহের কোনরূপ অস্তিত্ব অপ্রয়োজন। সেই জন্য অসুরগণ মৃত দেহকে 'মৃতকের দেহ' বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাহাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া সুসজ্জিত করিতেন। দেহাত্মবাদের ইহাই হইয়াছিল স্বাভাবিক পরিণাম। জীবনে যেমন অসুরগণ দেহকেই চরম ও সার বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, তাহাকেই যেমন চরম উপাদেয় বলিয়া জানিয়াছিল, মৃত্যুতেও তাঁহারা মৃতদেহকেই মৃতকের পক্ষে চরম উপাদেয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। তাহাদের এই অযৌক্তিক আচরণে, উপনিষদের ঋষি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন—'অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় অসুরগণ (অর্থ না থাকিলে) ভিক্ষা দ্বারাও মৃতদেহকে সজ্জিত ও অলংকৃত করে।" ঋষি ভাবিয়াছিলেন ইহা অপেক্ষা দেহাত্মবাদের ন্যায়-বিগর্হিত উৎকট পরিণাম আর কিছুই হইতে পারে না। হায় বৃদ্ধ ঋষি! তিনি যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া একবার মিশরদেশে তীর্থযাত্রা করিয়া আসিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন, অর্থ থাকিলে, সে দেশের অসুরগণ মৃত-দেহ লইয়া কি আশ্চর্য্য খেলাই খেলিয়া থাকে। তিনি দেখিতে পাইতেন এক অত্যাশ্চর্য্য 'মমী'-করণ-বিদ্যাবলে তাহারা মৃত দেহকে চিরস্থায়ী করিতেছে। ততোধিক আশ্চর্য্য স্থাপত্য বিদ্যা বলে, তাহার মৃতদেহের জন্য পীরা-মিডের ন্যায় অভ্রভেদী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। এবং ঋষি যদি নবাবিষ্কৃত তুতুকামেনের গোরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিতেন তবে দেখিতে পাইতেন,—জাতকের জন্য নহে,—মৃতকের জন্য থরে থরে কত দ্রব্যসম্ভার ও ভোগ্য উপাদান—কত না মণি কাঞ্চন ও অমূল্য রত্ন কবরের মধ্যে

সজ্জিত রহিয়াছে। এবং ঋষি, দেহাত্মবাদের এই কালোচিত, উৎকট, ন্যায়-বিগর্হিত বি-পরিণাম দেখিয়া হয়ত হাসিয়াই খুন হইতেন। কিন্তু আসুরিক চতুষ্পাঠিতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা কখনই হয় নাই, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি Philosophy বলিয়া বস্তুটি আসুরিক প্রকৃতির সঙ্গে কখনই খাপ খায় নাই।

আসুরিক সভ্যতার ইহা সামান্য দিগ্‌-দর্শন মাত্র। এবং চেষ্টা করিলে আসুরিক সভ্যতার এক বিপুল ইতিহাসও সংকলন করা অসম্ভব নহে। এই সভ্যতার মূলে হইতেছে আসুরিক চিত্তবৃত্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই চিত্তবৃত্তির একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দান করিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন 'আসুরিক সম্পদ"। নামটি পরম সঙ্গত নাম হইয়াছে, কারণ আসুরিক সমৃদ্ধির মূল কারণ হইতেছে ঐ আসুরিক চিত্তবৃত্তিরূপ সম্পদ। ভগবদুক্তির কয়েক ছত্র উদ্ধার করিয়া আমরা অসুরগণের এই সামান্য বিবরণের উপসংহার করিতে চাহি।

'অসুরগন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বলিয়া কিছুই জানে না। তাহাদের মধ্যে শুচিতা, আচার ও সত্য বলিয়া কিছুই নাই তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে না। তাহারা বলে জগতের কোনই ঈশ্বর নাই। তাহাদের মতে জীব সৃষ্টির কোনই সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, কামহেতুক পরস্পর-সংযোগ হইতেই জীবসৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহারা এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, উগ্রকর্ম্মা হইয়া জগৎকে ক্ষয় করে। তাহারা নষ্টাত্মা, অল্প-বুদ্ধি ও জগতের অহিতকামী। তাহারা দম্ভ, মান ও মদান্বিত। তাহারা মনে করে অদ্য এই শত্রুকে নাশ করিলাম, কল্য অন্য শত্রুকে নাশ করিব; অদ্য এই ধন লাভ করিয়াছি, কল্য অন্য ধন লাভ করিব। তাহারা মনে করে 'আমিই আঢ্য', 'আমিই শ্রেষ্ঠ', 'আমিই অভিজাত।' ইত্যাদি ইত্যাদি"—গীতা-১৬।

এখন পাঠক, বিচার করিয়া দেখুন এই আসুরিক 'সম্পদের' প্রচ্ছন্ন ধারা বর্ত্তমান যুগের সমৃদ্ধ সভ্যতার মধ্যেও কোথাও কচিৎ প্রবাহিত হইতেছে কি না।

৩

কঠোপনিষদের বালক-ঋষি নচিকেতা যখন অসীম স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিল—"ন বিত্তেন তর্পনীয়াঃ মনুষ্যাঃ" —অর্থাৎ বিত্ত বা সম্পদের দ্বারা মনুষ্য কখনই তৃপ্ত হইতে পারে না,—কোথা হইতে সেই দৃপ্ত তেজস্বী বালক পাইয়াছিল তাহার এই আশ্চর্য্য বাণী? সে বাণী নিশ্চয়ই সে কোন মরা পুঁথির মধ্যে পাঠ করে নাই। সে তাহা পাঠ করিয়াছিল জীবিত ও জাগ্রত মনুষ্য হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে,—মানবচিত্তের সেই লুক্কায়িত অন্তঃস্তরের মধ্যে,—যেখানে এক অশান্ত চির-অতৃপ্তি নিরন্তর ধুমায়মান হইতেছে। এবং তাহা সকল সময়েই পথ খুঁজিতেছে আমাদের প্রকাশ-চেতনার উপরে উঠিয়া আসিতে। ভূগর্ভের অন্তর্গূঢ় আলোড়ন ও বিলোড়নের ন্যায়, অন্তর্হৃদয়ের সেই অতৃপ্ত অশান্তি, মহামায়ার সৃষ্টির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া, সকল সময়ে আমাদের অনুভবের তলকে প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্তু যখন ও যে দিন,—কোন এক শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা বুদ্ধ, কোন এক যিশু বা শ্রীচৈতন্তের মুখ দিয়া তাহা বহ্নিময়ী জ্বালা উদগার্ণ করিতে থাকে, সেদিন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, এ বহ্নি-স্রাব আমাদেরই হৃদয়ের নিরুদ্ধ বহ্নি-স্রাব, সে বাণী আমাদের হৃদয়েরই অ-কথিত বাণী। এবং সে বাণী হইতেছে অবিকল সেই বাণী, যে বাণী স্বয়ং প্রজাপতি আমাদের অন্তরের গহন গভীর প্রদেশে স্বহস্তে উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সে লেখা না থাকিলে তাঁহার সৃষ্ট লোষ্ট্র কাষ্ঠময় এই জগৎ এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগৎ হইত, সে লিখন না থাকিলে মানুষের সমস্ত বাসনা ও কামনা চরম অবসান প্রাপ্ত হইত এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যেই। এবং অসুরতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন তন্ত্রেরই অবসর থাকিত না এই বিপুল জগতের মধ্যে। সেই অতৃপ্ত অশান্তির বাণী অন্তরের অন্তস্তলে উপ্ত ছিল বলিয়াই, যিশুর ভাষায়, জগতের এমন ব্যবস্থাও সম্ভব হইয়াছিল যে—"Man shall not live by bread alone."

বুদ্ধদেব জগৎ দুঃখময় বলিয়াই দেখিয়াছিলেন। "সর্ব্বং দুঃখং" হইতেছে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ "মুদ্রা," যে মুদ্রা সমস্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বাজারে সর্ব্বসাধারণ ভাবে চলিয়াছিল। তাহা মহাযান ও হীনযান, সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছিল। কোথায় পাইয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধ এই মহামুদ্রার মূল

ধাতুকে ? তিনি কোনই শাস্ত্র, বেদ বা তন্ত্র মন্ত্রের মধ্যে তাহা পান নাই। তিনি সেই মূলধাতুকে পাইয়াছিলেন মনুষ্য-হৃদয়ের গভীর খনির মধ্যে।

সংসারের প্রিয় ও অপ্রিয়ের উপর চরম অনাস্থাই হইতেছে দৈব সভ্যতার নিয়ামক মধ্য-কেন্দ্র। এবং সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের আত্যন্তিক পরিহারের জন্যই ছান্দোগ্যের ঋষি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এক অশরীর আত্মার, কারণ,—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—অশরীর ও সৎ-স্বরূপ আত্মাকে কোনই প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।

সংসারের প্রতি মনুষ্যহৃদয়ের এই অন্তঃপ্রচ্ছন্ন অনাস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আমরা ঘোরতর সংসারী সাজিতে পারি, এবং সংসার-বিরাগীকে ইচ্ছামত গালিও দিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের সহজাত এই প্রিয় ও অপ্রিয়ের উপর অনাস্থাকে, আমরা কখনই রোধ করিতে পারি না। এই দুর্নিবার অন্তর্দস্যু বড়ই দুর্দ্ধর্ষ দস্যু। দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে সে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়ে, সদর বন্ধ থাকিলে, সে খিড়কী দিয়া প্রবেশ করে। এবং কর্ণকে বধির করিয়া দিলেও জীব তাহার অন্তঃহৃদয়ের অশান্ত কলকল্লোলধ্বনিকে কচিৎ শুনিতে পায়। এ সংসারে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি কোন-দিন-না-কোন-দিন অনুভব করেন নাই, তাঁহার হৃদয়ের গহন গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত এক অশান্তির কৃষ্ণ ধূমে তাঁহার সোনার সংসারকে আচ্ছাদন করিতে চাহে; তাঁহার রাজপুরীর মধ্যে কোনও এক নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, এক অতৃপ্তির প্রেত হাহাকারে কাঁদিয়া ফিরে; তাঁহার মোহন বাঁশীতে কি-জানি-কোথায় ফাটল' ধরে, যাহার জন্য তাঁহার সুখের ঐক্যতান সঙ্গীত একেবারেই বে-সুরা বাজে ?

দৈব সভ্যতার ভারতবর্ষে কিম্বা অন্য কোন দেশে, এমন কোনই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, যাহা স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ, মনুষ্য হৃদয়ের এই স্বতঃনিসৃত বৈরাগ্য-মন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত ও সংযত হয় নাই। এবং আমাদের দেশের দেব-পক্ষের সংসার-যাত্রা কেবলই স্বয়ংস্বাধীন সংসার যাত্রা হয় নাই, তাহা হইয়াছিল স্বর্গরাজ্যকে প্রাপ্তির জন্য সংসার যাত্রা। তাহা হইয়াছিল মুক্তিকে লাভ করিবার জন্য বন্ধনকে স্বীকার করা। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া, তাহা হইয়াছিল অতীন্দ্রিয়ের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন অসুরগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বলিয়া কিছুই স্বীকার করে না। কিন্তু দেবগণ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছিলেন, নিবৃত্তিকে লাভ করিবেন বলিয়া। অসুর পক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া কিছুই মানেন নাই। কিন্তু দেব পক্ষ তাঁহাদের সংসার যাত্রাকে নিয়মিত করিয়াছিলেন ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্মবিচার দ্বারাই। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়াছিল বিপুল, তাহাদের বিধি-নিষেধ হইয়াছিল সঙ্কুল, এবং তন্ত্র সকল হইয়াছিল বহুল।

এইরূপে তাঁহাদের যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আজো চারিদিকে দেদীপ্যমান। অশরীর আত্মার ধ্যানে বসিয়া তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বাত্মাকে। এবং সেই বিশ্বাত্মার শক্তি ও বিভূতির অসীম খেলা দেখিতে পাইয়াছিলেন এই অসীম বিশ্বরূপের মধ্যে। তাহাতে তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ প্রাতিভ-নেত্রের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের কত অগণিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণ। কত না বিচিত্র হইল তাঁহাদের পূজা ও হোমের বিধি,—কত না আশ্চর্য্য হইল তাঁহাদের পূজার মন্দির, এবং কত না বিস্ময়াবহ হইল সেই সব মন্দিরের কারুকার্য্য।

প্রজাপতির নিকট অশরীর আত্মবাদে তাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আত্মা কেমন করিয়া অশরীর হইতে পারে, কি করিয়া জীবের জন্মান্তরে দেহ ধারণের নিবৃত্তি হইতে পারে, এই হইয়াছিল তাঁহাদের প্রধান বিষয়, তাঁহাদের "Philosophy"র প্রবর্ত্তক। তাহাতে জাগ্রত হইয়া উঠিল তাঁহাদের আশ্চর্য্য ষড়-দর্শন বিচার, তাঁহাদের বেদ ও উপনিষদ, তাঁহাদের তন্ত্রশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র। এবং সেই জ্ঞান লয়েই তাঁহারা গাঁথিয়াছিলেন তাঁহাদের কাব্য ও কাহিনীর পুষ্পমালা।

দৈবী সভ্যতার, ঐ সকল অপেক্ষা আর কোন কিছুই অভ্রভেদী নিদর্শন হইতে পারে না এবং সেই অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ, আজো জগতের পতিত সম্রাজকে মুগ্ধ করিতেছে।

দৈবী সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ইহাই সংক্ষিপ্ত আভাস। এবং সেই সমৃদ্ধির মূলে ছিল তাঁহাদের দৈব-মানবী সম্পদ। এবং সেই সম্পদ নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"হে ভারত! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, জীবে দয়া, অলোলুপত্ব, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি হইতেছে অভিজাত ব্যক্তির দৈবী সম্পদ।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার

নীড় ও দিগন্ত

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১

অভিজাত শ্রেণীর একটি নৈশ ক্লাব।

এ পাশের টেবিলে চলেছে ব্রীজের আড্ডা, লম্বা ঘরখানার ওপাশ থেকে বিলিয়ার্ড স্টিকের শব্দ কাণে আসছিল। এদিকে বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন ধরণের তুমুল বিতর্ক উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি এবং সিনেমা থেকে আরম্ভ ক'রে সাহিত্য পর্যন্ত প্রদক্ষিণ চলছিল।

চমৎকার সাজানো ঘরটি, অর্থ এবং রুচির সমন্বয়ে ক্লাবটির একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র ও সুমার্জিত রূপ আছে। এই অঞ্চলের অর্থশালী এবং প্রগতিশালী যুবকদের পৃষ্ঠ-পোষণা, আগ্রহ এবং উৎসাহেই ক্লাবটি পরিচালিত হ'য়ে থাকে। "শেষের কবিতা"র "অমিট্রায়ের" মতো বোহে-মিয়ান জীবন এদের আদর্শ, সর্ব-সংস্কার মুক্ত সমাজ সংগঠনের এরা স্বপ্ন দেখে এবং এদের মধ্যে যা'রা আরো একটু অগ্রসর এবং সাহসী, তারা কার্ল মার্ক্স পর্য্যন্ত আওড়াতে ভয় পায় না। এদের প্রত্যেকের পকেটেই টাকা, হাতে মোটরের ষ্টিয়ারিং এবং পাশে ফিয়াসেঁ। এরা সত্যিকারের অভিজাত।

এদের মনোবৃত্তি ক্লাব ঘরের সর্বত্র চিত্রাঙ্কিত। রূপোর ফুলদানীতে, পাথরের টেবিলে, মোটা মোটা কুশান-আঁটা স্প্রীংয়ের চেয়ার সোফায় এবং শেরী ভারমাউথের গ্লাসে। দেওয়ালে খানকয়েক ইমিটেশান ছবি, রুবেন্স, লিওনার্দ-দ্য ভিঞ্চি, অ্যাঞ্জেলো অথবা টিশিয়ান। ঘরের মাঝখানে প্লাষ্টারে তৈরী অর্ধনগ্ন ভেনাস মূর্তি, বিশ্বের আদর্শ সৌন্দর্য, শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ মডেল মাইলোর ভেনাস।

বিখ্যাত ধনী পার্থসারথি রায় এই ক্লাবের অন্যতম প্রধান সভ্য। বয়েস ত্রিশের কাছে এসেছে, সুস্থ, সুশ্রী, দীর্ঘ চেহারা। নিশ্চিন্ত ভোগের এবং নিরুপদ্রব জীবনের ক্লান্ত ছায়া উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টিকে অনেকখানি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, মুখের ভাবে মূঢ়তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত। মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে দিয়ে কথা বলা ওর অভ্যাস, কিন্তু নিজের প্রচ্ছন্ন অভিজাত বোধকে ও কখনো অতিক্রম ক'রে উঠতে পারে না। প্রত্যেকটি চলনে বা বলনে সেটি প্রকাশ পায়। প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং পার্থসারথির জীবন স্বচ্ছন্দ বিলা-সিতার স্রোতে ভেসে চলছিল। অখণ্ড সুযোগ, অপর্যাপ্ত অবসর এবং অপরিমিত অর্থ,—মানুষ এর চাইতে বেশি আর কীইবা কামনা করতে পারে? হুইস্কির মতো ও এক নিঃশ্বাসে জীবনটাকে পান করতে চায় বন্ধনবিহীন সংযম-বিহীন।

ব্যারিষ্টার অনঙ্গ পাইপটা অ্যাশ ট্রেতে ঝেড়ে বললে, "বাস্তবিক, সেক্স জিনিষটাকে একটা স্বতন্ত্র রোম্যাণ্টিক বর্ণ বিন্যাস ক'রেই পৃথিবীতে যত গোলযোগের সৃষ্টি হ'য়েছে। এইখানেই মানুষ নিজের সহজ এবং স্বাভাবিক একটা বৃত্তিকে হঠাৎ নানা রকম রঙ ফলিয়ে কল্পনা ক'রতে সুরু ক'রেছে এবং ফলে পৃথিবীর সমস্ত নারী পুরুষের আদিম সম্পর্কটা যুক্তিহীন, আবছায়া এবং ঘোলাটে হ'য়ে গেছে।"

স্বর্ণগর্দভ নরেন ধূমায়িত কোকোর পেয়ালাটা তুলে নিয়ে ব'ললে, বড্ড পুরোনো তর্ক। ও ধরণের সেক্স প্রব্লেম্ নিয়ে দশ বারো বছর আগে ইয়োরোপীয় বিশেষ করে ইংরাজী, আমেরিকান আর ফ্রেঞ্চ সাহিত্যে দর্শনে চূড়ান্ত আলোচনা হ'য়েছে। মরেল্স এ প্রশ্নের জবাব সেই কবে এই ভাবে দিয়ে রেখেছেন, 'Sex is a communication like speech' এবং আরো বলেছেন যে কথা দিয়ে আই-

ভীয়াই যদি আদান প্রদান করা যায়, তা' হ'লে interchange of sensations'—

নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে এঞ্জিনীয়ার পশুপতি বললে, "থামো, থামো, ভাল্গার! আর্টিষ্ট মানুষ চিরকাল ধ'রে মনের এই বন্ধনকে জয় ক'রেছে, সেক্সকে অস্বীকার না ক'রলেও জীবনে সেই-ই শেষ কথা নয়। বার্ণার্ড শ'র নিজের কথা মনে নেই? তিনি বলেছেন, আর্টের চরম উন্নতি হয়েছে তখনি যখনি কোনো জাতির জীবনে যৌন প্রশ্ন অবান্তর ব'লে মনে হয়েছে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ভিক্টোরীয়ান্ সাহিত্যের ডিকেন্সের রচনায়"—

অনঙ্গ ঠোঁটের এক পাশে পাইপটা ধ'রে চিবানো তাচ্ছিল্যের সুরে ব'ললে, "শেম্! বার্ণার্ড শ! Is he a a man?"

বার্ণার্ড শ'র একান্ত ভক্ত 'শেভিয়ান' পশুপতি গর্জন ক'রে উঠল: "তা'র মানে? How d'you dare—"

অনঙ্গ অনুকম্পার ভঙ্গীতে বললে, "সার্টেইনলি। বার্ণার্ড শ'র মতের স্থিরতা আছে কবে? ছিলেন পুরোদস্তুর সোশ্যালিষ্ট, খেলেন একটা বিরাট ডিগবাজী। এমন কি, অ্যাবিসিনীয়া জয়ের সংবাদে মুসোলিনীর পিঠ চাপড়ালেন। সেক্সপ্রবণ সাহিত্যের বিরোধিতা করলেন, আবার লরেন্সের সেক্সজর্জরিত Lady Chatterley's Loverকে এক বিরাট প্রশংসা পত্র দিয়ে বললেন যে মেয়েদের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বইখানা রাখা উচিত।"

অনঙ্গকে সমর্থন ক'রে নরেন বললে, "অতি পাণ্ডিত্য এবং চমক লাগানো কতকগুলো উল্টো পাল্টা কথা ছাড়া শ'র আর কিছুই নেই, he is a bombastic nonsense."

পশুপতি সরোষে ব'ললে, "কী এত বড় কথা! তোমরা শ'কে বুঝতে পারো না, তাই—"

অনঙ্গ আবার নাক কুঁচকালো: "থাক, আর বুঝে দরকার নেই। বার্ণার্ড শ' এক সময়ে নিজেই বলেছিলেন, Everyman above forty is a scoundrel:—কথাটা বোধ হয় নিজেকে লক্ষ্য ক'রেই বলা, গৌরবে বহু বচন।"

এবার সবাই-ই হাসল, পরাজিত পশুপতিও। কিন্তু পশুপতি আবার গম্ভীর হ'ল, বললে, "যাই-ই বলো, ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মতো সমালোচকও স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন যে—"

—"Frank Harris! He is the next scoundrel."

—"আমি তোমার এ সব দায়িত্বহীন মন্তব্যে আপত্তি করি"—পশুপতি সজোরে টেবিলে একটা অতি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করলে। হাতের ধাক্কায় ফুলদানীটা ছিটকে পড়ল কার্পেটের উপর। ঘর শুদ্ধ লোক চকিত হ'য়ে উঠল, বিলিয়ার্ডের দল ষ্টিক হাতে নিয়েই এদিকে তাকালো এবং ব্রীজের আড্ডায় নো-ট্রাম্পের ডাক কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বন্ধ রইল!

পার্থসারথি এক গ্লাস সোডায় চুমুক দিতে দিতে একটা সোফায় ব'সে এই ব্যাপারটি উপভোগ করছিল। পশুপতির আকস্মিক উত্তেজনায় চম্‌কে উঠতে গ্লাস থেকে খানিকটা সোডা চল্‌কে সিল্কের সার্টের বুকটাকে ভিজিয়ে দিলো। পার্থ গ্লাসটাকে নামিয়ে রেখে' বললে, "কী পাগলামি আরম্ভ করলে বলো অনঙ্গ! যদি হাতাহাতি করতে চাও, তা' হ'লে গ্লাভস আনিয়ে দিই, দু'জনে বকসিং লড়ো। মিছেমিছি কেন আমাদের শান্তি ভঙ্গ করছ?"

নরেনের কোকোর পেয়ালা তখনো শেষ হয়নি', পেয়ালাটা মুখের কাছে ধ'রেই সে বললে, "এ যুগের লজিক হাতাহাতিতেই, তলোয়ারের মুখে। কথা দিয়ে মত প্রতিষ্ঠার সময় শেষ হ'য়ে গেছে নাৎসীজ্‌মের আগে, অথবা সেই উনিশ শো চোদ্দ সালে। সুতরাং—"

কথাটা কুড়িয়ে নিয়ে অনঙ্গ বললে, "সুতরাং এটাই এ যুগের এথিক্স।"

পার্থ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে, "এ-ই যদি তোমাদের এথিক্স হয়, তা' হ'লে খোলা মাঠের ভেতরে দু'জনে নেমে' পড়ো, অথবা পয়সা রোজগার করতে হ'লে কার্নিভালে—"

অনঙ্গ মৃদু হেসে' বললে, "বন্ধু হে, দুনিয়াটাই যে একটা বিরাট কার্নিভাল।"

দেওয়ালের গায়ে কারুকার্যকরা ক্লকটাতে 'আম' ষেক-ভের্র সুরে দশটা বাজল। ওভারকোটটা কাঁধে তুলে' নিয়ে

পশুপতি দাঁড়িয়ে উঠল: "অনেক রাত হ'য়েছে, no more today। কিন্তু এও আমি নিশ্চয় ব'লে রাখছি অনঙ্গ, তোমার ভুল আমি ভাঙবই।"

অনঙ্গ পাইপ্‌টা চিবিয়ে তেমনই একটু হাসল। "আচ্ছা গুড্‌নাইট", ব'লে ভারী জুতোর শব্দ ক'রে ভারী মুখে পশুপতি বে'র হ'য়ে গেল।

নরেন বললে, "ওকে চটানো এত সহজ! He is as simple as a child."

ক্লাবের আর্দালী পার্থের সামনে এসে' দাঁড়ালো: "হুজুরকে টেলিফোনে ডাকছে।"

—"আমাকে?"

—"জী।"

—"এত রাত্রে আবার কে ডাকাডাকি করছে? যত সব বিড়ম্বনা"—পার্থ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল এবং ফোন ধরল। মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা আর্ত-চীৎকারে সমস্ত ক্লাব চকিত এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল, সমস্ত সুসজ্জিত সুনিয়ন্ত্রণের উপরে ঘটল রূঢ় ছন্দ পতন।

পার্থ ফোনের সামনে মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছে, পতনের বেগে টেবিলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ লেগে' কপালের অনেকখানি বিদীর্ণ, তাজা রক্তে কার্পেট অভিষিক্ত হ'য়ে যাচ্ছে।

২

এই কাহিনী বলবার পূর্বে পার্থ সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা বিবৃত করা প্রয়োজন।

জীবনে যারা পায়, তা'রা একেবারে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রেই পায়, সমস্ত চাওয়া তাদের প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠে। দুঃখ যেমন নিজের গতিতে চলতে চলতে পরম দুর্গতিতে সমাপ্তি লাভ করে, পূর্ণতার লগ্নটিও মানব জীবনে ঠিক সেই রকম। সে নিজেকে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করতে থাকে, তার আকাঙ্ক্ষার পাশে পাশে রাশি রাশি প্রাপ্তি পুঞ্জিত হ'য়ে ওঠে।

পার্থ সারথির জীবনের দিকে তাকিয়ে একথা আমার বার বার মনে হয়েছে। সে সব পেয়েছে, কোনখানে অপূর্ণতা নেই, অসন্তোষও হয়তো নেই, শিক্ষা, সম্মান, অর্থ এবং নারীর ভালোবাসা।

প্রকাণ্ড কারবার, ধানচালের ব্যবসায়, লক্ষপতি। গ্র্যাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে একশো মাইল স্পীডে ছুটে'-চলা মোটরের মতো স্বচ্ছন্দ, বন্ধনমুক্ত জীবন। নিজের জন বলতে বড় কেউ নেই, এমন কি একজন বিধবা মা পর্যন্ত নয়! সংসারের কোনো আকর্ষণ সে চলায় বাধার সৃষ্টি করে না। দূরের সম্পর্কিত আত্মীয়েরা মাঝে মাঝে বিয়ের কথা তোলেন —পার্থ সে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু বিয়ের কথা ও যে একেবারে না ভেবেছে, তা' নয়। অবশ্য, প্রথম কিছুদিন পায়ে একটা শৃঙ্খল জড়ানোর কথা ভয়াবহ বলেই মনে হ'ত, কিন্তু নানারকম পারিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ওর নিজের মতি পরিবর্তনের কারণ ঘটেছে। নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হয়। এক একটি ক্লান্ত মুহূর্তে যখন রাত্রির মায়া সমস্ত সহরের বুকের উপর দিয়ে ঘনিয়ে আসে, মানুষের কলরব, ট্রাফিকের কুশ্রী কর্কশ শব্দ অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হ'য়ে যায়, রাত্রের বাতাসে আচ্ছন্ন আবেশ লাগে, তখন মনটা কিসের জন্ত যেন অশান্ত অস্থির হ'য়ে ওঠে, কি যেন অতৃপ্তির একটা তীক্ষ্ণ অথচ সূক্ষ্ম স্পর্শ ও অনুভব করতে থাকে। মনে হয়: সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে' কি যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা'র সাড়ীর খস্‌খস্‌ শব্দ কাণে আসে, দেহের গন্ধ স্পষ্ট অনুভব করা যায়, একটা অভিনব, সম্পূর্ণ উপস্থিতি। ওর শ্রান্ত ললাটের উপর যেন তার হাতের কোমল স্পর্শ লাগে, দেহমন জুড়িয়ে যায়।

পার্থ ভাবে—ভাবতে ভালো লাগে। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে পা মিলিয়ে চলে; ছায়ার মতো অনুসরণ করে নয়, সঙ্গীর মতো পাশে পাশে। শাণিত প্রখর নয়, স্থির শ্যামল মেঘের মতো প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি। আটলান্টিকের মতো তরঙ্গোচ্ছল নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের মতো গভীর এবং মৌন। ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিয়ে মাতামাতি করে না, জোলা জয়েস্‌ও নয়, ওর কণ্ঠে সুইন্‌বার্ণের আবৃত্তি শুনতে ভাল লাগে, ভাবমুগ্ধ গভীরভাবে, উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিয়ে ও ব্রাউনিঙ পড়তে পারে।

বাস্তবিক, মনের দিক দিয়ে পার্থ যেন অনেকটা রক্ষণশীল, অনেকটা মধ্যপন্থী। আলোকে ও অন্ধকারে কিন্তু

বস্ত্রের আলো নয়, প্রদীপের প্রতি ওর একটা মোহ আছে, মাঝে মাঝে পল্লী-বাস এবং ভ্রমণের সংকল্পও যে ওর মনে চাড়া না দিয়েছে, তা' নয়। ওর রক্তে মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা অদ্ভুত কান্নার সুর ঝঙ্কৃত হ'যে ওঠে, তা'র সমাধান খুঁজে' পাওয়া যায় না, অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরো আশ্চর্য, আরো বিস্ময় এই যে, মাঝে মাঝে পার্থ নিজের মধ্যে একটা কিসের যেন প্রেরণা অনুভব করে, মনে হয়, ওর যেন নেশা লেগেছে। কতকগুলো এলোমেলো ভাবনা, টুকরো টুকরো কথা যেন গানের কলির মতো অন্তরে সাড়া দিয়ে ওঠে, ও যে কি করবে ভেবে' পায় না, ইচ্ছে হয়, কবিতা লেখে।

কিন্তু কবিতা! লিখবার কথা কল্পনা করতেও মনটা আপনা থেকে কুঁকড়ে' যায়, ভয় করে। নিজের উপর বিশ্বাস যে একেবারে নেই তা' নয়, কিন্তু কবিতার কথা মনে পড়তেই ক্লাব-বন্ধুদের মুখগুলো একে একে মনের সামনে ভেসে' ওঠে।

কিছুদিন আগের কথা মনে পড়ে। ওদেরই ক্লাবের এক সভ্য তাঁর একটি সাহিত্যিক বন্ধুকে একদিন নিয়ে' এসেছিলেন। সাহিত্যিক ভদ্রলোকটি বয়সে তরুণ হ'লেও বাংলা মাসিক সাপ্তাহিকগুলোতে তাঁ'র রচনা সাদরে এবং সাগ্রহে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে, এক ধরণের প্রতিষ্ঠাও তাঁর আছে।

কিন্তু এই ধরণের কবি এবং সাহিত্যিকেরা এই ক্লাবের সভ্যদের কাছে করুণা এবং অবজ্ঞার পাত্র। এই সব রোমান্টিসিষ্টদের এরা শ্রদ্ধা করে না। এদের মতে, এই সব সাহিত্যিকের বনিয়াদ সস্তা সেন্টিমেন্টের উপরে, এদের কবিতা অতি কাল্পিক, এরা দৃশ্যমান বস্তুকে অস্বীকার ক'রে চোখ বুজে অবস্তুর স্বপ্ন দেখে।

সুতরাং চিরকালের স্কেপ্টিক্ অনঙ্গ তেমনি বিচিত্র ভঙ্গীতে ঠোঁটের প্রান্তদ্ব'টি কুঁচকে প্রশ্ন ক'রেছিল, "আপনি বুঝি লেখেন?"

সাহিত্যিক ভদ্রলোকের কাছে এই অভিজাতচক্র এবং এ হেন পরিবেষ্টনী সম্পূর্ণ নূতন, কাজেই তিনি বারকয়েক ঢোঁক গিলে দ্বিধা জড়িত স্বরে জবাব দিয়েছিলেন: "আজ্ঞে এই, হ্যাঁ"

—"ওঃ বেশ, বেশ! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনাকে?"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলুন?"

—"আপনার লেখাটেখা আসে কেমন করে? মানে, কি ভাবে লেখেন?"

ভদ্রলোক বিব্রতভাবে মাথা কণ্ডুয়ন করতে থাকেন: "তা,—তা—"

—"থাক, আর বলতে হ'বে না। ইন্‌স্‌পিরেশান থেকে নিশ্চয়ই, কি বলেন?"

বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিক যেন অকূলে কূল খুঁজে' পা'ন। মুখের ভাব অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে আসে, এতক্ষণ পরে নিজে কিছু বলবার এবং স্বাভাবিক ক'রে দেওয়ার জন্যে বলেন, "হ্যাঁ, অনেকটা তাই-ই বটে। ভাবতে ভাবতে মনটা কেমন ক'রে খুলে যায়, কথার পর কথা, ভাবনার পর ভাবনা সহজগতিতে বেরিয়ে আসে, নিজে যেন কেমন একটা—"

—"হুম্—" অনঙ্গ রীমলেশ চশমার মধ্য দিয়ে বক্র শ্লেষবর্ষী দৃষ্টিতে সাহিত্যিকের মুখের দিকে তাকায়: "দেখুন, কিছু মনে করবেন না। ব্রেইনে গোলমাল হ'য়ে গেলে মানুষ এলোমেলো অনেক আজগুবি স্বপ্ন দেখে, ডিলিরিয়ামও কম আওড়ায় না; সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ইন্‌স্পিরেশানের নামে সেই ক্ষ্যাপামি পরিবেশনের মোহ আপনাদের কি আজও গেল না? এমন ফাঁকির কারবার আর ক'দিন চলবে, মানুষের মনের উপর জোচ্চুরি ক'রে আর কতকাল আপনারা বাহবা নেবেন?"

অনঙ্গের সে কথাগুলো পার্থ ভোলেনি'। ইন্‌স্‌পিরেশনের কবিতা, স্বপ্নমধুর আত্মবিস্মৃতির কথা এই অভিজাত সঙ্ঘে পরম উপহাস এবং অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ হিসেবে উপভোগের বস্তু। সাহিত্য-ক্ষেত্রে, তথা বাস্তব জীবনে এরা একেবারে আইসক্রীমপন্থী, অর্থাৎ আইসক্রীম খেয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে এরা বুদ্ধিবাদী এবং বাস্তববাদী সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে চায়।

তাই পার্থ কবিতা লিখতে ভয় পায়, আইসক্রীমপন্থী সাহিত্যকে ও যেন ঠিক মতো বুঝতে পারে না। এখানে ওর মৌলিক ত্রুটি। না, অস্বীকার করে লাভ নেই, মনের

ভেতরে পার্থ রোমাণ্টিক, একান্ত ভাবেই রোমাণ্টিক। কিন্তু বন্ধুসঙ্ঘে একথা প্রকাশ করবার উপায় নেই, তা' হ'লে কঠোর বিদ্রূপের আঘাত ওকে দু'দিনেই জর্জরিত ক'রে তুলবে। প্রখর মননশীলতাকেই ওরা একমাত্র বিশ্বাস করে, অন্তরের দাবীকে ওরা বুদ্ধিবাদের ধারালো চকচকে ছুরিখানা দিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ ক'রে দিতে চায়, তীক্ষ্ণ ইণ্টেলেক্চুয়ালিজ্‌ম্‌কেই ওরা একমাত্র সত্য ব'লে জানে।

এই বুদ্ধিবাদীদের চোখে জীবনের রূপ রঙ সব কিছুই স্বতন্ত্র, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সমস্ত জিনিষকেই এরা মনস্তত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করে। প্রেমের কথা শুনলে এরা হাসে, অনঙ্গ পাইপটা চিবিয়ে বলে, "ট্র্যাস্‌!"

নরেন গম্ভীরভাবে কোকোর পেয়ালায় চুমুক দেয়, "এক সেঞ্চুরী আগে প্রেমের কথাটা শোনাতো ভালো।"

বার্ণার্ড শ'—প্যাটার্ণ পশুপতি তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে: "এরা হ'চ্ছে অক্টেভিয়াসের দল, 'লাইফ ফোর্সের' ওপরে একটা সেণ্টিমেণ্টের বুদ্‌বুদ ফেনিয়ে তোলে।"

কিন্তু তবুও পার্থ প্রেমে পড়েছে, বুদ্ধিবাদের জগতে বহু নিন্দিত হলেও ও প্রেমে পড়েছে। রমাকে ওর ভালো লাগে। দীর্ঘ দু' বছর থেকে দু' জনের মধ্যে মন দেওয়া নেওয়া চলেছে, বহু জ্যোৎস্না রাত্রি কেটেছে গড়ের মাঠে, খিদিরপুরের ডকে, শরতের শান্ত-অপরাহ্নে লেকের পারে, বটানিক্যাল গার্ডেনে। বন্ধুরা কেউ কেউ যে এই ব্যাপারটির সন্ধান রাখেনা তা' নয়, কিন্তু এদের এই অভিজাত চক্রে কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা যেমন অভদ্রতা, তেমনি অপরিণত রুচির পরিচয়।

এই বিয়ের কথায় তাই পার্থের মনটা সাড়া দিয়ে উঠল: সত্যিই তো, ঘর বাঁধলে দোষ কি! জীবনের প্রহরগুলো চলেছে নিজেদের গতিচ্ছন্দে, যত দিন যাচ্ছে, যৌবনের মুহূর্তগুলো স্বল্প থেকে স্বল্পতর হ'য়ে আসছে। এই মাধবী-লগ্নকে নিজের সীমার মধ্যে আস্বাদন করলে ক্ষতি কোথায়?

বাস্তবিক, পার্থ রোম্যাণ্টিক। ওর মনটা কস্‌মোপলিটান হওয়ার মতো ব্যাপক নয়। ওর অন্তরের চিত্রপটের ছবি শ্যাম্পেনের রঙে আঁকা নয়, সেখানে সবুজের শ্রী-বিন্যাস আছে। হ্যাঁ, বিদ্যুতের আলোর চাইতে প্রদীপের প্রতি মোহ ওর প্রচণ্ড, ওর মনটা কাব্যপ্রবণ, হয়তো কোনো অসংযত দুর্বল মুহূর্ত্তে কবিতা লিখে ফেলাও ওর পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে।

অতএব পার্থ ঘর বাঁধবে, ঘাটে ঘাটে তরী ভাসিয়ে বেড়ানোর চাইতে কোনো গ্রামের ছায়ায়-ঢাকা কোকিল-ডাকা পুরোনো ঘাটলাটির পাশে ছাতিম গাছের ছায়ায় ওর নৌকাখানিকে ও বাঁধবার কল্পনা ক'রে। টপ্‌ স্পীডে মোটর ছুটিয়ে চলতে ভালো লাগে, কিন্তু তা'র চাইতেও ছায়াস্নিগ্ধ ঘাটের পাশটিতে ঘাসের উপরে বাঁশি নিয়ে বসতে ওর আরো ভালো লাগে। পায়ে হাই হিল নয়, দামী রেশমী শাড়ীর বাহার নয়, হাতে জাপানী পাখা নয়, বেণু-চ্ছায়াঘন পথে রমা মৃদু চরণে ঘাটের পানে নেমে আসে, ওর কাঁখে কলসী। এইখানে, এই নির্জ্জন ঘাটে গলা ডুবিয়ে ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্নান করবে, গুন গুন ক'রে গানের একটা কলি গুঞ্জন করবে। তার পর সন্ধ্যা হ'বে, ছাতিম গাছটার আড়াল দিয়ে ঘাটের উপর জ্যোৎস্না ঝ'রে পড়বে, সিক্তবস্ত্রে, দেহের পরিস্ফুট বিকাশে নিজেকে সংযত করতে করতে কলসীটিতে জল ভ'রে নিয়ে আলো-ছায়া-খচিত পথে ঝরা পাতার মর্ম্মর জাগিয়ে ও ঘরে ফি'রে যাবে। এইবারে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলবে, শঙ্খ বাজবে এবং—

পার্থ সজাগ হ'য়ে ওঠে; নাঃ ওর মনটা বড্ড অবিশ্বাসী, সংযত হ'য়ে চলতে জানে না। যখন নেশা ধ'রে তখন যে কোথা থেকে কোথায় ভেসে যায়, ভেবে তা'র কূল-কিনারাই পাওয়া যায় না। সত্যি ও সেণ্টিমেণ্টাল, বেজায় সেণ্টিমেণ্টাল। ওর পারিপার্শ্বিকতা এবং পরিস্থিতির মাঝখানে ওকে মোটেই মানায় না, সেখানে ওর জন্যে স্থান নেই।

—কিন্তু স্থান না থাকলেও কী খুব বেশী ক্ষতি আছে?

মনের দিক দিয়ে প্রশ্ন জাগলেও পার্থ জোর ক'রে সে প্রশ্নের কণ্ঠরোধ ক'রে দেয়। ও সামাজিক মানুষ, সমাজকে ও যতটাই শ্রদ্ধা করুক না কেন, তা'কে স্বীকার করে। তবে এই অভিজাত সমাজের উদারতা আছে, ও বিয়ে করলে কেউ প্রশংসা হয়তো করবে না, নিন্দাও

করবে না। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র রুচি এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারকে অনাসক্ত ও নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করবার শিক্ষা এদের আছে।

যেদিন সন্ধ্যায় পার্থ ফোনের কাছে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল, তা'র পরের দিনই ওর রমার কাছে প্রোপোজ করবার সঙ্কল্প ছিল।

৩

পার্থের যখন জ্ঞান হল, রাত প্রায় একটার কাছাকাছি।

মাথার উপরে বোঁ বোঁ ক'রে ফ্যান ঘুরছে, চারদিকে লোকজন, ডাক্তারের দল। পার্থ চোখ মেলে অর্থহীন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো, বললে, "আমি কোথায়?'

মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অনঙ্গ বললে, "তোমার নিজের বাড়িতে। এখন কেমন বোধ করছ পার্থ?"

—"একটু ভালো। কিন্তু কী হয়েছিল বলো তো?"

—"তুমি ক্লাবে ফোনের সামনে হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে পড়ে গিয়েছিলে।"

—"ফোনের সামনে—ফোনের সামনে!" পার্থ নিজের অবস্থাটাকে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল, অসুস্থ আলোড়িত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে কী একটা কথাকে অনুসন্ধান করতে লাগল। কি হয়েছিল ওর, কী হয়েছিল? ফোনের সামনে ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল কেন?

সমস্ত মাথার ভেতর দিয়ে যেন বিপ্লবের একটা প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে গেছে, সেখানে সব কিছুই বিশৃঙ্খল, সব কিছুই ওলট পালট্, কোনো নিশানা যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাট ঝড়ের শেষে ভাঙা গাছপালায় চেনা পথঘাট যেমন ঢাকা পড়ে থাকে, চিনতে দেরী হয়, তেমনি ওর মস্তিষ্ককে ঠিক মতো জাগ্রত এবং সুস্থ করে নিতে খানিকটা সময় লাগল।

কিন্তু পরক্ষণেই পার্থ সজাগ হয়ে উঠল, নির্মম, নিদারুণভাবে সজাগ হয়ে উঠল। এর চাইতে মূর্চ্ছা ভালো, অচেতন আত্ম-বিস্মৃতি অনেক ভালো। পার্থ হঠাৎ আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, "অনঙ্গ, অনঙ্গ!"

অনঙ্গ পার্থকে স্থির রাখবার জন্তে শশব্যস্তে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে, বললে, "অমন করছ কেন? থামো, থামো—"

—"আমার কারবার ফেল ক'রেছে অনঙ্গ,—ম্যানেজার ফোনে খবর পাঠিয়েছে। I am a drowned man,—absolutely drowned!—"

প্রবল কণ্ঠে আর্তনাদ করে পার্থ দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

পার্থ সারথির বাবা রণজিৎ রায় যখন এই কারবারটার প্রতিষ্ঠা করেন, সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা। পুরুষানুক্রমে তাঁরা জমিদার, মেদিনীপুর অঞ্চলে নাকি তাঁদের বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু আরো দশজন বাঙালি জমিদারের মতো পূর্ব্ব পুরুষদের রক্তে রক্তে বিচরণ করত উচ্ছৃঙ্খলতার জীবাণু, উপভোগের সুরাপাত্রে তাঁরা জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার লীলাবিলম্বিত গতি নয়, বাংলা অক্ষরবৃত্তের প্রখর তেজস্বী দুর্বার ছন্দ।

কিন্তু উপচে-পড়া ঐশ্বর্য্যের বানের জল যেদিন নেমে গেল, সেদিন উত্তরপুরুষেরা বিস্মিত ক্ষোভে তাকিয়ে দেখলে দিগন্তবিস্তৃত পঙ্ক-শয্যার মাঝখানেই তা'দের আশ্রয়, বিপুল অর্থ বিরাট জমিদারী প্রায় অপস্রিয়মান। শুধু পরিশিষ্ট র'য়েছে ব্যভিচারের অতীত ইতিবৃত্ত, রক্ত-কলঙ্কিত অত্যাচারের দিনগুলির স্মৃতি। শুধু কাঁচভাঙা ঝাড় লণ্ঠন, মেজেতে ছিন্ন গালিচা, ভগ্ন সুরাপাত্র এবং শূন্য মদের গ্লাশ। পুরানো বড় বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্ছল ভোগের অতৃপ্ত হাহাকার এখনো অতৃপ্ত ক্ষুধার সাড়া দিয়ে ফিরছে, নটীর চঞ্চল চরণে নূপুরের ঝঙ্কার এখনো তা'র কক্ষে কক্ষে নিস্তব্ধ হ'য়ে আছে।

—স্মৃতিই তো আর সব নয়। অতএব পৃথিবীর সাথে উত্তরপুরুষদের মুখোমুখি করতে হোলো, বলিষ্ঠ এবং কঠোর। অস্পৃষ্ট পৃথিবীর ধুলোবালি আজ এতকাল পরে তা'দের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল, "এতদিন পরে তা'রা

মাথার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীব্র কিরণ দীপ্তি অনুভব করলে। এতদিন পরে পৃথিবীর কঙ্কর আর কাঁটা তাঁ'দের পা রক্তাক্ত ক'রে তুলল।

তবুও কঙ্কালের পূজা তবুও অতীত গৌরবের উপর নির্ভর ক'রে পুরোণো বহু ব্যবহৃত অচল টাকা ভাঙিয়ে মিথ্যা আভিজাত্যের দিনচর্যা। হাঁড়িতে অন্ন না থাকতে পারে, কিন্তু বৈঠকখানায় চব্বিশঘণ্টাই সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া উঠছে। ঋণের পর ঋণ বেড়ে' চলেছে, পৈতৃক বাড়িটা পর্যন্ত মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে, কিন্তু মহা সমারোহে দোল দুর্গোৎসবের বিরাম নেই, বাঈ নাচ যাত্রাগানের ত্রুটী হয় না। ক্রিয়াকর্মে আজো জমিদার বাড়িতে সমস্ত গ্রামের পাত পড়ে, আজো এঁদের কাছে হাত পাতলে একান্ত অভাবগ্রস্তকে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়না।

এইখানেই শেষ অধ্যায়।

নিভবার আগে প্রদীপের বুক জ্বলা এবং তারপরেই পূর্ণ বিস্তৃতির নিরন্ধ্র অন্ধকার। আশ্রয়হীন পথে দিগন্তে বিস্তৃত স্মৃতির দংশন বক্ষে বহন ক'রে একলা চল রে—'

রণজিৎ রায় এঁদেরই একজন। রাজধানীর কর্ম-সংগ্রাম উদ্বেলিত পথে চলতে চলতে পৃথিবীর স্বরূপ তিনি অনেকটাই অনুভব করতে পেরেছিলেন। পৈতৃক যৎসামান্ত দেশের জমিজমা অবশিষ্ট ছিল, তা' সমস্তই বিক্রী ক'রে দিয়ে যে টাকা কয়টা হাতে এলো, তাই দিয়ে তিনি ধান-চালের কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জানতেন তাঁর ব্যবসাকে বাঙালি সাধারণ হয়তো শ্রদ্ধা করবে না, হয়তো তাঁর তথাকথিত সামাজিক মর্য্যাদা ব্যাহত হ'বে, কিন্তু রণজিৎ রায় এটা নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে অর্থ বস্তুটি যদি না থাকে, তা' হলে সমস্ত মর্যাদা বোধই হাত পা গুটিয়ে তিরোধান করতে বিলম্ব করে না। তিনি আরো জানতেন, যদি ব্যবসা তাঁর ঠিকমতো চলতে পারে, তবে সোসাইটিরূপ লষ্ট প্যারাডাইস রিগেইনড হ'তে খুব বেশি সময় লাগবে না।

রণজিৎ রায়ের উত্তর জীবনে এই সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিল। ব্যবসা বিস্তৃত হ'তে লাগল, ফেঁপে' উঠল ব্যাঙ্কের ব্যালান্স, মাথা খাড়া করলে বিরাট অট্টালিকা এবং গ্যারেজে একাধিক মোটর শোভা পেতে লাগলো। আলাদীনের মায়াপ্রদীপের স্পর্শে দেখতে দেখতে সমস্ত অবস্থাটাই বিবর্তিত হল, চাল-ওয়ালা রণজিৎ রায়কে নিজের বেশিদূর এগিয়ে যেতে হ'ল না, সোসাইটিই স্বয়ং আগ বাড়িয়ে এসে তাঁকে গ্রহণ করলে। দেখতে দেখতে তিনি তিনটে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হলেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হ'লেন কর্পোরেশনের কমিশনার, পাড়ার স্কুলটা তাঁকেই সেক্রেটারী করলে এবং স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্মানও তিনিই লাভ করলেন। তারপর রায়-সাহেব থেকে রায়বাহাদুর এবং অতঃপর যখন সি, আই, ই, হবার আয়োজন চলছিল, এমন সময়ে তিনি লোকান্তরিত হলেন।

পার্থ তখন সবে এম-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছে, টেনিস খেলে দিনগুলো মন্দ কাটছিল না, ভালো প্লেয়ার হিসেবে কিছুটা খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল। লাহোরে অল্ ইণ্ডিয়া টেনিস কম্পিটিশানে মেন্স সিঙ্গল্-এর ফাইন্যাল, পার্থের বিজয় সুনিশ্চিত। ঠিক সেইদিন সকালেই টেলিগ্রাম এলো: রণজিৎ রায় সাংঘাতিক পীড়িত। টেনিস র‍্যাকেট্ মুড়ে রেখে পার্থ তৎক্ষণাৎ সুটকেস গোছালো, কিন্তু পঞ্জাব মেইল হাওড়া ষ্টেশনে পৌছবার দশবারো ঘণ্টা আগেই রণজিৎ পৃথিবীর থেকে বিদায় নিলেন।

এইবার পার্থের জীবনের গতি অনেকখানি পরিবর্তিত হল। অসীম বিস্মিত এবং প্রচুর বিপদগ্রস্ত হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে যে এই বিরাট ব্যবসার দায়িত্ব এখন ওরই হাতে, কোনোদিকে আর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। এতদিন ধরে বহির্মুখী মন যে অবাধ স্বাধীনতা ও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ভোগ করছিল, তা'র দিন এবার শেষ হয়েছে।

প্রথম উৎসাহে পার্থ কারবারের পেছনে মনোযোগ দিলে, কাজকর্ম দিনকতক চললও ভালো। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত কারবারের সুশৃঙ্খল কার্য-পদ্ধতি পার্থকে ক্রমশ অলস ও কর্মবিমুখ ক'রে তুলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে কাজে আলস্য ধরল, পার্থ আবার ধীরে ধীরে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে আরম্ভ করলে। পার্থ পুরোণো র‍্যাকেটের ধুলো ঝাড়লে, নতুন টেনিস স্যুটের অর্ডার দিলে, নাইট ক্লাবগুলোতে আবার মোটা হারে জুয়া খেলা আরম্ভ

করলে এবং বন্ধুচক্র তা'কে আবার ফিরে পেয়ে সোল্লাস অভিনন্দন জানালে।

অনঙ্গ বললে, "So, you see my friend, আনন্দ এবং worship of Mammon cant walk side by side।"

নরেন বললে, "সেইজন্যেই তো পার্থ আবার ফিরে এসেছে।"

পশুপতি শুধু একটু হাসলে, কোনো কথা বললে না। কাজের লোক সে, তার নিজেকে উপার্জন করতে হয় এবং টাকার মূল্য সে বোঝে। পার্থের প্রত্যাবর্তনে সে খুশি হ'ল নিঃসন্দেহ, কিন্তু ব্রীফ্‌লেস ব্যারিষ্টার অনঙ্গ বা লাখো-পতি নরেনের মতো এমন বেপরোয়া সমর্থন দিতে পারলে না। তাই অবসর সময়ে অন্যের অজ্ঞাতে সে পার্থকে প্রশ্ন করলে,—"কি হে, সবই একেবারে হাত থেকে ছেড়ে দিলে নাকি?"

—"কি সব?"

—"এই কারবার টারবার গুলো? কিছু মনে কোরোনা ভাই, একটা কথা তোমাকে বলি। দেখো, সমস্ত দায়িত্ব যখন এখন তোমারি ওপর, তখন এসব দিকে সর্বদাই একটু নজর রেখো। পরের ওপর নির্ভর করে কিন্তু ব্যবসা চলে না।"

পশুপতির "সীরিয়াস্" মুখের দিকে তাকিয়ে পার্থ হাসল: "তুমি যে নিতান্ত বৈষয়িক গুরুদেবের ভঙ্গী নিয়েই উপদেশ দিচ্ছ পশুপতি! হঠাৎ এই সাবধান: ব্যাপারটা কি বলো দেখি?"

পশুপতি গম্ভীর হয়ে বললে, "নাঃ, সত্যি ঠাট্টা নয়। অনঙ্গ আর নরেন না হয় নিশ্চিন্তে দায়িত্বহীন এপিকিউ-রিয়ান্ লাইফ লীড করতে পারে, কিন্তু তোমার অবস্থা তা'দের মতো এমন হালকা উড়ে'-বেড়াবার মতো নয়। Always follow your father's glorious footprints, আর মনে রাখবে, a bad boss spoils an office।"

পার্থ সকৌতুকে বলেছিল, অশেষ ধন্যবাদ, মনে থাকবে।"

কিন্তু মনে ছিল না।

শান্ত-সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে জাহাজ ভেসে চলেছিল, উৎসবের কলরব সমুদ্র বায়ুকে উন্মুখর করে তুলছিল। বসন্তের মেঘমুক্ত নীল আকাশ থেকে জ্যোৎস্না অঝোরে ঝরে পড়ছিল, সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে রূপের মণি-মাণিক্য যেন খণ্ডছিন্ন হয়ে অভিনব সৌন্দর্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ, চারদিকে মুহূর্তে আর্তক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল, চীৎকার আর কলরবে নৈশ-গগন মথিত হ'ল। ডুবো পাহাড়ে আঘাত লেগে জাহাজ বিদীর্ণ হয়ে গেছে!

এলো সর্বনাশের পালা—

তারপরে মহাসাগর—আশ্রয় তৃণখণ্ড!

(ক্রমশঃ)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বৈষ্ণব-সাহিত্যের গোড়ার কথা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এক

সামাজিক বিধি নিষেধ রচিত হয় সমাজকে রক্ষা করবার জন্য, পুষ্ট করবার জন্য। রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে থাকে রাষ্ট্রের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য। সাহিত্যও ঠিক তেমনি মানবের মনের রক্ষণ ও পুষ্টির জন্যই রচিত হয়ে থাকে।

মনের খোরাকের দিকে দৃষ্টি না রেখে শুধু দেহের রক্ষা ও পুষ্টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে বীর্য্যবান পশু তৈয়ারী হতে পারে কিন্তু সত্যিকার মানুষ গড়ে উঠে না। সাহিত্যের দুইটি অংশ। একটি কাহিনী, অপরটি কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্য। এই সত্যই মনের খোরাক। মানব মন সর্ব্বদাই সত্যের অনুসন্ধিৎসু। সত্যকে লাভ করার জন্য দিন রাত সে প্রত্যেক গোপনতার দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরছে। এ বিশ্বের অন্তরালের গোপন সত্যকে লাভ করার জন্য তার অফুরন্ত প্রয়াস। সেই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারলে, তাকে লাভ করতে পারলে—মন সত্যের সাহিত্য লাভ করে থাকে। কিন্তু অন্তরের সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রেখে মন যখন কাহিনীকেই বড় করে দেখতে সুরু করে তখনই মনে শঙ্কার উদয় হয়। মানব মনের সব চাইতে বড় শত্রু "শঙ্কা"। এই শয়তানই মানব মনকে কলুষিত করে দৃঢ় মানব দেহকেও দুর্ব্বল করে দেয়।

সাহিত্যে জাগতিক বা আধি-ভৌতিক ব্যাপারের ও দৈব বা আধি-দৈবিক কাহিনীর বর্ণনা থাকতে পারে, কিন্তু তার আত্মীক বা আধ্যাত্মিক অংশটুকুই হ'ল যথার্থ সাহিত্য। ঐটুকুই মানব মনের খোরাক। আধ্যাত্মিক অংশটুকুতেই সত্যের অনুসন্ধান চলে এবং সাহিত্য লাভ হয়। শুধু আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক অংশগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তথাকথিত পণ্ডিতেরা, আর আধ্যাত্মিক অংশটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করেন সাহিত্যিক বা সাধক।

শ্রীরাধা বলছেন

"মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা,
কায নাই সখি তাঁদের কথায়, বাহিরে রহুন তাঁরা।
আমার বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না লো সই, আঁধার পেরিলে আলা"

—চণ্ডীদাস

সাহিত্যের সত্যিকার সন্ধানটি পাওয়া যায় ওরি মধ্যে। "সহিতের" ভাবকেই বলে "সাহিত্য"। বাজারে দাঁড়িয়ে দশ জনের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার চলতে পারে কিন্তু সাহিত্য চলে না। সাহিত্য যেখানে, সেখানে বাইরের কেউ থাকে না। শুধু 'তুমি' আর 'আমি'। 'তোমাতে' আর 'আমাতে' 'আমাতে' আর তোমাতে' ঐক্য, প্রীতি, প্রেম। এইটেই হল সাহিত্য।

এই সাহিত্য লাভ করবার মানসেই কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"জলে বাসা বেঁধেছিলুম
ডাঙায় দেখে কিচিমিচি"...

সাহিত্য যে ভোগ। এ ত শুধু নদীর এ পার থেকে ওপারকে দেখা নয়। এ যে পার হয়ে গিয়ে ওপারেতে পড়া। নাট-মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখে কুমোরের গড়ন ভঙ্গির সমালোচনা সাহিত্য নয়। সাহিত্য ঠাকুরকে পাওয়া, ঠাকুরকে উপভোগ করা।

রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব"

বৈষ্ণব-কবি যেখানে গেয়েছেন—

"হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে—"

—জ্ঞানদাস

সত্যিকার সাহিত্যের আরম্ভ এইখান থেকেই সুরু হয়েছে।

সাহিত্যের অন্তরে জেগে থাকে রূপ ও রস। রূপ রসের সন্ধান দেয়, তাই সাহিত্য গড়ে ওঠে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর
প্রতি-অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর। —জ্ঞানদাস

রূপ ও রস বা রূপ ও গুণই হ'ল সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য, সাহিত্যের সম্পদ। এই দুটিকে ধরতে পারলেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সাহিত্যের উদ্বোধন হয়। সাহিত্যে বিরাগ নাই, মোহ নাই, দ্বন্দ্ব নাই।

সাহিত্য যোগ। আমাতে আর তোমাতে দ্রষ্টার আর দৃশ্যে, ভাবেতে আর ভাবেতে, জ্ঞাতাতে আর জ্ঞেয়তে। সেখানে ধ্যেয় ধ্যায়ী ও ধ্যান এক হয়ে গেছে।

পড়ুয়ার নিকট যখন শব্দ ও শব্দার্থ বা জ্ঞান এক হয়ে তার অন্তরের ভাবের সঙ্গে মিশে যায়, তখনি পড়ুয়া তার বইয়ের ভিতর দিয়ে যথার্থ সাহিত্য লাভ করে। বই সাহিত্যের উপায়, জ্ঞান সাহিত্যের উপায়। এটা অবশ্য দার্শনিক সংজ্ঞা। নিজের অন্তরের সত্য যখন দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দৃশ্যকে বৈজ্ঞানিকের সহিত একাত্ম ভাবে পরিণত করে তখনি বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্য লাভ হয়।

যাক, আমাদের কথা বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে। সাহিত্য শব্দটির পূর্ব্বে একটি বিশেষণ যোগ হয়েছে 'বৈষ্ণব'। আমাদের ত মনে হয় সাহিত্য মাত্রই বৈষ্ণব সাহিত্য। তবু লোকে সুবিচার জন্য সকল বস্তুকেই ভাগ ভাগ করে দেখে ও ভালবাসে। এটা বোধ হয় বীক্ষণে অনুসন্ধিৎসা মানব প্রকৃতি।

বৈষ্ণব শব্দটি বুঝতে হ'লে বিষ্ণু শব্দটিকে বুঝতে হবে। বৈষ্ণবের ধাতুগত রূপ ওই বিষ্ণুতেই রয়েছে। বিষ্ণাতে ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমিতি বিষ্ণুঃ। যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। একটি কণিকা, একটি সূচীভেদ্য ছিদ্রের ভিতরেও যিনি অনুপ্রবিষ্ট। যে শক্তিতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত—তিনিই বিষ্ণু। অর্থাৎ সেই সর্ব্বব্যাপী বিরাট সত্ত্বাকেই বিষ্ণু আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—

"রসিক জানয়ে রসের চাতুরি"।

রসিক হওয়া চাই, ভাবুক হওয়া চাই, তবে ত বৈষ্ণব সাহিত্য বোঝা যাবে। রসিক বা ভাবুক না হ'লে এ রস-সাহিত্যে অধিকার হয় না। 'তুমিতে' আর 'আমিতে' মিলন চাই, প্রীতি চাই তবেই ত সাহিত্য। 'আমি' যে 'তুমি'কে চায়, এই ত 'আমির' উপাসনা। দূরবীণের মধ্য দিয়ে যে গ্রহ নক্ষত্রকে জানতে চাই, দূরবীণে চোখ লাগিয়ে ওই যে গ্রহ নক্ষত্রের পানে চেয়ে বসে থাকি—ওই ত উপাসনা। ওই ত 'আমির' তুমিকে পাওয়ার ভাব। উপাসনা ভাবেরই হয়।

নিজের ব্যষ্টিসত্তাকে বিরাটে লয় করে বিরাটের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াই বিষ্ণু উপাসনা। ভূমাতে মিশতে হবে। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"। যে ভাব, যে ক্রিয়া, যে যোগ আমার ব্যষ্টির মত ব্রহ্মকে সেই বিরাটের, সেই ভূমার রসতত্ত্বে নিমজ্জিত করবার সাহায্য করে, যার যার সাহায্যে আমার ক্ষুদ্রত্বকে বিরাটে, আমার ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে বা ভূমাতে পরিণত করবার সাহায্য করে, তাহাই বৈষ্ণব সাহিত্য।

এই যে 'আমি'র রসে 'তুমি'কে অভিষিক্ত করা, আমির ভিতরে 'তুমি'কে পাওয়া, 'আমির' ভিতরে তুমিকে অনুভব করা, এই রসধারার মূলে রয়েছে প্রাণ। শুকনো প্রাণহীন কাঠে রস নেই। প্রাণের যেখানে অস্তিত্ব, রসের ধারা সেইখানেই প্রবাহিত হয়। প্রাণের প্রতিষ্ঠা না হলে রসের ভোগ হয় না। প্রাণ রসকে টানে বলেই জীবন রসমূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

প্রাণের সন্ধান নেই অথচ রসের ক্ষুধা মিটাতে চাই, একি হয়! প্রাণ যেখানে মৃতবৎ, রস সেখানে সুপ্ত।

প্রাণেই জ্ঞানের উন্মেষ। জীবন থাকলে তবে ত বোধ। আমিতে যদি প্রাণ থাকে তবেই 'আমি'র বোধ 'তুমি'তে সঞ্চারিত হতে পারে। ওই যে সঞ্চরণ, ওই যে এক করা, ওকেই বলে ভালবাসা, প্রীতি। এই ত সাহিত্য। বিরাট প্রাণময় সত্তাকে, ভূমাকে, প্রিয় বলে, বন্ধু বলে, স্বামী বলে, সখা বলে উপাসনাই বৈষ্ণব সাহিত্য।

আমিতে আর 'তুমি'তে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে। তবেইত 'তুমি' 'আমি'কে চাইবে। তবেই ত 'তুমি' এসে হেসে হেসে 'আমির' কাছে বসবে। সেইত আনন্দ! বৈষ্ণব সাহিত্য সেই আনন্দের খনি।

দুই

রূপ রসে সৃষ্ট। রসাভাসই রূপ। রূপ রসেরি সন্ধান দেয়।

উপনিষদ যাঁকে 'রসো বৈ-সঃ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন, [illegible]-বৈষ্ণব সাহিত্য সেই রসস্বরূপেরি রসপূজা।

উপনিষদ বলেছেন—

রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

—তৈত্তিরীয়

এই ত আনন্দ। রসলাভ হ'লে তবেই-ত আনন্দ। কিন্তু রসিকছাড়া রস কেউ উপভোগ করতে পারেনা। রসিক শুধু রস উপভোগই করেনা সে রস পরিবেশনও করে। বৈষ্ণব পদাচার্য্যগণ সেই রসস্বরূপকে কখন "রসময়" কখন 'রস-শেখর' কখন বা 'রসিক চূড়ামনি' নামে আখ্যাত করেছেন।

রসিক কথাটি আমরা যখন তখন যেমন তেমন ভাবে ব্যবহার করে ওকে খেলো করে ফেলেছি। ওর মানের দিকে লক্ষ্য রেখে কথাটি অনেকেই ব্যবহার করেন না।

কবি রবীন্দ্রনাথ রসিকের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন "রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্য বোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকালেই যে লোক বুঝতে পারে, রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপন চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেই-ত রসিক।"

এই রসে যে মজেছে, সেই শুধু জানে যে 'রসস্বরূপ''র অন্যথা কিছুই নাই।

"সে রস সাগর অনেক সাগর
[illegible] না করিতে পারে—"

—চণ্ডীদাস

সে শুধু 'আমি'কে স্থির থাকতে দেয় না। 'আমি'কে তুমির সন্ধানে ছুটায়। 'আমি'র রসে 'তুমি'কে অভিষিক্ত করতে বসে।

কথায় বলে—

"যন্নদীয়কে তন্নষ্টং"

যে দিতেই পারেনা তার ঐশ্বর্য্য থাকলেও যা না থাকলেও তাই। ওকে নষ্ট ছাড়া আর কিই বা বলা যায়।

প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যখন 'আমি' তুমি'র সন্ধান পেয়ে উঠে না তখনি 'আমি'তে খেদ উপস্থিত হয়। রসশাস্ত্রে একে নির্বেদ বা despair বলা হয়—। খেদ হয়—

"এ নব যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল।"

—চণ্ডীদাস

এই নৈরাশ্য 'আমি'তে এক অজানিত অসূয়ার উদ্রেক করে, তাতে জ্বালা হয়।

"সে কোন নগরে নাগর রহিল
নাগরী পাইয়া কোর
কোন গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুব্ধ ভ্রমর মোর—"

—চণ্ডীদাস

এখানে অসূয়া বা indignation এবং শঙ্কা বা suspicion পর পর উদয় হচ্ছে। কবি কি নিপুণ ভাবেই না সেটি বর্ণনা করলেন।

এই ভাবগুলিকে রসশাস্ত্রে 'ব্যাভিচার ভাব' বলে। এরা অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাবেরই উৎকর্ষ সাধন করছে। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"।

রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্য হয়, তা হ'লে পদকর্ত্তাগণ রচিত বৈষ্ণব পদাবলীও কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

অসূয়া ও শঙ্কার পরেই আসে—বিষাদ (dejection).

"সখি রতেক মনের সাধ
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিধি সে করল বাদ"

—চণ্ডীদাস

রসে বিষও যেমন [illegible] ঠিক যোগাইয়েছে।

বৈষ্ণব কবি শুধু রসের কবিই নন, তিনি রসের সাধকও। তাই ভুক্তভোগীর ন্যায় বলচেন—

"বিষামৃত একত্রে রয়"

— চণ্ডীদাস

রসিক অমৃতটুকুই গ্রহণ করে, আর অরসিক করে বিষপান। তারপর সেই বিষে জর্জ্জরিত হয়ে জ্বালায় পুড়ে মরে।

"যেমতি দীপিকা উপরে অধিকা
ভিতরে অনল শিখা
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা।"

— চণ্ডীদাস

লালসার উন্মাদনাই অরসিকের জীবন বেদ। কিন্তু—

"রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে—"

— চণ্ডীদাস

প্রকৃত রসজ্ঞ যিনি, রস-সাহিত্য শুধু তিনিই গড়ে তুলতে পারেন। কারণ তাঁর ভিতর বৈষম্য নেই, কূপ-মণ্ডূকতা নেই। বিশ্বের প্রাণের তারে তাঁর নিজের অন্তরের তারকে তিনি এক সুরে বেঁধে ফেলেছেন। 'আমি' যখন রসাস্বাদের জন্য ও রস পরিবেশের জন্য 'তুমি'র খোঁজে বার হয় তখন সে নিজের অন্তরের ঐ রসটুকু ছাড়া আর কোন সম্বলই সঙ্গে লয় না।

তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পড়ে থাকে, অনাদৃত হয়ে পিছনে।

কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়া দুই কুলে
এ নব যৌবন পরশ রতন
সঁপেছি চরণ তলে।

— চণ্ডীদাস

রসাধার নব যৌবনটুকুই ছিল তার সম্বল। এবং সেইটুকুই অর্পিত হ'ল তার প্রিয়তমের চরণ তলে। আত্মসমর্পণ বা Renunciationএর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাই রস পূজা। এই রস যে মন্ত্রে তার অন্তর মন্থন করে' উচ্চারিত হয় সেটি হয়ে ওঠে বিশ্ব সঙ্গীত। তার সুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে বিশ্ব মানবের অন্তর। মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তাতে বিশ্বের প্রাণশক্তি। বিশ্বাত্মাকে সম্বোধন করে তার প্রাণে ঝঙ্কার ওঠে—

"তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর।"

—চণ্ডীদাস

রসাবেগ হৃদয়ে যতই বাড়তে থাকে আনন্দও যেমন তাতে হ'তে থাকে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন একটা বিচ্ছেদাশঙ্কাও ঠিক অন্তরের কোণে তেমনি উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। শঙ্কা, পাছে হারাই।

এই যে শঙ্কা-জনিত ত্রাস, এই ত্রাস থেকেই জেগে ওঠে মানবাত্মার প্রার্থনা—

বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে। —চণ্ডীদাস

তিন

রস যা পাওয়া যায় সেইটেই হ'ল বৈষ্ণব সাহিত্যের সার।

পদকর্ত্তাগণ তার নামকরণ করেছেন "পীরিতি।"

"পীরিতি" শব্দটি প্রীতি শব্দেরই অপভ্রংশ বটে কিন্তু সাধারণতঃ প্রীতি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার চাইতে গভীর ভাবদ্যোতক।

বৈষ্ণব সাহিত্য দুইটি চিত্র অঙ্কিত করে এই প্রীতির অভিনব প্রকাশলীলা রচনা করেছেন।

সেই দুইটি চিত্র—রাধা ও কৃষ্ণ।

রাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিক দিকটা কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন। সেই কুজ্ঝটিকা ভেদ করে ইতিহাসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না সে বিচার আমাদের নয়। আমরা আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক দিকটার দিকে ঝুঁকিব না। আমরা সাহিত্য নিয়ে যখন বসেছি, তখন তার আধ্যাত্মিক দিকটা নিয়েই আমাদের কারবার।

সেই রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ যে মধুময় রস-সাহিত্য গড়ে তুলেচেন সে ঝঙ্কার পাশ্চাত্যের বড় বড় কবিগণও আমাদের নিকট বহন করে আনতে পারে নি। এমনই অপূর্ব্ব এমনি মধুর সে কাকলি!

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ শুধু গায়ক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, দার্শনিক ও ভক্ত।

রূপের অন্তরে যে অপরোক্ষ ব্রহ্মানন্দ সেই আনন্দ তাঁরা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁদের এ সাহিত্যে দেখতে পাই—

সৌন্দর্য্যের বিচিত্র উচ্ছ্বাস, ললিত তরঙ্গে লীলায়িত ছন্দ, ভূমাস্পর্শী উচ্চভাব। এ সাহিত্য রসতত্ত্বের অফুরন্ত খনি।

ভাষাই সাহিত্যের সম্পদ। অর্থ-যুক্ত শব্দ বা সমর্থ-শব্দ ভাবের উদ্বেলন করে।

শব্দের প্রতিশব্দও আছে। কিন্তু অনেক সময়ে শব্দটী এমন সমর্থ ভাবে বসে যে তার যে কোন প্রতিশব্দ সেখানে বসালে তা শুধু নিরর্থকই হয় না, রস ভঙ্গও হয়।

দেশ কাল পাত্র হিসাবে শব্দার্থের পরিবর্ত্তন হয়।

কানিং (Cunning) একটি ইংরেজী শব্দ। এক সময় এর মানে ছিল জ্ঞানী বা wise। আজ মানে দাঁড়িয়েছে ধূর্ত্ত।

আজ 'পীরিতি' শব্দটির যে অর্থ সাধারণতঃ বাজারে প্রচলিত, চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে তার সে অর্থ ছিল না। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা কবিরাজ গোবিন্দদাস, লোচন দাস, মুরারী গুপ্তের পদেও আজকের অর্থ দেখা যায় না।

বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝতে হ'লে এই "পীরিতি"কে না বুঝলে চলবে না। 'পীরিতি' ছিল বৈষ্ণব সাধকের সাধ্য। সাধক এই সাধ্যে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সিদ্ধি লাভ করেই পীরিতির ব্যাখ্যাও করে গেছেন।

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি বিষম কথা
বিরিখের ফল নহেগো পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা। —চণ্ডীদাস

কবি রজনীকান্তের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—এ পীরিতি—

"হাট বাজারে বিকোয় নারে, থাকে নাক গাছে ফলে,
মিস্ত্রী লাহোর নয়, যে রাস্তা করিম চাচা দেবে বলে—"

সাধক বলেছেন—

পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে।

—চণ্ডীদাস

এ সাধনায় আমার 'আমি'কে ভুল হয়ে যাবে। 'আমি'কে 'তুমি'তে মিশে যেতে হবে। অথবা 'তুমি'কে এনে 'আমিতে' মিশিয়ে নিতে হবে। যখন 'তুমি' 'আমি' হয়ে উঠবে, তখনি শুধু 'পীরিতের' সন্ধান মিলবে। এ ত শুধু মুখের বাক্যবিন্যাস নয়, এ সাধনাসাপেক্ষ। ব্রত আত্মলোপ। আমি বলে কিছুই থাকবে না। এ যে অহঙ্কার বা Egoism বা শুদ্ধাহঙ্কারের বিনাশ। থাকবে শুধু তুঁহু তুঁহু। তাই মহাকবি সাধক চণ্ডীদাস বলচেন—

"পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।"

এ সেই অদ্বৈতসিদ্ধি বা পূর্ণ সাহিত্য লাভ। এই সিদ্ধি লাভ হ'লে তখন জানা যাবে দুই নেই আছে এক। তবে—

"এক বটে তাই কিন্তু যেন দুই জনে এক জন"

—রসিক

হিন্দু বিবাহের মূল ভিত্তি ঐ তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এক দেহ দুই হয়ে গেল, অমনি আরম্ভ হ'ল নিজ নিজ Sparkএর খোঁজ। এই খোঁজ মানব মনে অনবরত চলছে, কোথায় সে কোথায় সে! পীরিতি জেগে উঠলে মানব মন কেঁদে কেঁদে বলে—

"শিশুকাল হ'তে পিয়াই সহিতে, পরাণে পরাণে লেহা
না জানি কি লাগি
কো বিহি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা—" —জ্ঞানদাস

বিপরীতায় না জানি কত জন্ম-জন্মান্তরে সেই দ্বিধা-বিভক্ত অংশ—পরে আবার এক হয়ে যায়। এক হ'লে আর লীলা থাকে না। তখন নিত্যে স্থিতি। এটি একটি গভীর তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এখানে আলোচনা করতে গেলে একখানি পুঁথি হয়ে উঠবে।

মিলনে দুটো সত্বাই পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকে। মিশ্রণে এক হয়ে যায়। পাশ্চাত্য কবির—

> What art thy kisses worth
> If thou kiss me not
>
> —Shelly

বা

> তুমি যদি মোরে না চুম ললনা
> এ সব চুম্বনে কি তবে ফল
>
> (রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুদিত)

বৈষ্ণব—'পীরিতি' নয়। হতে পারে ওইটেই পাশ্চাত্য জগতে Highest Philanthropy of love. কিন্তু বৈষ্ণব পীরিতি ও নয়—।

বৈষ্ণব কবির 'পীরিতি' ব্যষ্টির ভিতর দিয়ে সমষ্টিতে পৌছান। Concreteকে ধরে, Concreteকে ছেড়ে Abstractএ গিয়ে পৌছান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছে অরূপ রতন আশা করি' এদের নিত্য ও লীলা উভয়ই সত্য। লীলা নিত্যেরই অভিব্যক্তি। রূপের ভিতর দিয়ে অরূপে পৌছানই বৈষ্ণব পীরিতি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই "পীরিতিই" হল তার অন্তর-পেটিকার চাবীকাটি।

চার

মানুষের জীবন-ধারা তার ভাবেরই অভিব্যক্তি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে তার ভাবেরই বিচিত্র স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। স্পন্দন শক্তির খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শক্তি সুপ্ত অবস্থা বা potential state of Energy. সেই শক্তি যখন "রজসা উদ্ঘাটিত" হয় বা ক্রিয়াত্মক হয় অর্থাৎ Mutative stateএ এসে পড়ে তখনি জীবনে ভাব স্পন্দন প্রস্ফুটিত হতে থাকে। সকল স্পন্দন ফুরিয়ে গেলে মানব আবার যেখানে ফিরে পৌছে যায়—তাকেই বলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ। রামপ্রসাদ তাই বলচেন—

> যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
> জল হয়ে সে মিশায় জলে

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি ঠাকুরও বলচেন

> "তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমাওত
> সাগর লহরী সমানা।"

শক্তি তখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ত্রৈগুণ্যাবস্থা ত্যাগ করে। সাম্যে দোলন নেই।

> লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
>
> গীতা ৫।২৫

দোলন নেই বটে কিন্তু নির্ব্বাণে আনন্দ অক্ষয়। স্থির-বুদ্ধি মানব ব্রহ্মবৎ হয়ে তাঁতেই স্থিতি লাভ করে।

> স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
>
> গীতা

বৈষ্ণব দর্শন ঠিক দ্বৈতবাদী নয়। অন্ততঃ বাংলার পদকর্ত্তাগণ দ্বৈতবাদী দর্শণকে অনুসরণ করেন নি।

উপনিষদ যেমন বলেছেন—

> ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

গীতা যেমন বলেছেন—

> প্রশান্তং মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্
> উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ॥

বিদ্যাপতি ঠাকুর সেই কণ্ঠেই কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলেন

> "তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমাওত
> সাগর লহরী সমানা।"

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ মানব জীবনের প্রত্যুষ থেকে সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত জীবনের ব্রহ্মমুখী ভাবস্পন্দনের ভাবভঙ্গিমা তাঁদের অমর লেখনির মুখে শাশ্বত ছন্দে ও গানে তানে লয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন—তাঁরা উপলব্ধি করেছেন ভাব পালনই জীবনের মর্ম্ম। এই ভাব সহ-জ। সহ-জ সম্বন্ধ জাত।

'আমি' যে 'তুমি'কে চায় এ-তার সহ-জ সম্বন্ধেই চায়। 'আমি' যে 'তুমি'রই একটি ভাব বিগ্রহ মাত্র। সহ-জ জানে তুমির ছায়া যখন আমিতে পড়ে বা 'তুমি' যখন 'আমি'র

ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে থাকে তখনি 'আমি'কে 'আমি'র মধুর বলে বোধ হয়—

"আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর"

—রবীন্দ্রনাথ

এ ভাব সে আর কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই বৈষ্ণব কবি বলচেন—

ভাব কি গোপসি
গোপত না রহই
মরমক বেদন বদনে সব কহই।

—গোবিন্দদাস

'আমি' যে 'তুমি'রই অন্তর-প্রবাহ, অন্তর-শ্রী।

"আত্মা দেহভৃত জীবে স্বভাবে পরমাত্মনী।"

'তুমি'র গরবেই 'আমি'র গরব। 'তুমি'র প্রকাশেই 'আমি' প্রকাশিত।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলছেন—

"তোমারি গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমারি রূপে
হেন মনে লয়, ও দুটি চরণ
সদাই রাখি গো বুকে।" —জ্ঞানদাস

কবির ভিতর দিয়ে যে বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে সে যে সকলেরি অন্তর-বাণী। দেশ কাল পাত্রে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না।

কবি তাঁর সেই বাণীকে তাঁর সাধনার ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন ভাষায়।

St. Augustine বলেছেন—

If not asked I know, if you ask me I know not.

পুছিলে, বলিতে নারি,
না পুছিলে, জানি তায়।

সে কি ব্যাখ্যা করা চলে? ও যে আমার অন্তরের কলকাকলি। সেই বাণীর যেটুকু মাত্র বাইরে বেরিয়ে এসে সেই চিরসত্যসুন্দরের ভাব উদ্বেলন করে, তাইত কবিতা। তাইত রসাত্মক বাক্য বা কাব্য। তাই এই বাণী শাশ্বত-বাণী, মানব মনের চিরন্তন সঙ্গীত।

চির-যৌবনা সর্বালঙ্কারভূষিতা ছন্দবতী এক অপূর্ব গীতিই এর রূপ। চিরসুন্দরের পূজার জন্যই এর আবির্ভাব। চিরসুন্দরে লীন হয়ে যাওয়াই এর ধর্ম্ম।

তাই সাধক অবিরাম তার পূজার ডালা সাজিয়ে ডাকতে থাকে—

ওগো সুন্দর মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি
রেখেছি হৃদয় আসনে
কনকাসনপাতি

—রবীন্দ্রনাথ

বৈষ্ণব পদকর্ত্তার ভাষায়—

বাসিত বারি কর্পূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন শয়ান
উজোর দীপ সমীপহি আরহি
বিরচহ চারু বিতান।
মৃগমদগন্ধ অগুরুপর লেপব
গন্ধ মহোৎসব কুঞ্জে
কোকিল ভ্রমর মনোহর গাওই
মুরছিত রতিপতি পুঞ্জে।

—গোবিন্দদাস

সাধক বসে আছে তার কমলাসন-খানি পেতে। তার বাঞ্ছিত এসে ব'সবে। তার প্রাণের আকুলতা—

এস এস ফিরে এস
বঁধু হে ফিরে এস
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
নাথ হে ফিরে এস

—রবীন্দ্রনাথ

বৈষ্ণবপদকর্ত্তা আকুল সুরে গাইলেন—

এস এস বঁধু এস
আধ আচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
বঁধু তুমি মণি নও মাণিক নও যে
হার করে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ

আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
তুয়া বঁধু পড়ে মনে
চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি,
রন্ধনশালাতে যাই
তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি।
কাজর করিয়া যদি
নয়নেতে রাখি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ
বাজন নূপুর হয়ে
চরণে রহিব গো
লোচন দাসের এই সাধ॥

তুমি যে আমার—

"গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।"
—গীতা

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইনু দাসী।

* * * *

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনা
গতি যে নাহিক মোর। —চণ্ডীদাস

ভাবই ভাষায় কবিতা হয়ে ফুটে ওঠে। যখনই সুখ দুঃখের উদ্বেগ হয় চিত্তে তাহাই বৃত্তিরূপে ফুটে উঠে ভাবাকারে পরিণত হয়। বিচিত্র ছন্দে তখন সেই ভাবেরই প্রকাশ চলেছে। কবিতা জীবনের অভিব্যক্তি।

অনেক কবিতা আছে যাকে পদ্য না বলে গদ্য বললেই শোভন হয়। আবার অনেক গদ্য আছে যা গদ্য হয়েও কবিতারূপেই ব্যক্ত। গদ্য ও পদ্যের একটা সীমারেখা অবশ্যই আছে।

কবিতা তাকেই বলা হয় যাতে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে মানবের কল্পলোকের ছবি ও ভাব। নিছক কবিতা অবশ্য ছন্দানুযায়ী ভাষা, গতিবেগ ও ছন্দে গ্রথিত হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু যে তাল ও ছন্দহীন ভাব কল্পলোকের ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলে মানবমনের উন্নয়ন করে সেখানে কবিতার বাহ্যিক আবরণ-বিহীনা সে ভাষা গদ্য হয়েও পদ্য।

গান ও কবিতা। যদিও গানের তাল ও ছন্দ পদ্যের তাল ও ছন্দের সহিত সব সময় এক নয়।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ রচিত কবিতা গান। সে কবিতা গানেরি তালে লয়ে ছন্দে গ্রথিত। পদ্যের তাল লয় ও ছন্দের সঙ্গে মিল রেখে সব সময়ে সে চলে না বলে তার উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়। উভয়ই মানব মনকে ঊর্দ্ধ লোকে উন্নয়ন করে। ভাব বহু ও বিচিত্র বটে। তবু তিনটি পর্য্যায়ে তাকে দেখা যায়। প্রকাশশীল ভাব, ক্রিয়াশীল ভাব ও স্থিতিশীল ভাব। প্রকাশশীল ভাবটি হ'ল সত্ত্বভাব Sentient state, ক্রিয়াশীল ভাবটি হল রজঃভাব বা Mutative state, আর স্থিতিশীল ভাবটি হল তম বা Conservative state. ভাব মাত্রই গুণময়। এই গুণ একদিকে ভাবকে টেনে নেয় ভোগের দিকে। আবার অন্যদিকে টেনে নেয় অপবর্গের দিকে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ক্ষেত্র, বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি-করণের সহিত যখন 'আমি'র সংযোগ হয় তখন 'আমি'তে হয় ভোগ। আবার ভাব যখন ইন্দ্রিয়াদি করণ বিযুক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থান করে অর্থাৎ বাহ্যকে ছেড়ে অন্তরের অন্তর-তমের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে তখনি 'আমি'র হয় অপবর্গ লাভ—

তাই রাধা বলছেন—

"আমার বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা"

—চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝতে হ'লে এইটুকু জেনে রাখা দরকার। 'আমি' যখন বহুকে ছেড়ে এককে বা 'তুমি'কে পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠে তখনি তার ভাবের গতি অপবর্গের দিকে প্রবাহিত হ'তে থাকে।

পল পল করি দিবস গোঁয়ায়লু
দিবস দিবস করি মাহা।
মাহ মাহ করি বরিখ গোঁয়ায়লু
না পূরল মনোরথ আশা।

এ সেই আত্মীক পথের যাত্রীর খেদ। এই নিরাশার ভিতর আবার যখন আশা ফুটে ওঠে, 'তুমি' কে পাব বলে একটা প্রত্যয় আসে, তখন সে তার কল্পলোকে সেইটিকে জাগ্রত রাখতে চেষ্টা করে থাকে—

"নয়নবিষয়ং জন্মলোকঃ স এব মহোৎসবঃ।"

এই পরমোৎসব বা মহোৎসবের জন্যই প্রাণটি উন্মুখ হয়ে থাকে। বিরহের দীর্ঘতা নিরাশার বীজ উপ্ত করে তোলে। আশা ও নিরাশায় মন দুলিতে থাকে। হয়ত দুলিতে দুলিতে চিত্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। নিদ্রায় অভিভূত হয়। হঠাৎ জেগে উঠে হয়ত মনে হয়—সে এসেছিল। এই যে কিছু হেথে গেছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সে তখন বলে—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনি!

—রবীন্দ্রনাথ

সে কান্না যেন থামতে চায় না। কাঁদে আর সখিকে ডেকে বলে—

"সই গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে।
রাধা রাধা রাধা বলে
বড়ই ডেকেছিল মোরে
কাঁদনা বাঁশরী তার ফেলে গেছে ভুলে।"

* * * *

তখন মনে সঙ্কল্প জেগে ওঠে আর ঘুমাবে না—যদিই বা ঘুম আসে—

"বিহি পায়ে লাগি
মাগি নিব এই বর
চেতন রহ মঝু দেহ।"

—গোবিন্দদাস

এই যে সব বিচিত্র ভাবপ্রবাহ স্পন্দিত হ'তে থাকে, রসশাস্ত্রে একে বলে সঞ্চারীভাব। এই সঞ্চারী ভাব-প্রবাহগুলি অনুরাগরূপ স্থায়ীভাবেরই পরিপোষক, তাই বৈষ্ণব পদাচার্য্য বলেচেন—

"আনের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবলি তুমি
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি।" —জ্ঞানদাস

"আমার কেবলি তুমি" অপবর্গ অভিমুখী মনের এই হ'ল স্থায়ীভাব। ভোগাভিমুখী মনের "অনেক জনাই" থাকে। তাদের গৃহ, পরিবার, শত্রু মিত্র সব থাকে। কিন্তু অপবর্গ অভিমুখী মনের—

"গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সুহৃৎ"

সবই তুমি।—

তাই অপবর্গ অভিমুখী মন বলে ওঠে—

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আরও মোর কেহ আছে।
আহা বলে কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।

—চণ্ডীদাস

তবেই বিরহের দীর্ঘতায় মনের আবেগ বা uneasiness বেড়ে ওঠে। আর আবেগ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবল অনুরাগে পরিণত হতে থাকে।

তুঁহু অতি মন্দর গমন দুরন্তর
যামিনী ভেলি অতি ছোটি
সো সব বাহির করত নিরন্তর
নিছিয়ে মানব যুগ কোটি।

আশ পাশ নেই গলে বৈঠল
প্রেম-কলপ-তরু-মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল-ফল
গোবিন্দ দাস কহ ফুর।
(তখন) মোতিম হার ভার হিয়ে ভারই
কর-কঙ্কণ ভেল বনক
সহচরী কোরে ভোরে তনু ঘোড়ই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক।
—গোবিন্দদাস

বেশ বোঝা যায় যে এই সব নির্বেদ (despair), শ্রান্তি (exhausion), দীনতা (less-spiritedness) ও বিষাদ (dejection) প্রভৃতি সঞ্চারী-ভাবরাশি সেই "আমার কেবলি তুমি" রূপ স্থায়ী ভাবটিকে কেন্দ্র করে দুলছে। কাব্যে এদের বলে ভাবালঙ্কার। কাব্যকে এরা শ্রী দেয়, সম্পদ দেয়।

বিষাদই প্রবোধের (awakening) জননী।

যখন চারিদিক থেকেই কালোর ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। যখন—

সজল হাওয়া বহে বেগে
পাগল নদী ওঠে জেগে
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে
—রবীন্দ্রনাথ।

তখন "দিনের শেষে বঁধু" আসবে বলে তার আর ঘরের কোণে বসে থাকা চলে না, সে বেরিয়ে পড়ে যবল গিরির তার অভ্রভেদি বাধারাশি সমস্ত পদদলিত করে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তার জাগরণের মুখে সব বিঘ্ন। সে অগ্রসর হয়, চেয়ে দেখে না পথে কত বাধা।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পথে শত
আরো কত বিঘিনী-বিথার
কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে করলু অভিসার।
—গোবিন্দদাস

নির্বেদের অবসাদের মধ্যেই তার অন্তরে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। সকলকে ডেকে বলে—

ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খুইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
নয়ন-পুতলি করি লইয়াছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুণ জালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।"
—মুরারি গুপ্ত

বৈষ্ণব সাহিত্য ভাবসিন্ধুর এই সব তরঙ্গ ও বীচিভঙ্গে মুখরিত অথবা উহারই তলে তলে "আমার কেবলি তুমি" রূপ ভাবটির কি মাধুর্য্যময় মহিমা।

এই ভাব সম্পদটি যখন গভীর হইতে গভীরতর গভীরতম হয় তখন হয় মহাভাবের উদয়—

চরিতামৃত তাই বলচেন

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব।
"মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি॥
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী
—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ রাধা প্রকরণে

মহাভাবে 'তুমি'তে 'আমির' অচলা স্থিতি। ইহারই দার্শনিক নাম সমাধি ভাব। 'তুমি'মুখী মানব-মনে দুটি ভাব দেখা যায়, একটি রাধাভাব অপরটি চন্দ্রাবলীভাব। কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ রাধাভাবকেই সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ভাব বলে বর্ণনা করেছেন।

থাক্ গোড়ার কথাটা এই পর্য্যন্তই থাক। পদকর্ত্তাদের পদ আলোচনার অবসর যদি হয়, তাহ'লে পদের রূপ, ভাব ও অলঙ্কারের সহিত তন্নিহিত দর্শন তত্ত্বগুলি আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীসতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

একটি মিথ্যার গতি

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষি বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষদের বৈঠক সাঙ্গ করিয়া মেঘনাদ দত্ত, ওরফে মিঃ ডাটা যখন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন তখন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোটুকু প্রায় গ্রাস করিয়া রাত্রি তাহার অধিকার বিস্তার সুরু করিয়া দিয়াছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়া সহরে যাইবার যে একটা অল্প দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ গিরিপথ আছে তাহা রাত্রিতে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হইলেও খুবই যে বিপদ-সঙ্কুল তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তাই সে পথে ফিরিবেন না বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন আর চলিতেছিলেন সদর রাস্তা দিয়াই; কিন্তু সেই দিনটার পর পর যে সব বিরক্তিকর ঘটনার সমাবেশ তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল সেই সব চিন্তা করিতে করিতে একপ্রকার অন্যমনস্কভাবেই তিনি সেই গিরিপথের দিকে ঘোড়া ফিরাইলেন। কিছু দূরে গিয়া তাঁহার চেতন্য হইল। তিনি ভাবিলেন—'এমন ত' নয় কেউ এ রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে যায় না একেবারেই; আর ঘোড়ায়ও ত' আমি খুব অল্পদিন চড়ছি না! একটু সাবধানে গেলেই বেশ চ'লে যেতে পারব। তাই সে পথেই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঘোড়াটি ধীরে ধীরে চলিতেছিল, কিন্তু মন তাঁহার অতি দ্রুত নানা চিন্তায় উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। অন্যমনস্কভাবেই তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্বটি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল!

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পর পর নানা উৎপাৎ যখন আমাদের ঘিরিতে থাকে তখনকার দুঃখাদুর্গতি হয় আমাদের অনেকটা অজ্ঞানের উপর দারুণ চপেটাঘাতেরি মত। সে দিন প্রথমতঃ, স্কুল পরিষদে শিক্ষক নির্বাচন বিষয়ে তাঁহার পরাজয়—তাহারি ভিতর তাঁহার এক অতি নিকট আত্মীয় আসিয়া যখন আরো কিছু টাকা তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কাশন করিয়া লইবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইল তখন তিনি এটাকে আত্মীয়তার অপব্যবহার ও নিছক একটা জুলুম বলিয়া মনে না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আবার তাহারি একঘণ্টার মধ্যে তিনি যখন সংবাদ পাইলেন যে কারবারে দারুণ লোকসানের জন্য মং প্যাইন দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে ও ফলে, তিনি তাহার তরফে যে দু'হাজার টাকা দেনার জামিন হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারি নিকট হইতে আদায় করা হইবে তখন এ দুর্দ্দৈবটি তাঁহার কাছে এক কঠোর অভিসম্পাৎ বলিয়াই মনে হইল। মনে তাঁহার স্বতঃই উদয় হইল যেন সবাই দল বাঁধিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—ফলে শীঘ্রই এমন একটি সময় আসিবে যখন তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সব প্রবঞ্চকদের কুক্ষি-গত হইবে আর তাঁহাকে হইবে পুত্র পরিবার লইয়া পথে দাঁড়াইতে।

সেই গভীর অরণ্য-সঙ্কুল দুর্গম গিরি-পথ দিয়া তাঁহার ঘোড়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার; কেবল দূরে, বহু দূরে লোকালয়ের কয়েকটি আলো বৃক্ষপত্রের অন্তরালে নক্ষত্রের মত লক্ষিত হইতেছিল।

'কিন্তু মেরী যখন জানবে এ সংবাদটা?' মেরী মিঃ ডাটার স্ত্রী। মেঘনাদ দত্ত যখন ভাগ্যান্বেষণে বর্মায় আসিয়া ইন্‌সিনে ছোট একটি কাঠের কারবার ফাঁদিয়া কেবলমাত্র উন্নতির প্রথম সোপানে পা' দিয়াছিলেন তখন মেরীর পিতা টমাস থেটের সম্পর্কে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ও তল্লাটের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী কাঠ-ব্যবসায়ী। মেঘনাদকে তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল; একটা যে ত্রুটিরই তিনি সেই বাঙালী যুবকের তাহার

একমাত্র সন্তান সুশিক্ষিতা কন্যা মেরীকে সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিপুল কারবারের অংশীদার করিয়া লইয়াছিলেন। মেঘনাদের ত্রিকুলে কেহ ছিল না, তাই এই বহু মানিত ধনী বর্ম্মী খৃষ্টান পরিবারের সহিত ভাগ্য মিলাইতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি হয় নাই—তাহার অন্যতর কারণ মেরী রূপে গুণে ছিলেন অনন্যসাধারণ। ক্রমে টমাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পদাঙ্ক নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য চালাইয়া মেঘনাদ এখন তাঁহার বিপুল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান এমন কি কার্য্যতঃ একমাত্র অংশীদার, শুধু কাগজ কলমে তাঁহার স্ত্রী মেরী উহার অর্দ্ধেক মালিক। শ্বশুরের বিষয়াধিকারী হইলেও মেঘনাদ নিজ বুদ্ধি অধ্যবসায় কৌশল ও ব্যবসায়ে সততার বলে কারবারটি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া এখন এই অঞ্চলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতাপশালী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক। মেরী সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিনী ও ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপা।

প্রায় তিন বৎসর হইল বোধ হয়, একদিন মং গাইন তাহার কারবারের উন্নতি-কল্পে দুই হাজার টাকা রেঙ্গুনের এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কর্জ্জ চাহিলে অবস্থা বৈগুণ্যে তাঁহাকেই সেই টাকার জন্য গাইনের তরফে জামিন দাঁড়াইতে হইয়াছিল। গাইনকে তিনি একটু সু-নজরেই দেখিতেন। একটু সাহায্য না পাইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী তাই অনুকম্পা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহাকে ঐ টাকার জন্য দায়-বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এই ধরণের নিঃস্বার্থ পরোপকার তাঁহার জীবনে এইটিই প্রথম নয়। এইরূপ ব্যাপারে তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেও ঠকিতে হইয়াছিল আরো কয়েকবার; তাই মেরীর কাছে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন আর কখনো কাহারো জন্য জামিন তিনি কোনো বিষয়েই দাঁড়াইবেন না। কিন্তু এখন কি জবাব তিনি তাহাকে দিবেন যখন তাঁহার এই মূর্খতার কথাটি তাহার নিকট প্রকট হইবে! এই চিন্তাই বিশেষ করিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। মানুষের জীবনে ঘটনার সমাবেশ কখনো কখনো এমন ভাবে ঘটিয়া যায়, যখন সে নিছক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনুচালিত না হইয়া মুহূর্তের জন্য [illegible] কল্পনার [illegible]

পরিচায়ক হইতে পারে—কিন্তু সাংসারিক হিসাবে, ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে তাহা হয় অত্যন্ত অনিষ্ট-প্রসূ। সেইরূপ এক ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহাকে এই মং গাইনের তরফে জামিন দাঁড়াইতে হইয়াছিল। উভয়ে তাঁহারা তখন রেঙ্গুনে। গাইন তাঁহাকে সহরের সবচেয়ে বিলাসী এক হোটেলে নিয়া পরিপাটি ভোজ করাইবার পর দুঃখ দৈন্যের অবতারণা করিয়া দারুণ অভাবের কথা অতি করুণ ভাবে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট এই [illegible] জানাইয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্থির আশ্বাস দিয়াছিল অল্পকালের মধ্যেই সে এই টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবে যেমন করিয়াই হউক, আর সজল নয়নে সে ইহাও বলিয়াছিল—এ সাহায্যটির অভাবে তাহাকে সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে ও পুত্র-পরিবার লইয়া পথে বসিতে হইবে। কী ভীষণ উচ্চমূল্য তাঁহাকে দিতে হইবে একণে সেই দিনকার সেই ভোজনের পরিবর্ত্তে! সে যা' হোক, সবচেয়ে বেশী ভাবনা তাঁহার হইতেছিল কি করিয়া তিনি তাঁহার এই বালক-সুলভ দৌর্ব্বল্যের কথা মেরীর কাছে স্বীকার করিবেন। চিন্তামাত্রই তাঁহার মন ভীতি ও লজ্জার এক যুগপৎ মিশ্র ভাব দ্বারা জর্জ্জরিত হইল, আবার পরক্ষণেই এক বিজাতীয় ক্রোধ তাঁহার মনে সঞ্চিত হইয়া উঠিল গাইনের উপর। 'নিশ্চয় সে জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই সেদিনকার ওই ঘটনাগুলির সমাবেশ ঘটাইয়াছিল। ওই দুঃখ-দৈন্যের কাহিনীর অবতারণাটি একটা বাজে ছল মাত্র, আর সেদিনের ঐ ভোজের আয়োজনটি শঠের কৌশল ভিন্ন আর কিছু নয়। এই চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে গাইনের সম্বন্ধে বহু কঠোর সমালোচনা একের পর এক তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। 'শঠতার তাহাকে তিনি যত বড় করিয়া পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন নিজের মূর্খতার দোষটি তিনি সেই অনুপাতে কমাইয়া ফেলিতে কৃতকার্য্য হইলেন।

পারিপার্শ্বিক বৃক্ষের উপর একক্ষণে তাঁহার নজর পড়িল। দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া বিপদসঙ্কুল অনতিপ্রশস্ত গিরিপথ দিয়া তাঁহার অশ্ব ধীরে ধীরে সাবধানে চলিতেছিল। চতুর্দিকে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই—কেবল, হরিতের

অন্ধকার। আলোকের মধ্যে দূর আকাশে কয়েকটি তারকার খদ্যোৎ-দ্যুতি, আর শব্দের মধ্যে বাত্যা-চালিত বৃহৎ-বৃক্ষের পত্রশাখার আলোড়নের শব্দ। কচিৎ পশু-পক্ষীর ও তাঁহার অশ্বের কঠিন-পাষাণ ও আরণ্য পত্র দলনের খট্-খট্ মর্ম্মর মিশ্রিত এক অপরূপ ধ্বনি।

না— এ ত' দূরে সদর রাস্তার উপর হইতে আসিতেছিল অন্য একটি অশ্বের পদশব্দ ও তাঁহার খুব পরিচিত সেই গাড়ীটির কণ্ঠ-লগ্ন ঘণ্টাধ্বনি! ঐ ত' ফিরিয়া যাইতেছে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের 'সর্ব্ব-বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রম মেটা, তাঁহাকেই অদ্যকার সভায় সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া সদর্পে বিজয়োল্লাসে! মেঘনাদ ভাবিতে লাগিলেন "নিশ্চয় বিক্রম খুব খানিকটা মন খুলে হেসে নেবে যখন সে শুনবে পার্টিনের এ ব্যাপারটা, আর বুঝতে পারবে সেই সাথে আমাকেও এই মূর্খের মত কাজের জন্য যথেষ্ট আক্কেল সেলামী দিতে হবে।"

বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া মেঘনাদকে জীবন-যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাই বাধাবিঘ্নের সহিত কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার মনোবৃত্তি তাঁহাকে লাভ করিয়াই আরম্ভ করিতে হইয়াছে। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে একদল লোক তাঁহার বিপদে উল্লসিত ও সম্পদে ঈর্ষান্বিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত তাহা তিনি বেশ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনো একটা খুব লাভজনক ক্রয় বিক্রয়ের পর আত্ম-প্রসাদের প্রথম অনুভূতি হইত তাঁহার এই ভাবিয়া—কি দারুণ হিংসাই না হবে ওদের এ'তে!" আর যে সব কাজে তাঁহাকে সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত তাহাতে নিজ লোকসানের জন্য তিনি মোটেই দমিয়া যাইতেন না—দমিয়া যাইতেন শুধু উহাদের তাঁহার এই ক্ষতির জন্য উল্লাসের কথা চিন্তা করিয়া।

এই সময় অশ্বটি তাঁহারি চলিতেছিল সেই পথের সব চেয়ে বিপদ-সঙ্কুল স্থানটি দিয়া। অত্যন্ত অ-প্রশস্ত পথ, একদিকে দুর্ভেদ্য অরণ্য, অন্যদিকে গভীর অধিত্যকা। যতদূর দেখা যায় নীচে প্রায় অশেষ শূন্য। অশ্ব-পদ কোন ক্রমে স্খলিত হইলেই কেহ খোঁজও পাইবে না কোথায় তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। শঙ্কায় বুক তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল।

মনে পড়িয়া গেল তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের একটি পুরাতন কাহিনী। বিপুল এক কাঠের বোঝার সাথে তিনি নদী-বক্ষে নৌকায় আসিতেছিলেন। হঠাৎ দুরন্ত ঝড় উঠিল। বে-গতিক দেখিয়া তিনি মানৎ করিলেন—"নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে দাও প্রভু! কুড়ি মণ চাল আমি দরিদ্রসাধারণকে বিলিয়ে দেবার জন্য পাদ্রি সাহেবের হাতে দেব।" সেই দিনই নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া তিনি চারিদিকে একবার তাকাইলেন ও মনে মনে বলিলেন—"মানতের কি মানে আছে কিছু? না করিলেও যে ঝড়ে আমি মারা পড়িতাম ওটা কোনো কাজের কথাই নয়—একটা অন্ধ কু-সংস্কার মাত্র।" পাছে কুসংস্কারের দাস প্রমাণিত না হওয়ার জন্যই তিনি সে চাউল বিতরণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মেঘনাদের ভাবনা হইল সেই পাপের ফল যদি আজ তাঁহারি উপর ফলিয়া যায়? শুধু তাই নয়। রওনা হইবার সময় তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে গির্জ্জায় গিয়া আগামী পর্ব্বটি সম্পাদনের সমুদয় খরচ তাঁহারা বহন করিবেন লিখাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার ভিতরকার নাস্তিক মূর্ত্তিটি প্রকট হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। গির্জ্জার কেরাণীর বাটীর সম্মুখ দিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে নামিয়া নামটা ত' তিনি লেখান নাই।

মেঘনাদ দত্তর অন্তরে ছিল পরস্পরবিরোধী দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। একটি ছিল পুঁথি, বক্তৃতা, গির্জ্জা হইতে আরম্ভ করা কতগুলি ভাবের সমষ্টি লইয়া, অপরটি ছিল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শ্বশুরের শিক্ষানবিশ হইয়া। ব্যবসায় সম্পর্কে কেনা বেচা, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব ইত্যাদি লইয়া সে স্থানে পূর্ব্ব প্রকৃতিটি ঘেঁসিতেই পারিত না। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ব্যবসায় সম্পর্কে সর্ব্ব বিষয়ে তিনি তাঁহারই ধারা হুবহু বজায় রাখিয়াছিলেন এতটা যে সেখায় তাঁহার প্রতি কার্য্যে তাঁহার শ্বশুরের ছাপ সবাই লক্ষ্য করিতে পারিত। কারবারের খাতাপত্রে, ক্রয় বিক্রয়ের রীতি-নীতিতে এখনো যেন তাঁহার শ্বশুরকে মূর্ত্ত দেখা যাইত।

অনেকবার পথ এখনো তাঁহাকে এই অনাবৃত পথ দিয়া

চলিতে হইবে দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"মৈত্রীর নিকট সম্মত হইয়া নামটা না লেখান খুবই অন্যায় হ'য়েছে পরকালের কোনো কাজে লাগুক বা না লাগুক, দোষ তাহাতে যে কিছু ছিল না তাহা ত' ঠিক! যাক নিরাপদে ফিরতে পারলে পথে সেটার সংশোধন এখনো করা যেতে পারবে।"

অবশেষে নির্ব্বিঘ্নে সদর রাস্তায় পৌছিয়া তিনি স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ঘোড়াটি তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ ফেনায় ভরিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি তাহাকে আস্তে চলিবার নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু নিজাবাসে ফিরিয়া যাইবার ব্যস্ততায় ঘোড়াটি নিজ হইতেই দৌড় আরম্ভ করিল। রাস্তার দু-ধারে লোকের বাড়ী, উর্দ্ধে বড় বড় গাছের ডাল, তাহার ভিতর দিয়া তারকাখচিত আকাশের অংশ মাত্র লক্ষিত হইতেছিল। সম্মুখে ঐ যে টিলার উপর বৃহৎ গোলা বাড়ীটি ও তাহারি এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ওখানেই ত থাকেন মেঘনাদের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রম মৈটা। ঐ ত বিক্রমের প্রাসাদোপম অট্টালিকার এক প্রান্তে তাহার বৈঠকখানা। ওখান হইতে মেঘনাদের বসিবার ঘরটি বেশ লক্ষিত হয়, মনে হয় যেন তাঁহারি উপর নজর রাখিয়া বিক্রম ওখানে বসিয়া আছে।

"হতভাগা গাইনের কেল পড়া সম্পর্কে আমার শোচনীয় দৌর্ব্বল্যের কথা শুনিতে পাইয়া কতই না উল্লসিত ও হবে!' এই চিন্তাই বেশী করিয়া তাঁহাকে বিঁধিতেছিল।

গিরিপথ অতিক্রম করিতে করিতে বিপদের চিন্তার এ ঘটনাটার কথা তাঁহার মনে খানিকক্ষণের জন্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখন আবার উহা তাঁহার মনটি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিল। মনে পড়িয়া গেল কতবার তিনি ঐ গাইনকে মত্ত অবস্থায় সহরের নানা স্থানে দেখিয়াছেন। আর সেই পাষণ্ডের চালে ভুলিয়া তিনি কিনা তাহার জন্য জামিন দাঁড়াইলেন—স্ত্রীর নিকট প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও।

মোড় ঘুরিয়া তিনি নিজ-বাটীর ফটকের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। একটা প্রকাণ্ড কুকুর দৌড়িয়া আসিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে ঘোড়াটার সম্মুখে দু-পায়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াটা থামিয়া গেল।

সহিস আলো হস্তে আস্তাবল হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া ঘোড়াটি ধরিল। মেঘনাদ নামিয়া পড়িলেন।

প্রকাণ্ড বাহির উঠানের তিন দিকে আস্তাবল ও গো-শালা। একটু তফাতে একটি লাইন বাড়ী। সেটা বৃদ্ধ, কাজে অপটু কয়েক জন পুরাতন চাকর ও মজুরদের বাসস্থান। তাহারা যে বৃদ্ধ বয়সে সব শক্তি সামর্থ্য হারাইয়া বসিয়া আছে! এ অবস্থায় তাহাদের সাধারণের দয়ার উপর নিক্ষেপ করা বা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ শোচনীয় নিশ্চিত মৃত্যুমুখে তাহাদের আগাইয়া দেওয়া। সে কল্পনাও তাঁহার কাছে অসহ্য মনে হইত। তাই নিজ খরচে, তাঁহারই সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তাহাদের ভরণ পোষণ ও আবাসের সব বন্দোবস্ত তিনি ঐ স্থানে করিয়াছেন।

ঘোড়াটার দিকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া—"একটা কম্বল দিয়ে বেশ ক'রে এর গা'টা চাপা দিয়ে দিস্, আর এক্ষনি জল খেতে দিস না যেন ওকে" সহিসটাকে বলিয়া তিনি ভিতরে চলিলেন। কুকুরটি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৈত্রী দত্ত ছিলেন কিছু দাম্ভিকা সবারই সহিত ব্যবহারে,—চাষী মজুরদের সাথে, কেন না তিনি তাদের দেখিতেন কৃপার চ'ক্ষে; আর সহরের বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারী প্রভৃতির সাথে, কেন না, তিনি আশঙ্কা করিতেন হয় ত' তাঁরা তাঁকে কৃপার চ'ক্ষে দেখেন।

তিনি রান্নাঘর ও বসিবার ঘরের মাঝখানটার ছোট ঘরটিতে বসিয়া উল দিয়া একটা সোয়েটার বুনিতেছিলেন। পাদ্রী সাহেবের স্ত্রীর অনুকরণে তাঁহার শুভ্র কেশগুচ্ছের উপর ছিল একটি নীল রংয়ের গোল টুপি। মুখখানি তাঁর সুশ্রী সুঠাম ও সুন্দর। চোয়ালদুটি অপেক্ষাকৃত একটু উচু। সমস্ত মুখখানিতে তাঁহার প্রকট ছিল চরিত্রের দৃঢ়তার একটা স্পষ্ট ছাপ। মেঘনাদকে আসিতে

দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—"এত দেরী হ'ল তোমার ?"

আগুনের কাছে হাত দুখানি সেঁকিতে সেঁকিতে মেঘনাদ বলিলেন—"মিটিংই অনেকক্ষণ ধরে চল্‌ল, তাই।"

"কি হ'ল মিটিং এ ?"

মেরী জানিতেন আজিকার মিটিংয়ে কি প্রস্তাব পাশ করিবার জন্ত মেঘনাদ চেষ্টিত ছিলেন।

"ফল আমাদের বিপক্ষেই হ'ল"—বলিয়া মেঘনাদ ফিরিয়া বসিলেন। মনে হইল তিনি দেখিতে পাইলেন মেরীর মুখে বিদ্রূপের ঈষৎ বঙ্কিম একটি স্পষ্ট রেখা। কত লোক কত রকমেই ত' আজ তাঁহাকে বিঁধিল! তাহাতে কি দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় নাই আজ। আপন জনও তাহাতে যোগ দিতে সুরু করিল! নিশ্চয় মেরী তাঁহাকে বিদ্রূপের চোখে দেখিতেছে—কিন্তু গাইনের ব্যাপারটি শুনিলে ?

মুখের উপর হইতে এক গুচ্ছ চুল হাত দিয়া সরাইতে সরাইতে মেরী বলিলেন—"আজকাল দেখছি তুমি সব ক্ষেত্রে হ'টে যাচ্ছ!"

"সব ক্ষেত্রেই হ'টে যাচ্ছি, এ মিথ্যা অন্ততঃ তোমার মুখে শুনব আশা করিনি।"

তাঁহার এই গম্ভীর প্রতিবাদের অন্তরে কি গুরুতর মনোভাব ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া বুনিতে বুনিতে মেরী বলিলেন—

"এত ভালমানুষ হ'য়ে পড়েছ তুমি আজকাল যে তোমার এত ধন ঐশ্বর্য্য পদ কিছুই কোন কাজে আসছে না। কোন কিছুরই সংস্থান নাই যাদের, এক কপর্দ্দকও যারা কর দেয় না, তারাই আজকাল শাসন কচ্ছে আমাদের, কর ধার্য্য ক'চ্ছে আমাদেরই উপর। আর আমরা তা দিব্য মেনে নিয়ে—'ধন্যবাদ আপনাকে' বলে তা দিয়ে আসছি!"

মেঘনাদের অন্তরে কিছু শান্তি পৌঁছিল, কারণ ইহা তাঁরই চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি।"

তারপর একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মেরী বলিলেন—"বোধ হয় শুনেছ কি [illegible] ঘটেছে গাইনের ?"

এরই মধ্যে খবরটা মেরীর কাছে পৌঁছিয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধ মনে মনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। চৌকের সম্মুখে হাত দু'খানি পিছনে দিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। এত শীতেও তাঁহার মাথার টাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। মাথাটা নোয়াইয়া পাশ দিয়া আড়চোখে একবার তিনি স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া লইলেন। কি ভাবে মেরীর কাছে এ বিষয়টি তিনি বলিবেন ও কি জবাব তিনি যোগাইবেন তাহা স্থির ত' করেন নাই—করিবার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও তাঁহার বর্ত্তমানে নাই। এত দীর্ঘকাল বাহিরের ঠাণ্ডায় থাকিয়া ঘরের গরমে তাঁহার দেহটা এখন নিতান্ত ভারী ও অলস বোধ হইতেছিল—ঘুমে তাঁহার চোখ দুটি বুজিয়া আসিতেছিল।

একটা হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন—"হাঁ, কে ভাবতে পেরেছিল এতটা হবে!"

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে আনিয়া মেরী বলিলেন—'কেন, তুমি ত' নিজেই এর পূর্ব্বাভাষ দিয়ে আসছিলে কিছুদিন থেকে! সুখের বিষয় ওর টাকাকড়ির ব্যাপারে তুমি জড়িত নও।"

স্ত্রী এখনো শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া আপাততঃ কিছু সুস্থ বোধ করিয়া দোয়া-মোনা স্বরে তিনি শুধু বলিলেন "হাঁ-আ"! বর্ত্তমান অবস্থায় এই গাইনের বিষয় বা গির্জ্জায় নাম না লিখাইবার ব্যাপারটা লইয়া স্ত্রীর সহিত বুঝা-পড়া করিবার মত মানসিক সঙ্গতি তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাই পার্শ্বের ঘরে সু-পরিচিত হাসির লহর শুনিতে পাইয়া এই অপ্রিয় সমস্যা হইতে আপাততঃ অব্যাহতি লাভের আশায় তিনি ছুটিলেন সেইদিকে।

সেখায় তাঁহার পুত্রবধূ ইমা তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্রটির দাপটে ছুটা-ছুটি করিতেছিলেন। চৌকে গরম জল চড়ান। তাহা দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিয়া তাহাকে পোষাক পরাইবার আয়োজন চলিতেছিল; আর সে উহাকে একটা নিছক উৎপীড়ন মনে করিয়া অব্যাহতির জন্য ছুটা-ছুটি করিতেছিল। মা'টিও ছুটিতেছিলেন তার পিছনে।

বৃদ্ধ চৌকাঠের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গভীর প্রীতি ও



শ্রাবণ, ১৩৪৬ | সচকিতা | শিল্পী—শ্রীহেমেন মজুমদার

চিন্তার ছাপ অপসারিত হইয়া যেন কোন মহা যাদুর প্রভাবে মুখখানি তাঁহার এক অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দাদুর দিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া ইমা বলিলেন—"কে দেখত' খোকা!"

তরুণ বড় বড় চোখ করিয়া একটিবার দাদুর দিকে তাকাইয়া, একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া লইল। তারপর কোনক্রমে সোয়েটারটি গলায় ঢুকাইবার অবসর দিয়া দাদুর নিকট ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতে মায়ের বাধায় মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া মায়ের আর তখন উপায়ান্তর রহিল না। মাতৃ-কবল হইতে মুক্তির উল্লাসে সে ছুটিয়া গিয়া পড়িল একেবারে দাদুর হাঁটুদুটির উপর। দাদুকেও অগত্যা বসিয়া পড়িতে হইল।

মা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন "কেন তুই জামা গায় দিস নি,—দাদু তোকে কিছুই দেবেন না"

তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। তরুণ সোজা দাদুর হাঁটু বাহিয়া বহু কসরত করিয়া, অবশেষে তাঁহারই সাহায্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহার কোল অধিকার করিয়া ফেলিল ও অবিলম্বে তাঁহার পকেট তদারক সুরু করিয়া দিল। ক্রমে বিশ্লেষণের পর তাহা হইতে বাহির করিয়া আনিল এক বাক্স চকলেট। লুটের পর এক মুহূর্ত অপব্যবহার না করিয়া সে সোজা নামিয়া পড়িয়া আনন্দে সারা ঘরটি নৃত্য-কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিল।

তরুণ পিতৃ-হারা। মেঘনাদের প্রথম পুত্র ইন্দ্রনাথের পুত্র সে। তরুণের জন্মের পূর্ব্বেই একদিন মেলা হইতে মত্ত অবস্থায় অশ্ব-পৃষ্ঠে ফিরিবার পথে পড়িয়া গিয়া অকালে ইন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই অবধি মদের উপর মেঘনাদের ছিল এক বিজাতীয় মর্ম্মান্তিক ঘৃণা।

দুশ্চিন্তায় মন তাঁহার ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইতেছিল। নিদারুণ পরিশ্রমের পর, বিশ্রাম তাঁহার একান্ত প্রয়োজন। শরীরটা এলাইয়া পড়িতেছিল। এ অবস্থার মধ্যেও এই গাইন সম্বন্ধে কি ভাবে তাঁহার স্ত্রীর সহিত একটা বুঝা-পড়া করিয়া লইবেন এই চিন্তাটাই তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। নাতিটির সহিত বে-মানুষ মিশিয়া গিয়া তিনি নিজেকেও শিশুটিতে পরিণত করিতে পারিতেন। সেইটাই ছিল তাঁর এই শেষ বয়সের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত। তাহাতেও গাইন আজ হস্তক্ষেপ করিয়াছে! তরুণের সহিত হাসি ঠাট্টার মধ্যেও ঐ গাইনের মুখখানি অশান্তির মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। আচম্বিতে তিনি মুখখানি ফিরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন—'এখানেও কি তুই রেহাই দিবি না আমায়?' যেন বৃদ্ধের জীবনের পবিত্রতম কন্দরেও গাইন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে—আর তিনি তাহাকে সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত! গাইনকে তাই তাঁহার নিষ্ঠুরতম শত্রু বলিয়া তিনি পরিকল্পনা করিয়া ফেলিলেন। সে যে তাঁহার পরিবারের মধ্যেও বিচ্ছেদ ও অশান্তির হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে। তাইত' এই বৃদ্ধ বয়সে আজ তাঁহার স্ত্রীর নিকট তাঁহাকে সত্য গোপন করিতে হইল। শুধু তাই নয়, যাহা তিনি বলিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে তাহা ত' মিথ্যার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়! —ইহার সংশোধন যদিও তিনি নিশ্চয় করিয়া লইবেন, অতি সত্বরই।

নানা কসরৎ করিয়া তরুণকে তাহার মাতা কোনো রকমে পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া দিতেছিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মেঘনাদ তাহাই দেখিতেছিলেন ও মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। হাসির প্রকোপে চোখে তাঁহার জল দেখা দিল। কিন্তু এ সবের মধ্যেও তাঁহার মনে উঁকি মারিতেছিল গাইনের ইউনিয়ন খোলার কথা—আর সে যে গত বছর হইতে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল সেই কথা। কি মূর্খের মত কাজ! এই বাতুলের খেয়ালের কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে এই মজুর বিদ্রোহের দিনে কারবারে দু-পয়সা লাভ করা এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। এ সব অস্থিরমস্তিষ্ক লোকের এই পরিণতিই ত' অবশ্যম্ভাবী!

এই সব ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে বৃদ্ধ বাহিরে যাইতেছিলেন। উহা নিরীক্ষণ করিয়া খোকা হাঁকিল—"দাদু, আমি যে ঘুমব।" তাই ত', খোকার ঘুমাইতে যাইবার পূর্ব্বে খোকার পাওনা নিয়মিত চুমাটি দিতেও

"তাহার ভুল হইল আজ"! ফিরিয়া আসিয়া তিনি খোকাকে আপটাইয়া ধরিয়া চুমা দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

খাইতে যাইবার ডাক পড়িল। বৃদ্ধ বাথরুমে গিয়া স্নিগ্ধহস্তে হাত মুখ ধুইয়া পোষাক ছাড়িয়া খাবার ঘরে গেলেন। ড্রইং রুমের পাশের ছোট ঘরটায় টেবিল সাজান ছিল। ইলা ও ইভা পিতার দু-দিকে বসিল, সম্মুখে বসিলেন মৈত্রী, গৃহকর্ত্রীরই মত বিপুল গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি! ও তাহার পার্শ্বে পুত্রবধূ ঈমা। তাঁহাদের একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র দিলীপ রেঙ্গুনে বি, এ পড়িতেছে।

বৃদ্ধ ইলাকে বলিলেন—"কাল আমি জঙ্গলে যাব ইলা, আমার পোষাকগুলো সাজিয়ে রেখ'। সেখানে গাছ কাটা সুরু হ'য়েছে, আমার যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

ইলা এ সংসারের মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী। এক উদীয়মান ডাক্তারের সাথে তাহার বিবাহ সব ঠিকঠাক হইয়াছিল। বিবাহের মাত্র তিন দিন বাকী। এমন সময় একদিন প্রভাতে পাত্রটিকে দেখা গেল বিছানায় মৃত অবস্থায়। ইলা বিবাহ করে নাই ও তদবধি গৃহে থাকিলেও সে সন্ন্যাসিনীর মত। বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক না হইলেও তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে, গাল দুটি শীর্ণ আর চোখে তাহার সর্ব্বদাই এক আতঙ্কপূর্ণ বিহ্বল ভাব। তাহার প্রধান চিন্তা—কি তাহার হইবে ভবিষ্যতে, যখন পিতামাতা আর থাকিবেন না। একা সেই এই সংসারের সব বোঝাটি মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। রান্না ঘর, ভাঁড়ার, শয্যাকক্ষ সর্ব্বত্র সব বন্দোবস্তের মূলেই সে। কোনো কাজে নিজের বিন্দুমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে লজ্জা ও ঘৃণায় সে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তা' সত্ত্বেও সে নিজেকে এ সংসারের গলগ্রহ বিশেষ বলিয়া মনে করে।

"ইভা, তুই বোর্ডিংএও কি এই এলো-মেলো বিশ্রী ভাবেই থাস নাকি?" ইভার দিকে প্রায় কট-মট করিয়া তাকাইয়া তাহার মা ইভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া ইভা মুখের সুমুখে আসিয়া-পড়া চুলগুলি সরাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি ইভার বেশীক্ষণ এভাবে কাটিল না। নানা কথায় সে আবার সবাইকে নিজের আনন্দে সংক্রামিত করিয়া ফেলিল।

ইভা রেঙ্গুণে পড়ে। ছুটি উপলক্ষে ক'দিনের জন্য সে আসিয়াছে। তাহার স্কুলের একটি বৃদ্ধ শিক্ষকের পরিচয় সে নানা ভাব-ভঙ্গি সহকারে দিতে সুরু করিল। তাঁহার অনুকরণে গভীর অবধানতা সহকারে সে একটিপ নস্য নাশারন্ধ্রে প্রয়োগের অভিব্যক্তি করিয়া লইল। তাহার পর চশমাটা নাশিকায় নিম্নস্থ করিয়া সেই ফাঁক দিয়া সকলের দিকে ঈষৎ মস্তক নত করিয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "মায়েরা, স্থির হ'য়ে, ঠিক পুতুলের মত ব'সে থাক সবাই, গোলমাল ক'রো না—জালিয়ো না আমায়" ইত্যাদি। ইলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, গম্ভীর-মূর্ত্তি গৃহকর্ত্রীও, অবশ্য সংযতভাবে একটু মৃদু হাসিয়া লইলেন এবং বৃদ্ধ মেঘনাদ তাহার দিকে হাসিভরা চোখে তাকাইয়া বলিলেন "দাঁড়া, কালই আমি তোর মাষ্টারের কাছে লিখে দিচ্ছি!"

পরক্ষণেই পূর্ব্বকার চিন্তাধারা আবার তাঁহার মনে উদয় হইল।

—"আচ্ছা, দু'হাজারের বেশী নয় ত? যদি হয়?—"

খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করিয়া তিনি দোতলায় শয়নকক্ষে গিয়া শয্যাপার্শ্বের ছোট টেবিলের উপরকার বাতিটি নিভাইয়া দিলেন ও সোজা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঘুম কিন্তু আসিল না। একটা দীর্ঘ হাই ছাড়িলেন তারপর ভাবিলেন—

"—ঘুমের ভান করিয়া অন্ততঃ আজ রাত্রিটার মত ত' চার্জ্জের ও জামিনের বিষয়টি থেকে অব্যাহতি নেওয়া যাক!"

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া ইভা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল ও তাঁহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। পরে কণ্ঠস্বরে একটু আতঙ্কের ভাব মিশাইয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে তাহার হিসাব বহির জমা-খরচের অবস্থা অত্যন্ত অমিল, গোঁজামিল দিয়াও তাহা বুঝাইবার যোগ্য নয়। তাই মার কাছে তাহা এখনো পেশ করা যায় নাই। কিন্তু যে

কোনো মুহূর্ত্তেই যে তিনি হিসাব তলব করিতে পারেন! তাহা হইলেই.........

বালিশের উপর হইতে মাথাটা ঈষৎ তুলিয়া তিনি বলিলেন—"আর আমাকে যত খুসি ঠকিয়ে নিতে তুই পারিস, এই তোর ধারণা - তাই অবাধে আমাকে এসে এসব ব'লে যাচ্ছিস, না?"

বোধ হয় কিঞ্চিত ভীত হইয়া ইভা হাতটা সরাইয়া লইতেছিল দেখিয়া মেঘনাদ তাহা নিজের হাতের মধ্যে লইলেন—কি ছোট নরম হাতটা। তারপর যেন প্রায় ঘুমন্ত চোখে বলিলেন,"যাস কাল আমার অফিস ঘরে—দেখা যাবে কি করা যায়।"

আর কিছুক্ষণ ইভা বাবার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া তারপর আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল।

আবার দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ হইল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়া ঘুমের ভান করিতে যাইয়া দেখিলেন ইলা তাঁহারি জঙ্গলে যাইবার পোষাক লইয়া ঘরে ঢুকিল। উঠানের অপর প্রান্তে আলোর আনা-গোনা লক্ষ্য করিয়া মেঘনাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে এত রাত্রে আলো নিয়া আনাগোনা ক'চ্ছেরে ইলা?"

ইলা বলিল "পয়লানী ঘোরা ফেরা ক'চ্ছে। কালো গাইটা যে আজই বিয়োবে বলে মনে হ'চ্ছে।"

তাহার পর ধীরে ধীরে পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিল—"একটা কথা তোমায় ব'লব বাবা! সকালে ডাক-ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে বুড়ো ব্যারিষ্টার কিটং খুব হল্লা কচ্ছিল এই ব'লে যে গাইনের দেউলিয়া হওয়ায় তোমা-কেও বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হবে। সেটা কি সত্যি বাবা? তোমায় না জিজ্ঞেস ক'রে মাকে ও কথা বলিনি এখনো।"

আজ রাত্রে আর এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন না বলিয়াই মেঘনাদ বলিলেন।

—"কিটং? খেয়ে না খেয়ে কোনো কাজ ত' নাই তার! না হ'ক কিছু একটা নিয়ে বক্ বক্ না ক'রলে যে ওর পেট ফেঁপে ওঠে!"

"আমিও ভেবেছিলাম এটা মিথ্যা" বলিয়া ইলা পর্দ্দাটা বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

পর দিন প্রাতে মেঘনাদ শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মেরী আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন চার্চ্চের কেরানীর কাছে গিয়া সব বন্দোবস্ত তিনি ঠিক করিয়া আসিতেছেন কি না। করা হয় নাই বলাতে এক তুমুল ঝড় বহিয়া গেল তারপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া, শাসাইয়া মেরী বাহির হইয়া গেলেন।

মেঘনাদ বহুক্ষণ অবধি সেদিন শুইয়া রহিলেন। এরূপ ঝড়-ঝাপাটি আজ হইয়া গেল এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ চারি পাঁচ দিন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে—কারণ উভয়ের কেহই উপরপড়োয়া হইয়া সে বিরোধ ভঙ্গে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত বোধ করেন।

শয্যা ত্যাগ করিয়া মেঘনাদ সে দিন বাহিরের উঠানে নামিয়া আসিলে একজন মজুর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্মিত হাস্যে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মিঃ গাইন যে তাঁহার নাম জাল করিয়াছে শুনা যাইতেছে তাহা সত্য কি না।

গাছ কাটার পক্ষে আবহাওয়ার আনুকূল্য কি না লক্ষ্য করিবার জন্য ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইতে তাকাইতে তিনি বলিলেন—"তার পক্ষে অসম্ভব নয় কয়াটা।"

লোকটী উঠানের পাশে একটি জমি খুঁজিতেছিল। কোদালের উপর ভর দিয়া ভয়ে ভয়ে সে মুনিবের দিকে আড় চোখে তাকাইয়া বলিল—"শুনলাম আপনার নামই নাকি সে জাল ক'রেছে আর খুব বড়াই ক'রে রটিয়ে বেড়াচ্ছে আপনি তার জন্য জামিন দাঁড়িয়েছেন। বাড়ীর লোকজনদের কাছে শুনলাম সে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

এদের এ বিষয় লইয়া মাথা ঘামান দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া তার কোনই উত্তর না দিয়াই তিনি বাহির হইয়া গোলাঘরের দিকে গেলেন। সেখানেও দেখিলেন এই বিষয় লইয়াই আলোচনা চলিতেছে। সেখানেও সেই একই প্রশ্নের পুনরুক্তি তাঁহাকে শুনিতে হইল। কোনো জবাব না দিয়া তিনি গাছকাটার যন্ত্রটা নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন। একটি বৃদ্ধ মজুর মুরুব্বীআনা চালে সঙ্গীদের বলিতেছিল, "বলিনি আমি ও লোকটার কপালে আছে জেল; তারি ফিকির সে নিজহাতেই ক'চ্ছে।"

এই সব শুনিয়া মেঘনাদ একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িলেন। এই গুজোবটার মূল ভিত্তি ত তিনি নিজেই স্থজন করিয়াছেন, আর তাঁহার দ্বারাই ইহা মুখ্যতঃ প্রচারিত হইয়াছে প্রমাণিত হইলে যে তাঁহাকেই ভবিষ্যতে মুস্কিলে পড়িতে হইবে—যদি গাইন ইহার জন্য কোনো মাম্লা মোকদ্দমা আনয়ন করে। তাই এই গুজোবের মূল তখনই উচ্ছেদ করিবার জন্য ইহার অসত্যতা ও তিনি যে বস্তুতঃই গাইনের পক্ষে জামিন দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা জ্ঞাপন করিবেন এমন সময় দেখিলেন তাঁহাদের লোহার মিস্ত্রি এই বাড়ীর দিক হইতে বাহির হইয়া রাস্তার উপর সাইকেলে উঠিতেছে।

তিনি তাঁহার লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন মিস্ত্রি এখান হইতেই গেল কিনা। সকলে সমস্বরে বলিল "হাঁ"।

মেঘনাদ ভাবিলেন—"এ লোকটা নিশ্চয় সব শুনে গেল আর ও বেলার ভিতরই এ সংবাদটা ওরই মুখ থেকে বেরিয়ে সহরময় চাউর হ'য়ে যাবে। ওর মুখ বন্ধ করা সব চেয়ে প্রথম দরকার।"

উহাকে ডাকিবার একটা অজুহাৎ সৃষ্টি করিবার জন্য বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"ওর না আজই নূতন কুড়ুল কটা দিয়ে যাবার কথা ছিল?" এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার দিকে দৌড়িয়া গেলেন। যতই দৌড়াইতে লাগিলেন ততই গাইনের উপর ক্রোধ তাঁহার বাড়িয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি যে এই বুড়ো বয়সে পাগলের মত দৌড়ে যাচ্ছি—কেন? ঐ পাষণ্ডটাকে সাহায্য করেছিলাম, তাই ত!"

"ওরে, শোন, থাম" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তিনি ছুটিলেন। ইহার মধ্যে মিস্ত্রি সাইকেলে উঠিয়া কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছে। কান তাহার একটা কম্ফর্টারে ঢাকা ছিল। তাই ডাকের আওয়াজ তাহার কানে পৌঁছায় নাই। কিন্তু উহাকে যে থামাইতেই হইবে! নইলে ইহার জন্য দারুণ মুস্কিলে যে তাঁহাকেই পড়িতে হইবে!

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার বাঁক ঘুরিয়া তিনি দেখিলেন মিস্ত্রিটি নামিয়া অন্য একটি সাইকেলওয়ালার সঙ্গে কথা কহিতেছে। মেঘনাদ তাহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দেখিলেন দ্বিতীয় সাইকেলওয়ালাটি উঠিয়া ঢালু রাস্তা দিয়া তীব্র বেগে ছুটিয়াছে।

মিস্ত্রি অভিবাদন করিয়া বলিল—"কি শুনছি হুজুর। চমৎকার লোক ওই গাইন। বাহাদুর ছেলে। আমাকেও ঘাল ক'রেছে ও। আমাকেও গুণগার দিতে হবে। বলে কিনা—

তাহার নাম জাল করার কথা সে বলিতেছে ভাবিয়া মেঘনাদ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"না, না, ওটা মিথ্যা কথা।"

মিস্ত্রি মাথা নাড়িয়া বলিল—"না হুজুর, মিথ্যা না—সম্পূর্ণ সত্যি, যেমনটি আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনার সুমুখে। সত্যিই আমার গুনগার দিতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাদের মনে পড়িল মিস্ত্রিটি অন্য একটি লোকের সাথে কথা কহিতেছিল। তাই মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই এ কথা বলেছিস নাকি ঐ সাইকেল-ওয়ালাটাকে?"

মিস্ত্রি বলিল—"বলেছি। কি দিন কালই না প'ড়েছে কাউকে আর বিশ্বাস ক'রতে নেই একেবারেই।"

মেঘনাদ মাথা হইতে টুপিটি খুলিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে সেই সাইকেলওয়ালার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে তখন নীচেকার রাস্তায় বহুদূরে ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়াছে।

মেঘনাদ মূঢ় বিহ্বলের মত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চাকর-মজুরদের সম্মুখে নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়াও যে কোনো সুফল হইবে তাহার আশা নাই। কথাটা এ দুর্ম্মনের মুখে শীঘ্রই যে ছড়াইয়া পড়িবে তাহা রোধ করিবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই।

মিস্ত্রি বলিল—"আমাকে ডাক্ছিলেন কেন হুজুর?"

সব দোষের চাপ তাহারই উপর পড়িল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া মেঘনাদ বলিলেন—"নেমকহারাম, পাজি! তোর না আজই কুড়ুলগুলি দিবার কথা ছিল!

টাকা খাবিস, শোধ দেবার নামটি নেই! কাজ করবি, তার জন্ত উচিৎ দাম পাবি—তা ক'রেও শোধ দিবি না! দাঁড়া আজই আমি নালিশ রুজু করে দিচ্ছি তোর নামে।"

তাহাকে প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই মেঘনাদ বাটীর দিকে চলিলেন। মিস্ত্রি বজ্রাহতের মত সাইকেল হাতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল আর ভাবিল—"হতভাগা গাইনের এই জালিয়াতিতে দেখছি কর্ত্তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।" তাহারই পর সে সাইকেলে উঠিয়া চলিয়া গেল। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

* নরওয়ে দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক John Bojer এর অনুমতিক্রমে তাঁহার "Power of a Lie" পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

"তোমার আমার মাঝখানেতে থাক না অনেক দূর"

মীরা সেন (মজুমদার)

চৈত্র শেষের বিলোল মাধবী রাতি
বাতায়নে মোর নিভেছে রাতের বাতি,
দখিন হাওয়ার মৃদু পুলকের দোলে।
বন-পুলকের' গন্ধ-মেশান হাওয়া
না-ফোটা-কুঁড়ির সকরুণ পথ-চাওয়া
রাতেরে আজিকে উতল করিয়া তোলে।

শালের সবুজ-মঞ্জরী 'পরে ঝরে
জ্যোৎস্না-জড়ানো রূপালী পথের পরে
উতল আজিকে বন-মাধবীর হিয়া
নিবিড়-সবুজ পাতার অন্তরালে
গন্ধ-বিলানো ফুলগুলি তার দোলে—
দিয়াছে সবই সে বাতাসেরে নিবেদিয়া

স্বপনে দেখেছি কাল সন্ধ্যার ঝড়ে
তব বিতানের মাধবী মঞ্জরীরে
উড়ায়ে এনেছে মোর বাতায়ন তলে।
জেগে উঠে এই প্রদীপ নেভান-ঘরে
তোমার স্মৃতি সে উড়ে এসে বারে বারে
রাতেরে করুণ করিছে অশ্রু-জলে।

তোমারো নয়নে আজ কি গো ঘুম নাহি
আমার বিজনে-বাতায়ন পানে চাহি।
হয়তো যে গান ছিলে এতদিন ভুলে
অজানা ফুলের গন্ধ-উতল রাতে
তারই সুর আজ সুনিবিড় বেদনাতে
তোমার বীণার তারে তারে ওঠে দুলে।

তোমার নয়নে জড়ানো সুরের মায়া
বাতায়নে মোর ঘনানো করুণ-ছায়া
নীরবে দোঁহার হ'ল বুঝি চেনা শোনা
তারই স্মৃতি নিয়ে হেথা আজ বারে বারে
রূপসী-নিশার তনুর তানিমা ঘিরে
নীরবে আমার চলেছে স্বপন-বোনা।

মোর লাগি যদি আঁখি তব অনিমিখা
বাতায়ন ঘিরে জ্বালে আজ দীপ-শিখা
কানে কানে শুধু তারে বলে দিও,
বিরহী প্রাণের কত কিছু মোর ব্যথা
সঙ্গী-রিক্ত রজনীর ব্যাকুলতা
সবাকারে আজ করেছে সে সহনীয়।

চাক্‌লাদার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

চাক্‌লাদার ঠাকুরদার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপটা আমার আজো বেশ মনে আছে। সকালে উঠে মা কাপড়খানা কোঁচা দিয়ে পরিয়ে, কোটের বোতামগুলি বেশ কোরে এঁটে দিয়ে বললেন, 'যাও, বারবাড়ীতে পূবের বারান্দায় অতোক্ষণ রোদ এসে গেছে। বইটই নিয়ে রোদে বসে মন দিয়ে পড়াশুনো করো গিয়ে।' মা রস জ্বাল দিতে চললেন। রোদের চেয়ে উনানের পিঠে বসে আগুন পোহাবার দিকেই আমার লোভ বেশী, তা'ছাড়া এক গ্লাস কাঁচা রস মা শেষ পর্য্যন্ত আর না দিয়ে পারবেন না, প্রথমে যতো রাগই করুন। অন্ততঃ আধ গ্লাস তো মিল্‌বে। কিন্তু আজ ভাগ্য একেবারে অপ্রসন্ন। আমাকে পিছনে পিছনে যেতে দেখে মা মুখ ফিরিয়ে ধমক দিয়ে বল্‌লেন, "আবার আমার পিছে পিছে আসছিস্‌ যে পল্টু? তোকে না বল্‌লাম বারবাড়ী গিয়ে বই নিয়ে বস্‌তে?"

"এক গ্লাস রস খেয়ে যাই মা।"

মা সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "কথা শোনো ছেলের! আবার 'রস'! সেই ভোর থেকে তুই ক'বার পায়খানায় গেলি আমি দেখিনি বুঝি ভেবেছিস্‌? প্রত্যেক দিন দু' তিন গ্লাস কোরে খেজুরের রস খাবি আর তোর পেটের অসুখ সারবে না। না, বাপু ও'সব মতলব আজ ছাড়ো। রস তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, ফাল্গুন মাস পর্য্যন্তই তো রস খেতে পারবি। তোর জন্য আজ বাতাসার মতো ছোট ছোট পাটালি কোরে রাখবো। এখন বারবাড়ীতে গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো রোদ্দুরে বসে বসে পড়োগে যাও।"

এ রকম আপত্তি তো মা প্রত্যেক দিনই করেন। তাই ততোটা হতাশ না হোয়ে বললেম, "বেশ, রস না হয় আজ না-ই খেলাম। তোমার কাছে বসে খানিকক্ষণ আগুন পুইয়ে যাই, মা।"

অভিসন্ধিটা মা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেললেন, "না, আজ আর আগুন পুইয়ে কোন লাভ হবে না। অতো লোভ কি ভালো?"

আমি তীব্র প্রতিবাদ কোরে বললাম, "বাঃ রে একটু আগুন পোয়াব তাতেও আমার দোষ?"

মাও রীতিমত চটে গেলেন, "হ্যাঁ, মেয়েদের পিছনে বসে বসে তুমি আগুন পোহাও আর রস জ্বাল দাও, তা হোলেই তোমার দিন কাটবে আর কি। লেখাপড়া কোরে আর হবে কি। আর আমি বাড়ীর সবাইর গাল খেয়ে মরি, 'তুমিই ছেলেকে কুণো কোরেছ।' আচ্ছা তুই বেটা ছেলে না পলটু? সর্ব্বদাই আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবি, ভয়ে বারবাড়ীমুখো হবি না, কারো সঙ্গে একটু আলাপ কোরতে পারবি না। বেশ, কথায় বলে যার হয় না নয় বছরে তার হবে না নব্বুই বছরে। অমনি ছেলের চোখে জল এলো। তা কাঁদো আর যাই করো বাপু এই পেটের অসুখের মধ্যে রস আমি তোমাকে খেতে দিতে পারবো না। ভালো কথা কাল রাত্রে আমাদের বাড়ীতে কে এসেছেন জানিস্‌?"

নবাগত অতিথি সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ না কোরে চুপ কোরে রইলেম।

"দামোদরদী থেকে তোর এক ঠাকুরদা এসেছেন। যা, আলাপ কর গিয়ে দেখি তাঁর সঙ্গে।"

অগত্যা বইপত্র বগলে কোরে বারবাড়ীতে চলে গেলাম। পৃথিবী আমার কাছে আজ নীরস হোয়ে গেছে। পূবের ঘরের বারান্দায় বড়ো বেঞ্চখানার ওপর বসে একটি লোক হুঁকো টানছে আর 'দিদি-ভাই'র সঙ্গে গল্প করছে। আমি যেতেই লোকটি বলে উঠল "এই বুঝি মহিম্‌দিদের বড়ো ছেলে পলটু?"

দিদি-ভাই বললেন; 'হ্যাঁ। পলটু, প্রণাম কর তোর ঠাকুরদাকে।'

আমি প্রণাম করবো না, আলাপ করবো আগে। আমি আবার নাকি আলাপ করতে জানিনে। বাড়ীর কেউ আমাকে দেখতে পারে না, বিশেষ কোরে মা। যতো সব মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে আমার নামে বলবে। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কী নাম, বাড়ী কোথায় আপনার ?"

"নাম ধাম গোত্র প্রবর জেনে ও আগে বুঝে দেখতে চায় আমাকে প্রণাম করা যায় কিনা, বুঝলেন বেয়ান ? আপনার দাদার আর কিছু না হোক কৌলিন্য গর্ব্বটুকু ও পুরোপুরিই পেয়েছে। আমার নাম শ্রীকর্ণমর্দ্দন চাকলাদার। এসো শালা কান এগিয়ে দাও, তুমি আমাকে প্রণাম না কোরে কেমন পারো দেখি।' বলে ভদ্রলোক আমাকে কাছে টেনে নিতে গেলেন। আমি একটু পিছিয়ে গেলাম।

দিদিভাই বললেন, "ভয় কিরে পল্টু, তোর বাবার মামা; তোর ঠাকুরদা হয় যে। ছোট বেলায় কতো দেখেছিস্, তোর একটুও মনে নেই ?"

অবশ্য ঠাকুরদাকে দেখে আর যাই হোক কারোরই ভয় হোতে পারে না। দাড়ি গোঁপ চাঁছা নিতান্ত শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঠোঁট দুটি কেমন যেন একটু অদ্ভুতভাবে বাঁকা। দেখে বরং হাসিই পায়, ভয় হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার গভীর আলাপ জমে গেলো। তাঁর বিচিত্র সরস গল্প শুনতে এতো ভাল লাগতে লাগলো যে রস খেতে না পারার বিন্দুমাত্র ক্ষোভও আমার মনে রইলো না। সেদিন স্কুলে গেলাম না, নাওয়া খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাড়ীর ভিতরেও আর গেলাম না। সারাদিন তাঁর পাছে পাছে লেগে রইলেম। এমন চমৎকার লোক আমি আর দেখিনি। এতো গল্প জানেন। আর সবগুলিই নতুন। কোনদিনই কারো মুখেই আমি এমন মজার মজার গল্প শুনিনি। আর ঠিক কবিওয়ালাদের মতোই অনর্গল বানিয়ে বানিয়ে ছড়া বলতে পারেন। বিকেল বেলায় তো আমার সঙ্গে শুধু ছড়াতেই কথা বললেন। আমি যখনি যাই কিছু না জিজ্ঞাসা করি তিনি মিলিয়ে মিলিয়ে উত্তর দেন। এক সময়ে বললাম, "ঠাকুরদা, আপনি নাকি কালই চলে যাবেন ? আমি কিন্তু যাবো আপনার সঙ্গে।"

"কোথায় ?"

"আপনাদের বাড়ী।"

"দূর। আমাদের বাড়ী কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা ? ভারী জংলা, ভারী নোংরা। অমন জংলা দেশে ভদ্রলোক বাস করতে পারে ? তাইতো সব ঘরবাড়ী ভেঙ্গে নিয়ে তোমাদের এখানে এমাসের শেষাশেষি চলে আসবো।"

"সত্যি ? আর কোনদিনই চলে যাবেন না ?"

"না, অবশ্য, তোমরা যদি তাড়িয়ে না দাও—"

"বাঃরে, আমরা তাড়াবো কেনো ? ঠাকুরদা, আসবার সময় সেই বইটা নিয়ে আসবেন কিন্তু, যার মধ্যে লোহা আর সোণার, জল আর আগুনের ঝগড়া আছে।"

"আনবো, আনবো ; বই-এর বাক্স ধরেই তো নিয়ে আসবো।"

"আর সেই লণ্ঠনটা যার একদিকে লাল, একদিকে সবুজ, একদিকে বেগুনি আর একদিকে হলদে। বুঝলেন ?"

ঠাকুরদা কী যেনো ভাবছিলেন। অন্যমনস্কের মতো বললেন, "আচ্ছা।"

পরের দিন ভোরে উঠে দেখি ঠাকুরদা চলে গেছেন। সেদিন থেকে বাড়ীর প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রতে আরম্ভ করলাম, 'ঠাকুরদা কবে আসছেন। পঁচিশে তারিখের আর কতোদিন বাকি।'

বাবা বললেন, "ঠাকুরদা ঠাকুরদা কোরে তুই যে একেবারে পাগোল হোয়ে গেলি পল্টু। যা ভাবছ তা' নয়। সকাল সন্ধ্যায় দু' বেলা তাঁর কাছে বসে পড়াশুনো না করলে আচ্ছা কোরে কাণ মলে দেবেন। ভারী কড়া লোক।"

ঠাকুরদা তো আসুন আগে। তাঁর কাছে দু-বেলা কেনো সব সময়েই আমি পড়তে পারবো। স্কুলের পণ্ডিত মশাইর মতো বাবাকেও আমি ভারী অপছন্দ করি। ওঁর কাছে পড়া দিতে গেলেই তাড়াতাড়ি অন্যান্য বইর পড়া সব নিয়ে অঙ্ক করতে দেন কিংবা মণকষার হিসেব জিজ্ঞাসা করেন। বলেন, "অঙ্কে তুই ভয়ানক কাঁচা পল্টু। কর দেখি এই মিশ্র ভাগটা, একবারে রাইট করা চাই কিন্তু।"

ঠাকুরদার নিশ্চয়ই অঙ্কের প্রতি তেমন প্রীতি নেই। তাঁর কাছে পড়া দিতে আমার ভালোই লাগবে।

কয়েকদিন পর একদিন বিকেল বেলায় আমি আর কান্দু নদীপারের কুলগাছ তলায় কুল কুড়াচ্ছি। কান্দু বল্‌ছে ঐ ডালটায় অনেকগুলি পাকা পাকা কুল রয়েছে দেখেছ দাদা? ঢিল ছুঁড়ে ওগুলি আর পাড়া যাবে না। গাছে উঠে ঝাঁকি দিতে হবে। আমি উঠি গিয়ে গাছে।"

আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। ঐ কুলগুলিই সবচেয়ে পাকা। তবু মুখে একটু প্রতিবাদ করে বললাম, "না, না, গাছে উঠে দরকার নেই। শেষে আর ইঁদুরের মতো পড়ে টড়ে যাবি আর দোষ হবে আমার।" হঠাৎ নদীর মধ্যের একখানা নৌকা থেকে আওয়াজ এলো 'আরে, ঘাট যে ছাড়িয়ে যাচ্ছ মিঞা, এই তো ঘাট। ফিরে দেখি বড়ো একখানা দোমাল্লাই নৌকা আমাদের ঘাটে এসে ভিড়লো। আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ঠাকুরদা। বললেন, "ইঃস বেলা একেবারে শেষ কোরে দিয়েছ মিঞারা! আরে কান্দু পল্টু যে, তোমরা কী করছ এখানে? বাঙ্কু কোথায়? তার যে জ্বর দেখে গিয়েছিলাম, সারেনি? কান্দু, যাওতো ভাই, এলেম আর রহমকে ডেকে নিয়ে এসোতো। জিনিষ-পত্তর সব তুলতে হবে। ওরা দুজনে তো আর পারবে না। উঠাবার সময়ও তিন চারটা কামলা লেগেছিল।" কান্দু তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গেলো। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বাবা আর কাকা বোধ হয় এখনো ফেরেন নি ডাঙ্গা থেকে?"

আমি বললাম, "না। ঠাকুরদা সেই বইখানা এনেছেন তো মনে কোরে?"

"হুঁ, হুঁ, শুধু বই? বই, বউ, হাঁড়ি কোলা বাক্স, তেক্স সব নিয়ে এসেছি! কিছু রেখে আসিনি। ওরে সুবর্ণ তোরা এখনো বসে আছিস, কেনো? পল্টুর সঙ্গে বাড়ী যা তোরা। ঐ তো বাড়ী। ঐ যে বড়ো আমগাছটা দেখা যায়—। মাঝিদের নিয়ে আমি এগুলি ক্রমে ক্রমে নামাতে থাকি। তোর মার যতো কাণ্ড। মুড়ীর কোলাগুলি পর্য্যন্ত নৌকায় তুলেছে। ও সব যেনো এখানে আর পাওয়া যায় না। এগুলো রামঠাকুরদের দিয়ে এলেই হোতো।"

সংবাদ পেয়ে 'দিদি-ভাই' 'মা' 'জেঠীমা' ততোক্ষণ ঘাটে এসে পৌঁছেছেন। ঠাকুরমা আর সুবর্ণ-পিসী নৌকা থেকে নামলেন। সুবর্ণ পিসীকে দেখে তখন আমার মনে হোয়েছিল এমন সুন্দরী মেয়ে আমাদের গাঁয়ে আর আমি দেখিনি। ঠাকুরমার মুখ দেখা গেলোনা। হাতখানেক লম্বা এক ঘোমটা দিয়ে জেঠীমাদের পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন।

নৌকা থেকে জিনিসপত্র তুলতে তুলতে রাত্রি হোয়ে গেলো। ভাই বল্লেন "চাকলাদার, শুধু ভিটার মাটিটুকুই নৌকায় তুলে নিয়ে আসতে পারোনি, আর সব নিয়ে এসেছ। ঘায় খইচালা চালুনখানা পর্য্যন্ত।"

সত্যি, নৌকার ভিতর থেকে বিরাট এক সংসার বেরুলো। গোটা কয়েক সিন্দুকের মতো বড়ো কাঁঠালের বাক্স, ছোট ছোট হাতবাক্স কতোকগুলি, ছোট বড়ো টিনের ট্রাঙ্ক গোটা কয়েক, প্রায় শখানেক কাঁঠালের পিঁড়ি— সব তুলতে তুলতে আমাদের পুবের ঘরে আর তিলমাত্র স্থান রইলো না। এই সব বড়ো বড়ো বাক্সগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত আমার, কান্দুর আর বাঙ্কুর অপরিসীম কৌতুহলের বস্তু হোয়েছিল। মাসের পর মাস আমরা বিপুল কৌতূহল নিয়ে যে বাক্সগুলির তালা চাবি ছিল না সেগুলি তন্ন তন্ন কোরে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখেছি কী আছে ওগুলির মধ্যে। সংসারের যতো সব অকেজো জিনিস (অবশ্য তখন আমাদের চোখে প্রায় সবই কাজের জিনিষ ছিল) ছেঁড়া কাঁথা আর ছেঁড়া কাপড়, পুরাণো পঞ্জিকার স্তূপ, আরম্ভ নেই শেষও নেই এমন কতোগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া বই, কোনো-টার মধ্যে ডুগিতবলার খোলই পাঁচসাতটা, কোনটার মধ্যে লোহার নানা রকম অস্ত্রপাতি, খোস্তা কুড়ুল থেকে আরম্ভ কোরে হাতুড়ি বাটালিও আছে, কোনোটায় বিচিত্র রঙের ঘুড়ির লাটাই সরু মোটা নানা রকমের সুতা, কোনোটায় শুধু মৎস্য শীকারের সরঞ্জাম বিভিন্ন প্রকারের জাল আর বড়শী, বাইন মাছ মারা সুপারীর চোঙা গোটা কুড়ি। পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিষ খুঁজে মিল্‌বেনা যা' ঠাকুরদার কোনো না কোন বাক্সে নেই। ঠাকুরমা আমাদের সব ঘাঁটতে দেখে মাঝে মাঝে পিছনে এসে চুপ কোরে দাঁড়াতেন; বল্‌তেন, "দেখেটেখে যেখানে যা' আছে

সেখানেই আবার তা, গুছিয়ে রেখে যেজো দাদুয়া। কিছু নিয়োনা যেনো। ওর আবার কখন কোনটায় খেয়াল যাবে তার তো কিছু ঠিক নেই আর চাওয়া মাত্র হাতের কাছে তা না পেলে আমার আর রক্ষে থাকবে না।" পরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন, "ওকি মানুষ! মানুষ হোলে আর এমন দশা হবে কেনো। যখন যা' দেখেছে তার পিছনেই টাকা নষ্ট কোরেছে। এমনি কোরে কোরেই তো সব গেলো। মানসম্ভ্রম গেলো, বিষয় সম্পত্তি গেলো বাপ পিতাম'র ভিটাটুকু পর্যান্ত রইলোনা। এই খেয়ালের জন্য বিনা চিকিৎসায় ছেলেটাকে পর্য্যন্ত খোয়ালেম। আর ওরই বা দোষ দিয়ে করবো কি, সবই আমার কপাল", বলে কপালে হাত দিয়ে বলতেন, "সবই আমার এই চার আঙুলের মধ্যে নিয়ে এসেছি! কিন্তু আমার মাথা খাও পল্টু, আমি যে এসব কথা তোমাদের কাছে বললেম তা' জেনো তোমার ঠাকুরদার কানে না যায় খবরদার। তা হোলে আমার আর রক্ষে থাকবেনা, বাড়ীসুদ্ধ তোলপাড় কোরে তুলবে। আমার জ্বালা কি এক জায়গায়? আমার একটা কথাও ও কোনোদিন সহ্য কোরতে পারে না।"

কিন্তু ঠাকুরদার বিরুদ্ধে এ সব অভিযোগের একবিন্দু তখন আমার বিশ্বাস হোতোনা। ঠাকুরদার মতো লোক বুঝি আবার কখনো রাগ করতে পারে!

সত্যি ঠাকুরদাকে দেখে আর তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে কিছুতেই বুঝবার উপায় ছিল না যে তাঁর পিছনে পুঞ্জীভূত হোয়ে আছে অতীতের বহু অবাঞ্ছনীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা, দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। মৃত্যুর রূঢ়তম আঘাত যে কোন দিন, তিনি পেয়েছেন তা তাঁর সরস মন্তব্য আর কবির ছড়া থেকে বিন্দুমাত্রও অনুমান করার জো ছিল না। প্রাণনাথ পরামানিককে আমি ও আমরা (কান্নু বাবু) দোস্ত বলে ডাকি, কিংবদন্তী আমার অতি বাল্যকালে একদা ভয়ানক জ্বর হোয়েছিল। জ্বর থেকে উঠে কিছু দিন ভাত আমার মুখে কিছুতেই রুচ্‌তোনা, খবর পেয়ে প্রাণনাথ নিজ হাতে মেরে এক কুড়ি কই মাছ আর কুড়ি সেরেক মাগুর মাছ উপহার দিয়ে আমার সঙ্গে অক্ষয় বন্ধুত্ব স্থাপন কোরে নেয়, আর এই বন্ধুত্বের জন্য সে বিনা পয়সায় আমাদের পরিবারের প্রত্যেককে ক্ষৌরী করতো আর বিনা পয়সায় বাবার কাছ থেকে মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ পেত। দোস্ত এসে বললে, "আসুন চাকলাদার মশাই, আপনাকে ক্ষৌরী কোরে দিয়ে আমার আবার রায় বাড়ী যেতে হবে।"

ঠাকুরদা বললেন, "আরে ভায়া বসোনা একটু, ভালো কোরে রোদটা উঠুক, এতো ব্যস্ততা কীসের! তা প্রামাণিক ভায়ার নামটা যেনো সে দিন কী বলেছিলে!"

"প্রাণনাথ প্রামাণিক।"

"কী?"

"আজ্ঞে প্রাণনাথ।"

"আরে সেতো অন্দর মহলে 'প্রাণেশ্বরীর' কাছে, যখন ক্ষৌরী কর তখনকার নামটা কী আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

আমরা হেসে উঠলেম।

ঠাকুরদার এমনি টুকরো টুকরো সরস মন্তব্যগুলি আমার ঝাঁক বেঁধে মনে পড়ে। ভদ্রলোক কখনো যেনো সিরীয়স্ হোতে জানতেন না, গম্ভীর হোতে পারতেন না। ঘোষ-পাড়ার নগরবাসী এক দিন করুণ কণ্ঠে তার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবিচারের আর ছলনা চাতুরীর কাহিনী বর্ণনা কোরে শেষে বললে, "কিন্তু ধর্ম্মের জয় শেষ পর্য্যন্ত হবেই বুঝলেন চাকলাদার মশাই। এতো যে ছল চাতুরী কোরে গেলেন আমার সঙ্গে, তার ফল হোলো কী। বড় বৌঠান বেশ মজা বুঝছেন তার। কোনো সন্ধ্যা এক বেলা জোটে আবার কোন দিন জোটেও না, শুধু বড়দাই কিছু টের পেয়ে গেলেন না।"

ঠাকুরদা মাথা ঝুলিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, "বটেইতো, আক্ষেপই তো সেইখানে নগরবাসী, বড়ো বৌদি শেষ পর্য্যন্ত বিধবা হোলেন কিন্তু বড়দা থাকতে হোলেন না এই দুঃখ।"

অবিলম্বে গ্রামের কারো কাছে এ কথাটা আর অবিদিত রইলোনা চাকলাদার মশাইর মতো এমন সুরসিক আর বিশ্বকর্ম্মা লোক পৃথিবীতে নেই। এম-ই স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক নর্ম্যাল পাশ পণ্ডিতমশাই ঠাকুরদার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হোয়ে গেলেন, আতসকার রজনী ধুপী ঠাকুর-

দার কাছ থেকে নতুন নতুন তুবড়ী চরকি আর বোমের বারুদের ভাঁজের সন্ধান পেয়ে ঠাকুরদার অত্যন্ত অনুগত হোয়ে রইল। গ্রামের ঢুলীশ্রেষ্ঠ হরলাল ওঁর কাছে এসে অবসর পেলেই ঢাকের বোল শিখে যেত। জেলে লালমোহন ঠাকুরদার কাছে প্রায়ই সন্ধান নিতে আস্‌তো মাছ মারার কোন নতুনতর ফন্দী তিনি আবিষ্কার কোরেছেন কি না। ঠাকুরদা মাস চারেক বসে বসে আমাদের বড়ো নৌকার এমন এক ছই বাঁধলেন যে দৈনিক আট আনা মজুরীর গোপাল ঘরামী এসে তাঁর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়লো, কর্ত্তা, আপনাকে আমি ওস্তাদ স্বীকার করলুম। আমাকে বাঁশের কাজ শিক্ষা দিতে হবে। এমন ছই রায় বাড়ীর রাঙা ভুঁইয়াকে বেঁধে দিতে পারলে তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা বকশিষ দিয়ে দেবেন।”

কিন্তু যতো আন্তরিকতা ঠাকুরদার এই সব ধোপা, নাপিত, ঢুলী, নমঃশূদ্রদের সাথে, গ্রামের ভদ্রলোকদের সাথে আলাপ ক'রতে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করতেন না। তাঁদের প্রায় সবাইকেই তিনি অপছন্দ ক'রতেন। আর সব চেয়ে তাঁর খারাপ লাগ্‌তো কীর্ত্তনীয়া অক্ষয় মাষ্টারকে। তিনি আমার বাল্য শিক্ষক, ছিলাদর চরে তাঁর সেই পাঠশালাটি আজো আছে। কিন্তু শিক্ষকতা তাঁর নাম মাত্র। সদা সর্ব্বদা তিনি কীর্ত্তন নিয়েই মত্ত হোয়ে আছেন। আশে পাশে কীর্ত্তনীয়া বলে তাঁর খ্যাতিও খুব। চোমরদী, চণ্ডীদাসদী, গোহালা, বাটিকামারী এমন কি ঢাকা জেলার সুদূর কলাকোপা থেকেও তাঁর কীর্ত্তনের দলের বায়না আসতো। সুর তাল জ্ঞান যে তাঁর খুব বেশী তা' নয় কিন্তু কৃষ্ণ কীর্ত্তনে তিনি নিজেই এমন বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে মত্ত হোয়ে যান যে তাঁর শ্রোতার দলেও তাঁর সেই ভাববিহ্বল মত্ততা অবাধে সঞ্চারিত হোয়ে যায়। এই বিহ্বলতাকে সংক্রামক আর একে পূর্ণ ভাবে সংক্রামিত কোরতে পারাতেই কীর্ত্তনীয়ার কৃতিত্ব। সুর তালের দিক দিয়ে তেমন ওস্তাদ তিনি নাইবা হোলেন। বিশেষতঃ মাষ্টার মশাইর সেই কীর্ত্তনখানা “একবার নিতাই নিতাই নিতাই বলে চলনা নদীয়ায়, যদি শচীর ঘরে নয়ন ভরে দেখবিরে গৌরাঙ্গ রায়”—শুনে প্রত্যেকেই চমৎকৃত হোয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুরদা মাষ্টার মশাইকে মোটেই দেখতে পারেন না। বলেন লোকটির রাগরাগিনী সম্বন্ধে কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। শুধু নর্ত্তন কুর্দ্দনেই লোককে অস্থির কোরে তোলে, গানের ওর সম্বল শুধু চোখের জল, আর যে সব তেল লবণ বেচা রসিক মহলে ওর প্রসিদ্ধি সেই ব্যবসায়ীরা দিনে এক সেরের জায়গায় তিন পো বেচে রাত্রে তার পাপ ক্ষয় কোরবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ নাম শুনে কাঁদবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হোয়ে থাকে। তারাই তো ওর সব চেয়ে বড়ো সমঝদার। তা ছাড়া কীর্ত্তন আবার একটা গান! হ্যাঁ, ধ্রুপদ আলাপ করোতো একখানা—দেখি সঙ্গীত শাস্ত্রে তোমার কতোটুকু অধিকার জন্মেছে—

আমাদের পরিবারে ঠাকুরদা প্রত্যেকেরই প্রিয় হোয়ে উঠলেন। প্রত্যেক দিন শেষ রাত্রে উঠে আমি পুবের ঘরে গিয়ে ঠাকুরদার কাছে শুয়ে পড়ি। তাঁর কাছ থেকে প্রত্যহ শুনে শুনে কালিদাসের শৃঙ্গারাষ্টক আর শৃঙ্গারতিলক অমরুর শৃঙ্গারশতক, ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপ বর্ণনা আমি প্রায় মুখস্থ কোরে ফেললাম। কবিগানের অনেক ধূয়া আমার কণ্ঠস্থ হোয়ে গেলো। তাঁর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সমালোচনা করতে তখন কী ভালোই যে লাগতো! শৈবলিনী সতী কি অসতী, কুন্দনন্দিনী আর সূর্য্যমুখীর মধ্যে কে নগেন্দ্রনাথকে বেশী ভালো বেসেছিল, রোহিণীকেই কেনো ঠাকুরদার বেশী ভালো লাগে, ভ্রমরের দুঃখে কি তাঁর প্রাণ কাঁদেনা, ইত্যাদি নিয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে প্রত্যহ আমার বিতর্ক চলতো। উঠতে বেলা আটটা বেজে যেত। বাবা ভয়ানক রাগ করতেন। “কবির ছড়াই শেখো বসে বসে, লেখাপড়া কোরে আর কী হবে! পরীক্ষার আর কত দিন বাকি? এবার বার্ষিক পরীক্ষায় তুই কি কোরে পাশ করবি আমি ভাবি। প্রত্যেক দিন ভোর ছটায় উঠে আমার ভাত খাওয়ার আগে আমার কাছে তোর ইংরেজী পড়া দিবি আর অঙ্ক কষবি। বুঝেছিস্? কেষ্ট মাষ্টারের কাছে শুনলুম ক্লাসে ভগ্নাংশ করাচ্ছে আর তুই এখনো মিশ্র গুণ মিশ্র ভাগ শুদ্ধ কোরতে পারিসনে, আশ্চর্য্য।”

কানু মুগ্ধ ছিল অন্য কারণে। ঠাকুরদা তাকে প্রকাণ্ড

এক মাপ ঘুড়ি তৈরী কোরে দিয়েছিলেন। আর তার ফর-মাস মতো যখন তখন তাকে ছোট বড়ো নানা রকমের ঘুড়ি বানিয়ে দিয়ে, উড়াবার সুতো মেজে দিয়ে ঠাকুরদা কান্দুর মনোহরণ করেছিলেন। কৃতজ্ঞ কান্দু ঠাকুরদার তামাক খাবার জন্ত কুল গাছের গুঁড়ি পুড়িয়ে কয়লা করে দিতো আর তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করতো,"তামাক ভরে আনবো ঠাকুরদা?" ঠাকুরদা ভয়ানক খুসী হোয়ে উঠতেন। কান্দু সব চেয়ে বুদ্ধিমান। বাপ্পু তাঁর কাছে তুবড়ী বাজীর ভাগ শেখা আরম্ভ কোরেছিল। আর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পা টিপে দিতে দিতে, দুপুরে স্নানের আগে তাঁর পিঠে তেল ডলতে ডলতে বলতো, "ঠাকুরদা, সেই লাল কালিতে লেখা, বশীকরণ মন্ত্রের খাতাটা আমাকে আজ দিন।"

ঠাকুরদা বলতেন, "সে তো তোমাকেই দেবো বাপ্পু, তবে কোথায় কোন বাক্সে ছেঁড়া কাঁথা কাপড়ের তলায় রয়েছে তা' খুঁজে দেখতে হবে তো? তা ছাড়া শনিবার অমাবস্যায় সন্ধ্যাবেলায় প্রথম সেটা তোমার হাতে না দিলে তো কোনো ফল হবে না। অন্য সময়ে দিলে মন্ত্র ব্যর্থ হোয়ে যাবে।"

বাড়ীর মেয়েরাও সকলেই তাঁর ওপর খুসি ছিলেন। তাঁদের ফরমাস মতো তিনি ধামা কুলো বেঁধে দিতেন। লেপ তোষক, কাঁথা, মশারীও তিনি বেশ নিপুণভাবে সেলাই কোরে দিতে পারতেন।

শুধু প্রসন্ন ছিলেন না বাবা, প্রায়ই মাঝে মাঝে ধমকের সুরে তাঁকে বলতেন, "ঠাকুরমামা, এই বয়সে নভেল নাটক পড়তে শিক্ষা দিয়ে পন্টুর মাথা তো আপনি খেয়েইছেন—আপনার মতোই দিনরাত ও আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকে, সে যাক্, কিন্তু এই যে বাড়ীর ওপর অহোরাত্র ছোট লোকদের ডেকে এনে হাট বসাচ্ছেন আর তামাক খাওয়াচ্ছেন এ সব কী? চিরটা কালই কি আপনার এক ভাবে যাবে? কাজকর্ম তো কিছু করবেন না, নাই করলেন। ওপাড়ার উমেশ পাল, সতীশ নাগ তো দলীল লিখেই তাদের সংসার চালাচ্ছে। বলেছিলাম হাতের লেখা তো মোটামুটি ভালোই ছিলো, মুসাবিদাও এক রকম মন্দ জানতেন না, কিন্তু তা' আপনার পছন্দ হোলো না। তারপরে বললাম, একটা পাঠশালা চালা করলেও তো পারেন। কিন্তু তাও আপনি করলেন না। আপনি যে দুপয়সা এনে সংসারের সাহায্য করবেন সে ভরসা আমি আর করিনে আর আপনার আশীর্ব্বাদে তাতে আমার প্রয়োজনও নেই। তাই যদি আপনি পারবেন তো আপনার এমন দশা হবে কেনো। সংসারে সবই শিখেছিলেন শুধু কী কোরে টাকা রোজগার কোরতে হয় তাই শেখেন নি। থাক্ সে সব। কিন্তু কিছু একটার মধ্যে মনটাকে নিবিষ্ট কোরে রাখাই তো উচিত। এভাবে বসে বসে একেবারে অকর্ম্মণ্য হোয়ে যাবেন যে, আর এ বয়সে নভেল নাটক আপনিই বা পড়বেন কেনো শুনি। যখন যা মানায়, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী আমার লাইব্রেরীতে সবই তো আছে। সে সব আপনি পড়তে পারেন না আজকাল? বসে বসে নভেল নাটক পড়ছেন আর ঝাড়ের বাঁশগুলির সর্ব্বনাশ করছেন ডালা চালুনি বুনিয়ে বুনিয়ে। একটা সংসারে ক হাজার ডালা কুলোর দরকার হয় জিজ্ঞেস করি?"

ঠাকুরদা বাবাকে ভয়ানক ভয় করেন। "না, না, মেজ বৌমা সেদিন বলছিলেন, তাই। পন্টু তোমার খাতা পেন্সিল নিয়ে এসো তো। আজ তোমাকে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ শিখিয়ে দেবো।"

দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল। ঠাকুরদার উর্ব্বর মস্তিষ্ক নিত্য নতুন আমোদ আর কৌতুকের সৃষ্টি করতো। ক্রমে ঠাকুরদার কাছে আমরা পাশা খেলাটাও শিখে ফেললাম। ওঁরা যখন ডাঙ্গায় চলে যেতেন স্কুলের ছুটীর পর আমরা তিন জন ঠাকুরদাকে নিয়ে পাশা খেলতে বসতাম। পাশা খেলায় বাপ্পুর মাথা সব চেয়ে বেশী খেলতো। আমি আর ঠাকুরদা প্রায়ই কান্দু বাপ্পুর কাছে হেরে যেতাম। মাঝে মাঝে আমি ধমক দিয়ে বলতাম, "নাঃ, কী সব বিশ্রী দানই যে আপনার পড়ছে ঠাকুরদা। এ ভাবে কি খেলা চলে নাকি? আপনি ভারী অন্যমনস্ক। সাত আটটা দানের মধ্যে আপনি হাত খুলতে পারলেন না।" হারজিতের দিকে ঠাকুরদার মোটেই লক্ষ্য নেই। নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে বলেন; "কী

করবো তারা, এতো আমার বাপের হাড়ের পাশা নয়, যে যা বলব তাই পড়বে।"

এমনি করে দিন যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। একটা বছর যে কাটলো তখনই আমরা টের পাই যখন স্কুলের এ্যানুয়াল পরীক্ষা আসে। কিছুদিনের জন্য বাক্সে বই, পাশা খেলা, ঠাকুরদা, সব কোথায় একপাশে পড়ে থাকে। পরীক্ষায় পাশ কোরতে হবে। দিনরাত্রি পাঠ্য বইগুলির ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থেকে চলে দুঃসাধ্য পাশের সাধনা। ভয়ে বুক দুরু দুরু কোরতে থাকে, কী হয় কী হয় রণে জয় পরাজয়। কিন্তু প্রতিবারই বিপদ নির্বিঘ্নে কাটে। প্রমোশন পাওয়ার ফূর্ত্তি, নতুন বই কেনার ফুর্ত্তি। বাবা প্রত্যেক বছর আমাদের হাতেখড়ির গুরুমশাই থেকে আরম্ভ কোরে হাই স্কুলের টিচারদের পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়ান। কিন্তু নতুনত্বের আনন্দ বেশী দিন থাকে না। আরম্ভ হয় সেই একঘেয়ে এ্যালজেবরা আর জিওমেট্রি, প্রিয়নাথ বাবুর মস্তিষ্কপ্রসূত জটিল প্রবলেম আর একস্ট্রা, হেডমাষ্টারের ইংরেজী গ্রামারের খুঁটিনাটি, পণ্ডিত মশায়ের বিদ্যাসাগরী বাংলা বক্তৃতা আর জুট আর আলীলিং। সব মিলে স্কুল আবার পুরাণো আর নীরস হোয়ে ওঠে। শুধু পুরাণো হন না ঠাকুরদা, তাঁর অফুরন্ত রস ভাণ্ডার নিয়ে তিনি অক্ষর অপরিবর্ত্তনীয় হোয়ে আছেন। খেজুর গাছের রস শেষ হোয়ে আসে, চোমরদীর আর ছাতিমতলার মাঠের ঘোড়দৌড়গুলি ফুরিয়ে যায়, লোকনাথ সা'র দোলের উৎসব ম্লান হোয়ে আসতে আসতে, এসে পড়ে শশী সা'র নীল পূজা। কিছুদিন বেশ মজায় থাকা যায়, গুপী বালার "বোল সাং" আর "সন্ন্যাস খাটা" আর অশুদ্ধ উচ্চারণের ছড়া—"দৈবযোগে শিবলিঙ্গ সেই বৃক্ষ মূলে" নেপাল বালার মাথায় তিন সের ওজনের "পাট গোঁসাই" দশমণ ভারী হোয়ে পড়েন; তারপরে তিরিশে চৈত্র তারিখের সেই বিরাট মেলা। পার্শ্ববর্ত্তী দুচার গ্রামের লোক শশীসার উঠানে ভেঙ্গে পড়ে। বছরে এই একদিন আমরা সত্যি সত্যি মানুষের ভিড় দেখি। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাই আর আনন্দ পাই, জানি যে সত্যিই আমরা হারিয়ে যাই নি। তবু কল্পনা কোরে আনন্দ পাই যে আমরা হারিয়ে গেছি। আমাদের বাড়ী আর আমরা খুঁজে পাবো না। তার পরের দিন রসরাজ দাসের দোকানে হালখাতা। বাপ্‌ সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রসগোল্লা খায় আর প্রত্যেক বছরই পরের দিন ওর পেটের অসুখ হয়। তারপরে আসে স্কুলের ফার্ষ্ট টার্মিন্যাল। পরীক্ষা আর পরীক্ষা, কী মুসকিল। সীতাকেও বোধ হয় জীবনে এতোবার পরীক্ষা দিতে হয় নি। আর অগ্নিপরীক্ষা কী এর চেয়েও কঠিন ছিল? কিন্তু আবার আরাম পাওয়া যায় গ্রীষ্মের ছুটীতে; আম খেতে খেতে আর ঘুমাতে ঘুমাতে অতো বড়ো বন্ধটাও নিঃশেষ হোয়ে আসে। অনুতাপ হয়, ইঃস, কিছু পড়াশুনো হোলোনা, আর তো ছুটী পাওয়া যাবে সেই আশ্বিন মাসে। কিন্তু তার আগে আছে আবার আর এক পরীক্ষা, সেকেণ্ড টার্মিনাল। পণ্ডিত মশাইর 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ' শ্লোকটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেত ছুটী আর পরীক্ষায়, ছুটী আর পরীক্ষায়। তারপরে আসতো পূজা। রায়দের দুর্গোৎসব। অতো বড়োলোক কিন্তু প্রত্যেকেই কোনো রকমে নমো নমো কোরে পূজা সারে। যেনো মাতৃশ্রাদ্ধ কি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হোয়েছে। শুধু মামলা মোকর্দ্দমা করার বেলায় এদের টাকার থলির মুখ খোলে। অন্যান্য গাঁয়ের মতো আমাদের গ্রামে যাত্রা নেই, থিয়েটার নেই, কোন রকম ফুর্ত্তিরই ব্যবস্থা নেই। অথচ কতো বড়োলোক ওরা।

বছরের পর বছর কাটে, কিন্তু একটা আর একটারই পুনরাবৃত্তি। শুধু নতুন ক্লাসে উঠা ছাড়া আর কোন নূতনত্ব নেই। কিন্তু এই চিরপরিচিত পুরাতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে একটু একটু কোরে। দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাচ্ছে, তা ঠিক পুরাপুরি যেন কেউ আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে।

ঠিক এমনি এক সময়ে একদিন মনে হোলো ঠাকুরদার রসিকতাগুলি বড়ো পুরানো, বড়ো সেকেলে। আর ঠাকুরদা যেনো একই কথা বার বার বলেন, একটু ঘুরিয়ে বলেন মাত্র। নিজেকে নিজে নকল করতে তাঁর কি ক্লান্তি আসে না? ভারতচন্দ্র বড়ো ভাল্‌গার মনে হয়, ঠাকুরদাকে

রবীন্দ্রনাথ পড়তে উপদেশ দিলাম। কেশববাবুর সাজেজ্-সন অনুযায়ী আমি স্কুল লাইব্রেরী থেকে নামকরা কন্‌টিনেন্-টাল উপন্যাসগুলি পড়তে আরম্ভ কোরেছি। ঘুড়ী উড়াবার ওভ্যাস কান্দু বহুদিন ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল ও জিম্‌ন্যাষ্টিক করে। ওর উচ্চাকাঙ্খা বাংলা দেশে একজন নামকরা জিমন্যাষ্ট হবে। ঠাকুরদাও বুঝতে পারছেন যে তাঁর মনোহারীত্ব ক্রমেই ফিকে হোয়ে আস্‌ছে, রসের তেমন গাঢ়ত্ব আর নেই, আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয় ঠাকুরদা আসলে আস্ত একটি অকর্ম্মণ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

সেদিন রাত্রের ঘটনায় ঠাকুরদা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরো খারাপ হোয়ে গেলো। রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ কোরে আমরা সবে ঘুমিয়েছি হঠাৎ পূবের ঘর থেকে বিকট চীৎকার আর রুদ্ধ কান্নার শব্দে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। "কী, ব্যাপার কী, ঠাকুরদা, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন শিগগির।" ঠাকুরদা আমাদের কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ না কোরে শুধু চেঁচাচ্ছেন "হারামজাদি, তুই আবার দাঁতে তামাকের গুড়ো দিয়েছিস্। এতো বড়ো স্পর্দ্ধা তোর, আমি যা' কখনো চ'চক্ষে দেখতে পারিনে তাই—"

বাবা বল্লেন, 'কী হোয়েছে মামীমা, দোর খুলে দিন তো।'

ঠাকুরমা এসে দোর খুলে দিলেন. সুবর্ণপিসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আমরা সবাই ঘরে এসে ঢুকলেম, "আজ আবার আপনাদের কী হোলো মামীমা?" বাবা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করলেন। ঠাকুরদা' তখন চুপচাপ তামাক ভরতে বসেছেন, বল্লেন, "কিছু না, কিছু না, মাহিন্দির তোমরা শোও গিয়ে যাও। কেনো মিছামিছি আবার উঠে এসেছ? কী একটা যেন দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ওরা ভয়ে কেঁদেই অস্থির। ভয়ের স্বপ্ন দেখা আমার আর গেলোনা। রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, বায়ু ভয়ানক চড়ে গেছে। চোখ বুজলেই যতো সব ছাই ভস্ম দেখি—"

বাবা ফেটে পড়লেন, "তিনকাল কেটে গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো মিথ্যা বলতে কোনো সংকোচ হয় না আপনার? ভেবেছেন আমি বুঝি কিছু জানিনে, কিছু টের পাইনে? মদ যে বহুদিন আগে থাকতেই খান তা আমি জানি, কতোবার আপনাকে গোপনে নিষেধ কোরে দিই নি, 'ছিঃ ঠাকুরমামা ও সব আর এবয়সে করবেন না?' তবু আপনি আমার নিষেধ শুনলেন না। এই দুপুর রাতে বুড়ো বয়সে আপনি মাতলামি আরম্ভ কোরেছেন, লজ্জা করে না আপনার? আমারি ভুল হোয়েছিল আপনাকে জায়গা দেওয়া, বাড়ীর ওপর এই কেলেঙ্কারী ডেকে আনা—"

মণিকাকা মাঝখানে এসে পড়লেন, "আঃ, আপনিই বা কী আরম্ভ কোরেছেন মেজদা, থামুন। ঠাকুরমামা শুয়ে পড়ুন আপনি। সুবর্ণ, দোর টোর ভালো কোরে এঁটে দিস্, ভুল হয় না যেনো, তোদের আবার যা' অভ্যাস, কাল রাত্রে দেখলাম দোর খোলা রেখেই সব ঘুমিয়ে পড়েছিস। একটু সাবধান থাকা ভালো। দিন কাল যা' আরম্ভ হোয়েছে। এই তো সেদিন জলধর সা'র বাড়ী চুরি হোয়ে গেলো।"

ঠাকুরদার ওপর যতোটুকু শ্রদ্ধা ছিল একেবারে নিঃশেষ হোয়ে গেলো। কিন্তু বাবাকেও ক্ষমা কোরতে পারলেম না। আমাদের সামনে ঠাকুরদাকে অমন কোরে বলাটা তাঁর উচিত হয় নি। অন্ততঃ একটু sence of decency তাঁর থাকা উচিত ছিল। Moralistদের কি decencyর জ্ঞান থাকতে নেই?

পরদিন সকালে উঠে ভাবলাম ঠাকুরদার কাছে কাল-কের ঘটনার জন্য বাবার হোয়ে ভদ্র ভাষায় apology চাইব আর সাবধান কোরে দেব এমন যেনো আর না করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই মুখ দিয়ে প্রথমেই বের হোয়ে গেলো, "ছিঃ ঠাকুরদা, এ বয়সেও আপনি মদ খান?" ঠাকুরদা হেসে বললেন, "দুর্গা, দুর্গা, সকাল বেলায় কী সব অশ্লীল ভাষার ব্যবহার আরম্ভ কোরলে!? মদ খাই তোমাকে কে বললে? মাঝে মাঝে এক আধটু সুরা পান করি বটে। ওতে কোনো দোষ নেই। আর কিছু দিন পরে এই নির্দোষ আমোদ প্রমোদ তুমিও তো আরম্ভ কোরবে ভায়া।"

"আমি ?"

"হ্যাঁ, আমি বেশ দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। আদি রসের ওপর এই বয়সেই যখন তোমার এতো আসক্তি তখন সুরা আর সুরত যে কী বস্তু তা বুঝতে তোমার আর বেশী বিলম্ব হবে না। আমার সতেরোতে আরম্ভ হোয়েছিল, তোমার অতো দেরী কোরতে হবে না।"

"অভিশাপ দিচ্ছেন বুঝি ?"

"পাগোল, তোমাকে অভিশাপ দিতে পারি ?" ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আশীর্বাদ করছি, পণ্টু, তুমি যে আমার মন্ত্রশিষ্য। তিন দিন পরে অবিনাশ চাকলাদারের কোনো চিহ্নও আর দামদরদী গ্রামে দেখা যাবে না, কিন্তু তোমার মধ্যে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।"

"তিন দিন পরে অবিনাশ চাকলাদার কি আত্মহত্যা কোরে মরবে ? তা ছাড়া মরার আর কোনো লক্ষণ তো আর আপাততঃ দেখতে পাচ্ছিনে।"

"মূর্খ, অবিনাশের কি বিনাশ আছে কোনো কালে ? আত্মহত্যা কোরতে যাবে সে কোন্ দুঃখে ? নরকের চেয়ে দামোদরদি গ্রাম অনেক ভালো।"

দুপুর বেলায় দেখলাম ঠাকুরদা সত্যি সত্যিই জিনিস পত্র গুছানো আরম্ভ কোরেছেন। তাঁর দা' ছুরী, এখানে ওখানে টুকরো টুকরো যা কিছু ছড়ানো ছিল সব পরিপাটি কোরে এক বেলার মধ্যে তিনি বাক্সে তুলে ফেললেন। আমাকে অসঙ্কোচে বললেন, "পণ্টু, যে সব বইগুলি আমি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম, সেগুলি গুছিয়ে আমার বইএর বাক্সটায় তুলে রেখে এসো।"

আমি বিস্মিত হোয়ে বললাম, "সেগুলি দিয়ে আপনি আবার কী কোরবেন ঠাকুরদা ? আপনার বাক্সে থাকলে তো ইঁদুরে কাটবে তার চেয়ে আমাদের লাইব্রেরীতে আছে সেই তো ভালো।"

ঠাকুরদা বললেন, "না, ওগুলি সবই তো তোমার পড়া হোয়ে গেছে। ও সব বই তোমার তো কোনো কাজেই আর আসবে না, মিছামিছি ওগুলি তবে রাখতে চাও কেনো। অধিকারের লোভ তোমার বড্ডো বেশী পণ্টু।"

ব্যঙ্গ কোরে বললাম, "অধিকারের লোভ শুধু আপনারই নেই। বইগুলি আপনারই বা কোন কাজে লাগবে ?"

"বিক্রি কোরলে দু' সন্ধ্যা খোরাক মিলবে। আর কোনো কাজেই লাগবে না।"

সব গুছিয়ে নিয়ে রাত্রে ঠাকুরদা বাবাকে বললেন, "আমি মনস্থ কোরেছি মহীন্দর, আমি আবার দামোদরদী ফিরে যাবো।"

বাবা বললেন, "আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত ঠাকুরমামা। জানেনই তো রাগ হোলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—"

"না, না, তুমি মোটেই অন্যায় করোনি। সেজন্য আমার মনে একটুও ক্ষোভ নেই। গ্রামে গিয়ে অবশ্য আমি আর সেখানে বাস করবো না, রামঠাকুরের সাথে কিছু দরকারি কাজ আছে তা' সেরে সুবর্ণকে কামারদিয়ায় তার শ্বশুর বাড়ী রেখে' তোমার মামীকে নিয়ে আমি কাশী চলে যাবো। জীবনে কোন কাজই তো আর বাকি রাখলাম না, আর তার প্রায় সবই তুমি জানো। শেষ কটা দিন একটা তীর্থে টিকেই কাটুক এই আমার ইচ্ছা। আমার অনেক উপকার তুমি কোরেছ, আমার এই শেষ ইচ্ছায় তুমি আর বাধা দিয়োনা বাবা।"

বাবার চোখে জল এসে পড়লো, বললেন, "আমার সেবাদের রূঢ়তা আপনি ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনি যদি এই সঙ্কল্পই কোরে থাকেন, আমি আর কোনো বাধা দেবো না। বেশ, কাশী গিয়েই থাকুন আপনারা। আমি বরং মাসে মাসে আমার যথাসাধ্য সেখানেই কিছু কিছু পাঠাবো।"

যাওয়ার সময় ঠাকুরদা মাকে বললেন, "আমি খুব সুখেই ছিলাম মেজ বৌমা। কিন্তু সবই আমার অদৃষ্ট। চিরজীবন ওর এই এক ভাবে কাটলো।"

ঠাকুরদা যা বলেছিলেন ঠিক তাই করলেন দেখলাম। আমাদের বাড়ীতে ভুলেও তিনি তাঁর কোনো জিনিস ফেলে গেলেন না। একেবারে নিশ্চিহ্ন হোয়ে মুছে গেলেন। আমরা মুখে কেউ কিছু বললাম না। কিন্তু মনে মনে এ কথাটা প্রত্যেকেই ভাবলাম, "লোকটির চক্ষু লজ্জা বলে কোনো বালাই নেই। আর তিনি যদি কাশীই যাচ্ছেন এসব দিয়ে তিনি কোরবেন কি ?"

আমার একবার মনে হোলো "এসব বুড়োর অতীতের ঐশ্বর্য্য। আমাদের চোখে যা অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য তাই হয়তো ওর কাছে মহৈশ্বর্য্যময় হোয়ে রয়েছে। সুখ দুঃখের কতো স্মৃতি কতো ইতিহাস যে এই সব তুচ্ছতম মূল্যহীন বস্তুর সঙ্গে জড়িত হোয়ে আছে তার আমরা কী খবর রাখি। জীবনে স্মৃতিই তো তাঁর একমাত্র অবলম্বন। স্মৃতির মোহ তিনি কী কোরে এড়াবেন?"

কিন্তু কিছুদিন পরে খবর পেলাম ঠাকুরদা তাঁর সব জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে রামঠাকুরের কাছে বিক্রি কোরে গেছেন। টাকা ছাড়া কিছুই তিনি সঙ্গে নিয়ে যান্‌নি। যাক্, টাকার মূল্য এতোদিন পরে তিনি বুঝেছেন তা হোলে।

কয়েক মাস পরে ঠাকুরদার একখানা চিঠি এলো। বসন্ত রোগে ঠাকুরমার কাশী প্রাপ্তি হোয়েছে। আর কয়েকদিন পরে ঠাকুরদা নিজেই এসে উপস্থিত হোলেন। কিন্তু সেই পূর্ব্বের ঠাকুরদার সঙ্গে এর কী পার্থক্য। এই কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অনেক বুড়ো হোয়ে গেছেন। দেখলে হঠাৎ যেনো চিনে ওঠা যায় না। মৃত্যু-শোক এই যেনো তিনি প্রথম পেলেন। তাঁর রসের উৎস আজ আর নেই। ভাণ্ডার আজ নিঃশেষিত। ঠাকুরমা যে তাঁর জীবনের এতো-খানি অধিকার কোরেছিলেন তিনি বেঁচে থাকতে তা তো আমরা কোনোদিন বিন্দুমাত্রও অনুমান কোরতে পারিনি।

তাঁরা নিজেরাই কি পেরেছিলেন?

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মুহূর্ত্তের ক্ষতি

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

তালের বনে জম্‌লো ছায়া দিন না যেতে যেতে;
আঁধার মহোৎসবে তারা ওই উঠেচে মেতে।
দিনের আলোর সহজটুকু ক্ষণিক গেল হেসে,
দিন না যেতে আঁধার রথে এলো সর্ব্বনেশে।
বিশম ক্ষতি নিয়ে সেযে এসেছে তাল বনে,
বেসুর বীণা উঠ্‌লো বেজে পাতার মনে মনে।
বাতাস এসে বলে গেল—"সর্ব্বনেশে ক্ষতি
রচে গেলো দীর্ঘ ছায়ার মুহূর্ত্ত প্রণতি।'
তালের বনে ক্ষতির ধনে খুশির কোলাহলে
বাতাস এসে নিমেষ তরে শুধুই গেল বলে।
হারান ধন পূর্ণ হলো মুহূর্ত্ত গৌরবে
আকাশ হেসে চেয়ে বলে, "অপূর্ণ কে রবে?"

পদ্মা—প্রমত্তা নদী *

অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র এম্-এ

শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুর সদ্য-প্রকাশিত পদ্মা—প্রমত্তা নদী বইখানা বিচিত্রায় বেরিয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে। পড়তে আরম্ভ করে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি, কারণ এ জাতীয় বই-এর খুব সামান্য একটু অংশ পড়ে তৃপ্তি হয় না বা অল্প আর একটু অংশের জন্য ধৈর্য্য ধরে একমাস অপেক্ষা করাও সহজ নয়। অথচ এ বই ঠিক এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলাও যায় না, কেন না এর পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে থামতে হয়, ভাবতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়, গুণ গ্রহণ করতে হয়, মুগ্ধ হতে হয়, স্তম্ভিত হতে হয়। যে কলমে "মানবের শত্রু নারী" জাতীয় হাল্কা কৌতুক রস পরিবেশন করেছে সে কলমেই "পদ্মা—প্রমত্তা নদী"র মত গভীর মনস্তত্ত্ব ও গুরুচিন্তাপূর্ণ উপন্যাসের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে দেখলে লেখকের লিপিকৌশলের বৈচিত্র্য স্বীকার করতেই হয়। এ বইখানাতে যে কৌতুক রস বা হাল্কা ভাবের স্বতঃউচ্ছলিত গতি নেই তা নয় কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, একটা বৃহত্তর সার্থকতার মধ্যে তারা পূর্ণতা লাভ করেছে। উপন্যাসখানার বিষয়বস্তু, নায়ক নায়িকা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভাব ভাষা গতি সমস্তই পাঠকের মনকে নাড়া দেয় গভীরে গভীরে তার অত্যন্ত সূক্ষ্ম রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সাহিত্য জগতে এ বইখানা লেখকের এক মস্ত বড় দান।

বইখানা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে উপন্যাসের নায়ক রাজা শিশু ও বালক, দ্বিতীয় ভাগে কলেজের ছাত্র রজতপ্রসন্ন। নদীমাতৃক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, বাংলার গ্রামে একটি কোমল প্রাণে কি অভিনব ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, একটি কচি অন্তরকে কি অপার্থিব সম্পদে, কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে তা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। বাংলার মাটি, বাংলার হরিৎ ক্ষেত্র সাধারণতঃ যুগিয়ে এসেছে কবির কবিতার উপাদান অথবা লেখকের বর্ণনার ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপকরণ, কিন্তু তাহাদের মহিমা, তাদের সম্পদ, তাদের ঔদার্য্য সচরাচর ঠিক এমিভাবে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে জীবনের প্রতি স্তরে তাদের এ প্রভাবের বর্ণনায় লেখকের চিন্তাশক্তির তেজ ও নবীনতার পরিচয় পাই। 'রাজা' তাঁর এক অভিনব সৃষ্টি তা আগেই বলেছি। পদ্মার পারে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে, পিতার অপরিমিত স্নেহ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে মানুষ; তার ভিতরের মনুষ্যত্ব ফুটে উঠেছে পদ্মার সঙ্গীতে, পদ্মার ভাঙ্গা গড়ার অপূর্ব্ব লীলায়, তাই অতি অল্পক্ষণের জন্যও সে যার জীবনের পথে এসেছে সেই তাকে ভাল না বেসে পারে নি। কিন্তু বইখানা পড়তে গেলে শুধু যে প্রধান চরিত্র রাজার মধ্যেই আমাদের সমস্ত কৌতুহল সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তা নয়; গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র—মাণিক জেলে, নন্দ মিস্ত্রি, যমুনা বষ্টোমী, নকুল চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি সকলেই আমাদের মনকে দোলা দেয়। না ভেবে পারি না যে এই সমস্ত অতি সাধারণ চরিত্র, প্রতিদিনকার বাস্তব জীবনের, এত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও ক্ষণিক জীবনের ছবিগুলো এমন সুনিপুণভাবে এঁকে একটি দুটি কথায় ফুটিয়ে তুলে পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করে দেওয়ার মধ্যে লেখকের কী আশ্চর্য্য দরদ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়! যাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের অর্জ্জিত ফল আমরা ভোগ করে আসছি—আজ নয়, যুগযুগান্ত ধরে, অথচ যাদের মানুষের আসনে বসবার যোগ্য বলেও বিবেচনা করি না, তাদের ভিতরকার মানুষকে লেখক শুধু পাঠকের

* পদ্মা—প্রমত্তা নদী: শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু প্রণীত। চিত্রাঙ্গদা পাবলিসিং হাউস, কলিকাতা,—মূল্য ৩৲।

চোখের সামনে তুলে ধরেন নি, তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন বিধাতার সৃষ্টির পরিকল্পনায় এরাও বেশ উচ্চ আসনই দাবী করতে পারে। তাদের সারল্যের সাহচর্য্যে, তাদের উদার ও মহৎ অন্তরের সংস্পর্শে রাজার ভিতরকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ফুটে বেরুতে লাগল। এর কোন চরিত্র কোন ঘটনা, কোন একটি নগণ্য বস্তু থেকেও আমরা চোখ ফিরিয়ে চলে যেতে পারি না। বিশেষতঃ দুই একটা কলমের আঁচড়ে যমুনা বোষ্টমীর মধ্যে নারীর যে চিরন্তন রূপ উঁকি মেরেছে,—তার মধ্যে লেখকের অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কোন অসাধারণ ঘটনার সমাবেশ, বা কোন কল্পলোকের অবাস্তব রাজ্যে বিচরণ করেছেন বলে মনে হয় না। মনে হয় সবই অতি সাধারণ, প্রাতিদিনকার বাস্তব জীবনের ছবি, সবই আমাদের পরিচিত, এ যেন অবশ্যম্ভাবী, এমনটি যেন হতেই হবে, এ ছাড়া আর কিছু যেন সম্ভব নয়। এখানেই লেখকের বৈশিষ্ট্য। গ্রামের সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা দেখতে পাবেন বইখানার মধ্যে—কোথাও অতিরঞ্জন নেই, সম্ভাব্যতা বা সামঞ্জস্যের অভাব নেই। লেখকের কল্পনাশক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ও মৌলিকতা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হবেন। অবশ্য লেখকের সৃষ্ট চরিত্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত আধুনিকতার রঙে রঞ্জিত সৃষ্টি যে—পাঠকের প্রকৃতির কোলে লালিত রাজার চরিত্র-বিকাশের মধ্যে তাঁর চোখে কোন সৌন্দর্য্যই না পড়তে পারে এমন আশঙ্কা লেখকের নিজেরই আছে বলে মনে হয়।

এই যে গ্রাম্য জীবনের টুকরো টুকরো নিখুঁত চিত্র—আর প্রতিটি রঙ, প্রতিটি রেখা অপূর্ব্ব ছন্দ-সুষমায় পাঠকের মনকে অনুক্ষণ দোলাতে থাকে, লেখকের কল্পনা কিন্তু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। তাঁর সুদূর-প্রসারী কল্পনা, জাতিধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি অন্ত্যজদের সরল জীবনযাত্রা থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় জীবনের ভাঙ্গা গড়া, সুরার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির চেষ্টা, হীরা বাইজির কদর্য্য জীবনের ধরা ছোঁয়াকে অতিক্রম করে,—এমন কি মানুষের সঙ্গে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, মানবশক্তির যুগ যুগান্তের জ্ঞান-সাধনার প্রচেষ্টাকেও পিছনে ফেলে এক অজানা রহস্যের অন্তরালে মানব জীবনের চিরদিনের অমীমাংসিত এক বিরাট প্রশ্নের মধ্যে আত্মনিবেদন করেছে। পদ্মার সে অপরূপ উদ্দাম লীলার প্রভাব আমরা বালক রাজার মধ্যে দেখেছি—যুবক রজতপ্রসন্নের চিন্তা অনুভূতি ও কর্ম্ম তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,—যদিচ লেখকের লিপিচাতুর্য্যে শিশু রাজা যুবক রজতপ্রসন্নের মধ্যে একেবারেই গোপন, অতীব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না লক্ষ্য করলে চেনাই যায় না। পদ্মার সেই ভাঙ্গা গড়ার নেশা, একদিকে ধ্বংসলীলা অন্যদিকে বৈভববিতরণের আনন্দের উদ্দামতা যুবক রজত-প্রসন্নকেও তার অন্তরের গহনে গহনে চালিত করেছে। তার ভিতরকার এই অনুপ্রাণনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সুমিত্রার সঙ্গে তার সংস্পর্শের মধ্যে। রজত যখন পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ছাত্র তখন দেশে তুমুল রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। পিতার প্রাণভরা স্নেহ ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে, প্রকৃতিমাতার অফুরন্ত রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ও সঙ্গীতের মধ্যে লালিত হয়েও রজত নিজেকে সেই আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে পারল না। পদ্মার যে প্রচণ্ড শক্তি শিশু রাজার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল সে শক্তি উচ্ছ্বসিত বেগে ভাসিয়ে দিল যুবক রজতপ্রসন্নকে! সে নিজের প্রাণের আবেগ সুমিত্রার কাছে প্রকাশ করল অকপটে, অতি সহজ সরলভাবে, তার মধ্যে না ছিল কোন দ্বিধা, না ছিল কোন কুণ্ঠা, না ছিল কোন বৃথা আড়ম্বর। তার অন্তর উদ্দাম হয়ে উঠল, নিজেকে সংবরণ করা আর সম্ভব হলো না। সে প্রচণ্ড আন্দোলনের মাঝখানেও আত্মশক্তিতে রজতপ্রসন্ন এতদিন সংহত ছিল, সুমিত্রা-তরঙ্গের আঘাতে তার সেই সংহত শক্তি ফুলে ফুলে গর্জ্জন করে উঠল ভাঙ—ভাঙ—ভাঙ। বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিলাস বর্জ্জন করে কারাবরণ করতে তার একটুও দ্বিধা হলো না। তার এই শক্তির মহিমায় সুমিত্রা যখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করল তখন কারাগৃহের ক্লেশদায়ক দিনগুলোও তার কাছে মধুর হয়ে উঠল, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, সুমধুর স্বপ্নে। সে তখন জয়ের গর্ব্বে গর্ব্বিত, জয়ের আনন্দে বিভোর তারপর কারাগৃহের লৌহপ্রাচীরকে তার অন্তরের মহিমায়

পরাভূত করে আবার উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে যখন সে জানতে পারল তার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, রঙীন স্বপ্ন, সমস্ত কিছু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট মহাশক্তির কঠোর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে তখন আবার তার জীবনতন্ত্রীতে বেজে উঠল পদ্মারই সেই প্রমত্ত সুর ভাঙ—ভাঙ—ভাঙ। পদ্মার যেমন একদিকে ধ্বংসলীলার উন্মাদনা, অন্যদিকে ঐশ্বর্য্য বিতরণের উল্লাস,—ভ্রূক্ষেপ না করে বয়ে যায় অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, তেমনি রজতপ্রসন্নও একদিকে আপনার ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর জীবনটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দিয়ে, অপরদিকে পিতৃদত্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্য অকাতরে নানা জনহিতকর কাজে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল মানুষের চিরকালের মীমাংসা-বিহীন অনন্ত জিজ্ঞাসার সমাধানে। হতাশ, বেদনা, ভাষাহীন ব্যর্থতা তাকে পরাজিত করতে পারল না—সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার প্রাণ আকুল হয়ে ছুটল যা সত্য, যা শাশ্বত, যা সুন্দর, যা সার্থক তারই সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়।

এইখানেই যবনিকা। বইখানির "পদ্মা প্রমত্তা নদী" নামটি সার্থক। সাহিত্যসাধনায় লেখক জয়মাল্য অর্জ্জন করেছেন, ভবিষ্যতে আরও করবেন, আশা করি।

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র

গাভীর মনস্তত্ত্ব

শ্রীকালীচরণ মিত্র

বাঁশী বেউড় বাঁশের, সুর দেন কালাচাঁদ। মনভুলান এমন কিছু নয় আপাতদৃষ্টিতে। দলে দলে গোপিনীরা অথচ 'বাউরা'! কালো ঠোঁটের ফাঁক দিয়া পাকা বাঁশের বাঁশীর রবে কি যে যাদু—কত না মধু! তাই না লাজমান ভুলিয়া পথে পথে পাগলিনী যত কুল-কামিনী! বিচিত্র কি! তাহারা যে গোপের বালা, গোপবধূ, পয়স্বিনী গাভীর সেবিকা, গো-সংসর্গে বুঝি বা আধা গো-ভাবাপন্না—. বাঁশীর আওয়াজে, সুরের ঝঙ্কারে মাতোয়ারা যদি না হয়, হইবে কে?

হাসিও না হে রসিক পাঠক ও সুরসিকা পাঠিকা গুরু-গম্ভীর গবেষণায়। সত্যই মাঙ্গল দেখা দিয়াছে এত-কালে—নিগূঢ় রহস্য জাহাজের, গোধনেরা সঙ্গীত বাদ্যের তারিফ করিতে নাকি জানে, শুধু তারিফ করিয়াই ক্ষান্ত নয়—সঙ্গীতে মুগ্ধ ও আত্মভোলা। সন্নিকটে গানবাজনার ব্যবস্থা থাকিলে যত খুশী দোহন কর, আপত্তি নাই তাহাদের—পা ছুড়ে না, হাম্বা ডাক ছাড়ে না। অতি-শয়োক্তি বাদ দিয়া অনায়াসে বলা চলে—যে গরু পাঁচ সের দুধ দেয় দোহনকালে গানবাজনায় মসগুল রাখিতে পারিলে আট সের তাহার কাছে সহজলভ্য!

এই তথ্যের কলম্বাস্ জনৈক গোপিকা। বৃন্দাবনের নহে, জাপানী টোকিও সহরের। নাম শ্রীমতী শিনা। গোয়ালে ৩০টি গাভী। রাখাল ও দোয়াল কাজেই অনেকগুলি। তাহাদেরই আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীমতী কর্ত্তৃক গোশালার নিকটে রেডিও সেট স্থাপিত। সঙ্গে সঙ্গে সকল দুগ্ধবতী গাভীরই দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল, শ্রীমতীর টনক নড়িল। অনুসন্ধানে বুঝিতে বাকি রহিল না—গান বাজনায় গোধনের প্রবল আসক্তি সুস্পষ্ট দেখা গেল—গাভীগুলি উৎকর্ণ হইয়া রেডিও সঙ্গীত শুনে, শুনিতে শুনিতে মোহিত আত্মহারা হইয়া যায়, ফলে সিকি পরিমাণ দুধ বেশী দেয়। সেই হইতে প্রত্যহ দুগ্ধ দোহন কালে রেডিও চালান হয়। সুতরাং ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ষোল আনা, শ্রীমতীর এখন 'পোয়া বারো!'

মেয়েলি স্বভাব—কাণাঘুষা। সমাচার ক্রমশঃ পুলিশের বড় কর্ত্তা মিঃ জুজাবুরো নাকাজোয়ার শ্রুতিগোচর হইল। নানা পরীক্ষার পর তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জনশ্রুতির মূলে নিছক সত্য নিহিত, অতিরঞ্জনের লেশ নাই। তাঁহারই পরামর্শে বা আদেশ মত সহরের এক শত পঁচাশীটি গো-শালায় রেডিও সেট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুফল লাভে গোয়ালাদের মুখে হাসি আর ধরে না। রেডিও যন্ত্র ব্যবসায়ী এবং রেডিও মিস্ত্রী মজুরদেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল অবশ্যই।

এখন প্রশ্ন এই—শ্যামসুন্দর যে মাঠে গোঠে ধেনু চরাইতেন আর বেণু বাজাইতেন মুহুর্মুহু, তাঁহারও কি এই তথ্য বিদিত ছিল না? কোন্ কাক ভুষণ্ডী তাহার সাক্ষ্য দিবে!

বিষধরেরা সঙ্গীতে মুগ্ধ—প্রচলিত বচন এই, গান শুনিতে শুনিতে হিংসাও নাকি ভুলিয়া যায়। দোসর জুটিল এখন সর্প কুলের, পহেলা নম্বর,—গরুর পাল, দ্বিতীয় দফায়, সভাসমিতিতে বাংলার গীতপটিয়সী কুমারীরা—বিদুষী ও অবিদুষী।

বুদ্ধিহীনকে 'গরু' বলিয়া আমরা ব্যঙ্গ করিয়া আসিতেছি—যে গরু দুধ দিয়া প্রাণ বাঁচায়, পাদুকা যোগায়, লাঙ্গুলের কেশে কাটাছেঁড়া চর্ম্ম সীবনের সূতা এবং ক্ষুরে ছাপাখানার শিরিশের উপকরণ উপঢৌকন দেয়। গরুর অপবাদ অবশেষে ঘুচিল, যেহেতু সঙ্গীতের তাহারা বোদ্ধা সাব্যস্ত হইয়াছে। 'সঙ্গীত' শব্দে এখানে গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনেরই সমাহার বুঝিতে হইবে—সেকালের 'সঙ্গীত-দর্পণে'র নজিরে। অদূরে অভিব্যক্তিবাদ মৃদু হাসিতেছে আকাশ-মার্গে! কিন্তু কেন? গাভীর সঙ্গীত-প্রীতি তবে কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোঠায় পড়ে, না ক্রমবিকাশের পথে?

যে পর্য্যায়ে পড়ুক্ বঙ্গের তথা ভারতের গোপ গোয়ালারা কি নির্ব্বেদই রহিবে, জাপানী রমণীর আবিষ্কারের সুযোগ লইবে না? সর্ব্বত্র দুধের দুর্ভিক্ষ এই হিন্দুস্থানে—বিশেষ করিয়া বড় বড় নগরগুলিতে। সিকি পরিমাণ দুধের যোগান যদি বাড়িয়া যায়, হানি কি গোয়ালঘরে রেডিও সেট স্থাপনে? মশক বংশের গুঞ্জরণ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ, পোকা মাকড়ের রণ্‌রণ্‌ সেখানে আবহমান কাল, রেডিও প্রবর্ত্তনে সোণায় সোহাগা। গাভীর ভাগ্যোদয়ও কম নয়। ফুকা দেওয়ার রেওয়াজ ত রহিত হইবেই, তবে গানে গানে ও বাদ্যি বাজানায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ না হয় গাভীরা, এই আশঙ্কা। আর বেচারা বলদ!—গাড়ী টানিয়া ও হাল বাহিয়া গলদ্ঘর্ম্ম, আহা!

শ্রীকালীচরণ মিত্র



The Story of the Nobel Prize winners in Literature—মিঃ এ, কে সেন প্রণীত। এলাহাবাদ ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত। ২১৪ পৃষ্ঠা মূল্য ২৲ টাকা।

এই পুস্তকখানিতে শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে যে গ্রন্থকার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। নোবেল পুরস্কারের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সাধারণের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ সেন পুরস্কারের স্রষ্টা ডাঃ অ্যালফ্রেড বার্নহার্ড নোবেলের জীবনী, সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলমে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে ডাঃ নোবেলের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের বিবরণ, নরওয়ের রাজধানী ক্রিশ্চিয়ানায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর শান্তির জন্ত নোবেল পুরস্কার বিতরণের বিবরণ, ষ্টকহলমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সাহিত্যে পুরস্কার বিতরণের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কিরূপে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত পাঠাইতে হয়, নোবেল পুরস্কার-প্রদান প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী, আইন কানুন কি, সাহিত্যের জন্ত বিশেষ বিধি কি আছে প্রভৃতি সংবাদও বইখানির মধ্যে পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত আরও একটি আকর্ষণের বিষয় এই যে যাঁহারা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের একখানি করিয়া ছবি বইতে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পণ্ডিত অমরনাথ ঝা একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন।

এই ধরণের বই যে সাধারণের খুব কাজে লাগিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেননা রবীন্দ্রনাথ এবং সার সি, ভি রমণ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এসিয়াবাসীরা সাধারণভাবে এবং ভারতীয়েরা বিশেষভাবে নোবেল পুরস্কারের খোঁজ খবর রাখিতেছেন। প্রতিযোগিতামূলক অনেক পরীক্ষায় এখন এই বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নাদিও জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে।

বইখানির অবয়ব এবং প্রচ্ছদপট সুরুচিপূর্ণ। কলিকাতার পুস্তকালয়ে এবং হুইলার কোম্পানীর বুকষ্টলে বইখানি পাওয়া যায়।

সমী ও দীপ্তি—শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত। মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট ১.৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত। ১১৮ পৃষ্ঠা মূল্য ১৲ টাকা।

বইখানিতে সমী ও দীপ্তি নামক দুইজন কাল্পনিক পুরুষ এবং স্ত্রী বন্ধুর কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথাবার্ত্তাগুলি সবই সাহিত্যের বিষয় লইয়া এবং সাহিত্যের এমন বিষয় যাহা লইয়া অনেকে ভাবিয়াছেন এবং ভাবিতেছেন—যথা সাহিত্যে পরিপূর্ণতার আদর্শ, সাহিত্যে রিয়ালিজম, সাহিত্যিকের ধর্ম, আর্ট এবং আমিত্বের প্রভাব, অল্ডাস্ হাক্সলি প্রভৃতি। প্রসঙ্গত লেখিকা charm এবং coquetryর ভিতরকার পার্থক্য, personality বলিতে কি বোঝায়, traditional moralityর স্থান artistic temperament দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে কিনা ইত্যাদি আপ-টু-ডেট্ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। লেখিকার পড়াশোনার পরিধি সুবিস্তৃত; তিনি মোঁ পা সাঁ, রোঁলা, লুডোভিকি, গলস্ওয়ার্দি, হাক্সলি প্রভৃতি গ্রন্থকারদের প্রবচন নিজের মতের স্বপক্ষে অনেক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি বিভিন্ন মতবাদ

হজম করিতে পারিয়াছেন এবং সেই আহরিত জ্ঞান-ভিত্তির উপর নিজের স্বাধীন চিন্তার সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

লেখিকা সত্যপথে চিন্তা করার ফলে মানস রাজ্যে কতকগুলি সাধারণ সত্যে (general truth) উপনীত হইতে পারিয়াছেন—বলা বাহুল্য ইহাই প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাম্য। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। সাহিত্যিকের কাছে প্রকৃতি দেবীর দাবী সম্বন্ধে লেখিকা বলিতেছেন, "জীবনে যাহা এলোমেলো তোমাকে যে সাজি ভরিয়া তাহাকেই গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। তাই যদি না হইবে তবে সাহিত্যের প্রয়োজন কি?......সাহিত্যিকের কাজই এই বাছাই করা, নির্ব্বাচন করা, গুছাইয়া লওয়া এবং প্রতিভার পরিচয়ই এইখানে। শিল্পী বোঝেন যে জীবনের নকল করিলে তাঁর চলিবে না। তাঁহাকে জীবনের লক্ষ লক্ষ প্রবাহ হইতে বাছিয়া লইতে হইবে, তাঁহাকে অনেক কিছু বাড়াইতে কমাইতে হইবে, তাহা না হইলে তিনি নিজে যে নিজের জন্ম মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাকে জগতের সম্মুখে বাহির করিতে পারিবেন না। করিতে গেলে লোকে ঢের কম দেখিবে এবং ভুল দেখিবে।" (৫৪ পৃঃ) "জীবন দিয়াই জীবনকে স্পর্শ করা যায়। ভাষা আর ভঙ্গীর কারিকুরি (?) দিয়া নয়।" (১১৪ পৃঃ)

লেখিকার ভাষা প্রধানতঃ প্রাঞ্জল এবং বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর রচনার মধ্যে একটি সহানুভূতিময় অথচ পরিশীলনশীল মনের সান্নিধ্য অনুভব করা যায়। তাঁহার লেখার বহুল প্রচার কামনা করি।

আর একটা কথা বলিবার আছে। বিধবা বিবাহ, হরিজন সমস্যা বা প্লেটের বাসনে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যেমন আইনগত কোন বাধা নাই কিন্তু তবু ও-গুলি সমাজ জীবনে এখনো আত্মস্থ হইয়া যায় নাই; তেমনি লেখিকা যে সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন সে গুলির অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের সমাজ মনের পরিচয় গৌণ। যেমন অল্ডাস্ হাক্সলি সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের সমাজ মনের যত নিকটে, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়ই তার চেয়ে নিকটতর। ইহা দেশ, ভাষা বা জাতিগত বিরুদ্ধতার কথা নয়। অপর পক্ষে স্বদেশগত অভিমুখীনতার কথা। লেখিকা এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে সুখী হইব।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

"অতীশ দি গ্রেট" (উপন্যাস)—শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানি ভারি নূতন ধরণের ও মধুর ভঙ্গীতে লেখা। আজকালকার উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের আতিশয্য ঘটায় মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। মাঝে মাঝে মনে হয় অতিরিক্ত অলঙ্কারের অযথা সন্নিবেশে ভারাক্রান্ত তরুণীর লাবণ্য যেমন কৃত্রিমতায় অসুন্দর ঠেকে তেমনই যেন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অশোভন উচ্ছ্বাসে এই ধরণের উপন্যাসেও এসে পড়ে একটা আড়ষ্টতা, কৃত্রিমতা। একটি সদ্যঃ শিশিরসিক্ত ফুলের যে স্বাভাবিকতা, যে নবীনতা, তার লেশমাত্র গন্ধও যেন পাওয়া যায় না। কিন্তু অবনীনাথের এই উপন্যাসখানি পড়ে সে ক্ষোভ নিমেষে তিরোহিত হয়ে যায়। সমগ্র বইখানিতে একটি স্নিগ্ধ এবং আন্তরিক লিখনভঙ্গী পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। জীবন ধারা যেমন বয়ে যায় ঠিক তেমনই আত্মবিস্মৃত অবাধ গতিতে বইখানির কাহিনী বয়ে চলেছে। বিশেষ ঘোরালো কোন প্লট নেই। অতীশ নামের একটি ছেলের শৈশব অবস্থা থেকে পরিণত যৌবনের কাল অবধি যেমন ভাবে দিন কেটেছে, জীবন পথের নানা বৈচিত্র্য নানা ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে সে যেমন করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথে জীবনকে উপলব্ধি করেছে তারই কাহিনী গল্পের ভিতর দিয়ে সহজ স্বচ্ছ ভাষায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। গল্প বলবার এই একান্ত অনাড়ম্বর অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গীটি অবনীনাথের একেবারে নিজস্ব। আমরা তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই বিশিষ্ট ও সুন্দর ভঙ্গীতে লেখা আরও বৃহত্তর উপন্যাসের প্রতীক্ষায় রইলেম।

শ্রীআশালতা সিংহ

বিদ্রোহিণী—উপন্যাস; শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত এম, এ, পি, আর, এস, প্রণীত ও 'রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ' হইতে

শ্রীরাধেশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত। ২২৬ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ— মূল্য দুই টাকা।

বাজারের হাজার হাজার উপন্যাসের মধ্য হইতে যে অল্প সংখ্যক বই পড়িয়া মনে সত্যকার তৃপ্তি পাওয়া যায়, "বিদ্রোহিণী" তাহাদেরই অন্যতম। বইখানি পড়িতে পড়িতে কিম্বা পড়া শেষ করিয়া এ আফসোস করিতে হয় না যে বৃথা সময় নষ্ট করা হইল; বরঞ্চ ইহাই মনে হয়, কিছু লাভ হইল।

এই উপন্যাসের নায়িকা শ্রীমতী মীরা একটি শিক্ষিতা, স্কুলে-পড়া এবং কলেজে পাশ করা মেয়ে; অথচ সাধারণ কলেজে-পড়া মেয়ে হইতে তাহার অন্তরে, স্বভাবে, কথায়, কার্য্যে, চিন্তায় অনেক কিছু প্রভেদ বিদ্যমান। মীরা তাহার শিক্ষিত ও স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ অন্তরকে তাহার পারিপার্শ্বিক প্রচলিত বেষ্টনীর মধ্যে মিলাইয়া এবং বিলাইয়া দিতে না পারিয়া বিদ্রোহিণী হইয়া ওঠে এবং তাহার ফলে নিজের জীবনকে একটা শোচনীয় অবস্থায় আনিয়া ফেলে।

যে সমস্যাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া উপন্যাসখানি লিখিত, তাহা বিশ্বের নর-নারীর জীবনে একটি চিরন্তন সমস্যা। জগতে দুইটি হৃদয় সব দিক দিয়া সত্যকার এক সুরে বাঁধা হইতে পারে না; হয়ও না। একের স্বভাবের সঙ্গে অপরের স্বভাবে কোথাও না কোথাও—কিছু না কিছু গরমিল থাকেই। পরস্পরে একটু সহ্য এবং চেষ্টা করিয়া সেই গরমিল মানাইয়া-মিলাইয়া না লইলে উপায় নাই। কিন্তু মীরা তাহার স্বাধীন চিত্ত ও চিন্তার বশবর্তী হইয়া এই একটুখানি অমিলকে মিলাইয়া লইতে পারিল না। দুইটি মিলনোন্মুখ অন্তরের একটুখানি অসামঞ্জস্য যদি সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার দ্বারা এই অসাধারণ মেয়েটি সহ্য করিয়া ও মানাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে সে আর সকলেরই মত জীবনে সুখ ও শান্তির অধিকারী হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারায়েই সংসারে ও সমাজে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নানারূপে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে হইল।—এই করুণ চিত্রটি অতি নিপুণতার সহিতই গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন।

অঙ্কিত চিত্রটি আগাগোড়াই সুচিত্রিত, কোথায়ও রং-য়ের কম-বেশী নাই বা রং দিবার ভুল নাই। নায়িকা মীরা হইতে আরম্ভ করিয়া, পল্লীগ্রামের মার্কামারা মুক্তীপিসি পর্য্যন্ত সমস্ত চরিত্রগুলিই সুপরিস্ফুট। অশিক্ষিতা, বিধবা-বালিকা কাঞ্চন—অবহেলা অনাদরে বিক্ষিপ্ত একটি হীরক কণা! লেখক মনোজকে আমাদের সামনে আনিয়া একটি মোলায়েম অথচ অভিনব চরিত্রের যুবককে দেখাইয়াছেন। মোটের উপর সমস্ত চরিত্রগুলিই স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেহই পাঠকের কাছে অপরিচিত থাকিয়া যায় না। লেখকের রচনা সুষ্ঠু, সরল ও প্রাণপূর্ণ। কঠিন দার্শনিক এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা ও কথোপকথন এরূপ সহজ সরল করিয়া লেখা, লেখকের পক্ষে যে খুবই বাহাদুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। এইসব ক্ষেত্রে লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব স্থানেই লেখনীর মুখে তাঁহার ভাবধারা ভাগিরথীর অবাধ, স্বচ্ছ, একটানা সৌন্দর্য ধারার মত প্রবাহিত। সৃষ্টি, জীব এবং জীবের অন্তরের পরিচয়ে লেখক বিশেষরূপেই পরিচিত। তাঁহার অনন্যসাধারণ দৃষ্টিশক্তি আছে এবং তিনি সেই দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন, খুব সহজ করিয়া আমাদের তাহা দেখাইয়াছেন। মোট কথা, খুব সুলভ জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা 'বিদ্রোহিণী' রচিত নয়। সস্তায় কিস্তিমাৎ-য়ের ব্যাপার ইহাতে নাই। লেখক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। মানব জীবনের একটা চিরন্তন সমস্যাকে সূত্র করিয়া, গভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি তাঁহার বিদ্রোহিণীকে আমাদের সামনে হাজির করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও তিনি অনেক চিন্তার কাজ দিয়া ছাড়িয়াছেন।

পরিশেষে বইখানির বাহ্যিক রূপের বিষয় কিছু না বলিলে এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনাটুকু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ইহার ভিতরের সৌন্দর্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই প্রকাশক ইহার বাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আশা করি, "বিদ্রোহিণী" প্রত্যেক সাহিত্য-রসিকের কাছেই সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—এম, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স। ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি যে আট জনের জীবনীর অবতারণা করিয়াছেন ইঁহারা সকলেই বিশ্ববিশ্রুত। পুরুষকারের দ্বারা নগণ্য জীবনও বিশ্ববরণীয় হইতে পারে "সাহসীর জয়যাত্রা"র মধ্যে সেই সুর বাজিতেছে। ছেলেদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থ লেখা সহজ নহে। ঠিক এই কারণে শিশুসাহিত্যমূলক অনেক গ্রন্থই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার সুকৌশলে সহজ এবং চল্‌তি ভাষায় এরূপ সুন্দর জীবনী লিখিয়াছেন যে শিশুদের পক্ষে বুঝিবার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না। 'সাহসীর জয়যাত্রা' লিখিয়া যোগেশবাবু শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন। শিশু সাহিত্যেও তিনি যশস্বী হইবেন। 'সাহসীর জয়যাত্রা' পড়িয়া সেই ধারণা হয়। আদর্শমূলক ঈদৃশ গ্রন্থের চাহিদা চিরদিনই আছে এবং এরূপ ধরণের গ্রন্থ পূর্ব্বে বাহির হয় নাই বলিয়া ইহার সমাদর হইবে। গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি এবং পাঠক পাঠিকাগণকে পড়িতে অনুরোধ করি। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ও প্রচ্ছদপট ভালই হইয়াছে।

শ্রীউপানন্দ উপাধ্যায়

শেষ খেয়ায়

শ্রীনিশীথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ক্ষণিকের ওগো, দীপ্ত গোধূলি রাণী
দাঁড়াও ক্ষণিক বিদায়ের খেয়া ঘাটে
আলাপন যাহা শেষ করি এই বেলা
রাতের জড়িমা নাহি যদি আর কাটে।
হয়তো শেফালি সারা রাত পথ চেয়ে
কাঁদিবে প্রভাতে নিরাশায় ছল ছল।
শুভ্র বলাকা সুনীল গগন-তলে
মালিকা রচিবে, কে পরিবে তাহা বল।

বিহগ-কাকলি মর্ম্মর-বন-ছায়—
হয়তো হবে না—নীরব বিষাদময়,
প্রাণ তবু চায় বরণ করিতে তোমা
এ খেয়ার শেষে দেখা যদি নাহি হয়।
দিকে দিকে শুধু যাত্রীর কোলাহল
উত্তর নাই শুধুই প্রশ্ন করা,
কখন ভিড়িবে পরিচিত সেই তীরে
যেথায় প্রিয়ার অধর সুষমা ভরা।

মিলন-স্বপন দুলিছে ওদের প্রাণে
সুন্দর যেন নির্ম্মল চাঁদিমায়
অন্তরে মোর সকরুণ সুর বাজে
মিলনের মাঝে বিদায়ের ছবি হায়!

লাহোরের ছবি

শ্রীঅখিল

নূতন যায়গা দেখিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছেলেবেলা থেকেই অনেকের মত আমারও ছিল। কিন্তু জীবনের, বিশেষতঃ ছেলেবেলাকার ও যৌবনের, অনেক ইচ্ছার মত ইহাও কখন যে, নিজ্জীব হইয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল নিজেই টের পাই নাই। দৈনন্দিন বন্ধনদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেশ ভ্রমণের কথা মনের কোণে উঁকি মারিতেও সাহস করে নাই। তা ছাড়া জীবনের সম্ভবতঃ দুই তৃতীয়াংশ কলিকাতায় কাটাইয়া দিয়াছি। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি ও পৃথিবীর অনেক দেশ এই মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, কলিকাতাবাসীকে তাহাদের স্বরূপ দেখাইয়া যায়, তত্রত্য অধিবাসীদের মারফৎ। কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীও দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার মত বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশবাসীদের দেখিয়া দেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা কলিকাতায় বসিয়াই মিটায়। আমিও তাহাই করিতেছিলাম।

কিন্তু জীবনে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে যাহা ঘটিবার পূর্ব্বে মনের কিনারায়ও স্থান পায় নাই। তাই হঠাৎ একদিন ঠিক হইল আফিসের কাজে লাহোর যাইব। এমনই হঠাৎ একদিন গত বৎসরও গিয়াছিলাম লক্ষ্ণৌ। অনেকের জীবনেই এটা এমন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। কিন্তু যে জীবনের অপরাহ্ণ কাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বাহিরে যাওয়ার কথা ধীরে সুস্থে ভাবিবারই এক রকম ফুরসৎ পায় নাই তার পক্ষে লাহোর শুধু যাওয়া নয়, সেখানে গিয়া দুমাস আড়াই মাস থাকা একেবারে অত্যুল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। গত বৎসর লক্ষ্ণৌ গিয়া মনে হইয়াছিল অনেক দূরে আসিয়াছি। কিন্তু এবারে যখন লাহোর যাওয়া ঠিক হইল তখন লক্ষ্ণৌ মনে হইল যেন ঘরের কোণে। ছেলেবেলায় কোন একটা দূরত্ব ব্যঞ্জক কথা উঠিলেই শুনিতাম "দিল্লী", "লাহোর"। তারপর যখন বড় হইলাম তখনও ঐ দুইটি যায়গা কেবল ইতিহাসের পাতার কথাই মনে করাইয়া দিত —বড় জোর মানচিত্রের পাতা। তাই যখন দেশ ভ্রমণের উপলক্ষে না হইয়া কার্য্যব্যপদেশেও লাহোর যাওয়া ঠিক হইল তখন জীবনের অপরাহ্ণেও যেন যৌবনোচিত উৎসাহ ও আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠিল।

ডিসেম্বরের গোড়াতেই পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম রাত্রি আন্দাজ ৮টায়। তৃতীয় দিনে লাহোর গিয়া পৌছিব সকালে। নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতম অতীত স্মৃতিটুকুও নিজের কাছে ভাল লাগে। কারণ তাকে আর ফিরিয়া পাইব না। একদিন হয়ত নিজের স্মৃতির তলদেশ পর্য্যন্ত হাতড়াইয়াও নিজেই তার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিব না। কাজেই অতীতের কথা বলিতে গেলে তুচ্ছতম খুঁটিনাটি জিনিষটিও বাদ দিতে ইচ্ছা হয় না। নিতান্ত অবহেলার চোখে যার দিকে চাহিয়াছিলাম সে ছবিটিও যেন মূর্ত্তি ধরিয়া মিনতিকরুণ চোখে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, "আমাকেও বাদ দিওনা আমি যে তোমার আপন।" তাই কাউকেই ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সবাইকে বুকে আঁকড়াইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।

রেল গাড়ীতে যাইতে যাইতে পরের দিন সকাল বেলা শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া বসিয়াছিলাম। ছবির পর ছবি চোখের সম্মুখ দিয়া চলাইয়া যাইতে লাগিল। দেখিবার আয়াস পর্য্যন্ত করিতে হইতেছিল না। শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্য। সমস্ত প্রাণ যেন চোখে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। চারিদিকে সবুজ মাঠ। একখানা ছোট মাটীর তৈয়ারী বাড়ী। কাছে একটি আম গাছ। তার পাশে একটা গরু। গরুটাকে নিয়া একটি লোক, স্ত্রী কি পুরুষ মনে পড়িতেছে না, বাড়ীর দিকে যাইতেছে। চক্ষের নিমেষে

এই অতি অকিঞ্চিৎকর ছবিটী কখন অন্তর্ধান করিয়া গিয়াছে। ভাবিতে লাগিলাম ঐ বাড়ীটা, ঐ শস্য ক্ষেত্র, ঐ আম গাছ, ঐ গরু এবং ঐ মানুষ পরস্পরের নিকট হয়ত কত অর্থপূর্ণ—কিন্তু আমার কাছে তার কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন অনাবশ্যক এই ছবিটিও ত আমার জীবনের এক কোণে তার চিরন্তন বাসা বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। তাকেও ত সরাইতে পারিতেছি না।

আবার কত ছবি চোখের সুমুখ দিয়া ভাসিয়া গিয়াছে যাহা দেখিয়া প্রাণ মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ক্যামেরা সঙ্গে ছিল। এক একবার ইচ্ছা হইয়াছে ছবিটা তুলিয়া লই। কিন্তু তখনই আবার শান্ত হইয়াছি। ভাবিয়াছি কত তুলিব, ভাল মন্দ কিছুই ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তার মধ্যেও এমন এক একটা বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গিয়াছে যাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে ইচ্ছা করে নাই। মনের ছবি একদিন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে মিলাইয়া যাইবে। ইচ্ছা হইয়াছে ক্যামেরায় ধরিয়া রাখি। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ধরিয়া মহাকালকে ফাঁকি দিয়া ক্ষণেকের জন্য হইলেও গত মুহূর্তকে ফিরিয়া পাইব। জানি তা হয় না, হইবার নয়। তবুও মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার শেষ নাই। তুচ্ছতম সুখ স্মৃতিকেও সে প্রাণপণে আঁকড়িয়া থাকিতে চায়।

হঠাৎ একটি পোলের উপর রেল গাড়ী আসিয়া পড়িল আর চোখের সামনে পড়িল অপূর্ব্ব এক দৃশ্য। প্রাতঃ সূর্য্যের আলো আসিয়া তার উপর পড়িয়াছে। গঙ্গার উপর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সৌধমালা সুশোভিত। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী। এ ছবি ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু ক্যামেরা লোড করা ছিল না। তাড়াতাড়ি ফিল্ম খুলিয়া 'লোড' করিতে করিতে ছবি অন্তর্ধান। কিন্তু ক্যামেরায় ফিল্ম পুরিয়া ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হইয়া রহিলাম। দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, রাত্রি ভোর হইল ; সকালে লাহোর গিয়া পৌঁছিলাম।

এই লাহোর! প্রাণ যেন বাতাসে মিলাইয়া ভাল মন্দ নির্ব্বিচারে লাহোরের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশিয়া যাইতে চাহিল। চোখ কাণ যেন কতকালের উপবাসী। সুন্দর কুৎসিতের ভেদ নাই, ভাল মন্দের বিচার নাই।

কলিকাতার অতি সাধারণ গলির মত রাস্তা, চৌরঙ্গির রাস্তার চাইতেও সুদৃশ্য মল রোড বা পাঁচশো বছরের পুরাণো ঘিঞ্জি, সরু নোংরা গলি কিছু থেকেই চোখ ফিরাইতে পারি নাই। আকবরি গেট, লোহারি গেট, ভাটি গেট। এ ছাড়াও পুরাণো সহরের অনেকগুলি গেট।



ভাটি গেট

লাহোর মোগল সম্রাটদের দখলে আসিবারও বহু পূর্ব্বে ভাটি রাজপুতদের সময়ে সম্ভবত ৭ম বা ৮ম শতাব্দিরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। ভাটি রাজপুতদের স্মৃতিচিহ্নরূপে ইহা আজও বর্ত্তমান।

তখন সহর থাকত সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও করা। এখন অবশ্য অনেক গেট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক একটা গেটের সঙ্গে কত শত সহস্র বৎসরের স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্য্য এখন না থাকিলেও এখনও অতীতের

সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—কত স্নিগ্ধ কঠোর দৃষ্টির প্রলেপ, কত যুগ যুগান্তরের মানুষের চাহনি আমার গায়ে বুলান আছে তোমার দৃষ্টি তার সঙ্গে মিলাইয়া যাও, আমি অতীত বর্ত্তমানের সঙ্গম স্থল। আমাকে শ্রদ্ধা কর। সমস্ত পুরাণো সহরটাই মনে হল যেন কথা বলিতেছে।

বিশ বৎসর আগে বাদুড় বাগানের এক মেসে কয়েকদিনের জন্ম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাঁর নাম শ্রীযুত ব্রিজলাল পুরি, ঠিকানা বলিয়াছিলেন—'Messrs. Atma Ram & Sons, Publishers, Anarkali Lahore।' ঠিকানা বলিবার সময় "আনার কলি" চমকিয়া উঠিলাম। বিশ বৎসরের পুরাণো স্মৃতি যার নাম ধাম কাহিনী মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া ভাসিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, মশায় এখানে Messrs Atma Ram & Sons, Booksellers and Publishers আছে? হাঁ আছে। 'টাঙ্গাওয়ালা, চালাও—উসতরফ্'। সঙ্গে অফিসের দুজন ভদ্রলোক ছিলেন। পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিয়া একজন বলিলেন—'তোমার ত মাথা খারাপ জানাই আছে কিন্তু অকাজে কোথায় যাচ্ছ অসময়ে? দেখো অন্ত সময়।' তাদের কথা শুনিবার মত অবসর ও মনের অবস্থা আমার ছিল না।



লাহোর দুর্গ তোরণ

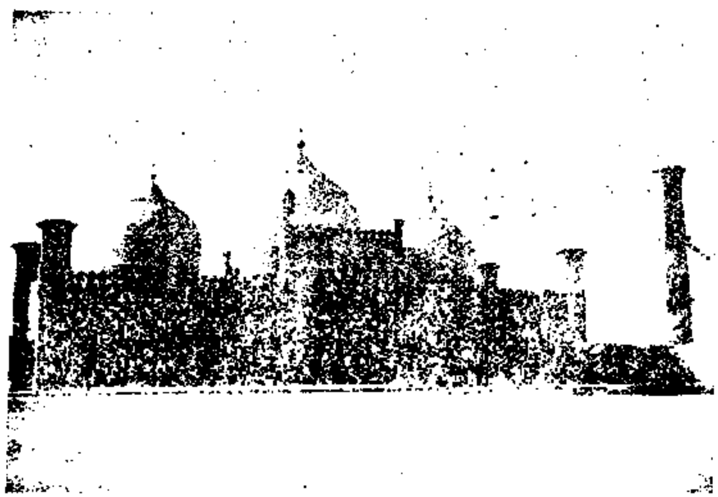
অতীতের একটী ক্ষুদ্র সেনানিবাসকে সম্রাট আকবর একটী দস্তুরমত দুর্গে পরিণত করেন। ঐ দুর্গ জাহাঙ্গীর, সাজাহান এবং ঔরঙ্গজেব এই তিন জন মোগল সম্রাট ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত করেন। ইহার তিনটী তোরণ আছে। "হজুরি বাগ" তোরণ, "শাহপান" তোরণ এবং "মস্তি" তোরণ। এই ছবিটী হজুরিবাগ তোরণের।

অঞ্চলটার একটা ইতিবৃত্ত বলিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা এবং ঐ ইতিবৃত্তটা পুরাতন অব্যবহৃত জিনিসের মত মনের কোণে কোথায় এতদিন পড়িয়াছিল তার কোন খোঁজও করি নাই। লাহোরে ও'দিন থাকিতে হইবে। হোটেল খুঁজিতে-খুঁজিতে একটা চমৎকার হোটেল পাইলাম Standard Hotel। যে অঞ্চলে হোটেলটা অবস্থিত সেই অঞ্চলটার নাম জানিতে পারিলাম "আনার কলি"।

ব্রিজলাল পুরি আমায় চিনিতে পারিলেন না। মাথার চুল সমস্ত ধপধপে সাদা হইয়া গিয়াছে, দেহ জরাগ্রস্ত। আমি স্মরণ করাইয়া দিলেও আমাদের স্বল্প পরিচয়ের কথা মনে আনিতে পারিলেন না। তবুও খুসী হইলেন। আমার জন্ত কিছু করিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটি লাহোর সিটির মানচিত্র চাহিয়া নিলাম; কিন্তু তাঁর কাছে মানচিত্র বা অন্ত কোন প্রয়োজনের জিনিষ চাহিতে আমি যাই নাই।

মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার মন বিষণ্ণ হইয়া গেল। যে প্রাণভরা আকুলতা লইয়া এই অপ্রত্যাশিত স্থানে আমার বিশ বৎসরের পুরাণো, যৌবনের পরিচিত, লোকটিকে দেখিতে গিয়াছিলাম তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমার স্বপ্নময় পুরাণো স্মৃতি-মথিত ছবি আমার সঙ্গে কথা কহিল না। তার চাইতে একটা পুরাণো ভাঙ্গা দেওয়াল, যাকে জীবনে কখনো চোখে দেখি নাই, আমার অধিক পরিচিত মনে হইল। একটা পুরাণো বাড়ী, পুরাণো সমাধি, পুরাণো মসজিদ, যার সামনেই গিয়া দাঁড়াই যেন মুখর হইয়া উঠে। পরম আত্মীয়ের মত আমার সঙ্গে আলাপ করে, আমায় ছাড়িতে চায় না।

বিশ বৎসর আগেকার শোনা "আনার কলির" কথা আর ভুলিতে পারিলাম না। ব্রিজলাল পুরির মুখেই প্রথম শুনিয়াছিলাম, পরে লাহোরেও শুনিয়াছি। ঠিক করিলাম "আনার কলির" সমাধি দেখিব। ক্রমে ক্রমে দেখি বহু দেখিবার জিনিষ রহিয়াছে, ঔরঙ্গজীব, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, রণজিৎ সিং, নুরজাহান—যে সব নামের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে মনে পড়িবার আগে নামের বানান মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিত, যাঁদের কীর্ত্তিকুল মনে পড়িবার আগে অধর মুখার্জ্জির ইতিহাসের পাতা মনে পড়িত, পরম বিস্ময়ের সহিত দেখি, তাঁদেরি রচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ কত সৌধমালা তাঁহাদের সুখ দুঃখের ছোট বড় কত কাহিনীমণ্ডিত শত শত বৎসরের স্মৃতি বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।



বাদসাহি মসজিদ

১৬৭৩ খৃঃ অব্দে এই মসজিদ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্ত নির্ম্মিত হয়।

একটা লাহোর গাইড্ কিনিলাম, ভাল করিয়া জানিয়া লইব কি কি দেখিবার যায়গা আছে। লাহোর নাকি একটি অতি পুরাতন, সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন, সহর। প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল শ্রীরামচন্দ্রাত্মজ লব কর্ত্তৃক। পূর্ব্ব নাম ছিল "লবপুর" বা "লহকোট"। লবের একটি বহু পুরাতন মন্দির লাহোর দুর্গের ভিতরে আছে, কিন্তু দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। এতদিন রহিলাম দেখিব দেখিব করিয়া দেখা হইয়া উঠিল না। হয়ত দুচার দিনের জন্ম গেলে দেখা হইত। ফোর্টের ভিতর আরও—— দেখিবার ছিল; মোগল সম্রাটদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের, শ—— ও প্রাচুর্য্যের কত চিহ্ন— কিছুই দেখা হয় নাই। দেখিয়াছি

শুধু ফোর্টের বাহিরের কতক অংশ ও তাহার একটা গেট। কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গেট দেখিয়াছি কিন্তু মনে জাগিয়াছে শুধু একটা সন্দেহমিশ্রিত আতঙ্ক। যখনি সে দিক থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে চাহিয়াছি মনে হইয়াছে কোন্ অজানা কুটিল ক্রূরতা যেন তার ভিতরে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছে। বিপদসঙ্কুল, নির্জ্জন অন্ধকার পথে চলিতে মনে যেরূপ ভাব হয়—কখন পিছন হইতে আসিয়া আততায়ী তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিবে। কিন্তু



"হজুরিবাগ ও বারাদরি"

লাহোর দুর্গ ও বাদশাহি মসজিদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই সুন্দর বাগানটি অবস্থিত। ছবিতে লাহোর দুর্গ তোরণের গায়েই যে একতলা ভবনটি দেখা যায় উহাকে মহারাজা রনজিৎ সিংহের "বারাদরি" বলে।

আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান ঔরঙ্গজেবের তৈয়ারী লাহোর ফোর্ট গেটের চেহারা অন্য রকম। যেন শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দম্ভে আহ্বান করিতেছে—'এস শক্তি পরীক্ষা কর। কোন লুকোচুরি প্রবঞ্চনা নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে ডঙ্কা বাজাইয়া বলিতেছে, আমি শক্তিমান, আমি বলীয়ান, আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার কর।'

তারি পশ্চিম দিকে অপর পার্শ্বে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের তৈয়ারী বাদশাহী বা শাহী মসজিদ্। সম্রাটের উপযোগী মসজিদ বটে। কি বিরাট তার পরিকল্পনা! মহাকাশেই সূর্য্যের উদয় হয়—অস্ত যায় মহাসমুদ্রে এবং একমাত্র বাদশাহী মসজিদে মাথা নত করিলেই যেন গর্ব্বিত মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণার অন্তরালে আত্মগোপন করিতে পারে। সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব একাকার হইয়া যায়। ভিক্ষুকে বাদশাহে প্রভেদ থাকে না। এই লাহোর ফোর্ট সায় লাহোর শহর পর্য্যন্ত একদিন মহারাজ রণজিৎসিংহের দখলে আসিয়াছিল। ফোর্টের অভ্যন্তরস্থ একটি প্রাসাদের দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখিতেন। ঐ বারান্দাটা বাহির হইতে দেখা যায়। ইচ্ছা হইল ফটো তুলিয়া আনি, কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই।

ফোর্ট ও মসজিদের মাঝখানে বাগান ও একটি মণ্ডপযুক্ত চতুর্দ্দিক খোলা মনোরম শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্রকায় সৌধ। এক সময় দ্বিতল ছিল। উপর তলাটি এখন নাই। ইহা ছিল মহারাজা রণজিৎ সিংহের বারাদরী অর্থাৎ সভাগৃহ। ঐ বাগানের উত্তর পার্শ্বেই আবার রণজিৎ সিংহের রাজোচিত সমাধি-মন্দির মহারাজা রণজিতের চিতাভস্ম

বক্ষে ধরিয়া উন্নত মস্তকে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে মোগল শক্তির বুকের উপর।

সমস্ত লাহোর একদিন মহারাজা রণজিৎ সিংহের পদানত হইয়াছিল। সমস্ত পাঞ্জাব শিখের পদভরে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—"পাঞ্জাব আজি গরজি উঠিল অলখ নিরঞ্জন", কিন্তু আজ এসব অতীতের কথা। একাকার হইয়া পদ্মার স্রোতের তৃণখণ্ডের মত কোথায় কতদূরে মিলাইয়া গিয়াছে। আর তাহারা নাই। আর সে আমি নাই। আবার সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন।

মল রোডের উপর দিয়া যাতায়াত করিবার সময় একটা চৌমাথার উপর একটা কামান পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। চোখে পড়িয়াছে কি—পড়ে নাই। ভাল করিয়া না তাকা-



মহারাজা রণজিতের সমাধি

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের পরে সমগ্র পাঞ্জাব তার রাজধানী লাহোর মহারাজা রণজিৎ সিংহের পদানত হয়। লাহোর দুর্গ এবং বাদশাহী মসজিদও শিখদের দখলে আসে। ঠিক বাদশাহী মসজিদের পাশে এবং লাহোর দুর্গের হজুরিবাগ তোরণের সম্মুখেই মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি নির্ম্মিত হয়।

ইয়া চলিয়া গিয়াছি। "লাহোর গাইডে" পড়িলাম কামানটীর নাম "জমজমা"। আর একদিন সেই কামানকেই আবার নূতন চোখে দেখিলাম। তখন তার ইতিবৃত্তটা জানিয়া লইয়াছি। তার ছবি লইলাম। আহম্মদ শা দুররানী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এই কামান মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন। মনে হইল যে ঐ যুদ্ধেই ভারতে হিন্দু রাজত্ব বিস্তারের শেষ চেষ্টা হয় এবং শেষ আশা বিলুপ্ত হয় ঐ যুদ্ধেরই পরিণামে। হয়ত নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িয়াছিল কিন্তু দাঁড়াইয়া ভাবিবার অবসর ছিল না।

হাঁটিতে যাইতে যাইতে কতদিন কত অনাবশ্যক অকিঞ্চিৎকর জিনিষ পদ্মার প্রবল স্রোতে চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ভাসিতে ভাসিতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ চোখ যায় চাহিয়া রহিয়াছি। দূরে অতিদূরে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। আর দেখা যায় না। কেন জানি না মনের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। ততক্ষণে চোখের দৃষ্টি হয়ত অন্য কোথাও নিবদ্ধ হইয়া গেছে। কিন্তু মনের হাহাকার থামে নাই। কোথায় চলিয়া গিয়াছে সেই রণজিৎ সিং, কোথায় বা সেই শিখ, আর কোথায়-বা আমার সেদিনের দেখা রণজিৎ সিংহের "সমাধি"। সব যেন

আজ দুদিনেই মনে হইতেছে সব ছবি যেন ক্রমশঃ

অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া যাইতেছে। হোটেলের চাকর অমরনাথ, সদাপ্রসন্ন, নিরলস, চির আজ্ঞাবহ। যখনই ডাকিয়াছি "অমরনাথ", উত্তর আসিয়াছে "হুজুর,—আবহি লায়া"। কন্‌কনে দারুণ শীত। সকাল নটার আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু অমরনাথ ভোর ৫টায় উঠিয়া তাহার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। না চাইতে বিছানায় আসিয়া চা রুটি হাজির। স্নান করিব, গরম জল চাই, "অমরনাথ"। "হুজুর পানি তৈয়ার হয়।" রাত্রি ১২টায় আসিয়াছি। অমরনাথ আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আছে, অপরিশ্রান্ত, হাসিমুখে, যে কোন আসিবার দিনও সেই সদাপ্রফুল্ল মুখে আমার বিছানা পত্র বাক্স গুছাইয়া দিল, কোনও দৈন্য কোনও অপূর্ণতার লেশ মাত্র চিহ্ন তার মুখে ছিল না। আমিও হাসিমুখেই বিদায় নিলাম। আমারও কোথায়ও যেন কোন অপূর্ণতা ছিল না—বিদায় মুহূর্ত্তটিও যেন—"পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়"। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মানসপট হইতে এ ছবি মুছিয়া যাইবে না, যদিও ভয় হয় স্মৃতি হয়ত একদিন আমাকে প্রতারিত করিবে।

কি বিচিত্র মানুষের মন। একটু আগেই মনে হইয়াছিল সব ছবিই যেন মিলাইয়া গিয়াছে বিস্মৃতির অতলে। কিন্তু



জমজমা কামান

৯½ ইঞ্চি নালি (bore) বিশিষ্ট এবং প্রায় ১৪½ ফুট লম্বা। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে আহম্মদ সা দুররাণী কর্তৃক এই কামান নির্ম্মিত হয়। ইহা ৩য় পাণিপথের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে যে পরিমাণ তামা ও দস্তা প্রয়োজন হয় তাহা হিন্দু ও শিখদের নিকট হইতে জিজিয়া কর প্রয়োগ করিয়া আদায় করা হয়। পরে এই কামান শিখেরা দখল করিয়া নেয়। বর্ত্তমানে ইহা অব্যবহার্য্য।

হুকুমের প্রতীক্ষায়। তাহাকে দেখিলে মনে হয়না হোটেলের দুদিনের যাত্রীদের ছাড়া এ জগতে আর তার কেহ আছে। অথচ হয়ত তার সবই আছে—স্ত্রী পুত্র পরিবার। প্রাণের নিভৃততম প্রদেশের সমস্তটাই হয়ত তারাই জুড়িয়া বসিয়া আছে—আর কাহারও সেখানে প্রবেশের পথ নাই। কিন্তু তবুও এই যে তার সঙ্গে আমার এই দুদিনের পরিচয় তাহাও আমি কিম্বা সে কেহই ত মুছিয়া ফেলিতে পারিব না। কিছু না! সব যেন পর্দ্দার আড়ালে একান্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। মুহূর্ত্তে ঠেলাঠেলি করিয়া সামনে আসিয়া ভিড় জমাইয়া বসিয়াছে—মায় রাস্তার আলু-কাবলিওয়ালার অথাদ্য আধার পূর্ণ পাত্রটি পর্য্যন্ত। তলায় আগুন জ্বালান, উপরে আলু-কাবলির স্তূপের ভিতর হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। আনারকলি বাজার, পানের দোকান, কত কি। 'নারগিসাস' ফুলওয়ালা সাধারণ বাস-

কেটে করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি সুন্দর ফুল! সময় সময় এক একটা করিয়া গোছা কিনিয়া গাড়ীর দু' পাশে রাখিয়া দিয়াছি। লরেন্স গার্ডেনস্, কৃত্রিম সিমলা পাহাড়, লাহোর ক্যান্টনমেন্ট, ক্যান্টনমেন্টের রাস্তা, সব যেন চোখের উপর ভাসিতেছে।



লাহোর হইতে অমৃতসর যাইবার রাস্তা

ইহা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডেরই একটী অংশ। দুপাশে গাছের সারি এবং তার অগ্রভাগ দুপাশ হইতে এমনভাবে মিশিয়াছে মনে হয় যেন একটী বৃক্ষশাখা নির্ম্মিত নিরবচ্ছিন্ন তোরণ!

অমৃতসরের রাস্তা, দু'পাশে গাছ, গাছের সারির পাশে সবুজ মাঠ, দু'পাশের গাছের শাখা প্রশাখাগুলি একত্র হইয়া যেন অবিচ্ছিন্ন তোরণ রচনা করিয়া চলিয়াছে আর তার ভিতর দিয়া চলিয়াছে একটানা সোজা রাস্তা। মোটর চালাও, যত খুসী জোরে। দুপাশের দৃশ্য যেন তীব্র বেগে হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। এক একবার মনে হইয়াছে যেন এ গতির শেষ নাই। যেন অনন্তকাল, অক্ষুণ্ণগতিতে এই একই ভাবে চলিয়া যাইতে পারে। পথের যেন শেষ নাই, গাড়ীর পেট্রল ফুরাইবে না, গতির বিরাম নাই। সংসারের দুঃখ দৈন্য অভাব সব কিছু যেন মন হইতে আলগা হইয়া খসিয়া পড়িয়া গেছে। এই একটা মুহূর্ত্ত যেন অনন্ত মুহূর্ত্ত। প্রাণ গাহিয়া উঠিয়াছে—"ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে।" গাড়ী চালাইতে চালাইতে চলিয়াছি ত—চলিয়াছিই। একটা রাস্তার আরম্ভে পাশে সাইনবোর্ডে লেখা আছে "To Julunder"। বুঝিলাম রাস্তা জলন্ধরে গিয়াছে। চলিলাম সেই পথ ধরে, গাড়ী থামাইতে ইচ্ছা হইল না। সূর্য্য ডুবিতে না ডুবিতেই দেখি আকাশ জোছনায় ভরিয়া গিয়াছে, সম্মুখে পূর্ণিমার চাঁদ। বোধ হয় সেদিন ১১ই জানুয়ারী শনিবার ছিল। সহর হইতে কতদূরে চলিয়া গিয়াছি, ক্রমশঃ রাস্তা জনবিরল হইয়া পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে দুএকটা মোটর বা মোটর লরি আমাকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি চলিয়াছি, যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। গাড়ী থামাইতে ইচ্ছা নাই। আমার চারিপাশে যেন সৌন্দর্য্যের বান ডাকিয়াছে। একবার মনে পড়িয়াছে, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী।' গাড়ীতে পেট্রোল ভর্ত্তি। এক একবার মনে হইয়াছে একেবারে জলন্ধরে গিয়া গাড়ী থামাইব এবং সেখানেই রাত কাটাইব, যেখানে হউক। কিন্তু অপরিচিত

রাস্তা ক্রমবর্দ্ধমান নির্জ্জনতা মনকে বাস্তব জগতের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। একটা মস্‌জিদের কাছে আসিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া আবার ছুটিলাম অমৃতসরের দিকে। চাঁদ তখন পিছনে পড়িয়া আছে। কতদূরে চলিয়া আসিয়াছি আবার সহরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কোন অবসাদ নাই। সমস্ত পৃথিবী জ্যোছনায় ভরা, গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, আমি একা। তবুও যেন একা নই, পৃথিবীর, সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত সুখ যেন আমাকে জড়াইয়া আলিঙ্গন প্রাণপণে যাহাকে বাহুদ্বারা বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছি, মুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখি সে নাই, কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

অমৃতসরে যখন ফিরিয়া আসিয়াছি তখন রাত্রি হইয়াছে। ঠিক করিলাম অমৃতসরেই রাত্রির মত থাকিয়া যাইব। কোথায় রাত্রি কাটাইব জানি না। বিছানা নাই, পত্র নাই, সঙ্গে কিছু মাল বোঝাই গাড়ী। গাড়ী কোথায় রাখিব তারও ঠিকানা নাই। কিন্তু কিছুতেই মন দমিল না। সমস্তই অনিশ্চিত এবং অনিশ্চিত বলিয়াই আমার আনন্দের



"Golden Temple" বা "স্বর্ণ মন্দির" অমৃতসর

ইহা একটী প্রকাণ্ড বড় সমচতুষ্কোণ দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত। মন্দিরে যাইবার একটী সেতু আছে। ছবিতে তাহা দেখা যাইতেছে। ইহার উপরের ভাগের একটী কক্ষ খাঁটি সোনার পাতে মোড়া। ইহা দ্বিতল। নীচের তলার কক্ষটিও ঐরূপ সোনার পাতে মোড়া। তা ছাড়া অভ্যন্তরভাগের প্রায় আগাগোড়াই সোনালি পাতে আবৃত এবং আগাগোড়াই কারুকার্য্যখচিত। এই মন্দির একবার মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলে কিন্তু শিখগণ উহা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। শোনা যায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি ভবন হইতে অনেক বহুমূল্য প্রস্তর তুলিয়া আনিয়া মহারাজা রণজিৎ সিং এই স্বর্ণ মন্দিরে গ্রথিত করেন।

করিয়া রহিয়াছে। প্রতি পলে মনে হইতেছিল জীবনের ঠিক এই মুহূর্ত্তটি আর ত ফিরিয়া আসিবে না। আমার কথায় সায় দিয়া সারা প্রকৃতিও যেন বলিতেছিল, না আর আসিবেনা—তোমার আমার এই যে মিলনের ক্ষণ—এ অনন্ত অতীতে চিরকালের জন্ম মিলাইয়া গেল, আর ফিরিবে না। অন্তরতম প্রদেশে আবার সেই চিরদিনের ক্রন্দন। যাত্রা যেন সীমাহীন ভাবে বাড়িয়া গেল। ভাল হোটেল পাওয়া যায় কিনা জানি না। সন্ধান করিয়া জানিলাম শিখদের অতিথিশালায় স্থান পাওয়া যাইতে পারে এবং বিছানাপত্র সমস্তই দেয়। অতিথিশালার খাতায় নাম লিখাইয়া, একটি ঘর ঠিক করিয়া এবং আমার সামান্য যা কিছু সঙ্গে ছিল সেই ঘরে তালাবন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম

আহারের সন্ধানে। একটি নোংরা গোছের হোটেল পাইলাম। ঢুকিয়া দেখি কতিপয় গুণ্ডা শ্রেণীর পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একটা টেবিলে গোটা কয়েক মদের গ্লাস লইয়া বসিয়াছে; মনে দারুণ একটা ঘৃণা এবং অস্বস্তির ভাব আসিল। তবুও অন্য একটা ঘরে গিয়া বসিলাম। এই রাত্রে আবার কোথায় হোটেল খুঁজিতে যাইব? খাওয়া শেষ না হইতেই পাশের ঘরে শুনি তুমুল গোলমাল এবং ধ্বস্তা-ধ্বস্তির শব্দ। উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। চাকরটাকে বলিলাম বিল ল্যা আও। খাবার পয়সা চুকাইয়া দিয়া সটান অতিথিশালায় নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম হোটেল হইতে বিছানাপত্র, মানে লেপ তোষক ও বালিশ দিয়া গিয়াছে। আজ ভাবিতেছি কি করিয়া ঐ নোংরা বিছানায় রাত কাটাইয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কোন অসামঞ্জস্যের স্থান আমাতে ছিল না। খাটিয়ায় বিছানা পাতিয়া শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া নিলাম। কিন্তু চোখে ঘুম নাই। বারান্দায় বাহির হইয়া চাহিয়া দেখি শিবদের মন্দির "বাবা অটলের" অভ্রভেদী চূড়ার উপরে বৃত্তাকার আলো জ্বলিতেছে। ক্যামেরা খুলিয়া আনিয়া ধরিয়া রাখিলাম। তার পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। একা শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কি যেন একটা মাদকতা আমাকে পাইয়া বসিল। মনে হইল প্রকৃতি রাণী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার পাশে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়া হাসি মুখে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমায় ডাকিয়া বলিতেছে,—চলে এস আমার বুকে, বেরিয়ে পড় নিরুদ্দেশ যাত্রায়! কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই।

ভোর হইতেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া অতিথি-শালা হইতে বিদায় লইলাম। অতিথিশালার সদর দরজার সামনেই একটা লোককে পাহারা দেওয়ার মজুরী বাবদ চারি আনা পয়সা দিয়া গাড়ীখানা রাখিয়া দিয়াছিলাম। আর দেরী নয়—গাড়ী ষ্টার্ট দিয়া লাহোর রওনা হইলাম। মুখ ধোয়া ক্ষৌর কর্ম্মাদি কিছুই হয় নাই। ভারী বিশ্রী লাগিতেছিল। বেলা তখন নয়টা তবুও দারুণ শীত। হল রোডে একটি নাপিতের দোকান দেখিয়া এক পাশে গাড়ী রাখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। মিনিট দশেক পরে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখি, এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়িলাম। এক পাহারাওয়ালা গাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতেই বলে— "হিঁয়া কাহে গাড়ী খাড়া কিয়া। আপকা লাইসেন্স?"

বুঝিলাম হল রোডে 'No Parking।' কিন্তু রাস্তায় কুত্রাপি কিছুই লেখা নাই। লোকটাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে বাবা হাম্‌তো পরদেশী আদমি, তোমার এই অদ্ভুত মুলুকের আইন কানুন কিছুই জানি না, বড়ই কসুর হইয়া গিয়াছে, এ যাত্রা আমাকে ছোড় দেও।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। "আপকা লাইসেন্স দিজিয়ে।" অগত্যা লাইসেন্সটী তাহার হাতে দিতেই, আমার হাতে অন্য একখানা কাগজ দিয়া বলিল 'আপ্‌কা চালান হো গিয়া, এক্কিশা তারিখ্‌মে অমৃতসর কোর্টমে হাজির হোনা। Licenceটি নিজের পকেটে রাখিয়া দিল। বাধ্য হইয়া থানায় গেলাম, দেখি, উপরওয়ালাদের বলিয়া কিছু হয় কি না। উপরওয়ালারা সব শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল যে পুলিশেরই বেকুফি হইয়াছে এইরূপ পরদেশী নূতন লোককে লাঞ্ছনা করা, কিন্তু চালান লেখা হইয়া গিয়াছে উপায় নাই। তবুও একটি লোক সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিল একটি সার্জ্জেন্টের নিকট। সে পাঠাইল তার উপরওয়ালার নিকট। শেষ পর্য্যন্ত সবাই দুঃখ প্রকাশ করিল কিন্তু সেদিন রবিবার থাকায় কিছুই করিতে পারিল না, বলিল পরদিন সোমবার একবার আসিতেই হইবে উপায় নাই। পরদিন আসিতেই হইল এবং ডেপুটী কমিশনারকে বলিয়া লাইসেন্সটী লইয়া গেলাম।

অমৃতসরে কয়েকবারই আসিতে হইয়াছিল অফিসের কাজে। Golden Temple (শিখদের স্বর্ণমন্দির) দেখার ইচ্ছা কলিকাতা থাকিতেই মনে মনে ছিল। একদিন লাহোর প্রবাসিনী আমার একজন আত্মীয়াও আমার সাথী হইয়াছিলেন। সকাল বেলায় লাহোর-অমৃতসরের রাস্তায় রওনা হইয়া প্রায় সোয়া ঘণ্টায় অমৃতসর পৌছিয়া একেবারে সোজা স্বর্ণমন্দিরের দোরগোড়ায় আসিয়া গাড়ী থামাইতেই গাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য প্রার্থী আসিয়া জুটিল। একটি ছোকরাকে ঠিক করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই পড়িলাম ভিক্ষুকের হাতে। সম্ভব অসম্ভব নানা রকমের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা বর্ষণের ভিতর দিয়া কোনও রকমে দুজনে মন্দিরের সীমানায় ঢুকিয়া পড়িলাম। কতদিন হইতে Golden Templeএর কথা শুনিয়া মনে মনে কত রকম কাল্পনিক মন্দির গড়িয়াছি ও ভাঙ্গিয়াছি তার ইয়ত্তা নাই। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবুও দেখিবার মত। বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকার মাঝখানে মন্দির। অভ্যন্তর-ভাগ সত্যিকার সোনার পাতে মোড়া ; চমৎকার কারুকার্য্য খচিত। দেখিবার যা কিছু আছে সমস্তই দেখিবার খুব সুবিধা হইয়াছিল Temple Guideটির সৌজন্যে। আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই চলে। তবুও মনে হয় না কোনও guide ইহার চেয়ে সব দিক দিয়া সুনিপুণ ও সৌজন্য পূর্ণ হইতে পারে। (আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅখিল

ডিঙ্গাবাড়ীর ঠাকুরাণী

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী এম্-এ

শীতের শেষ! সবে আই-এ পরীক্ষা দিয়াছি; লিলি আসিয়া বলিল,—"ছোড়দা, বড়দির বাড়ী বেড়িয়ে আসি।"

ইচ্ছা ছিল শিলং যাই, বুঝিলাম যাওয়া হইল না! লিলিকে যদি বলি "তোর ইচ্ছা হয় তাড়াতাড়ি না, আমি চললুম শিলং" অমনি বাবার কাছে গিয়া নালিশ রুজু করিবে—"দাদা বড়দির বাড়ী যাবে না, ছোড়দা নিয়ে যেতে চায় না।"

হুকুম আসিবে—"লিলিকে নিয়ে কমলিকে দেখে আয় গে। দিব্বি খোলা জায়গা; কদিনেই দেখবি শরীর সেরে উঠবে—" ইত্যাদি! ফলে এখন আসিয়াছে লিলি হাত জোড় করিয়া, তখন বাবার জোর পাইয়া ঘাড় হাত দিতে চাহিবে! কি করি, অগত্যা চলিলাম শ্রীমতী লীলিমা চৌধুরীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গী হইয়া বড়দির বাড়ী,—ভাটী মুলুকে। মনে মনে গজরাইতে গজরাইতে তল্পী তল্পা বাঁধার ষোল আনা ভার ফেলিয়া দিলাম লিলির ঘাড়ে! একটু উপদেশ দিয়াও সাহায্য করিলাম না!

বৃথা! এদিকে লিলিটা নৌকায় দাঁড় টানিয়া, সাঁতার কাটিয়া ছুটাছুটি করিয়াই দিন কাটায়; বাড়ীতে বিশেষ কোন কাজ কর্ম্মের দিনে বাবার সামনে একটু বেশী তাড়া-তাড়ি পা ফেলিয়া দু চার বার এ ঘর সে ঘর চলাফেরা করে মাত্র; কাজের ধার মাড়ায় না,—সেই লিলিই দেখিলাম আমার ধমক চমক বেমালুম হজম করিয়া দিব্বি সব গোছ গাছ করিয়া লইল। রাগারাগির ধার দিয়াও গেল না যে একটা ছুতা ধরিয়া যাওয়াটা পণ্ড করি!

যাত্রার সময় বাবা বলিলেন—"ডিঙ্গাবাড়ীর ঠাকরুণকে একটা প্রণাম করে আসিস লিলি, বিজুও যাস্।"

এই ডিঙ্গাবাড়ীর ঠাকুরাণীটিকে, ডিঙ্গাবাড়ীই বা

কোথায়, আর দেশে প্রণাম করিবার মত হাজারো লোক থাকিতে চেনা শোনা নাই আচমকা উঁহাকেই বা প্রণাম করিতে যাইব কেন, এ সকলই তখন মনে হইয়াছিল। বাবার উপর রাগ করিয়াই তখন আর জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু বড়দির বাড়ীতে আসিবার দু' একদিন পর বড়দিই একদিন বলিল—"চল্ ডিঙ্গাবাড়ীর ঠাকরুণকে দেখে আসি।"

লিলির উপর রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। শিলংএর আমোদ পাই নাই, কিন্তু বড়দিদের গাঁ খানি ও তার চতুষ্পার্শ্বের বিরাট হাওড়ের উদার মুক্তি লইয়া পৃথিবীর যে কোন সুন্দর জায়গার সঙ্গে রূপের পাল্লা দিতে পারে! যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজের পর সবুজ, আর তারি মাঝে মাঝে হ্রদের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝিল্ বিল জলা। চারিদিকে পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নাই, কেবল কাললী নদী তার বিরাট স্ফটিকস্বচ্ছ শুভ্র দেহ লইয়া হাওড়ের আর জলার নীল সবুজের মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্য আনিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে! জন কোলাহল নাই, কেবল হাঁসের ঝাঁকের শোঁ শোঁ পাখার শব্দ, মাঝে মাঝে উড়ন্ত রাজ হাঁসের ডাক, রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরিয়া উধাও হইয়া চলে। সকালে নল খাগের জঙ্গলের আড়ালে ঝিলের মধ্যে হাঁসের পাল কোয়াসার মাঝে মাঝে শীতের আদ্র-প্রভাতের জমাট আড়ষ্ট প্রাণের মত জলের উপর স্তব্ধ হইয়া ভাসিতে থাকে। তারপরই তাদের উপর ধীরে আসিয়া একটু কোমল স্পর্শ লাগে কোয়াসা কোমল তরুণ সূর্য্যালোকের লালিমার তুলনায় শিলংএর পাহাড়ী মেয়েদের লাল গাল লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়ে খোঁজ করাও আবশ্যক মনে করি না!

তবু বড়দির দুঃখ যায় না; খালি বলে, "তবু বিজু তুই একবার বর্ষায় এলিনে। আঃ কি চমৎকারই দেখতে হয় তখন। সব একেবারে ডুবে যায়; চারদিকে দেখতে হয় পুরীর সমুদ্রের চাইতেও ভালো রে,—কত রংই যে ধরে হাওড়টাতে!"

বড়দিকে হাওড়ে পাইয়া বসিয়াছে। বড়দিতে সহরের আর বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই। তবু ভালো লাগে তাকে আগের চাইতেও বেশী। আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, আর কিছুদিন থাকিলে হয়ত আমিই আর সহরে ফিরিতে চাহিব না। বড়দির সঙ্গে ডিঙ্গাবাড়ীর ঠাকরুণকে দেখিতে চলিলাম নিঃসংশয়ে যে সত্যই দেখিবার মত একজন কাহাকেও দেখিতে পাইব!

ডিঙ্গাবাড়ী মানে এই গাঁয়েরই একটা পাড়া! বাড়ী তাকে বলা চলে না! পিছনে কাললীর একটা ক্ষুদ্রশাখা ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে, বাড়ীটাও একটা অর্দ্ধচন্দ্র বা ডিঙ্গার ঢংএ তৈরী, তাই নাম তার ডিঙ্গাবাড়ী! প্রায় আধমাইল জায়গা ঘিরিয়া মাথা উচু ভারি পাকা দেওয়াল—অনেক জায়গায়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা 'ফাটলের বটের চাপার পেষণে লোপ পাইয়া গিয়াছে! ভাঙ্গা সিং দরোজার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলাম পড়িয়া রহিয়াছে অসংখ্য শূন্য ভিটা গাছে আগাছায় প্রকাণ্ড জঙ্গলে ঢাকা হইয়া; আর এই সব পড়ো ভিটায় ঘেরা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে অসংখ্য ছোট বড় ভাঙ্গা দালান। সবগুলিরই ফাটলে ফাটলে সহস্র শিকড় চালাইয়া দিয়া মরণ আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে অসংখ্য বট গাছ।

দুই পার্শ্বে ভাঙ্গা দালান আর বট গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটা সরু পথ, তাই ধরিয়া চলিলাম তো চলিলামই; বাড়ীর আর ভাঙ্গা দালানের যেন শেষ নাই। শেষে অনেক দূরে এক কোনায় গিয়া দেখিলাম একটা ছোট্ট পরিচ্ছন্ন দোচালা ঘরের নমুনায় তৈরী দালান—তারই রোয়াকে একটা ঝাঁটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন একজন বিধবা মহিলা। কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না যে ইনিই ডিঙ্গা-বাড়ীর ঠাকুরাণী!

লিলির বড় রংএর গরব। আড়চোখে চাহিয়া দেখি-লাম ঠাকুরাণীর রংএর জোলুসে শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী সত্যি সত্যি নীল হইয়া গিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। বয়স হইয়াছে, চুলগুলি সব সাদা মানুষটিও ছোটখাটোই, তবু ও ইনিই যে এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের শেষ জ্যোতিঃ-শিখাটি তা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না! কথাবার্ত্তা সামান্যই হইল,—আলাপ পরিচয় মাত্র। গল্প জমাইতে গিয়া দেখিলাম, আমি বেচারী কোথাকার এক সাধারণ ঘরের ছেলে, মহাসম্ভ্রান্ত ডিঙ্গাবাড়ীর রায়চৌধুরাণীর সম্মুখে পড়িয়া গিয়াছি! খুঁটাইয়া আমার সংবাদ নিলেন, বাবার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতে দেখিলাম একটু স্নেহচ্ছায়া মুখে খেলিয়া গেল,—লিলির খবর নিলেন। সকলের মধ্যেই দেখিলাম একটা সম্ভ্রান্ত স্নেহ কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এই অন্তরঙ্গতায় সাহস পাইয়া যখনই তাঁর সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করিতে গেলাম অমনি দেখিতে পাইলাম তাঁর অতি সুন্দর দুর্ফাক কোমল সেকেলে চিবুকটি লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—আর তারই সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া আমার কৌতূহল শত টুকরায় ভাঙ্গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

বুঝিলাম—শিখিতে বাকী অনেক! যে নমনীয়তা থাকিলে এই হীনতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঠাকুরাণীর অন্তরঙ্গতায় পৌঁছা যায় তা আমার নাই। সুতরাং

ঠাকুরাণীকে অনেক সংবাদ দিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না জানিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বড়্‌দিও দেখিলাম বিশেষ কিছু জানে না! লিলি কিন্তু সারা রাস্তাই গুম্ হইয়া রহিল।

কিন্তু সেইদিন হইতেই উহাকে যেন ভূতে পাইল। সময়ে অসময়ে আসিয়া হাঁকিত—"চল ছোড়দা ডিঙ্গাবাড়ী"। আমি রাজী না হইলে একাই রওনা হইত। শেষটা আমারও পিছনে পিছনে ধাওয়া করা ছাড়া গতি থাকিত না। নেশায় শেষটা যেন আমাকেও পাইয়া বসিল। একদিন না গেলে মনে হইত দিনটা মিথ্যা কাটিতে যাইতেছে। অমনি দু ভাই বোনে ছুটিতাম ডিঙ্গাবাড়ী। অথচ কিইবা পাইতাম। হয়তো বা ভাঙ্গা বাড়ীটার মস্ত মস্ত পাথর বাঁধা আঙ্গিনায়, নয় তো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে, কখনও বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে, কখনো বা আমরা দুজনে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ঠাকুরাণীর দেখিলাম ভাঙ্গা বাড়ীর স্থায়ী বাসিন্দা গোক্ষুর সাপগুলির বাসস্থান ও গতিপথ পর্য্যন্ত মুখস্ত! নিজে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে সেইগুলি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেন মাত্র!

লিলি কিন্তু ক্রমে মহাপরাক্রান্ত ঠান্‌দিকে অনেকটা কাবু করিয়া আনিল। লিলির সঙ্গে সঙ্গে আমিও ক্রমে তাঁহাকে ঠান্‌দিই বলিতে আরম্ভ করিলাম! ঠান্‌দিও দেখিলাম আমাকে তাঁর অতীত যুগের প্রজাশ্রেণী হইতে আত্মীয়তে প্রমোশন দিয়াছেন! মাঝে মাঝে একটু আধটু গল্পগাছাও করেন। তবে খুব সাবধানে তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে হইত—কে জানে উনি রাজকুল এবং স্ত্রীলোক দুইই!

একদিন কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটিয়া গেল। ঠানদি লিলিকে বলিতেন 'লীলা,'—একদিন তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া কি এক কথার মাঝখানে ফস করিয়া বলিয়া বসিলেন—"ছাখ লীলা, মেয়েদের বুকের হাড়মাস যারা ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খায়, তাদের নাক থাকে লম্বা, বাজপাখীর ঠোঁটের মত বাঁকা। তারি দুপাশে চোখে কোমল চাহনীর ফাঁকে ফাঁকে খেলে আগুনের হলকা!"

কথাটাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত পাইয়া ঠান্‌দিকে একেবারে চাপিয়া ধরিলাম! ঠান্‌দিও সেদিন ভালো মেজাজে ছিলেন, সুতরাং গল্পটা শুনিতে পাইলাম।

বাহিরে তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে,—ফিরিবার পথ রীতিমত বিপদসঙ্কুল,—ডিঙ্গাবাড়ীর পোষা সাপগুলির অনেকগুলিরই চলিবার রাস্তা ওই সরু পথটি, তবু ঠানদির কাহিনী না শুনিয়া ফিরিবার কথা মনেও করিলাম না। ঠান্‌দি বলিয়া চলিলেন—

আজ আমি একা শ্মশান পাহারা দিচ্ছি, কিন্তু বুঝতেই পারছিস্ অল্পলোকের জন্যে এ বাড়ী তৈরী হয় নি। আমিও হা ঘরের মেয়ে নই—কিন্তু মোটে বারো বছর বয়সে এ বাড়ীতে যখন প্রথম পা দিই তখন এ বাড়ীর জৌলুসে আমিই চমকে গিয়েছিলুম! চার মহলাতে চৌদ্দটা দালান, তাদের ঘিরে ওই অতগুলি বাড়ী! সব এবাড়ীর চাকর, কর্ম্মচারী, পাইক লাঠিয়ালদের থাকবার ঘর বাড়ী। এবাড়ীর ধরণ ধারণও ছিল সব আমার বাপের বাড়ী থেকে আলাদা সুতরাং সব কিছুই আমার চোখে তখন আশ্চর্য্য লাগছিল। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছিলুম আমি তিন জনকে দেখে—আমার বিধবা শাশুড়ী, আমার স্বামী, আর তাঁরই জন্মের সঙ্গে ঠিক একদিনে এঁদের পিলখানায় জন্মেছিল একটা হাতী—নাম তার 'বাহাদুর'!

আমি আসার আগেই এ বাড়ীতে ভাঙ্গন ধরেছে! শ্বশুর নেই, সম্পত্তি সাতভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে। পিলখানায়ও এক বাহাদুর ছাড়া অন্য হাতী নেই। শাশুড়ী দিতে জান্‌তেন নিতে জান্‌তেন না, তাই তালুকের পর তালুক হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।

আমার শাশুড়ীর কথা বেশী বলব না। গল্পে তোরা রাজরাণীর কথা শুনিস, সে রাজরাণী তোরা কখনো চোখে দেখতে পাস্ নি, ওঁকে দেখলে তা দেখতে পেতিস! আর বাহাদুর? আমি কায়েত পাড়ার জমিদারের মেয়ে,—হাতী আমার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু বাহাদুরের মত হাতী আমিও আর দেখিনি। মস্ত, কালো, প্রকাণ্ড মাথা সর্দ্দার 'নও'। চলতো ও যেন সে বাড়ীর একটা ছেলে। তাকে কেউ বাঁধত না; ইচ্ছামত এসে অন্দরে ঢুকত বেরিয়ে যেত। শাশুড়ীর মুখে শুনেছি, ছোট থাকতে বাহাদুর এক একদিন তাঁর ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে খামোখা ছুট্ দিত! ঝি চাকর কাউকে গ্রাহ্য করত না! মাঝে মাঝে শাশুড়ী কান মলে দিতেন, আর বাহাদুর রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে থাকত! তখন তাকে আবার ছোট ছেলের মত ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াতে হত!

স্বামী তখন শিশু! তাঁকে দোলনায় শুইয়ে রাখা হত; চঞ্চল বাহাদুর শুঁড় দিয়ে শুড়্‌শুড়ি দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত! আমার এক দূর সম্পর্কের মামাস্ নাকি একদিন অতো ছোট ছেলের কাছে হাতীর বাচ্চাটাকে যেতে দিতে বারণ করেছিলেন; শ্বশুর তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলেছিলেন—"ডিঙ্গাবাড়ীর চৌধুরীদের হাতীতে মারে না ঠাকরুণ, হাতীতেও মনিব চেনে!"

আমি যখন প্রথম এদের বাড়ী এলুম, এই বাহাদুরই তখন প্রকাণ্ড দাঁতাল! ডাক সোয়ারী হাতী,—স্বামীর

ডাকে তার আগে কোন চাকর বা লাঠিয়ালও ছুটে আসতে পারত না! স্বামীর কথা এখন আর কিছু বলব না!

বিয়ের কয়েক দিন পরের কথা বলি,—আমার শাশুড়ী আমার হাত ধরে বললেন, "তোমার শ্বশুর কায়েতপাড়া নিমন্ত্রণে গিয়ে ছোট বেলা তোমাকে দেখেই একদিন পছন্দ করে এসেছিলেন; দেখছি তাঁর চোখ ছিল! তোমার বুদ্ধি আছে! তোমাকে বলি—ছেলেটা আমার বোকা, পাগল! কর্ত্তা গিয়েছেন, বুঝতে পাচ্ছি আমারও আর বেশী দেরী নেই; ওকে তোমার হাতে দিয়ে যাবো। আর দিয়ে যাবো বাহাদুরকে! ওটাকেও ছেলের আদরেই মানুষ করেছিলুম মা!"

সমুখের ওই ওদিককার দালানটার রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখলুম মুখটিপে হাসছেন, বাহাদুরের কালো শুঁড়ে হেলান দিয়ে। গনগনে আগুনের মত টকটকে ফেটে পড়া রং বাহাদুরের গায়ের কালো রং-এর মধ্যে যেন মেঘের কোলে বিদ্যুতের চমক দিচ্ছে। বাহাদুরও দেখলুম যেন চোখ আরও ছোট করে কান নাড়া নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিচ্ছে। লজ্জায় কোথায় মুখ লুকোবো ভেবে পেলুম না।

সতীলক্ষ্মী মিথ্যে বলেন নি, কিছুদিন পরই শাশুড়ী চলে গেলেন স্বর্গে, সমস্ত জমিদারীটা—আর তারও চাইতে বিশৃঙ্খল স্বামীটি পড়ল আমার ঘাড়ে।

ঠানদিদি একটু চুপ করিলেন। দেখিলাম, উচ্ছৃঙ্খল স্বামী, আর তাঁর বিশৃঙ্খল জমিদারী সায় সাক্ষাত সয়তান বাহাদুরের স্মৃতিতে তিনি ডুবিয়া পড়িয়াছেন। একটা কোমলতায় তাঁর সারা মুখ ভরিয়া উঠিয়া তাঁকে আবার কনে বউটি সাজাইয়া দিয়াছে।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"লীলা, ওই নাক লম্বা বাজপাখীর মত চোখওয়ালা পুরুষ মানুষের ধার খবদ্দার মাড়াবি নি। ওরা মেয়েদের বাঁদী করে তোলে। মাতাল,—মদের ঝোঁকে এক একদিন গায়ে হাত পর্য্যন্ত তুলেছে, তবু হিংসায় কোন ঝিকে পর্য্যন্ত ওর গা ছুঁতে দিই নি! নিজ হাতে তেল মাখিয়েছি, স্নান করিয়েছি, পাখা করে ঘুম পাড়িয়েছি। সব বুঝতে পারত আর মুচকি মুচকি বিদ্রূপের হাসি হাসত। আমার তো গা শুদ্ধ জ্বলে যেত।"

এইখানে লিলি বলিয়া বসিল "তোমার মুখটা কিন্তু ঠিক গা জ্বলে যাওয়ার মত লাগছে না ঠান্‌দি—"

ঠানদি ধমক দিয়া উঠিলেন—"থাম্ থাম্, কথা বলতে দে! তা কথাটা মিথ্যেও নয়! আজও এক একবার মনে হয়, যদি ও' আমার স্বামী নাও হত, তবু কুলে কালি দিয়েও বুঝি আমি ওই মাতালটার কাছেই চলে আসতুম! হাসচিস্? কি জানবি দিদি, আজকালকের মেয়ে তোরা, পুরুষ মানুষ কি! কী দুর্ভাবনা ওদের নিয়ে আমার এক একটা দিন গিয়েছে, আর যেন বুক থেকে এক একটা বোঝা নেবে গিয়েছে। মনে হয়েছে, যাক একটা দিন তো কাটল, বেঁচে রইল, বাঁচতে দিল! সঙ্গী ছিল মহিম সর্দ্দার, উসকে নিয়ে যেত আর আজ খুন, কাল খুন ওই করে করে বেড়াত। কত কি করে লোক লাগিয়ে টাকা ঢেলে আমি সে সব মেটাতুম! ও জানতোই না আইন বলে কিছু আছে! কতদিন যে কত ছলে ওকে ঘরে আটকে রেখেছি সে আমিই জানি। নিজের হাতে গেলাস গেলাস মদ ঢেলে দিয়েছি! তবু যদি বেহুঁস হয়ে ঘরে থাকে। কিন্তু সেদিন তো আটকাতে পারলুম না।

বলিতে বলিতে ঠানদিদি একটু চুপ করিয়া রহিলেন তার পর একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

চর মৈনপুরের আবাদী প্রজারা গোলমাল আরম্ভ করেছে,—ওরা ভিটেল প্রজা নয়,—জানি ওঁর কানে গেলে আর রক্ষা নেই, তাই ক'দিন শুধু মদ দেয়েছে মদ দিয়েছি। মহিম সর্দ্দারকে পাঠিয়েছি তাদের সায়েস্তা করতে।

দুপুর বেলা মহিম সর্দ্দার আর দুজন লাঠিয়ালের লাস বয়ে নিয়ে এল সঙ্গের অন্য লাঠিয়ালরা! সবাই গা মাথা রক্তগঙ্গা! মহিমের লাসের ওপর এসে বিলাপ করে আছাড় খেয়ে পড়ল মহিমের বউ ছেলেমেয়ে!

মদের ঘুম, না, মড়ার ঘুম! কিন্তু জানি না কেমন করে মড়ার কানেও সে কান্না গিয়ে পৌঁছল। অন্দরের আর সদরের মাঝে একটা বড় উঠান। সেই খানেই মহিমের লাস এনে, মাটিতে রেখেছে আমি আমলা আর লাঠিয়ালদের নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, চেয়ে দেখি টলতে টলতে উঠে এসেছে! তাকে দেখেই লাঠিয়ালরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেই থম্ মেরে গেল! ওকে দেখে আমি ঘোমটা টানতে যেতেই দেখি মহিমের ঢাল আর রাম-দাওটা কুড়িয়ে এনেছিল তার প্রধান সাগরেদ নিবিরাম—মহিমের পাশ থেকে তাই হাতে তুলে নিয়েছে, গর্জ্জে উঠেছে 'বাহাদুর!'

বাহাদুর যেখানেই যাক্ ওর ডাকের বাইরে যায় না! ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসল! পায়ের উপর গিয়ে পড়লুম—"ওগো তুমি যেয়ো না।" এই প্রথম আমায় কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল; মাথার ওপর যেন রাগে-কান্নায় মেশা বাজ ভেঙে উঠল,—"মহিম সর্দ্দার আমার মার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ রাঙ্গা বৌ!"

বলে বাহাদুরকে ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে ছুটল

পাগলের মত সব লাঠিয়াল। যাদের মাথা দিয়ে বুক বেয়ে রক্ত ঝরছে তারাও!

ছুটে বেরিয়ে এলুম পিছনে পিছনে সিং দরোজায়; চেয়ে দেখি মাঠের ওপর দিয়ে পাহাড়ের মতো কালো বাহাদুর তার শুঁড় উঁচিয়ে কান দুটো খাড়া করে, মাথা উঁচু করে ছুটেছে; তার পিঠে সোজা দাঁড়িয়ে আছে! ডান হাতে তার মহিম সর্দ্দারের রক্ত মাখা রামদাও, বাঁহাতে ঢাল। খালি গা, তারি ওপর রোদ পড়ে ঝক্ ঝক করে করে যেন জ্বলছে! পিছনে ছুটেছে লাঠিয়ালের দল!

ছুটে গিয়ে পড়লুম শ্বাশুড়ীর ঘরে! ঘরের পাথর বাঁধানো মেঝেয় মাথা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বল্‌তে লাগলুম—"দাঁদের গলায় মুক্তার হার দিয়েছিলি মা, রাখতে পারলুম না! মা গো তোর ধন তুই বাঁচা!"

সন্ধ্যায় রক্তে স্নান করে ফিরে এল! সংবাদ পেলুম আট দশটা মানুষ খুন করেছে, গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে তবে রাক্ষস ঠাণ্ডা হয়েছে।

তখনো ইংরাজের আইন আজকের মতো শেকড় গাড়েনি, তবু বুঝ্‌লুম আর রক্ষা নেই! উনিও দেখলুম কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন, দিন রাত মদ খাচ্ছেন আর ঘরে পড়ে রয়েছেন! এক একদিন গভীর রাত্রে বলে উঠতেন "একটা গাঁকে গাঁ পুড়িয়ে দিলুম তো, ছেলে পুলেগুলির পর্য্যন্ত মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই রাখিনি।" পুলিশ টুলিশ ওসব তিনি বড় জানতেনও না ওসব চিন্তাও তাঁর ছিল না!

থানা তখন চরভারাম। সেখান থেকে সংবাদ সদরে যেতে, সদর থেকে আস্‌তে যা কয়দিন গেল, তার পরই এক দিন বাড়ীতে এ'ল অসংখ্য পুলিশ।

স্বামী হুকুম দিলেন—"সব ভাগিয়ে দাও!"

আজও আমি তাঁর মুখের চেহারা ভুলব না যখন তিনি দেখলেন তাঁর একটি লাঠিয়ালও তাঁর হুকুম তামিল করবার জন্ম দাঁড়াল না! স্বামীর হুকুমে তারা যমের মুখে যেতে পারতো কিন্তু ইংরাজের আইনের সম্মুখে তারা অপদার্থ হয়ে পড়ল!

দল বেঁধে এসে পুলিশ অন্দর মহলে ঢুকল, কেউ বাধা দিতে সাহস করল না! লাল পাগড়ীওয়ালাদের আগে আগে এল একজন সাদা সাহেব। সে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করল তাঁকে সদরে যেতে হবে নয়তো বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে! সে কী বিস্মিত মুখের ছবি তাঁর! লাফিয়ে নিতে গেলেন দেওয়ালে ঝুলানো তাঁর তলোয়ার। সেই সাহেবটা আর ৮।১০ দশ জন লালপাগড়ী হিন্দুস্থানী তাঁকে ধরে ফেলল! বিস্ময়ে তিনি ভালো করে বাধা পর্য্যন্ত দিতে পার্লেন না! শুধু দেখলুম কি এক রকম দুঃখে তাঁর মস্ত বুকটা যেন ফুলে ফুলে উঠেছে, চোখে তাঁর জল!

তখনো তিনি একটু একটু জোর করছেন আর লোকগুলি তাঁর গায়ে আঘাত করছে! আর সহ্য হোলো না, দু হাতে চোখ ঢেকে চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—'বাহাদুর'।

আমাদের দিনে দেওরকে ও নাম ধরে ডাক্‌ত না। বাহাদুরকেও দ্যাওর মানতুম কিন্তু বাহাদুর আমার গলার স্বর চিন্‌তো। সেও বোধ হয় কোথাও দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল বিনা বাধায় চৌধুরীবাড়ীর অন্দরমহলে দলবেঁধে লোকে ঢুক্‌ছে। আমার চীৎকার শুনে সারাবাড়ী কাঁপিয়ে ছুটে এ'ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

দুহাত দিয়ে চোখ বন্ধ করেছিলুম ওর গায়ের আঘাত দেখব না বলে। এইবার চেয়ে দেখি বাহাদুর সাহেবকে পায়ের নীচে ফেলে থেঁতলে মারছে, সঙ্গের লোকগুলাকে ছুড়ে ছুড়ে কোথায় ফেলে দিয়েছে, বাকী সব কে কোথায় পালিয়েছে ঠিক নেই!

ছুটে গিয়ে ওঁকে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ থেকে জল অঝোরে ঝরতে লাগল আমার মাথায়! আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌তে লাগলেন—"আজ বড় মুখ রেখেছ রাঙ্গা বৌ, ডিঙ্গাবাড়ীর চৌধুরী বংশের মান বাঁচিয়েছ! চৌধুরী বাড়ীর বৌ'র উপযুক্ত কাজ করেছ!"

কতক্ষণ পর আবার বল্লেন, "তবু আমি বুঝতে পেরেছি বৌ এখানেই এর শেষ নয়। আমি চল্লুম! বাহাদুরকেও নিয়ে যাবো। আর এক রকমের দিন এসেছে, বেঁচে থাক্‌লে বাহাদুরকেও বোঝা টানতে হবে। যদ্দিন পারো ডিঙ্গাবাড়ীর চৌধুরীদের ভিটায় প্রদীপ জালিও!"

ভাবলুম, মরুক জংলীবাঘ খোলা আকাশের নীচে। গরাদের মধ্যে আটকা পড়ে পরের বিচারে ফাঁসী লটকে মরবে কেন!

গলায় আঁচল দিয়ে শেষ প্রণামটা করলুম, আজও হাজার বার সেই জায়গাটায় কপাল ঠুক্‌তে ঠুকতে বলি ঠাকুরকে, তখন ওর পা দুটীর কাছে আমি ম'লাম না কেন!'

দেখিলাম এইবার পাথর ফাটিয়াছে। ঝর ঝর করিয়া ঠানদির গাল দুটি বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে!

অনেকক্ষণ পর চোখ দুটী মুছিয়া, ধরা গলায় ঠানদি বলিয়া চলিলেন—বাহাদুর হাঁটুগেড়ে বসেচে, ঠাকুর প্রণাম করে উনি তার পিঠে চড়লেন, দেখি একটু দূরে তখনো দাঁড়িয়ে আছেন ছেলেবয়সী একজন দারোগা! আর সবার মত পালান নি,—চোখে তাঁর জল!

বাহাদুর উঠে দাঁড়াতেই স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "কাউরাইতের গাঙের বড় পাক!"

স্বামী একটু হাসলেন তারপরই আমার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন!

ঠানদি চুপ করিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন তারপর বলিলেন,—"এই দারোগাটি ছিলেন তোমার বাবা! পরেও পুলিশের হাঙ্গামায় নতবার তিনি অসম্মান থেকে বাঁচিয়েছেন, কিন্তু সেদিন এর চেয়ে বড় বন্ধুর কাজ আর কেউ করতে পারতো না! কাউরাইতের গাঙের বড় ঘূরণপাক ছাড়া ওঁকে আর বাহাদুরকে এক সঙ্গে ডুবিয়ে মারে এমন নদী তখন দেশে আর ছিল না! আজও সেই দিনটিতে আমি কাউরাইতের গাঙে গঙ্গাস্নান করে আসি। ওঁর দুঃখ রাখিনি লীলা, তালুক বিক্রী করে মৈনপুর গাঁও আমি আবার গড়িয়ে দিয়েছি! তাঁর লাঠিয়ালদের জেল থেকে বাঁচাতে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আজ মৈনপুরের খাজনায় আমার দিন চলে!"

* * *

সেদিন অনেক রাতে একটা কেরোসিনের প্রদীপ হাতে লইয়া ঠাকুরাণী অন্ধকার পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীর ভাঙ্গা সিংদরোজা পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের আগাইয়া দিলেন। গাঁয়ের সম্মুখে মাঠের পথ ধরিয়া বহুদূর আসিয়াও ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম উঁহাকে আর দেখা যায় না কিন্তু ভাঙ্গা ভিটাবাড়ীর জমাট অন্ধকারের বুকে টিম্ টিম্ করিয়া তখনো জ্বলিতেছে একটি অনির্ব্বাণ ক্ষুদ্র দীপশিখা!

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী

নানাকথা

সুভাষচন্দ্রের দণ্ড

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত দুইটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় গত ৯ই জুলাই ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রতিবাদ সভার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিচারে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, এবং বর্ত্তমান আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি উক্ত সমিতিতে অথবা আর যে কোনো কংগ্রেস সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য পদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তিন বৎসরের জন্য সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি উক্ত ৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ অনুষ্ঠানের দ্বারা বোম্বাইয়ে গৃহীত প্রস্তাব দুটির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের আত্ম-সমর্থন এই ছিল যে, তিনি প্রস্তাব দুটির লঙ্ঘন করেন নাই, অথবা লঙ্ঘন করিবার জন্য অনুরোধও করেন নাই; শুধু প্রস্তাব দুইটি অবাঞ্ছনীয় অতএব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশন বাতিল হইবার যোগ্য, সুতরাং পুনর্ব্বিচার কাল পর্য্যন্ত প্রস্তাব দুইটিকে অক্রিয় রাখা হয়।

শুধু সুভাষ বাবুরই নহে, বহু মান্য গণ্য কংগ্রেসী এবং অ-কংগ্রেসী ব্যক্তিরও যে এই মত তাহা সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। যেরূপেই হউক, সুভাষ বাবুর অভিযুক্ত আচরণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ নহে, এ বিষয়ে একটা প্রবল মতদ্বৈধ ছিল এবং আছে। সুভাষ বাবু একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী, পদ মর্য্যাদার তালিকায় অন্ততঃ তৃতীয় ব্যক্তি ত নিশ্চয়ই। তিনি একজন ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি। এ বৎসরও প্রবল মতাধিক্যের বলে দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সকল সত্যের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রকে সুদীর্ঘ কালের জন্য দণ্ডিত করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি গুরুতর অবিচার করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা তাঁহারা সুভাষ বাবুর প্রতি তাঁহাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। পদমর্য্যাদা সম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুধু আইন রক্ষা অনুরোধে যখন দণ্ড নির্দ্ধারণ করিতে হয় তখন সাধারণতঃ একটা নাম মাত্র দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে এক টাকা অর্থ দণ্ড, অথবা আদালতের দৈনন্দিন কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকার মত নাম মাত্র দণ্ডবিধির কথা সকলেরই জানা আছে। ওয়ার্কিং কমিটি সেইরূপে নাম মাত্র দণ্ডে সুভাষ বাবুকে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। তাহাতে সাপও মরিত লাঠিও ভাঙ্গিত না। এবং তাহাতে কণ্টকোদ্ধার হইত না। গান্ধীজি, যে কিছু দিন হইতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে দেশ এখনও অহিংস হয় নাই—তাহা দেখিতেছি নিতান্ত মিথ্যা নয়!

রাজবন্দীগণের অনশন ত্যাগ

রাজবন্দীগণ দুই মাসের জন্য অনশন ত্যাগ করায় সমস্ত

দেশ একটা বিষম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। এই অনশন ভঙ্গের জন্য অনশন ব্রতীগণকে সম্মত করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি বাংলা গভর্মেণ্ট দুই মাসের মধ্যে সকল রাজবন্দীকেই মুক্তি দিবেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—

বিশ্বভারতীর গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের যে বিবৃতি পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। এই সংবাদে আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্য ও কাব্য রচনার এরূপ সম্পূর্ণ ও সচিত্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নাই।

"শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারা স্বভাবতই তাঁহার জীবনের ধারার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নূতন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা নব নব রূপে নানা বাঁকে মোড় ফিরিয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে বালক কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্ব্বের মধ্য দিয়া তাঁহার কবি জীবনের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে পারিলেই কবির রচনার আদর্শ প্রস্ফুট হইয়া ওঠে এবং তাঁহার জীবনের মূল্য সত্যটিকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। কবির সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

"এই উদ্দেশ্য লইয়া বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে, তাঁহার সমগ্র বাংলা রচনা একত্র করিয়া ধারাবাহিক ভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সংকল্প করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন অনুসারেই এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

"রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি সাধারণ ও একটি শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে—যথা: (১) কবিতা ও গান (২) উপন্যাস ও গল্প; (৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবিধ প্রবন্ধ। রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত প্রথম খণ্ড আগামী আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং প্রতি দুই অথবা তিন মাস অন্তর একটি করিয়া খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এইরূপ প্রায় পঁচিশটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্রে গ্রথিত হইবে। প্রতিখণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৬০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং কাগজ ও বাঁধাইয়ের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইবে ৪॥০, ৫॥০, ৬॥০, টাকা; রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ও শোভন কাগজে মুদ্রিত পরিমিত সংখ্যক চামড়ায় বাঁধাই প্রতিখণ্ডের দাম হইবে ১০৲ টাকা।

"রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি বিশেষ অকর্ষণ হইবে ইহার চিত্রসম্ভার। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের অপ্রকাশিতপূর্ব নানা ফটোগ্রাফ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃত ও পুস্তক চিত্রণ, রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং কবির অঙ্কিত চিত্রও থাকিবে।"

ভাদ্র পূর্ণিমায় বৈদ্যনাথ দর্শন

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার সময়ে বৈদ্যনাথধামে পুণ্যকামী বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই সময়ে এখানে একটি মেলা বসে, এবং শ্রীবৈদ্যনাথ দর্শন করিবার ও পূজাদি দিবার ইহা একটি অতিশয় প্রশস্ত কাল বলিয়া কথিত আছে। এ বৎসর আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর এই সময় পড়িয়াছে।

আমরা অবগত হইয়া সুখী হইলাম যে, ই, আই, রেল-ওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে সপ্তাহান্ত (week-end) টিকিটের মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়া যাত্রীগণের বৈদ্যনাথ দর্শনের সুবিধা বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ডাল-হ্রদ—কাশ্মীর।

বিচিত্রা

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৪৬	২য় সংখ্যা

তোমার পানে

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অন্ধ গভীর গহন রাতির দুঃখ অবশেষে,
পল্লবে মোর একটি কবে উঠবে পুষ্প হেসে ;
পাপড়িগুলি থাকবে ঘেরা সবুজ পাতার সাথে,
নমস্কারের অঞ্জলিতে দেব তোমার হাতে।

ফুটব আমি নীল আকাশে একটি শুধু তারা,
চাইব শুধু তোমার পানে হব-আপনহারা,
আসব আমি গগন থেকে লক্ষ যোজন ছুটি,
পড়ব আমি পায়ের তলে নীরব হয়ে লুটি।

সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যখন বসবে সোনার খাটে,
ঘনিয়ে আসবে ছায়ার আঁচল গাঁয়ের নিঝুম বাটে ;
তোমার দ্বারে দেব আমার প্রদীপটুকু জ্বালি,
এই জীবনের যেটুকু তেল সকল দেব ঢালি।

গহন বনের গভীর ছায়া আসবে যখন নেমে
ঘুমে যখন আসবে সকল প্রাণের ধারা থেমে,
সেই ঘুমেতে দেখব আমি শুধু তোমার হাসি,
দেখব শুধু একটি স্বপন তোমায় ভালবাসি।

দুঃখ সুখ আর সংশয়েতে জনম যত ভয়,
একটি রসের আলিঙ্গনে পায় যেন সব লয়।
সেই রসেরি আনন্দেতে ছন্দ যাব গেঁথে,
বুকে পাতা আসনখানি দেব তোমায় পেতে।

নাজানা এই রহস্যেরি মহান্ পারাপারে
ভয় তুফানে তলিয়ে যাব গভীর অন্ধকারে,
সেখান থেকে একটি করে মুক্তা এনে তুলে,
দেব আমি অর্ঘ্য করে তোমার চরণমূলে।

এই জীবনের সকল দুঃখ সকল ভালবাসা
এই জীবনে দেখেছি যা, যা কিছু মোর আশা,
সকল আমি পূর্ণ করে তুলব একটি গানে,
ছুটবে সে তার সুরের হাওয়ায়
শুধু তোমার পানে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সন্ন্যাস ও ত্যাগ*

শ্রীঅরবিন্দ

গীতায় দিব্য গুরু তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া, তাঁহার চরম কথাটি, তাঁহার বাণীর নিগূঢ়তম মর্ম্মটি শেষে কয়েকটি অপূর্ব্ব শক্তিপূর্ণ শব্দে এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যেন তাহা শিষ্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উদারতম অধ্যাত্ম উপলব্ধি আনিয়া দেয়। আর আমরা দেখিতে পাই যে, এই অসন্দিগ্ধ, শেষ ও চূড়ান্ত কথাটি এ-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে কেবল তাহারই সার সংগ্রহ নহে, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সাধনাটির এবং এই সমস্ত প্রযত্ন ও তপস্যার ফলে যে মহত্তর অধ্যাত্ম চৈতন্য অধিগত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নহে ; ইহা যেন আরও দূরে প্রসারিত হইয়া যায়, প্রত্যেক সীমা ও বিধি, নীতি ও সূত্র লঙ্ঘন করে, এবং এমন এক উদার ও সীমাহীন অধ্যাত্ম সত্যের দ্বার খুলিয়া দেয় যাহার মধ্যে অনন্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। আর এইটিই হইতেছে গীতার শিক্ষার গভীরতার, সুদূর প্রসারতার এবং ভাব-মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যের কতকগুলি মহান ও প্রয়োজনীয় দিককে ধরিতে পারিলে এবং সে-সবকে ব্যবহারোপযোগী মতবাদ ও উপদেশে, পদ্ধতি ও সাধনায় পরিণত করিয়া মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন পরিচালনায় সাহায্য করিতে পারিলে এবং তাহার কর্ম্মের নীতি ও স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিলেই সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষা বা দর্শনশাস্ত্র সন্তুষ্ট হয় ; তাহা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় না, নিজের পদ্ধতির বাহিরে কোন দ্বার খুলিয়া দেয় না, আমাদিগকে কোন প্রশস্ততম মুক্তি এবং উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে লইয়া যায় না। এইরূপ সীমাবধারণ লাভজনক, বস্তুতঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহা অপরিহার্য্য। মানুষ তাহার মন ও ইচ্ছার দ্বারা আবদ্ধ, তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম নির্ব্বাচনের জন্য তাহার পক্ষে একটা নীতি ও বিধান, একটা বাঁধাধরা পদ্ধতি একটা নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসক্রমের প্রয়োজন আছে ; সে চায় একটিমাত্র অভ্রান্ত সুনির্ম্মিত পথ, বেড়া দিয়া ঘেরা, সুদৃঢ়, তাহার উপর যেন নিরাপদে পা ফেলিয়া চলা যায়, সে চায় সীমাবদ্ধ দিক্‌চক্র এবং পরিবৃত বিশ্রাম স্থল। অতি অল্প সংখ্যক শক্তিমান ব্যক্তিই মুক্তির ভিতর দিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অথচ মন যে-সব ধারণা ও সংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা লইয়া তৃপ্ত রহিয়াছে, পরিচ্ছিন্ন সুখলাভ করিতেছে, মুক্তজীবকে পরিশেষে তাহাদের বাহিরে যাইতেই হইবে। যে সোপান বাহিয়া আমরা ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছি সেইটিকে ছাড়াইয়া উঠা ; উচ্চতম ধাপে গিয়াও থামিয়া না যাওয়া, পরন্তু আত্মার উদার প্রসারতার মধ্যে মুক্ত পদে অবাধে বিচরণ করা—আমাদের সংসিদ্ধি লাভের জন্য এই-রূপ বিমুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে ; আত্মার পূর্ণতম স্বাধীনতাই হইতেছে আমাদের সিদ্ধতম অবস্থা। আর গীতা এইভাবেই আমাদিগকে পথ দেখাইয়াছে ; উহা এক মহান ধর্ম্ম দিয়াছে, ঊর্দ্ধে উঠিবার এক সুদৃঢ় ও নিশ্চিত অথচ সেই সঙ্গেই অতি প্রশস্ত সিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে এবং তাহার পর আমাদিগকে সকল ধর্ম্মের উপরে, যাহা কিছু নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে সে-সবের উপরে অসীম-উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া গিয়াছে, আমাদের সম্মুখে পরমতম অধ্যাত্ম মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক পরমতম সিদ্ধির আশা প্রকট করিয়াছে, তাহার রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে, এবং সেই রহস্যই হইতেছে গীতা যাহাকে তাহার পরমতম বাক্য বলিয়াছে তাহার সারবস্তু, সেইটিই হইতেছে গুহ্যতমম্‌, সেইটিই অন্তরতম জ্ঞান।

আর প্রথমেই গীতা তাহার বাণীটি মোটামুটি পুনরায় বিবৃত করিয়াছে। পনেরোটি শ্লোকের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সমগ্র পরিকল্পনা ও মর্ম্মটি সংক্ষেপে ধরিয়া দিয়াছে, এই

*গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় ৪৯—৬৩

ছত্রগুলির বাক্য ও অর্থ হইতেছে সংক্ষিপ্ত ও সংহত, বিষয় বস্তুর কোন সার অংশই এখানে বাদ যায় নাই, সবই অতি স্বচ্ছ যাথার্থ্য ও প্রাঞ্জলতার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব সেগুলিকে যত্নের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে, কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, গীতার নিজের মতে যেটি হইতেছে তাহার শিক্ষার মূল অর্থ এখানে সেইটিরই সারোদ্ধার করা হইয়াছে। যে কথাটি লইয়া গীতা প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের কর্ম্মের প্রহেলিকা, সংসারে কাজ করিতে থাকা অথচ সেই সময়েই উচ্চতম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা যে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়—এখানেও সেই সমস্যাটি লইয়াই বিবৃতিটি আরম্ভ হইয়াছে। সহজতম পন্থা হইতেছে ঐ সমস্যাটিকে অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, যখনই আমরা সংসাররূপ ফাঁদের মধ্য হইতে অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে উঠিতে পারি তখনই জীবন ও কর্ম্মকে মিথ্যা মায়া বলিয়া অথবা সৃষ্টির একটা নিম্নতম প্রক্রিয়া বলিয়া পরিত্যাগ করা। এইটিই হইতেছে সন্ন্যাসীদের সমাধান, তবে ইহাকে সমাধান বলা যায় কি-না তাহা বিবেচ্য; যাহা হউক এইটি ঐ প্রহেলিকা হইতে উদ্ধার হইবার একটি নিশ্চিত ও সফল পন্থা, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার যেটি উচ্চতম ও সমধিক ধ্যানশীল ধারা সেইটি যখন তাহার প্রথম উদার ও মুক্তসমন্বয় ছাড়িয়া একদিকে তীব্রভাবে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে উহা এই পন্থাটির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে এবং সর্ব্বদা উত্তরোত্তর এইটিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। গীতা তন্ত্র এবং কোন কোন দিকে পরবর্ত্তী ধর্ম্ম আন্দোলনগুলির মত প্রাচীন সমন্বয়টি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে; সেই আদি সমন্বয়ের সার ও ভিত্তিটি গীতা বজায় রাখিয়াছে কিন্তু তাহার বাহ্য আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ক্রমবিকশিত অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। উচ্চতম সত্তায় ও আত্মায় মানুষের যে আভ্যন্তরীণ জীবন তাহার সহিত পূর্ণ কর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য করার কঠিন সমস্যা গীতার শিক্ষা এড়াইয়া যায় নাই; ইহার মতে যেটি প্রকৃত সমাধান সেইটিই উপস্থিত করিয়াছে। জীবন সন্ন্যাসের দ্বারা সন্ন্যাসের নিজ উদ্দেশ্যটি যে বেশ সাধিত হইতে পারে, গীতা তাহা আদৌ অস্বীকার করে নাই, কিন্তু গীতা দেখিয়াছে যে, উহা সমস্যাটির গ্রন্থিটিকে খুলিয়া না দিয়া কাটিয়া ফেলে, অতএব গীতা এই প্রণালীটিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াছে এবং নিজেরটিকেই উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়াছে। দুই পন্থাই আমাদিগকে মানুষের নিম্নতম অজ্ঞান সাধারণ প্রকৃতি হইতে তুলিয়া শুদ্ধ অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে লইয়া যায় এবং এই পর্য্যন্ত দুইটিকেই ন্যায়-সঙ্গত, এমন কি মূলতঃ এক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে একটি থামিয়া গিয়াছে, পশ্চাদবর্ত্তন করিয়াছে, অপরটি সেখানে অবিচল সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সমুচ্চ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছে, অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে একটা দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, মানুষের মধ্যে ভগবানকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং আত্মার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

আর সেইজন্যই প্রথম পাঁচটি শ্লোকে গীতা তাহার বক্তব্যটিকে এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে যাহা আভ্যন্তরীন ত্যাগের পন্থা এবং বাহ্য ত্যাগের পন্থা উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ এমন ভাবে উহা করিয়াছে যে, উহাদের কয়েকটি সাধারণ কথার একটা গভীরতর এবং অধিকতর অন্তর্মুখী অর্থ গ্রহণ করিলেই গীতা যে প্রণালীটি অনুমোদন করিয়াছে তাহারই ভাব ও মর্ম্মটি পাওয়া যায়। মানবীয় কর্ম্মের সমস্যাটি হইতেছে এই যে, মনে হয় মানুষের অন্তর্পুরুষ ও প্রকৃতির নিয়তিই হইতেছে নানা প্রকার বন্ধনের অধীন থাকা—অজ্ঞানের কারা, অহংয়ের জটিল পাশ, রিপুগণের শৃঙ্খল, উপস্থিত জীবনের নির্ব্বন্ধপর দাবী, এমন একটা অন্ধকার ও সীমাবদ্ধ গণ্ডী যাহা হইতে বাহির হইবার কোন পথই নাই। কর্ম্মের এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবের কোনই স্বাধীনতা নাই, তাহার আত্মাকে আবিষ্কার করিবার এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য, সংশয়ের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিবার উপযোগী কোন অবসর বা আত্মজ্ঞানের আলোক নাই। তাহার কর্ম্মপর ব্যক্তিত্ব এবং ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে সে তাহার সত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে সে পূর্ব্বোক্ত সেসব আদর্শ

দাঁড় করাইতে পারে সে-সব এত বেশী সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক যে তাহাদের সাহায্যে তাহার নিজস্ব সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানের সূত্র পাওয়া যায় না। তাহার সক্রিয় প্রকৃতির সনির্ব্বন্ধ আহ্বানে তন্ময় হইয়া যে সে পুনঃ পুনঃ বাহিরের দিকেই যাইতে বাধ্য হইবে তখন সে কেমন করিয়া তাহার প্রকৃত সত্তা ও অধ্যাত্ম জীবনে ফিরিয়া যাইবে? সন্ন্যাসীর ত্যাগের পন্থা এবং গীতার পন্থা উভয়েই এ-বিষয়ে এক যে, প্রথমেই তাহাকে এই তন্ময়তা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার বাহ্য জিনিষের জন্য বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষকে সক্রিয় প্রকৃতি হইতে পৃথক করিতে হইবে; তাহাকে নিশ্চল আত্মার সহিত একাত্ম হইতে হইবে এবং নীরবতার মধ্যে বাস করিতে হইবে। তাহাকে এক আভ্যন্তরীণ কর্ম্মশূন্যতায়, নৈষ্কর্ম্ম্যে, উপনীত হইতে হইবে। এইজন্য এই যে মুক্তিপ্রদ আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা এইটিকেই গীতা এখানে তাহার যোগের প্রথম লক্ষ্য বলিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এইটিই হইতেছে সেই যোগের প্রথম প্রয়োজনীয় সিদ্ধি। "যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে আসক্তি-রহিত, আত্মা স্ববশ এবং বাসনাশূন্য, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন।"*

এই যে সন্ন্যাসের আদর্শ, আত্ম-জয় হইতে লব্ধ নীরবতা, অধ্যাত্ম নিশ্চেষ্টতা এবং কামনাশূন্যতার আদর্শ—ইহা সকল প্রাচীন জ্ঞানেই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা আমাদিগকে ইহার মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তিটি অতুলনীয় পূর্ণতা ও স্পষ্টতার সহিত প্রদান করিয়াছে। আর ইহা নির্ভর করিতেছে আত্মজ্ঞান-সন্ধিৎসু সকল সাধকের এই সাধারণ অনুভূতির উপর যে, আমাদের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি রহিয়াছে, যেন দুইটি বিভিন্ন আত্মাই রহিয়াছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানসিক, প্রাণিক, ও ভৌতিক প্রকৃতি লইয়াই নিম্নতর আত্মা, ইহার চৈতন্যের মূল উপাদান, বিশেষতঃ জড় পদার্থ লইয়া ইহার যে আধার তাহা অজ্ঞান ও জড়তার অধীন; জীবনের শক্তিতে ইহা অবশ্য কর্ম্মিষ্ঠ ও প্রাণময়, কিন্তু ইহার কর্ম্মে স্বাভাবিক আত্মবশ্যতা ও আত্মজ্ঞান নাই; মনের মধ্যে আসিয়া ইহা কিছু জ্ঞান ও সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাও কষ্টকর প্রয়াসের দ্বারা, নিজেরই অক্ষমতা সমূহের সহিত নিত্য দ্বন্দ্বের দ্বারা। আর রহিয়াছে আমাদের অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া উচ্চতর প্রকৃতি ও আত্মা, তাহা আত্মবশ ও স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানসক্ষেত্রে তাহা আমাদের অনুভূতির অতীত। কখন কখনও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত এই মহত্তর বস্তুটির ইঙ্গিত পাই, কিন্তু আমরা সজ্ঞানে ইহার মধ্যে বাস করি না, ইহার জ্ঞান এবং শান্তি ও অপরিচ্ছন্ন জ্যোতির মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি না। এই দুইটি অতি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রথমটি হইতেছে গীতার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। ইহা নিজেকে দেখে অহংভাবের কেন্দ্র হইতে, ইহার কর্ম্মের নীতি হইতেছে অহং হইতে জাত বাসনা, এবং অহংয়ের গ্রন্থি হইতেছে মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের প্রতি আসক্তি, এবং প্রাণের বাসনা সমূহের প্রতি আসক্তি। এই সকল জিনিষের অপরিহার্য্য পরিণাম হইতেছে বন্ধন, নীচের প্রকৃতির স্থায়ী দাসত্ব, আত্মজয়ের অভাব, আত্মজ্ঞানের অভাব। অন্য মহত্তর শক্তি ও সত্তাটি হইতেছে অহংয়ের অতীত শুদ্ধ আত্মার প্রকৃতি ও সত্তা, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে এই শুদ্ধ আত্মাকেই নির্গুণ, নিব্যক্তিক ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মূলতঃ ইহা হইতেছে এক অনন্ত নিব্যক্তিক সত্তা, তাহা সকলের মধ্যেই এক ও অভিন্ন; আর যেহেতু এই নিব্যক্তিক সত্তা অহংবর্জ্জিত, গুণ-উপাধি বর্জ্জিত, বাসনা, প্রয়োজন ও অনুপ্রেরণা বর্জ্জিত, সেহেতু ইহা নিশ্চল ও অক্ষর; চিরকাল একই,—ইহা বিশ্বকর্ম্মের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ও ভর্ত্তা, কিন্তু তাহাতে যোগ দেয় না, প্রবর্ত্তক হয় না। জীব যখন নিজেকে সক্রিয় প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দেয় তখন সে হয় গীতার ক্ষর, গীতার সচল ও পরিবর্ত্তনশীল পুরুষ, সেই একই জীব যখন নিজেকে সম্বৃত করিয়া শুদ্ধ নীরব নিশ্চল আত্মা ও মূল সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে হয় গীতার অক্ষর, গীতার নিশ্চল ও অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষ।

তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, সক্রিয় প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন হইতে উদ্ধার হইবার এবং অধ্যাত্ম মুক্তিতে ফিরিয়া যাইবার সরল ও সহজতম পন্থা হইতেছে অজ্ঞানের কর্ম্ম-

* অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥১৮।৪৯

পরতার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ রহিয়াছে সে-সবকে বর্জ্জন করা, অন্তঃপুরুষকে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তায় পরিণত করা। এইটিকেই বলা হয় ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্ম-ভূয় *। ইহা হইতেছে, মন প্রাণ ও দেহ লইয়া যে নিম্নতন জীবন তাহা বর্জ্জন করা এবং শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা হইয়া উঠা। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে বুদ্ধির দ্বারা, এই বুদ্ধিই হইতেছে বর্ত্তমানে আমাদের উচ্চতম তত্ত্ব। ইহাকে নিম্নতন জীবনের সকল জিনিষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে, আর প্রথমে ও মুখ্যতঃ জীবনের মূল গ্রন্থি স্বরূপ বাসনা হইতে মন ও ইন্দ্রিয় যে সকল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহাদের প্রতি আসক্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে ‡। মানুষকে হইতে হইবে সর্ব্বত্র অসক্ত বুদ্ধি †। তখন নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মা হইতে সমস্ত বাসনা দূর হইয়া যায়, আত্মা হয় বিগত-স্পৃহ। তাহার ফলে আমাদের নিম্নতন সত্তার উপর আধিপত্য এবং আমাদের উর্দ্ধতন সত্তায় প্রতিষ্ঠা আইসে বা সম্ভব হয়। সে প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আত্মজয়ের উপর, তাহা সুদৃঢ় হয় আমাদের সকল প্রকৃতির উপর পূর্ণ জয় ও আধিপত্য হইতে। আর এই সবেরই অর্থ হইতেছে, অন্তর হইতে বিষয় বাসনা নিঃশেষে বর্জ্জন, সন্ন্যাস। বর্জ্জনই হইতেছে এই সিদ্ধিলাভের পন্থা, আর যে-মানব এইরূপ আভ্যন্তরীণভাবে সব কিছু বর্জ্জন করিয়াছে, গীতা তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু যে-হেতু ঐ কথাটি সাধারণতঃ বাহ্য সন্ন্যাসও বুঝায়, অথবা কখনো কখনো শুধু তাহাই বুঝায়, সেইজন্য গুরু আভ্যন্তরীন বর্জ্জনের সহিত বাহ্য বর্জ্জনের প্রভেদ করিতে "ত্যাগ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা ত্যাগ উৎকৃষ্টতর। সন্ন্যাসমার্গ ক্রিয়াত্মিক। প্রকৃতি হইতে প্রত্যাহারে আরও অনেক বেশীদূর অগ্রসর হয়। ইহা বর্জ্জনের জন্যই বর্জ্জন করিতে আনন্দ পায় এবং বাহ্যভাবে জীবন ও কর্ম্মত্যাগের উপর জোর দেয়, আত্মা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার উপর জোর দেয়। ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছে যে, যতদিন আমরা শরীরের মধ্যে বাস করিতেছি ততদিন ইহা সম্পূর্ণ-ভাবে করা সম্ভব নহে। যতদূর সম্ভব ইহা করা যাইতে পারে, কিন্তু এইভাবে জোর করিয়া কর্ম্মকে খুব কমাইয়া দেওয়া অপরিহার্য্য নহে, এমন কি ইহা বস্তুতঃ পক্ষে, অন্ততঃ সাধারণতঃ সমীচীনও নহে, একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা, গীতা নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে ইহার অধিক আর কিছুই বুঝে নাই।

যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন এই অবশেষ রাখা, যখন শুদ্ধ আত্মা হওয়াই আমাদের লক্ষ্য এবং শুদ্ধ আত্মাকে নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে তখন সক্রিয়-তার উপর এই পক্ষপাতিত্ব কিসের জন্য। তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদই আমাদের অধ্যাত্ম মুক্তির সমগ্র তত্ত্ব নহে। পুরুষ এবং প্রকৃতি পরিশেষে একই বস্তু; পূর্ণ ও সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে পুরুষের মধ্যে ভগবান এবং প্রকৃতির মধ্যে ভগবান—সবেরই সহিত এক করিয়া দেয়। বস্তুতঃ এই যে ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্মভূয়—ইহাই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে কেবল আরও মহত্তর ও আশ্চর্য্যতর ভাগবত জীবনের (মদ্ভাব) জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল ভিত্তি। আর সেই মহত্তর অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মায় নিশ্চল হইতে হইবে, আমাদের সকল অংশে নিস্তব্ধ হইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদিগকে প্রকৃতিতে, আত্মার সত্য ও সমুচ্চ শক্তিতে কর্ম্ম করিতে হইবে। আর যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বিপরীত বলিয়া মনে হয় এমন দুইটি জিনিষ যুগপৎ কেমন করিয়া সম্ভব; তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম সত্তার এইটিই হইতেছে প্রকৃত স্বরূপ; সকল সময়ে তাহার মধ্যে অনন্তের এই দুইমুখী ভাব রহিয়াছে নির্ব্যক্তিক সত্তা নিঃশব্দ; আমাদিগকেও হইতে হইবে আভ্যন্তরীণভাবে নিঃশব্দ, নির্ব্যক্তিক,—আত্মার

* অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৮।৫৩

‡ বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥১৮।৫১

† অসক্ত বুদ্ধি সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥১৮।৪৯

মধ্যে সমাহিত। নির্ব্যক্তিক সত্তা সকল কর্ম্মকে দেখে তাহার দ্বারা কৃত নহে পরন্তু প্রকৃতির দ্বারা কৃত; প্রকৃতির সকল গুণ ও শক্তির ক্রিয়াকে যে শুদ্ধ সমতার সহিত দেখে; যে জীব আত্মায় নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিয়াছে তাহাকেও সেইরূপই দেখিতে হইবে যে, আমাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ সকলের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহার নিজের দ্বারা নহে; তাহাকে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে *। আর সেই সঙ্গেই যাহাতে আমরা এইখানেই থামিয়া না যাই, যাহাতে আমরা যথাকালে সম্মুখে অগ্রসর হই এবং আমাদের কর্ম্মের একটা আধ্যাত্মিক নীতি ও নির্দ্দেশ লাভ করি, শুধু আভ্যন্তরীণ নিশ্চলতা ও নৈঃশব্দ্যেরই নীতি নহে, সেইজন্য আমাদিগকে বলা হইয়াছে আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের উপর যজ্ঞের ভাব আরোপ করিতে, যেন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম আভ্যন্তরীনভাবে প্রকৃতির অধীশ্বরের উদ্দেশ্যে, যে পরম পুরুষের সে আত্মশক্তি, স্বা প্রকৃতি, তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গে পরিণত হয়। এমন কি আমাদিগকে যথাকালে তাঁহার হস্তে সব সংন্যস্ত করিতে হইবে, আমাদের প্রাকৃত সত্তাকে কেবল তাঁহার কর্ম্মের এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের যন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে। এই সব জিনিষ ইতিপূর্ব্বে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এখানে গীতা আর এ-সবের উপর জোর দেয় নাই, কেবল দুইটি সাধারণ শব্দ, "সন্ন্যাস" ও "নৈষ্কর্ম্ম," অন্য কোন বিশেষণ না দিয়াই প্রয়োগ করিয়াছে।

শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে বাস করিবার জন্য আবশ্যকীয় সাধনা হইতেছে পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা—ইহা একবার স্বীকৃত হইলে তাহার পরই প্রশ্ন উঠে, কেমন করিয়া কার্য্যতঃ ঐ সাধনার দ্বারা ঐ ফলটি লাভ করা যাইতে পারে। "এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেমন করিয়া মানুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, হে কুন্তিনন্দন, তাহা শ্রবণ কর—সেইটিই হইতেছে জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা ‡।" এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা হইতেছে সাংখ্যযোগ, গীতার নিজের যোগের সহিত ইহার যতখানি মিল আছে ততখানিই গীতা এই শুদ্ধ জ্ঞানযোগকে মানিয়া লইয়াছে, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্; গীতার যোগের মধ্যে কর্ম্মের পন্থাও রহিয়াছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। কিন্তু এখানে আপাততঃ কর্ম্মের সমস্ত কথা উহ্য রাখা হইয়াছে। কারণ এখানে ব্রহ্ম বলিতে প্রথমতঃ নিঃশব্দ, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর সত্তাকেই বুঝাইতেছে। অবশ্য উপনিষদের ন্যায় গীতার মতেও যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু জীবন্ত ও গতিশীল সবই হইতেছে ব্রহ্ম; ইহা কেবলই নির্ব্যক্তিক অনন্ত নহে, কেবলই এক অচিন্ত্য অব্যবহার্য্য কৈবল্যাত্মক সত্তা নহে। উপনিষদ বলিয়াছে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম; গীতা বলিয়াছে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্,—স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু আছে পরম ব্রহ্মই সেই সব, এবং তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক এবং মুখ আমাদের সর্ব্বদিকে রহিয়াছে †। তথাপি এই সর্ব্বের দুইটি দিক আছে, তাঁহার অক্ষর শাশ্বত সত্তা যাহা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার সক্রিয় শক্তির সত্তা, তাহা জগতের কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম করিতে বাহির হইয়াছে। যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের ব্যক্তিত্বকে আত্মার নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে লয় করিয়া দিই, কেবল তখনই আমরা শান্ত ও মুক্ত একত্বে উপনীত হই, এবং তাহার দ্বারা আমরা ভগবানের জগৎরূপ কর্ম্মধারায় যে বিশ্ব-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার সহিত সত্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। নির্ব্যক্তিকতা হইতেছে সীমা ও ভেদের খণ্ডন এবং নির্ব্যক্তিকতার সাধনা হইতেছে সত্য সত্তার স্বাভাবিক অবস্থা, সত্য জ্ঞানের অপরিহার্য্য উপক্রমণিকা এবং সেই হেতু সত্য কর্ম্মের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। ইহা খুবই স্পষ্ট যে, আমাদের সীমাবদ্ধ অহংয়ের ব্যক্তিত্বকে ধরিয়া থাকিলে আমরা সকলের সহিত এক আত্মা হইতে পারি না অথবা বিশ্বপুরুষের সহিত এবং তাঁহার বিশাল আত্মজ্ঞান, তাঁহার বহুমুখী ইচ্ছা ও তাঁহার সুদূর প্রসারী বিশ্ব-উদ্দেশ্যের সহিত এক হইতে পারি না। কারণ উহা আমাদিগকে অন্যের সহিত পৃথক করিয়া দেয় এবং

* ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥১৮।৫৪

‡ সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ১৮।৫০

† সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৩

আমাদিগকে আমাদের দৃষ্টিতে ও আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ ও অহংমুখী করিয়া তোলে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা সহানুভূতির দ্বারা অথবা অন্যের দৃষ্টি ও অনুভব ও সঙ্কল্পের সহিত কোন রকম একটা আপেক্ষিক সামঞ্জস্য করিয়া কেবল একটা সীমাবদ্ধ ঐক্যেই উপনীত হইতে পারি। সকলের সহিত এক হইতে হইলে এবং ভগবান ও তাঁহার বিশ্বগত ইচ্ছার সহিত এক হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই নির্ব্যক্তিক হইতে হইবে, অহং ও তাহার দাবী-সকল হইতে এবং নিজেদের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে ও অন্যের সম্বন্ধে অহং ভাবমূলক দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আর আমরা ইহা করিতে পারি না যদি না আমাদের সত্তায় এমন একটা কিছু থাকে যাহা ব্যক্তিত্ব হইতে ভিন্ন, অহং হইতে ভিন্ন, যাহা সর্ব্বভূতের সহিত এক নির্ব্যক্তিক আত্মা। অতএব অহংকে লয় করিয়া এই নির্ব্যক্তিক আত্মা হওয়া, আমাদের চৈতন্যে এই নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম সাধনা।

তাহা হইলে ইহা কেমন করিয়া করিতে হইবে? গীতা বলিয়াছে, প্রথমতঃ বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের বিশুদ্ধীকৃত বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।* এই যে বুদ্ধিকে বহির্ম্মুখী ও নিম্নমুখী দৃষ্টি হইতে ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখী ও উর্দ্ধমুখী করা, বুদ্ধির এই আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্ত্তনই হইতেছে জ্ঞানযোগের সার তত্ত্ব। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা সমগ্র সত্তাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, আত্মানং নিয়ম্য; বুদ্ধি দৃঢ় ও অবিচল সঙ্কল্পের দ্বারা, ধৃত্যা, আমাদিগকে নিম্নতন প্রকৃতির বহির্ম্মুখী বাসনার প্রতি আসক্তি হইতে ফিরাইয়া লইবে, সেই সঙ্কল্প একাগ্র হইয়া শুদ্ধ আত্মার নির্ব্যক্তিকতার সম্পূর্ণ অভিমুখী হইবে। ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করিবে, এই সকল বিষয় আমাদের মনের মধ্যে যে রাগ ও দ্বেষের সৃষ্টি করে মন তাহা পরিহার করিবে,—কারণ নির্ব্যক্তিক আত্মার কোন বাসনা নাই, কোন বিদ্বেষ নাই; এই সব হইতেছে বস্তু সকলের স্পর্শে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের প্রাণগত প্রতিক্রিয়া, আর বিষয়ের সংস্পর্শে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে উদ্দীপনা তাহাই হইতেছে ঐ সকল প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন ও তাহাদের ভিত্তি। মন, বাক্য ও শরীরের উপর এমন কি ক্ষুধা, শীত ও উষ্ণ বোধ এবং শারীরিক সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাণিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার উপরেও পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে; আমাদের সমগ্র সত্তা হওয়া চাই উদাসীন, এই সকল জিনিষে অবিচলিত, সকল বাহ্য স্পর্শে এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় সমভাবাপন্ন। এইটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী প্রণালী, যোগের সোজা ও খাড়া পথ। চাই বাসনা ও আসক্তির সম্পূর্ণ বিরতি, বৈরাগ্য; সাধককে দৃঢ়তার সহিত নির্ব্যক্তিক নির্জ্জনতায় বাস করিতে হইবে, ধ্যানের দ্বারা সর্ব্বদা অন্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।* অথচ এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য নহে জাগতিক কর্ম্মে যোগ দিবার দুঃখ সহনে বিমুখ মুনি বা দার্শনিকের ন্যায় একান্তভাবে নিজেকে লইয়াই নির্জ্জনতা ও নিরুদ্বেগের মধ্যে বাস করা; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকল প্রকার অহং ভাবকে দূর করা। প্রথমেই রাজসিক অহংভাব, অহঙ্কারপূর্ণ তেজ ও উগ্রতা, দর্প, বাসনা, ক্রোধ পরিগ্রহ, রিপুসমূহের উদ্দীপনা এবং জীবনের প্রচণ্ড ভোগ লালসা সকল সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।§ কিন্তু তাহার পর সকল প্রকার অহং ভাব, এমন কি সাত্ত্বিক অহংভাবও ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ লক্ষ্য হইতেছে আত্মা ও মন ও প্রাণকে শেষ পর্য্যন্ত সকল প্রকার সীমাবদ্ধকর "আমি" "আমার" ভাব হইতে মুক্ত করা, নির্ম্মম। অহং এবং অহংয়ের সকল প্রকার দাবী নির্ম্মূল করা—আমাদের সম্মুখে এই সাধন পদ্ধতিই দেওয়া হইয়াছে। কারণ যে শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক আত্মা অবিচল থাকিয়া এই বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার কোনরূপ অহংভাব নাই, তাহা কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তির নিকট

* বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ১৮।৫১

* বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ১৮।৫২

§ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮।৫৩

কোন কিছু কামনা করে না ; তাহা শান্ত, জ্যোতিঃপূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, তাহা নিঃশব্দে সকল বস্তু, সকল ব্যক্তিকে দেখে, আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের সমতাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া। তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, অন্তরে অনুরূপ কিম্বা ঐ একই নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করিয়াই অন্তর্যামী আত্মা বস্তু সকলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুষ্ঠুভাবে সেই অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারে যাহা বিশ্বের নামরূপ ও পরিবর্ত্তন সকলের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, কিন্তু সে সব তাহাকে স্পর্শ বা বিচলিত করিতে পারে না।

গীতা এই যে প্রথমেই নির্ব্যক্তিকতার সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ একটা পূর্ণ হৃদয় আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা লইয়া আইসে এবং ইহা ইহার গূঢ়তম অংশে এবং সাধনতত্ত্বে সন্ন্যাসের প্রণালীর সহিত অভিন্ন। তত্রাচ এমন একটা স্থান আছে যেখানে ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি এবং বাহ্য জগতের দাবী পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে রোধ করা হইয়াছে এবং যাহাতে আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা নিবিড় হইয়া কর্ম্মত্যাগ ও বাহ্য সন্ন্যাসে পরিণত না হয় সে জন্য একটা সীমা রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক তাহাদের বিষয় সমূহের যে পরিবর্জ্জন তাহার স্বরূপ যেন হয় ত্যাগ; ইহা হইবে সকল রস বা ভোগাসক্তি ত্যাগ, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণের যে মূল প্রকৃতিগত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া তাহার বর্জ্জন নহে। মানুষকে চতুষ্পার্শস্থ বস্তু-সকলের মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রের বিষয় সমূহের উপর শুদ্ধ, সত্য ও প্রগাঢ় সহজ ও নিরালম্ব ইন্দ্রিয়ক্রিয়া লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে দিব্যকর্ম্মে আত্মার প্রয়োজন মিটাইতে তাহাদের উপযোগিতার জন্য, পরন্তু আদৌ বাসনা চরিতার্থতার জন্য নহে। বৈরাগ্য চাই, সাধারণ অর্থে জীবনের প্রতি বিরাগ বা সাংসারিক কর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণা নহে, পরন্তু "রাগ" বর্জ্জন এবং তাহার বিপরীত "দ্বেষ" বর্জ্জন। মন ও প্রাণের সকল প্রকার অনুরাগ বর্জ্জন করিতে হইবে, তেমনই মন ও প্রাণের সকল প্রকার বিদ্বেষও বর্জ্জন করিতে হইবে। আর এইরূপ করিতে বলা হইতেছে নির্ব্বাণের জন্য নহে পরন্তু এমন নিবিড়তম ও সামর্থ্যপ্রদ সমতার জন্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মা বস্তু-সকল সম্বন্ধে সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টি এবং প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র দিব্য কর্ম্ম উভয়ের প্রতি অবাধ ও অপরিমেয় সম্মতি প্রদান করিতে পারে। ধ্যানযোগপরো নিত্যং, সর্ব্বদা ধ্যানে রত থাকা হইতেছে সুদৃঢ় পন্থা যাহার দ্বারা মানুষের অন্তপুরুষ তাহার শক্তিময় সত্তা এবং তাহার নৈঃশব্দ্যময় সত্তা সিদ্ধ করিতে পারে। অথচ শুধুই ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কর্ম্মময় জীবন পরিত্যাগ করা চলিবে না; পরম পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সকল কর্ম্মই করিতে হইবে। সন্ন্যাস মার্গে এই বৈরাগ্যের সাধনা ব্যষ্টিগত জীবকে শাশ্বত সত্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া নিজেকে লয় করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, আর সাংসারিক জীবন ও কর্ম্মের পরিত্যাগ হইতেছে এই প্রণালীতে একটি অপরিহার্য্য সোপান। কিন্তু গীতার যে ত্যাগ পন্থা তাহাতে এইটি হইতেছে আমাদের সমস্ত জীবন ও সত্তাকে এবং সমস্ত কর্ম্মকে ভগবানের শান্ততম ও অপরিমেয় সত্তা ও চৈতন্য ও ইচ্ছার সহিত সর্ব্বতোমুখী ঐক্যে পরিণত করার আয়োজন, এবং ইহা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জীবের পক্ষে নীচের অহং হইতে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সিদ্ধির মধ্যে প্রশস্ত ও সমগ্রভাবে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

গীতার চিন্তার এই সুস্পষ্ট নূতন ধারাটি পরের দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটির পারম্পর্য্য বিশেষ অর্থসূচক। "যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, যিনি শোক করেন না, যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার উপর তাঁহার হয়, পরম প্রেম ও ভক্তি"।* কিন্তু জ্ঞানযোগের যে সঙ্কীর্ণ পন্থা তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপর ভক্তি কেবল একটি নিম্নতন ও প্রথম প্রক্রিয়া হইতে পারে; শেষ, চূড়ান্ত পরিণতি হইতেছে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বিশেষে ঐক্যে ব্যক্তিক সত্তার বিলয়, সেখানে ভক্তির কোন স্থান থাকিতে পারে না; কারণ সেখানে কাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, কেই বা ভক্তি করিবে? সেখানে আর সব কিছুই আত্মার সহিত জীবের নীরব নিশ্চল তাদাত্ম্যের মধ্যে

* ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গীতায় আমাদিগকে নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইতেও বড় কিছু দেওয়া হইয়াছে,—এখানে রহিয়াছেন পরম আত্মা, তিনিই পরম ঈশ্বর, এখানে রহিয়াছেন পরম পুরুষ এবং তাঁহার পরমা প্রকৃতি, এখানে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম, তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়েরই ঊর্দ্ধে এবং তাঁহার শাশ্বত সমুচ্চপদে তাহাদের সমন্বয় করিয়াছেন। অহংকর্তা এখানেও নির্ব্যক্তিক নীরবতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চাতে এই নিশ্চল নীরবতাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে পরম পুরুষের কর্ম্ম, তিনি নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম অপেক্ষা মহত্তর। তখন আর অহং এবং গুণত্রয়ের নিম্নতন অন্ধ ও পঙ্গু ক্রিয়া থাকে না পরন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আইসে এক অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তির, এক মুক্ত অপরিমেয় শক্তির বিশাল স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল ক্রিয়া। সকল প্রকৃতি হয় এক অদ্বিতীয় ভগবানের শক্তি, সকল কর্ম্ম হয় আধার ও নিমিত্ত স্বরূপ ব্যষ্টি সত্তার ভিতর দিয়া ভগবানের কর্ম্ম। অহংয়ের স্থলে সত্য অধ্যাত্ম ব্যষ্টি-সত্তাটি সচেতন ও প্রকট হইয়া সম্মুখে আইসে তাহার প্রকৃত স্বরূপের স্বাধীনতায়, তাহার স্থিতির শক্তিতে, ভগবানের সহিত তাহার চিরন্তন সম্বন্ধের মহিমা ও জ্যোতিতে, তাহা পরম ঈশ্বরের অক্ষয় অংশ, পরা প্রকৃতির অবিনশ্বর শক্তি, মমৈবাংশঃ সনাতনঃ, পরা প্রকৃতি-র্জীবভূতা। মানুষের অন্তপুরুষ তখন এক পরম আধ্যাত্মিক নির্ব্যক্তিকতায় নিজেকে পুরুষোত্তমের সহিত এক বলিয়া অনুভব করে এবং তাহার বিশ্ব প্রসারিত ব্যক্তিত্বে নিজেকে ভগবানের একটি প্রকট শক্তিরূপে অনুভব করে। তাহার জ্ঞান হয় ভগবানেরই জ্ঞানের একটা জ্যোতি, তাহার ইচ্ছা হয় ভগবানেরই ইচ্ছার একটা শক্তি; বিশ্বের সব কিছুর সহিত তাহার ঐক্য হয় ভগবানেরই শাশ্বত ঐক্যের একটি লীলা। এই যে যুগ্ম সিদ্ধি, এই যে এক অনির্ব্বচনীয় সত্যের দুইটি দিকের মিলন (এই দুইটির যে-কোনটি অথবা দুইটিরই দ্বারা মানুষ তাহার নিজ অনন্ত সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে), —ইহার মধ্যেই মুক্ত মানবকে বাস করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, সকলের সহিত এবং তাহার আত্মার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্রিয়াসমূহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে অথবা তাহার হইয়া তাহার শ্রেষ্ঠতম সত্তার মহত্তম শক্তিই তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে। আর সেই ঐক্যসাধক সিদ্ধিতে উপাসনা, প্রেম, ভক্তি যে তখনও সম্ভব হয় শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তাহারা হয় উচ্চতম উপলব্ধির উদার, অবশ্যম্ভাবী ও কিরীটস্বরূপ অংশ। যে এক অদ্বিতীয় সত্তা অনন্তকাল ধরিয়া বহু হইতেছে, যে বহু তাহাদের দৃশ্য বিভেদের মধ্যেও চিরকাল এক, যে পরমতম পুরুষ আমাদের মধ্যে জগতের এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য প্রকট করিতেছেন, যিনি তাঁহার বহুত্বের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন না, তাঁহার একত্বের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নহেন,—এই যে সমগ্র জ্ঞান, এই যে সমন্বয়-সাধক উপলব্ধি, ইহাই মানুষকে মুক্তস্থ কর্ম্ম, মুক্ত কর্ম্মে সমর্থ করিয়া তোলে।

গীতা বলিয়াছে, এই জ্ঞান আইসে পরমতম ভক্তি হইতে। ইহা লব্ধ হয় যখন মন বস্তু-সকল সম্বন্ধে অতি-মানস ও সমুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টির দ্বারা নিজেকে অতিক্রম করে, যখন সেই সঙ্গে হৃদয়ও আমাদের প্রেম ও ভক্তির অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ও মানসিক রূপকে ছাড়াইয়া এমন প্রেমে উন্নীত হয় যাহা শান্ত গভীর এবং প্রশস্ততম জ্ঞানে জ্যোতির্ম্ময়, ভগবানে পরম প্রীতি এবং অপরিমেয় ভক্তি লাভ করে, অবিচল পুলক, অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ করে। জীব যখন তাহার ভেদাত্মক ব্যক্তিকতাকে লয় করিয়াছে, ব্রহ্ম হইয়াছে, তখনই সে সত্য পুরুষের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং পুরুষোত্তমের প্রতি পরম দৃষ্টিপ্রদ ভক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহার গভীর ভক্তি, তাহার হৃদয়ের জ্ঞানের শক্তি দ্বারা পুরুষোত্তমকে পূর্ণতমভাবে জানিতে পারে। সেইটিই হইতেছে সমগ্র জ্ঞান, যখন হৃদয়ের অতলস্পর্শদৃষ্টি মনের চরমতম উপলব্ধিকে পূর্ণ করিয়া তোলে,—সমগ্রং মাং জ্ঞাত্বা। গীতা বলিয়াছে, "আমি কি এবং কতখানি তাহা তিনি জানিতে পারেন, আমার সত্তার সকল সত্যে ও তত্ত্বে তিনি আমাকে জানিতে পারেন, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" *। এই যে সমগ্র জ্ঞান, ইহা হইতেছে ব্যষ্টির মধ্যে অনন্বিত ভগ-

* ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৫

বানের জ্ঞান; ইহা মানুষের হৃদয়ে গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি, তিনি এখন প্রকাশিত হন তাহার জীবনের পরমতম সত্তারূপে, তাহার সকল জ্ঞানালোকিত চেতনের সূর্য্যরূপে, তাহার সকল কর্ম্মের অধীশ্বর ও শক্তিরূপে, তাহার অন্তরাত্মার সকল প্রেম ও প্রীতির দিব্য উৎসরূপে, তাহার পূজা ও উপাসনার দিব্য প্রেমিক ও প্রিয়রূপে। এই জ্ঞান বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ত ভগবানের জ্ঞান, এই জ্ঞান সেই শাশ্বত পুরুষের যাঁহা হইতে সব কিছুর প্রবৃত্তি এবং যাঁহার মধ্যে সব কিছু বাস করিতেছে, সকলের সত্তা বিধৃত রহিয়াছে, এই জ্ঞান বিশ্বের অন্তপুরুষ ও আত্মার, এই জ্ঞান বাসুদেবের যিনি যাহা কিছু আছে সবই হইয়াছেন, এই জ্ঞান বিশ্বের অধীশ্বরের যিনি প্রকৃতির সকল কর্ম্মের উপর অধ্যক্ষতা করিতেছেন। এই জ্ঞান আপন বিশ্বাতীত শাশ্বত পদে জ্যোতিষ্মান্ দিব্য পুরুষের জ্ঞান, তাঁহার সত্তার রূপ মনের চিন্তার অগোচর কিন্তু মনের নৈঃশব্দ্যের অগোচর নহে; ইহা হইতেছে কৈবল্যাত্মক সত্তারূপে, পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, পরম ভগবানরূপে পূর্ণভাবে, জীবন্তভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা; কারণ সেই আপাত-অজ্ঞেয় কৈবল্যাত্মক সত্তা সেই সঙ্গেই এবং সেই উচ্চতম পদেই হইতেছেন বিশ্বকর্ম্মধারার উৎপত্তিস্বরূপ আত্মা এবং এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। মুক্ত পুরুষের অন্তরাত্মা এইভাবে পুরুষোত্তমের মধ্যে প্রবেশ করে সমন্বয় সাধক জ্ঞানের দ্বারা এবং তাহার অন্তঃস্থলে স্থান পায় বিশ্বাতীত ভগবানে, ব্যষ্টিগত ভগবানে এবং বিশ্বগত ভগবানে পূর্ণতম যুগপৎ প্রীতির দ্বারা। সে তাহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মোপলব্ধিতে তাঁহার সহিত এক হয়; তাহার সত্তায় ও চৈতন্যে ও ইচ্ছায় ও জগৎ-জ্ঞানে ও জগৎ-প্রেরণায় তাঁহার সহিত এক হয়, বিশ্বে এবং বিশ্ববাসী সকল জীবের সহিত তাহার ঐক্যে সে তাঁহার সহিত এক হয় এবং জগতের ও ব্যষ্টির অতীতে অব্যয় শাশ্বত পদে তাঁহার সহিত এক হয়। যে পরম ভক্তি পরম জ্ঞানের অন্তরতম, ইহাই হইতেছে তাহার চরম পরিণতি।

আর এখন ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় কেমন করিয়া কর্ম্ম, জীবনের কর্ম্মরাজির কোন অংশের হ্রাস বা বর্জ্জন না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরাম ও সকল প্রকার কর্ম্ম পরমতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ অবিরুদ্ধ হইতে পারে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু ভক্তি বা জ্ঞানের ন্যায়ই এই উচ্চতম অধ্যাত্ম স্থিতিতে পৌঁছিবার একটি শক্তিশালী সাধন হইতে পারে। এ বিষয়ে গীতার উক্তি অতিশয় সুস্পষ্ট। "আর আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।"* এই যে মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম ইহা স্বরূপতঃ হইতেছে আমাদের মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত আমাদের সঙ্কল্পের এবং আমাদের প্রকৃতির সকল কর্ম্মপ্রবণ অংশের গভীরতম যোগে সম্পাদিত কর্ম্ম। প্রথমে ইহা করা হয় যজ্ঞরূপে, তখন আমাদের "আমি কর্ত্তা" এইরূপ ভাব থাকে। তাহার পর ইহা করা হয় ঐ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া এবং প্রকৃতিই সব করিতেছে এই উপলব্ধি লইয়া। শেষকালে প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি এই জ্ঞান লইয়া এবং আমাদের সকল কর্ম্ম তাঁহাতে সন্ন্যাস করিয়া, সমর্পণ করিয়া ব্যক্তিগত সত্তাকে কেবলমাত্র যন্ত্র করিয়া, আধার করিয়া কর্ম্ম করা হয়। আমাদের কর্ম্ম তখন সাক্ষাৎভাবে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা ও ভগবান হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হয় অবিভক্ত বিশ্বকর্ম্মেরই একটি অংশ, তাহা আরব্ধ হয়, সম্পাদিত হয় আমাদের দ্বারা নহে পরন্তু এক বিশাল বিশ্বাতীত শক্তি দ্বারা। আমরা যাহা কিছু করি সে-সবই করা হয় আমাদের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের জন্য, ব্যষ্টির মধ্যে ভগবানের জন্য, আমাদের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, বিশ্ব-কর্ম্ম এবং বিশ্ব-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য এবং তাহা বস্তুতঃ তাঁহারই দ্বারা তাঁহার বিশ্ব-শক্তির ভিতর দিয়া সম্পাদিত হয়। এই সকল দিব্য কর্ম্ম, তাহাদের রূপ বা বাহ্য স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, বদ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু তাহারাই হয় এই ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতি হইতে পরমা, দিব্য ও অধ্যাত্ম প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্যে উঠিবার শক্তিশালী সাধন। এই সকল মিশ্রিত ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম

* সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা অমৃত ধর্ম্মে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা আমাদিগকে অধিকার করে, যখন আমরা আমাদের সকল চৈতন্যে ও কর্ম্মে নিজেদিগকে পুরুষোত্তমের সহিত এক করিয়া দিই। এখানে সেই ঐক্য সেখানে কালের অতীতে অমৃতত্বের মধ্যে উঠিবার শক্তি লইয়া আইসে। সেখানে আমরা তাঁহার শাশ্বত অব্যয় পদে বাস করিব।

অতএব গুরু ইতিপূর্ব্বেই যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহার আলোকে এই সাতটি শ্লোক অভিনিবেশ সহকারে পঠিত হইলে এই গুলির মধ্যেই আমরা গীতার যোগের সমগ্র তত্বটি, সম্পূর্ণ মূল পদ্ধতিটি, সমস্ত সার মর্ম্মটি সংক্ষেপে অথচ ব্যাপকভাবে প্রাপ্ত হই।*

* Essay on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনুদিত।

কাঞ্চন-সম্রাট

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

হে অনন্ত হিমাদ্রির কাঞ্চন-সম্রাট,
তোমার সুমেরু-সজ্জা, তুষার-উত্তরী,
চন্দ্রলিপ্ত সীমাহারা নিস্তব্ধ ললাট
স্তম্ভিত করেছে মোরে! নীলাভ্র বিদরি'
চলেছ কোথায়? সাঙ্গহীন তুঙ্গ বেশে
স্বপিতেছে কোন্ পূর্ণ অভ্রান্ত মিলন?
রেখেছ জাগ্রত হিয়া শশাঙ্ক-স্বদেশে,
শীর্ষে তব স্বর্ণোচ্ছল তপন-প্লাবন;
তবু কেন অভীপ্সার অকম্পিত পাখা
অশ্রান্ত স্পন্দনে যাচে দূর ভূবর্লোক?
হে গিরীন্দ্র, উড়ায়েছ উজ্জ্বল পতাকা
স্বর্গের অগম্য ঊর্দ্ধে। নক্ষত্র-আলোক
চরণে লুণ্ঠিত হয়, সঘন কজ্জল
তোমারে করে না ক্ষুব্ধ ওগো অচঞ্চল।

সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)

সহৃদয় বন্ধুগণ,

আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়া আপনারা যে বন্ধুপ্রীতির পরিচয় দান করিলেন, তাহা ধন্যবাদের অতীত। আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

এইরূপ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বন্ধুবর প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সুন্দরভাবে এ বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি যতদূর বুঝি তাহাতে এইরূপ অনুষ্ঠান হইতে অনেক কিছু আশা করা যাইতে পারে। কেন না প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানকে এইরূপ মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত করিলে এই সকল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হইতে যে তীব্র প্রচেষ্টা জন্মলাভ করে, তাহার সমবেত শক্তিতে জাতি অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। বর্তমান সভ্যতা একটি সত্যকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে তাহা হইতেছে সমবেত শক্তির অসীম সম্ভাবনা। কি সমাজনীতি কি রাষ্ট্রনীতি, কি অর্থনীতি সর্বত্র জনসঙ্ঘের বা গণতন্ত্রের যৌথ রূপটি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

সাহিত্য মানবজাতির চিত্তের অভিব্যক্তি। প্রত্যেক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিলে তবেই তাহার মানসক্ষেত্রে কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। কবির ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ লইয়া তাহার যে ক্ষুদ্র জগৎটি নির্মিত হয়, তাহা কবিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। কবি সমগ্রতার মধ্যে যখন আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, তখন তাঁহার চিত্তবিকাশ নির্ব্যক্তিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সাহিত্যের যে আনন্দ, তাহা সমগ্রতার আনন্দ, মিলনের আনন্দ, একের মধ্যে বহুর আবিষ্কারের আনন্দ। সেই আনন্দের অনুভূতি কবির কল্পনাকে, সৃষ্টির ব্যথাকে সর্বসাধারণের চৈত্ত সম্পত্তি করিয়া ফেলে একান্তভাবে।

সাহিত্য সেইজন্য সীমাকে লঙ্ঘন করিয়াই চলিতে ভালবাসে। সাম্প্রদায়িকতার সীমা, বর্ণের বিভেদ, ভৌগোলিক ব্যবচ্ছেদ—এ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য মানবজাতির কল্যাণকল্পে কালাকাল পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া গঠিত হয়। চৈতন্যের স্বভাবজ প্রকাশকে যাহারা রুদ্ধ করিয়া সাহিত্যকে নিজের খেয়ালের কাটা খালে প্রবাহিত করিতে চাহে, তাহারা মানবজাতির সংস্কৃতির উন্নততর পরিণতিতে আস্থাবিহীন বুঝিতে হইবে।

এই সকল অপচেষ্টা এবং সংকীর্ণতা হইতে সাহিত্যকে টানিয়া আনিয়া যাঁহারা সমগ্রতার সুপরিসর ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। যে সকল মনীষী প্রাণপাত করিয়া কালের সীমাহীন সাগরে সাহিত্যের সুন্দর প্রবালদ্বীপ গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণোদ্দেশে যুগে যুগে শ্রদ্ধাবনত জাতি কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে কৃপণতা করে নাই। বাল্মীকি, কালিদাস, কপিল, শঙ্কর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, আমাদের কেহ নন অথচ সকলেরই পরম আত্মীয়, পরম আদরের ধন, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম সুহৃদ্। ইহাঁদের প্রত্যেকেই ভারতের মানসকাননে এক একটি কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন যাহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, কিন্তু সকলেই সেই বৃক্ষের অমৃত ফল তুল্যরূপে ভোগ করিয়া অমর হইতে পারে।

* কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিভাষণ।

সাহিত্যের এই সার্বজনীনতা জগতের পক্ষে কল্যাণকর, সেইজন্ম সাহিত্যকে সাহিত্য বলে। বিশ্বের হিত যাহার উদ্দেশ্য, তাহার সেবা করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে না পারিলে আমাদের পরম দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বর্তমান যুগে এই কথাটি স্মরণ রাখা আবশ্যক হইয়াছে, কারণ কোন এক দুষ্ট বিধাতার ক্রূর পরিহাসের ফলে যাবতীয় জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, সাধনা—সমস্তই হিংসার অনল কুণ্ডে ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে, অভিমানবহ্নির রক্তলেখা মানবজাতির ভাগ্যাকাশ কলঙ্কিত করিতে অগ্রসর হইয়াছে—এ সময়ে সাহিত্যের হিতসাধনী শক্তির কথা স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়। বাহিরের জগতের কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের মধ্যেও যে বৈষম্য, মলিনতা, ভেদবুদ্ধির উক্ষতা, অভিমানের উগ্রতা প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়, তাহার মহৌষধি সাহিত্য। ইহা হিংসাদ্বেষ ভুলাইয়া দেয়, আত্মপর ভুলাইয়া দেয়, মনের কলুষ কালিমা মুছিয়া দেয়। সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশ্বে শান্তির স্থাপন হইতে পারে কিনা আমি জানি না। কিন্তু সে কল্পনারও সুখ; সাহিত্যের সে স্বপ্ন অলীক হইলেও আশাপ্রদ।

বর্তমানে আমরা এমন এক যুগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি যখন পথের অনিশ্চয়তা হয়ত আমাদের সাধনাকে ব্যাহত করিতে পারে। সুতরাং সন্ধানীদের সম্মিলিত চেষ্টায় পথের রেখা খুঁজিয়া লইতে হইবে, দিক্‌ভ্রষ্ট না হইতে হয় তাহার জন্য সজাগ হইতে হইবে। চারিদিক হইতে দোকানী পসারীরা টানাটানি করিতেছে, আমরা কোথায় কাহার নিকট গেলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কিছুদিন হইতে রাষ্ট্রভাষার কুহকে পড়িয়া আমরা দিশাহারা হইতে বসিয়াছি। এতদিন এক বিদেশী ভাষার গর্তে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইয়াছি। দেশের ভাষা ভুলিয়াছি, বিদেশী বাগ্‌দেবীকেও ধরিতে পারি নাই। বিজাতীয় মোহে এতদিন যে আমরা ভুলিয়াছিলাম তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি ঘোর আত্মাবমাননায়। আমরা আত্মসম্মান হারাইয়াছি, মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়াছি, দেশমাতৃকাকে লাঞ্ছিত করিয়াছি। কিন্তু এত করিয়াও, অধোগতির পঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই।

অনেক কষ্টে, দীর্ঘ রজনীর অন্ধকারের পরে, একটু ভোরের বাতাস বহিল যখন আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার বক্ষে অন্য ভাষার পার্শ্বে মাতৃভাষার জন্য একটু স্থান করিয়া লইলাম। যে সকল মনস্বী নবজাগরণের অগ্রদূত স্বরূপে আমাদের মঙ্গলবর্তিকা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদেরই একজনের নামে যে সৌধ উৎসর্গীকৃত তাহারই প্রশস্ত কক্ষে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। অবশ্য এখনও আমাদের চেষ্টার ফলভোগ এই দুর্গত জাতি করিতে পারে নাই। আগামী বর্ষে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইবে, তাহাতেই আমাদের এই নববিধানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। ইহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা আমাদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে হয়ত দেখিবার সুযোগ ঘটিবে না। কিন্তু মাতৃভাষার সীতা-উদ্ধার-কল্পে যে সেতু বন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার আনন্দ আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

কিন্তু মাতৃভাষার মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিবার সূচনাতেই আর এক সমস্যা আসিয়া জুটিয়াছে—মাতৃভাষা এখন থাক, সমগ্র ভারতের জন্য রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা যাক্। এইরূপ রাষ্ট্রভাষা হওয়া আবশ্যক কি না এবং যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবে কি বাংলা হইবে, ইহা লইয়া যথেষ্ট দলাদলি এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি এবং সঙ্কীর্ণতা প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির পরিপন্থী। যদি হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষার অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার সম্বন্ধেও অনেকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাকে বিলুপ্ত করিয়া এক হিন্দীভাষার প্রচলন করিতে হইবে আপামর সাধারণের মধ্যে। এইরূপ করিলে আমরা ভারতের নানা প্রদেশের মধ্যে যে নিবিড় ঐক্য স্থাপন করিতে পারিব, তাহা হইবে অটুট; এবং ইহা না করিলে ভারতবর্ষের ঐক্য সাধিত হইবে না। কথাটি শুনিতে অবশ্য ভাল, কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে যে, এই পরিকল্পনা কেবল একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনের উপর

নির্ভর করিতেছে। ইহার দ্বারা সাংস্কৃতিক কোনও পরিবর্তন সাধিত হইবে কি না, সে কথা কেহ বলিতেছেন না।

ভারতের ভাষা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের আরজী পেশ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, ভারতের মধ্যে বাংলা ভাষাই সংস্কৃতির দিক দিয়া সমৃদ্ধ। সুতরাং বাংলা ভাষার দাবী অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। যাঁহারা এই ভাবে এক আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিত মনে করেন যে, একদিন কোনও এক সভায় জন কয়েক নেতা, অধিনেতা ও উপনেতা মিলিত হইয়া যথারীতি একটি সংকল্প গ্রহণ করিলেই আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ তাহা শিরোধার্য করিয়া লইবে। আমার এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। সমস্ত প্রদেশের মাতৃভাষা বিলুপ্ত করিয়া যদি কোনও একটি ভাষা এই উপমহাদেশে চালাইতে হয়, তাহা সংকল্পের দ্বারা হইবে না, বিপ্লবের দ্বারা হইবে, resolution নহে, Bayonet চাই। পুলিশের সাহায্য না লইলে চলিবে না।

যদি বলা যায় যে, মাতৃভাষার বিলোপ সাধন করিতেই হইবে এমন কথা নাই। মুখ্যভাষা স্বরূপ রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করিতে হইবে, গৌণভাষা স্বরূপ মাতৃভাষা শিখুক না। তাহাতেও গোল আছে। কেন না মুখ্যভাষারূপে যে একটি বি-মাতৃভাষা শিখিব তাহার প্রেরণা বা প্ররোচনা আসিবে কোথা হইতে? দেশাত্মবোধ এই প্রেরণা জোগাইয়া উঠিতে পারিবে কি? ইংরেজিভাষা যে ভারতের সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা একদিনে হয় নাই। ইহার প্রেরণা জোগাইয়াছে জ্ঞানপিপাসাও নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠাও নহে। আমরা ক্ষুধার তাড়নে, রাজকীয় প্রয়োজনে ইংরেজিভাষা শিখিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা বেয়নেটের বাধ্যতা নহে, প্রয়োজনের বাধ্যতা। দায়ে ঠেকিয়া অনেক লোক ইংরেজি শিখিতে ধাবিত হইয়াছে। তাহাও কত লোক? সমস্ত ভারতের লোক সংখ্যার সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আপনাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইংরেজিভাষার সঙ্গে ভারতবাসী যে কারণেই হউক পরিচয় লাভ করিয়া দেখিতে পাইল যে ইহা একটি অতি সমৃদ্ধ ভাষা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইহাতে সবই আছে। সাধারণ প্রয়োজনের দিক দিয়াও যেমন, সংস্কৃতির দিক দিয়াও তেমনই, ইহার ভাণ্ডার অত্যন্ত প্রচুর। সুতরাং আমরা মজিলাম! এমন লোক এখনও আছেন আমাদের মধ্যে, যাঁহারা মনে প্রাণে মাতৃভাষার দ্বারা ইংরেজির অপসারণ সমর্থন করেন না।

যাহা হউক, ইংরেজির স্থান লইয়া যদি হিন্দী বা বাংলা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা হইলে সে সমৃদ্ধি কি ইহার কোনও ভাষার আছে? সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার শক্তি হিন্দীর নাই-ই, বাংলারও যে নাই, একথা আমরা অপ্রিয় হইলেও স্বীকার করিতে বাধ্য। যদি বলা যায় যে ব্যস্ত কেন হও, একবার রাষ্ট্রভাষার পদটি দেও, তাহা হইলে হুহু করিয়া ভাষার গঙ্গায় জোয়ার আসিবে, সমস্ত অপূর্ণতা অচিরে পূর্ণ হইয়া যাইবে। কথাটি শুনিতে ভালই লাগে। কিন্তু ভাষাকে সমৃদ্ধ করা মুখের কথা নয়। যাঁহারা মনে করেন, অনুবাদ করিয়াই একদিনে কাজ ফতে করিয়া ফেলিব, তাঁহারাও ভাষার গতি ও প্রকৃতি ভাল বোঝেন বলিয়া বোধ হয় না। কথা আছে বটে যে অনেক সময়ে ভারে না কাটিলেও ধারে কাটে। কিন্তু ধার করা গহনা পরিয়া যেমন দরিদ্র ঘরের বধূ ঐশ্বর্যশালিনী হয় না, তেমনি অপর ভাষা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কোনও ভাষা সমৃদ্ধ হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া হিমশিম খাইতেছি। আজ তিন বৎসরের অধিক কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী শব্দসম্পদ্ সমস্ত পরীক্ষণীয় বিষয়ে আমদানী করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাহার পর হিন্দী, অসমীয়া, উড়িয়া, উর্দু প্রভৃতি অন্যান্য মাতৃভাষা ত পড়িয়াই আছে। আমরা বাংলা ভাষার জন্য শব্দ আহরণ করিতে ইতস্ততঃ করি নাই। ইংরেজি, জার্মাণ প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, উর্দু প্রভৃতি

দেশীয় ভাষা—যে ভাষায় যে শব্দ পাইয়াছি তাহাই গ্রহণ করিয়াও কূল পাইতেছি না। কাজেই কোনও একটি ভাষাকে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিতে ইচ্ছা করিলেই যে সে কার্য সহজে সমাধা করা যায়, এ ধারণা কোনও মতেই ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অবলম্বন করিলে একই পরিভাষা বা শব্দ সংকলন হইতে সকল প্রদেশের প্রয়োজন সাধিত হইবে। এ কথাটি ঠিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেরূপ একীকরণে প্রথম বাধা পড়িয়াছে উর্দুর দিক হইতে। হিন্দীর ন্যায় সংস্কৃতমূলক ভাষা ত সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে না, সেইজন্য রাষ্ট্র-নেতারা উর্দুকে স্বতন্ত্র স্থান দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। ইহার সরল অর্থ আমি যতদূর বুঝি তাহাতে রাষ্ট্র ভাষা হইল না। যদি একটির স্থলে দুইটি ভাষা চলে তাহা হইলে তিনটি বা চারটি বা পাঁচটি ভাষা চলিতেই বা ক্ষতি কি?

এই জন্য কল্পনা করিতে হইল যে এমন একটি রাষ্ট্রভাষা হইবে যাহা হিন্দীও নয় উর্দুওনয় অথচ দুইয়ের মাঝামাঝি। আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অমনি শব্দের পার্সেন্টেজ গণিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

যে ভাষা যুগযুগান্তের সঞ্চিত অমূল্য সম্পদে গরীয়সী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার কোন নূতন মোহের পশ্চাতে ধাবিত হইব? এমন কে শক্তিমান বিক্রমাদিত্য আছে যে তালবেতালের সাহায্যে হিন্দুস্থানী ভাষার সৌধ রাতারাতি গড়িয়া তুলিবে? আগে সে ভাষা হউক তাহার সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান গড়িয়া উঠুক, তখন দেখা যাইবে।

আসল কথা এই যে, ভাষার সাধনা, সাহিত্যের সৃষ্টি মুখের কথা নয়। আমরা এতদিন মাতৃভাষার সেবা করিয়া কতটা সফলতা লাভ করিয়াছি, তাহা স্থিরসুস্থচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। পরাধীনতার পাষাণ চাপে যতটা প্রত্যাশা করা যায় সে অনুপাতে আমরা যে নিতান্ত মন্দ করি নাই, ইহা আমাদের প্রতিভার দুর্দমনীয়তা প্রমাণ করিতেছে। যে যুগে আমরা বাস করিতেছি, তাহা ভাষার পক্ষে একটি গৌরবময় যুগ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা সব যুগে জন্মে না, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারা ইঁহাদের সাহিত্যিক অবদানের দ্বারা দরিদ্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। তথাপি আমাদের সাহিত্যের অনেক দিক এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমরা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের তুলনায় এখনও অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছি। এখন আমাদের সে দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বাংলার জাতীয় সাহিত্য প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে সত্য, এখন ইহাকে ধ্রুবপথে পরিচালিত করিতে পারিলে ইহা আমাদের পক্ষে কামদুঘা হইয়া উঠিবে। সেই চেষ্টা ও সাধনা আমাদের ঐকান্তিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি ইহা সত্য হয় যে মাতৃভাষার আরাধনা ব্যতীত কোনও জাতির মুক্তি হয় না, তাহা হইলে নিরলস সাধনার দ্বারা সেই যজ্ঞই সম্পন্ন করিতে হইবে। এতদিন যে ইংরেজী ভাষার সর্বগ্রাসী প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পঙ্গু হইয়াছিল এই কথাই আমরা সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভাসমিতির কক্ষে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের এই যুক্তি-সঙ্গত দাবীর অনিবার্যতা বুঝিয়াই আজ ইংরাজির বন্ধন-রজ্জু একটুখানি খসিয়া পড়িয়াছে। এখন রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক, আর আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিব না। হিন্দী বা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হউক, এ বিচার প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যেরূপে হয় মীমাংসিত হউক। আমরা আমাদের মাতৃ ভাষার পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিব, বলিব মাতৃভাষার জয় হউক, আমার ভাষাজননী গৌরবগরিমা ঐশ্বর্য্যমহিমায় মণ্ডিত হউক, আমরা জননী বাণী বীণাপাণির পাদপীঠতলে বসিয়া কৃতকৃতার্থ হই।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাঙলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী

ডক্‌টর মনোমোহন ঘোষ, এম্‌-এ, পি-এইচ, ডি, কাব্যতীর্থ

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙলা দেশের এক মহা পরিবর্ত্তনের যুগ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাট্‌গণের প্রভাব ক্ষীণতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সুবাদারগণ কার্য্যত স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু নবাব উপাধিধারী এই সুবাদারগণের অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শান্তি ও সুশৃঙ্খলার ভাব ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে দূর হইল। ইংরেজ বণিক কোম্পানীর সহিত বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার যে সংঘর্ষ বাধিল তাহারই ফলে দেশের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌঁছিল। পলাশীর তথাকথিত যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটিলে দেশের কর্ত্তৃত্ব হইল দ্বিধা বিভক্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিতে লাগিল রাজস্ব আদায়, আর প্রজাদের ধন প্রাণ নিরাপদে রাখিবার ভার রহিল ইংরাজ কোম্পানীর আজ্ঞাধীন নামে-মাত্র নবাবের হস্তে। এই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলে এক দিকে দস্যু তস্কর, অপর দিকে কোম্পানীর উৎপীড়ক কর্ম্মচারীবৃন্দ, ইহাদের হাতে পড়িয়া জনগণের দুরবস্থার সীমা রহিল না। ১৭৬৭-১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে অন্যূন দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে নিপতিত হইল। দেশের এহেন দুঃসময়ে কোন প্রতিভাশালী লেখকের অভ্যুদয় বা প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর নহে। এই যুগের লিখিত যে কিছু বৈষ্ণব পদাবলী, চরিতকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যাদি পাওয়া যায় তাহা গতানুগতিক ভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যধারাকেই বহন করিয়া চলিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের অধিকাংশেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র দুইজন লোক সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। তাঁহাদের নাম :—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (মৃত্যু ১৭৭৫) এবং কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)। এই দুয়ের মধ্যে ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতিই অধিকতর।

রামপ্রসাদের রচনার মধ্যে তাঁহার শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত নিশ্চয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে তিনি যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশি নহে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নিকট তাহা একান্ত নিষ্প্রভ। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতসমূহ অধিকতর বিখ্যাত এবং তাঁহার খ্যাতির একমাত্র কারণ হইলেও সাধারণ সাহিত্যরসলিপ্সু পাঠকবর্গের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ খুবই ক্ষীণ। সংসার চক্রের বৈচিত্র্যহীন আবর্ত্তনে বীতস্পৃহ কবি যখন আন্তরিকতার সহিত নিজকে তৈলিকের বলীবর্দ্দের সহিত তুলনা করিয়া গাহিতেছেন—

> মা আমায় ঘুরাবি কত,
> কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত,
> ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা
> পাক দিতেছ অবিরত।
> তুমি কি দোষে করিলে আমায়
> ছটা কলুর অনুগত॥

তখন, না ইহার বিষয়বস্তু না উপমা-সৌষ্ঠব আমাদের অন্তরকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক রসে আপ্লুত করিয়া তোলে; অথবা কবি যখন বৈরাগ্যের সুরে গাহিতেছেন :—

> ত্যজ মন কুজনভুজঙ্গসঙ্গ,
> কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক।
> অনিত্য বিষয়ে ত্যজ নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
> মকরন্দরসে মজ ওরে মনভৃঙ্গ॥

তখনো ইহার বিষয় বস্তু এবং অনুপ্রাসসম্ভার সাহিত্যরসবেত্তা পাঠকের চিত্তকে কোনও রূপে স্পর্শ করে না। রামপ্রসাদের রচনায় এইরূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য কোন রসসৃষ্টি করিতে পারেন নাই তাহা নহে। বাৎসল্য রসের বর্ণনায় তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিভিন্ন

আগমনী গানে তিনি এই রসটি বেশ ফুটাইতে পারিয়াছেন। উমার শৈশব বর্ণনায় ও বাৎসল্যরসের একটি চমৎকার ছবি তিনি আঁকিয়াছেন।

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান,
নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষে নিশি
গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে॥
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি
মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে
আয় আয় মা মা বলি
ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে॥

* * * *

উঠে বসে গিরিবর
করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি,
ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ
উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

এই গানটিতে কবির হৃদয় ও রচনা শক্তির উত্তম পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও তত্ত্বমূলক সঙ্গীতসমূহে রহিয়াছে তাঁহার সাধক-সুলভ তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয়। ইহাদেরই জন্য বাঙালী সমাজে তাঁহার স্মৃতি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে।

'মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানবজমী রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা' ইত্যাদি

গানটিতে তিনি মানবজীবনের বিরাট সার্থকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে রসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রায় সাহিত্য রসেরই পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রামপ্রসাদের রচিত গীতিনিচয়ের প্রেরণা বৈরাগ্যমূলক বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই তাহা রসবান্ হইয়া উঠে নাই। অবশ্য এই বৈরাগ্যের ভাব হয়ত তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন। দেশময় যে দুর্দ্দশা বিরাজ করিতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াই রামপ্রসাদের মনে সংসার বিমুখতার ভাব আসিয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। নিতান্ত দুর্দ্দশার কালে যেমন পরম বৈরাগ্য দেখা দিতে পারে তেমনি আবার চরম ভোগ বিলাসও দেখা দিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যেও দেশের দুর্দ্দশার প্রতিক্রিয়ার এই দুই চরম কোটি দেখা দিয়াছিল। রামপ্রসাদ বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞানমূলক গান রচনা করিলেও তাঁহারই সমসাময়িক ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে ভোগ বিলাসের ছবিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে তিনি হীরামালিনী নামক যে কুট্টনীর চরিত্র এবং নায়ক নায়িকার গোপন মিলন ও সম্ভোগাদির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সেই যুগের চরম ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সারই পরিচয় দান করে। এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লিখিত কাব্য যে আধুনিক কালে সুরুচি বিগর্হিত মনে হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু এই এক মহান্ ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের কবিত্ব প্রশংসনীয়। আদিরসের বাহুল্য সত্ত্বেও তাঁহার রচনায় গ্রাম্যতা দোষ নাই কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রশংসার যোগ্য তাঁহার সুমার্জ্জিত ভাষা। প্রসাদ-গুণ-সম্পন্ন স্বচ্ছ এই ভাষায় নাগরিকতা-সুলভ বাক্‌নৈপুণ্য থাকিলেও তাহা প্রায়শ সরল। তাঁহার ভাষা শুনিবামাত্রই চিত্তে রসের সঞ্চার হয়। ছদ্মবেশিনী ভগবতীর (অন্নদার) ভবানন্দ-ভবনে গমন পথে নদী পার হওয়ার যে বর্ণনা ভারতচন্দ্র করিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেবী যখন—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও-রাঙ্গা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিল অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥

ভারতচন্দ্রের প্রশংসার দ্বিতীয় কারণ তাঁহার মাত্রাজ্ঞান। নিরবচ্ছিন্ন প্রসাদগুণের সমাবেশে তিনি স্বীয় রচনাকে বৈচিত্র্যহীন করিয়া তোলেন নাই। স্থানে স্থানে বচন ভঙ্গীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়াছেন। যেমন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন —

চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণ চন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥

শ্লেষালঙ্কারযুক্ত উল্লিখিত স্থলটি ভারতচন্দ্রের সরল ভাষার গুণে বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। তাহার রচিত ব্যাজ স্তুতির দৃষ্টান্তগুলিও বেশ উপভোগ্য। নদীকূলে পাটনীর নিকট নিজ পরিচয় দান কালে দেবী যখন নিন্দাচ্ছলে সর্ব্বলোকপূজ্য স্বামীর গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দেবী বলিতেছেন :—

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥

*   *   *   *

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে যে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥

ভারতচন্দ্রের অপর এক গুণ তাঁহার বর্ণনার সরসতা ও স্বচ্ছন্দ গতি। যেমন হীরা মালিনীর বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥

*   *   *

চূড়া বাঁধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

*   *   *

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥

ভারতচন্দ্রের এক বিশেষ গুণ তাঁহার সরস প্রবচনতুল্য কবিতাংশ রচনায়। যেমন :—

(১) একা যার বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥
(২) বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
(৩) গড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার।
(৪) নীচ যদি উচ্চ ভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।

ইত্যাদি কবিতাংশগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। এই সকল বিবিধ গুণে ভারতচন্দ্রের কাব্য লোক সাধারণের মধ্যে এত সমাদর লাভ করিয়াছিল যে তিনি এক সময়ে বাঙলা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে বঙ্গ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান অতি উর্দ্ধে নহে। তাঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থ অন্নদামঙ্গলে তদীয় পূর্ব্বগামীদের রচিত মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল আদি মঙ্গলকাব্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণ অতি সুস্পষ্ট। তাই ভারতচন্দ্র ও তাহার রচনাকে উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করা যায় না।

কবিওয়ালাদের রচিত গীতনিচয়কেও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের অন্যতম প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। নব গঠিত শহরের ধনী ও বণিক সম্প্রদায়ের অবসর বিনোদনের জন্যই মুখ্যভাবে রচিত এই গানগুলিতে, কি বিষয়বস্তু কি ভাষা কোন দিক দিয়াই বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কৃষ্ণ-রাধা, কালী, দুর্গা ইত্যাদিকে লইয়া রচিত মামুলী ধরণের গান, ভাব-গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা অনুপ্রাসাদি শব্দাড়ম্বর এবং সুরসংযোগের জন্যই সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। অনুপ্রাস যমকাদির উদাহরণ (১) স্বরূপ রাম বসুর

(১) উদাহরণগুলি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের গানের নিদর্শন খুব দুর্লভ।

একটি গান হইতে নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইতেছে।—
খণ্ডিতা নায়িকা রাধা বলিতেছেন :—

শ্যাম কাল মান করে গেছে,
কেমন আছে দূতি জেনে আয়।
করে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে
হয়ে পণ্ডিতে মরি হরির প্রেমের দায়।
* * * *
যদি মানের মানে আমার মানে, সে না মানে
তবে কি কোরবে এ মানে
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥

আর রাধার সখিগণ, মথুরায় উপনিবিষ্ট কৃষ্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন :—

কত কথা বদন তোল হও সদয় এই ভিক্ষা চাই!
রাধার অধৈর্য্যে এলাম আপার্যে,
তোমার কংসরাজ্যের অংশ লতে আসি নাই।
অধোমুখে যদি থাক শ্যাম কুব্জার দোহাই ॥
তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য
কেন মাধব আজি দাসীর প্রতি ঔদাস্য
চারু চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য
যেন সর্ব্বস্ব লতে এলেন ভেবেছ তাই ॥

বেশীর ভাগ কবিওয়ালার রচনা এই নমুনার মত হইলেও তাহাদের দুই এক জনের গানে সাহিত্যিক রসের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন নিতাই বৈরাগীর একটি গানে আছে :—

পীরিতি নগরে বিষম সখি মনচোরের ভয়।
বসতি ইহাতে দায় ॥
নয়নে নয়নে সন্ধান মন অমনি হরিয়ে লয় ॥

রাম বসুর বিরহ বিষয়ক গানগুলিই অবশ্য কবিওয়ালার রচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। যেমন একটি গান আছে—

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো তারে
বলি বলি বলা হল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না ॥

আর একটি গানে আছে :—

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই
চোখের দেখা দেখতে চাই।
কিছু কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখব না ॥

রামবসুর রচিত আগমনী গানের মধ্যেও দুই একটি বেশ উল্লেখযোগ্য। যেমন :—

গত নিশিযোগে আমি দেখেছি হে সুস্বপন।
এলো সেই আমার হারাধন
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে মা কই
মা কই মা কই আমার।
দেখা দাও দুখিনীরে।
অমনি দুবাহু পশারি
উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি আমি নয়।

কবিওয়ালাদের সমসাময়িক ও সমশ্রেণীস্থ টপ্পা, পাঁচালী, ঢপ, কীর্ত্তন বাউল ইত্যাদি গানেও বাঙলা সাহিত্যের অন্বেষণ কেহ কেহ করিয়াছেন; কিন্তু এই সমুদয় উচ্চশ্রেণীর রচনা নয়। কিন্তু কদাচিৎ এই সকল গানের মধ্যে সত্যিকারের রস যে না পাওয়া যায় তাহা নহে। টপ্পা রচকগণের মধ্যে নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত সমধিক প্রসিদ্ধ। তাহার রচিত কয়েকটি গানের অংশ বিশেষ ভাবের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উত্তম গীতি কবিতার গুণসম্পন্ন। যেমন—

"নয়নে নয়ন রাখি অনিমিখ হয় আঁখি।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুখী।
কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি ॥"

"সাধিলে করিব মান কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি ॥"

"কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি।
আঁখি অনিমিখ পথ হেরিতে হেরিতে ॥"

"হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥"

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ॥

আর কি রূপ ভুলি, প্রেমতুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিন লবে শমনে॥"

নিধুবাবুর বহু পরবর্ত্তী শ্রীধর কথক নামক অপর একজন টপ্পা রচয়িতার গানেও তাঁহার রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহারই যে একটি গান নিধুবাবুর নামে লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত তাহা এই :—

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই
আর জানি নে।
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখতে
বড় ভালবাসি
তাই শুধু দেখতে আসি
দেখা দিতে আসি নে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্ট না হইলেও প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিস্থল হিসাবে ইহা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কারণ এই যুগ-সন্ধির কালে এক দিকে যেমন প্রাচীন ধরণের সাহিত্য প্রাণহীন হইয়া আসিতেছিল অপর দিকে তেমন নূতন সাহিত্য সৃষ্টির বীজ উপ্ত হইতেছিল। এই বপন কার্য্যের উদ্যোক্তা ছিলেন নব প্রতিষ্ঠিত শাসন তন্ত্রের নেতৃস্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষবর্গ এবং তাঁহাদের স্বদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী সজ্জন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। বাইবেল অনুবাদ ও প্রচারের জন্য তাঁহারা বাঙলা ভাষার অনুশীলন করিলেন এবং এই অনুশীলনের ফলেই বাঙলার ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হইল। রাজপুরুষবর্গ দেশের শাসনতন্ত্রকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য দেশ ভাষায় নিপুণ ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তাহারই ফলে সরকারী ব্যয়ে বাঙলা ভাষার অনুশীলন ও প্রচার ব্যবস্থার সূত্রপাত হইল। এই দুইটি ঘটনাই বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অতএব প্রাচীন ও নব যুগের সন্ধিস্থল হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দান নগণ্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধ ব্যাপিয়া বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টির যে আন্দোলন চলিতে পারিয়াছিল মুখ্যত অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক অবস্থাই তাহার কারণ।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সোনালী রঙ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২১

শ্রাবণ মাসের শেষ দিক।

তিন দিন অনুমতি দেবী বাতব্যাধির আক্রমণে প্রায় শয্যাগত হ'য়ে আছেন। দীর্ঘকাল হ'তে এ রোগ তাঁর শরীরে আশ্রয় নিয়েছে। যখন ভাল থাকেন তখন রোগের কোনো চিহ্নই থাকে না, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন আক্রান্ত হন তখন কিছুদিনের জন্য শয্যায় আবদ্ধ থাকতে হয়। সেই সময়ে চাঁপার মার দ্বারা তাঁর নিজের সেবা চলে; আর দেব-সেবা চলে পাড়ার একটি অনুগত বিধবা রমণীর দ্বারা। এবারকার অসুখে কিন্তু অনুমতি সে স্ত্রীলোকটির সাহায্য না গ্রহণ ক'রে দেব-সেবার সম্পূর্ণ ভার পারুলের উপর ন্যস্ত করেছেন।

দেবসেবার কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে বাকি সময় পারুল একান্ত আগ্রহের সহিত অনুমতির শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করে। অনুমতি প্রবল ভাবে আপত্তি করেন, এত বেশি পরিশ্রম ক'রে সে পীড়িত হ'লে মোটের উপর অসুবিধা বর্দ্ধিত হবে ব'লে ভয় দেখান। কিন্তু পারুল মৃদু হাস্যের দ্বারা সে-সকল ওজর আপত্তি কাটিয়ে দেয়। অনুমতি কিছুতেই তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না।

সন্ধ্যার পর অমরেশ এসে উপস্থিত হ'ল। পারুল তখন ঠাকুর ঘরে রয়েছে। দ্বার প্রান্তে অমরেশকে দেখতে পেয়ে অনুমতি সাগ্রহে তাকে আহ্বান করলেন, "আয় অমর, ভেতরে এসে বোস্।"

ভিতরে প্রবেশ ক'রে অনুমতির পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এ বেলা কেমন আছ মাসিমা?"

অনুমতি বললেন, "আজ ত' মাত্র তিন দিন, এখন ত ক্রমশ বাড়ের দিকেই যাবে। যে রকম ক'রেই হোক, এক মাসের কম ত' কোনো মতেই নয়। অর্থাৎ, ভাদ্র মাসের শেষাশেষি বর্ষা ক'মে এলে যদি আবার অসুখ কমে

অমরেশ বললে, "তাই বা কি ক'রে বলছ মাসিমা, গত বৎসর ত সমস্ত বর্ষাকালটাই বাত নিয়ে ভুগেছিলে। যতদূর আমার মনে পড়ে, আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে আরম্ভ হ'য়েছিল, আর আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জের চলেছিল।"

অনুমতি বললেন, "তোর ঠিকই মনে আছে অমর, গত বৎসর তিন মাসের ওপর ভুগেছিলাম। এবার কতদিন প'ড়ে থাকতে হয় তাই বা কে জানে! নিজের জন্যে তত ভাবিনে, কিন্তু ঐ মেয়েটা যে দিবারাত্রি খেটে খেটে সারা হচ্ছে ও কেমন ক'রে ভাল থাকবে তাই ভাবি!"

অমরেশ বললে, "সে ত' সামান্য ভাবনা মাসিমা, না হয় অসুখ হ'য়ে দু চারদিন কষ্টই পাবে। কিন্তু পারুলের বিষয়ে আরো কিছু গুরুতর ভাবনা ভাবো কি তুমি?"

"কি গুরুতর ভাবনা?"

"এই ধর, কি ভাবে, কেমন ক'রে, ওর জীবনটা কাটবে। সমস্ত জীবনটাই ত ওর সামনে প'ড়ে রয়েছে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে অনুমতি বললেন, "সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবিনে যে তা নয়। অবশ্য ওর ভাত কাপড়ের জন্যে তেমন কিছু ভাবিনে, কারণ তার একটা সম্ভবমত ব্যবস্থা মনে মনে একরকম স্থির ক'রে রেখেছি। কিন্তু পারুলের মত একজন সুন্দরী সমর্থ মেয়ের জন্যে ভাত-কাপড়ের ভাবনাই ত' সব চেয়ে বড় ভাবনা নয় অমর। দু দিন আগে যে রীতিমত ভোগিনী ছিল, আস্তে আস্তে সে একেবারে যোগিনী হ'য়ে যাচ্ছে দেখলে মনে শুধু আনন্দই হয় না,—একটু দুঃখও হয়। হাজার হোক, মেয়েমানুষ ত!"

"কে মেয়েমানুষ মাসিমা?—তুমি, না পারুল?"

"দুজনেই।" ব'লে অনুমতি হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে অমরেশও হাসতে লাগল।

অমরেশ বললে, "বেশ ত' মাসিমা, যোগিনীর জন্যে যদি তোমার এত দুঃখই হয়, তা হ'লে যোগিনীকে আবার ভোগিনী ক'রে দেও না।"

অনুমতি বললেন, "যদি আমার নিজের পেটের একটা ছেলে থাকত তা হ'লে কি দিতাম না অমর? নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু তা যখন নেই তখন কা'কে অনুরোধ ক'রে অপ্রস্তুতে পড়ব বাবা! বাঙালীর ঘরে কে এমন পুরুষসিংহ আছে যে এই পাঁকের পদ্মফুলকে মালা ক'রে গলায় পরতে সাহস করবে? একজন অবিশ্যি আছে। কিন্তু তা' হ'লে শুধু যোগিনীকেই ভোগিনী নয়, যোগীকেও ভোগী করতে হয়। সে বড় শক্ত কাজ অমর! অতটা আমার ভরসা হয় না।"

অমরেশ বললে, "তা হ'লে সে কাজে কাজ নেই মাসিমা। এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে গেলে হয়ত' একটা পাখীও মরবে না, কাজেই আপাতত যোগিনীর কথাই ভাবো, যোগীর কথা না হয় পরে ভাবা যাবে।"

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবতে ভাবতে অনুমতি বললেন, "ভাবতে গেলে দুজনের কথাই এক সঙ্গে ভাবতে হয়, এক জনের কথা পৃথক ক'রে ভেবে বিশেষ কিছু লাভ আছে ব'লে মনে হয় না। তবে আজ শুধু এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে কোনদিন যদি তেমন প্রয়োজন দেখি তা হ'লে দু হাত দিয়ে যোগীর দু হাত চেপে ধ'রে যোগ ভঙ্গের জন্যে একবার অনুরোধ ক'রে দেখব।"

মৃদুস্মিত মুখে অমরেশ বললে, "যোগী যদি খাঁটি যোগী হয় তা হ'লে তার যোগ ভাঙতেও পারে, কিন্তু যদি মেকি হয় তা হ'লে যোগ ভাঙানো শক্ত হবে মাসিমা।"

অনুমতি বললেন, "সেই ত হয়েছে বিপদ বাবা,—তোদের এই সর্বনেশে অত্যাচারী সমাজ মেকি যোগীতে একেবারে ভরা, কিছুতেই তাদের যোগ ভাঙানো যাবে না।" তারপর

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে বলতে লাগ্‌লেন, "আচ্ছা অমর, মেয়েদের ওপর তোদের এই জুলুম জবরদস্তি উৎপীড়ন কি শেষ হবে না কোনো দিন? পারুল-শ্রেণীর মেয়েদের জন্যে তোদের হতভাগা সমাজের দোর কি চিরদিনই বন্ধ থাকবে? অথচ পারুলের চেয়ে কত বেশি ঘৃণিত জীবন নিয়ে কত মেয়ে সমাজের মধ্যে সদম্ভে দিনপাত করছে তা ত জানতে কারো বাকি নেই। আচ্ছা, বুদ্ধি বিচার বিবেচনা কি চিরদিনের জন্যেই সংস্কারের পদানত হ'য়ে থাকবে?"

অনুমতির অনুযোগ শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বললে, "তুমি একটু ভুল করেছ মাসিমা, যে তোমার দলের লোক তার সঙ্গে তুমি বিবাদ করছ। এই নিয়ে যাদের সঙ্গে আমার বিবাদ, এমন দু-এক জনের ঠিকানা তোমাকে দিতে পারি, তাদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে দেখো যদি কিছু করতে পার। কিন্তু সে কথা যাক। পারুলের প্রতি তোমার মনোভাব দেখে নিজের প্রতি দস্তুর মত শ্রদ্ধান্বিত বোধ করছি!"

স্মিতমুখে অনুমতি বল্‌লেন, "কেন, শ্রদ্ধান্বিত বোধ করছিস কেন?"

"পাঁকের মধ্য থেকে এমন একটি পদ্ম আবিষ্কার করেছি, এ কি কম বাহাদুরির কথা?"

অনুমতি বললেন, "বাহাদুরির কথা নিশ্চয়ই, কিন্তু সে আবিষ্কারের জন্যে নয় অমর, সে অন্য কারণে। চাঁপার মাকে বাদ দিলে বাড়ির মধ্যে মাত্র আমি আর পারুল। দিবারাত্র আমাদের দুজনে কথাবার্তা হচ্ছেই। এই তিন মাসের মধ্যে কোনো কথা সে আমাকে বলতে বাকি রাখে নি। তোর পায়ে সংঘের তেলের মালিশের কথা পর্যন্ত আমাকে সে বলেছে। কি শুভ মুহূর্তেই ওকে দেখা দিয়েছিলি অমর! দেবতার স্থানটুকু পর্যন্ত ওর মনের মধ্যে বাকি রাখিস নি, সমস্ত জায়গা নিজেই জুড়ে বসেছিস্।"

অমরেশের মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিলে; বললে, "ভারী জবরদস্ত লোক ত দেখছি আমি মাসিমা?"

অনুমতি বললেন, "তা'তে কি আর সন্দেহ আছে? জবরদস্ত না হ'লে কি কেউ এমন ক'রে চুলের মুঠি ধরে একেবারে উল্টো পথে ফেরাতে পারে? কিন্তু সে কথা যাক, পারুলের বিষয়ে কি দুর্ভাবনা নিয়ে তুই আজ এসেছিস আমাকে পরিষ্কার ক'রে খুলে বল ত?"

অমরেশ বললে, "দুর্ভাবনা নিয়ে নয় মাসিমা, ভাবনা নিয়ে। যে দিন তুমি পারুলকে আশ্রয় দিয়েছ সেই দিন থেকে তার বিষয়ে আমার দুর্ভাবনা কেটে গেছে।"

"ভাবনাই বা কি শুনি?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে অমরেশ বললে, "ভাবনাও তেমন কিছু নয়। মানুষের প্রথম যা ভাবনা, অন্নবস্ত্রের ভাবনা, তা'ত তুমি হরণ করেছ। কিন্তু মাসিমা, এ ত' আর তোমাকে বোঝাতে হবে না যে, খাওয়া পরার জন্যে উপার্জন করবার প্রয়োজন না থাক্‌লেও শুধু উপার্জনের জন্যেই উপার্জনের একটা প্রয়োজন আছে, তা'তে মানুষের আর কিছু না হোক চিত্ত শুদ্ধি হয়। পারুলের একটা উপার্জনের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে তোমার অনুমতি আবশ্যক।"

"কেন? আমার অনুমতি কেন আবশ্যক?"

"বা রে'! তুমি যে পারুলের অভিভাবিকা!"

অমরেশের কথা শুনে অনুমতির অধরে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বল্‌লেন, 'আর, তুই কে? তুই যে পারুলের অভিভাবিকার অভিভাবক। কিন্তু সে কথা যাক্, পারুলের কি উপার্জনের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বল শুনি?"

অমরেশ বললে,"সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামে আমার একজন বন্ধু রেডিয়ো অফিসে বড় চাকরী করে। সে আজ সাড়ে সাতটার সময়ে এখানে আসবে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত' সে পারুলের দু-চারখানা গান শুনবে, আর তেমন যদি ভাল লাগে ত' রেডিয়োতে ক্রমশ একটা পাকা-পাকি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে। শুধু রেডিয়োই নয় মাসিমা, গান যদি তার ভাল লাগে তা হ'লে রেকর্ড তোলার ব্যবস্থা করাও সুরেনের পক্ষে খুব কঠিন হবে না।"

অমরেশের কথা শুনে অনুমতি খুসি হলেন, বিশেষত রেকর্ড তোলার কথা তাঁর খুব ভাল লাগল। পারুলের কণ্ঠস্বর রেকর্ডে ধরা প'ড়ে স্থায়ী হবে, এ চিন্তা তাঁর মনকে সন্তুষ্ট করলে। কিন্তু পারুলের নিকট যখন কথাটা উত্থাপিত হ'ল তখন সে প্রথমটা বেঁকে বসল। অনুমতির প্রতি

কাতর দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "না, মা, এ সব হাঙ্গামা আবার কেন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিলে অমরেশ ; সহাস্যমুখে বললে, "অর্থের জন্যে।"

অমরেশের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পারুল বললে, "অর্থের আমার কি প্রয়োজন দাদা ?"

অমরেশ বললে, "অর্থের প্রয়োজন সাধু সন্ন্যাসীরও আছে। জীবন ধারণ করতে হ'লে অর্থ নইলে চলে না।"

"কিন্তু সেজন্যে ত' মা রয়েছেন।"

"কি জন্যে ?"

"জীবন ধারণের জন্যে।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অমরেশ বললে,"সে কি পারুল ! তুমি কি চিরকাল মাসিমার স্কন্ধে চ'ড়ে জীবন ধারণ করবে স্থির করেছ না-কি ?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মৃদুস্মিত মুখে পারুল বললে, "করেছি। চিরকাল মার চরণতলে জীবন ধারণ করব স্থির ক'রেছি।"

পারুলের উত্তর শুনে অনুমতি হেসে উঠে বললেন, "কি অমর, কেমন উত্তর পেলি তা বল ! জব্দ হয়েছিস ত ?"

নিঃশব্দ কৌতুক হাস্যে পারুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অমরেশ বললে, "হয়েছি।"

শেষ পর্যন্ত পারুলকে সম্মত হ'তেই হ'ল। অনুমতি বললেন, "অর্থের তোমার বিশেষ দরকার নেই, সে কথা ঠিক পারুল ! কিন্তু গোপীনাথের ত' অর্থের প্রয়োজনের শেষ নেই ; তাঁর জন্যেই কিছু না হয় উপার্জন কর।"

অমরেশ বললে, "একটা গোপীনাথ-পারুলপ্রভা ফাণ্ড খোলা যাবে।"

অনুমতি বললেন, "গোপীনাথ-পারুলপ্রভা ফাণ্ড খোলা যাবে, না, গোপীনাথ-অমরেশ ফাণ্ড খোলা যাবে, সে কথা পরে বিচার করলেই হবে ; উপস্থিত সাড়ে সাতটা প্রায় হ'য়ে এল, পারুল, তুমি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে নাও ! দেরি কোরোনা।"

পারুল প্রস্থান করলে অনুমতি বললেন, "আমি তোকে ব'লে রাখলাম অমর, যদি কখনো পারুলের পিতৃপরিচয় জানতে পারা যায় তা হ'লে দেখবি সে পরিচয় নিতান্ত সাধারণ হবে না। তোর কৃতিত্ব আমি একটুও কম করছিনে, কিন্তু মাটি ভাল পেয়েছিলি তাই এত শীঘ্র এমন সুন্দর মূর্তি গ'ড়ে তুলতে পেরেছিস।"

অমরেশ বললে, "সে কথা এক শ' বার সত্যি মাসিমা। একেবারে প্রথম দিনেই ওর একটা দল-ছাড়া ভদ্র ভাব লক্ষ্য করেছিলাম।"

ঠিক সাড়ে সাতটার সময়েই সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এসে উপস্থিত হ'ল। অমরেশ তাকে অনুমতির সমীপে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে। মিনিট দশ পনেরর মধ্যে চা পানাদি শেষ হ'য়ে গিয়ে গান আরম্ভ হ'ল। পারুল সব শুদ্ধ চারখানা গান গাইলে—দুটি হিন্দি এবং দুটি বাঙলা।

গান শুনে সবিস্ময় আনন্দে সুরেনের মন ভ'রে উঠ্ল। সে বল্লে, "ভাই অমর, তোমার মতো কঠিন সমালোচকের মুখে সুখ্যাতি শুনে মনের মধ্যে একটা ভালরকম প্রত্যাশা নিশ্চয় জেগেছিল, কিন্তু She has outsoared even my highest expectations ! আমি যদি বলি এঁর মত rich এবং melodious কণ্ঠের দ্বারা এ পর্যন্ত আমাদের ক্যালকাটা রেডিয়ো ষ্টেশনের মাইক সম্মানিত হয়নি তা হ'লে বোধ হয় এমন কিছু অত্যুক্তি করা হয় না।" পারুলকে সম্বোধন ক'রে বল্লে, "দেখুন, আমি শুধু ভাবচি, আপনি এতদিন কেন আমাদের ক্যালকাটা রেডিয়ো ষ্টেশনকে অন্যান্য রেডিয়ো ষ্টেশনের কাছে অপ্রতিভ ক'রে রেখে-ছিলেন !"

পারুলকে রেডিয়োয় গাইতে অনুমতি প্রদানের জন্য সুরেন অনুমতি দেবীকে পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র রেডিয়ো প্রোগ্রামে পারুলের গান সংযুক্ত করতে ত্রুটি হবে না তদ্বিষয়ে বার বার অঙ্গীকার ক'রে গেল। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গোয়ালিয়রের ফিলোজ বংশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, পি আর এস্

অতঃপর মাইকেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাপতিস্ত ফিলোজের কথা বলা যাইতেছে। দে লা ফস্তেন নিজে ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া ইৎমাদদৌলা উপাধিসহ তাঁহার যাবতীয় পদ তাঁহার পোষ্যপুত্রকে প্রদান করিবার জন্য সাহ আলমকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত পরিচারকবংশে ঐ ধরণের পদবীসমূহ পুরুষানুক্রমিক করা সমীচীন বোধে সম্রাট তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন (১৭৯৬ খৃঃ)। অতঃপর লা ফস্তেন তাঁহার সমুদয় পদ এবং সম্পত্তির ভার বাপতিস্তকে সমর্পণ করিয়া অবসর জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে পাটনা নগরে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল (মার্চ্চ ১৭৯৭)। এই ঘটনার কিছুকাল পরে কাপ্তেন ফিলোজ নিষ্ক্রিয় জীবনে বীত-রাগ হইয়া কোন যুদ্ধাভিযানে প্রেরিত হইবার জন্য সিন্ধিয়ার নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার আবেদন অনুকূলভাবে গৃহীত হইয়াছিল এবং দৌলৎরাও ফাইজেলকে ভ্রাতাকে দরবারে আহ্বান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। আদেশ পাইয়া বাপতিস্ত পুণা যাইবার অভিপ্রায়ে সপরিবারে দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে একটি দুর্ঘটনায় পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহাদের গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়াতে তাহার চাকা তাঁহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আঘাতজনিত ক্ষত কালক্রমে আরোগ্য হইলেও শ্বাসকষ্ট বরাবরের মত তাঁহার থাকিয়া যায়। পরিজনবর্গকে দিল্লীতে রাখিয়া বাপতিস্ত পুণায় গিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া মূল্যবান একটী খিলাৎ দিয়া তাঁহাকে হরিয়ানা প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিন রেজিমেন্ট সিপাহী তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। উহাদের লইয়া তিনি হরিয়ানা প্রদেশের প্রধান নগর রেওয়ারীতে গমন করিলেন। "বাপতিস্ত কর্ম্মপ্রাপ্তির পর নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিয়াছিলেন কিন্তু অচিরেই তিনি দেখিলেন তাঁহাকে প্রদত্ত কার্য্যটী নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। তখনকার দিনে বাধ্য না হইলে কেহই রাজকর প্রদান আবশ্যক বিবেচনা করিত না। অধিবাসীগণ নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, কলহপ্রিয় এবং অবাধ্য ছিল। সমগ্র দেশ বিদ্রোহী সৈনিক বা সশস্ত্র দস্যুতে পরিপূর্ণ ছিল। রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ অযোগ্য এবং কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন ছিল। বাপতিস্ত দেখিয়াছিলেন তাঁহার সেনাবল শান্তি রক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সেজন্য তিনি আরও তিনটী রেজিমেণ্ট এবং দুইটী অনিয়মিত কোম্পানী সংগঠন করিয়াছিলেন। একটী রেজিমেণ্ট নারনোল অধিকারে প্রেরিত হইয়াছিল। সে কার্য্য তাহারা সহজেই করিয়াছিল। তাহার পর হইতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের রাজস্ব সহজে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রাও বাদলরাও নামক এক ব্যক্তির নিকট দীর্ঘকাল হইতে টাকা বাকি পড়িয়াছিল। বাপতিস্ত তাঁহাকে হিসাব চুকাইতে বলিয়াছিলেন। বাদল রাওয়ের টাকা দিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিভিন্ন অজুহাতে বহু কাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন। তখন বাপ-তিস্ত বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে তাঁহাকে বাধা প্রদান সম্ভব নহে দেখিয়া বাদলরাও আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।"

ইহার কিছুকাল পরে জর্জ্জ টমাসের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তাহার সুদীর্ঘ বিবরণ টমাসপ্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক। বাপ-তিস্ত এই সময়ে নিজ সৈন্যদলসহ উপস্থিত ছিলেন। টমাসের জীবন-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় ফিলোজ তাঁহার সহিত প্রভুদ্রোহকর চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতা এবং ভ্রাতার গুণ তিনিও লাভ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। উহাদের দুইজনের মতন

বাপতিস্তের সম্বন্ধেও পারিবারিক ইতিহাসে সত্য গোপন করা হইয়াছে। "ফিলোজের দুর্ভাগ্যক্রমে হরিয়ানায় তাঁহার সাফল্য সন্দর্শনে সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি জেনারেল পেঁর'র ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইয়াছিল। ফিলোজ তাঁহার সহিত একটা মিটমাট করিতে সমুৎসুক ছিলেন এবং সেজন্য দিল্লীর কয়েক মাইল পশ্চিমে বাহাদুরগড় নামক স্থানে গিয়াছিলেন। পেঁর'র হেড-কোয়ার্টার্স তখন ঐখানে ছিল। ফিলোজ তাঁহার শিবিরে সাক্ষাৎকারে যাইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল, তাঁহার শিবিরের চতুর্দ্দিকে প্রহরী সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে তথা হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে দেওয়া হয় নাই। ফিলোজের সৈনিকগণ অধিনায়কের প্রতি এবম্বিধ আচরণে মহাক্রোধে পেঁর'কে আক্রমণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং ফিলোজ তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন এবং মহারাজের আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে বুঝাইয়া সম্মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের কোন নেতা না থাকায় সৈনিকগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া সকলে নিজ নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। কাপ্তেন ফিলোজকে দিল্লী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পেঁর তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে ১০ মাস কাল বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে ফাইডেলের চেষ্টায় মহারাজ দৌলতরাও তাঁহার মুক্তির আদেশ দিয়া পেঁর'কে লিখিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অপমানের দুঃখ তাঁহার মন হইতে বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাপতিস্ত অপর একটি বিষম শোক পাইয়াছিলেন। সর্জ্জারাও ঘাটগে এই সময় ফাইডেলের নামে অভিযোগ আনিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে তিনি যশোবন্তরাও হোলকারের সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং স্বীয় প্রভু সিন্ধিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার উপযুক্ত অবসরের সন্ধান করিতেছেন। এই সকল মিথ্যাপবাদ এবং সর্জ্জারাওয়ের সতত শত্রুতাচরণ ফাইডেলের চিত্ত এত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং ফাইডেল ফিলোজের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়াই মনে হয়; কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ বাপতিস্তকে গোয়ালিয়রে তাঁহার হেড-কোয়ার্টার্সে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে মেজর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় দেহরক্ষীগণের নেতৃত্ব তাঁহাকে প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মেজর দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন; সেজন্য সিন্ধিয়া তাঁহাকে নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পদে তিনি দুই বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। নগরের এবং উপকণ্ঠবর্ত্তী জনপদের শান্তি এবং অনাময় হইতে ফিলোজের বিবেচনা এবং কর্ত্তব্যানুরাগের ফল অচিরেই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সম্রাট বাহাদুর তাঁহার কৃতকার্য্যাবলীর মর্য্যাদা এত উচ্চে প্রদান করিয়াছিলেন যে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে যখনই ফিলোজ অশ্বারোহণে বাহির হইবেন তখনই ছয়জন ধ্বজাধারী তাঁহার অনুগমন করিবে। আরও বহু সম্মাননিদর্শন তিনি উঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইভাবে দিল্লীতে কাটাইবার পর বাপতিস্ত গোয়ালিয়রে আহূত এবং সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক ভানপুর অধিকারে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। একার্য্য খুবই সহজ হইয়াছিল, কারণ তিনি নগরসমীপে আসিবামাত্র শ্যামরাও মারিক উহা পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৩৮৭-৯)

এই বিবরণে অনেকগুলি অপ্রকৃত কথা এবং ঐতিহাসিক অসঙ্গতি স্থান পাইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

(১) হাঁসির রাজা জর্জ টমাসের সহিত যুদ্ধে হরিয়ানার শাসনকর্ত্তারূপে বাপতিস্তের উপস্থিতি অপরিহার্য্য। অন্যান্য সূত্র হইতে জানা যায় যে তিনি ঐ সময়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জর্জ্জগড়ের যুদ্ধের পর দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(২) যুদ্ধকালে বাপতিস্ত তাঁহার সহিত প্রভুদ্রোহকর পত্র ব্যবহারে নিরত হইয়াছিলেন টমাসের একথা মিথ্যা করিয়া বলিবার কোন কারণ ছিল না। উহার প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত আক্রোশের কোন কারণ বা পরিচয় পাওয়া যায় না। সিন্ধিয়ার বাহিনীতে বাপতিস্ত এমন কিছু উচ্চপদস্থ বা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না যে তাঁহার

বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া টমাসের কোন স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।

(৩) উত্তর হরিয়ানা প্রদেশের সামান্য কয়েকজন সর্দারকে বাপতিস্ত আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হওয়াতে সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি মহাপ্রভাবশালী পের‍ঁর ঈর্ষ্যা উদ্রেকের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

(৪) টমাসের সহিত সমরারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, উভয় পক্ষে একটা আপোষ নিষ্পত্তির জন্য বাহাদুরগড়ে পের‍ঁর এবং তাঁহার বৈঠক বসিয়াছিল। তাহার ব্যর্থতার ফলে পর মাসে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সুতরাং বাহাদুরগড়ে বাপতিস্ত বন্দী হইলে এবং পরবর্ত্তী দশমাসকাল তিনি দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকিলে তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে সিন্ধিয়ার নিকট তাঁহার জন্য উপরোধ করা সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ বৎসর ১৪ই অক্টোবর তারিখে ইন্দোরের যুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য ফাইডেলও বন্দী হইয়াছিলেন এবং কারাগারে আত্মসংহার করিয়া সিন্ধিয়ার রোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

(৫) ফাইডেলের প্রভুদ্রোহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া দৌলৎরাও যে সঙ্গে সঙ্গে বাপতিস্তকে নিজ দেহরক্ষীদলের নেতৃত্ব এবং মোগল রাজধানীর শাসনভার প্রদান করিবেন এ কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য।

(৬) বাপতিস্ত কোনকালে দিল্লী নগরীর শাসনভার লাভ করেন নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইঙ্গ-মারাঠা সমরে লর্ড লেক কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার পর্য্যন্ত (সেপ্টেম্বর ১৮০৩) কর্ণেল ক্রজেঁয়া দিল্লীর শাসনকর্ত্তা এবং বৃদ্ধ অন্ধ মোগল সম্রাট সাহ আলমের রক্ষক ছিলেন।

(৭) বাপতিস্তের সুশাসনের এবং তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাটের তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার কাহিনীর পরিবর্ত্তে ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে অন্য কথা প্রমাণ হয়। তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত অবাধ্য এবং নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল; একবার বাদসাহ সাহ আলমের আদেশে তাহাদের অতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাঁহার ব্যাটালিয়নত্রয় দিল্লী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল উক্ত রাজাধিরাজ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত আদেশ যাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল তাহার বোধ হয় এইটিই একমাত্র লিপিবদ্ধ নিদর্শন। প্রদত্ত আদেশ এবং যে প্রকার তৎপরতার সহিত তাহা বাস্তবে পরিণত করা হইয়াছিল তাহা হইতে মনে হয় যে বাপতিস্তের সিপাহীগণ উৎপাত বিশেষে দাঁড়াইয়াছিল।

সুতরাং আমরা মনে করিতে বাধ্য যে ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হইয়া পের‍ঁ বাপতিস্তকে বন্দী করেন নাই; বরং শত্রু পক্ষের সহিত রাজদ্রোহকর চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মুক্তিলাভ করিবার পর দিল্লীতে কিছুকাল (অবশ্য ফৌজদার রূপে নহে), অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাটালিয়ন ছয়টি লইয়া পের‍ঁ নিজ চতুর্থ ব্রিগেডের পত্তন করেন। পরিবর্ত্তে বাপতিস্ত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ফাইডেলের পরিত্যক্ত সেনাদলের পরিচালনভার লাভ করেন। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার দলে ৮ ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী এবং ৪৫টি তোপ ছিল। তন্মধ্যে মেজর জন জেমস দুপোঁ নামক জনৈক ওলন্দাজ জাতীয় অফিসরের অধীনে চারিটী ব্যাটালিয়ন সুবিখ্যাত আসাইয়ের যুদ্ধে কর্ণেল ওয়েলেসলীর (উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অফ ওয়েলিংটন) হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট সৈন্যসহ বাপতিস্ত উজ্জয়িনী-নগর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। সিন্ধিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া ফিলোজ মালব ছাড়িয়া একেবারে রাজপুতানায় পলায়ন করিয়াছিলেন। সমরাবসানের পর আবার তিনি প্রভুসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহার পর আরও দীর্ঘকাল তদীয় কর্ম্মে নিরত ছিলেন। তিনিই একমাত্র ইউরোপীয় অফিসর যিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের সমরের পর কর্ম্মচ্যুত এবং ইউরোপে প্রেরিত হন নাই। তাঁহার প্রতি ইংরাজ গভর্ণ-মেণ্টের এই বিশেষ অনুগ্রহের কারণ কি বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট হইতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই; বরং সিন্ধিয়ার দরবারে তাঁহার উপস্থিতি তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাকর হইবে বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিতাড়িত করেন নাই।

"যুদ্ধের ফলে বিশাল রাজ্যাংশ সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানে অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার তটবর্ত্তী জনপদে ইংরাজাধিপত্য এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্ধিয়া তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্যে যাহাতে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব সুদৃঢ় থাকে এবং রাজকর নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হয় সেজন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সে কারণ ফিলোজ কখনও বা বুন্দেলখণ্ডে, কখনও বা মালবদেশে কখনও বা রাজস্থানে অবাধ্য সর্দ্দারগণকে সায়েস্তা করিয়া ফিরিয়াছিলেন। মালব প্রদেশে তিনি অষ্টা, সিহোরা, ভিলসা প্রভৃতি স্থানসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। উহাতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। সুধু খাণ্ডোয়া দুর্গ অবরোধে চারি মাস সময় লাগিয়াছিল। মালব জয় এবং শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া ফিলোজ সিপ্রিতে নিজ হেড-কোয়াটার্স স্থাপন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি সিন্ধিয়ার আর একটি বিশেষ মূল্যবান উপকার সাধন করিয়াছিলেন। বিগত সমরে সিন্ধিয়ার কামান সমূহের এবং সমর সম্ভারের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার আর কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিন ফিলোজ সংবাদ পাইলেন মুনির খাঁর ভ্রাতা শামাৎ খাঁ ৬০টী কামান এবং সুসজ্জিত একদল অশ্বারোহী ও পদাতিকসহ মালবাভিমুখে যাইতেছেন। তিনিও সন্ধ্যাকালে রওনা হইলেন এবং সারারাত্রি একাদিক্রমে চলিয়া ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রাতঃকালে উহাদের অতর্কিত আক্রমণে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সমগ্র তোপখানা করায়ত্ব করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে কয়েকটী কামান ঝাঁসিতে আজিও দৃষ্ট হয়। স্বল্পকাল পরে স্বয়ং দৌলৎরাও সিপ্রিতে আসিয়াছিলেন। ফিলোজ তাঁহাকে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধিত করিয়া নবলব্ধ কামানগুলি উপঢৌকন দিয়াছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বে এবং রাজভক্তিতে প্রীত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে একটী মূল্যবান খেলাৎ দিয়া কর্ণেল পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাহার সনদ পত্রে "ইৎমাদ-উদ-দৌলা কর্ণেল জন বাপতিস্ত ফিলোজ বাহাদুর, বুর্গ-ই-জঙ্গ" ইত্যাদি নাম লিখিত দেখা যায়।

"বিগত সমরে তাঁহার বিষম ক্ষতি, বিশেষতঃ সমর সম্ভারের, কতকাংশে পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে সিন্ধিয়া সাঙ্গোর নামক স্থান অধিকারে ইচ্ছুক হইয়া ফিলোজকে ঐ কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। তিন সপ্তাহ ব্যাপী অবরোধের পর নগরের পতন হইয়াছিল এবং সৈনিকবৃন্দের প্রতি তাহা লুণ্ঠনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। লব্ধ ধনরাশির অধিকাংশ রাজকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। অস্ত্রাগারে সঞ্চিত প্রচুর সমর সম্ভার ফিলোজের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি বহু সংখ্যক নূতন তোপ ঢালাইও করিয়াছিলেন। গুলিগোলা বারুদাদিও বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"এইরূপে ফিলোজ যখন তাঁহাকে অর্পিত কার্য্যভারসমূহ একটির পর একটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া যশ এবং গৌরবের পথে অধিরোহণ করিতেছিলেন এবং সিন্ধিয়ার সমস্ত বিদেশী অফিসরের মধ্যে তাঁহার স্নেহপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যদর্শনে বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছিল। যশোবন্তরাও লোলকার সিন্ধিয়াকে ফিলোজের উপর অতটা প্রত্যয় স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার নিজের ইংরাজ অফিসরগণের কথা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে ইংরাজগণের সহিত ভবিষ্যতে বিরোধ দেখা দিলে, বিদেশী অফিসরগণ তাঁহাদের সহিত যোগ দিলে তাঁহার পক্ষে আত্মরক্ষা দুর্ঘট হইবে। ফিলোজের নিজের কাছেই তাঁহার একটি বিষম বিশ্বাসঘাতক শত্রু বিরাজ করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি তাঁহার মুন্সী যশোবন্তরাও। উহাদের প্ররোচনায় দৌলৎরাও ফিলোজকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ঐ কার্য্য করিতে সক্ষম হইলে মুন্সীকে কর্ণেল পদসহ সৈন্য দলের নেতৃত্ব প্রদত্ত হইবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর সিন্ধিয়া তাঁহাকে মালব হইতে সাঙ্গোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি যখন মহারাজের শিবির সন্নিধানে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন তখন মুন্সী তাঁহাকে বুঝাইল এভাবে সাড়ম্বরে সদলে নৃপতি সন্নিধানে গমন না করিয়া নিভৃতে রাত্রিযোগে সামরিক বাদ্যাদি ব্যতিরেকে যাওয়াই শ্রেয়; সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকগণকে যদি আবশ্যক হয় তজ্জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রক্ষা করা প্রয়োজন। ফিলোজ

তাঁহার প্রস্তাবে সায় দিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়ার শিবিরে আসিয়া তিনি শুনিলেন মহারাজ শয়ন করিতে গিয়াছেন, পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই ঘটনায় কতকটা বিস্মিত হইলেও রাজাদের খেয়ালের কথা মনে ভাবিয়া তিনি শঙ্কানুভব করিলেন না। এইরূপে মুন্সীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। সে সিন্ধিয়াকে বুঝাইল যে নিশীথে অদূরে সেনাদল সজ্জিত রাখিয়া দস্যু সর্দ্দারের মত ফিলোজ নিঃশব্দে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল; সুতরাং সময় থাকিতে তিনি সাবধান না হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। ফিলোজের বাহিনীর প্রধান প্রধান অফিসরগণ আহুত এবং তাঁহাদের অধিনায়ককে বন্দী করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ঐ হীন কার্য্যে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া দৌলৎরাও তাঁহার দুইজন সভাসদকে ফিলোজকে বৈঠকে আহ্বান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার আগমন মাত্রে তাঁহাকে ধৃত করা হইয়াছিল। এই অবমাননায় ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইলেও ফিলোজ, বিশ্বস্ত পরিচারকরূপে, কোন প্রকার বাধাপ্রদান তাঁহার কর্ত্তব্য নহে বলিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন।

"ফিলোজের কারারুদ্ধ হইবার সংবাদে তাঁহার সৈনিকগণ এবং অপরাপর সুহৃদবর্গের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া দৌলৎরাও মুন্সী কর্ণেল পণ্ডিত যশোবন্তরাওকে কালবিলম্বব্যতিরেকে সৈন্যদলকে বাঁশওয়ারার ছাউনীতে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। আশা ছিল দূরবর্ত্তী স্থানে স্বল্পকাল মধ্যে উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

"দীর্ঘ দেড় বৎসর বন্দীত্বের পর ফিলোজের দুঃখ রজনী প্রভাত হইয়াছিল। প্রখ্যাতনামা মারাঠা সর্দ্দার বাপু সিন্ধিয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতায় এবং প্রভুভক্তিতে সবিশেষ আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে দৌলৎরাও ফিলোজকে মুক্তি প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন এই সর্ত্তে যে, তাঁহার পুত্র জুলিয়ান স্বীয় পিতার সদাচরণের জন্য দরবারে প্রতিভূস্বরূপ রক্ষিত হইবে। অতঃপর স্বীয় পূর্ব্বপদে পুনর্নিযুক্ত হইয়া বাঁশওয়ারা হইতে সেনাদলের পরিচালনভার লইয়া ফিলোজ পুনরায় মালবদেশে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর কিছুকাল তিনি মালব, বুন্দেলখণ্ড এবং রাজপুতানা হইতে রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন।"

ফিলোজবংশের ইতিহাসে অতঃপর তাঁহার দীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট মূল্যবিহীন সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযানের কথা আর এখানে দেওয়া হইল না। তিলকে তাল করার যে অপচেষ্টা উহাতে দেখা যায় তাহা নিতান্ত হাস্যকর। বাপতিস্ত ফিলোজকে উহাতে জগতের যাবতীয় গুণরাশির আধারে পরিণত করা হইয়াছে। নির্লজ্জ স্তুতিবাদ যে কতদূর যাইতে পারে উদ্ধৃত অংশটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন,—

"অল্প বয়স হইতে জন বাপতিস্ত স্বীয় বিচক্ষণতা এবং সৎ স্বভাবের জন্য যাহাদের সহিত সম্পর্কে আসিতেন তাহাদের সকলেরই প্রিয় হইতেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গোলাকার ছিল এবং দেহাকৃতি শরীরের বিশাল দৈর্ঘ্য এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সুডৌলের জন্য বৈশিষ্ট্যশালী ছিল। সর্ব্ববিধ স্বভাবে তিনি নিতান্ত সাধাসিধা ধরণের ছিলেন। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে কতকটা গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হইত; মানুষটির ভিতরের দৃঢ়তা এবং একগুঁয়েমি যেন বাহিরের আকৃতিতে প্রকাশ পাইত। কিন্তু যাহারা তাঁহার পরিচিত ছিল তাহাদের নিকট তিনি নিতান্ত সহজলভ্য এবং বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। অর্থলিপ্সু অথবা অমিতব্যয়ী তিনি ইহার কোনটি ছিলেন না বরং স্বীয় আয়ের ভিতর পরিমিতভাবে জীবনযাপন করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট পরনিন্দা করিবার জন্য আসিলে সমর্থন পাইত না। কিন্তু নিজ সমকক্ষগণকে তিনি সতত পরম সৌজন্যসহকারে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের সাহচর্য্যে তিনি আনন্দিত, সন্তুষ্ট এবং রঙ্গরসপ্রিয় হইতেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কবিতা লেখকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য পালনে তিনি সর্ব্বদাই পরিশ্রমী ছিলেন; এবং উন্মুক্ত সামরিক জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ অসুবিধাসমূহ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। যে সমাজে চরিত্ররক্ষার কোন মূল্য

প্রদত্ত হইত না তাহাতে বাস করিয়াও তিনি নিজ স্ত্রীর প্রতি অবিচল ছিলেন; উক্ত মহিলাও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার ভালবাসার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। অসহায় এবং মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাগণের প্রতি তিনি সর্ব্বদা দয়ালু ছিলেন; এবং তাঁহার আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি তাঁহার বদান্যতাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি ক্যাথলিক চর্চ্চের সদস্য ছিলেন এবং সুবিধা পাইলে প্রার্থনাকালে তিনি নিয়মিতভাবে গির্জ্জায় উপস্থিত হইতেন। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে ফিলোজ বহু গুণ এবং স্বল্প দোষসমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বর্ত্তমান ইতিহাস যেমন অগ্রসর হইবে তাহা হইতে তাঁহার এই চরিত্রবিশ্লেষণ সমর্থিত হইবে।" (পৃঃ ৩৮৬-৮৭)।

বাপতিস্ত সম্বন্ধে সমসাময়িক লেখকবৃন্দের রচনা মধ্যে বহু উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল হইতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় ইহার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। ব্রাউটনের "Mahratta Camp" গ্রন্থে প্রকাশ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বাপতিস্তের অবস্থা মোটেই সুখকর ছিল না। সৈন্যদলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। বেতনাভাবে এবং তাঁহার অত্যাচার দুর্ব্যবহারে সৈনিকগণ অধিকাংশ সময় প্রকাশ্য বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া থাকিত। একবার উহারা অভ্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে এবং অপরাপর ইউরোপীয় অফিসরগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল। অনেককে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল, কাহারও কাহারও কামানের lockএ পুরিয়া কাণ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। "হিন্দুদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যের এবং ন্যায়ের খাতিরে আমি একথা বলিতে বাধ্য যে উহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে জগতে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বাধ্য বা সহজে শাসন করিবার মত আর কোন জাতি নাই। সিন্ধিয়ার দুইটি রেগুলার ব্রিগেডের সিপাহীগণের ব্যবহারের তারতম্য হইতে এ কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। কর্ণেল জেকবের সৈনিকগণ কদাচিৎ কোন গোলমাল বা অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে; তেমনই বাপতিস্তের সৈন্যগণ খুব কম সময় সম্পূর্ণ বিদ্রোহের অবস্থার বাহিরে অবস্থান করে। যে বিভিন্ন উপায়ে তাহাদের বেতন প্রদত্ত হয় তাহারই প্রতি এই পার্থক্যের কারণ আরোপ করা যাইতে পারে। স্বীয় কোরের (corps) ব্যয়নির্ব্বাহার্থ জেকবকে প্রদত্ত কতকগুলি জায়দাদ আছে; পক্ষান্তরে বাপতিস্ত সম্পূর্ণরূপে সরকারের প্রতি নির্ভরশীল। সৈনিকগণের বেতনের সামান্য পরিমাণ অংশ আদায়ের জন্য তাহাকে প্রায়ই ধর্ণা, বিদ্রোহ অথবা অপরাপর মারাঠা পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়।" বাপতিস্তকে তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক বলিয়া কেহ উল্লেখ করিলে দৌলৎরাও বলিয়াছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়াছেন যে শ্রেষ্ঠ সেনানায়কবর্গই বদমাইসের শিরোমণি হইয়া থাকে।

কর্ণেল স্লিম্যানের গ্রন্থ হইতে বাপতিস্ত সম্বন্ধে একাংশমাত্র দেওয়া যাইতেছে,—"১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ ভদ্রলোকগণ যেমন নিয়মিতভাবে তিতির পাখী শিকারে গমন করেন পিণ্ডারীরাও তেমনই প্রত্যেক বৎসর নভেম্বর মাসে দশহরা উৎসবের পর "দিগ্বিজয়ে" গমন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বাপতিস্ত ফিলোজের একটি অভিযানের কথা বলিব। পিণ্ডারীযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার বাহিনীর একাংশের নেতৃত্ব লইয়া তিনি এইরূপ একটি অভিযানে গিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র হইতে তিনি প্রথম কেরৌলি যান এবং তথাকার রাজার নিকট হইতে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের শুভূগড় জেলা হস্তগত করেন। অতঃপর প্রাচীন বুন্দেলাসর্দ্দারবৃন্দের মধ্যে অন্যতম চন্দেরীর রাজার জনপদ তিনি অধিকার করিলেন। তাহার আয় ছিল বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা। রাজাকে বার্ষিক ৪০০০০৲ টাকা বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। অনন্তর রঘুগড় এবং বাহাদুরগড়ের রাজা দুইজনের রাজ্য তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় তিন লক্ষ টাকা; ভরণপোষণের জন্য কুমারত্রয়কে বার্ষিক ৫০০০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি লোপার দখল করেন। উহার আয় ছিল বার্ষিক ১॥০ লক্ষ টাকা। রাজাকে ২৫০০০৲ টাকা আয়ের বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর তিনি গড়্হাকোট অধিকার

করেন। তথাকার রাজা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভাতা পাইয়া থাকেন। বাপতিস্ত তাঁহার দিগ্বিজয় সমাধা-মাত্র করিয়াছেন এমন সময় আমাদের সৈন্যদল পিণ্ডারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিল।" ফিলোজবংশের ইতিহাসে এই অভিযানগুলির বিবরণ নানা ভাবে পল্লবিত হইয়া অত্যদ্ভুত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

পিণ্ডারী-যুদ্ধ হইতে কি ভাবে ধীরে ধীরে তৃতীয় মারাঠা সমরের (১৮১৭-১৮ খৃঃ) উদ্ভব হইয়াছিল তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার ফলে পেশবার রাজ্যলোপ এবং ভোঁসলা ও হোলকরের রাজ্য বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সিন্ধিয়ার সহিত ইংরাজদিগের শেষ পর্য্যন্ত বলপরীক্ষা না হইলেও তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা প্রথমে দেখা গিয়াছিল। ইংরাজ সেনার গোয়ালিয়র আক্রমণ আশঙ্কায় দৌলৎরাও বাপতিস্তকে তাঁহার সেনাদলসহ অবিলম্বে রাজধানী রক্ষার আগমনের আদেশ দিয়াছিলেন। ফিলোজবংশের ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন যে "তিনি প্রভুর কার্য্যসাধনে নিতান্ত উন্মুখ হইলেও এক্ষণে নিজেকে অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সিপাহীগণ বিগত ৪০ মাস যাবৎ কোন বেতন পায় নাই এবং তাহারা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না হইলে যাত্রা করিতে অসম্মত হইয়াছিল। অফিসর এবং সাধারণ সৈনিক, সকলেই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল এবং সেজন্য আমরা তাহাদের দোষ দিতে পারি না। ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে ফিলোজের এক সময়ে সুবিখ্যাত বাহিনী অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি বহু আয়াসের পর সামান্য একটি ছোট দল লইয়া গোয়ালিয়র ছাউনীতে আসিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে মহারাজ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণেলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন এবং নূতন অফিসরগণকে সেনাদল গোয়ালিয়রে আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সৈনিকগণের বক্রী বেতন সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাহাদের না থাকায় তাহাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। সৈন্যদলের অবস্থা দিন দিনই হীনতর হইতে লাগিল।

"ইতোমধ্যে ফিলোজ প্রকাশ্যভাবে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা ভাতা দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজদিগের সহিত গোপনে চক্রান্ত করিবার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত হইয়াছিল, যদিও তাহার অসম্ভাব্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। তিনি ইংরাজজাতীয় ছিলেন না, মহারাজের নিকট হইতে তিনি সুপ্রচুর বেতন লাভ করিতেন, ইংরাজদিগের নিকট হইতে তিনি কিছুরই আশা করিতে পারেন না। অভিযোগকারিদিগকে তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের একমাত্র উত্তর ছিল যে, গোয়ালিয়রে স্বীয় বাহিনী না আনাই তাঁহার দাগাবাজির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যদি তাহাদের হিসাব নিকাশ করা হইত তাহা হইলে সৈনিকগণ নিশ্চয়ই পুনঃ পূর্ব্বাবারের মতই সতেজে লড়িত।

"ফিলোজ দীর্ঘ ৭ বৎসর কাল এই ভাবে নজরবন্দী হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত তাঁহার যাবতীয় ধনসম্পত্তাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইয়া যাওয়াতে এবং নিজেও তিনি তখন প্রৌঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভবিষ্যতে মুক্তিলাভ বা কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়ে ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুহৃদ্বর্গ তাঁহার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহার নির্দ্দোষিতা সকলকার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। বাপু ভাবলে নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী সর্দ্দার ফিলোজের মত সুদক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ একজন কর্ম্মচারীকে তাঁহার পূর্ব্বতনপদ এবং অভিজ্ঞতার অনুরূপ কোন কার্য্য ~~দিবার জন্য [illegible]~~ অনুরোধ করিতেছিলেন। জুলিয়ান ফিলোজও পিতার মুক্তির জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। পরিশেষে সিন্ধিয়া ইহাঁদের সকলকার সম্মিলিত অনুরোধে বাপতিস্তকে মুক্তি দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁহাকে একথাও জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার সৈনিকগণের বক্রী বেতন দানের অথবা তাঁহার ধনসম্পত্তির ক্ষতিপূরণের কোন কথায় তিনি কর্ণপাত করিবেন না। ২৪শে ডিসেম্বর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া

ফিলোজকে প্রকাশ্য দরবারে একটি মূল্যবান খেলাৎ দিয়া সেনাবিভাগে স্বীয় পূর্ব্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহার মাসিক বেতন আবার ২০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।[৭]

এইরূপে সেনাবিভাগে তাঁহার পুরাতনপদ এবং বেতন তাঁহাকে প্রত্যর্পিত হইলেও নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্যের ভার মহারাজ তাঁহাকে দেন নাই। কিন্তু "জান বাটিসটা"র সামরিক খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই সময় অ্যালার, কোর্ট, ভেঞ্চুরা, অভিতাবিলপ্রমুখ তাঁহার নবলব্ধ ইউরোপীয় সৈনিকবর্গের সাহায্যে নিজবাহিনী সংগঠন করিতেছিলেন। তিনি ফিলোজকে তাহার কর্ম্মগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাপতিস্ত যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, জানাইয়াছিলেন দুই পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সিন্ধিয়া মহারাজের সেবক, অপর কোথাও কর্ম্ম করিতে তাঁহার স্পৃহা নাই।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দৌলৎরাওয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না এবং তিনি কোন দত্তকও গ্রহণ করেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি ইংরাজগবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজ্যভার দিয়া যান এবং বৈজা বাইকে তাঁহাদের পরামর্শ মত চলিতে বলিয়া যান। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার ইচ্ছানুসারে জনকজী সিন্ধিয়া নামক একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে সিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার অভিভাবকরূপে রাজকীয় সমুদয় কার্য্যের ভার বৈজা বাইয়ের হস্তে ন্যস্ত রহিল। তিনি অল্পকাল পরে বাপতিস্তকে পুনরায় বুন্দেলখণ্ডের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে বৈজাবাইয়ের সহিত নবীন নৃপতির বিরোধ বাধিয়াছিল। ইহাতে ফিলোজ শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বৈজার আবেদন স্পষ্ট অমান্য, এমন কি মহারাণী তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা জনকজীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা এবং নজর প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর বৈজাবাই গোয়ালিয়র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশরাজ্যে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদ সহরে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত সহরে "বাই-কা-বাগ" নামে একটি পাড়া আজিও তাঁহার ক্ষীণ-স্মৃতি বহন করিতেছে।

এই সকল উপকারের মূল্যস্বরূপ নবীন সিন্ধিয়ার দরবারে কর্ণেল ফিলোজের প্রভাব প্রতিপত্তির অন্ত রহিল না (১৮৩৩ খৃঃ)। তিনি ঝাঁসীর তোপখানার অধ্যক্ষ এবং বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি এই সময় হইতে মৃত্যুকাল অবধি গোয়ালিয়র নগরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র জুলিয়ান তাঁহার নামে বুন্দেলখণ্ডের শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

গোয়ালিয়র বাহিনীতে এই সময় ৩০ রেজিমেণ্ট পদাতিক সৈনিক ছিল। তন্মধ্যে কর্ণেল আলেকজাণ্ডারের অধীনে তিনটী, আপ্পাজীর অধীনে ছয়টি, কর্ণেল জেকব এবং তাঁহার পুত্র মেজর ডেভিডের অধীনে ১১টী, কর্ণেল বাপতিস্ত ফিলোজের পাঁচটী, মহারাজের মাতুল মামুসাহেবের অধীনে দুইটি এবং বাবু বাওলীর দলে তিনটী রেজিমেণ্ট ছিল। প্রতি রেজিমেণ্টে ৬০০ সৈনিক এবং চারিটী মেঠো তোপ থাকিত। "জিনসি" বা তোপখানায় বিভিন্ন আকারের প্রায় ২০০ কামান ছিল। গোলন্দাজবাহিনী তাদৃশ সুদক্ষ ছিল না বলিয়া স্লিমান লিখিয়া গিয়াছেন।

কর্ণেল জেকব সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঐ ব্যক্তি আর্ম্মানীজাতীয় ছিলেন। উহার পিতা পেট্রস (বা পিটার) এরিভাণ নগরের অধিবাসী জনৈক বণিক ছিলেন এবং বাণিজ্যব্যপদেশে এদেশে আসিয়া দিল্লীনগরে বাস করিতে থাকেন। ২৪শে মার্চ্চ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মোগল রাজধানীতে জেকবের জন্ম হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে সামরিক জীবনে তাহার অনুরাগ ছিল, পৈতৃক পেশা তাহার ভাল লাগিত না। পিতার মৃত্যুর পর নিজ সামান্য পুঁজি দ্বারা জেকব কয়েকজন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমে সর্দ্দার-বৃন্দকে সুবিধামত উহাদের ভাড়া দিত। ভরতপুরের রাজার কর্ম্মে সে প্রায় তিন বৎসর কাটাইয়াছিল। ডি-বইন যখন তাঁহার সেনাদল গঠন করিতেছিলেন জেকব তখন তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধে জেকবের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া সিন্ধিয়া

তাঁহাকে কর্ণেল পদসহ একটি ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছিলেন। উহাতে ১২ রেজিমেণ্ট পদাতিক, ৪ রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী এবং ১৫০টী তোপ ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সৈনিকগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সিন্ধিয়া তাঁহাকে অম্বাহ, কাটবাল, ভিণ্ড, এবং আট্টার এই চারিটী ইলাকা বা জেলা জায়দাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব বেতন মাসিক তিন সহস্র টাকা ছিল। তদ্ভিন্ন জাগসৌলি এবং সুসার এই দুইটি গ্রাম তাঁহাকে 'নানকর" প্রদত্ত হইয়াছিল। সৈনিকগণকে যথানির্দ্দিষ্টকালে তিনি বেতন প্রদান করিতেন। সে জন্য উহারা তাঁহার খুব অনুগত এবং সর্ব্ববিধ আদেশ পালনে সদাই তৎপর ছিল। ২৪শে জুন ১৮২০ খৃষ্টাব্দ সিন্ধিয়ার সৈন্যদলে দীর্ঘ ১০ বৎসর কর্ম্মজীবনের পর ৯২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। কর্ণেল জেকবের জ্যেষ্ঠপুত্র মেজর ডেভিড মাসিক ১৮০০৲ টাকা এবং কনিষ্ঠ পুত্র কাপ্তেন ওয়েন মাসিক ৯০০৲ টাকা বেতনে পিতার সৈন্যদলে নিযুক্ত ছিল। পিতার জীবদ্দশায় ডেভিড মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করে। উহার এক কন্যা ফেরিণের বেগম সমরুর বাহিনীর মেজর অ্যাণ্টনিও রেঘেলিনির পুত্র মেজর ষ্টিফেন রেগেলিনির সহিত বিবাহ হইয়াছিল। উহাদের বংশীয়গণ এখনও আগ্রায় বাস করিতেছে এবং কর্ণেল জেকবের বংশধররূপে সিন্ধিয়া দরবার হইতে বৃত্তিভোগী। পিতার মৃত্যুর পর কাপ্তেন ওয়েন জেকব গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় বাস করিতে গিয়াছিলেন। তথায় সিপাহী বিদ্রোহকালে তিনি বিদ্রোহীগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জনকজী সিন্ধিয়ার দেহান্ত হইয়াছিল। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। মহারাণী তারাবাই নিজেই অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। তিনি জয়াজী রাও নামক একটি বালককে দত্তক লইয়াছিলেন। রাজা এবং তাঁহার অভিভাবক উভয়েই নাবালক হইলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল। গোলযোগ বিশৃঙ্খলার অন্ত রহিল না। রাজ্যের সেনাবল প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ছিল। উহারা এক্ষণে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইল। রাজ্য মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড এলেনবরা আগ্রা হইতে ইংরাজ বাহিনীকে চম্বল নদ উত্তীর্ণ হইয়া গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। "রাজধানী হইতে দশ ক্রোশ দূরে চান্দা নামক স্থানে শত্রু সৈন্য আসিয়া পৌছিয়াছে সংবাদ পাইয়া তারাবাই এবং প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত দাদা খাসজীওয়ালা উহাদের বাধা দিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতজী ফিলোজকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তারাবাই তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করিয়া চান্দার গমনোদ্যত সেনাদলের পরিচালনভার লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। বিষম অনিচ্ছার সহিত ফিলোজ তাহা করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং ইংরাজদিগের সহিত বিরোধের সে-পরিণাম এক ভিন্ন অপর প্রকার হইতে পারে না তাহাও তাঁহার অজানা ছিল না। এসকল সত্ত্বেও তিনি এতকাল যে সরকারের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন সাধ্যমত তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং সে কারণ প্রধান সেনাধ্যক্ষরূপে চান্দা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে বশ্যতা শৃঙ্খলার লেশমাত্র ছিল না। সেনানায়কগণ খুসী এবং খেয়ালমত চলিতেছিলেন ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। মহারাজপুর এবং পনিয়ার নামক দুই বিভিন্ন স্থানে একই তারিখে (২৯।১২।১৮৪৩) সংঘটিত দুইটি যুদ্ধে ইংরাজসেনা বিজয়লাভ করিল। ফিলোজ অবস্থা আশাহীন দেখিয়া গোয়ালিয়রে ফিরিয়া আসিলেন। বিজয়ী ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ রাজ্য সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্য সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। গোয়ালিয়রে রক্ষিত বৃটীশ সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চন্দেরী এবং বুন্দেলখণ্ডের আরও একটী স্থানের রাজস্বভার ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। পদচ্যুত সৈনিকগণের মনে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যে ধূমায়িত আক্রোশের সঞ্চার হইয়াছিল কয়েক বৎসর পরে সিপাহীবিদ্রোহকালে তাহাই প্রজ্বলিত অনলে পরিণত হইয়াছিল।"

ইংরাজদিগের সহিত সমরে বাপতিস্তের কীর্ত্তিকলাপ

কমটন অন্যভাবে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফিলোজ যাহাতে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে না হয় সেজন্য নিজের সৈনিকগণ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কারণ ইংরাজ কোম্পানীর কাগজে তাঁহার চার লক্ষ টাকা ছিল। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিলে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহার অফিসরগণের মধ্যে দুইজন ব্যতীত আর সকলেই সম্ভবতঃ অনুরূপ কারণে সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়াছিল।*

বাপতিস্তের পুত্র জুলিয়ান পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়—অ্যান্টনি, পিটার, ফ্রেন্স এবং মাইকেল,—সকলেই তখন সেনা-বিভাগে কাপ্তেন পদে অধিষ্ঠিত। সিন্ধিয়া অ্যান্টনিকে বুন্দেলখণ্ডে পিতার শূন্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জুলিয়ানের বিধবাকে মাসিক ১৫০০০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল।

"এই ঘটনার অল্পকাল পরে বাপতিস্ত শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় সপ্ততিবর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং প্রয়াণের আর বিশেষ বিলম্ব নাই তিনি বুঝিয়াছিলেন। পৌত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয় পৌত্র পিটারই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। উহাকে তিনি স্বীয় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মারাঠা প্রথানুসারে স্বীয় পদ এবং সম্মানসূচক উপাধিসমূহ তাহাকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে অবসর জীবন যাপন করিবার অনুমতি দিবার জন্য সিন্ধিয়া মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর "ইৎমাদ-উদ্-দৌলা কর্ণেল পিটার ফিলোজ বাহাদুর বাক-ই-জঙ্গ"কে মূল্যবান একটি খেলাৎ দিয়া সিন্ধিয়া তাঁহাকে পিতামহ বা পালিত পিতার যাবতীয় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার স্বল্পকাল পরেই জন বাপতিস্ত 'বিশ্বরাষ্ট্রের মহান অধীশ্বরের সম্মুখে স্বীয় নজর প্রদান করিতে ২রা মে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সায়াহ্নে গমন করিয়াছিলেন।' তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদে সমগ্র সিন্ধিয়া রাজ্য তথা গোয়ালিয়র নগরী গভীর শোকে নিমগ্ন হইয়াছিল।" প্রায় শত বর্ষ পরে আজিও গোয়ালিয়রের অধিবাসীগণের মুখে তাঁহার নাম ভক্তিভরে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। তাঁহার সমাধির উপরে পিটার শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের সুন্দর একটী স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পিটারের দেহান্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা মেজর ফ্রেন্স দীর্ঘকাল গোয়ালিয়র আপীল কোর্টের অন্যতম বিচারকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ স্যার মাইকেল ফিলোজই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তিনি অ্যান ডোণেরী নামক একটী মহিলার পাণিপীড়ন করেন। সে বিষয়ে ফিলোজরা কতকটা দেশীয়ভাবাপন্ন হইয়াছে বলিতে হয়।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সিন্ধিয়ার দরবারে কর্ম্মে প্রবেশ করেন। সিপাহী বিদ্রোহকালে সিন্ধিয়ার সৈনিকগণ বিদ্রোহীদিগকে যোগ দান করিলে জয়াজীরাওয়ের সহিত মাইকেলও আগ্রায় পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এবং সৈন্যদলে মেজর পদে উন্নীত হন। মাইকেলের সুদক্ষ স্থপতি বলিয়া নাম ছিল। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স-অফ ওয়েলসরূপে যখন ভারতবর্ষে আসেন তাহার পূর্ব্বে সিন্ধিয়া মহারাজের আদেশে মাইকেল তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য গোয়ালিয়র নগরে 'জয়বিলাস প্রাসাদ" নির্ম্মাণ করেন। তদ্ভিন্ন "মতিমহল," "জলমহল," বিচারালয়, জেলখানা ইত্যাদি আরও অনেকগুলি ইমারৎ তাঁহার পরিকল্পনানুসারে এবং তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৭৯-৮১ সালে মালবপ্রান্তের সর্ব্বপ্রথম রাজস্বসম্বন্ধীয় জরিপ কার্য্য তিনি করেন এবং পর বৎসর তথাকার শাসনভার তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। জয়াজীরাওয়ের দেহান্তের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সিন্ধিয়া মাধব রাওয়ের নাবালক অবস্থায় মাইকেল ফিলোজ বহু দায়ীত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শাসনপরিষদের অন্যতম সদস্য এবং মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল

* Compton :—"European Military Adventurers", p. 354.

পর্য্যন্ত রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহামান্য পোপ বাহাদুর তাঁহাকে নাইট অফ দি অর্ডার অফ সেণ্ট সিলভ্যাষ্টার নামক গৌরবময় উপাধি দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সাধারণে সার মাইকেল ফিলোজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; যদিও উক্ত বৈদেশিক উপাধির জন্য তিনি বৃটীশ রাজত্বে "সার" আখ্যা লাভে বৈধ অধিকারী ছিলেন না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ণেল পদে উন্নীত হন। গুণগ্রাহী ভারত সরকার তাঁহাকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ই, এবং তিন বৎসর পরে দিল্লী দরবার উপলক্ষে কে, সি, আই, ই, উপাধি দিয়াছিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাইকেল ফিলোজের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুইটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা ছিল।

লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল ক্লেমেণ্ট ফিলোজ:—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি ইউরোপে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র সরকারের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ইনি পুলিশের ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল, সৈনা-বিভাগের ইনস্‌পেকটিং অফিসর, মিলিটারী সেক্রেটারী ইত্যাদি হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে M. V. O. উপাধি দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে গোয়ালিয়র রাজ্যে A. F. Filose নামে একজন হাইকোর্টের জজ এবং কর্ণেল অ্যালবার্ট ফিলোজকে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। সুতরাং সাধারণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের বংশধরগণ হইতে ফিলোজদিগের যে কিছু পার্থক্য আছে তাহা বলিতে হইবে। (সমাপ্ত)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টি-রহস্য

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

এবার এলাম আকাশ থেকে কালো মাটির কোলে
বুক ছেয়ে তার সবুজ ধানের মুক্তাছড়া দোলে।
আকাশ তারে ডাক দিয়ে কয় হাল্কা মেঘের স্বরে
"কবিকে মোর ধানের ক্ষেতে কে নেয় হরণ করে?
রঙ মুছে মোর কে মিশলো অন্ধকারের ছায়া
ওরে অশ্রু-জলের মায়া?
মোর চরণে আজ কোন কঠিনের শিকলখানি দোলে?"
এবার এলাম আকাশ থেকে কালো মাটির কোলে।

মাটি আমার আকাশ থেকে পেয়েছে এই মালা,—
অশ্রু ব্যথার উৎসবেতে বক্ষ যে তার আলা।
সৃষ্টি তারে আলোর মাঝে আপনি দিয়ে ধরা—
আকাশ পানে চেয়েছিল সুখের দৃষ্টি ভরা।
কবির ফসল আলোক এনে ফোটায় মাটির কোলে,—
ও তার গানের মালা দোলে,
আকাশ শুধু চেয়ে ভাবে কোথায় পেল মালা।
তার-ই বুকের আঁধার আলো সাজায় ধানের থালা॥

নীড় ও দিগন্ত

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

তিনটা মাস কাটল একেবারে ঝড়ের মতো দ্রুবার গতিতে।

—ঝড়ই বটে!

কিন্তু কাল বৈশাখী। হঠাৎ আকাশ ঘিরে ঘনিয়ে এলো, সামলে নেবার অবকাশ পর্য্যন্ত দিলে না। তারপর প্রচণ্ড উপপ্লব সমস্ত এলো মেলো, ছড়িয়ে, ভেঙে-চুরে একেবারে ছত্রিশখানা হ'য়ে গেল। যা' ছিল, তা'র রূপান্তরকে আর চিনবার উপায় নেই।

কতদিন ধরে' যে কারবার ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝরা হ'য়ে সমাপ্তির প্রতীক্ষা করছিল, পার্থ তা'র বিন্দুমাত্রও জানবার অবসর বা সুযোগ পায়নি। মানুষের জীবনটা সঙ্কীর্ণ, তা'র মনোবৃত্তিগুলো আরো সঙ্কীর্ণ, অনেকটা মেয়েদের মতো একনিষ্ঠ; তাই তা'র বহুধা-বিকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত সার্থক হ'তে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একটা বিশিষ্ট পথ বা ধারাকে অবলম্বন করে। এবং এই একটি নির্দিষ্ট পথকে যখন সে আশ্রয় করে, তখন তা'র অন্যান্য স্বতন্ত্র দিকগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই অনাদৃত হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

ঠিক সেই জন্যেই পার্থ-সারথির টেনিস আর ক্লাব-জীবন, আর অবসর সময়ে রমার সাথে প্রেম চর্চার সঙ্গে ব্যবসায়ী জীবনের সমন্বয় হ'তে পারেনি। ধরে 'কাপে'র পর 'কাপ' জমেছে, সাধারণ মেম্বার থেকে সে ক্লাবের সেক্রেটারীর পদে প্রমোশান পেয়েছে, রমার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বায়ুচঞ্চল গঙ্গার তীরে শান্ত রাত্রিতে দু'জনে মুখোমুখি ব'সে থাকবার অধিকার লাভ হ'য়েছে; কিন্তু ঠিক তারি' সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কারবারে চুরি হ'তে সুরু হ'য়েছে, ক্যাপিটালে হাত দিতে হ'য়েছে এবং পরিশেষে ঋণ করতে হ'য়েছে।

এই-ই তা'র পরিণতি।

ব্যবসা লিকুইডেশানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের পৃথিবী যেন ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো পার্থের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, একেবারে যেন ওকে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা-নখরে একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ ক'রে দিতে চায়। মহাজনের পরে মহাজন, ঋণের পরে ঋণ! এতদিন ধরে যেন ওরা এই দিনটির জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এতদিন পরে পার্থ অনুভব করলে, ও একা, নিতান্ত ভাবেই একা। এক সময়ে মনে হ'ত, এই কারবারের জন্যে এতটুকু করবার বা ভাববার প্রয়োজন ওর নেই, এই বিরাট অনুষ্ঠানটাকে সুনিয়মে চালিয়ে নেবার জন্যে এত অসংখ্য মানুষ পরিশ্রম করছে যে, নিজের হ'লেও, সেখানে হাত বাড়াতে যাওয়া ওর পক্ষে অনধিকার চর্চা।

কিন্তু কারবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থাটা যেন কা'র মন্ত্রবলে স্বতন্ত্র রকমের দাঁড়িয়ে গেল। আজ পার্থ নিশ্চিত জানল, এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বিপদের মুহূর্তে এবং অপরিচিত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ওকে একাই ক্ষত বিক্ষত হতে হ'বে, এখানে ওর সহায়তার জন্যে কেউ-ই সাগ্রহ-বাহু প্রসারিত ক'রে দেবে না। এতদিন ধ'রে যে বিরাট কর্ম্মচক্রটা ওর সম্মতি সহায়তার অপেক্ষা না রেখেই নিজের স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘূর্ণিত হ'য়ে চলেছিল, সেই চক্র যখন নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই রুদ্ধগতি হ'ল, তখন চারদিকের সমস্ত প্রতিকূলতা বজ্রের মূর্তি নিয়ে নীল-আকাশের বুক চিরে' প্রলয় গর্জনে ওরই মাথার উপরে নেমে' এলো।

পার্থ অসহায় ভাবে দু'দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু কোনোখানে নির্ভর করবার মতো এতটুকু কিছুও ওর হাতে ঠেকল না। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের ফেনিল জল ঝলকে

ঝলকে এসে নাকে মুখে আছড়ে' পড়ল, নিরুপায় আর্ত-নাদকে বিদ্রূপ ক'রে সিন্ধু-পবন হা-হা ক'রে অট্টহাসি হেসে উঠল।

ঋণের বিরাট জঠরটা পূর্ণ করতে ব্যাঙ্কের টাকা কয়েকটা নিতান্তই অপর্যাপ্ত মনে হ'ল। তারপর কল-কাতার বাড়িগুলোতে পর্যন্ত টান পড়ল, সর্বনাশের এতটুকুও আর অবশিষ্ট রইল না।

পার্থ তাকিয়ে দেখলে, মাথার উপরে পরিষ্কার আকাশ, সামনে ফসলহীন শূন্য প্রান্তর রৌদ্রের আলোয় মরুভূমির মতো জ্বলে যাচ্ছে।—

আরো দু' মাস পরে যবনিকা উঠল কলকাতার একান্তে, একখানা ছোট্ট বাড়ির উপরে।

সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত পার্থ-সারথি। বিলাসী জীবনের যে গুণগুলোকে জীবনের পক্ষে একদা পর্যাপ্ত ব'লে মনে হ'ত, আজ দেখা গেল, বস্তু-তান্ত্রিক পৃথিবীর বস্তু-বর্জিত জীবনে তা'দের মূল্য যেমন নগণ্য, তেমনি অর্থকরী দিক দিয়ে তা'রা সমান অর্থহীন। একদিন তা'দের বাইরে জীবনে কোনো পাথেয়ের প্রয়োজন ছিল না, আজ ঠিক সেই পাথেয় নিয়েই পৃথিবীর পথে এক পা-ও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রশংসায় সেদিন মনের তৃপ্তি জুটত, কিন্তু আজ আর পেট ভরে না।

দূর সম্পর্কেয় মাসিমা, তার বাড়িতেই আশ্রয়। সমস্ত অবস্থার উপর দিয়ে এই যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হ'য়ে গেল, বাস্তবে তা'র পরিণতিটা আদৌ সত্য কি-না, পার্থ যেন এটাকেও বুঝে' উঠতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল: ও যেন ও নয়, অথবা ও যেন ও ছিল না। স্বপ্নের বিরাট ঐশ্বর্যপুরী থেকে কে যেন ওকে নির্মম জাগরণের আলোয় টেনে' এনেছে।

শীতের সকাল!

বাইরের একটা জীর্ণ চেয়ারের উপরে পা গুটিয়ে পার্থ ব'সেছিল। একখানা কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়ানো, অতীতের স্মৃতিতে বিজড়িত। ও যেন এই স্বপ্নটাকে সহজ ক'রে নেবার চেষ্টা করছিল।

মাসিমা একটা চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে সামনে এলেন। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, রঙ ফ্যাকাশে শুভ্র, রক্তহীনতার একটা হরিদ্রাভ পাণ্ডুর ছাপ পড়েছে চোখে মুখে। এককালে শরীরের বাঁধুনি শক্ত ছিল, সৌন্দর্যও রোধ হয় ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। চোখের কোণে কোণে কালি জমেছে, জ্যোতিহীন চোখ দু'টো কোটরের অন্ধকারে প্রায় বিলীয়মান। চোয়ালের হাড় দু'পাশে ঠেলে' উঠেছে, প্রশস্ত কপালটা যেন কেমন অস্বাভাবিক বিবর্ণ ব'লে ঠেকে।

কিন্তু চেহারা যাই-ই হোক, কপালে সিঁদুরের বিন্দুটি যেমন প্রশস্ত, তেমনি উজ্জ্বল। ওই চিহ্নটিকে নারী জীবনের চরম সৌভাগ্যের দ্যোতক ব'লে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে,—এবং হয়তো তা' সত্যিই। কিন্তু মাসিমাকে দেখে' পার্থের মনটা যেন কেমন সংশয়ী হ'যে ওঠে: ওটাকে যেন সে সার্থকতার স্মারক চিহ্ন ব'লে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

সংসারে অভাব প্রচণ্ড, অন্নের দুর্ভিক্ষ প্রবল মূর্তি গ্রহণ করলেও সে মুষ্ট্যন্নের অংশীদার একেবারে কম নয়। মেসো-মশায়ের বেতন বাযট্টি টাকা তেরো আনা ছয় পাই, কিন্তু সন্তানের সংখ্যাও সাতের ঘরে।

লাইফ ইন্সিয়োর, বাড়ি ভাড়া, মুদির দোকান, কয়লার দাম চুকিয়ে দিয়েও মাসিক বেতনের যে কয়টা টাকা হাতে থাকে, ছেলেদের খালিতে, জুড়ে তা'র একটা বড় অংশ আছে। কিন্তু এই খানেই যদি শেষ হ'ত তা' হলেও অবস্থাটা অনেক সহজ হ'তে পারত।

তা' নয়।

মাসিমা সূতিকার রোগী। সাতটি সন্তান অধুনা জীবন্ত কলেবরে বাহাল তবিয়তে মর্ত্য-ভূমিতে বিচরণ করলেও আরো আটটি সন্তান ভ্রূণ, অর্ধ ভ্রূণ বা মাংসপিণ্ড অবস্থায় এ সংসারের গণ্ডীতে পা বাড়িয়েই সংসার বিদায় নিয়ে চ'লে গেছে। তা'দের দিক দিয়ে কোনো ক্ষতি হয়তো হয়নি', হয়তো পঙ্গুমনা পিতার অসংযম এবং অনিচ্ছুকা মাতার অসহায় আত্মদানে তা'রা ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীর যে সমস্ত গ্লানি আর অসম্মানের মাঝখানে অবতীর্ণ হ'য়ে আসছিল, তা'র হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তা'রা অন্ধ-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে; কিন্তু যাওয়া আসার এই ব্যাপারটা এত

সহজেই নিষ্পন্ন হয়নি'। এই অনাগত বা স্বল্পাগত মানব-শাবকের দল তা'দের আবির্ভাবের চিহ্ন জননীর দেহে নির্দয় ভাবেই এঁকে রেখে' গেছে। সূতিকা আর রক্তহীনতা, পেটেণ্ট ওষুধের একটা মোটা বিল মেসোমশাইকে প্রতি মাসেই মিটিয়ে দিতে' হয়। মানসিক ক্লান্তি আর হীনতার কোনো ওষুধ আজো আবিষ্কৃত হয়নি', নইলে তা'র খরচ চালাতে হয়তো মেসোমশাইকে দেউলে হ'তে হ'ত।

কিন্তু মেসোমশাই পুরুষ মানুষ, এবং পৌরুষের শক্তিতে যখন তিনি নারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ, তখন রোগের দিক দিয়েও যে তিনি মাসিমার কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রেছেন, একথা তাঁর অতি বড় শত্রুতেও বলতে পারে না। মেসোমশায়ের অনেক দিন থেকে বুকের দোষ আছে, এতদিন হাঁপানির অবস্থাতেই ছিল। হাড়জিরজিরে বুকখানা যখন শ্বাসের টানে টানে দুলে' উঠত, তখন নিঃশ্বাসের সেই ধরণ দেখে' নাভিশ্বাসের কথাই মনে পড়ত অধুনা কাশির সঙ্গে কিছু কিছু রক্তও দেখা দিচ্ছে। পাড়ার যে হাতুড়ে ডাক্তার মাঝে মাঝে চিকিৎসা করতেন, তিনি অন্য কিছু ব'লে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর ওষুধের যে খরচ, মাসিক টাকার বাকী অংশটা তা'তেই ব্যয়িত হয়।

এর পরেও সংসারের অনেকগুলো খরচ খরচার দিক আছে, ঋণ ছাড়া। সে সমস্যাগুলোর সমাধান করবার উপায় নেই। সুতরাং ঋণের পরিমাণ প্রতি মাসেই বেড়ে চলেছে, পরিশোধের ভাবনা ভাববার মতো মনের জোরও এরা খুঁজে পায় না, তবু নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই পার্থ এদের গললগ্ন হ'য়েছে, অন্তত যতদিন পৃথিবীতে নিজের জন্যে কোনো একটা স্থান ক'রে না নিতে পারে, ততদিন।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত গায়ে বেঁধে, পলে পলে অসম্মানের কালিমাখা অশুচি হাতখানা ওকে স্পর্শ করে। জীবন নয়, 'ড্রাজারি।' যে সৌন্দর্য যে পরিপূর্ণ রস-সমৃদ্ধ জীবন থেকে শ্রীহীন এই বস্তু-পৃথিবীর সংস্পর্শে পার্থকে আসতে হ'য়েছে সেই অতীত দিনগুলোর স্মৃতি থেকে থেকে যেন বিদ্যুতের চাবুকের মত আঘাত করে। মনে হয়: ও যেন দুর্গন্ধ পঙ্কের মাঝখানে আপাদমস্তক ডুবে যাচ্ছে, সমস্ত অস্পৃষ্ট দুঃখ, অজানা অন্ধকার এতদিন পরে সুযোগ পেয়ে ওর চারদিকে নিবিড় হ'য়ে ঘনিয়ে এলো।

মাসিমা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, "এই নে,' খোকা, চা এনেছি।"

পার্থ নিরুত্তরে হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা গ্রহণ করলে।

মাসিমা ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বললেন, "দিন রাত অত কী ভাবিস বল দিকি? ওতে ক'রে শরীরটা একেবারে' ভেঙে ফেলবি যে!"

পার্থ মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল: না মাসিমা, বেশি আর কিছু ভাবিনে। শুধু এই রকম অবস্থায় তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকা—"

মাসিমা ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, "এত সব বাজে কথা তোর আসে কোত্থেকে? মিছেমিছি এ সব কথা তুলে আমার মনে দুঃখু না দিলে বুঝি তোর চলে না?"

—"বাজে কথা মোটেই নয়, মনে মনে নিজেরাও বেশ বুঝতে পারছ, কেবল বাইরেই—"

মাসিমা এবার সত্যি সত্যিই রাগ করলেন। যেতে' যেতে' বললেন, "আমার রাজ্যের কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ব'সে ব'সে তোর পাগলামি শুনলে আমার চলবে না।"

বাড়িতে তখন দৈনন্দিনের চাকাটা ঘুরতে সুরু হ'য়েছে—

সন্তানের অভাবে মানুষ যখন বিধাতা পুরুষের মিত-ব্যয়িতা সম্বন্ধে অভিশাপ দেয়, ঠিক তখনই আরেকদল তাঁর অমিতব্যয়িতার অপার করুণায় 'পরিত্রাহি' ডাক ছাড়তে আরম্ভ করে। মেসোমশায়ের এবং মাসিমারও এখন সেই দশা।

তিনটি ছেলে, চারিটি মেয়ে, ছোট খাটো একটি বুভুক্ষার 'ব্যাটেলিয়ান'। অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে তা'রা জন্মেছে তাই সংসারের চারদিকেই তা'রা তা'দের লোলুপ জিহ্বা যেন অত্যুগ্র ভাবে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু ক্ষুধা তীব্র ব'লেই হয়তো অভাব তীব্রতম।

বড় মেয়েটা ষোলোর কোঠায় পা দিয়েছে এবং বাঙালি ঘরের হিসেব মতো সে তিন বছর আগেই বিয়ের বয়স পার হ'য়ে গেছে। মেয়েটি শান্ত এবং মৌন, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সে যেন সচেতন হ'য়ে উঠেছে। —নারীজন্মের অপরাধ। নীরবে নতমুখে সমস্ত দিন

সংসারের একটা বিরাট্ বোঝা সে কাঁধের উপরে ব'য়ে চলেছে, কোনদিন একটুকু প্রতিবাদ করেনি, হয়তো করতে সাহসও পায়নি'।

ছোট ছোট ভাই-বোনদের দাবী আর অত্যাচার তা'রই উপরে। রুক্ষ চুলগুলোতে তেল পড়ে না, তা'রা আপনিই উঠে' আসছে। যে দু'চার গাছা এখনো বাকী, ভাই-বোনেরা তাও উপ্‌ড়ে ফেলবার চেষ্টায় আছে। হাতে গায়ে নখ আর দাঁতের চিহ্নও কম নয়।

মেয়েটির নাম রাণী।

নামটাকে বিদ্রূপ করবার জন্যেই হয়তো এঘরে ওর জন্ম। শাড়ীখানাকে বহু তালি দিয়ে এবং কৌশল ক'রে পরে হয়তো প্রকাশোন্মুখ যৌবনশ্রীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখতে হয়। পাণ্ডুর সাদা হাত দু'খানিতে কাঁচের চুড়ি বিদ্রূপের মতো বেজে' ওঠে।

আশ্চর্য্য এই, যে যত সহনশীল, পৃথিবীতে সেই-ই হয়তো তত বেশি ক'রে ঘা খায়। অসহায় মূঢ় চোখের দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে যে তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা করে, তা'কেই তুমি সব চাইতে বেশি ক'রে আঘাত করো, এটা পৃথিবীর ধর্ম। মেসোমশায়ের সম্বন্ধে তো কোনো কথাই চলে না, এমন কি, মাসিমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না।

—"কি, রান্নার কত দূর?"

—"এই হ'য়ে গেল ব'লে, ঝোলটা চাপিয়ে দিচ্ছি এখুনি।"

—"এখনো ঝোল চাপেনি?" বিরক্ত কটুকণ্ঠে মেসোমশাই বললেন, "এতক্ষণ ধ'রে কা'র শ্রাদ্ধ করছিলে শুনি? কি খেয়ে অফিসে যাবো?"

—রাণীর ভীরু মৃদু কণ্ঠ কানে এলো: "এক্ষুণি হ'য়ে যাবে বাবা।"

—"এক্ষুণি হ'য়ে যাবে!" মেসোমশাই বিকট মুখ ভেঙচে বললেন, "কতগুলো হলুদগোলা জল নামিয়ে আমাকে পিণ্ডি গেলাবে, এই তো? যাক, ও গিলে আজ আর দরকার নেই,—কদ্দিন আর মানুষে এমন ধারা পারে, শুনি?"

মাসিমা বেরিয়ে এলেন, "কি হ'য়েছে, অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন?"

—"নাঃ, চ্যাঁচাবে না, মুখ বুজে ব'সে থাকবে! বলি, এমন নবাবের বেটিকেই যদি পেটে ঠাঁই দিয়েছিলে, তবে আমাদের মতো এমন কাঙাল গরীবের ঘরে এসে ঢুকলে কেন? ড্যাং ড্যাং করতে করতে কোনো রাজা রাজড়ার দোলা চৌদোলায় গিয়ে উঠলেই তো পারতে!"

মাসিমা উষ্ণ হ'য়ে বললেন, 'আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন বাপু, রান্না হয়নি' নাকি?"

মেসোমশাই একটা বীভৎস শব্দ করলেন: আমার শ্রাদ্ধের রান্না, হাজার বারোশো লোক খাবে, এত তাড়াতাড়ি কি ক'রে হ'বে?"

আরো ভীরু, আরো মৃদু ভাবে রাণী বললে, "উনুন যে জলছে না, কাঁচা কয়লা—"

মেসোমশাই গর্জে উঠলেন: "উনুন জ্বলছে না, কিন্তু আমার চিতেটা ভালো ক'রেই জ্বলবে, একেবারে খাক্-খাক্ ক'রে। রোজ রোজ রান্নার এম্নি ধারা দেরী হ'লে কি চাকরী থাকে? শেষে দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াতে হবে যে—"

মেসোমশাই হঠাৎ কাশতে সুরু করলেন,—অবিশ্রান্ত কাশি। পার্থের মনে হ'তে লাগল, কখন একটা কাশির সঙ্গেই বা ফুসফুসটা ছিঁড়ে' দু' টুকরো হ'য়ে যায়।

মেসোমশাই যদি বা ভঙ্গ দিলেন তো এলো মাসিমার পালা।

—"গরীবের মেয়ে বাছা, এমন বড় লোকের ঘুম নিয়ে তো তোমার চলবে না। আর একটু সকালে উঠতে তোমার কি হয়?"

—"সকালেই তো উঠেছি মা। সেই চারটে থেকে,—বাসনগুলো মেজে নিয়ে রান্না ঘরটা ধুয়ে' কতক্ষণ তো ব'সে ছিলাম। একেই বাবা বাজার নিয়ে এলেন দেরীতে, তার ওপরে কাঁচা কয়লার ধুঁয়োয়—"

মাসিমার কণ্ঠস্বর নির্মম ভাবে তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল: "থাক, থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে না। আমিও তো এক সময়ে গোটা হেঁসেল ঠেলেছি, কাঁচা কয়লা নিয়েও রেঁধেছি। কত ধানে কত চাল হয়, সে আর তুমি আমাকে শেখাতে এসো না। এখন দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ ক'রে দিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।"

রাণীর আর কোনো কথা শুনতে পাওয়া গেল না, আর কোনো কথা কইতে সে জানে না। পার্থ এখান থেকে ওকে দেখতে না পেলেও কল্পনা করতে পারছে : ওর শীর্ণ গালের উপর দিয়ে পুষ্ট মুক্তাবিন্দুর মতো দু'টি অশ্রু-কণা, আর একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস—

বড় ছেলেটার বয়স পনেরো, মা সরস্বতীর সঙ্গে তা'র সদ্ভাব নেই। কিছু দিন ইস্কুলের পথে হাঁটাহাঁটি ক'রে সে স্পষ্ট অনুধাবন করলে যে ওপথ আর যাদের জন্যেই হোক না কেন, অন্ততঃ তা'র জন্যে যে নয়, এটা নিশ্চিত। বই আর খাতাগুলোকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে সে বাড়িতে এসে অধিষ্ঠিত হ'য়েছে। কিন্তু বাড়ির সঙ্গে সংস্রব তা'র কম। সকাল আটটা বাজতেই চা খেয়ে সে বেরিয়ে যায় নারকেল-ডাঙ্গা অথবা বেলেঘাটার কোনো জায়গায় গেঞ্জীর কলে অ্যাপ্রেন্টিস্ খাটতে। সেখানে মাসিক আট দশ টাকার মতো হাত খরচ হয়তো পায়, কিন্তু নিজের সিগারেট অথবা সিনেমার খরচের পক্ষে এই টাকাটা যে নিতান্তই অপ্রচুর, এ বয়সেই সে সেটা বেশ ভালো ক'রে বুঝে নিয়েছে।

বাড়ি আসে রাত এগারোটা বারোটায়, চুলের ছাঁটটা দেখলে মনে রাখবার মতো। বাপ মা কাছে না থাকলে মাঝে মাঝে চুটকি সুর ক'রে গান ধরে :

"প্রাণে তোমার প্রাণ মিলায়ে সই;
টানে টানে প্রাণেরি টানে
প্রাণের কথা কই—"

মা হয়তো মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "এত রাতে কোথায় ঘুরে' বেড়াস লক্ষ্মণ ?"

লক্ষ্মণ সংক্ষেপে জবাব দেয়, "কাজে থাকি।"

[illegible] কি এত কাজ ? গেঞ্জীর কল তো সেই সন্ধ্যে সাতটার সময় বন্ধ হয়ে যায়, রাত বারোটা পর্যন্ত তুই কোন্ কাজটা করিস ?"

লক্ষ্মণ বিব্রত হ'য়ে ওঠে, বিতৃষ্ণভাবে বলে, "আঃ, ওসব তুমি বুঝতে পারবে না মা। কাজ তো কত আছেই, তা'র ওপর ওভার টাইম খাটলেও বেশ পয়সা আছে—"

মা বলেন, "ওভার টাইম্ খাটিস তা' হলে ? কিন্তু কোনোদিন তো একটা পয়সা হাতে ক'রে ঘরে আনতে দেখলাম না বাপু—"

—"চোখ থাকলে তো দেখবে—" জাপানী সিল্কের সস্তা রুমালটা দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে লক্ষ্মণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

মাসিমা মেসোমশাইকে গিয়ে বলেন, "ছেলেটা বয়ে গেল যে !"

মেসোমশাই হাতের হুঁকোটা নামিয়ে প্রায় চোখ পাকিয়ে বলেন, "তা' কি করতে বলো ?"

—"কোথায় গেঞ্জীর কলে কি করে না করে, বাড়ীতে একটা আধলাও তো আনে না। কুসঙ্গে পড়ে ক্রমশ গোল্লায় যাচ্ছে। আবার ওকে ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দাও না।"

—"ইস্কুল !" মেসোমশাই অত্যন্ত রসিকতার ভঙ্গীতে হেসে ওঠেন : "গোটা ইস্কুল বাড়ীটা বেটে' খাওয়ালেও তোমার ছেলের পেট দিয়ে 'ক' বেরোবে না।"

মাসিমা এবারে প্রতিবাদ করেন : "নাঃ বেরোবে না ? দুনিয়া শুদ্ধ সকলের ছেলে পাশ ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে, তা'দের থেকে আমার ছেলের মাথা এমন কি কম যে অন্তত ম্যাট্রিকটা তরে যেতে পারে না ? ওই তো ও বাড়ির হারু—"

মেসোমশাই ভ্রূকুটি করেন। তাঁর মেজাজ কোনো-কালেই খুব শান্ত নয়, অসুখে ভুগে ভুগে আরো রূঢ়, আরো খিটখিটে হয়ে উঠেছে। একটা রোদে পোড়া রস-বর্জিত কাঠের টুকরোর মতো মন নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে খানিকটা জৈবিক-অনুভূতি আর পঙ্গু কামনার তীক্ষ্ণ দংশন ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোনোরকম স্পর্শাতুরতার অবকাশ নেই।

শ্বাপদের মতো দাঁত বের ক'রে বলেন, 'ও বাড়ীর হারুর অবস্থা আর তোমার অবস্থা এক নয়। হারুর টাকা আছে, সে শতবার ফেল করলেও আটকায় না, বুঝলে ? কিন্তু আমার থলে এত ভারী নয় যে বছর বছর তোমার ছেলের ফেল করবার রসদ যোগাবো। ছেলেকে যদি পড়াতে চাও, তা' হলে বাপের বাড়ি থেকে রুধির নিয়ে এসো, এ শর্মাকে দিয়ে এর বেশি আর হবে না।"

—"ছেলেটা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে যে।"

—"গেলে আমি আর কী করব ? দু' বেলা খেতে

পরতে দিতে পারছি, এই-ই ঢের, আর যদ্দিন পর্যন্ত না মরব, তদ্দিন দেবও। তারপর যেখানে খুশি যাক, যা ইচ্ছে করুক, তা'তে আমার কি ?"

এর উপর আর কথা চলে না। মাসিমা নতমুখে সেখান থেকে চলে যান।

তিনটি ছোট মেয়ে, একটার বয়স আট ন' মাসের মতো। একবার আরম্ভ করলে সে বোধ হয় দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো ঘণ্টা তিনেক কাঁদতে পারে। মেয়েটার স্বরযন্ত্র অস্বাভাবিক শক্তিশালী, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই সেটি দস্তুরমতো সক্রিয় থাকে।

মেসোমশাই থেকে থেকে গর্জন ক'রে বলেন, "দেবো একবার গলাটা টিপে' একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে। একি জ্বালাতন রে বাপু !"

মাসিমা বলেন, "ওকি আর এমনি এসেছে ? আমাকে একেবারে খাবে, তবে যাবে, এই-ই ব'লে দিলাম একটা কথা।"

বাকী মেয়ে দুটি মেন্তি আর খেন্তি। অতৃপ্ত শৈশবের বুভুক্ষা তা'দের বিকৃত রূপ নিয়েছে। তাদের জ্বালায় মায়ের আচার, চিনি বা দুধের সর কোনটাই নিরাপদে রাখবার জো নেই। পিঁপড়ের থেকেও ঘ্রাণশক্তি এবং সন্ধানশক্তি তা'দের তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল।"

ক্ষেন্তি মেয়েটার বয়স পাঁচ বছর, কিন্তু হাবা। বেশি কথা বলে না, বলতে পারে না। ভাঙা চুরো ভাবে দু' একটা শব্দ উচ্চারণ করে। মুখ দিয়ে লাল গড়িয়ে পড়ে, চোখের দু'পাশে জমাট পিচুটির রাশি। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বর্ণ-বিন্যাসের দিক দিয়ে তাকে মা কালীর স্ব-গোত্রীয়া না হ'লেও সম-গোত্রীয়া মনে ক'রে নেওয়া শক্ত নয়। হয় কথা বললে শুনতে পায় না, নইলে জবাব দিতে ভুলে' যায়, সুতরাং কালা কি-না, সেটা এখনো নিশ্চিত ভাবে স্থির করা যায় নি', কিছু কিছু সন্দেহের উপর আছে।

মেন্তি মেয়েটি ঠিক এর উলটো, চালাক আর চট্‌পটে। একটু বেশি কথা বললে ভুল হয় না। ন'দশ বছরের মেয়ে এরই মধ্যে পেছন থেকে মাকে ভ্যাংচায়, বাবার মতো ক'রে পিঠ বাঁকিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে !

সেদিন বারান্দায় এই চেয়ারটিতে পার্থ এমনি ভাবেই ব'সেছিল। মেন্তি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কাছে এলো : "জানো দাদাবাবু, জানো একটা কথা ?"

মেন্তির মুখের ভাব দেখে পার্থ কৌতুক বোধ করলে : "কি কথা ?"

—"হয়েছে কি, জানো ? পাশের বাড়ির ওই যে আইবুড়ো ফর্সা মেয়েটা, রোজ ইস্কুলে যায় বাসে ক'রে, দেখনি ?"

—"দেখেছি বই কি। তা কী ক'রেছে ও মেয়েটা ?"

মেন্তির গলার স্বর আরো নীচু হ'য়ে এলো : "ওর ছেলে হ'বে।"

—"কী !" পার্থের সমস্ত মুখটা একেবারে টকটকে লাল হ'য়ে উঠল, কয়েক মুহূর্ত ও যেন কোনো কথা বলতে পারলে না।

মেন্তি জোর দিয়ে বললে, "হ্যাঁ গো হাঁ, বড় মামী আর মা যে বলাবলি করছিল, আমি শুনলাম কিনা দোরের আড়াল থেকে ! মাগো, আইবুড়ো মেয়ে, সতেরো বছরের ধিঙ্গী, কী কাণ্ড !"

কিন্তু কাণ্ডটা যাই-ই হোক না কেন, মেন্তির পরিপক্কতা আর বলার ধরণ দেখে' পার্থ একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিল। এতটুকু মেয়ের কাছ থেকে এ ধরণের কথা আর এমনিতরো সংবাদ বহন ওর কল্পনারও সম্পূর্ণ বাইরে ছিল !

মেন্তি আবার বললে, "সতেরো বছরের মেয়ে, সময় মতো বিয়ে না দিলে—"

সহ্য এবং ধৈর্যের মাত্রা পার্থের অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে ও উদ্যতপ্রায় চপেটাঘাতটাকে সামলে নিলে। বললে, "ছিঃ মেন্তি, এমন কথা কাউকে বোলো না, এসব জিভ দিয়েও উচ্চারণ করতে নেই কখনো।"

মেন্তি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, "কেন, মা বড় মামিমা, ও বাড়ির ছোটদি, সবাই বলে যে !"

পার্থ রূঢ়স্বরে বললে, "ওরা বড়, ওরা বললেই বা। সেজন্যে তুমিও এসব আবোল-তাবোল বলবে নাকি ? তোমার মা একথা শুনলে তোমাকে কেটেই ফেলবেন।"

মেন্তি ঠোঁট উলটে' বললে, "হঁঃ, কাটলেই হ'ল আর কি! আমাকে যে কাটবে, সে এখনো মার পেটে। মা যদি আমাকে কিছু বলতে আসে, তা হ'লে আমি বুঝি মা'কে দশ কথা শুনিয়ে দিতে পারিনে?"

—"নিশ্চয় পারো,—তা' আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি," সম্পূর্ণ হতাশার সুরে পার্থ কথা কয়টা উচ্চারণ করলে। বীরপদদাপে বারান্দাটা কাঁপিয়ে হয়তো পাড়ায় পাড়ায় এই অতিমূল্যবান ও মুখরোচক সংবাদটা প্রচার করবার জন্যে মেন্তি বেরিয়ে গেল আর পার্থ শুধু চোখ-দুটো বড় বড় ক'রে ওর গতি পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

এ মেয়ে বড় হ'লে নতুন কিছু একটা রেকর্ড করবে।

ছোট ছেলে দু'টিকে পার্থ এক সময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যাদান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করবার চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা অতিশয় সকরুণ।

শোনা যায়, তারা কোনো ইস্কুলের চতুর্থ এবং পঞ্চম মানের ছাত্র, কিন্তু তা'দের জ্ঞান-জগতের সংস্পর্শে এলে জনশ্রুতির অনিত্যতা এক মুহূর্তে ধরা প'ড়ে যায়। 'ক' 'খ'র বাইরে এক পা বাড়িয়েও যে তারা অগ্রসর হ'য়েছে, অতিবড় বিশ্বাসীও তা' সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

প্রথমটির নাম বুধু। বুদ্ধদেব বা 'বুধদেব' কিসের থেকে যে নামটি সঞ্জাত, তা' নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধের 'বোধি' বা বুধের 'বোধ' কোনোটাই তা'র মধ্যে পাওয়া গেল না। পার্থ কেবল তা'কে প্রশ্ন ক'রেছিল, "বলো তো, তিন-পাঁচে কত?"

বুধু অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যে বুধ-গ্রহেরই সন্ধান করতে লাগল, কিন্তু যেহেতু মাথার উপরে কেবল কড়িকাঠ, সেহেতু উত্তরটা আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। কয়েক মিনিট ধ'রে সে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ধ্যানস্থ হ'য়ে রইল এবং মাঝে মাঝে সাপের মন্ত্র আওড়ানোর মতো বিড় বিড় ক'রে ঠোঁট দুটো নাড়তে লাগল, যেন মস্তিষ্কের অতল-স্পর্শ জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন ক'রে সে 'তিন-পাঁচে'রূপ রত্নটি আহরণ করবার প্রয়াস করছে।

অপর ভ্রাতা বল্টু ওৎ পেতে ব'সে উসখুস করছিল, ভাবটা, এসব তা'র ঝাড়া কণ্ঠস্থ! বললে, "বলি, আমি বলি দাদাবাবু?"

—"বলো।"

বল্টু 'বোল্টের' মতোই চটাং ক'রে জবাব দিলে, "পঁয়ত্রিশ!"

—"পঁয়ত্রিশ!" পার্থ বললে, "কি ক'রে হলো?"

বল্টু নামতা গুণতে লাগল, "পাঁচ এক্কে পাঁচ, পাঁচ দু গুণে দশ, তিন পাঁচে পঁয়ত্রিশ, চার পাঁচে কুড়ি—হচ্ছে না দাদাবাবু?"

চকিত হ'য়ে পার্থ বললে, "কিন্তু কুড়ির আগে পঁয়ত্রিশ হয় কেমন ক'রে?"

—"হয়, হয়, তুমি জানো না," বল্টু বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লে, "বইতে লেখা আছে।"

—"কোন বইতে?"

—"ভূগোলে।"

স্তম্ভিত হ'য়ে পার্থ বললে, "ভূগোলে!"

—"না, না," থতমত খেয়ে বল্টু বললে, "ধারাপাতে লেখা আছে।"

—"নিয়ে এসো ধারাপাত দেখব।"

—"ধারাপাত, ধারাপাত!" বল্টু মাথা চুলকাতে লাগল, "সেটা উইয়ে কেটে ফেলেছে, সত্যি বলছি দাদাবাবু, একেবারে টুকরো টুকরো—"

—"কক্ষণো না, একেবারে মিথ্যে কথা," বুধু তা'র 'সম্বোধি' থেকে লাফিয়ে উঠল, "ওর ধারাপাত দেরাজের মধ্যে আছে দাদাবাবু, আমি দেখেছি।"

—"থাঃ মিথ্যেবাদী"—বল্টু গর্জে' উঠল।"

সমান তেজে বুধু প্রত্যুত্তর দিলে, "তুই-ই তো মিথ্যেবাদী।"

শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে বল্টু চোখ পাকিয়ে বললে, "ভাখ্ বুধু, মার খাবি বলছি।"

বুধু ভেংচে বললে, "মারলেই হল!"

—"নিশ্চয় মারব।"

—"মেরেই ভাখ্ না—" বুধু তা' হ'লে বুদ্ধের মতো মোটেই অহিংসনীয়।

মুহূর্তে পাঠস্থল কুরুক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। ছাড়াতে গিয়ে পার্থ গালে মুখে নখের আঁচড় খেয়ে' স'রে এলো এবং অবশেষে খড়ম হাতে মেসোমশাই ঘর থেকে ছুটে আসতে যোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিলে।

দূরের থেকে ক্ষেন্তি মন্তব্য করলে, "মা গো মা, যেন দু'টো মহিষাসুর। এই সকাল বেলাতেই কী হুড়্‌যুদ্ধ্‌ লাগিয়েছে দেখো সে!"

কিন্তু তারপর থেকে বিদ্যাদানের অব্যাপারে পার্থ আর কখনো হাত দেয়নি'।

মেসোমশাই মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, "এগুলোর কোনোটার কিছু হ'বে ভেবেছ? ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছি, যেখানে খুসি যাক।"

পার্থের অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু মাসিমা এখন কাছে নেই। থাকলে তিনি নিশ্চয় একথার প্রতিবাদ করতেন।

৫

দু'পুরের ঘণ্টা তিনেক রাণী বিশ্রাম পায়।

কিন্তু এই সময়টাও তার অকাজে নষ্ট করবার উপায় নেই, খুঁটিনাটি সেলায়ের কাজ হাতে লেগেই আছে। একবার ব'লেছিল, "একটা সেলাইয়ের কল কিনে দাও না বাবা, তা' হ'লে এক সঙ্গে অনেক—"

—"সেলাইয়ের কল!" বাবা মুখের এমন একটা ভঙ্গী করলেন যে রাণী সেখান থেকে পালাতে পথ খুঁজে পায়নি। একেই তো সমস্ত পৃথিবীর চোখের সামনে ও ওর নিজের দীনতা নিয়ে কোথায় লুকিয়ে থাকবে ঠিক করতে পারে না। তা'র উপরে বাবার ওই মূর্তি দেখলে ওর বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

কিন্তু রাণী বোকা নয়, নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বয়স ওর এসেছে। মাঝে মাঝে ও যেন নিজেকে বিশ্লেষণ করে, বিচার করবার চেষ্টা করে। হিসাব করতে চায়: কার কাছে ও কতটুকু দাবী করতে পারে, কার কাছ থেকে কতটুকু নিয়েছে। এ বিশ্লেষণ ওর সচেতন অবস্থার নয়। দক্ষিণের বাতাসে যে সোনালী স্বপ্নে অরণ্যের চোখ আবিষ্ট হ'য়ে আসে, যে অন্ধ অথচ অনিবার্য প্রাণ-বহ্নির দাহন লেগে কিশলয়-পুঞ্জ দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে, সেই জড় প্রকৃতির সোনার কাঠি কোন অজ্ঞাত নির্জন মুহূর্তে ওর মনে তা'র ছোঁয়াচ বুলিয়ে গেছে।

হাতের কাজগুলো শেষ হয়ে যায়, রাণী শূন্য দৃষ্টিতে জানলার সামনে এসে বসে। বাইরে উজ্জ্বল নীল আকাশ, কিন্তু তা'র বেশি দূর দেখবার উপায় নেই, লাল, সাদা, তেতলা-চৌতলা বাড়ির ভিড়ে আকাশ একেবারে অবরুদ্ধ, একেবারে সঙ্কীর্ণ। ইচ্ছে করে আকাশটাকে আরো একটু দেখতে, খুব বেশি নয়, যতদূর চোখে পড়ে, তার বাইরে আরো একটু, আর সামান্য একটু।

কোলের উপরে শূন্য সেলাইটা পড়ে থাকে, ফাঁকা আকাশের মতোই ফাঁকা মনের ভেতর দিয়ে যেন ভাবনার অসংখ্য সাদা সাদা মেঘের টুকরো হালকা হাওয়ায় আনাগোনা করে। মা, বাবা, ভাইবোন! সংসারে সকলেই তো ওর, কিন্তু ও যেন কারোই নয়! রাণী ভাবে: বাবার সমস্ত স্নেহের উৎস শুকিয়ে সেখানে বেরিয়ে পড়েছে রূঢ় স্বার্থপরতার খানিকটা ঝকঝকে বালির কঙ্কাল, নিত্য অভাবী সংসারের ক্ষুদ্রতায় মায়ের মন থেকে ভালোবাসার সবটুকু মধু একেবারে নিংড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভাই-বোনেরা ওর কাছ থেকে শুধু নিতেই জানে, দেবার কথা তাদের কারো এতটুকুও মনে নেই।

কিন্তু এ নিয়ে রাণী কখনও অভিযোগ করবে না; কারো কাছেই না, এমন কি ওর নিজের মনের কাছেও নয়। অপরাধের মাত্রা ওরই বা কম কিসে! যদি কেরাণীর ঘরেই জন্মেছে, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন ও বড় হয়ে উঠল, কেন ওর যৌবন ওর দেহকে অতিক্রম ক'রে অমনি ভাবে ফেনার মতো উপচে পড়তে চায়!

অবশ্য রাণী এ সব কথা, অন্তত এত সব কথা ভাবছিল কি-না, সে কথা আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারিনে। কিশোরী মেয়েদের মনোজগতের সঙ্গে আমার খানিকটা পরিচয় থাকলেও তা'দের এই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলোকে আমি ভালো ক'রে চিনিনে। কিন্তু ওর শ্লথ এই বসবার ভঙ্গীটা, পিঠের উপর দিয়ে লুটিয়ে পড়া বিস্রস্ত এই চুলের

গুচ্ছ আর দুপুরের উষ্ণ মধ্যাহ্নের এই স্পর্শালুতা এমনি ধারা ভাবনার তরঙ্গই ওর মনে জাগিয়ে তুলেছিল ব'লে আমি অনুমান করতে পারি।

পথের ও পাশের লাল বড় বাড়িটাতে একটা ছেলে এ সময় বাঁশি বাজায়, রাণী অনেক দিন এই জানলার পাশে ব'সে সে বাঁশি শুনেছে। ছেলেটাকেও দেখেছে বার কয়েক। বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয়, রাজপুত্রের মতো সুশ্রী। বাঁশি হাতে নিয়ে চঞ্চল চোখে অনেকবার সে এ বাড়ির জানলায় কী যেন খোঁজে, রাণীর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় তা'তে।

আজো ওই জানলার দিকে চোখ পড়তে রাণী দেখলে, সেই ছেলেটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তা'র চোখের দৃষ্টি ওরই পানে নিবদ্ধ। অজ্ঞাত কিসের একটা আকর্ষণে কয়েক মুহূর্ত রাণীও ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটা সুন্দর, বাস্তবিক, এত সুন্দর পুরুষ মানুষ ও খুব কমই চোখে দেখেছে। নিখুঁত মুখের গড়ন, জ্র দু'টি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কপালের উপর এক গুচ্ছ কোঁকড়া চুল লুটিয়ে প'ড়েছে, শুভ্র কপালটাকে সেই চুলের স্পর্শে শুভ্রতর দেখায়।

চোখোচোখি হ'তেই ছেলেটা হাসল, রাণী যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে, ওর দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ ক্ষুধা। শশব্যস্তে ও জানলাটা টেনে বন্ধ করে দিলে, ওর বুকটা তখন দুর দুর করছে।

রাণী সেখান থেকে পালিয়ে এলো। ওর ভয় করছে, ভয়ানক ভয় করছে। মনে হচ্ছে, কে যেন এক্ষুণি ওকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, অনেক দূরে, বিচিত্র এক স্বপ্ন-জগতে যে জগতের পথ ও কখনো চেনে না। সেই অজানা রহস্যময় জগতের খানিকটা আলো ওর মনে এসে পড়েছে বটে, কিন্তু সে আলো এখনো ওর দৃষ্টিকে নষ্ট করতে পারেনি, প্রদোষের অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্নতায় সে আলো অনুজ্জ্বল, সে আলো ধূসর। ইঙ্গিত আছে, কিন্তু প্রকাশের পূর্ণতা নেই।

রাণী একেবারে ভেতরের বারান্দায় চলে এল, যে করেই হোক, এই সেলাইটা ওকে শেষ করে ফেলতেই হ'বে। কিন্তু রাণীর বার বার ক'রে কেবলই মনে পড়তে লাগল: ছেলেটা কী সুন্দর! আচ্ছা, অমন ক'রে হাসছিল কেন, কী বলতে চায়?

—না:, ছি:, কী বলতে চায়, তা' জেনে ওর কী দরকার, পৃথিবীতে সব জিনিষেরই কী একটা না একটা মানে থাকতে হ'বে? ইচ্ছে হ'লে সবাই-ই হাসে, রাণী নিজেও তো হাসে।

কিন্তু ও ছেলেটার উপরে রাণীর সত্যি সত্যিই রাগ হচ্ছে, কেনই বা এমন করে ও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে? এক দিন নয়, দু' দিন নয়, অনেক দিন ধরে রাণী লক্ষ্য ক'রেছে, ওই ছেলেটা অমনি ক'রেই তা'র সতৃষ্ণ দৃষ্টি ওর মুখের পানে মেলে দেখেছে। এত ক'রে কী দেখে ওর ভিতরে?

হঠাৎ একটা কথা রাণীর মনে বসন্ত বাতাসের মতো ফুল ফোটানোর সুরে গুঞ্জন ক'রে গেল: তবে কী ও সুন্দর!

—সুন্দর! এক মুহূর্তে অসংখ্য গন্ধ-মর্মরিত চৈত্রের রাত্রি আর শরতের অজস্র জ্যোৎস্নার স্পর্শ ওর মনের মধ্যে গানের সুরের মতো দু'লে উঠল: ও সুন্দর! নিজের সমগ্র সত্তার ভিতরে এই যে পরম বিস্ময়, এই যে ওর দেহের জগৎ থেকে এক অনির্ব্বচনীয় রূপ জগতের স্বপ্ন সন্ধান, এত দিন এরা কোথায় ছিল, কেমন ক'রে ছিল?

রাণী নিজে সুন্দরী, একথা ও অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছে এবং এত বেশি ক'রে শুনেছে যে ওই কথাটার কোনো স্বতন্ত্র অর্থ আছে ব'লেই ওর মনে হয় নি'। আর অর্থ যদি বা কিছু থাকেই তা' হ'লে সেই অর্থ-নির্ণয়ের জন্যও ও কোনদিন মনের দিক থেকে এতটুকুও সাড়া অনুভব করে নি।'

কিন্তু আজ?

রাণী চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে একটা তীক্ষ্ণ আঘাত। অসতর্ক মুহূর্তে ছুঁচটা কোন সময় কার্পেটের সীমা ছাড়িয়ে ওর শুভ্র মসৃণ ত্বককে চুম্বন ক'রেছে এবং লালসা যখন আরো প্রবল হয়েছে, তখন বাইরের গণ্ডী পার হয়ে ওর অন্তর জগতের রহস্যকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছে।

আঙুলের মাথায় একবিন্দু রক্ত, সতেজ স্বচ্ছ রক্ত। রাণী অনেকক্ষণ ওই রক্তবিন্দুর পানে তাকিয়ে রইল, এত সহজেই এরা এমন মাতাল, এমন অসংযত হয়ে ওঠে কী করে?

সেলাইটা নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল, পা বাড়াল পার্থের ঘরের দিকে।

পার্থ তখন বাংলা একটা মাসিক-পত্রিকা থেকে মনস্তত্ব সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত ছিল। প্রশ্ন করলে, "কী মনে করে?"

রাণী বিছানার একপাশে বসল, অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি গান গাইতে পারো, দাদাবাবু?"

—"গান!" পার্থ প্রায় অট্টহাসি ক'রে উঠল: "আমি গান গাইব, বলিস কি রে! তার চাইতে ওই যে কাবলী-ওয়ালা মাঝে মাঝে হিং বিক্রী করতে আসে না, তাকে বললে কিছুটা তবু শুনতে পাবি।"

রাণী আবদারের সুর ধরলে। জীবনেও কখনো আবদার করেনি হয়তো, হয়তো করতেও শেখেনি। তবু আজ এইখানে, এই দাদাবাবুর কাছে ও যেন খানিকটা দাবী করতে সাহস পায়: "না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলো, তুমি গান গাইতে জানো কি-না।"

—"কেনোদিন না—" পার্থ তেমনি উচ্ছল ভাবে হেসে উঠল।

—"তবে বাঁশি বাজাতে পারো?"

—"উহুঁ।"

—"কী পারো তবে?"

হাতের পত্রিকাটা মুড়ে রেখে পার্থ বললে, "যা পারি, তা তোমার গানের সঙ্গে একটাও মিলবে না। টেনিস খেলতে পারি, ফুটবল খেলতে পারি, দরকার মতো যদি বলিস তা' হ'লে কাউকে ধরে মারও দিতে পারি, আর রাক্ষসের মতো চার হাত বের করে খেতে পারি—"

রাণী হেসে ফেললে, "ওই বুঝি তোমার চার হাত বের করে খাওয়া? তা' হলে আমরা সবাই তো খোক্কসেরও ওপরে, লক্ষ্মণকে যে কী বলব তা ভেবেই পাইনে।"

পার্থ বললে, "এখনো বিশ্বাস করছ না তা হলে। পরিচয় দেব একদিন।"

—"দিয়ো। তাতে বরং তুমিই ঠকবে।"

—"আচ্ছা, না হয় ঠকলামই। কিন্তু গানের কথা কেন জিজ্ঞেস করছিলি বল তো?"

নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রাণীর: "শিখতাম।"

—"শিখতিস!" পার্থ আবার উচ্ছলিত ভাবে হেসে উঠল: "ওঃ, বুঝেছি।"

রাণী কেমন একটু শিউরে উঠল যেন: "কি বুঝেছ বলো তো?"

—"বিয়ের ভাবনা ভাবছিস্ বুঝি? গান না জানলে তো আজকাল মেয়ে পছন্দ হয় না কারো, তাই বুঝি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেবার চেষ্টায় আছিস্?"

রাণী হাসতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখের উপর দিয়ে এমনি একটা ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে এলো যে পার্থ তৎক্ষণাৎ তীব্র অনুতাপ বোধ করলে।

বাস্তবিক রাণী তো আর বোকা নয়। ওকে কেন্দ্র করে এই বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে, আর্থিকভাবে একান্ত অসমর্থ বাপ মায়ের মনে যে সূক্ষ্ম অস্বস্তির অনুভূতি আর মাঝে মাঝে বাইরে তার অশোভন রূঢ় আত্মপ্রকাশ, রাণীর অনেক কটি মুহূর্তকেই তারা গ্লানি-মন্থর করে তুলেছে। অনেক রাত্রে নিজের বিছানার উপরে ও জেগে উঠেছে আর তখন হয়তো কলকাতার ধূলি-কুয়াসার আবরণ-মুক্ত আকাশ থেকে এক টুকরো চাঁদের একফালি আলো এসে পড়েছে ওর চোখে-মুখে। মনে হয়েছে: ওর ব্যর্থ বসন্তকে ঘিরে ঘিরে এই যে পারিবারিক বিক্ষোভ, এই দ্বন্দ্বের কোনো শেষ কী হবে, কখনো কী হবে?

রাণী কালো মুখে খানিকটা হেসে বললে, "হ্যাঁ, বিয়ের জন্যেই তো!" তারপর হঠাৎ সেখান থেকে উঠে বের হয়ে গেল।

৬

সংসার তো নয়, যেন একটা কামারশালা।

অভাব আর অপরিপূর্ণতার আগুন একেবারে ধুধু ক'রে জ্বলে' যাচ্ছে, মানুষের বুকের রক্তেই তা'র ইন্ধন।

কিন্তু তুমি আমার কথাকে ভুল বুঝোনা। এই অভাব অতৃপ্তি তাঁদেরি' শুধু নয়, মুক্ত-আকাশের তলায়, অভ্রংলিহ প্রাসাদের নীচে শীত-তীক্ষ্ণ ফুটপাথের উপরে প'ড়ে যা'রা রাত কাটায় ; ভৈষজ্য দ্রব্যের অজস্র সমারোহপূর্ণ মেডিক্যাল্ কলেজের সামনে প'ড়ে যা'রা রোগ যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করে, এটা শুধু তাঁদেরি' কথা নয়। অথবা সেই কেরাণীরা যাঁদের বাঁচা ও ম'রা পক্ষাঘাতের মতোই সমগ্র অনুভূতি বর্জ্জিত, তাঁ'দের ড্রয়িংরুমের' সেই গতানুগতিক বহু-উচ্চারিত কাহিনী শুনিয়েও আমি তোমাকে ক্লান্ত ক'রে তুলব না। তুমি কী জানো, উত্তর কলকাতার একটা 'মেস্' এ ব'সে এই যে আমি গল্প লিখে' যাচ্ছি, আমার সঙ্গে রথচাইল্ডসের মনো-জগতের কোনো তফাৎ নেই ?

হাঁ, সত্যি কথা। নির্বোধ এক একটা লৌহ-পিণ্ডের মতো আমরা, আমাদের প্রত্যেক দিনের অসম্পূর্ণতা, বস্তু-জগৎ, জ্ঞান-জগতের অতৃপ্তি আমাদের হাপরের আগুনের মতো দগ্ধ করছে। আর তা'র উপরে প্রত্যেকটি মুহূর্ত, তোমাদের কাব্যের ভাষায় যা'কে মহাকাল বলা হয়, সে অতি প্রচণ্ড, অতি নির্মম আঘাত দিয়ে আমাদের এই স্থুল পিণ্ডটাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করছে যে বিশ্লেষণের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজকের' আমি'কে তুমি আগামী-কাল চিনে' নিতে' পারো না।

পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্থ একটা সিগারেট ধরালো।

দু'পুরের আলোয় সমস্ত চৌরঙ্গী ধারালো, তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। কলকাতায় শীত এখনো ভালো ক'রে নামেনি, তাই রোদের তাপে মাথাটা এখনো জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আজ সকালে কুয়াশা ম্লান আকাশ থেকে নগরীর অশ্রু-বিন্দুর মতো কয়েক ফোঁটা শিশির গ'লে প'ড়ে এই পৃথিবীটাকে যদি স্নিগ্ধ না করত, তা' হ'লে জুতোর চাপে হয়তো রাস্তার পীচ্ বেরিয়ে পড়ত।

ঘণ্টি বাজিয়ে চলেছে ট্রাম, পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো দুর্দমভাবে বাসে'র গতি। ধর্মতলা, ওয়েলিংটন, কর্ণ-ওয়ালিশ, শ্যামবাজার। পার্থ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে যে দু'টো মাত্র পয়সা টিন টিন করছে।

পার্থ আবার আকাশের দিকে তাকালো, দু'পুরের সূর্য্য ওকে এতটুকু করুণা করবে না, করতে চায় না। টালীগঞ্জ থেকে ও সোজা হেঁটে আসছে, জীবনে দশ হাতের বাইরে ও মটর ছাড়া পা বাড়ায়নি।

কিন্তু পকেটে মাত্র দুটি পয়সা।

পার্থ লোলুপ চোখে ট্রামগুলোর দিকে তাকালো, আজকে শনিবার, ভিড়্ড়ে নেই। দু'পয়সার পাথেয় নিয়ে এসপ্লানেড থেকে শ্যামবাজার অবাধ পাড়ি দেওয়া যাবে না। অথচ—

মহানগরী পাদচারীদের জন্যে নয়, হয়তো পৃথিবীর মাটিই তা'দের জন্যে নয়। চারদিক থেকে লোহা আর ইঁটের ফ্রেম, মাথার উপরে তারের জটিল জাল আর অসংখ্য লৌহ-চক্র সশব্দ এবং নিঃশব্দ গর্জনে তাঁ'দের শাসন করছে।

ষ্টেট্স্ম্যান হাউসের পাশে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। কোনো কৌতূহল নেই, তবু পার্থ একবার সেখানে এসে' দাঁড়ালো। যুক্তপ্রদেশের কৃষক সমস্যা, ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠক, রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা। পার্থ খানিকটা পড়বার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই মনকে একাগ্র করতে পারলে না। এতক্ষণ পরে ও অনুভব করলে, হাঁ, সত্যি সত্যি অনুভব করলে : ওর খিদে পেয়েছে।

—আশ্চর্য, আশ্চর্য মানুষ। ন্যাট্ হামসুনের বুভুক্ষা তখন তোমাকে আনন্দ দেয়, যখন তোমার হাতে থাকে সোডা মেশানো এক গ্লাস স্কচ হুইস্কী, যখন তোমার মাথার উপরে ম্যাক্সিমাম ফ্যান চলতে থাকে, তখন গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের উষ্ণ বাতাস খসখসের পর্দায় স্নিগ্ধ হ'য়ে এসে তোমাকে স্পর্শ করে ; হয়তো তখন দুঃখের সেই মনোচঞ্চল বিশ্লেষণ তোমার ভালো লাগতে পারে ; কিন্তু সেই বুভুক্ষা এসে যখন তোমাকে স্পর্শ করবে, তোমার সমস্ত দেহের যন্ত্রগুলো যখন অসহ্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় সরীসৃপের মতো মোচড় দিয়ে উঠবে আর মনে হ'বে, চারপাশের অনেকটা ধারালো রোদকে কে যেন অতসী কাঁচে জমাট ক'রে তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে এনে' ফেলেছে। সেই মুহূর্তে তুমি ন্যাট্, হামসুনের বুভুক্ষাকে স্মরণ কোরো।

পার্থ এই মুহূর্তে আরো আবিষ্কার করলে : ও বক্তৃতা দিতে পারে, হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই বক্তৃতা দিতে পারে। মনুমেণ্টের তলায় বা কলেজ স্কোয়ারে, যেখানে হোক। ও বলতে পারে, চীৎকার ক'রে বলতে পারে : এ দুঃখের সাহিত্যের মূল্য কি ? এ যেন রোমের অ্যাম্ফিথিয়েটার, আমরা গ্ল্যাডিয়েটর আর তোমরা দর্শক। আমরা যখন হিংস্র প্রাণী বা হিংস্রতর প্রতিদ্বন্দ্বীর নখরে বা অস্ত্রমুখে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হ'য়ে যাচ্ছি, তখন তুমি আর তোমার নায়িকা, তোমরা এবং তোমাদের নায়িকারা গ্যালারী থেকে আমাদের সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার অসহ্য মুহূর্তগুলোকে হিংস্র-উল্লাসে উপভোগ করছ। আমাদের চোখের থেকে ঝরা রক্ত-মাখানো যে জল-কণায় দুঃখের সাহিত্য পরিপুষ্ট, তোমাদের স্কচ-হুইস্কী বা মৃদু-পরিতৃপ্তির অবসর মুহূর্তের সঙ্গে তা'র একটাও মিলবে না।

—"না,"—অসতর্কভাবে পার্থের ঠোঁট থেকে কথাটা পিছলে পড়ল।

একটা মোটর। একটু হ'লেই গায়ের উপর এসে পড়ত, কিন্তু পড়ল না, ঘস্-স্-স্ শব্দ ক'রে ঠিক পাশটিতে এসে থেমে গেল। একটি অতি-আধুনিকা মেয়ে ড্রাইভ করছিল, ষ্টিয়ারিংটা এখনো ভালো ক'রে আয়ত্ত হয়নি বোধ হয়।

—"তুমি!"

পার্থ চমকে মুখ তুলে তাকালো। রমাই বটে, তা'তে ভুল নেই। চুলগুলো একটু অসংযত, মুখের উপরে অস্পষ্ট শ্রান্তির রক্তাভা। সেই তীক্ষ্ণাগ্র ছোট্ট নাকটি আর গালের উপরে কালো একটি তিল।

—"হ্যাঁ, আমি,—"অত্যন্ত শান্ত এবং নির্লিপ্তভাবে পার্থ কথাটা উচ্চারণ করলে।

কিন্তু রমা তা' নয়। উত্তেজনা আর আগ্রহে ও প্রখর হ'য়ে উঠেছে : এতদিন কোথায় ছিলে ? এভাবে কোথায় যাচ্ছ ? ওখানে যাও না কেন ?"

পার্থ হাসল, হাসিটা করুণ। বললে, "থাকি শ্যামবাজারে সেখানেই চলেছি। ওখানে যাইনে কেন ? উত্তর অতি সরল,—সময় পাইনে।"

রমার কণ্ঠে অনুযোগ এবং অভিমানের সুর বাজল : "ফাঁকি দিতে চাচ্ছ সব ? সে হবে না, উঠে এসো মোটরে।"

—"কেন ?"

—"চলো, তোমাকে পৌছে দিচ্ছি শ্যামবাজারে।"

—"না, ধন্যবাদ, এ পথটুকু আমিই হেঁটেই যেতে পারব।"

রমা ভ্রূকুটি করলে, ছোট্ট ঠোঁটের প্রান্ত দুটি সুন্দর ভাবে কুঞ্চিত হল। বললে, "দুপুর বেলা রাস্তার মাঝখানে তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারব না।"

—"আমি তো তোমাকে ঝগড়া করতে বলছিনে। অনর্থক পথের মাঝখানে তোমারি' দেরী হয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছিলে, অনায়াসে চ'লে যেতে পারো।"

—"উঠবে না তো ?" রমা চ'টে বললে, "তা হ'লে মোটর থেকে নেমে আমি তোমার হাত ধরে টানাটানি করতে সুরু করে দেব। তেমনি একটা সিন্ ক্রিয়েট করতে রাজী আছ তো ?"

—"না, তা রাজী নই," পার্থ হেসে ফেললে।

রমা আদেশের সুরে বললে, "তবে ওঠো।"

উঠতেই হল। পার্থ ওকে চেনে। অসম্ভব জেদী মেয়ে, যা ধরবে, তা করবেই। মেজর গুপ্তকে সবলে সমীহ ক'রে চলে, আর মেজর গুপ্ত স্বয়ং সমীহ করেন তাঁর মেয়েকে।

রমা বললে, "বাঃ, পেছনে গিয়ে বসলে কেন ? এসো আমার পাশে, নইলে গল্প করব কী করে ? বেশ লোক তুমি যা' হোক।"

রমা একটু বেশি প্রগলভা হয়ে উঠেছে যেন। পার্থ ওর পাশে এসে বসল, বললে, "তোমার বড্ড খুঁৎ খুঁতে স্বভাব। আচ্ছা, দাও তা হলে এবার ষ্টিয়ারিংটা ?"

—"উঁহু, সেটি পাচ্ছ না। জানো, এবারে আমি লাইসেন্স পেয়েছি ? তুমি চুপটি করে বসে দেখো আমি কেমন চালাতে পারি।"

—"আচ্ছা।"

রমা মোটরে ষ্টার্ট দিলে এবং আশুতোষের মর্মর মূর্তিটাকে প্রদক্ষিণ করে গাড়িটা সোজা দক্ষিণ দিকে চৌরঙ্গী বেয়ে এগিয়ে চলল।

পার্থ বললে, "এ কী করছ ?"

রমা মুখ টিপে হেসে বললে, "কী করছি ?"

—"খুঃ কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? শ্যামবাজার তো ওদিকে নয় ?"

—"ওদিকে নয় ?" রমা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললে, "তাই তো, কী সাংঘাতিক ভুল ! তা' কী আর করা যাবে, চলো, বালিগঞ্জের দিকেই যাওয়া যাক।"

পার্থ বললে, "বাঃ—

রমা হর্নটা টিপল, বাকী কথাগুলো আর শুনতে পাওয়া গেল না। তারপর ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "আমাকে চটিয়ো না বলছি। তা হলে ষ্টিয়ারিং-ফিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে এত লোকের মধ্যে, এই দিনের বেলায় এমন একটা কাণ্ড করব যে লজ্জায় তো মরে যাবেই তা' ছাড়া এমনো য়্যাকসিডেণ্ট ঘ'টে যেতে পারে যে কাল কাগজে কাগজে আমাদের ছবি অবধি বেরিয়ে যাবে। বড় বড় লীডার দিয়ে লিখবে : তরুণ-তরুণীর অপূর্ব প্রেম, মৃত্যুকালে পরস্পরের—"

কথাটা শেষ করবার আগেই রমা হেসে উঠল। বায়ু-তরঙ্গিত প্রশস্ত পথের উপর দিয়ে মিষ্টি-হাসিটা জল-তরঙ্গের ঝঙ্কারের মতো ছড়িয়ে গেল।

পার্থ হেসে বললে, "সে কাণ্ডটা করো, তাতে আমার এতটুকুও আপত্তি নেই, কিন্তু দোহাই তোমার, য়্যাকসিডেণ্টটা অন্তত ঘটিয়ো না।"

রমা বললে, "কিন্তু তা করতে গেলে য়্যাক্সিডেণ্ট ঘটবেই।"

—"ঘটবেই ? আমি বিশ্বাস করিনে। আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখা যাক তবে—"

—"হাঃ ফাজিল, এখানে, এই সময়ে। পরীক্ষা করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন চুপটি করে মুখ বুজে বসে থাকো তো ?"

—"বেশ—"পার্থ পকেট থেকে আর একটা সিগারেট্ বের করে ধরালো। বিরলা মেন্সন, ভার্জিনিয়া হাউস্, আমি নেভি, সেণ্ট পল্স চার্চ পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে স'রে যাচ্ছে। গাড়ির স্রোত চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে যেন অসংখ্য ক্রিকেট্-বলের মতো গড়িয়ে চলেছে,—সময়কে তারা আঘাত করতে চায়।

গড়ের মাঠ পেরিয়ে বাতাসের চঞ্চল-তরঙ্গ, অনেক দূরের গঙ্গার স্পর্শ আর শুকনো ঘাসের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে। রৌদ্রে মাঠটাকে কেমন অস্বাভাবিক মৃত্যু-ধূসর ব'লে মনে হয়, শূণ্য স্টেডিয়ামগুলো যেন উৎসব-শেষের হৃতশ্রী নিয়ে পড়ে আছে। তবুও রেড-রোড দিয়ে মোটরের শ্রেণী, জনা-কীর্ণ বেহালার ট্রাম। মাথার উপরে ঝুলে' পড়া ইলেক্‌ট্রিক্ তারের গিঁটে গিঁটে ট্রাম-স্ট্যাণ্ডের সংঘর্ষ লেগে' এই দিনের বেলাতেও বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছিল।

ওপাশে রেস্‌কোর্স। সিগারেটে একটা টান দিয়ে পার্থ বললে, "রমা, জীবনের 'রেস্' খেলায় আমি হেরে' গেলুম।"

রমা মুখ ফিরিয়ে বললে, "তার মানে ?"

—"মানে ?" পার্থ ক্লিষ্টভাবে হাসল শুধু।

রমা বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "তোমার মতো এমন 'সেণ্টি-মেণ্টাল্ মানুষ নিয়ে পৃথিবীতে আদৌ কাজ চলে না, বুঝতে পেরেছ ?"

—"হুঁ-উঁ-হুঁ—," পার্থ মাথা নেড়ে' বললে, "আমার বন্ধুরা দয়া করে সে কথাটা অনেকবার শুনিয়েছেন, আজ তুমি নিশ্চয়ই নতুন কিছু বলতে পারছ না।"

—"সত্যি কথা কখনো নতুন হয় না, জানো তো ? কিন্তু কে বললে, তুমি রেস-খেলায় হেরেছ ? আমি তো দেখছি, পুরোপুরি জিত হয়েছে তোমারি।

—"কেমন করে ?

—"নাঃ, তুমি বড্ড ছেলে মানুষ, নিজের বুকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রমা বললে, "বুঝতে পেরেছ এইবারে ? হার তোমার হয় নি, যা হয়েছে, তা আমার।

—"বুঝেছি।"

পার্থ নিরুত্তরে ভাবতে লাগল। গাড়ি তখন চৌরঙ্গীর সমারোহ পার হয়ে ভবানীপুরের অপেক্ষাকৃত অমার্জিত ভাঙা-চুরো অঞ্চলটাতে এসে পড়েছে। রমা সরে বললে, "এইবারে তুমি চালাও। আমাদের বাড়িটা এর মধ্যেই ভুলে যাওনি নিশ্চয়।"

—"আমার স্মৃতি-শক্তি সম্বন্ধে এতটা অবিচার কোরো না।"

রমা ক্ষুণ্ণ অভিমানে বললে, "সুবিচারই বা করব কী

ক'রে? কি সর্বনেশে লোক বাপু তুমি, ছ' সাত মাস আগে সেই যে কোথায় ডুব মারলে, খুঁজে খুঁজে আর পাত্তাই পাইনে। আমি তো রাত্রে কেঁদে কেঁদে ঘুমুতে পারিনে, আর তুমি যে কোথায়—"

পার্থ বললে, "সত্যি?" ওর কথার মধ্যে বিদ্রূপের একটু আভাসও ধ্বনিত হয়ে উঠল যেন।

রমা ঝাঁজিয়ে বললে, "সত্যি না তো কি! দুনিয়া শুদ্ধ্‌ লোককে নিজের মতো ক'রে ভাবো কিনা, তাই কারো কথাই বিশ্বাস করতে জানো না। ছেলেদের জাতটাই এমনি।"

—"একটা পরম জ্ঞান-গর্ভ বাক্য শেষ পর্যন্ত শোনা গেল।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ," রমা অধৈর্য ভাবে বললে, "তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আমি আর তর্ক করতে পারিনে, এসব বাজে কথা এখন তুলে রেখে দাও।"

আবার কয়েক মুহূর্ত দুজনে নীরবে বসে রইল। একান্ত নীরব, অথচ একান্ত মুখর অফুরন্ত বিচিত্র এই মুহূর্তগুলি!

পার্থ হঠাৎ হেসে উঠল।

রমা চোখ তুলে বললে, "হাসছ যে?"

—"গাড়ীটা তো এখন আমার হাতে। যদি এখন মোড় ঘুরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে রওনা হই, তুমি তা হ'লে বেশ জব্দ হয়ে যাও তো?"

—"আমি? মোটেই নয়—," দুষ্টুমির হাসিতে রমার চোখ মুখ জল্ জল্ করে উঠল: "সে রকম মৎলব যদি করতে চাও, তা হলে কী করব জানো? রাস্তার লোককে চীৎকার করে জানিয়ে দেব যে এই লোকটা আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে শ্যামবাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমার কথা শুনছে না। তারপরে কী হবে অনুমান করতে পারো?"

পার্থ বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "উঃ, কী ভয়ঙ্কর লোক তুমি!"

—"সেটা যদি আজকে নতুন জেনে থাকো তবে এই ভয়ানক লোকটিকে ভয় করে ভদ্রলোকের মতো আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে চলো।"

—"নাঃ তোমাকে নিয়ে পারা গেল না।"

রমা গম্ভীর হ'য়ে বললে, "তুমি আবার আমার সঙ্গে পারবে কী!"

—"এত অহঙ্কার? আচ্ছা, দেখা যাবে।"

—"দেখো।"

গাড়ীটা প্রিয়নাথ মল্লিক লেনে মেজর গুপ্তের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

দু জনে ড্রইং রুমে এলো।

ছ'মাস পর্যন্ত এই ঘরটার সঙ্গে পার্থের পরিচয় নেই, তাই চারদিকের সব কিছুই যেন কেমন অস্বাভাবিক, অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। অথচ, কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি; অন্তত বাইরের দৃষ্টিতে তেমন কিছুই তো লক্ষ্য করতে পারা যায় না। শুধু ফুলদানীতে টাটকা নতুন ফুলের গুচ্ছ, প্রতিদিন ওরা নবাগত; এই ড্রয়িং রুমের চির-পরিচিত পরিমণ্ডল, প্রতিদিনের সিগারেটের গন্ধ, উচ্ছল হাসি-আলোচনার আঘাতে ওদের পাপড়ি বিবর্ণ, শিথিল হয়ে একেবারে ঝড়ে পরবার আগেই তো এখান থেকে ওদের নির্বাসন ঘটে।

রমা বললে, "বাবা ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়। ওঁকে আর এখন জাগিয়ে কাজ নেই, বিকেলে তোমাকে দেখে কত খুসি হবেন যে। তুমি বোসো এখানে কয়েক মিনিট, আমি কাপড়টা বদলে আসছি ভেতর থেকে।"

একটা গানের সুর নিজের ভিতর গুন গুন করতে করতে রমা চঞ্চল-পায়ে চ'লে গেল, ওর সর্বাঙ্গে যেন দক্ষিণ বাতাসের উচ্ছল স্পর্শ। তর্ তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ডাকতে লাগল, "কুসুম, কুসুম!"

কুসুম চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো।

—"যা খাবার আছে, এক্ষুণি ভালো ক'রে থালায় সাজিয়ে নিয়ে আসবি, এক মিনিট যেন দেরী না হয়, বুঝলি?" কুসুম ভারী গলায় বললে, "তোমার ঘরেই দিয়ে আসব দিদিমণি!"

রমা সস্নেহে ধমক দিয়ে বললে, "আমার ঘরে কি-রে, আর বুঝি কেউ খাওয়ার লোক নেই?"

—"তুমি খাবে না! সে কি গো, এই বেলা একটার

সময় আবার কে এলো? ভার ভাত তো শুধু একজনের মুগ্যিই রয়েছে, তুমি কী সমস্তটা দিন না খেয়ে—”

রমা আবার ধমকে উঠল: ‘যাঃ যাঃ সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। যা বলছি, তাই কর! আমি উপর থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শাড়ীটা ছেড়ে আসছি।”

কুসুম বললে, “যাচ্ছি।”

মিনিট দশ পনেরো পরে নিজেই খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে রমা বসবার ঘরে এসে ঢুকল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, চেয়ারটা শূন্য, টেবিলের উপরে এক টুকরো চিঠি।

এখান থেকেই রমা চিঠিটা পড়তে পারছে, লেখাগুলো বড় বড়:

“আমি জানি, এ ভুল তোমার ভাঙবে, পৃথিবীর ধুলো তুমি সহ্য করতে পারবে না, তাই আমার নিজের প্রলোভনের হাত থেকেই আমি তোমাকে রক্ষা করতে চাই। বিনা অনুমতিতেই বিদায় নিলাম, কারণ, তোমাকে আবার পাওয়ার জন্যে আমি লুব্ধ হয়ে উঠছিলাম, নিজের পরিস্থিতিটাকে ভুলে যাচ্ছিলাম। এমন অসংযত মনকে বিশ্বাস নেই, তাই আমার এ ভাবে চলে-আসার অর্থটা তুমি বুঝবে। আমার জীবন থেকে তোমাকে আজ সম্পূর্ণ মুক্তি দিলাম, ভুলে যাওয়াও তোমার পক্ষে হয়তো কঠিন হ'বে না। ক্ষমা কোরো—”

— পার্থ

রমার হাত থেকে খাবারের থালাটা ঝন্ ঝন্ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গান

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এম্-এ

আমি সন্ধ্যা কমল মুদেছি আমার আঁখি।
আজ, পারিনি ফুটিতে মেলিয়া আপন দল
তোমার কিরণ মাখি'॥

তরুণ বন্ধু মোর,
ওগো, তরুণ বন্ধু মোর -
এ কি, নিতল সুপ্তি ঘোর।
সঘন তিমির নামে চারিধারে,
স্তব্ধ মরণ নীর-সঞ্চারে
তন্দ্রা-বিছানো অলস কানন তল
নীরবে ফেলিছে ঢাকি'॥

সুদূর স্মৃতির অন্তিম পার হ'তে,
কোন্, নবীন ঊষার সুখ-সৌরভ আনে
ঘন অরণ্য পথে।
তরুণ বন্ধু মোর,
ওগো, তরুণ বন্ধু মোর—
দেখ, রাত হয়ে এল ভোর।
তুলি আনন্দে আলোকের রোল,
নব-জীবনের প্রাণ-কল্লোল
কভু কি আবার জাগাবেনা মোর প্রাণে
অরুণ চরণ রাখি'॥

আফ্রিকার জঙ্গলে সাতহাজার মাইল

শ্রীহীরেণ বসু

কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতার নেশায় আমাদের কেঁপিয়ে তুলছিলো। তাই টেণ্টে ফিরে আহারাদি শেষ করে বেলা ৩টা-৪টার সময় বেরিয়ে পড়লাম নতুন সিংহদলের অনুসন্ধানে। প্রায় দুমাইল দূরে লোনা জলের একটী নালী আছে—তারই কাছে ও আশেপাশে এরা আসে সারাদিনের তৃষ্ণা নিবারণ কর্ত্তে! আমাদের বয়রা খালি পিপে সঙ্গে নিয়েছে ব্যবহারের জল নেবে বলে। লরির সাথে ছোট ক্যামেরাটাও আছে।

সারেঙ্গাটির মরুভূমির উত্তাপে যারা হয় তৃষিত তাদের সকলেরই দেখা পেলাম সেথায়—তারই অনতিদূরে দিনান্তের ক্লান্তির অবসাদে বিশ্রাম নিচ্ছিলো ৬টা পশুরাজ।



লোনা জলের নালীর ধারের যাত্রী

চাহনী তাদের শ্রান্তিমাখা। মিঃ একম্যান জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে কিছু খাবি নাকি?" এ আহ্বানে তারা উঠে দাঁড়ালো—মিঃ একম্যান আবার বললেন "আচ্ছা বোস, আনছি কিছু শিকার করে।"

এরপর আমরা পিছু নিলাম জেব্রা উইলডাবিষ্ট আর থমসন গ্যাজেলের। পথে পেলাম বিরাট এক জিরাফের দল, সংখ্যায় এরা ছিলো প্রায় ১০০টী। এদের ক্ষিপ্রগতি আমাদের গাড়ীকে অনায়াসেই এদের অতিক্রম করতে দিলো এবং ছবি উঠাবার অবকাশও দিলো। মিঃ একম্যান গুলির বর্ষণে দীগন্ত কাঁপিয়ে তুলতে লাগলেন সে গর্জ্জনে মাঠের সারা পশু-পক্ষী আর্ত্তনাদে চীৎকার করে দূরে পালাতে লাগলো। কিন্তু মরে না কেউ—আশ্চর্য্য এত গুলিতেও কারোকে আহত করতে পারা গেলো না মিঃ একম্যান মরিয়া হয়ে শেষে একটি Buster Crater মারলেন—পাখী বটে যেন জটায়ু! মিঃ একম্যান বললেন "মিঃ বোস, আমার রাইফেলের মাছির দিগটা বোধকরি বয়রা ভেঙ্গে ফেলেছে—তাই বার বার এমন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছি।"



তৃষিতদের দেখা পেলাম

আমি বললাম "তবে আজ থাক্, সন্ধ্যাও প্রায় হয়ে আসছে কাজেই কাল সকালে আবার প্রচেষ্টায় যাত্রা যাবে।"

মিঃ একম্যান বললেন "আমি যে ওদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি"। আমি—"বেশত, কাল সকালেই সেটা রক্ষা করা যাবে'খন।" তিনি—"ওদের অতক্ষণ সবুর সইবে না মিঃ বোস—মটরের সঙ্গে সঙ্গে ওরা টেণ্ট পর্য্যন্তই শেষে ধাওয়া কর্ব্বে।"

কী সর্ব্বনাশ তাহলেই ত' গেছি; আমি বললাম "তবে?" মিঃ একম্যান বললেন "তবে আর কী—বন্দুকের তাক দেখতেই হবে—এ কাজ সমাপন করতেই হবে।"

সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি তখন মাঠের সারা গায় ছড়িয়ে পড়েছে—। গাছের আড়ে আড়ে সন্ধ্যার আবেশ ঘনিয়ে এসেছে। এই রকম একটী গাছের আড়ালে একটী জেব্রা পরিবার বিশ্রাম নিচ্ছিলো। স্বামী স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান। মিঃ একম্যানের গুলিতে মৃত্যু হলো স্ত্রী জেব্রাটীর। কিন্তু এর স্বামী বা পুত্র কেউই এই মরণোন্মুখ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর স্ত্রী জেব্রাটীকে ছেড়ে এক পাও নড়লো না। আমাদের বয়রা কাছে গিয়ে তাড়া দিতে এরা সরে গেলো বটে, সেও



নিমন্ত্রিতের অপেক্ষা

দুচার পা—"। বয়রা মৃত দেহটীকে বহন করে নিয়ে তুললো লরির উপর। অদূরে দাঁড়িয়ে রইল জেব্রা পরিবারের অবশিষ্ট দুইটী প্রাণী। তাদের চোখ বেয়ে অজস্রধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপার আমাদের লরির সকলেই নীরব।

জেব্রাটীকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো সেই নিমন্ত্রিত সিংহ দুইটীর সামনে। আমি বললাম "মিঃ একম্যান সর্ব্ব রক্ষে হয়েছে, এখন ফিরে চলুন ডেরায়।"

মিঃ একম্যান হেসে বললেন, "বুকে বুঝি লেগেছে? কিন্তু কি জানেন মিঃ বোস কারুর মৃত্যুতেই কারুর উদর পূর্ত্তি।"

এই সাধারণ সত্য জানিনা তাও নয়—মনে আসেনি তাও নয়—কিন্তু কেন যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের মত সারা বুক ছেয়ে জেব্রা পরিবারের অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগলো। টেন্টে—না খেয়েই শুয়ে পড়লাম, ভাবতে লাগলাম সেই মায়া-মমতা যা মরণের মাঝেও টেনে আনে বাঁচার অতৃপ্ত আশা। সে ত' চোখের সামনেই দেখলাম তা সে জানয়ারের মৃত্যুতেই হোক আর মানুষের!

কালকের রাতের মত আজও বনের উল্লাসের অবধি নেই। ঝিঁঝিঁ থেকে আরম্ভ করে হায়নার বিকট চীৎকার সবই তেমনি, তবে কালকের মত অন্ধকার আর আজ গলা টিপে ধরছে না। মানুষকে যা সওয়ানো যায় তাই সয়, তাই এও সয়ে গেলো।



লায়ন হিলসের ক্যাম্প

সকালে উঠে প্রস্তুত হতে লাগলাম। আজ বানাগী হিল্স ছেড়ে আমাদের দল প্রায় ১০০ মাইল দূরে লায়নস্ হিলে যাত্রা কর্ব্বে, সেখানে সিংহদের গাছে উঠিয়ে নতুন মজার পর্ব্ব সুরু হবে। প্রায় ৪॥টার সময় এই নতুন জায়গায় এসে পৌছলাম। এখানে রাত্রে সিংহের উপদ্রব খুব বেশী। মিঃ একম্যান সকলকে আশ্বাস দিয়ে বললেন "আমি আজও কখন বিপদের সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি।"

এই স্থানটীতে অসংখ্য জন্তুর বাস! অষ্ট্রিচ থেকে সুরু করে wild dogs ইত্যাদি নানা জন্তুর সংমিশ্রণে জায়গাটী স্বভাবের বিচিত্র চিড়িয়াখানার একটী বিশেষ অংশ হয়ে উঠেছে। জলাভাব এত যে ঘোলা জলেরও নামগন্ধ নেই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রান্নাখাওয়ার ব্যবস্থা হতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া শেষ হলো তখন প্রায় ৬টা। এখনও দিগন্তে আলোর অভাব নেই। মিঃ একম্যান বয়দের জন্য একটী থম্‌সন গ্যাজেল মেরে দিলেন। তারা সেই হরিণের দেহ ছিন্নবিছিন্ন করে কাঠের গোঁজার অগ্রে বিদ্ধ করে আগুনের চারিপাশে সাজিয়ে রেখেছে আর তাই ধীরে ধীরে পুড়ছে! এরই অদূরে হায়নাদের লোলুপ দৃষ্টি ও চীৎকারের আর মুহুর্মুহু সিংহের গর্জ্জনের সাথে সন্ধ্যা ধনিয়ে এলো। আঁধারের ঘন কালির বুকে আমাদের টেন্টগুলি লেপে মুছে যেন বিলীন হয়ে গেলো। অবসাদে সারা অঙ্গ ভরে রয়েছে তাই ঘুমোবার চেষ্টা করছি, তন্দ্রাও আসছে কিন্তু প্রলয়ের গর্জ্জনে তা শত-ছিন্ন মনে আনছে ভীত-শঙ্কা আর মিঃ একম্যানের শেষোক্ত দুটী কথা।



পশুরাজের গাছে চড়ার আগের অবস্থা

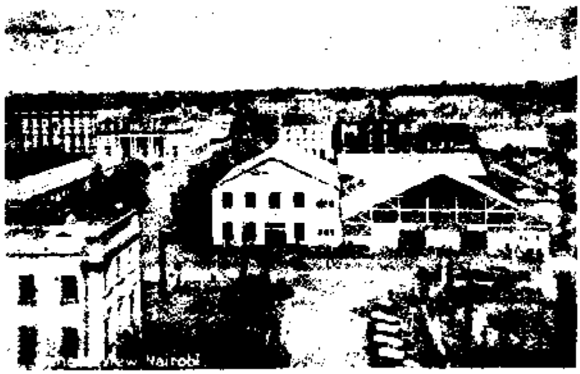
পাশের টেন্ট হতে শ্রীযুত সুধীর বোস ছবির টেষ্ট পিস তৈয়ার কর্ত্তে কর্ত্তে চীৎকার করে বলছিলেন "আলো বন্ধ করো—আলো বন্ধ করো।" মাথার মধ্যে রয়ে রয়ে এ কথাটাই ঘুরতে লাগলো যে কতটুকুই বা আলো আছে যা বন্ধ করতে এই আবেদন। তার চেয়ে এই গাঢ় বনস্পতির চোখ ফুটিয়ে শত সূর্য্য জ্বলে উঠুক আর বুকের ত্রাসের হোক অবসান। এই সূচিভেদ্য অন্ধকারের বুক ফেটে আসুক আলোর ঝরণা যার অমৃত ধারায় এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে আনে তৃপ্তির নিশ্বাস; আনে শান্তির আচ্ছাদন। এই রকম নিদ্রা জাগরণের মাঝে পড়ে আছি, তখন কানে চীৎকার এলো "সিম্বা সিম্বা"। চমকে উঠে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম তা দেখলে বুকের রক্ত সত্যিই শুখিয়ে যায়। মনে হ'লো স্বপ্নই বা দেখ্‌ছি,—একটী সিংহ মিঃ একম্যানের টেন্টের মাঝ দিয়ে বরাবর সোজা বেরিয়ে এসে আমাদের টেন্টের গা শুঁকে শুঁকে চলে গেলো—সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হলো "দুম্‌-দুম্‌"। মিঃ একম্যান তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন—বয়রা চীৎকার করে জলের খালি ড্রামে অবিশ্রান্ত ঘা দিতে লাগলো। আমরা সব যে যার টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলাম—যেন পা আর চলেনা। তবুও বেরিয়ে এলাম। মিঃ একম্যানের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন "মাংসের গন্ধ পেয়ে



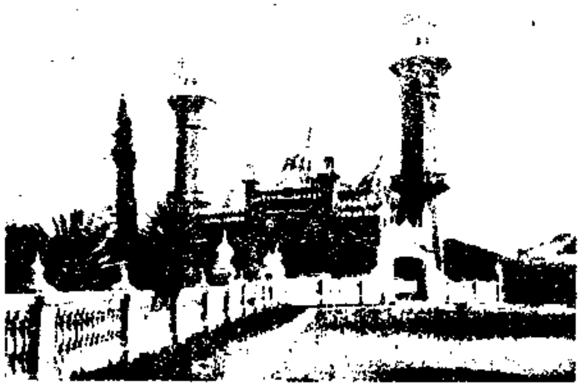
প্রবাদ আছে সিংহ গাছে চড়েনা

অমনতর ওরা আসে।" আমি—"অনিষ্টও তো করতে পারত?" তিনি বললেন "কাফ্রিদের সুবিধে পেলে তুলে নিয়ে যায় তবে শ্বেতাঙ্গদের কিছু বলে না।" সে ত নিজের চোখেই দেখলাম মিঃ একম্যানের টেন্টের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো তবু তাঁর গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত দিল না। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ কী করে সম্ভব হয়?" তিনি বললেন "মিঃ বোস! মাসাই জাত এদের উপর আজও অত্যাচার করতে ছাড়ে না তাই কাফ্রি দেখলে এরাও ক্ষেপে উঠে। কিন্তু কোট প্যান্ট পরিহিত লোকগুলো খালি

খেতেই দিয়ে এসেছে—নিতান্ত সঙ্কট না হলে মারে না, তাই এদের হিংস্র প্রাণেও এদের জন্ম কৃতজ্ঞতা ভরা আছে।" এ আর একটী অদ্ভুত কাহিনী মনে হ'লো। নানা আলাপ আলোচনায় সে রাত্রি প্রভাত হলো। সকালের নতুন আলোয় আমাদের দেহের সকল ক্লান্তির অবসান এলো।



নৈরবী সহরের দৃশ্য



নৈরবীর জুম্মা মসজিদ

আবার কর্ম্মের আহ্বান। সকলের সাজ সজ্জার শেষে সিংহদের গাছে চড়াবার আশায় বার হয়ে পড়লাম। পথে পেলাম কয়েকটী সিংহ ও সিংহী—তাদের পেছুতে মটর নিয়ে তাড়া করেছিলাম। ছবি উঠানোর কাজ চলতে লাগলো।

শেষে আমরা পৌছিলাম ৫০ মাইল দূরে বানাগী হিলসের জঙ্গলের শেষ সীমানায়। একটী "টপি" মোর—পুরানো সিংহদের খোঁজে যাত্রা করলাম।

যথাস্থানে পৌছিয়ে হরিণটীকে গাছের নীচু ডালে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা হতে লাগলো। কিন্তু বাঁধা সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই সিংহের দল উপস্থিত হলো। আমাদের কয়েকটী রয় তখনও গাছের উপর,' আমরা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। মিঃ একম্যান বললেন "ভয় পাবার কিছুই নেই, এরা অপেক্ষা কার্ব্বেথন।" সত্যিই এই ক্ষুধিতের দল আমাদের ২০।৩০ ফিট দূরে গাছের তলায় গৃহপালিত কুকুরের মতই

বসে রইল। আমাদের সব কাজের সমাপ্তির পর মটরে এসে উঠলাম, সিংহের দল লাফিয়ে গাছের উপর উঠলো। ধারণা ছিল সিংহ গাছে চড়তে পারে না কিন্তু সে ধারণায় সিংহের যায় আসে কী—; তারা গাছে বাঁধা হরিণের লোভে কখন গাছ বেয়ে কখন বা লাফ দিয়ে, উঠবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমাদের ছবির কাজও দ্রুত চললো। এ দিনের ছবি সত্যই ছবির পর্দ্দায় আশ্চর্য্যজনক ও ভয়াবহ মনে হবে। Lions Hillএ প্রত্যাবর্ত্তন করেই আমরা ডেরা উঠালাম কারণ ব্যারেলের জল প্রায় নিঃশেষ করে এনেছিলাম। অতএব এর পরেও এখানে থাকা কতখানি যুক্তি-সঙ্গত তা আমরাও যেমন বুঝেছিলাম, পাঠকবর্গও বোধকরি বুঝবেন।



অল সেন্ট ক্যাথিড্রাল : নৈরবী

আবার সেই গারোঙ্গোরোর মেঘাবৃত চূড়া, আবার সেই রাত্রের হিমানীর শৈত্য পার হয়ে আমাদের চির-পরিচিত মটুয়াম্বা নদীর ধারে ফিরে এলাম। ৭ দিনের ধুলোর সমাপ্তি এরই শীতল জলে করলাম। পরে ফলাহারাদি সমাপ্ত করে আরুষার পথে ফিরে চললাম। পথে পড়ে অল্ডিওনো (Oldiano) এবং লেক লায়কা (Lake Lyaka)। এই রাস্তায় যারা বন্যজন্তু শিকারে যায় তাদের জন্যে সুবন্দোবস্ত আছে। অধিকন্তু এই লেক লায়কার ধারে অজস্র Flaningoesএর বাস। রক্ত পদ্মের ন্যায় সরোবরের জলে এদের শোভা। প্রতি সন্ধ্যায় বন্যজন্তুরা এই লেকের জলে পানীয় সংগ্রহ করতে আসে। তাই বহু সময় এই লেকের ধারে গণ্ডার, হাতি, বুনোমহিষ ইত্যাদির পরস্পরের বিবাদের দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। এ রকম চিত্র Metro Goldwyn Myreও সংগ্রহ করেছেন এইখান থেকেই।

আরুষায় ফিরলাম ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯। ফিরে আসার পর শুধু এই কথাটাই স্মরণে থাকে যে কী অদ্ভুত এই স্থানের প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য। কোথাও শীতের অন্ত নেই অথচ তারই পাশে আগ্নেয়গিরির ধূমোদ্গারণ, শুখনো মরুভূমির সমান সারেঙ্গাটী প্রান্তর অথচ সেখানে মুহুর্মুহু বৃষ্টির সমাগম। একই ময়দানে সিংহ ও হরিণ। কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পেলে ছেড়েও দেয় না অথচ পায়ও



কেনিয়ার দিগন্ত

না। সিংহ বিশ গজের বেশী দৌড়াতে পারে না অথচ হরিণ, জেব্রার গতির তীক্ষ্ণতার আর অবধি নেই। মরন বাঁচনের সীমানার মাঝে একি অদ্ভুত সামঞ্জস্য।

টাঙ্গানিকার অভিজ্ঞতা শেষ করে এবার আমরা কেনিয়া যাত্রা করলাম। কেনিয়ার প্রধান সহর হচ্ছে নৈরবী। আরুষা থেকে Mount Meruর পাশ দিয়ে যে সরকারি রাস্তা গেছে তা নৈরবী সহরের মধ্যেই এসে পড়েছে। আরুষা থেকে নৈরবী হচ্ছে ২৫০ মাইল। মাঝে পড়ে ইমেগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের পথরোধ অফিস—এখানে পাস পোর্ট দেখিয়ে Kenyaতে প্রবেশ করতে হয়।

কেনিয়ার পথে যে সমস্ত জঙ্গল অতিক্রম করতে হয়—

সেখানেও অষ্ট্রিচ, জিরাফ, উইলডা বিষ্ট ইত্যাদির কিছুমাত্র অভাব নেই। হাতীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়েও রাস্তা পার হয়ে গিয়েছে।

আমরা কেনিয়ার প্রধান সহর নৈরবীতে এসে যখন পৌঁছিলাম তখন রাত প্রায় ৮টা। সুন্দর তকতকে পরিচ্ছন্ন সহর। সহরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হলাম। দোকান পসার সবই পরিপাটিভাবে সাজানো। ইয়োরোপের যে কোন বড় সহরের রূপ মনে করিয়ে দেয় এই ছোট্ট নৈরবী।

এরই ৩৩ মাইল দূরে 'থিকা' সহর। যেখানে আমাদের সাফারির মুখ্য উদ্দীপক মিঃ দয়াভাই পাটেলের বাড়ী। আমরা ছিলাম তারই বাড়ীতে অতিথি। এই 'থিকা'তেই একবার মেট্রো গোল্ডউইন মাইয়ার ৩ মাস টেন্ট ফেলে ছিলেন তাদের কয়েকটী জঙ্গল চিত্রের ছবি সঙ্কলনের আশায়।



থিকার জলপ্রপাত

পরদিন প্রাতে আমরা নিজেদের টেন্ট প্রতিষ্ঠা করবার জন্য জায়গার অনুসন্ধানে বেরুলাম। চেনিয়া নদী ও থিকা নদী একই স্থানে প্রপাতের সৃষ্টি করেছে। তারই মাঝে এক ফালি জমি, জমিদার তার মিঃ প্রেমচাঁদ ভাই। যিনি কেনিয়ার সমাজ ব্যবসায়ী বলেই পরিগণিত হন; তাঁর কাছে সাহায্য ছাড়াও অনেক খনিজ ব্যবহারের জন্য আজও আমরা ঋণী। যাই হোক্ সেই দেবাকল্পিত জায়গায় আমাদের বসতি বসলো। ঝরণার ঝর ঝর শব্দে বনানী মুখরিত, তারই পাশে বিশ্রামের স্থান, এ যেন কবি কল্পনার বা আশ্রম কল্পনার কল্পলোক। এইখানে আমাদের দলের অধিকাংশকে স্থায়ী আস্তানা দিয়ে আমরা দশজন বেরিয়ে পড়লাম ইউগাণ্ডার পথে। ইউগাণ্ডায় আমাদের হাতী, কুমীর ও জলহস্তীর ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়েছিলো। থিকা জায়গাটী দেখে শুনে ঠিক করেছিলাম যে আর্টিষ্টদের কাজ এইখানেই ধীরে সুস্থে নেওয়া যুক্তি সঙ্গত।

তাই দুদিনের মধ্যেই আমাদের ইউগাণ্ডা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। সুন্দরী কেনিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য্য সুধা পান করার অবকাশ পরে ব্যবস্থা করে আমরা ইউগাণ্ডা যাত্রা করলাম।

থিকা থেকে নৈরবী হয়ে পথ পাহাড় বেয়ে চলেছে কিসিমুর দিকে। "কিসিমু" ইউগাণ্ডার একটি প্রধান



কেনিয়ার কিকুই জাতি

সহর। বিশ্ববিখ্যাত ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা লেকের ধারেই এই সহর গড়ে উঠেছে। কাজেই আবার এক বিশ্বখ্যাত হ্রদ দেখবার আশায় প্রাণ নেচে উঠলো। পথের দূরত্ব প্রায় দু শ' মাইল। পথে পড়ে গিলগিল, লেক নকুরু, লেক নাইভাসা ইত্যাদি। প্রত্যেকটিই তার নিজের বিশিষ্টতায় বিখ্যাত।

কেনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে "কিকুই" জাতই প্রধান। এরা এখন বেশীর ভাগ খৃষ্টান হয়ে গেছে। গোলামী করে করে এদের জাতের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও নিতান্ত নিস্তেজ ও পরমুখাপেক্ষী। এদেশের দোষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী লাগছিল আমার, মদ খাওয়ার নেশা। কারু সাথে কথা কইবার জো নেই। যাঁরা আমাদের দেশে খেতেন না তাঁরাও খান। তা ছাড়া এদেশে ব্যবসাদার যারা তাঁরা শিক্ষিত সম্প্রদায় ভুক্ত নন। ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁদের দিনের পুজি টাকা আনা পাই এবং রাতের আনন্দ মদ ও নেশা। কেবল শ্রীযুত প্রেমচাঁদজীকে এ রোগে আক্রান্ত করতে পারে নি বটে। তবে জীবনের সব বাঁধনের বাধা অতিক্রম করে যারা এই পরদেশে জীবন সমর্পণ করেছে তাদের বোধ করি হতে হয় উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল। স্বাধীনতা কেমন করে ধীরে ধীরে মানুষকে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে টেনে নিয়ে যায় তা এদের দেখলেই বোঝা যায়।

শ্রীযুত প্রেমচাঁদজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এমন হয়। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এদেশের লোকে বিলাতি ভাবাপন্ন হতে চায় এই মন্ত্র পেয়েই—আমি হতে চাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে।"

শুনে কথাটা ভাল লাগলো। কিন্তু তবুও যা জিজ্ঞাসা করলাম তার সদুত্তর পেলাম না এটা বুঝলাম।

কেনিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ভারতীয়দের ইংরাজি ভাবাপন্ন দেখেই বোধ করি Highland নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। আমার এখানে অবস্থান কালে শুধু এইটুকুই উপলব্ধি করেছি যে বিশেষ করে কেনিয়ার ভারতীয়দের গভর্ণমেণ্টের আদেশ শিরোধার্য্য করা ছাড়া গতি নেই। কারণ এই ভারতীয়রা ব্যবসা করে—শুধু বিলাতের সাহেবদের সঙ্গেই যারা এই কলোনির হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এদের অসন্তুষ্টিতে যাদের পেটের খোরাকের টান ধরে তাদের দিয়ে প্রতিবাদের আশা কম, অন্য কথায়, নেই।

যাক্, আদার ব্যাপারি আমরা আমাদের Highland-Lowland এর তর্কে আর আসে কী। আফ্রিকান পলিটিক্সকে ভিক্টোরিয়া লেকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা ২৯শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৪টার সময় কিসিমু এসে পৌছিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেণ বসু



বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল

৭

গদ্য সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চর্চ্চার উৎসাহদাতা ও গুরু ঈশ্বর গুপ্তের তৎকালে কিরূপ প্রভাব ছিল, তাঁহার স্বরচিত দুইটি ছত্রে ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং 'প্রভাকরে' এইরূপভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

গুপ্ত কবি তখন সাহিত্যাকাশে সূর্য্যের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন-রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। গদ্য লেখক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের নাম করিবার মত কিছু নাই কিন্তু কবি বলিয়া তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

তরুণ বয়সে সাধারণতঃ কবিতা লিখিবার দিকে একটা ঝোঁক আসে এবং ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া স্বভাবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে গদ্য রচনার পূর্ব্বে পদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে উহার সূত্রপাত হয়। তাঁহার রচিত প্রথম কবিতাবলী ঋতু বর্ণনাচ্ছলে নায়ক নায়িকার রসালাপ। ইহাতে মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহারের ভাবের ছায়া কোথায়ও কোথায়ও পতিত হইয়াছে। ঐ সকল কবিতার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের "ললিতা" ও "মানস" নামে দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার বাল্যের রচিত কবিতাবলী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

"বর্ষার পল্লব নব, তা হ'তে অধর তব,
শতগুণে সুকোমল শোভা।
নদ নদী জলে টলে, তা হ'তে যৌবন জলে,
তব দেহ কিবা মনোলোভা॥
আর দেখ করিবরে, বরষায় মত্ত করে,
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার তরে, হেরি তব পয়োধরে,
চিৎকার করিছে কুঞ্জর॥
যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্ব্বের সার।
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।
মেঘে রবি ঢাকাঢাকি, কেশেতে সিন্দুর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ॥
পদে পদে এইরূপে, হারিয়া তোমার রূপে।
কত অপমান বরষার।
এত দুঃখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে,
রোদন করিছে অনিবার॥
সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টিধার তার,
ঘন নাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
তাই প্রাণ নিরন্তর, বরষিছে জলধর,
তাই মেঘ গর্জ্জে অনিবারে॥"

"হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুইলে বিফল হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন
সে বন এখন নাহিক সয়॥
জীবন ও বনের আভিধানিক একটি অর্থ—জল।
'ললিতায়' ঝড়ের বর্ণনা এইরূপ :—
"গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কার গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ পায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্ত বন।
পাতা উড়ে ঢাকে গনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে
বুড় বড় মহীরুহগণ॥"

এই সকল কবিতায় গুপ্ত কবির ভাব ভাষা ও অনুপ্রাসের বাহুল্য সকলই লক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ শুনা যায় যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন,—"তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, তবে তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের গদ্য রচনা দেখিতে সকলেরই কৌতূহল হয়। তজ্জন্য নিম্নে তাহার একটা নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মান। শম্প সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত, মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদাপ্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বু বিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্কসদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে, বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে। কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব শব হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তৈকও বিবেচনা করেন না যে তাহার কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে।" ইত্যাদি—

এই রচনার নিম্নে প্রভাকর সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করেন:—"ইঁহার লিপি নৈপুণ্য জন্ত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন, এবং অক্ষর গুলীন্ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যের পদ্য রচনার ন্যায় গদ্য রচনায় অনুপ্রাসের ঝঙ্কার এবং অভিধানে লিখিত অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।

ঐ সকল রচনা হয়ত বাল্যকালে অনেকে করিতে পারিতেন কিন্তু প্রতিভার ধর্ম্ম এই যে অত্যল্পকাল মধ্যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ গ্রহণ করে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আদর্শে প্রতিভাবান ব্যক্তি উপনীত হইতে না পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই।

ঐরূপ বাল্যরচনার পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় 'Rajmohon's wife' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন। যদি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি একজন যশস্বী লেখক বলিয়া সমাদৃত হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বদেশের দুর্দ্দশা ঘুচিত না। স্বদেশভক্ত বঙ্কিম কোন্ দিকে তাঁহার পথ সহজেই নির্দ্ধারণ করিলেন এবং রাজকীয় গুরুতর কার্য্যের মধ্যেও একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্ম সমস্ত মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেই জাতীয় মুক্তি নিহিত। বঙ্কিম কেবল গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, স্বভাবসুলভ আনন্দের প্রেরণা তাঁহাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। এই জন্য বঙ্কিম সাহিত্য এত লোক প্রিয় এবং এই জন্ম বঙ্কিমের মাতৃবন্দনায় চারিদিকে দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমের ঋণ বাঙ্গালীর অপরিশোধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভা বহুমুখী। তিনি কেবল ভাষাগঠনে নহে, নানাদিকে অপরূপ ভাবস্রোতে এই সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এক সীমায় তৎকাল প্রচলিত সাধুভাষা অন্য সীমায় 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা। ইহাদের কোনটি আদর্শ ভাষা বলিয়া গ্রহণীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের কোনটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিলেন না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এমন একটি ভাষার সৃষ্টি করিলেন যাহা ভাষায় আদর্শ বলিয়া অদ্যাপিও পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বহুকাল পর্য্যন্ত উহার গৌরব নষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হয় না। প্রবাহশীল নদীর ন্যায় কালক্রমে ভাষারও রূপান্তর ঘটে, যদি কখনও ঐরূপ ঘটে তাহাতে ক্ষোভের কোনও কারণ নাই।

পদ্য লিখিলেই কবি হওয়া যায় না। এবং গদ্যে যে কবিত্ব থাকিতে পারে না এরূপও নহে। ফলতঃ কবিত্ব শক্তি থাকিলে, কি গদ্যে কি পদ্যে উহা ধরা পড়িবেই। সাধারণতঃ কবিরা কবিতায় ভাবপ্রকাশ করেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন উচ্চশ্রেণীর কবি, তাহা কবিতায় প্রকাশিত না হইলেও অনায়াসে তাঁহার যে কোন উপন্যাস হইতে বুঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষিতদের মাতৃভাষার প্রতি

অনাদর ও নকল ইংরাজ সাজিবার মোহ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সমবেদনার অভাব, কৃষকদিগের প্রতি জমিদারের অত্যাচার, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য এবং বিদেশীয়ের হস্তে ভারতের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারেন নাই। প্রাচীন গৌরবে আত্মবিস্মৃত এই জাতিকে সমুদ্ধার করিবার জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রের প্রযত্ন চিরস্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে উহা সজীব হইয়া রহিয়াছে।

অভাব সৃষ্টির উৎস। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল চিন্তা, কল্পনা, উচ্চাশা জাগিয়া উঠে, বঙ্কিমচন্দ্র উহা কতক তাঁহার লেখনীতে মূর্তিমান করিয়াছেন। ঐ সময়ে একজন সবিশেষ শক্তিশালী লেখকের আবশ্যক হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিও ঐরূপ নিয়মানুগত।

আমাদের দেশে ইংরাজী নবেলের অনুকরণে কোন উপন্যাস ছিল না। 'গোলবেকয়ালী,' 'উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা,' প্রভৃতি কাহিনী বটতলা হইতে প্রকাশিত হইত। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুপাঠ্য বা অপাঠ্য। সুখাদ্য অভাবে যেমন মানুষ অখাদ্য বা কুখাদ্য গলাধঃকরণ করে, তৎকালে সুপাঠ্য পুস্তকের অভাবে পাঠকেরা ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইতে বাধ্য হইত। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে ঐ অভাব মোচন করেন। ২৭ বৎসর বয়সে ১২৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তখন বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন সৃষ্টির আনন্দে যে বিপুল সাড়া দিয়াছিল, তাহা এখন উপলব্ধি করা কঠিন এবং অনুমান করাও সহজসাধ্য নহে। গতানুগতিক পথ ত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ইহাতে পরিস্ফুট হইল। বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত সামর্থ্যশালী স্রষ্টা। এই সৃষ্টি কার্য্যে অক্ষম লেখক বিলাতীয় উপন্যাসের হুবহু অনুকরণ করিয়া বর্ণিত কিম্বা কোনরূপ গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিয়া লইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতী উপন্যাসের আদর্শ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে এমন সুন্দর উপন্যাস রচনা করিলেন যে শিল্প নৈপুণ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা নিখুঁত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই প্রথম উপন্যাসে কিছু কিছু দোষ ত্রুটী থাকিলেও তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে। রমেশচন্দ্র দত্ত যথার্থই বলিয়াছেন যে 'দুর্গেশনন্দিনী' সাহিত্যাকাশে একটি নূতন আলোক। সে আলোকচ্ছটায় দেশের লোক চমকিত প্রফুল্ল। দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিতে লাগিল। সমস্ত বঙ্গে আনন্দ রব। সকলে বুঝিল যে সাহিত্যে একটি নবীন যুগের আরম্ভ। নূতন ভাবের সৃষ্টি। গদ্য সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীতে যেরূপ মৌলিকতা, কল্পনার কমনীয় লীলা, যেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যচ্ছটা, যেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য্য, তাহা দেখিয়া বঙ্গবাসীগণ অমৃত সাগরে ভাসিল।

দুর্গেশনন্দিনীর আরম্ভ এইরূপ :—

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি, কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ-গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকারে দিগন্ত সংস্থিত হইল যে অশ্বচালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের এইরূপ ভাষা পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এরূপ রূপ বর্ণনার বাহুল্যও খর্ব্ব করা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্থান, কাল, পাত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন সুতরাং যখন যেখানে যেরূপ ভাষা উপযোগী, তদনুরূপ ভাষায় উহা প্রকাশ করিতেন।

"দাসীতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। তিলোত্তমা চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া প্রদীপের কাছে বসিলেন। তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন; অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কাদম্বরী পরিত্যাগ করিলেন। আর একখানি পুস্তক আনি-

লেন, সুবন্ধু কৃত বাসবদত্তা। কখন পড়েন, কখন ভাবেন, আবার পড়েন, আবার অন্য মনে ভাবেন। বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন। গীতগোবিন্দ কিছুক্ষণ ভাল লাগিল, সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। পরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যায় উপর বসিয়া রহিলেন।"

১ম খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি উপন্যাসের স্থানে স্থানে মানব চরিত্রে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র ১ম খণ্ড দশম পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে উহার আভাষ পাওয়া যায়।

বিমলা প্রদোষকালে নিজকক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। "পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়ার বেশভুষাই কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেই বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ। যার মনে রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর টলটল করিতেছে। রসে মন টল-টল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক; পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।"

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ বঙ্কিমচন্দ্রের অদ্ভুত রহস্যময় চিত্র। তাহার রূপ বর্ণনা উপভোগ্য।

"দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটী পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দ পুয়া চারি হাত হইবে। প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠ ভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগগজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু কুঁজো; অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারাকামান কামান, চুলগুলি যাহা আছে, তাহা ছোট ছোট আবার হাত দিলে সুড় সুড়ে। আর্কফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।" ১ম খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ—

২য় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনটি রমণীর রূপের আলো বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অল্পকথায় কি সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন। বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত। একটু একটু মিটমিটে তেল চাই, নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্য্য চলে, নিয়ে ঘর কর, ভাত রাঁধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন। সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায় সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না, তত প্রখর নয় এবং দূরনিঃসৃত। আয়েসাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

কতলু খাঁর জন্মদিন মহোৎসব বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রকাশভঙ্গী যেন একটি চিত্রের পর আর একটি চিত্র পাঠকের সম্মুখে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করিয়াছে। বর্ণনা অপূর্ব্ব কোথায় বা কবিত্বরসপূর্ণ। "মহোৎসব উপস্থিত। আজ কতলুখাঁর জন্মদিন। দিবসে রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এই মাত্র সায়াহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, দুর্গ মধ্যে আলোকময়; সৈনিক, সিপাহী, ওমরাহ, ভৃত্য, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্ত্তকী, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্প বিক্রেতা, গন্ধ বিক্রেতা, তাম্বুল বিক্রেতা, আহারীয় বিক্রেতা, শিল্প কার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাত বিক্রেতা, এই সকলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজী, বেশ্যা। অন্তঃপুর মধ্যেও কতক ঐরূপ। নবাবের বিহারগৃহ অপেক্ষাকৃত স্থিরতর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রমোদময়। কক্ষে কক্ষে রজতদীপ, স্ফটিকদীপ, গন্ধদীপ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে, সুগন্ধি কুসুমদাম পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, শয্যায়, আসনে, আর পুরবাসিনীদিগের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে; বায়ু আর গোলাবের গন্ধের ভার বহন করিতে পারে না; অগণিত দাসীবর্গ কেহ বা হৈমখচিত বসন, কেহ বা ইচ্ছামত নীল, লোহিত, শ্যামল, পাটলাদি বর্ণের চীনবাস পরিধান করিয়া অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার

প্রতি দীপের আলোকে উজ্জল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা যাঁহাদিগের দাসী, সে সুন্দরীরা কক্ষে কক্ষে বসিয়া মহাযত্নে বেশবিন্যাস করিতেছিলেন। আজ নবাব প্রমোদ মন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন.নৃত্যগীত হইবে।"

২য় খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—

উদ্ধৃত রচনাগুলি হইতে অনায়াসে অবধারিত হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসে ও তাঁহার অগ্রগামী লেখকদিগের লেখায় কতদূর পার্থক্য। এই পার্থক্যের মাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে ও রচনায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দুর্গেশনন্দিনী কল্পনাকুশল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম মানসকন্যা। ইহার বিরুদ্ধে একটি মত প্রচলিত আছে যে বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের বিখ্যাত উপন্যাস আইভ্যানহোর ছায়া লইয়া "দুর্গেশনন্দিনী" গঠন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিলোত্তমা রায়োনা, আয়েসা রেবেকা, জগৎসিংহ আইভানো রূপে যথাক্রমে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বিশেষতঃ আয়েসার সহিত রেবেকা চরিত্রের এতাদৃশ সৌসাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের অলঙ্কার দানের বিবরণ এরূপ সুসদৃশ, যে ঐরূপ মত পোষণ কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ঐ মত যে ভ্রমাত্মক বিচার করিয়া দেখিলে তাহা সহজেই নির্ণীত হয়। প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সুস্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন যে দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে তিনি স্কটের উক্ত উপন্যাস পড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশীয় দুইজন বড় লেখক বা কবির মনে ঠিক একটি ভাবের উদয় হইয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষায় তাঁহারা সেই একই ভাব নিজ নিজ গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কাহারও অনুকরণ করেন নাই। সুতরাং স্কট বা বঙ্কিমচন্দ্র কেহ কাহারও অনুকারী নহেন। তৃতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তি তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে এরূপ সমুজ্জলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা কেবল ভ্রমাত্মক নয়, যুক্তিসঙ্গতও নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

একটি মিথ্যার গতি

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিবার পথে মেঘনাদের অবস্থাটি হইল—যেন সাজসজ্জা করিয়া তিনি কাজে বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ ঝড়ে তাঁহার টুপিটি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন-দিকে তাহা এদিক-ওদিক চতুর্দ্দিকে তাকাইয়াও তিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। কি প্রকারে যে গাইনের জালিয়াতির এই উদ্ভট দোষারোপটা প্রথম প্রচার লাভ করিল তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবুও এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের দায়িত্বটা তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কাল সমস্ত শরীরটা তাঁহার শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছিল—তিনি ছিলেন তখন নিতান্ত বিশ্রাম-কাতর। সে সময়কার তাঁহার কথা শুনিয়া মেয়েরা একটা ভুল ধারণা করিয়া ফেলিয়াই এ বিপদটি ঘটাইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে ঝি চাকর ও ক্রমে বাড়ীর মজুর মহলে এ কথাটি প্রচারিত হইয়া পড়ে। বিকালের মধ্যে সমস্ত সহরেই এ খবরে রৈ রৈ করিবে। এমন একটা খবর! হাট, ঘাট, মাঠ, চা'য়ের দোকান—সব আড্ডাই আজ মুখরিত হইবে ইহার আলোচনায়। আর গাইন? সে নিশ্চয় এ সুন্দর সুযোগটি নিষ্ফল হইতে দিবে না। কিছুমাত্র কালাতিপাত না করিয়া সে ইহার জন্য মান-হানীর মোকর্দ্দমা আনিবে তাহারি বিরুদ্ধে!……বন্দুক দিয়া যদি তিনি ঐ সাইকেলওয়ালার মাথাটা উড়াইয়া দিতে পারিতেন। সেই ত এই সংবাদটার অগ্রদূত। ও না থাকিলে তিনি কোনো মতে ব্যাপারটা সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন, নিশ্চয়। নিজের লোকদের কাছে গিয়া বলিতেন—"এটা তোমরা নিতান্ত ভুল বুঝেছ, গাইনের ঐ দেনার জামিন আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সই সে জাল করেনি।"

প্রথম তিনি চলিলেন রান্না-ঘরের দিকে—ঝি-চাকরদের বেশ একটু শাসন করিবার জন্য। মাঝ পথে গিয়া তিনি থামিলেন। ভাবনা তাঁহাকে আবার পাইয়া বসিল—যাহা-কিছু বিপদের উৎপাত ইহা লইয়া হইবে, সব ত' আমাকেই সহ্য করিতে হইবে। উহাদের দোষ কেহই বুঝিবে না, সম্পূর্ণ দায়িত্বটা আমাকেই ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে কারণ আমিই গৃহকর্ত্তা।

জঙ্গলে যাওয়া তাঁহার আর হইল না আজ। তৎপরিবর্ত্তে তিনি গেলেন আস্তাবলে। ছোট ঘোড়াটিকেও এ হতভাগা সহিস মোটে দলাই মালাই করে নাই। তিনি তাহাকে অন্য কোথাও চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে বলিলেন। সেখান হইতে তিনি হঠাৎ গিয়া ঢুকিলেন গোলা ঘরে। চাকররা তখন সবেমাত্র কাজ সারিয়া চুরুট ধরাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে। তাহাদের খুব খানিকটা বকিয়া ঝকিয়া অফিস ঘরে গিয়া তিনি পাওনাদারদের বাকী টাকার দাবী করিয়া খুব কড়া রকমের চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলেন।

"গাইন মাম্‌লা করিলে জরিমানা আমার অনিবার্য্য। তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাকে খেসারৎ দিতে হবে। তার উপর হয় ত' খবরের কাগজে ইহার প্রত্যাহার করিয়া ঐ হতভাগার কাছে মার্জ্জনা চাইতে হবে"—এই চিন্তায় সমস্ত মনটা তাঁহার বিষিয়া উঠিল।

"ঐরূপ অপদার্থকে সাহায্য করার ফল হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে—স্ত্রীর সাথে বিবাদ, চাকর-বাকরদের লইয়া অনর্থক চেঁচা-মেচি, অর্থক্ষতি, তার উপর আবার সবার সুমুখে প্রকাশ্যভাবে নিজের মূর্খতা প্রতিপন্ন করা ও সঙ্গে সঙ্গে উহাতে অনিবার্য্য নিজের দুর্ণাম কেনা!"……

দরজা খুলিয়া গেল ও তিনি দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী ঘরে

ঢুকিতেছেন। বিশেষ অপূর্ব্ব একটা কিছু না ঘটিলে কালিকার ঐ ঝগড়ার পর এত শীঘ্র মেরী তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে আসিত না। না আসিলেই ভাল হইত তাঁহার এই শোচনীয় মানসিক অবস্থার ভিতর।

আসিয়াই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মেরী চাঁছা গলায় বলিলেন—"তুমি দেখছি এ বিষয়টা আমার কাছে গোপন করাই সাব্যস্ত করেছ। আমি শুধু তোমায় জিজ্ঞেস ক'রতে এসেছি তুমি নালিশ ক'রতে যাচ্ছ কি না আজ, এক্ষুণি।"

মেলনাদ তীরের মত সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া লিখিবার চশমার উপর দিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"নালিশ? না, না, কেন? আমি ত' পাগল হইনি।"

চার্জ্জের বিষয়টি লইয়া মেরী চটিয়াই ছিলেন; তাহার উপর স্বামীর এই বিষয়ে ব্যবহার জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি দিল। ক্রোধ কম্পিত, অথচ দৃঢ়-স্বরে তিনি বলিলেন—"যাবে না তুমি?"

মেলনাদের মেজাজও দারুণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নাক দিয়া তাঁহার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। স্ত্রীর এই সীমা-ছাড়ান কর্ত্তৃত্ব তাঁহার মনে দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিল। ইহার কাছে এ বিষয়ে নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সমস্ত আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিৎকার করিয়া তিনি বলিলেন—

—"আমাকে কি এখানেও একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? কি চাও তুমি এখানে।"

—"আমি চাই শুধু তুমি কোর্টে গিয়ে নালিশ রুজু ক'রে দিয়ে এস।"

"ব'লেছি ত' আমি পাগল নই। এখন স্পষ্ট বল্‌ছি এ নিয়ে কোর্টে নালিশ ক'রতে আমি ইচ্ছা করি না। শুন্‌লে ত'—এখন যাও এখান থেকে। আর জ্বালিয়ো না আমায় এ নিয়ে। আর কিছু আমি শুন্‌তে চাই না এবিষয়ে।"

একটু ক্রুর হাসি হাসিয়া মেরী বলিলেন—"তা' হ'লে টাকাটা তুমি দিয়ে দিতেই চাও দেখছি—তা' এতে তোমায় সর্ব্বস্বান্ত ক্রমশঃ হ'তে হবে হয়ত তা জেনেও। এ দেখে, যে কোনো জোচ্চোর এর পর ব'লে বস্‌বে তুমি তার জন্য জামিন দাঁড়িয়েছিলে। আর তুমিও অমি ছুটে যাবে টাকাটা দিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রতে।" আবার একটু কাঠ হাসি হাসিয়া স্বামীর দিকে বক্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন—

"হয় ত' বা তুমি বাস্তবিকই ওর জন্য জামিন দাঁড়িয়েছিলে। তুমি এ ব্যাপারে দোষী তাও অসম্ভব নয় মোটেই।"

'দোষী'! 'দোষী'! তিনি যেন চুরি, খুন, রাহাজানি বা ঐরূপ কোনো একটা কিছু করিয়াছেন! ক্রোধে সমস্ত মুখমণ্ডল তাঁহার রাঙিয়া উঠিল। তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সংযমের সব বন্ধন তাঁহার লোপ পাইল। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া তিনি হাত উঠাইলেন—যেন মারিবেন বলিয়া। তাহার পর স্ত্রীকে ঠেলিয়া সবলে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

বিহ্বলের মত কতক্ষণ তাঁহার কাটিল তাহা তিনি নিজেই ঠিক করিতে পারেন নাই। পরে শব্দ শুনিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন মেরী টম-টম লইয়া বাহির হইয়া গেল।

"বাঃ বেশ, আমাকে একটি বার না ব'লেই আস্তাবল থেকে গাড়ী বে'র ক'রে নিয়ে নিজেই হাঁকিয়ে চ'ল্‌লো। সুন্দর! এর পর দেখছি আমার ঘোড়া চড়ার ব্রিচেস্ নিয়ে বেরুবে" চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘরে টহল দিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল ঠিক নাই—হুঁস হইল তাঁহার আবার সেই টম-টমের আওয়াজে। তিনি ওদিকে তাকাইলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পরিচিত পদশব্দ সিঁড়িতে শ্রুত হইল। একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি টেবিলের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া পৌরুষ কণ্ঠে মেরী বলিলেন—"আবার আমায় সবলে ঘর থেকে বের ক'রে দেবার পুরুষত্বের অভাব হয় ত' তোমার হবে না, কিন্তু এটা ঠিক, নিশ্চিত কর্ত্তব্য পালনের মুরোদের অভাব তোমাতে ঘট্‌লে আমাকেই বাধ্য হ'য়ে সেটার সংশোধন করে নিতে হবে। আর এত বড় একটা শঠতার কোন প্রতিকারই হবে না, এ আমি

বেঁচে থাকতে বরদাস্ত করতে পারব না। তাই আমাকেই নালিশটা রুজু করে আসতে হল।”

মেঘনাদ ধীরে ধীরে উঠিলেন। বিহ্বলের মত স্ত্রীর দিকে একবার চাহিলেন। মুখ খুলিলেন কিন্তু কোন কথা তাঁহার যোগাইল না। তাহার পর দাড়ির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে সাধারণ স্বরে বলিলেন—“কি, তুমি সত্যিই নালিশ রুজু ক'রে এলে মেরী এ নিয়ে!”

“হাঁ, কারবারের বৈষয়িক কার্য্য দেখ্‌বার জন্য পুরুষের অভাব হ'লে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া খানিকটা অস্বাভাবিক হ'লেও অসঙ্গত নয় এটা নিশ্চিত। আর আমি যে সম্পূর্ণ তোমার মুখাপেক্ষী তাও ত' নয়। অংশ আমারও যে কারবারে আছে তা বোধ হয় তুমি অস্বীকার ক'রবে না; আর আমার অংশ জোচ্চোর বাটপাড়দের শুধু শুধু বিলিয়ে দিয়ে ফতুর হ'তে মোটেই রাজি আমি নই।”

মেঘনাদের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি টাক ও দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্ত্রীর কথাগুলি খোঁচার মত তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ বিদ্ধ করিল। তাঁহাকে বিঁধিবার এর চেয়ে তীক্ষ্ণতর অস্ত্র বোধ হয় আর কিছু ছিল না। কারবারের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থাটি কি তাঁহাদের জন্য হয় নাই! মেরীর পিতার আমলে যাহা ছিল এখন কারবারের মূলধন তাহার দ্বিগুণেরও উপর—এ কাহার জন্য······

আর ঐ স্থানে থাকা সমীচীন নয় ভাবিয়া মেরী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। মেঘনাদ হস্তে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সংসারের সব সুখ আজ তাঁহার অবসান হইল। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল এখনই ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিয়া এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেন।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ঘরে ইতস্তত পদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিলেন হয় ত' বা ইহা নিছক একটা স্বপ্ন—ও তাহার অবসানে সব আবার পূর্ব্বের মত ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু না, না, স্বপ্ন ত এটা নয়! ঐ ত' গোলাবাড়ীর লাল টিনের চাল। ঐ ত' একটা কাঠ-বিড়ালী ঝুঁটার উপর দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে। এই ত' তিনি এখানে দাঁড়াইয়া আছেন, এখন জঙ্গলে যাইবার পোষাক তাঁহার পরিধানে। না, না, সত্যই মেরী কোর্টে গিয়া নালিশ রুজু করিয়া আসিয়াছে, আর শেষ পর্য্যন্ত ইহা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে······আর এই নিয়া শেষে কি······

পায়ের তলা হইতে ঘরের মেঝেটি যেন তাঁহার সরিয়া যাইতে লাগিল। দু' দিক হইতে ছোট হইয়া ঘরটি যেন তাঁহাকে পিষিয়া মারিতে আসিল। আতঙ্কে পাশের ঘরে গিয়া তিনি পাইচারী করিতে লাগিলেন। সে ঘরের বড় বড় বাঁধানো আরসী, মেহগনী কাঠের সুচারু আসবাবগুলির যেন তিনি আর মালিক নন। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মনে তাঁহার দারুণ সন্দেহ জাগিল তিনিই মেঘনাদ দত্ত কি না।

জানালার নিকটে গিয়া তিনি বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বাহিরের গাছ বাগান, রাস্তা, পাহাড় সম্মুখে থাকিলেও সে সব তাহার দৃষ্টিপথবহির্ভূত। মন তাঁহার অন্তরে নিবদ্ধ। তিনি দেখিতেছিলেন তাঁহাকে যেন রাস্তা দিয়া নীচে লইয়া যাওয়া হইতেছে, কারাগারে—মিথ্যা অভিযোগ আনয়নের জন্য।

অবশেষে তিনি মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। ধীর পদবিক্ষেপে দরজার দিকে গিয়া হাতলটি ধরিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীর কাছে গিয়া সত্যপ্রকাশ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব মনে হইল; কারণ স্ত্রীর প্রতি তাঁহার বর্ত্তমান বৈরী ভাবের মধ্যে আরও কিছু ঘটিয়া বসিলে হয় তিনি আঘাতই করিয়া বসিবেন তাঁহাকে। দ্বিতীয়তঃ বলিলে মেরীর অবস্থাও যে কি হইবে তাহাও অনিশ্চিত। হয় ত' এইরূপ মূর্খের মত হঠকারিতার বশে কোর্টে গিয়া নালিশ দায়ের করা ও তাহার পরিণাম চিন্তায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে—উপরন্তু আরো সাংঘাতিক কিছু একটা করিয়া বসাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

পোষাক বদলাইবার জন্য তিনি সিঁড়ি দিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া গেলেন। এখনই যে তাঁহাকে কোর্টে যাইতে হইবে নালিশটি প্রত্যাহার করিবার চেষ্টায়। কিন্তু নানা চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। প্যাণ্টটা খুলিয়া অন্য একটি

পরিতে যাইবেন এমন সময় হঠাৎ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তিনি ভাবিলেন—

"কি দারুণ পাপ ও লজ্জার কথা! দয়া পরবশ হইয়া একটি লোকের সাহায্য করিলাম। আক্কেল সেলামী ত তাহার জন্য দিতে হইবেই। বাড়ীতে তাই এই অশান্তি। তার উপর এরই জন্য আজ এই বৃদ্ধ বয়সে পাগলের মত রাস্তায় দৌড়াইয়া নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করা হইল। এখন যাচ্ছি নিজের স্ত্রীকেও মূর্খ প্রতিপন্ন করিতে, প্রকাশ্য আদালতে সহরসুদ্ধ লোকের সম্মুখে। না; অতদূর করা চলে না।"

অন্য প্যাণ্টটা তাঁহার হাতেই রহিয়া গেল। মং গাইন সম্বন্ধে যে নীচ ধারণা কাল তিনি মনে মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, আজ তাহা আরো বীভৎসতর রূপ ধারণ করিল। আজিকার সব অপমান, গ্লানি ও অশান্তি ত তাহাকে ঐ গাইনের জন্যই ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। আর ঐ নীচ লোকটার জন্য কিনা আজ তিনি নিজের স্ত্রীর উপর এই প্রথম বল প্রয়োগ করিয়াছেন, এমন কি, যাইতে ছিলেন তাহাকে......না না এ অসম্ভব। অভিযোগটা তুলিয়া লইলেও ত এই গুজোব রটনার দায়িত্বটা তাঁহার রহিয়াই যাইবে। তাহার প্রতিকার গাইনের নিকট গিয়া মাথা নত করা, হয় ত বা নত-জানু হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করা। না, না, উহা অসম্ভব, হইতেই পারে না।

অন্য কোনো একটা উপায় তাঁহাকে উদ্ভাবন করিতে হইবে এই বিষয়ে। পরে চিন্তা করিয়া ইহার অন্য একটা কিছু বিহিত স্থির করিয়া লইলেই চলিবে।

এমন একটা অবস্থার আবর্ত্তে মেঘনাদ পড়িয়াছেন যাহার উদ্ভবে, স্বেচ্ছা-কর্তৃত্ব তাঁহার না থাকিলেও এটা ঠিক যে সবটুকু দায়িত্ব তাঁহার নিজেকেই বহন করিতে হইবে! শুধু নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা যে ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্বটা অনেক সময় এক হিসাবে কমই বিবেচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সমস্যাটিকেও মেঘনাদ সে ভাবেই গ্রহণ করিয়া লইলেন।

"যে একটা ওলোট-পালট আজ এ সংসারে হইয়া গেল তার মূলে ঐ কৃতঘ্ন গাইনকে সাহায্য করা। এ-সবের মূল কারণই ঐ হতভাগা মং গাইন, এই ধারণাটা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল।

ও-ঘর হইতে খোকার সোল্লাস চিৎকার ও আনন্দের প্রাণখোলা হাসির শব্দ শোনা যাইতেছিল। সেই হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া বৃদ্ধ ও ঘরের দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গেলেন—"নাঃ ও দেব-দূতের সাথে মন-খুলিয়া মিশিবার শুচিতা বোধ হয় আর আমার নাই···আর তার কারণ ত ঐ গাইন···শুধু তাই? ঐ ক্ষুদ্র বালকটি যে তাহার পিতাকে দেখিতে পাইল না আর পাইবে না ও এ জন্মে, তার মূলেও হয় ত' ঐ শয়তান গাইন। তখন ঐ গাইনই ত' ছিল তার সঙ্গে, মেলায়।···

একদিন গেল, তারপর আর এক। বৃদ্ধের মনের অশান্তি কাঁটারই মত তাঁহার মনের মর্ম্মস্থলে বিধিয়া আছে। ইহার মধ্যে কতবার তিনি কোর্টে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন অভিযোগটা প্রত্যাহার করিতে। কিন্তু প্রতিবারই তিনি বিরত হইয়াছেন গাইনের চরিত্রে একের পর এক নূতন দোষের অনুধাবন ও তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ মূর্ত্তিমান এক শয়তানের কাছে অবনত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব এই ভাবিয়া।

···ইহার উপর সত্যিই এই গাইনই যদি তাঁহার পুত্রের ঐ শোচনীয় অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী হইয়া থাকে? এই সম্ভাবনার কল্পনাটাই তাঁহাকে ক্রোধে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া তুলিল...আবার অন্য ধারায় তাঁহার চিন্তা ধাবিত হইল। দলিলের সাক্ষী মং কিন্ ত মৃত!···না, না তাহাতে কি? মেঘনাদ যে তাহার নিজ সহি অস্বীকার করিবে না তাহা নিশ্চিত। কোনো কিছু একটা করণীয় উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে, এ বিশ্রি অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রেঙ্গুনের ট্রেণ হইতে নামিয়া মং গাইন সুটকেস হাতে, মাথা নীচু করিয়া সোজা বাড়ীর দিকে ক্ষিপ্র-গতিতে অগ্রসর হইল। পথে কাহারো সাথে বাক্যালাপ বা কাহাকেও অভিবাদন অবধি করিবার জন্য সে মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইল না। তাহার ঐ কারবার ফেল পড়াতে ও দেউলিয়া হওয়ায় সহরের

বহু লোক যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা সে স্পষ্টই জানিত। পথে লোকেরা যে তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল ও চোরের মত তাহাকে প্রহার করিবে কিনা এই ইতস্তত ভাবে তাকাইতেছিল তাহার যৌক্তিকতা সে মনে মনে বেশ উপলব্ধি করিতেছিল।

বয়স তাহার পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, লম্বা এক-হারা গঠন, মুখে চাপদাড়ী। সুশ্রী সুঠাম চেহারা কিন্তু হাঁটুনি দেখিয়া পিছন হইতে ভ্রম হয় সে বৃদ্ধ। রেঙ্গুনে মহাজনের পর মহাজনের নিকট বহু কাতর প্রার্থনা করিয়াও কোনো সুবিধাই সে করিতে পারে নাই। আজ সে কোন মুখ লইয়া বাড়ীতে গিয়া দাড়াইবে সে চিন্তাতেই তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। গিয়াই ত তাহার স্ত্রীর নিকট এই নির্ম্মম সত্যটি তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে।

মং গাইনের পিতা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সরকারী টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে চাকুরীটি দিয়া কোনো মতে তিনি রাজ-দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। যুবা বয়স হইতেই গাইন একটার পর একটা বহু কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াও কোনটাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে কৃষি-উপজীবিক অবস্থায় তাহার বিবাহ হয় মা কেটের সাথে। মা কেটের পিতার এ বিবাহে মোটেই মত ছিল না। অবশেষে কন্যার ইচ্ছার দিকে চাহিয়া তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন এই সর্ত্তে যে তাহার কন্যার বিষয়-সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব তাহার কন্যারই থাকিবে—গাইন তাহাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কিন্তু মং গাইন কিছুকাল পরে যখন একটা বড় রকমের ইটখোলা ফাঁদিয়া বসিল তখন সে অদূর ভবিষ্যতে প্রচুর লাভের এক উজ্জ্বল রঙ্গিন চিত্র তাঁহার স্ত্রীর সম্মুখে ধরিয়া, ও নানা প্রলোভনে তাহাকে ভুলাইয়া তাহার সব অর্থ তাহারি অনুমতিক্রমে সেই কারবারে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়—তাহার বাক্‌চাতুর্য্যে ও হাব-ভাবে বিমোহিত হইয়া মা কেটের পিতা, ভ্রাতা ও ঐরূপ সহরের বহু লোক আশু অতি লাভের আশায় তাহার ঐ কারবারে তাহাদের কষ্টার্জ্জিত বহু ধন অর্পণ করিয়াছিল। আর এখন?

পথে অপ্রশস্ত সেতুটির অপর পারে আসিয়া পৌছিলে তাহার সহিত দেখা হইল অবনতাকৃতি, দন্তহীন, চ্যাপটা-নাকে চশমা-আটা জীর্ণ ওভারকোটে আবৃত এক বৃদ্ধের সহিত। তাহাকে দেখিয়াই গাইন স্যুটকেশ হইতে কাগজে মোড়া একটি বোতল বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। বেশ বোঝা গেল লোকটি তাহাকে ঐ জিনিষটি আনিতে দিয়াছিলেন ও তাহারই অপেক্ষায় তিনি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। বহুমূল্য সামগ্রীর মত বোতলটি ঊর্দ্ধে ধরিয়া একটিবার সহাস্য বদনে দেখিয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে বৃদ্ধ উহা বগলদাবা করিলেন। তাহার পর গাইনকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—"শুনে যাও, থেমে যাও একটু বন্ধু, খুব একটা টাটকা খবর আছে যে!"

কিন্তু গাইনের মন তখন নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন। সে ভাবিতেছিল তাহার স্ত্রীর কথা। এই চতুর্থবার অন্তঃস্বত্ত্বা সে—শরীরটাও তার মোটেই ভাল নয়। এই নিদারুণ সংবাদটা সে সহ্য করিতে পারিবে কি, এ অবস্থায়?

বৃদ্ধটি দৌড়িয়া গিয়া একেবারে তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"বাঃ শুনলে না তুমি। খবরটা যে তোমারি সম্বন্ধে—বিশেষ রকমের।" তারপর বোতলটি দেখাইয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"এত কষ্ট ক'রে নিয়ে এলে, একটু স্বাদ নিয়ে যাও, বন্ধু!"

"এখন দেরী করা অসম্ভব আমার পক্ষে" বলিয়া গাইন আবার রওনা হইল। বহুবার সে এই অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টরটির পাল্লায় পড়িয়া তাহার আড্ডায় মাতলামির চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছে। তাহা ভাবিতেও এখন তাহার ঘৃণাবোধ হইতেছিল। ও সব চিন্তা এখন তাহার কাছে গুরুতর পাপ। কিন্তু বৃদ্ধটি নাছোড়-বন্দা। তাহার ক্রমাগত টানাটানিতে তাহাকে যাইতেই হইল।

খুব নীচু একটা ঘরে তাহারা প্রবেশ করিল। সমুদয় ঘরটি ব্রাণ্ডি ও তামাকের গন্ধে ভরপুর। সেথায় মদ্যপায়ী ত্রয়ীর দুইটি অপেক্ষা করিতেছিলেন। একজন ভাঙ্গা একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া সম্মুখের টেবিলে পেসেন্স্-খেলায় মগ্ন। অপরটি একখানি ইজিচেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া পা' দুলাইতেছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার কড়িকাঠে নিবদ্ধ,

ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখে একটা প্রকাণ্ড চুরুট—ভাবটা 'রাজ্যের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসার ভার যেন একমাত্র তাঁহার উপর ন্যস্ত, আর তিনি সে সব লইয়া গভীর ভাবে ব্যস্ত। ইনি ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী, এক্ষণে বাতে পঙ্গু প্রায়। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও হাবভাববহুল তর্ক-বিতর্কের প্রাচুর্য্যের জন্য তিনি রসিক সমালোচক সমাজে "রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী" এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ ইন্‌স্‌পেক্টর গাইনকে বসিতে বলিলেন। কিন্তু সে বসিল না। সুটকেস্ হাতেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পেসেন্স খেলোয়াড়টি শ্রেণীবদ্ধ তাস হইতে ক্ষণেকের তরে মুখ তুলিয়া একটু আপ্যায়িতের হাসিবিকশিত মুখে বলিল,—"চারজন ত' জুটল, হবে নাকি এক হাত ?"

গেলাস পরিষ্কার করিতে করিতে ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—"চোপ-রও, এক গ্লাস না টেনে যক্ষ কিছু হবে না এখন, হ'তেও পারে না।"

আহ্লাদে আটখানা হইয়া বোতল ও গ্লাসটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—

"ছোক্‌রা বোসো, কিন্তু দুনিয়ার কি দুর্দ্দশাই না হ'চ্ছে এ যুগে !"

পরনিন্দাপটু এই বৃদ্ধের এ সাধারণ সমালোচনায় সহিষ্ণুতা হারাইয়া গাইন বলিল—

—"হেঁয়ালি শুনবার সময় আমার নেই, কি হ'য়েছে বলুন। কিছু হ'য়েছে নাকি আমার স্ত্রীর ?"

গ্লাস ও বোতলটি সন্তর্পণে টেবিলের উপর নামাইয়া বৃদ্ধটি গম্ভীর ভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কত কিই ত' ঘ'টে গেল। এখন বলত' সেই মহাপুরুষ মেঘনাদ সাহেবের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?"

পা বাড়াইয়া বিরক্তস্বরে গাইন বলিল—"মিঃ ডাটার সম্বন্ধে ? আমি জানিনা, চিন্তা ক'রে দেখিনি কখনো', দেখবার অবসরও নাই এখন আমার। যাই আমি।"

"দাঁড়াও, মেঘনাদ নিশ্চয় তোমার উপর একটা বিষম আক্রোশ পোষণ করে। সে যে চায় তোমাকে জেলে পুরতে তুমি দলিলে তার নাম জাল করেছ বলে।"

ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী কড়িকাঠ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে গাইনের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কেহই কিছু বলিল না। বৃদ্ধ ইন্‌স্‌পেক্টর চশমার ফাঁক দিয়া স্থির দৃষ্টি গাইনের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারি রচিত এই অবস্থাটি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে পূর্ণ উপভোগ করিতেছিলেন।

গাইন হো হো করিয়া অবজ্ঞাহের হাসি হাসিয়া টেবিল হইতে মদ্যপূর্ণ গ্লাসটি উঠাইয়া লইয়া বলিল—"হিপ্ হিপ্ হুররে, এত' কম মজার কথা নয়!...কিন্তু না, ঠাট্টা ক'চ্ছ তুমি।"

'বিশ্বাস কচ্ছ না ? খুব সত্যি, দিব্যি ক'রে বলতে পারি। বিশ্বাস না হয় 'প্রধান মন্ত্রীকে' জিজ্ঞেস কর।"

ভূত-পূর্ব্ব ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী গম্ভীরভাবে সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িলেন।

তবুও সংবাদটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া গাইন পর পর দু'জনারি দিকে একটিবার তাকাইয়া লইয়া বলিল—"কি যে আজগুবি কথা ব'লছ তোমরা!"

ক্রূর হাসি হাসিয়া ইন্‌সপেক্টার বলিলেন—"তুমি আজগুবি ব'লতে পার; কিন্তু কি যে দিন-কাল প'ড়েছে!"

কম্পিতস্বরে, ভয়ে ভয়ে, প্রায় বিবর্ণ-মুখে গাইন বলিল—"কেউ কি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল এ বিষয় নিয়ে বলতে পার ?"

"হাঁ পারি।"

"কে ?"

"কোর্টের পেয়াদা।"

"কেন ? আমি জাল ক'রেছি সেই অভিযোগের সমন জারি করতে ?

"ঠিক তাই।"

ভূতপূর্ব্ব ইন্‌সপেক্টর এত আগ্রহ ও পরম সুখের সহিত এই অবস্থাটি উপভোগ করিতেছিলেন যে মদের গ্লাসটি পূর্ণই রহিয়া গেল। আস্বাদ করিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন!

গাইন তাহার গ্লাসটি খালি করিয়া, তাহা আগাইয়া দিয়া আরও চাহিয়া লইয়া তাহা ঊর্দ্ধে ধরিয়া কহিল—"বেশ, তোমার হেলথ, ইনস্‌পেক্টর। এ যদি সত্যি হয় তা হ'লে আমি নয়—মিঃ ডাটাকেই জেলে যেতে হবে।" তারপর চোঁ চোঁ করিয়া গ্লাসটি শূন্য করিয়া ওভারকোটের বোতামগুলি আটকাইয়া দিতে দিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

মেঘনাদবধ কাব্যে শিল্পকৌশল

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার এম্‌-এ

ট্রাজিডি-পরিকল্পনা

৩

ট্রাজিডি-পরিকল্পনার মৌলিকতা, ট্রাজিডি রচনার সৃষ্টিকৌশল আখ্যায়িকা নির্মাণ ও ঘটনাবিন্যাসের কৃতিত্বকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই কাব্যে মেঘনাদবধ রাবণের পরাজয় ও সীতার উদ্ধারের নামান্তর মাত্র। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়—এই বিষয় অবলম্বনে ট্রাজিডি রচনা সম্ভব হইল কিরূপে? রাবণের পাপ কবি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। 'পরম-অধর্ম্মাচারী' ও 'দেবদ্রোহী' এই দুইটি বিশেষণ এ কাব্যে তাঁহার নিত্যসহচর। কেহ কেহ বলেন সীতা-হরণের মধ্যে রাবণের কোন অসাধু উদ্দেশ্য ছিল না, শূর্পনখার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তিনি এই কাজ করেন। ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসকুলের বিপুল কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে লাঞ্ছিতা ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের কাব্যে এ কথা সত্য কিন্তু সীতাহরণই ত রাবণের একমাত্র পাপাচরণ নহে। সীতাহরণের পূর্ব্বে রাবণের পাপরাশির ভারে 'সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী', 'অনন্ত ক্লান্ত,' রাবণের বিনাশ না হইলে 'ভবতল রসাতলে যাবে'; যে ধর্ম্ম শাশ্বত, যাহা আপনার দীপ্তিতে চির উজ্জ্বল সেই ধর্ম্ম রাবণের পাপাচরণে রাহুগ্রস্ত। এই রাবণের বিনাশে আমাদের মনে আশ্বাসের সঞ্চার হইবার কথা কিন্তু ট্রাজিডির উদ্দেশ্য আমাদের মনে ভয়, বিস্ময়, করুণা এই সকল ভাবের উদ্রেক করা। যাহার অধর্ম্মাচরণের ভয়ে অসংখ্য নরনারীর গায়ের রক্ত জল হইয়া যাইত তাহার বিনাশে করুণার পরিবর্ত্তে একটি হিংস্র উল্লাসের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। ট্রাজিডির প্রধান সুর হইতেছে ব্যর্থতার সুর। যে মহার্ঘ গুণাবলী মানুষের যুগ, যুগান্তরের কামনার ধন, বরেণ্যতম পুরুষ জন্ম জন্ম ধরিয়া সাধনা করিয়া যাহা লাভ করেন তাহার বিনাশেই যথার্থ ট্রাজিডি যে কল্যাণকর শক্তি মানুষের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম তাহা ফলপ্রসূ হইবার পূর্ব্বে বিনষ্ট হইলে সত্য সত্য দুঃখের কারণ কিন্তু পাপের বিনাশে ত অনেক দুর্লভ শক্তি ব্যর্থতার হাত হইতে রক্ষা পায় সুতরাং তাহা দুঃখের কারণ হইতে পারে না। রহস্যময়তা, সমস্যাময়তা ট্রাজিডির প্রাণ। এই শিল্পরূপের মাধ্যমে জীবনের যে সমস্যাময় রূপ চিত্রিত হয় তাহার সমাধান নাই, এই প্রহেলিকার রহস্যভেদ করা মানুষের বুদ্ধির অতীত। কিন্তু পুণ্যের দ্বারা পাপের পরাজয় এই বিষয়ের মধ্যে ত কোন রহস্যময়তা নাই।

বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতার দৃঢ় মত এই যে মেঘনাদবধ কাব্যের পৌরুষহীন, নির্বীর্য, কাঁদুনে রাম আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না; কবি স্বয়ং তাহাকে অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং অনেকে বলিতে পারেন যে এই রামের হাতে যে-রাবণ আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, যাঁহার মহিমোজ্জ্বল রূপ আমাদিগকে উন্নততর ভাবলোকে লইয়া যায়, তাঁহার পরাভব সত্য সত্যই দুঃখের বিষয়। রামচরিত্র সম্বন্ধে এই প্রচলিত ধারণা যে সর্ব্বৈব ভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিবার মত প্রচুর উপাদান কাব্যের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে। কবির পত্রালাপের সাহায্যে অথবা দ্বিতীয় সর্গের দু চারিটি ছত্রে রামচরিত্রের যে একটি রূপ দিবার তিনি ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন তাহাদের সাহায্যে, রামচরিত্রের সত্যস্বরূপের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা কবি আপনার অতিচেতন মনের অগোচরে যে-রামচন্দ্রের চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া আমাদের মনে স্থায়ী করিয়াছেন

সেই রূপটি রামচন্দ্রের সত্যরূপ। রামায়ণের রাবণ ও মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও তাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ সন্দেহ নাই। কিন্তু রামায়ণের রামচন্দ্রই মধুসূদনের কবি কল্পনার অমৃত প্রস্রবণ হইতে নব-জন্ম লাভ করিয়া আমাদের সম্মুখে মনোহর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কাব্যের রাবণ কেবল রাজসিক ও ক্ষাত্র গুণের আধার কিন্তু রামচন্দ্রের মধ্যে রাজসিকতার সহিত সাত্ত্বিকতার, ক্ষাত্র গুণের সহিত ব্রাহ্মণ্য গুণের একটি প্রাণবন্ত সম্মিলন দেখিতে পাই। প্রথম উল্লেখের সময়ই কবির তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাবনত ভাবের পরিচয় পাই—'নরেন্দ্র রাঘব কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনু, বাসবের চাপ যথা বিবিধ বর্ণে খচিত।' অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর সেই বীরবাহুকে তিনি সম্মুখ সমরে নিহত করেন। 'অগ্নিময় চক্ষু যথা সরোষে হর্য্যক্ষ, কড়মড়ি ভীমদন্ত পড়ে লম্ফ দিয়া বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা কুমারে।' শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণকে তিনি তীক্ষ্ণতর শরে ভূপতিত করেন, 'হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে।' রবিকুলরবি শূর রাঘবের বাহুবলে বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা বীরশূন্য। অনেকে প্রগলভতার সহিত বলেন যে অনুকূল দেবকুলের প্রসাদে রামচন্দ্রের জয় হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার কোন কৃতিত্ব নাই। এই উক্তি আমাদের মত চাকুরিজীবীর মুখে অত্যন্ত শোভনীয় সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি চাকুরির ক্ষেত্রে যেমন অযোগ্যতম ব্যক্তি ছলনা বঞ্চনা, মিথ্যুকতা নিন্দুকতা, হীনতা নীচতার সহজগম্য পথ আশ্রয় করিয়া আফিসের বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়া দুই হাত দিয়া তাঁহার প্রসাদ লুটিয়া নেয়, দেব প্রসাদলাভও এই জাতীয় ব্যাপার। আমরা ভুলিয়া যাই যে দেবপ্রসাদ লাভের যে পথ তাহা ক্ষুরস্য ধারা ইব নিশিতা, তাহার জন্য প্রয়োজন অখণ্ড নুরুষকার, ধর্ম্মের নিকট অকুণ্ঠিত আত্মনিবেদন, আবশ্যক হইলে যে কোন মুহূর্ত্তে সুপ্রসন্নমুখে আত্মবিসর্জ্জন। রামচন্দ্র কেবল যে বীরত্বে অতুলনীয় তাহাই নহে তিনি দয়াসিন্ধু মায়া মমতা ও স্নেহ ভালবাসায় তাঁহার হৃদয়-কানায় কানায় পূর্ণ। তিনি ধর্ম্মের দুর্গম পথ হইতে একচুলও কখনও ভ্রষ্ট হন নাই, কিন্তু এই দুঃখব্রতী মহাপুরুষের চরিত্রে কমনীয়তার অভাব নাই ঃ পাপের ছলনায় যাহারা ধর্ম্মপথচ্যুত তাহাদের জন্য তাঁহার দয়ার সীমা নাই। তিনি শত্রুর গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সত্ত্বেও তিনি আজন্ম বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অন্তরে নৃশংসতম শত্রুর প্রতিও বিদ্বেষের ভাব স্থান পায় নাই এবং শত্রুর সামান্য দুঃখেও তিনি কাতর ও অবসন্ন। এই আত্মভোলা মহামানব তাঁহার অমিত বিক্রম সম্বন্ধে শিশুর ন্যায় অচেতন; অসংখ্য অমূল্য গুণাবলী সত্ত্বেও তাঁহার বিনয় অকৃত্রিম। এই পুরুষরত্নের কথা ভাবিলে আমরা শ্রদ্ধাভক্তি বিস্ময়ে বিহ্বল হই, আমাদের মনে হয় এই পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা তাঁহার পদস্পর্শে পবিত্র, এই পুণ্যাত্মার চরিত্র স্মরণ করিলেও মানব জীবন সার্থক। 'নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তাঁর ঘোষিবে জগতে, যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উদিবে আকাশে।' এই মহান্ পুরুষের জয়কে অবলম্বন করিয়া কিরূপে ট্রাজিডি রচনা সম্ভবপর তাহা ভাবিয়া আমরা দিশাহারা হইয়া পড়ি।

কেহ কেহ বলেন নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে অসহায় মানুষের নির্ম্মম নিষ্পেষণ এই কাব্যের বিষয়বস্তু; সর্ব্বশক্তিমান অদৃষ্টের কাছে মানুষের পুরুষকার একান্তই অকিঞ্চিতকর এই মহাভাব কবিকে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই জাতীয় উক্তির সমর্থন এই কাব্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রমীলা, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ ইহারা ভয়ঙ্কর হইতে পারে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা নগণ্য শক্তিহীন কীট জাতীয় জীব এ ধারণা করিতে কাহারও হয় না। তাহাদের শক্তি, সাহস ও সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। নিষ্করুণ নিয়তি অকারণ জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার হিংস্র আনন্দে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের প্রতি সমান ঔদাসীন্য দেখাইয়া দুর্ব্বল নরনারীর বক্ষপঞ্জরের উপর দিয়া তাহার ভীষণরথচক্র চালাইতেছে—এ চিত্র কোথাও নাই। মেঘনাদবধের রামচন্দ্র ত নিতান্তই মানব কিন্তু তাঁহার জয় ত এই নিয়তির বিধানেই ঘটিয়াছে। ডিক্টেটার শাসিত রাষ্ট্রে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে যেমন পূর্ব্ব হইতেই দণ্ডাজ্ঞা নির্দ্ধারিত থাকে এবং অপরাধি নির্দ্দয়ভাবে তাহার বিন্দুমাত্র

ঘাতায় হয় না, তেমনি মানুষের জন্মের পূর্ব্বেই তাহার ভাগ্যলিপি তৈরি হইয়াছে এবং তাহার চরিত্র ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা যেমনই হউক এই লিপি অব্যাহত থাকিবে, মেঘনাদকাব্য পাঠকালে আমাদের এ অনুভূতি হয় না। দেবলোকে দেবদেবীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হিংসা-ঈর্ষা-দ্বেষ-অনুরাগ-আসক্তি-প্রসূত লীলাখেলার নিত্যচক্র অনবরত পাক খাইতেছে আর সেই চক্রের ঘূর্ণনের সহিত মানুষের ভাগ্য সংযুক্ত, তাহার গতিবিধির ফলে মানুষের ভাগ্যের উত্থানপতন ঘটিতেছে এই দেবযন্ত্রবাদ কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যের মূলভাব হইতে পারে না। কাঁচপোকায় যেমন করিয়া তেলেপোকাকে ধরে তেমনি নিয়তি অক্ষম মানুষকে অসহায়-ভাবে টানিয়া লইয়া চলিতেছে এ দৃশ্য এ কাব্যে দেখিতে পাই না। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাহার ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না, বাহিরের আরও অনেক শক্তির সম্মেলনে ভাগ্য-নির্দ্ধারণ হয় এ কথা সত্য এবং এই জন্যই কবি অতি প্রাকৃত শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন: দেব-শক্তি মানুষকে প্ররোচনা দিয়াছে, সমর্থন দিয়াছে, ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু মানুষের কর্ম্মের আদি প্রেরণা আসিয়াছে তাহার অন্তর হইতে। দেব-শক্তি কোথাও ঘটনা প্রবাহকে স্ফীত করিয়াছে, কোথাও তাহার গতিবেগ বর্দ্ধিত করিয়াছে, কোথাও স্রোতকে মন্দীভূত করিয়াছে কিন্তু তাহার গতি পথ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে কতকগুলি আত্মকর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতি নর-নারীর বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। রাবণের প্রতি দেবকুল প্রতিকূলতা করিয়াছিল সত্য কিন্তু 'নিজ কর্ম্মদোষে মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি' এ কথা বিস্মৃত হইবার অবসর কবি আমাদের দেন নাই। আত্মকৃত পাপ কর্ম্মের ফলে যে শাস্তি ভোগ তাহা ট্রাজিডির বিষয় বস্তু হইল কিরূপে?

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকের নির্দ্দেশানুসারে ট্রাজিডি রচনা নিষিদ্ধ। তাঁহারা বোধ হয় অনুভব করিয়াছিলেন যে ট্রাজিডির প্রধান সুর-পরাজয় ও পতনের সুর, বিনাশ ও ব্যর্থতার সুর; ধর্ম্মের বিনাশ নাই, বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত প্রাণ মহাত্মার পরাজয় কেবল বাহিরের কর্ম্মসিদ্ধির দিক দিয়া, আত্মার দিক দিয়া এই পরাজয়ের মধ্যেও তাঁহার আত্মপ্রকাশ সুসম্পূর্ণ, তাঁহার জীবন সার্থক; 'বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে' এই মহাত্মার মহানন্দময় ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের দৃশ্য আমাদের মনে ট্রাজিডির উপযোগী ভয় ও করুণার উদ্রেক না করিয়া অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে; অধর্ম্মের মধ্যে কোন মহান্ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই সুতরাং তাহার বিনাশেও ব্যর্থতা নাই। পাশ্চাত্যদেশীয় রসতাত্ত্বিকেরা ট্রাজিডির বিষয় নির্ব্বাচন ব্যাপারে সাহিত্যিকগণকে অত্যন্ত হুঁসিয়ার হইতে বলিয়াছেন। মহামতি এরিষ্টটল বলেন ট্র্যাজিডির প্রধান রস ভয় ও করুণা। ধর্ম্মের পরাজয় আমাদের মনে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, এই জন্য ধর্ম্মের পরাজয়ে ট্র্যাজিডি নাই। ট্রাজিডি একটি সংঘর্ষের চিত্র; বিশ্বের ধর্ম্ম ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাব সাম্যটি অধর্ম্মের আঘাতে ক্ষুণ্ণ হইলে ক্ষুব্ধ বিধি আঘাত-কারীর বিনাশের দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু অধর্ম্মের বিনাশ ন্যায়বিচার মাত্র। যদি কোন ধার্ম্মিকব্যক্তি মানবীয় চরিত্রের অপূর্ণতা বশতঃ, মানবীয় দৃষ্টিশক্তির সঙ্কীর্ণতা বশতঃ নিজের অগোচরে এ ধর্ম্ম ব্যবস্থাকে আঘাত করে, তাহার বিনাশ ট্র্যাজিডির উপযুক্ত বিষয়বস্তু। হেগেল অধর্ম্মকে মোটেই স্থান দেন নাই। তিনি বলেন যখন দুইটি ধর্ম্মসঙ্গত দাবী নিজ নিজ ন্যায়সঙ্গত সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য সকল দাবীর অধিকার গ্রাস করিতে আসে তখন তাহাদের যে সংঘর্ষ ও যে পতন তাহাই ট্র্যাজিডির যথার্থ উপাদান। অধর্ম্মের পরাজয়ে ও ট্র্যাজিডি সম্ভব এই উক্তির সমর্থনে কেহ ম্যাকবেথের নজীর হাজির করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেয়কে বিসর্জ্জন দিবার পূর্ব্বে ও পরে ম্যাকবেথের অন্তরে যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও যে মর্ম্মভেদী যন্ত্রনা-তাহার সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি মানবীয় দুর্ব্বলতার বশে, অপরূপ সুযোগ সন্নিবেশে, পাপেচ্ছাও পাপাচরণের মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের অভাবে যদিও ম্যাকবেথ অন্যায় হত্যা করিয়াছিল তথাপি তাহার প্রকৃতিতে শ্রেয়োবুদ্ধিরই প্রাধান্য ছিল। রাবণের মধ্যে আমরা কোন দ্বন্দ্ব দেখিতে পাইনা, নিজের কর্ম্মকে পাপ বলিয়া কোন স্বীকৃতি নাই। অথচ শক্তিমত্ত লইয়া ধর্ম্মের সহিত বিরোধ করিয়া দারিদ্র্যকে দারুণ বিধির

ঘাড়ে চাপাইয়াছে। ম্যাকবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু বৃহৎ, বিরাট ও গরিমামণ্ডিত তাহার অবসান হইয়াছে; যাহারা ধর্ম্মের প্রতীক ও জয়ী তাহারা ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন। রাবণের বিনাশের পরও রহিয়াছেন নরকুলরত্ন মহামানব রামচন্দ্র, নারীকুলরত্ন ধর্ম্মস্বরূপিনী সীতা। আমরা হতাশ হইয়া ভাবি, রাবণের পরাজয় অবলম্বনে কি কৌশলে ট্রাজিডি রচনা হইতে পারে?

সুদক্ষ বাজিকর যেমন নিজেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে অসংখ্য বন্ধনে অসহায়ভাবে জড়াইয়া আপনার ঐন্দ্রজালিক কৌশলের বলে অবলীলাক্রমে নিজেকে মুক্ত করে, আমাদের কবিও প্রতিপদে তাঁহার কাব্যকে দুরূহতর করিয়া শিল্পী-জনোচিত সুকৌশলে ঘটনা ও চরিত্রের উপর নূতন আলোক পাত করিয়া ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইয়াছেন। যে পাপিষ্ঠ আদিম হিংস্রতার সহিত কেবল মাত্র পীড়াদানের আনন্দে সুতীক্ষ বুদ্ধি-উদ্ভাবিত নব নব কৌশলে অসহায় নিরীহ নর-নারীর উপর তুষার শীতল হৃদয়ে নৃশংসাচার করে, মধুসূদনের রাবণ সেই দলভুক্ত নহে। যাহাদের দেহাবয়বে সৌষ্ঠব নাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লাবণ্য নাই, মনের গঠনে সৌকুমার্য্য নাই, যাহারা সীতাকে প্রাতরাশ রূপে ভোজন করিতে চাহিয়াছিল সেই বীভৎস, বিকট, দৈত্যদানবের জ্ঞাতিভাই, অথবা পশুশক্তির প্রতীক রাক্ষসদের সহিত মেঘনাদবধ কাব্যের রাক্ষসদের কোন সাদৃশ্য নাই। ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ যেমন এক একটি জাতি, এই রাক্ষস বা পিশাচেরাও সেইরূপ একটি জাতি। ত্রিলোচন, পঞ্চানন যেমন আমাদের অনেকের নাম মাত্র, দশাননও রাজা রাবণেরই সেইরূপ নাম মাত্র। নূতন যুগের নব-ভাবধারার অমৃতরস পান করাইয়া কবি তাঁহার নায়ক পক্ষকে আমাদের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের অধর্ম্মাচরণ কবি অস্বীকার করেন নাই কিন্তু তাহার স্বরূপ ও প্রেরণাকে সম্পূর্ণ অভিনব মনোজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে পাপে আসক্তির জন্য নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য নয়, এমন কি নিজেদের শক্তি প্রকাশের আনন্দের জন্যও নয়। তাহাদের অন্যান্য সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ন্যায় এই অধর্ম্মাচরণেরও মূল উৎস ও প্রধান প্রেরণা হইতেছে দেশাত্মবোধ ও স্বজাতিবাৎসল্য। তাহারা যে বিশ্বের কল্যাণকে আঘাত করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অগোচরে। আমাদের চেতনাতে ইঁট, কাঠ, পাথরের সুখ-দুঃখের যেমন কোন অস্তিত্ব নাই, তেমনি তাহাদের চেতনাতে জাতীয় কল্যাণের অতিরিক্ত কোন কল্যাণের অস্তিত্ব ছিল না। তাহাদের চরিত্রে কোন ম্যাকিয়াভেলীয়তা নাই। জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই নিজেদের অগোচরে শাশ্বত ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়াছিল। মানবের চেতনার অভিব্যক্তির ইতিহাসে যে-মুহূর্ত্তে মানুষ ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হইয়া, পারিবারিক জীবনের লাভ ক্ষতির সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র জাতির কল্যাণ অকল্যাণকে নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ অকল্যাণ বলিয়া তাহার শক্তি একাত্মবোধ অনুভব করে অথচ নিজের জাতির ছাড়া অন্য কল্যাণকে একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুমান করিতেও অক্ষম—সেই ঐতিহাসিকক্ষণের রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রতীক এই রাক্ষস জাতি। জন্মভূমিকে যে-সম্পদে ভূষিত করা বর্ত্তমান মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাহা অপরিমিত পরিমাণে লঙ্কাতে সঞ্চিত হইয়াছে। যে-সকল মহার্ঘ গুণ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার রাক্ষস চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই সুশোভিত, সুগঠিত, সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও এই সুসভ্য সুসংহত তেজস্বী জাতির বিনাশের কারণ তাহাদের সর্ব্বগ্রাসী দেশাত্মবোধের সহিত বিশ্বের ধর্ম্মব্যবস্থার সংঘাত, এবং তাহাদের দেশাত্মবোধের এই সর্ব্বগ্রাসীরূপ গ্রহণের কারণ মানব চেতনার সঙ্কীর্ণতা। বিনাশের সহিত সংঘাতের, সংঘাতের সহিত মানবীয় অপূর্ণতার একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় ট্রাজিডি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এই বিনাশ ও ব্যর্থতা আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে নাই; মানব প্রকৃতির মধ্যে ট্রাজিডির বীজ অন্তর্নিহিত আছে এবং সেই বীজ হইতে উদ্ভূত বিষবৃক্ষই অপূর্ব্ব সুযোগ-সমাবেশে জীবনের সকল সৌন্দর্য্য ও সম্পদ বিনষ্ট করিতেছে। যে মৌলিকতার সহিত রাক্ষস পক্ষ কল্পিত হইয়াছে, যে-শক্তিমত্তার সহিত এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে, যে-সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বর্ত্তমান সভ্যতার

বিষাদময় রূপটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং যে সুকৌশলে তাহাকে নায়কপক্ষের জীবনে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

বর্ত্তমান সভ্যতার শক্তি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য মধুসূদনের কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল, এবং বিমল জলে বিষের ন্যায়, ফুলদল মাঝে সর্পের ন্যায় ইহার মধ্যে বিশ্বের অকল্যাণের বীজ এবং এই জন্যই ইহার নিজের বিনাশের বীজ নিহিত আছে এই সত্য তাঁহাদের মনকে বেদনাভারাক্রান্ত করিয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্যকে Tragedy of morden civilisation নাম দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে আধুনিক প্রচারব্রতীদের সহিত তাঁহার প্রতিভার কোন সাদৃশ্য ছিল না। এ কাব্যে যেমন সাম্রাজ্যবাদের মুখর মহিমা কীর্ত্তন নাই, তেমনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাংবাদিক সুলভ বর্ত্তমান সভ্যতাকে নিছক দানবীয় সভ্যতা বলিয়া দ্বিধাকুণ্ঠাহীন প্রগলভ নিন্দাও নাই। কোন বিশেষ মতবাদ তাঁহার শক্তিশালী মনকে তাহার খাঁচার মধ্যে বন্দী করিতে পারে নাই। খুব সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রতি তাঁহার একটি কবিজনোচিত অবজ্ঞা ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার মত বিশুদ্ধ শিল্পীর সংখ্যা যে কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তাঁহার মুক্ত স্বচ্ছ অনাবিল রসদৃষ্টি যাহা সত্য বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাই তিনি একনিষ্ঠভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আধুনিক সভ্যতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছিল আবার এই সভ্যতা আপনার ভারসাম্যটি বজায় রাখিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সভ্যতার করুণ-সুন্দর রূপটি অঙ্কিত করিয়া তাহার হৃদয়ের আনন্দ বেদনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

একটি আদর্শ রাষ্ট্রের যে-কল্পনা বর্ত্তমানযুগের মানবমনের সামনে ভাসিয়া উঠে তাহাই মেঘনাদবধকাব্যের লঙ্কায় একদিন বাস্তবরূপে বিদ্যমান ছিল। লঙ্কার সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যে কবি এমনই আত্মহারা যে বর্ণনা করিয়া যেন তাঁহার কিছুতেই সাধ মিটিতেছিল না। গায়ক যেমন তাঁহার গানের ধুয়ায় বার বার ফিরিয়া আসেন কবিও লঙ্কার সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যের বর্ণনায় বার বার ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাঞ্চনসৌধ-কিরীটিনী ভুবনমনমোহিনী চারু লঙ্কার পূজার মানসে জগৎ তাহার সকল ধনরত্ন আনিয়া রাখিয়াছে—এই কনকলঙ্কা জগৎবাসনা, সুখের সদন লঙ্কার সৌন্দর্য্যসম্পদ্ মূককেও বাচাল করিয়াছে, অকবিকেও কবি করিয়াছে। কাব্যের প্রায় সকল চরিত্রই তাহার স্বতোৎসারিত বন্দনাগান গাহিয়াছে। রাজা রাবণ সমুদ্রকে বলিতেছেন—এই লঙ্কা, হৈমবতীপুরী, শোভে তব বক্ষঃস্থলে কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে। চিত্রাঙ্গদা রাবণকে বলিয়াছেন—স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত, অতুল ভবমণ্ডলে, ইহার চৌদিকে রজত-প্রাচীরসম শোভেন জলধি। মুরলা লক্ষ্মীকে বলেন—ত্রিদিবং বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে। অধর্ম্মাচারী রাবণের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ লক্ষ্মণও বিভীষণকে বলিতেছেন—অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে, এহেন বিভব আহা কার ভবতলে। বন্দিনী সীতার মুখেও শুনিতে পাই—সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী রঞ্জনের রেখা। বিশ্ববাসী যাহার "বন্দনা গাহিয়াছে সেই গীত-মুখরিত পুরীতে 'নীরব রবাব, বীণা মুরজ, মুরলী'; আলোক-ময়ী পুরী আজ মহাতমসাচ্ছন্ন, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল অন্ধকার, কেবল শূন্যতা। এই সুবিপুল, সুদূরপ্রসারী ধ্বংসচিত্র দর্শনে পাষাণেরও বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শোকাশ্রু বিগলিত হয়।

যেমন জাতি, তেমনি দেশ। যে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার প্রাণপণ সাধনা দেশমাতৃকার শ্রীবৃদ্ধিসাধন সেই দেশ সুন্দর ঋদ্ধিমান হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বালবৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নরনারী প্রতি লঙ্কাবাসীর জীবনের অনুপ্রেরণা এই—জন্মভূমি ভিন্ন আমি অন্য দেবতা জানিনা, দেশাত্মবোধ ভিন্ন আমি অন্য ধর্ম্ম জানিনা, জাতির কল্যাণ ভিন্ন আমার অন্য স্বার্থ নাই; আমার মাতৃভূমির প্রতি ধূলিকণা পবিত্র, আমার সকল দেশবাসী গুণবান্ হউক গুণহীন হউক, আমার ভাই, আমার মাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও যাইতে চাই না; এই মাতার সেবার জন্য আমি বাঁচিয়া আছি, যখনই প্রয়োজন হইবে মায়ের সেবার জন্য হাসিতে হাসিতে মরিব। রাজা রাবণের কর্ম্মপদ্ধতিকে সমগ্র জাতি দ্বিধাকুণ্ঠাহীনচিত্তে

গ্রহণ করিয়াছিল; তাই তাহারা কেহ রাবণকে পাপকর্ম্মের জন্য গঞ্জনা দেয় নাই। অন্তরের মধ্যে এই সংশয়সঙ্কোচের অভাব তাহাদের সমস্ত জাতির ঐকান্তিক পাপাসক্তির নিদর্শন বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহারা অধর্ম্ম করিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কেননা যে-সত্যের অন্যান্য সকল সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি নাই তাহা যেমন সত্য নহে মিথ্যা, তেমনি যে-ধর্ম্ম, হউক সে দেশপ্রীতি ধর্ম্ম, অন্য সকল ধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খায় না, তাহা অধর্ম্ম। দেশাত্মবোধ ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মের অস্তিত্ব রাক্ষসচেতনার বহির্ভূত ছিল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে প্রেয়োবুদ্ধির অভাব নাই, অভাব শ্রেয়োবুদ্ধির ব্যাপকতার। তাহাদের অন্তরের অকপট বিশ্বাস—রক্ষোনর বীরকুলরত্ন, রক্ষোনারী সতীকুলরত্ন, লঙ্কা সভ্যতা সংস্কৃতির একমাত্র লীলানিকেতন, লঙ্কা জগতের তীর্থস্থান; লঙ্কার বাহিরে কোথাও সভ্যতা নাই, ধর্ম্ম নাই, পুণ্য নাই, লঙ্কার বাহিরের সকল নরনারী দৈত্যের মত দুরাচার, কীটের মত হীন, চণ্ডালের মত অস্পৃশ্য; তাহাদের সুখদুঃখেরি বালাই থাকিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে আশা আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্পর্দ্ধার বিষয়; তাহাদের যে ধনসম্পদ্ তাহা নিতান্তই বানরের গলায় মুক্তার মালা, লঙ্কার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ছাড়া তাহার অন্যকোন সার্থকতা থাকিতে পারে না, সেই অপহৃত ধন যে ফিরাইয়া পাইবার জন্য সংগ্রাম করে সে হীনমতি, সে তস্কর। মানবচেতনার সঙ্কীর্ণতার জন্য দেশাত্মবোধের ন্যায় মহান্ ভাব দেখা দিল পরস্বহরণলালসারূপে, গগনস্পর্শী ঔদ্ধত্যরূপে, বিজাতির প্রতি অভ্রভেদী অবজ্ঞার আকারে—O the pity of it; the pity of it O! উচ্চ আদর্শবাদের নিকট আত্মবলিদানের মধ্যে যে নিখিল কল্যাণের সম্ভাবনীয়তা ছিল তাহা কেবল যে অপূর্ণ রহিয়া গেল তাহাই নহে তাহা আনয়ন করিল জগতের অমঙ্গল ও নিজের সম্পূর্ণ বিনাশ। ইহা অপেক্ষা দুঃখ, বেদনা, বিষাদের কারণ কি হইতে পারে?

লঙ্কার রাষ্ট্রীয়জীবনে যে দেশাত্মবোধ দেখি তাহা আমাদের মুগ্ধ করে, যে বিজাতিবিদ্বেষ দেখি তাহা আমাদের পীড়া দেয় কিন্তু তাহাদের অপূর্ব্ব গৃহজীবন আমাদের চিত্তে অবিমিশ্র অনুরাগের উদ্রেক করে। ভিন্ন ভিন্ন মানবসম্পর্ক হইতে স্নেহপ্রীতির অমৃতরসধারা নিরন্তর উথলিয়া উঠিয়া তাহাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের প্রতি কাজে প্রতি কথায় সুধা মাখাইয়া দিত। সত্যসত্যই লঙ্কা সোনার লঙ্কা, তার ঘরে ঘরে সোনার সংসার। মেঘনাদবধ কাব্যের কবি ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি রাবণের গৃহজীবনের চিত্রাঙ্কনে মানবহৃদয়ের প্রীতিরসের সীমাতীত ঐশ্বর্য্য ও অপরিসীম মাধুর্য্য উপলব্ধির পরিচয় দিয়াছেন তিনিই ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করিবেন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে রক্ষোনর রণক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ, যে-রক্ষোনারী রণরঙ্গিনী, জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রে পুরুষের দুরূহ-চিন্তার অংশভাগিনী, পরমসঙ্কটে কর্ম্মসঙ্গিনী তাহাদের গৃহজীবন যেন 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। ইন্দ্রজিতের বিনাশে এই কুসুমশরীরে শেলবিদ্ধ হইবে ভাবিয়া মনে মনে বলি, 'এ মৃদুদেহে মেরো না শর, আগুন দিয়ো না ফুলের পর'। তাহাদের হৃদয়ের এই কোমলতার জন্য রাক্ষসপক্ষের সহিত আমরা এত আত্মীয়তা অনুভব করি।

রাজা রাবণ রাক্ষসকুলের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ, তিনি লঙ্কার জনগণ মন অধি-নায়ক। কনক লঙ্কা তাঁহার মধ্যে নিজেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। স্বর্ণ লঙ্কা ও রাজা রাবণ অভিন্ন আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে। রাবণ চরিত্র মধুসূদনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মানব চরিত্রে যা-কিছু বিরাট, যা-কিছু মহান্, যা-কিছু সুন্দর, রাজা শব্দে যদি তাহাই বুঝায় তাহা হইলে তাঁহাকে রাজকুলশেখর বলিলে তাঁহার চরিত্রের অনেকটা পরিচয় দেওয়া হয়। তিনি ইংরাজীতে যাহাকে বলে every inch a king—তাঁহার প্রতি অঙ্গে রাজ-বিভূতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। রাজার মত উদার, রাজার মত মহানুভব, বিপদে তাঁহার রাজার মত অবিচলিত ধৈর্য্য, লাভ ক্ষতির প্রতি তাঁহার রাজার মত ঔদাসীন্য। রাজকুলমণি তাঁহার নিত্য বিশেষণ। যখন দেখি নীরব কর্ব্বুর-পতি, বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী, পদব্রজে ইন্দ্রজিতের শবানুগমন করিতেছেন তখন মনে হয় তাঁহার উপাস্য দেবতা প্রিয়তম ভক্তকে তাঁহার আপনার বিভূতিতে বিভূষিত করিয়াছেন। মানবীয়তা, কমনীয়তা,

তাঁহার চরিত্রে এত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান যে সাহিত্যের খুব কম চরিত্রই পাঠকের নিকট এত প্রিয়, এত নিকট ও এত আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যে প্রেমিক হৃদয় ও মাতৃ হৃদয়ের চিত্রের অভাব নাই কিন্তু পিতৃ হৃদয়ের যে বিশাল মনোজ্ঞ চিত্র এখানে পাই তাহার তুলনা নাই। গ্রীক্ নাটকে কোরাসের মধ্য দিয়া নাট্যকার তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেন এবং এই দৃষ্টি দিয়াই পাঠককে সেখানের সকল ঘটনা দেখিতে হয়। কোন কোন সময় আমাদের মনে হয় যে রাজা রাবণের হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যেই বোধ হয় কবি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়। বিপদের দিনে রাজা রাবণের মধ্যে আমরা আত্ম-অনুকম্পা দেখিতে পাই কিন্তু কোথাও আত্মগ্লানি নাই। পরাজয় সত্ত্বেও যেমন নিজের বীরত্বে তাঁহার সন্দেহ জন্মে নাই (বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত, অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি), তেমনি দুরবস্থায় পড়িয়াও আত্মপ্রত্যয়হীন কাপুরুষের মত নিজের সত্যোপলব্ধির প্রতি নিষ্ঠা হারান নাই। স্বার্থহানি ও বিপদের আশঙ্কা দেখিয়াই তিনি যদি কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিতেন তাহা হইলে লঙ্কা বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু এই ইতর বণিগবৃত্তি তাঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করে নাই। এখানেও তাঁহার রাজমহিমা দেখিতে পাই। চরম দুর্দ্দিনেও তাঁহার অকৃত্রিম প্রত্যয় ছিল যে তিনি দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ করেন নাই (কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে)। হায়, তাঁহার এই মহত্ত্বই তাঁহাকে বিপদের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমরা জানি তিনি তাঁহার চেতনার সঙ্কীর্ণতার জন্য তাঁহার অপরাধ বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গুক ইহা আমরা চাই না। যিনি সগোচরে কোন পাপ করেন নাই তিনি চরম বিপদে 'বিনা পাপে দণ্ড ভোগ করিতেছি', এই প্রতীতির মধ্যে যে-সান্ত্বনা আছে তাহা লাভ করুন।

এরিষ্টটল অনুমোদিত নায়কের সহিত মধ্যযুগনির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্মিলিত হওয়ায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ট্র্যাজিডি রচিত হইয়াছে। মধ্যযুগে ট্র্যাজিডির বিষয় ছিল রাজা মহারাজার আকস্মিক ভাগ্য বিপর্য্যয়। ত্রিভুবনজয়ী রাবণের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে যে বিরাট্ পরিবর্ত্তন, মানব ভাগ্যের যে চঞ্চলতা, নিয়তির যে দুর্বারতা দেখিতে পাই তাহা মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ইন্দ্রজিৎ বা রাবণের পতন ব্যক্তিবিশেষের পতন নয়, এক বিশাল দেশ ও বিরাট্ জাতির পতন; দুঃখ বেদনা স্বল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এই দুঃখ, এই বেদনা লক্ষ লক্ষ নর-নারীর, এ যেন এক ক্ষুদ্র জগতের পতন। এইভাবে একটি সুদূর প্রসারী বিষাদময় পরিমণ্ডল রচিত হইয়াছে। সাহিত্যরসকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যের চরিত্রের সহিত আমাদের আত্মীয়তা স্থাপন প্রয়োজন কিন্তু রসসৃষ্টির জন্য আবার সাহিত্যের চরিত্রের সহিত আমাদের দূরত্ব রক্ষা আবশ্যক। শিল্পরসের উপাদান আমাদের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবনিচয়। হৃদয়ভাব সমূহকে বাস্তব জীবনে যে-রূপে দেখি তাহার সহিত অবসাদ, অস্বস্তি, উদ্বেগ, আতঙ্ক, অশান্তি ও বিক্ষোভ জড়িত আছে কিন্তু সাহিত্যে যে-রূপে দেখি তাহা যে শুধু অবসাদ, উদ্বেগ, অস্বস্তি প্রভৃতি হইতে মুক্ত তাহাই নহে তাহাদের মধ্যে আছে সুগভীর প্রশান্তি ও প্রসন্নতা। রসানুভূতি মাত্রেই মহানন্দময়; এখানে ভয় আমাদের চোখের ঘুম, মুখের অন্ন কাড়িয়া নেয় না, ক্রোধ আমাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন করে না, শোক আমাদের পাগল করে না। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহাদের জীবনের যে-সমস্যা তাহা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা হইতে স্বতন্ত্র। যে-শ্বাসরোধকর আবেষ্টনের মধ্যে আমাদের কর্ম্মজীবন অতিবাহিত হয় সেই আবেষ্টনে তাঁহাদের দেখিতে পাই না, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তাঁহাদের সঞ্চরণক্ষেত্র। তাঁহাদের জীবনের যে-চিন্তা যে-ভাবনা, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থমগ্ন দৈনন্দিন জীবনের তৈল তণ্ডুল ইন্ধন ঘৃত লবণ সংগ্রহের যে-ভাবনা চিন্তা আমাদিগকে দিশাহারা করে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ক্ষুদ্র, স্বার্থমগ্ন ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ জীবনের বদ্ধ আবহাওয়া হইতে মুক্তি পাইয়া মানব হৃদয়ের পুণ্য-সমবেদনা-প্রবাহে বাহিত হইয়া রাজা রাবণের সুখ দুঃখের সহিত একাত্মবোধ অনুভব করিয়া আমাদের অন্তরবাসী রসপুরুষ আত্ম-উপলব্ধি করেন।

এখানের যে ভয় ও বেদনা তাহা ব্যক্তিগত ও ক্ষণিকের নয়, তাহা বিশ্বজনীন ও নিত্যকালের। মধ্যযুগীয় বিষয় নির্ব্বাচনের যাহা প্রধান ত্রুটি এরিষ্টটল অনুমোদিত নায়ক নির্ব্বাচনে তাহা দূর হইয়াছে। ট্রাজিডি বহিরাগত আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র নহে মানব চরিত্র হইতে উদ্ভূত হওয়ায় তাহা মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী অংশরূপে প্রতীয়মান হয়।

মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহার কর্ম্মশক্তিও অপরিমেয় কিন্তু তাহার ইচ্ছা তাহার কর্ম্মশক্তির সাহায্যে বাহিরের জগতে যে রূপ নেয় তাহা ঈপ্সিত রূপ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজা রাবণ চাহিয়াছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব কিন্তু সাধন করিলেন স্বর্ণলঙ্কার ধ্বংস ও সমগ্র রাক্ষসজাতির সম্পূর্ণ বিনাশ। তিনি ভাবিতেছিলেন পুত্র ও পুত্রবধূর সিংহাসনাভিষেকের কথা কিন্তু তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হইল তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যেখানে ফলের উপর কর্তৃত্ব নাই সেখানে ইচ্ছার উপর কর্তৃত্বকে কর্তৃত্ব বলিয়া অভিহিত করিলে অনেক সময় প্রহসনাত্মক মনে হয়। পাথরের মত সুদৃঢ় ভাবিয়া যে-ভূমির উপর রাজা কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ ফাটল দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে উহা করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার দেশ ও জাতিকে গ্রাস করিল। এই সর্ব্বনাশ এমনই অপ্রত্যাশিত যে রাজা রাবণ বিস্ময়ে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনুভব করিলেন 'বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে স্বর্ণলঙ্কা'। সকল বাধাবিঘ্ন কাটিয়া ছাটিয়া দলিয়া সমগ্র জাতিকে লইয়া নব-নব কীর্ত্তির পথে তিনি বিজয় রথ চালাইতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই রথ দুর্দ্দমনীয়বেগে নিজের ইচ্ছায় রাজার রশ্মিশাসনকে অসীম অবহেলা দেখাইয়া সমগ্র রাক্ষসজাতিকে অতলস্পর্শ গহ্বরে টানিয়া লইয়া চলিল! রাবণ বুঝিলেন মানুষ অন্ধ, মানুষ নাচার, এ ভব-মণ্ডল বিধির লীলাস্থলী। মানুষের কর্ম্মের দ্বারাই তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু যে-সকল বিভিন্ন শক্তির দ্বারা মানুষের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত তাহার উপর মানুষের আধিপত্য না থাকায় সময় সময় আমাদের মনে হয় যে তাহার কর্ম্ম-স্বাধীনতা আর্থিক স্বাধীনতা বঞ্চিত সামাজিক স্বাধীনতার ন্যায় অন্তঃসারশূন্য। যে-আবহাওয়ায় ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য বীরগণের মন গঠিত হইয়াছে, যে সঙ্কটে তাহাদের কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন তাহারা 'নিহতাঃ পূর্ব্বমেব'। মানুষের শক্তিই মানব জীবনের শেষ কথা নহে। যে-শক্তি তাহার শক্তিকে ব্যাহত করিতেছে তাহা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তির তুলনায় সীমাতীত। যে শক্তি এই ভাবে তাহার বিশাল পক্ষপুটে মানব জীবনকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহার স্বরূপ জানিবার জন্য আমাদের আগ্রহ অধীর হইয়া উঠে।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্বাস ছিল যে এই শক্তি হইতেছে চিরচঞ্চলা কুহকিনী সৌভাগ্যদেবী, সে আপনার খেয়ালের বশে একজনকে প্রেমাস্পদ বলিয়া বরণ করে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সৌভাগ্যের চরমশিখরে আসীন করে, এবং বিলাসবিভ্রমে, বিলোল-কটাক্ষে তাহাকে জয় করিয়া আপনার বশীভূত করে; পরের মুহূর্ত্তেই এই ছলনাময়ী মহারঙ্গে এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন ব্যক্তিকে একেবারে ধূলিসাৎ করে। মধুসূদন এই অন্ধনিয়তি জাতীয় কোন শক্তিকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কাব্যে এই শক্তি হইতেছে বিশ্বকল্যাণ ও শাশ্বতধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী। তিনি পলকহীন দৃষ্টিতে অহর্নিশি বজ্র উদ্যত করিয়া জাগিয়া আছেন, যখনই কেহ ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ধর্ম্মকে আঘাত করে তাহাকে তিনি নির্ম্মম ভাবে আঘাত করেন। কবি বলিয়াছেন 'সুবিধি বিধির বিধিবিদিত জগতে' অর্থাৎ বিধাতার যে-বিধানে এই বিনাশ তাহা স্বৈরাচার-প্রসূত নয়, ধর্ম্মরক্ষা প্রবৃত্তি-প্রসূত। বিধাতা সৃষ্টির বাহির হইতে সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেন নাই, সৃষ্টির ভিতর হইতেই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সৃষ্টি তাহার স্বকীয় প্রকৃতির প্রেরণায় নিজেকে ন্যায় ও সত্যের দিকে নিরলসভাবে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। গোচর, অগোচর সর্ব্ববিধ অধর্ম্মাচরণকে নিজের নিয়মানুসারে ব্যাহত করিতেছে; তাই মানুষের ইচ্ছার সহিত ফলের এই বৈসাদৃশ্য। কিন্তু যাহারা গোচরে অগোচরে যে ভাবেই হউক অন্যায়, অধর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির ধর্ম্মাভিমুখিনী অভিব্যক্তিকে বাধা

দেয়, তাহারাও সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া সৃষ্টি আপনাকেই পীড়িত করে। রাজা রাবণের দুঃখে দেবাদিদেব মহাদেবেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, রামসীতা তাঁহার দুঃখে একান্ত অধীর। বিধাতার সৃষ্টি তাঁহার নিজের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকে প্রকাশিত করিতেছে একটি জ্যামিতিনির্দ্দিষ্ট ঋজুপথে নহে, বিচিত্র বঙ্কিমগতিতে আঘাত সংঘাত, বিরোধবিক্ষোভের মধ্য দিয়া। তাহার অভিব্যক্তির পথে যে আত্মপীড়নের বেদনা তাহাই কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন ও আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

লঙ্কার বিনাশ ছাড়া সীতার উদ্ধার নাই এই ভাবিয়া আমরা এই বিনাশ সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে এই আক্ষেপের উদয় হয়, কি কুক্ষণেই রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। কিন্তু পরেই মনে পড়ে, কবি তাঁহার কাব্যে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছেন যে সীতাহরণ আকস্মিক ঘটনা মাত্র নহে, রাবণ যে অধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন ইহা তাহার অনিবার্য্য পরিণতি, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নিয়মানুসারে রাবণের অনুসৃত পথের গন্তব্যস্থানই এই। বসুন্ধরার মুখে শুনিতে পাই, 'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে, এ ভার আমি সহিতে না পারি, জননীর জ্বালা দূর করিলে মৈথিলি।' বসুন্ধরার উক্তি শুনিয়া আমাদের এই প্রশ্নের উদয় হয়, যে ধর্ম্ম 'হতো হন্তি, রক্ষিতঃ রক্ষতি' সেই ধর্ম্মকে রাজা আঘাত করিলেন কেন? রাজা তাঁহার শ্রেয়োবোধের সঙ্কীর্ণতার জন্যই ধর্ম্মের সঙ্গে সংঘাত বাধাইয়াছেন এই উত্তর আমাদের মনে বেদনাকে তীক্ষ্ণতর করে। কেন এই বিনাশ, কেন এই সংঘাত, কেন এই অপূর্ণতা, এই আদিঅন্তহীন প্রশ্নোত্তরমালা আমাদের মনকে ব্যাকুল করে, এবং যতই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে থাকি ততই রহস্য গভীর হইতে গভীরতর হয়, এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই—যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে ততদিন তাহার এই ত্রুটি বিচ্যুতি, চরিত্রের অপূর্ণতা ও চেতনার সঙ্কীর্ণতা তাহার চিরসঙ্গী, এবং ততদিন ধর্ম্মের সঙ্গে এই সংঘাত, ও সংঘাতজনিত এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বেদনারূপে এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়া থাকে—অনন্ত সম্পদে ভরা, অপরূপ সুন্দর ভুবনে, নিত্য উচ্ছ্বসিত অফুরন্ত প্রাণরসে টলমল মানবের জীবনের মর্ম্মস্থানে কেন এই বিনাশের ব্যর্থতার বীজ? রাজা রাবণের সহিত আমরাও মনে মনে বলি, 'হায় বিধি লীলাময়, মূঢ় নর কেমনে বুঝিবে তব মায়া?"

(সমাপ্ত)

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার

মানুষ গড়া

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম্-এ, বি-এল

"মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে ফ্রেড্রিকের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়েছে।"—কারাধ্যক্ষ নিজে আসিয়া বন্দীকে এই সুসংবাদটি শুনাইয়া দিলেন।

ফ্রেড্রিক তাহার ক্ষুদ্র কারাকক্ষের এক কোণে একটি ছোট টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। লৌহদ্বার উন্মোচনের কর্কশ শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে সোজা হইয়া বসিয়া সরকারের শেষ আদেশটুকু শান্তভাবে শ্রবণ করিল। তারপর একটু ম্লান হাসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "বেশ।...কিন্তু আমার উপর সরকারের হঠাৎ এতটা দয়া হ'বার কারণ কি তা' তো বোঝা গেল না। আমার তরফ থেকে তো দণ্ড মকুব করবার জন্যে কোন প্রার্থনা করা হয় নি।...ও, ঠিক, বুঝেছি,—আমি যে গুরু অপরাধে অপরাধী, ত্বরিত মৃত্যুতে তা'র প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তাই যা'তে তিল তিল ক'রে মৃত্যু হয় তা'রই ব্যবস্থা হয়েছে।" আবার একটু ম্লান হাসিয়া সে কারাধ্যক্ষের মুখের পানে চাহিল।

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "সে সব কথা আমি আর কি জানি বল।"

ফ্রেড্রিক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না, আমি নিজের মনেই বক্‌ছিলাম, আপনাকে কিছু বলিনি। এখানে আসা অবধি আপনার কাছে যে নিরবচ্ছিন্ন সদয় ব্যবহার পেয়েছি তা'র জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আপনাকে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "থাক্, উঠতে গেলে তোমার কষ্ট হবে, দরকার নেই, বস।"

ফ্রেড্রিকের একটা পা নাই, খঞ্জ, যষ্টিতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়। কারাধ্যক্ষ তাহাকে ধরিয়া টুলের উপর ভালো করিয়া বসাইয়া দিলেন।

তাহার উপর কারাধ্যক্ষের বস্তুতই একটু মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। কারণ জেল-কর্মচারীর কঠোর কর্তব্যময় জীবনে এমন ধীর, মার্জিত বুদ্ধি, উদার হৃদয় যুবকের সংস্পর্শ অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

ফ্রেড্রিক বলিল, "যাক্, এখন বলুন দেখি, বাকী জীবনটা এইখানে, আপনার স্নেহচ্ছায়াতেই কাটবে তো? তা হ'লে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়।"

কারাধ্যক্ষ তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিলেন, "না বন্ধু, এখানে থাকা হ'বে না। যে সব কয়েদীর তিন বছর পর্যন্ত মিয়াদ তা'রাই এখানে থাকে। তোমাকে যেতে হ'বে সেন্ট্রাল জেলে।"

"সেখানে কবে যেতে হ'বে?"

"তা' এখন কিছু বলা যায় না। ওপর থেকে হুকুম এলেই যেতে হ'বে। তা'তে বোধ হয় দিন দশ-পনেরো দেরি হ'বে।"

অত্যন্ত বিনীত ভাবে ফ্রেড্রিক বলিল, "তা' হ'লে আমার একটা প্রার্থনা...এখান থেকে যা'বার আগে আমার দুঃখিনী মায়ের সঙ্গে একবার দেখা—"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "তা আর বল্‌তে হ'বে না, সে ব্যবস্থা আগেই হয়েছে। আগামী বুধবারে তোমাকে তাঁ'র দেখতে আস্‌বার কথা আছে। তোমাকে তা' আগে বলা হয় নি, কেন তা' বোধ হয় বুঝতেই পাচ্ছ। এখন এই দণ্ড মকুব হওয়ার আদেশ পেয়েই আগে তোমার মাকে একটা তার করে দিয়ে এসেছি। সেই সঙ্গে বুধবারে আস্‌বার কথাও আবার বলে দিয়েছি।"

ফ্রেড্রিক আবেগভরে কারাধ্যক্ষের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিল, "বহুবার, অসংখ্য ধন্যবাদ!"

ফ্রেড্‌রিক ছিল তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাহার পিতা সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে সামান্য শ্রমজীবী হইতে ক্রমশঃ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছোট একটি মুদিখানা দেখিতে-দেখিতে গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বড় দোকান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কারবারের বেশ একটু উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। তাই ফ্রেড্‌রিকের যখন জন্ম হয় তখন তাহার পিতার বয়স চল্লিশের উপর।

একটু বড় হইলে ফ্রেড্‌রিক গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইল। তাহার পিতা বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু মাত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শিক্ষার মূল্য বুঝিয়াছেন। তাই পুত্রকে আর একটু বেশী করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে চাহিলেন।

ফ্রেড্‌রিকের স্কুলের শিক্ষা যখন শেষ হইল, তখন তাহার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এইবার পুত্রকে নিজের দোকানের কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহার মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। পুত্রের সম্বন্ধে তিনি একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষন করিতেন,—তাহাকে ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া একটা মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবেন। ফ্রেড্‌রিক বেশ বুদ্ধিমান বালক, লেখাপড়ায় বেশ মন আছে,—তাহার উপর তাহার দেহ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্য অটুট। সুতরাং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কোন সম্ভ্রমজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে সে সহজেই সমাজের উচ্চতর স্তরে স্থান করিয়া লইতে পারিবে। সে কি চিরজীবন গ্রাম্য দোকানদারই থাকিয়া যাইবে?

ফ্রেড্‌রিকের নিজের ইচ্ছা যে চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া সে গ্রামে আসিয়া বসিবে, এবং দেশের ও দশের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিবে। মাতা পুত্রের এই সাধু সংকল্পে বাধা দিবার প্রবৃত্তি ফ্রেডরিকের পিতার আর রহিল না। ফ্রেডরিক সহরে গিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিল।

সেখানে এই সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ গ্রাম্য বালক অতি সহজেই সমপাঠিগণের প্রীতি ও সমপাঠিনীগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

এক বৎসর পরে কলেজের ছুটি হইলে ফ্রেডরিক কয়েকদিন বাড়ীতে কাটাইয়া যখন কলেজে ফিরিল, তখন সহরে একটা বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রবল জনরব উঠিয়াছে যে যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিতেছে। ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সর্ব্বত্র এই একই আলোচনা। যুদ্ধ যে শীঘ্রই বাধিবে সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, তবে কত শীঘ্র এই কথাই এখন তর্ক আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একদিন এই তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি ঘটিল, যখন ভোরে উঠিয়াই নগরবাসীরা শুনিল যে যুদ্ধ ঘোষনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত বড় ব্যাপার ঘটিয়া গেলেও দেশে 'সাজ সাজ' রব উঠিল না। কারণ রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ নাকি বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেনাদল সাজিয়া গুজিয়াই বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাই এখন রব উঠিল—'ছোট ছোট; আগে চল, আগে চল ভাই!'

যুদ্ধের হুজুগে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিষম ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। শিক্ষক অধ্যাপকেরা অন্যমনস্কভাবে যা তা পড়াইয়া যান। ছাত্রছাত্রীরা তাঁহাদের কথায় কান দেয় না। তারপর ক্লাস হইতে বাহির হইয়া সারাক্ষণ কেবল যুদ্ধের আলোচনা, কে কত বড় যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ তাহারই প্রমাণ করিবার চেষ্টা।

মাস কয়েক পরে সমর সচিবের দপ্তরখানা হইতে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পত্র আসিল, শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে একুশ হইতে ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক যত যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি আছে তাহাদিগকে অবিলম্বে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে হইবে। সহরে রিক্রুটিং অফিস খোলা হইল। এক সপ্তাহের মধ্যে কলেজের সাত জন শিক্ষক এবং একশো বত্রিশ জন ছাত্র সংগৃহিত হইয়া নিকটতম সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে চালান দেওয়া হইল।

•

ছয় মাস পরে সামরিক দপ্তরখানা হইতে আবার নির্দ্দেশ আসিল—"আরও লোক পাঠাও।"

ক্লাসে ক্লাসে যখন আদেশ পড়িয়া শোনানো হইল, তখন ছাত্রগণ একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তুমুল কোলাহল

আরম্ভ করিল—লেখাপড়া চুলোয় যাক, আগে জাতের মান রক্ষা করতে হ'বে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে, শত্রু নিপাত যাক্, মাতৃভূমির জয়!"

ছাত্রগণ দলে দলে ক্লাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। খেলার মাঠে সমবেত হইয়া সকলে জাতীয় সঙ্গীত গাহিল, তাহারপর নানাপ্রকার ধ্বনি করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে একযোগে শপথ করিল, কালই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া রিক্রুটিং অফিসে গিয়া নাম লিখাইবে।

ছাত্রীদের মধ্যেও উৎসাহ সংক্রামিত না হইয়া যায় নাই। তবে তাহাদের তো সৈন্যদলে লইবে না, তাই তাহারা ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিয়া স্বদেশের প্রতি কর্তব্য পালন করিল।

ফ্রেডরিকও প্রচণ্ড ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে। সে এখন একটা ছোটখাটো নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেদিন খেলার মাঠের ভীড়ে ঢুকিয়া চীৎকার ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একবার সে যখন ভীড়ের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন মনে হইল কে যেন তাহার পিঠে ধীরে ধীরে টোকা মারিতেছে। ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল নীচের ক্লাসের একটি ছাত্রী বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া আছে।

বালিকাটি তাহার মুখচেনা আছে, কিন্তু নাম-ধাম-পরিচয় কিছুই জানা নাই। কলেজে যে কয়টি ছাত্রী আছে তাহাদের মধ্যে এইটি বয়সে ছোট, অন্ততঃ ছোট বলিয়া মনে হয়। তাহার গোলগাল মুখখানিতে শৈশবসুলভ সরলতা মাখানো। ভীতা হরিণীর মত চঞ্চল চোখদুটি ক্ষণে ক্ষণে আনত হইয়া পড়ে। আজ তাহারই চক্ষে এমন অসঙ্কোচ অবিচলিত দৃষ্টি দেখিয়া ফ্রেড্রিক চমকিত হইল।

মার্থা বলিল, "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"কি বল।"

"এখানে এ ভীড়ের মধ্যে নয়। একটু সরে চলুন—বল্‌ছি।"

দুজনে কয়েক পা সরিয়া দাঁড়াইল। মার্থা বলিল, "আপনার যুদ্ধে যাওয়া হ'বে না।"

"কেন?"

"কেন কি! সকলকেই ভেড়ার মতন গিয়ে প্রাণ দিতে হ'বে? আর যে যায় যাক, আপনি যাবেন না।"

কথাটা ফ্রেডরিক হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "বাঃ! সকলে যাক, আর আমি কাপুরুষের মতন ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকি! তা হয় না,—যেতেই হ'বে, শত্রুকে ধ্বংশ করতে হ'বে দরকার হ'লে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে হবে।"

মার্থার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিল। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কে শত্রু? যে এতদিন শত্রু ছিল না, আজ সে হঠাৎ শত্রু হ'ল কি ক'রে? কি চায় সে? আমরাই বা কি চাই? যুদ্ধে প্রাণ দেবার উদ্দেশ্য কি? এসব কিছু জানেন?"

"না, ও সব জানবার আমার দরকার নেই।"

ম্লান হাসিয়া মার্থা বলিল, "তাই তো বল্‌ছিলাম, ভেড়ার পালের মতন—"

ফ্রেডরিক অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; বলিল, "অত কথা শোনবার আমার সময় নেই।"

ছুটিয়া গিয়া সে আবার ভীড়ের ভিতর ঢুকিল।

পরদিন দুশো ছত্রিশ জন ছাত্র রিক্রুটিং অফিসে গিয়া নাম লিখাইল। তাহাদের সকলেরই বয়স একুশের নীচে, কিন্তু তাহাতে বাধিল না। সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সেখানে পৌঁছিয়াই নূতন সৈনিকদলের রীতিমত কুচ-কাওয়াজ আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু প্রথম তিন চার দিনে যেটুকু শিখানো হইয়াছিল, দুই মাস পর্য্যন্ত দিনের পর দিন, সকালে-বিকালে দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টা ধরিয়া কেবল তাহারই অনুশীলন চলিল। 'ডাইনে ফেরো, বাঁয়ে ফেরো, ঘুরে দাঁড়াও; ধিমে মার্চ, জলদ মার্চ, বাঁয়া-ডাইনা, বাঁয়া-ডাইনা··· থামো, সেলাম!"—এই পর্য্যন্ত।

ফ্রেডরিকের দলের সকলেরই বয়স আঠারো হইতে কুড়ি বৎসর। একঘেয়ে কুচ-কাওয়াজ করিতে করিতে তাহাদের বিরক্তি ধরিয়া গেল। উৎসাহে ভাঁটা পড়িতে

লাগিল। তাহার উপর কঠোর শাসন ও কদর্য আহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল।

অবশেষে এ বিড়ম্বনা হইতে সকলে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল, যখন তাহাদের উপর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ আসিল। এবার তাহারা যেখানে আসিল তাহার কয়েক মাইল পরেই যুধ্যমান সৈন্যদলের শ্রেণী। রাত্রে সেদিকের উজ্জ্বল দিগন্ত রেখা এবং ক্ষীণ বিস্ফোরণ-ধ্বনি হইতে রণক্ষেত্রের একটা অস্পষ্ট আভাষ মাত্র পাওয়া যায়।

এখানে আসিয়া ফ্রেডরিকের দলের বেশ আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। শাসনের কড়াকড়ি নাই, পরিশ্রম নাই, আহারাদির কোন ত্রুটি নাই। সারাদিন নানারূপ খেলাধুলা করিয়া, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া সময় কাটে। মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প সামরিক শিক্ষাও চলে, কিরূপে বন্দুক ছুঁড়িতে হয়, বিষবাষ্পের মুখস ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে আত্মগোপন করিয়া শত্রুর গোলাগুলি ও বোমা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হয়, ইত্যাদি।

কিছুদিন পরেই তাহাদের ডাক পড়িল। অস্ত্রশস্ত্র, গ্যাস-মুখোস, জলের বোতল, খাবারের থলি, পোষাকের পুঁটলি ইত্যাদি লইয়া বড় বড় লরিতে উঠিয়া সকলে রওয়ানা হইল।

সম্মুখ লাইনে আসিয়া কিন্তু তাহাদের উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া গেল। এ কি রকম যুদ্ধ? শত্রু কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। যুদ্ধসম্ভারের মধ্যে এখানে ওখানে কয়েকটা কামান নিষ্ক্রীয়ভাবে পড়িয়া আছে মাত্র। কাঁটা তার ও জাল দিয়া ঘেরা খানিকটা জায়গার মধ্যে সারি সারি খানার ভিতরে ইঁদুরের মত লুকাইয়া থাকিয়া শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করা—ইহারই নাম আধুনিক প্রণালীর ট্রেঞ্চ ফাইটিং বা পগার যুদ্ধ!

কিন্তু শত্রুর সাক্ষাৎ না পাইলেও, অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি ও বোমা সর্বক্ষণই একটা বিপদের কারণ হইয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলকে সতর্ক ও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। তথাপি শত সাবধানতার মধ্যেও আকস্মিক ভাবে নানা বিপদ ঘটিতে লাগিল,—হতাহতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

কিছুদিন পরে ফ্রেডরিকের দলের ছুটি হইল। তাহারা বিশ্রামের জন্য দ্বিতীয় লাইনে ফিরিয়া গেল, আর একটা দল আসিয়া তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল। এইরূপে পালা করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে যাওয়া-আসা করিতে করিতে অনেক দিন কাটিল। তারপর একবার ফ্রেডরিকের দলের টানা দুই মাসের ছুটি হইয়া গেল।

সেবার ১৬২ জনের মধ্যে ৩৬ জন হত এবং ৫৫ জন আহত হওয়ায়, আরও নূতন লোক লইয়া সংখ্যা পূর্ণ করিবার প্রয়োজন হইল। তাই এই দীর্ঘ অবকাশ। এই সুযোগে কেহ কেহ দু-তিন সপ্তাহের জন্য বাড়ী চলিয়া গেল।

যতদিন সম্মুখ লাইনে থাকিতে হয়, ততদিন জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না। দ্বিতীয় লাইনে ফিরিয়া আসিলে পৃথিবীর খবর একটু আধটু পাওয়া যায়। ফ্রেডরিক একদিন অফিসারদের বাসায় একখানা পুরাতন সংবাদপত্র কুড়াইয়া পাইয়া পরম আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল। একটা সংবাদে দেখিল শত্রুগণের বিমানপোত সুদূর পল্লি-অঞ্চলে পর্যন্ত গিয়া মধ্যে মধ্যে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার ফলে সাতখানি গ্রামের অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ফ্রেডরিক দেখিল তাহার গ্রামেও আক্রমণ হইয়াছে,—১৬ জন হত, ৭৩ জন আহত।

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ফ্রেডরিকের অন্তর বিহ্বল হইয়া উঠিল। সে আর থাকিতে পারিল না, তিন সপ্তাহের ছুটি লইয়া বাড়ী রওয়ানা হইল।

শত্রুর নৈশ অভিযানের চিহ্ন ট্রেণ হইতেই মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছিল। নিজের গ্রামে পৌঁছিয়া ফ্রেডরিক দেখিল বিস্তর বাড়ী-ঘর ধ্বংশ হইয়াছে, গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা মহা-আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে শুনিল যে বোমা বিস্ফোরণের ফলে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

ফ্রেডরিকের মাতা স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু এবং একমাত্র পুত্রের বিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রকে

ফিরাইয়া পাইয়া তাঁহার মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার হইল। কিন্তু ফ্রেডরিকের তো বেশীদিন থাকিবার উপায় নাই, নির্দিষ্ট দিনে তাহাকে বিদায় লইয়া যাইতে হইল।

ইতিমধ্যে ফ্রেডরিকের দলে অনেক নূতন লোক লইয়া সংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু এবার যাহারা আসিয়াছে তাহারা অধিকাংশই ষোল-সতেরো বৎসরের বালক। অনেকেই কৌতূহল নিবারণের জন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু এখন ভয় পাইয়া গিয়াছে, অথচ ফিরিবার উপায় নাই। ইহারা দুই সপ্তাহ মাত্র শিক্ষাকেন্দ্রে থাকিয়া আসিয়াছে, এবং আর দুই সপ্তাহ পরেই একেবারে সম্মুখ লাইনে প্রেরিত হইল।

সেখানে এ দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিকে লইয়া সকলে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা নিতান্ত অসহায়, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য আবার লোকের প্রয়োজন। তাহার উপর মুস্কিল হইল এই যে শত্রুর আক্রমণের তীব্রতাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

একটি বালক ছিল, তাহার নাম পল। তাহার উপর ফ্রেডরিকের অত্যন্ত মায়া জন্মিয়া গেল। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করাই ফ্রেডরিকের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন লাইনে প্রচার হইয়া গেল যে রাত্রে বিষবাষ্পের বোমা পড়িবে, এবং সেই সঙ্গে ভীষণ গোলাগুলি বর্ষিত হইবে। সকলকে বিশেষ সতর্ক থাকিবার জন্ত আদেশ প্রচার হইল।

রাত্রে মাথার উপর হাওয়াই জাহাজের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে সকলে মুখোষ পরিয়া সুরক্ষিত পরিখায় আত্ম-গোপন করিয়া রহিল। ক্রমে বুঝিতে পারা গেল যে বিষবাষ্প চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পরিখায় প্রবেশ করিতেছে। ফ্রেডরিক পলকে সঙ্গে লইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বসিয়া রহিল। কিন্তু পল কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। সে অনবরত মুখোস লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে। কখন নিঃশ্বাসবাহী নল বন্ধ হইয়া যায়, সে হাঁপাইয়া উঠে। কখন মুখোস টানিয়া খুলিবার চেষ্টা করে, বিষবাষ্প-মিশ্রিত বায়ু প্রবেশ করিয়া বুকজ্বালা করিতে থাকে। কখন ছুটিয়া একেবারে পরিখার তলদেশে গিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়ে। বিষবাষ্প যে বায়ু অপেক্ষা ভারি, এবং সেজন্য নীচের দিকে বেশী জমিয়া থাকে, পল তাহা জানে না, কিংবা জানিলেও ভুলিয়া যায়। ফ্রেডরিক তাহাকে টানিয়া তুলিয়া আনে।

এদিকে পরিখার আশেপাশে ঘন ঘন গোলা ও বোমা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিকট শব্দে পল শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, বিহ্বলভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে। কখন গড়াইয়া পরিখার তলদেশে গিয়া পড়ে, আবার দৌড়িয়া বাহির হইয়া উন্মুক্ত মাঠে গিয়া উপস্থিত হয়। ফ্রেডরিক বার বার তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসে।

একবার পল হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকার মাঠে ছুটাছুটি করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, ফ্রেডরিক গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু ঠিক সময়েই একটা গোলা আসিয়া নিকটে পড়িল। মনে হইল কে যেন ফ্রেড্রিকের হস্ত হইতে পলকে সজোরে ছিনাইয়া লইয়া গেল, এবং পরমুহূর্ত্তেই ডান পায়ে একটা দারুণ আঘাত পাইয়া ফ্রেডরিক চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

পরিখা হইতে দুইজন সৈনিক অতি সন্তর্পনে বাহির হইয়া ফ্রেড্রিকের অচৈতন্য দেহ তুলিয়া লইয়া গেল। হতভাগ্য পলের শতধা-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহের দিকে ফিরিয়া চাহিবারও তাহাদের অবসর ছিল না।

পরদিন ফ্রেডরিককে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তাহার মত আহত সৈনিকের সংখ্যা নাই—কে কাহাকে দেখে, কেই বা শুশ্রূষা করে।

ফ্রেডরিকের পায়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা তেমন গুরুতর নয়। হয় তো যত্ন লইয়া চিকিৎসা করিলে ক্রমে অনেকটা আরাম হইয়া যাইত। কিন্তু অতো কে করে? ডাক্তারেরা কাজ সংক্ষেপ করিবার জন্ত গোটা পাখানাকেই উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল,—তারপর হয় ইস্‌পার নয় উস্‌পার যাহা হয় হউক। সকলের বেলাতেই এই নিয়ম। অত্যধিক রক্তস্রাব এবং অসহ্য যন্ত্রণায় অনেকেরই ভবযন্ত্রণা শেষ হয়, যাহার নিতান্ত পরমায়ু থাকে সেই বাঁচিয়া উঠে।

কিন্তু ফ্রেডরিক যে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, তাহা কেবল পরমায়ুর জোরে নয়। সারা হাসপাতাল জুড়িয়া যখন হতভাগ্যদের আর্তনাদ উঠিত, তখন কে একজন মাঝে মাঝে নিঃশব্দে আসিয়া ফ্রেডরিককে ইঞ্জেকসন দিয়া যাইত, নিয়মিত সময়ে পথ্য আনিয়া খাওয়াইত। যখন অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইত, তখন ফ্রেডরিক প্রায়ই তাহাকে দেখিত। দেখিয়া মনে হইত মুখখানা চেনা চেনা, কিন্তু সে যে কে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিত না। শেষে ফ্রেডরিক একদিন চিনিয়া ফেলিল—সে মার্থা।

মার্থা কিছুদিন হইল স্বেচ্ছাসেবিকা নার্সের কাজ লইয়া এই হাসপাতালে আসিয়াছে। সে ভদ্র বংশের শিক্ষিতা তরুণী, তাহার উপর চিকিৎসা বিদ্যাও অল্পস্বল্প শিখিয়াছে, তাই সাধারণ নার্স অপেক্ষা একটু উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছে। আর সেই জন্যই বিশেষ যত্নের সহিত ফ্রেডরিকের নিয়মিত শুশ্রূষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

একটু সুস্থ হইলে ফ্রেডরিককে হাসপাতালের বৃহৎ সাধারণ কক্ষ হইতে সরাইয়া একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষে রাখা হইল। যাহারা ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে কেবল তাহাদিগকেই এখানে রাখা হয়। সুতরাং শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া ফ্রেডরিক সত্বর সুস্থ হইয়া উঠিল। ক্রমে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঠের পায়ে ভর দিয়া নূতন করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আরম্ভ করিল। মার্থা অবসর মত আসিয়া তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নানা প্রকারে চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করে।

যখন ফ্রেডরিকের হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইবার সময় আসিল, তখন মার্থা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "দেশের সেবায় একটা ঠ্যাং উৎসর্গ করে' জীবন সার্থক হ'ল, এখন আবার কি ভাবে দেশের সেবা হবে তাকি স্থির হয়েছে ?"

ফ্রেডরিক নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে উত্তর করিল, "কেন ফিরে গিয়ে আবার কলেজে ভর্ত্তি হ'ব। খোঁড়া হ'লেও ডাক্তার হ'তে তো বাধে না।"

"কিন্তু কলেজ কোথায় ? স্কুল কলেজ এখন সব বন্ধ। ছেলেদের লেখাপড়া শেখবার তো এখন কোন দরকার নেই, এখন দরকার কেবল দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন। যুদ্ধ যদি কখনও শেষ হয়, স্কুল কলেজে পড়বার মতন ছেলেমেয়ে যদি জোটে, তবেই সে সব একে একে খুলবে। ততদিন কি করবে ?"

ফ্রেডরিক কিছু বলিল না, হতাশ ভাবে চাহিয়া রহিল।

মার্থা বলিল, "সে জন্যে ভেবো না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে গৌরব অর্জন ক'রে নিয়ে যাচ্ছ, তাতে যথেষ্ট সম্মান পাবে। তুমি—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া ফ্রেডরিক বলিল, "সম্মান নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলে, বসে বসে খাওয়া কত দিন চলবে ? যা হ'ক কিছু রোজগারের উপায় করতেই হ'বে।"

"তবে বলি শোন। তুমি শিক্ষিত, মনটা উদার, দেশকে যথার্থই ভালবাস, শিক্ষাব্রত নিয়ে নিজের গ্রামে গিয়ে বস। ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের শিক্ষা দিয়ে যদি মানুষ ক'রে তুলতে পার, তা'তেও দেশের সেবা কিছু কম হ'বে না, সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা উপার্জনও হ'বে।"

ফ্রেডরিক বলিল, "হ্যাঁ, এ কথাটা আমার মনে লাগছে বটে।"

মার্থা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তবে আর কি, তাই কর গিয়ে। শান্তিপূর্ণ অনাড়ম্বর জীবন বেশ এক রকম কাটবে। ক্রমে বিয়ে-থা ক'রে সংসার-সুখেও সুখী হ'তে পারবে।"

ম্লান হাসিয়া ফ্রেডরিক বলিল, "পাগল ? একটা খোঁড়া দরিদ্র পাড়াগেঁয়ে স্কুল মাষ্টারকে কে আর বিয়ে করতে চাইবে বল ! ও কথা ছেড়ে দাও। তবে যে—"

মার্থা অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, "না না, তুমি কিছু জান না। মেয়েরা কি চায়, কিসে সুখী হয়, তুমি তা বুঝবে না। হয় তো এমন অনেক মেয়ে আছে যে তোমার জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকতে পেলে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করবে। দেশে ফিরে গিয়ে দেখ, যদি তেমন কারুর দেখা না পাও আমাকে জানিও, আমি তার সন্ধান দেব।"

মার্থার কথার ভিতরে কোন ইঙ্গিত ছিল কিনা ফ্রেডরিক ঠিক বুঝিতে পারিল না। চাহিয়া দেখিল মার্থার

নিটোল মুখখানি সকৌতুক হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেও তেমনি সহাস্য বদনে উত্তর করিল, "আচ্ছা বেশ, তাই হ'বে।"

দেশে ফিরিয়া ফ্রেডরিক দেখিল মার্থা ঠিকই বলিয়াছিল। ছেলে মেয়েদের উপর কোনরূপ শাসন নাই, তাহাদিগের শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। ছাড়া পাইয়া তাহারা বন্য জন্তুর মত দুর্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট প্রাথমিক পাঠশালাগুলিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নানা কাজে নিযুক্ত হইয়া কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ফ্রেডরিকের পিতার দোকান ঘরের ভগ্নস্তূপ সরাইয়া চালা ঘর তোলা হইল। সেখানে পাড়ার কয়েকটি ছেলে মেয়েকে লইয়া ফ্রেডরিক একটা ছোট খাটো স্কুল বসাইল। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। কাজেই গ্রামের দুইজন নিঃস্ব বিধবাকে বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইল।

দেড় বৎসরের মধ্যে ফ্রেডরিকের স্কুল বেশ জমিয়া গেল। তাহার আর্থিক অবস্থারও বিলক্ষণ উন্নতি হইল।

ক্রমে এই 'খোঁড়া মাষ্টারের' যশ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। বয়সে নবীন হইলেও বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া তাহার বেশ একটু খ্যাতি জন্মিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার স্কুল গৃহে একটি ছোট খাটো গল্পের আসর বসে। সেখানে তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। তাহার মত যুদ্ধ প্রত্যাগত ভগ্ন-সৈনিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, কিন্তু অধিকাংশই চাষী মজুর মিস্ত্রী শ্রেণীর লোক। সুতরাং যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন আলোচনা হইলে ফ্রেডরিকের মতামতই সর্বজনগ্রাহ্য। সকলে পরম আগ্রহ ও আস্থার সহিত তাহার বক্তব্য শ্রবণ করে।

ইতিমধ্যে ফ্রেডরিকের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধ স্থলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাহার অনেক নূতন ধারণা জন্মিয়াছে। সে বলে—"এ যুগের যুদ্ধ প্রণালী অতি হীন, নিষ্ঠুর, বর্বরোচিত। রাষ্ট্রনায়কগণ দেশের লোককে যোদ্ধারূপে দেখেন না,—তাহারা শত্রুর কামানের খোরাক মাত্র। পূর্বকালে অনেক সময়ে যুদ্ধে জয় পরাজয় দ্বৈরথ-সংগ্রামের দ্বারা নির্ধারিত হইত, সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে বেশী প্রাণহানি ঘটিত না। পরে বহুকাল ধরিয়া কেবল সৈন্যে সৈন্যে সম্মুখ-সমর চলিয়াছিল। যে পক্ষ জয়ী হইত শত্রুর দেশ দখল করিয়া জনসাধারণের উপর নানা অত্যাচার করিত। কিন্তু রাজধানী হইতে দূরে বিপদের বিশেষ আশঙ্কা ছিল না। একালের যুদ্ধে কেহই শত্রুর সম্মুখীন হইতে চাহে না। দূরে আড়ালে থাকিয়া শত্রুসৈন্যের উপর গোলা, গুলি, বোমা ও নানা প্রকার বিষবাষ্প নিক্ষেপ করিয়া নূতন নূতন মৃত্যু যন্ত্রণা দিতে পারিলেই বাহাদুরির চূড়ান্ত হয়। শুধু তাহাই নহে,—সুখসুপ্ত সুদূর পল্লীঅঞ্চলে অতর্কিত বৈমানিক আক্রমণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে যত বেশী প্রাণহানি ঘটাইতে পারা যায় ততই গৌরবের কথা। সুতরাং যুদ্ধ বাধিলে দেশের কেহই নিরাপদ নয়,—হয় তো কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছাড়া।"

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মাসের পর মাস কাটিল, বৎসর ঘুরিল, আবার একটা বৎসর চলিয়া গেল। মাঝে মাঝে শত্রুর বিমানপোতের অতর্কিত নৈশ আক্রমণ এবং দুজন একজন করিয়া ভগ্ন-সৈনিকের গৃহ প্রত্যাগমন দেখিয়া বুঝা যায় যে যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে তাহা জানিবার উপায় নাই। সংবাদপত্রে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইতে থাকে তাহাতে মনে হয় এইবার বুঝি পরাজিত শত্রুপক্ষ পলাইয়া বিবরে লুকাইল। কিন্তু এমন সুনিশ্চিত খবরটা সংবাদপত্রে বাহির হইতে কেন যে এত বিলম্ব হইতে থাকে তাহা বোঝা দায়!

যাহা হউক অবশেষে এক সময়ে যুদ্ধটা নিতান্তই থামিয়া গেল। যুযুধান প্রত্যেক দেশে তুমুল বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল। পাঁচটি রাষ্ট্রের ধুরন্ধরকুল এইবার প্রকাশ্যে বাহির হইয়া মহা আড়ম্বরে একস্থানে সমবেত হইলেন; সন্ধির সর্ত নির্ধারণের জন্য। তারপর যথাসময়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু গুরু-গম্ভীর মুখবন্ধ, ভূমিকা, ভণিতা, ও দফাওয়ারি সর্ত, উপসর্ত এবং দীর্ঘ তপসিল-ফিরিস্তি-সমন্বিত

সেই বিরাট সন্ধিপত্র ঘাঁটিয়া এ তথ্যটুকু বাহির করা যায় না যে কে জিতিল, কে বা হারিল, এবং লাভ লোকসানই বা কাহার কি হইল। মোটের উপর কেবল ইহাই বোঝা যায় যে সারমর্মটুকু অতি সরল,—অকর্মা বৃদ্ধদের দাবার আড্ডায় সে কথা প্রায়ই শোনা যায়,—"শেষ পর্যন্ত এ বাজিটা চটেই গেল দেখছি ; যাক্, আর এক সময়ে বলা যা'বে'খন !"

সে যাহা হউক যুদ্ধ তো শেষ হইল।

ফ্রেডরিক দেশে ফিরিবার মাস তিন চার পরে মার্থার নিকট হইতে একখানি পত্র আসিয়াছিল। নিজের কুশল সংবাদাদি জানাইয়া ফ্রেডরিক যথাসময়ে তাহার উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর অনেকদিন কেহ কাহারও কোন খবর লয় নাই।

বৎসর খানেক পরে মার্থার আর একখানা পত্র আসিল। সে একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে, এই সময়ে ফ্রেডরিক একবার গিয়া তাহার সহিত দেখা করিলে সে বড় আনন্দিত হইবে। কিন্তু ফ্রেডরিকের পক্ষে এতটা পথ যাওয়া যদি কষ্টকর হয়, সে নিজেই আসিবার চেষ্টা করিবে।

তাহার উত্তরে ফ্রেডরিক জানাইল যে মার্থার পরামর্শ মতই সে নিজ গ্রামে স্কুল খুলিয়া বসিয়াছে। স্কুলটির দ্রুত উন্নতি হইতেছে, সে নিজেও ক্রমশঃ বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এ সকলেরই মূল মার্থা। সুতরাং তাহার সৎ-পরামর্শের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে যাওয়া ফ্রেডরিকেরই কর্তব্য। সুবিধা হইলেই সে যাইবে।

কিন্তু সে সুবিধা আর হইল না। তখন স্কুল লইয়া ফ্রেডরিক অত্যন্ত ব্যস্ত, অবসর মোটেই নাই। শেষে মার্জনা ভিক্ষা করিয়া সে একখানা পত্র লিখিল। নানাস্থানে ঘুরিয়া তিনমাস পরে পত্রখানি ফিরিয়া আসিল।

ফ্রেডরিকের অন্তরে একটা প্রবল আঘাত লাগিল। ভয় হইল, হয়তো বা মার্থার অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে ! কারণ শত্রুর বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষণ হইলে হাসপাতালও বাদ পড়ে না। কিন্তু বাস্তবিক কি যে ঘটিয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

মার্থা যে তাহার কতদূর শুভানুধ্যায়িনী,—হয়তো বা অনুরাগিণী,—এই চিন্তা ধীরে ধীরে ফ্রেডরিকের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। অথচ সেই মার্থাকে সে একবার চোখের দেখা পর্যন্ত দিতে পারিল না ; নিজের এ অপরাধ সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। তাহার পর অনেক-দিন কাটিল, মার্থার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তাহার স্মৃতি ফ্রেডরিকের হৃদয়ের এক প্রান্তে একটা মৃদু বেদনার আকারে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

যুদ্ধ মিটিবার মাস চারেক পরে হঠাৎ মার্থার একখানা পত্র পাইয়া ফ্রেডরিকের মনে হইল সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়াছে। মার্থা লিখিয়াছে যে সে গৃহে ফিরিয়াছে, কিন্তু এতদিন পত্র দিতে পারে নাই। তাহার কারণ ইতিমধ্যে তাহার মাতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তারপর নানা পারিবারিক গ্লানি ও অশান্তির ভিতর দিয়া দিন কাটিয়াছে। ফ্রেডরিকের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মার্থা শেষে লিখিয়াছে,—"মনের মত পত্নী লাভ করেছ কিনা ? যদি পেয়ে থাক, আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করবে। যদি এখনও তার দেখা না পেয়ে থাক, একবার এস, আমার প্রতিশ্রুতি ভুলিনি,—সন্ধান বলে দেব।"

অপ্রত্যাশিত আনন্দের উত্তেজনায় ফ্রেডরিক তৎক্ষণাৎ মার্থার পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইল। বেশী কিছু না লিখিয়া সে কেবল জানাইয়া দিল যে এবার সে নিশ্চয়ই মার্থার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

কিন্তু সে যে সাক্ষাৎ করিতে যাইবে সে কি কেবল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য, না প্রণয়-নিবেদনের জন্য ? ফ্রেডরিক কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিল না। মার্থাকে সে কোনদিন অনুরাগের দৃষ্টি দিয়া দেখে নাই। নিজের ব্যর্থ অভিশপ্ত জীবনের প্রতি তাহার এমন অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল যে তাহাতে নারীর প্রেমেরও যে কোন স্থান আছে এ বিশ্বাস সে হারাইয়া

বসিয়াছিল। কিন্তু মার্থার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মনে কিছুদিন ধরিয়া যে চিন্তাধারা বিসর্পিত হইতেছিল তাহার ফলে একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। এখন আবার তাহার একটা ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মার্থা তাহাকে বিলক্ষণ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে, যদি অসঙ্গত আচরণের জন্ম তাহার নিকটেও হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিতে হয়, তবে সে লজ্জা রাখিবার ঠাঁই হইবে না।

প্রবল দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া ফ্রেডরিক মার্থার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে লাগিল। তথাপি সমস্যার সমাধান হইল না। শেষে মায়ের কাছে গিয়া বলিতে হইল। তিনি সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "বড় ভুল করেছ ফ্রেডি, এ কথাটা আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। যাই হ'ক, আর দেরি করো না, এখনি গিয়ে তা'র সঙ্গে দেখা করে এস। তোমার মুখে যা শুনছি তা'তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে সে তোমাকে ভালবাসে। সে যদি তোমাকে চিনে থাকে, তোমার মূল্য বুঝে থাকে তবে সে একটা খাঁটি মানুষ। তা'কে পেলে তুমি সুখী হ'বে।"

ফ্রেডরিক আর বেশি বিলম্ব না করিয়া রওয়ানা হইয়া পড়িল।

কিন্তু মার্থার বাটীতে পৌছিয়া সে যাহা শুনিল তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। মার্থার পিতা অত্যন্ত ক্রোধ ও অভিমানের সহিত জানাইলেন যে, এক সপ্তাহ হইল হতভাগা মেয়েটা গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাহার বেশি খোঁজ খবরও করেন নাই,—পাছে কোন গুরুতর কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ পাইয়া তাঁহাদের পারিবারিক সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

বরং নিকটেই একটা চায়ের দোকানে বসিয়া ফ্রেডরিক যে বৃত্তান্ত শুনিতে পাইল, তাহা আরও বেশি চাঞ্চল্যকর হইলেও মনে হইল তাহাই সত্য। স্থানীয় কে একজন কাউণ্টের নেতৃত্বে সম্প্রতি সমারোহ করিয়া একটা বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে মার্থার উপরে রূপ-বিলাসী কাউণ্ট মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়, তিনি তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। এ ব্যাপারে মার্থার বিমাতার প্রথম হইতেই বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল, তাহার পিতাও ক্রমে এই হীন চক্রান্তে যোগদান করেন। তখন মার্থা পলাইয়া গিয়া এমন এক স্থানে আশ্রয় লইয়াছে, যেখান হইতে স্থানচ্যুত করা মহাপরাক্রান্ত কাউণ্ট মহাশয়েরও সাধ্যাতীত। কোন একটা কন্‌ভেণ্টে প্রবিষ্ট হইয়া মার্থা সংসার হইতে চির-নির্বাসন গ্রহণ করিয়াছে।

হৃদয়ে গভীর হতাশা বহন করিয়া ফ্রেডরিক ফিরিয়া আসিল। একটা দারুণ আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, যখন সে বুঝিল যে মার্থার এই জীবন্ত সমাধির মূল হেতু তাহারই নিষ্ঠুর অবহেলা! দীর্ঘকাল ফ্রেডরিকের প্রতীক্ষায় থাকিয়া যখন একটিবারও তাহার সাক্ষাৎ পাইল না, একটা আশার বাণী শুনিল না, অভিমানিনী বালিকা তখনই এই চরম পন্থা বাছিয়া লইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু ফ্রেডরিকের অপরাধই বা কতটুকু? সে যে নিজেকে মার্থার মত সর্বগুণান্বিতা তরুণীর সম্পূর্ণ অযোগ্য ভাবিয়া সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তো এই সর্বনাশা যুদ্ধের ফলেই। সে ভাবিল এই করাল যুদ্ধের কবলে পড়িয়া যাহারা মরিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহাদের ছাড়া আরও কত নরনারীর জীবন যে এমনি করিয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

ঠিক সেই সময়ে একটা যুদ্ধবিরোধী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একদল লোক আসিয়া গ্রামে গ্রামে শান্তিবাদের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন ফ্রেডরিকের স্কুলগৃহেও সভা করিয়া একটা বক্তৃতা হইল।

বক্তা সর্বনাশকর যুদ্ধের বিবিধ ফলাফল বিশদ ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র সহযোগে নানা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য, নিহত সৈনিকদের মৃতদেহের স্তূপ, প্রভৃতির বহু চিত্র দেখাইয়া সর্বশেষে যে চিত্র পর্দার উপর প্রতিফলিত হইল, তাহা দেখিয়া সমবেত নরনারীর অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। গুরুতর ভাবে আহত হইয়া যে হত

ভাগ্যদের দেহ অদ্ভুতরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অথবা মুখ-মণ্ডলের একাংশ নষ্ট হইয়া কদাকার ও ভীষণ দর্শন হইয়াছে, এইরূপ শত শত লোককে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দর্শকগণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গেল। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ আর্তনাদ করিয়া উঠিল, একটি স্ত্রীলোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ ছবি দেখানো বন্ধ করিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন, "এই যে চিত্র দেখিলেন, তাহা অলীক কল্পিত চিত্র নয়, এই হতভাগারা আপনাদের দেশের লোক, ইহাদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই, এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, যুদ্ধের ফলে জগতের কতখানি ক্ষতি হয়, এবং তাহা বুঝিয়া নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করুন।"

এই সময় হইতে ফ্রেডরিক প্রবল উৎসাহ লইয়া যুদ্ধ-বিরোধী মতবাদের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যতীত সুযোগমত নানা উপদেশ দিয়া স্থানীয় যুব-সম্প্রদায়ের উপর সে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মানুষ গড়ার ব্রত গ্রহণ করিয়া ফ্রেডরিক তাহার আন্তরিক সাধনার ফলে এক নির্ভীক, শান্তিপ্রিয়, সচ্চরিত্র যুবকের দল গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিবাদের মূল—আন্তর্জাতিক দ্বেষ, লোভ ও স্বার্থপরতা—সযত্নে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং আবার নবীন উদ্যমে ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক হইল। কারণ ভুলিয়া রাখা দাবার ছক কে যে কখন কি সূত্রে পাতিয়া বসিবে কে বলিতে পারে?

তাই আবার নূতন করিয়া স্বদেশপ্রেমের ধুয়া উঠিল, জনসাধারণের নিকট উদ্দীপনাপূর্ণ আহ্বান আসিল,—সৈন্যদলে নাম লিখাইবার জন্য। কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। তখন ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত আরম্ভ হইল। ফলে যুদ্ধ-বিরোধী দলের প্রধান প্রধান নেতা ও প্রচারকগণের নামের তালিকা প্রস্তুত হইল। ফ্রেডরিকের নামও তালিকাভুক্ত হইয়া প্রেরিত হইল।

ফ্রেডরিককে প্রথমটা একবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল, তারপর যুদ্ধে আহত ও বিকলাঙ্গ সৈনিক বলিয়া তাহার যে আট টাকা বারো আনা মাসিক পেন্সনের বরাদ্দ হইয়াছিল তাহা বাজেয়াপ্ত হইল। যখন তাহাতেও কোন ফল হইল না, বরং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গুরুতর রূপ ধারণ করিল, তখন অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে ফ্রেডরিককেও গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইল। আসামীদের বিরুদ্ধে অতি গুরু অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অপরাধের গুরুত্বের অনুপাতে বিচারে নানারূপ দণ্ডাদেশ দেওয়া হইল। কয়েক-জনের মৃত্যুদণ্ডও হইল। তাহার মধ্যে ফ্রেডরিক একজন।

শেষ পর্যন্ত ফ্রেডরিকের মৃত্যুদণ্ড যে বিনা আবেদনেই মকুব হইল, তাহা রাষ্ট্রনায়কগণের উদারতারই পরিচায়ক। দেশের লোকের জীবনের মূল্য তাঁহারা বুঝিয়াছেন। এতগুলি বহুমূল্য মানব জীবন বৃথা নষ্ট না করিয়া ভাবী শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করাই তাঁহারা সমীচীন বোধ করিলেন তাই আদেশ প্রচার হইল যে মৃত্যুদণ্ডাধীন যত বন্দী আছে—খুন-ডাকাতির আসামী পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষম তাহারা বিনা বেতনে সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত হইবে। আর যাহারা অক্ষম, তাহারা কারাগারের কারখানায় থাকিয়া যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণ করিবে। এই শেষোক্ত শ্রেণীতে ফ্রেডরিকেরও স্থান হইল।

ফ্রেডরিক এখন তাহার জননীর সহিত শেষ সাক্ষাতের অপেক্ষা করিতেছে। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে যে, পুত্রকে মানুষ করিয়াছেন বলিয়া তিনি যে গর্ব করিতেন তাহা কত বড় ভুল। আর সে নিজেও যে অধ্যাপনা, উপদেশ ও প্রচারের দ্বারা মানুষ গড়ার মত একটা মহৎ কার্য করিয়াছে ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহাও একটা প্রকাণ্ড আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন তাহাকে মৃত্যু-কাল পর্যন্ত স্বদেশের ভবিষ্যৎ শত্রুকুলের জন্য গোলা, বারুদ ও বিষ-বাষ্পের মশলা তৈয়ারি করিয়া তাহার এই মানুষ গড়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে!

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বঙ্কিমকাব্যে প্রেম

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ এম্‌-এ, বি-টি

মানব হৃদয়ের একটি চিরন্তন রহস্য প্রেম, তাই প্রেম কাব্যেরও চিরন্তন উৎস। পৃথিবীর প্রাচীনতম কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম সাহিত্যের রস জোগাইয়াছে প্রেম। ক্রৌঞ্চবধূর বিরহব্যথা প্রেমিক বাল্মীকির হৃদয় ব্যথিত করিয়া রামায়ণ মহাকাব্য সৃষ্টি করিল, আর সেই সুর সীতা ও রামের প্রেমের কাহিনীতে ধ্বনিত, ঝঙ্কৃত হইল। মহাকবি হোমারের কাব্যেও প্রেমের সুর বহুবার বাজিয়াছে। ভবভূতি ও কালিদাসও এই প্রেমের কবি। ভবভূতি, সীতারামের বিরহের গান গাহিয়া অমর হইয়াছেন, কালিদাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' নাটকের প্রাণ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম। শেক্সপীয়রের নাটকাবলীতে 'রোমিও জুলিয়েট্', 'ওথেলো-দেস্‌দিমোনা', 'মিরান্দা-ফার্দিনান্দ,' 'এন্থনি-ক্লিওপেট্রা' প্রেমের জয়গান গাহিয়াছে মাত্র। মিল্টনের মহাকাব্যেও আদি মানবদম্পতীর প্রেম মধুর রসসৃষ্টি করিয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণবকবিগণও প্রেমগীতিদ্বারা রসের বন্যায় বাংলাদেশকে প্লাবিত করিয়াছেন। 'নিমে দুধ দিয়া ঐছন কানুর প্রেম' বৈষ্ণব কবি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়া মর্ত্তে স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক যুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কথাসাহিত্যেরও মেরুদণ্ড এই প্রেম।

এ হেন প্রেমের স্বরূপ কি তাহা লইয়া বহু দার্শনিক, বহু মনস্তাত্ত্বিক বহু গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের ন্যায় প্রেমও 'বিশ্বাসে মিলয়ে তর্কে বহুদূর।' অবিশ্বাসীর তর্কজাল হইতে প্রেম বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। যদি প্রেমের প্রকৃত আস্বাদ কণামাত্র কেহ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি কবি। প্লেতো বলিবেন প্রেম একটী 'আইডিয়া' মাত্র। কিন্তু ইহা হইল এক জাতীয় চরম আদর্শবাদীর কথা। ইহাঁদের মনে ইহা বাস্তব জগতে নাই, অতএব প্রেম এক অমূল তরু বিশেষ। ফ্রয়েডের মত সাইকো-অ্যানালিষ্ট বলিবেন, প্রেম যৌনপিপাসা মাত্র, অতএব ইহা একটী দৈহিক প্রবৃত্তি। তিনি বলিবেন প্রেমের মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছুই নাই। ফ্রয়েড বহু নর-নারীর কলুষিত কামনার নগ্ন চিত্র দেখিয়া প্রেমের কুরূপ দেখিয়াছেন, স্বরূপ দেখিতে পান নাই। কিন্তু যে কবি দেহ ও আত্মার দুইয়ের মধ্যে সত্যের সুন্দর রূপ দেখিয়াছেন তিনি ফ্রয়েডের মতে সায় দিতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই ধরণের একজন কবি।

বঙ্কিমকাব্যের প্রধান রস প্রেম। সুতরাং সেই রস উপভোগ করিতে হইলে বুঝিতে হইবে তিনি প্রেম বলিতে কি বুঝিতেন। কেহ কেহ বলিবেন তাঁহার উপন্যাসে যে প্রেমের কাহিনী আছে তাহা অত্যন্ত মামুলি ধরণের। মামুলি কাব্যপ্রথানুসারে দেখাইয়াছেন 'The course of true love never did run smooth' অর্থাৎ প্রেমের পথ কখনও বাধাহীন নহে। আর তিনি দেখাইয়াছেন স্ত্রী জাতির প্রেমে পুরুষ পাগল হয়। তাঁহারা বলিবেন, ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। এই শ্রেণীর সমালোচকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা আরো একটু অধিক চিন্তাশীল তাঁহারা বলিবেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমকে অতি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের হয়ত যুক্তি হইবে যে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির প্রেম অধিকাংশস্থলে ব্যর্থ হইয়াছে। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বঙ্কিমের ধারণা ছিল প্রকৃত প্রেম বলিয়া জগতে কিছু নাই, যদি কিছু থাকে রূপতৃষ্ণা। ওসমান, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নবকুমার, অমরনাথ এমন কি শাহানশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ প্রেমি-

কার দলে দেখিতে পাই আয়েষা, রোহিণী, শৈবলিনী, মতিবিবি বা পদ্মাবতী, লবঙ্গলতা, কুন্দ, দরিয়া প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে সকলে না হইলেও অনেকে নিষ্কলুষচরিত্র, কিন্তু তবুও তাহাদের অনেকেই তাহাদের প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, কিংবা মিলিত হইয়াও প্রতিদান পায় নাই। কখন কখন এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিহেতু কবি প্রেমের যথার্থ মূল্য নিরূপন করিতে পারেন নাই। কেহ হয়ত বলিবেন কাব্যের উপেক্ষিতা মাঝে মাঝে থাকিয়া যায়। আবার কেহ কেহ অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া বঙ্কিমের দোষস্খালনের চেষ্টা করিবেন।

বঙ্কিম সত্যই বিশ্বাস করিতেন প্রকৃত প্রেম ব্যর্থ হয় না। তাঁহার কবিজীবনে এই সত্যের আভাস সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। প্রেমের যে একটী দিব্য রূপ আছে তাহা তিনি ফুটাইবার চেষ্টা তাঁহার কাব্যে করিয়াছেন, তবে কোথাও যে তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই তাহা নহে। অন্ততঃ তাঁহার উদ্দেশ্য যে সর্ব্বত্রই এক ছিল তাহা বুঝিতে পারি। তাঁহার কাব্যে প্রেম সম্বন্ধে যে ভুল অনেকে করিয়া থাকেন তাহার কারণ তিনি বিভিন্ন অর্থে 'প্রেম' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। 'রাজসিংহে' যেখানে তিনি বলিয়াছেন, 'মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।' (৭ম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)। এইখানে প্রেমের অর্থ নরনারীর যৌন আকর্ষণ বা sex-attraction ; এই অর্থে ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন 'প্রেমে পড়া।' ইহা অপেক্ষা আরও একটু উচ্চ অর্থে তিনি 'কপালকুণ্ডলায়' 'প্রণয়' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন, 'সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।' এই প্রণয়ের মধ্যেও যে বিধাতার মঙ্গল হস্ত আছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, 'প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।' দাম্পত্যপ্রেমের মধ্যে এই ভাবটী তিনি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অতি সুন্দরভাবে বিষবৃক্ষের শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণি চরিত্রে। উচ্চতম প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন অল্প কয়েকটী চরিত্রে, তাহার কারণ সে প্রেম 'লাখে ন মিলল এক।' সে প্রেমের কিছু আস্বাদ পাইয়াছে আয়েষা, প্রতাপ ও অমরনাথ। ঔরঙ্গজেবের মত ব্যক্তির প্রাণেও সেই প্রেম ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। 'ভালবাসার অত্যাচার' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের মহত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

'স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা ; যে প্রণয়ী প্রণয়-পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগ ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।···অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্মনাম প্রাপ্ত হয়।'

বঙ্কিম প্রেমের কোন স্তবকে ঘৃণা করেন নাই, বরং তাঁহার নায়কনায়িকা চরিত্রে দেখাইয়াছেন প্রেমের প্রথম উৎপত্তি অনেকস্থলেই রূপজমোহ হইতে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক ও অনিন্দনীয়। দৈহিক রূপও যে উপেক্ষার বিষয় নহে, তাহা তাঁহার বক্তব্য ছিল। দেহবাদী না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন 'মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদের দোষেই।' আদিরস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'প্রকৃত আদিরস জগতের একটী দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য।...কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে ; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে।'

'বিষবৃক্ষে'র হরদেব ঘোষালের পত্রে বঙ্কিমের প্রেম সম্বন্ধে একটী সুস্পষ্ট মতবাদ দেখিতে পাই। হরদেব নগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, 'মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্য রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।···প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট হয় এবং

সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়, সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন, আমি ইহাকে ভালবাসা বলি।···গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এইজন্য সে প্রণয় হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কিনা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকাল-স্থায়ী প্রণয় বলিয়া মনে হয়।'

হরদেব ঘোষালের পত্র হইতে যে প্রেমের আদর্শ পাই, তাহা দেহকে অস্বীকার না করিয়া এক দেহাতীত লোকের সন্ধান দেয়। ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিদের আদর্শ। ভারতের কবি দেখিয়াছেন যে প্রেম দেহসর্ব্বস্ব, যে প্রেম সমাজকে বিস্মৃত হয়, সে প্রেম চিরকাল দুর্ব্বাসার অভিশাপে ব্যর্থ। যে প্রেম ত্যাগের ভিত্তিতে স্থাপিত সেই প্রেমই সার্থক। বঙ্কিমচন্দ্র ভোগ সর্ব্বস্ব প্রেমকে উচ্চ আসন কোথাও দেন নাই, বরং তাহার ব্যর্থতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখভোগের শিক্ষার মধ্য দিয়া তিনি প্রেমের মলিনত্ব দূর করিয়াছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম যেমন বহু দুঃখ ও বিচ্ছেদের পর সার্থক হইয়াছিল—নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর প্রেমও সেইরূপ দুঃখের আগুনে পুড়িয়া খাঁটী হইয়াছিল। রূপজমোহ হইতে চন্দ্রশেখরের প্রেমের উৎপত্তি, কিন্তু সে প্রেম সার্থক হইল যখন রামানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া যখন সে পরহিতব্রত গ্রহণ করিল। এক কথায় বঙ্কিমকাব্যে প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে আত্মসংযমের অভাবে ও ভোগে এবং সার্থক হইয়াছে সংযমে ও ত্যাগে।

প্রথমেই ধরা যাউক বঙ্কিমের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র কথা। এই উপন্যাসের ওসমানের আয়েষার প্রতি প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই, কারণ ঔদার্য্য, বীরত্ব, মাধুর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইলেও ওসমানের প্রেমের মধ্যে ত্যাগশীলতা বা আত্ম-বিসর্জ্জনাকাঙ্ক্ষা নাই, ক্ষমাগুণ ত একেবারেই নাই। রূপজমোহ হইতে সে দুর্দ্দাম তথাকথিত প্রেমের উৎপত্তি। পৃথিবীতে যে এরূপ প্রেম সার্থক হয় না তাহা নহে, কিন্তু না হইলে বলিবার কিছু থাকে না। এই রূপমোহের ফলে ওসমান আত্মসংযম হারাইয়াছে, ঈর্ষার বহ্নিতে পুড়িয়াছে। এ প্রেম ওথেলোর মত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করে। আয়েষার প্রেম কিন্তু স্বর্গীয়। ওসমানের পার্শ্বে আয়েষাকে তাই দেবী বলিয়া মনে হয়। জীবনে একবার ভিন্ন দুইবার আয়েষা আত্মবিস্মৃত হয় নাই। জগৎসিংহের প্রতি তাঁহার প্রেম রূপজ মোহ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণতি বড় মহৎ, বড় করুণ। জগৎসিংহের ও তিলোত্তমার সুখের জন্ম এমন আত্মবিলোপ শুধু বাস্তবজগতে কেন কাব্যজগতেও দুর্লভ। জগৎসিংহ সত্যই বলিয়াছিলেন, 'আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন' আয়েষার প্রেম হইতে বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন, পার্থিব মিলনেই প্রেমের এক-মাত্র সার্থকতা নহে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কোন চরিত্রেরই প্রেম উচ্চ আদর্শের নহে। কপালকুণ্ডলা নায়িকা হইলেও তাহার হৃদয় প্রেমশূন্য। যে কোন কারণেই হউক তাহার মধ্যে প্রেমের জন্ম হয় নাই। এরূপ চরিত্র সৃষ্টি করা বঙ্কিমের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল কিনা তাহা আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। নবকুমারের প্রেম নিম্নতম স্তরের নহে, কিন্তু উচ্চ আদর্শেরও নহে। নবকুমারের প্রেম দাম্পত্যপ্রেমের অভিব্যক্তিমাত্র। মতিবিবির প্রেমের যে কোন মহত্ত্ব নাই তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। প্রথমে মনে হয় অনুতপ্ত মতির প্রেমে কোন কলঙ্ক নাই, কিন্তু যখনই দেখি কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে নবকুমারকে পাইবার জন্য উন্মত্ত তখনই দেখিতে পাই মতির অন্তরের কালিমা। মতি নবকুমারকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল আপনার রূপ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া। দেবীচৌধুরাণী ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। তাই মতির প্রেম ব্যর্থ হইয়াছিল, দেবীর হয় নাই।

বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীর প্রেম প্রায় স্ফটিকস্বচ্ছ। প্রেমা-

স্পদের জন্য তাহার আত্মত্যাগ আয়েষার আত্মবিসর্জ্জনের সহিত তুলনীয়। তবে সূর্য্যমুখী দেবী নহে, রক্তমাংসে গঠিতা নারী, তাই সে অভিমানবহ্নি হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে নাই। তবুও সে আয়েষার ভগিনী বলিয়া সগর্ব্বে পরিচয় দিতে পারে। সূর্য্যমুখীর মঙ্গলময় প্রেম নগেন্দ্রের সোনার সংসারকে শেষ পর্য্যন্ত ছারখার হইতে দেয় নাই। কুন্দের প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে, হইবারই ত কথা, কারণ সে প্রেমের বহ্নিতে সংসারে অশান্তি আসিয়াছে। সেই বহ্নিতে নগেন্দ্র যে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহার কারণ সূর্য্যমুখী। নগেন্দ্র ও কুন্দ পরস্পরের রূপবহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিয়াছে, নগেন্দ্র কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু কুন্দকে মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি বৃহৎ উপন্যাস। ইহার তিনটী চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; যথা, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী। ইহাদের প্রেমের ঘাত-সংঘাতেই উপন্যাসের রসসৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন চন্দ্রশেখরের প্রেমের কিছুই বিশেষত্ব নাই। তিনি জ্ঞানী ও গুণী হইলেও আদর্শ প্রেমিক নহেন, কারণ তাঁহার শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার প্রেম রূপতৃষ্ণা ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনি দারুণ রূপমোহের বশীভূত, এবং নিজেও তাহা জানেন। মুর্শিদাবাদ হইতে মীরকাসিমের ভাগ্যগণনা করিয়া বেদগ্রামে ফিরিবার পথে বলিতেছেন, 'আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।' হরদেব ঘোষালের পত্রের এইখানে মনে পড়ে। তিনিও নগেন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, 'এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কিনা—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া মনে হয়।' শৈবলিনীর প্রেমে তাই চন্দ্রশেখরের জ্ঞানব্রত ভঙ্গ হইল, অমূল্য প্রাণাধিক শাস্ত্রগ্রন্থরাজি অনলে ভস্মীভূত হইল, তিনি গৃহত্যাগী হইলেন। রামানন্দ স্বামীর পুণ্যস্পর্শ না লাভ করিলে তাঁহার অদৃষ্টে শেষ পর্য্যন্ত কি হইত কে জানে!

শৈবলিনীর প্রেমেরও মূল রূপমোহ। যৌবনের প্রথমে এরূপ রূপোন্মাদ অনেকেরই হইয়া থাকে, শৈবলিনীরও তাহাই হইয়াছিল। সে প্রেমে নিজের বা প্রেমাস্পদের কোন মঙ্গল সে করিতে পারে নাই। এক হিসাবে তাহার প্রেম রূপোন্মাদে আরম্ভ এবং তাহাতেই শেষ। কবি শুধু করুণাবশতই যোগবলের সাহায্য লইয়া তাহাকে রোহিণীর পরিণতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শৈবলিনী যদি লবঙ্গলতার শক্তি পাইত তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের সংসার ছারখার হইত।

প্রতাপ বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম। আর কোন চরিত্রে প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিবার এত যত্ন তিনি করেন নাই। প্রেমাস্পদের মঙ্গলের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রতাপ আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহার প্রেমের লক্ষ্য। যাহারা প্রীতির পাত্র, যাহারা তাহার পরোপকারী তাহাদের সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকিতে সে চাহে নাই, তাই সে যুদ্ধে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া প্রেমের দধীচি হইল। প্রতাপের প্রেম যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা বলিবার জন্য রামানন্দ স্বামীকে দিয়া প্রতাপকে আশীর্ব্বাদপূত করিয়াছেন। রামানন্দ স্বামীর বেশে বঙ্কিমই যেন প্রতাপকে বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন।'

বঙ্কিম চিত্রশালায় প্রতাপের পার্শ্বেই স্থান পাইবার অধিকারী অমরনাথ। প্রতাপের ন্যায় কৈশোরে অমরনাথের লবঙ্গলতা-প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এবং বোধ হয় বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে বলিয়া লবঙ্গলতার সহিত তাহার মিলন হয় নাই। তবে অমরনাথের সৌভাগ্য যে সে লবঙ্গলতার মত নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিল। তাই অমরনাথের প্রেম ব্যর্থ হয় নাই। রূপজমোহে অমরনাথের প্রেমের উৎপত্তি হইলেও দুঃখের ভিতর দিয়া, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমের উজ্জ্বল পবিত্র আলোক জ্বলিয়াছিল। সে প্রেম যে কত খাঁটি হইয়াছিল, লবঙ্গলতাও প্রথম বুঝিতে পারে নাই, যখন সে বুঝিল তখন সে মুগ্ধ, চমৎকৃত। এই প্রেমের

বলে সে রজনী ও তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য অত সহজে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। লবঙ্গলতাকে না পাইয়া অমরনাথের প্রেম সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং এই প্রেমই বঙ্কিমের মতে শ্রেষ্ঠ প্রেম। চিত্তসংযম, পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনই এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য। লবঙ্গলতার প্রেমও কতকটা এই জাতীয়। অমরনাথকে সে সত্যিই ভালবাসিত, তবে সে ভালবাসার মধ্যে পার্থিব মিলনের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। অমরনাথের মঙ্গলের জন্য, সংসারের মঙ্গলের জন্য সে কথা প্রাণ থাকিতে সে প্রকাশ করে নাই। তাহার ইঙ্গিত সে শুধু শেষ বিদায়ের দিন অমরনাথকে একটু দিয়াছিল। লবঙ্গলতার আত্মবিসর্জ্জন তাই একদিক দিয়া অমরনাথের অপেক্ষা কম নহে। সত্যই অমরনাথ ও লবঙ্গলতা বঙ্কিম কাব্য-সাগরের অপূর্ব্ব রত্নযুগল

আর একটী চরিত্রের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব সেটি হইতেছে দুর্দ্ধর্ষ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। বঙ্কিমচন্দ্র কেমন করিয়া এই পাষাণের মধ্যে প্রেমের মত কোমল বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা পাঠকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। শত শত মোগল সুন্দরী পরিবেষ্টিত হইয়াও কেন যে নির্ম্মলকুমারীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। মদনদেবের কারসাজি বলিলেই সে বিস্ময়ের সমস্যার সমাধান হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভালবাসার মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা ছিল এবং এমন একটা নিষ্কলঙ্ক ভাব ছিল যাহা স্বতঃই পাঠকের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। নির্ম্মলকুমারীকে বিদায় দিবার সময় পাষাণ এমনই দ্রবীভূত হইয়াছিল যে ঔরঙ্গজেব সামান্য একজন স্ত্রীলোককে বলিয়া ফেলিলেন, 'এ পৃথিবীতে তোমাকে ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয় তাহা করিব না।' এ উক্তি প্রকৃত সম্রাটের উপযুক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় তবুও কথা উঠে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদ্বেষী। ঔরঙ্গজেব চরিত্রের এই কোমলতা সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 'ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখনও পাষাণও হয় না।'

এখন দেখা যাইতেছে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টিতে প্রেমের বিভিন্ন রূপ ধরা পড়িয়াছিল। সাধারণ দেহসর্ব্বস্ব প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেম বা Platonic love পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রেমের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। তবে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মনুষ্যজীবনে প্রেম একেবারেই উচ্চতম স্তরে আরম্ভ হয় না, সাধারণতঃ নিম্নস্তর হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়। রূপজ আকর্ষণ হইতে অনেক স্থলেই প্রেমের জন্ম হয়, এবং তাহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত কেহ কেহ উচ্চতম আদর্শে উপনীত হয় অর্থাৎ দেহকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রেম আরম্ভ হয় তাহা যে দেহাতীত মৃত্যুঞ্জয় প্রেমে পরিণত হইবে না এমন কথা নাই। তবে সকলের ভাগ্যে শ্রেষ্ঠ পরিণতি ঘটে না ইহাই তাঁহার বক্তব্য। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তাই প্রেম ও ধর্ম্মের পরিণতি একই

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

ভুল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী এম্.এ

প্রত্যহের জীবনের উপেক্ষিত দুঃখ দৈন্য হতে,
চলিবার পথে
যেই গ্লানি জমে উঠে পলে পলে হিয়ায় হিয়ায়,
সুখহীন প্রীতিহীন দুর্ব্বল মানব ভাবে, হায়,
ক্ষণিকের আনন্দের এতটুকু হাসি
ঢেকে দেবে সেই গ্লানি রাশি।
নিখিল বিশ্বের ব্যথা তাই নিত্য
মধু ছন্দে গেঁথে লয় কবি,
বেদনার ছবি
সুচারু তুলিকা পাতে রূপশিল্পি রাখিছে আঁকিয়া
মনের মাধুরী মিশাইয়া।

ফোটে ফুল মধুগন্ধ, আকাশে চন্দ্রমা উঠে হেসে
সন্ধ্যা নামে—স্নিগ্ধ-কালো নীলের জোয়ার-দিন শেষে
তারপর রহে চাহি' অপলক চোখে
ছায়াপথ চলে গেছে নিরুদ্দেশ যেই রূপলোকে,
সেথা বুঝি একখানি প্রীতির-অঞ্জলি-ভরা হিয়া
চির রাত্রি রয়েছে জাগিয়া
তাহারি লাগিয়া।

স্বপ্ন, স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন সব!
সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানব
আপনারে সুখ-স্বপ্নে চাহে যেন রাখিবারে ঢাকি;
হায়, হায়, জীবনের সবি তা'র ফাঁকি!
দুঃখভারে ক্ষীয়মান অবসন্ন হিয়া
একখানি স্বপ্নসূত্রে পারে কি সে রাখিতে বাঁধিয়া?

ওই-চাঁদ ডুবে' যায় অমার আঁধারে
দিবসের পারে
ধরণীর স্বর্ণছবি ধীরে ধীরে হয়ে আসে ম্লান,
ঝরে পড়ে ফুলদল, থেমে যায় জীবনের গান।
কেবল বিপুল শূন্য ভার'
সুর-মূর্চ্ছনার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া যায় মরে'
অশরীরি আত্মাসম মানবের অতৃপ্ত কামনা—
অন্তহীন হৃদয়ের অনন্ত বেদনা;
স্বপন গলিয়া যায়—বাস্তবের দাহনে আকুল,
তবু, তবু প্রিয় এই ভুল।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় সমুচ্চয়বাদ

শ্রীবরদাচরণ সেন

গীতা সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার পূর্ব্বেও হিন্দুশাস্ত্রে সমুচ্চয়বাদের কথা আছে। ঈশোপনিষদ শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার অন্তর্গত। এই ঈশোপনিষদে সমুচ্চয়বাদের বিশেষ আলোচনা আছে। এই আলোচনার কথা প্রথম উল্লেখ করিয়া পরে গীতায় সমুচ্চয়বাদের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।—

ঈশোপনিষদে আছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উবিদ্যায়াং রতাঃ॥

*　　*　　*　　*

বিদ্যাঞ্চা বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

*　　*　　*　　*

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আবার যাহারা বিদ্যার উপাসনা করেন তাহারা আরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে একই সময়ে জানেন, অর্থাৎ একটি ছাড়িয়া আর একটি লইয়া নহে—উভয়কে লইয়া জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। অবিদ্যাকে ধরা যাক সংসার, আর বিদ্যাকে ধরা যাক ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি। যিনি সংসার লইয়াই আছেন ঈশ্বরের ধার ধারেন না, তিনি নিশ্চয়ই (অন্ধঃ তমঃ) ঘোর অন্ধকারে যাইবেন, তাঁহার সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আশা নাই। আবার যিনি (ভূয়ঃ) ঈশ্বর বা ব্রহ্ম লইয়াই শুধু আছেন সংসারের বা জীবজগতের ধার ধারেন না, জীবকে তেমন ঘৃণার চক্ষে না দেখিলেও তেমন ভালবাসিতে পারেন না, জগতের বা জাগতিক পদার্থ বা ঘটনা পরম্পরা সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে অগ্রাহ্য করেন, তিনি (ততঃ অন্ধঃ তমঃ) তাহা হইতে আরও গাঢ় অন্ধকারে যাইবেন।—যিনি ব্রহ্ম ও জীবজগৎ, ঈশ্বর ও সংসার, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের প্রতি, কাহাকেও বাদ না দিয়া, ভালবাসা বা প্রেম রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত পুরুষ, মৃত্যু পার হইয়া অ-মর হইয়াছেন।

ঈশোপনিষদকার বিদ্যার উপাসককে অবিদ্যার উপাসক হইতে আরও গাঢ় অন্ধকারে (ততঃ অন্ধঃ তমঃ) নিক্ষেপ করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হয়। ইহার উত্তর এই মনে হয় যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসক উভয়েই ঈশোপনিষদকারের মতে প্রেয়ের পথে আছেন, শ্রেয়ের পথে নহে। কিন্তু বিদ্যার উপাসক তথাকথিত ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া এবং জীবজগৎকে উপেক্ষা করিয়া আত্মাভিমানী হইয়া পড়িয়াছেন। কতগুলি শুষ্ক ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আত্মগোপন করিতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন এবং অপরের নিকট এইরূপ আত্মগোপন করিতে করিতে নিজের কাছেও নিজে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা যে বড় ভয়ানক কথা!—আমি যাহা নই নিজকে তাহাই বলিয়া মনে করা, প্রেয়ের পথে থাকিয়া শ্রেয়ের পথে আছি বলিয়া মনে করা, পণ্ডিত না হইয়া পণ্ডিতের মত নিজকে মনে করা, আগাগোড়া জীবনটাকে একটা বড় রকমের গোঁজামিল দিয়া চালান—এ যে বড় ভীষণ রোগ! কিন্তু যিনি অবিদ্যার উপাসক, সংসারাসক্ত, তাহার মনে ঐ রকম আত্মাভিমান সাধারণতঃ স্থান পায় না। তিনি জানেন ও বোঝেন যে সংসারের বা অবিদ্যার উপাসনা তাঁহাকে করিতেই হইবে—ঈশ্বরোপাসনায় তিনি এ জন্মে অধিকারী নহেন—তিনি তাই অনধিকার চর্চ্চা করেন না। সুতরাং তাঁহার অজ্ঞানাবস্থা হইলেও বিদ্যার উপাসকের তুলনায় তাঁহার অপরাধ কম।

ঈশোপনিষদ্ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমুচ্চয়-বাদ এইরূপ দুটি জিনিষ, একটির নাম বিশেষ বা খণ্ড, আর একটি নাম ভূমা, সর্ব্ব বা অখণ্ড। এই দুইটির মধ্যে যে সম্বন্ধ সমুচ্চয়বাদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। বিশেষের মধ্যে সর্ব্ব আছেন, এবং সর্ব্বের মধ্যে বিশেষ আছেন—খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড আছেন, আবার অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড আছেন,—অ-খণ্ড জ্ঞান দৃষ্টিতে ইহাই দেখিতে হইবে। ইহাই প্রধান সাধনা। বিষয়টি জটিল সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" হইতে একটি উদাহরণ লইয়া বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

ভবানীঠাকুরের প্রেরিত নিশিঠাকুরাণী ও প্রফুল্লের মধ্যে এই প্রথম কথোপকথন হইতেছে:—

নি। আমি বামুনের মেয়ে বটে কিন্তু বাম্‌নি নই।

প্র। সেকি? বিবাহ হয় নাই?

নি। না। ভবানীঠাকুর আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন আমি তাঁহার পালিতা কন্যা। তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। এক প্রকার কি?

নি। রূপ, যৌবন, প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম? শ্রীকৃষ্ণই তোমার স্বামী?

নি হাঁ—তিনিই আমার স্বামী।

প্র কখন স্বামী দেখ নাই, তাই ও কথা বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।

মনে রাখিতে হইবে প্রফুল্ল তখন পর্য্যন্ত নিরক্ষর আর নিশি ভবানীঠাকুরের চেলা। প্রফুল্ল এক দিনের জন্য হইলেও স্বামীর স্বাদ বা আদর পাইয়াছিল বলিয়া সে তাহা ভুলিতে পারে নাই—তাহার স্বামীই সর্ব্বস্ব, সে স্বামীকে ভালবাসে। স্বামী না থাকিলে সে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারিত—যেমন নিশি পারিয়াছে বলিয়া বলে। সুতরাং ঈশোপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে প্রফুল্ল অবিদ্যার উপাসনা করে—সে অন্ধকারে যাইবে। আর নিশিঠাকুরাণী বলিতেছেন, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসি, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী, আমি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে যাইব কেন? মানুষের মধ্যে একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বা তাহার আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসিব কেন? গণ্ডীর মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে যাইব কেন? ঈশোপনিষদের ভাষায় নিশিঠাকুরাণী বিদ্যার উপাসনা করেন, তিনি আরও বেশী অন্ধকারে যাইবেন। সমুচ্চয়বাদী এই উভয়কেই এক সঙ্গে লইবেন, একটি ছাড়িয়া আর একটি লইলে তাঁহার চলিবে না, তাই তিনি বলিবেন স্বামীকে ভালবাসা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার সোপান। স্বামীকে ভালবাসা আমার তখনই সফল ও সার্থক হয়, যখন এই স্বামীর মধ্যে আমি অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত যৌবন, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই। আবার শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা আমার তখনই কেবল সফল ও সত্য হয়, যখন এই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসাতে আমার স্বামী আমার ভালবাসার পাত্র হয়। খণ্ড বা ব্যক্তি বিশেষকে অবহেলা করিয়া যিনি অ-খণ্ড বা সর্ব্বকে পাইতে চাহেন তিনি কল্পনাকে ধরিয়া আছেন। আবার যিনি অখণ্ড বা সর্ব্বকে অবহেলা করিয়া খণ্ড বা বিশেষ কোন পরিমিত অ-স্থায়ী বস্তুকে পাইবার জন্য ছুটিয়াছেন, তিনিও কল্পনাকে জড়াইয়া রহিয়াছেন। সত্য বা খাঁটি ভালবাসা, এই দুইয়ের নিকট হইতে অতি দূরে রহিয়াছে। এই দুইটি ভাবের সমন্বয়ের নামই সমুচ্চয়বাদ। প্রফুল্ল যখন "নূতন বউ" হইলেন, তখনকার কথা ধরা যাক। প্রফুল্ল বা দেবী-চৌধুরাণী "নূতন বউ" হইয়া সংসারে আসিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন, তাঁর কোন কামনা ছিল না কেবল কাজ খুঁজিতেন। "কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা, কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা।" নূতন বউ নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণা, তাই সে খাঁটি সন্ন্যাসিনী। নূতন বউ শ্বশুর, শাশুড়ী, সাগর, নয়নতারা, দাসদাসী পাড়া প্রতিবেশী সকলকে সুখী করিল। নূতন বউয়ের যাহা কিছু বিবাদ সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। নূতন বউ বলিত "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি-নয়ান বউয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায়না কেন?"

ব্রজেশ্বর তাহা শুনিত না, ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। ব্রজেশ্বর ঈশোপনিষদের অবিদ্যার উপাসক।

নূতনবউ বলিত "তুমি আমায় যেমন ভালবাস উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, সংসারের সকলকে তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার যে ভালবাসা তাহা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও যে আমি।"

ইহাই সমুচ্চয়বাদ ও সমুচ্চয়বাদীর প্রাণের কথা। সমুচ্চয়বাদ যে ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত তাহাতে নিজের জন্য দীর্ঘশ্বাস নাই, তাহার চোখে কেবলই আলোক, কেবলই আনন্দ, পাপ কলঙ্কের অন্ধকার বা দোষ, ত্রুটি, সে কল্পনাও করিতে পারে না।—যে ভালবাসায় সন্তোষ-বিরক্তি, আদর-অনাদর, উত্থান-পতন, ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান আছে তাহা স্বার্থ-প্রণোদিত—তাহা খাঁটি ভালবাসা নহে, তাহা দুর্ব্বল হৃদয়ের স্বার্থপরতামাত্র। ভালবাসার অর্থ স্বার্থত্যাগ করিবার শক্তি, নিজেকে পরের নিকট বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, পাপী-তাপী, সুখী-দুঃখী, সকলকে সমভাবে অবিচারে আকর্ষণ এবং আলিঙ্গন করিবার আন্তরিক টান।

ভগবান বুদ্ধদেব জগদুদ্ধারের জন্য গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"I loved thee most,
Because I loved so well all living souls."
(Edwin Arnold's Light of Asia.)

"আমি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে এত ভাল বাসিয়াছি বলিয়াই তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছি।"

"Thy tender lips, dear sleeper, summon me
To that which saves the earth but sunders us."

"হে নিদ্রাভিভূত প্রিয়তমে, তোমার সুকোমল অধর আমাকে সেই কাজের জন্য যাইতে আহ্বান করিতেছে যে কাজে পৃথিবীর উপকার হইবে, কিন্তু তোমাতে ও আমাতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে—অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা দ্বারা প্ররোচিত এবং উৎসাহিত হইয়াই আমি এই পাপক্লিষ্ট দুঃখ জর্জ্জরিত পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিতে যাইতেছি। যদি তাহা না করিয়া, তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া আমি গৃহে থাকিয়া যাইতাম তবে তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা খাঁটি বা সম্পূর্ণ হইত না, স্বার্থপরতা ও মোহাচ্ছন্নতার নামান্তরমাত্র হইত।"

ছন্দক যখন বলিলেন, "তুমি ত জগতের প্রেমে মত্ত হইয়াছ। কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনদের মনে যে দারুণ কষ্ট হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাহাদের সকলকে কাঁদাইয়া যখন তুমি যাইতে প্রস্তুত তখন জগতের জন্য তোমার প্রেম থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের জন্য তোমার প্রেম কোথায়?" সিদ্ধার্থ তখন উত্তর করিলেন।

"Friend, that love is false
Which clings to love for selfish sweets of love;
But I, who love these more than joys of mine—
Yea, more than joy of theirs—depart to save
Them and all flesh, if utmost love avail".

"হে বন্ধু, সে প্রেম প্রেমই নহে, যে প্রেম নিজ সুখলালসা তৃপ্তির জন্য প্রেমাস্পদকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আমি কিন্তু আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে আমার নিজের সুখভোগ অপেক্ষা, এমন কি তাহাদেরও সুখ ভোগ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। তাই যদি প্রেমের চরম সাধন দ্বারা তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও তাহাদের প্রকৃত সুখের জন্য অর্থাৎ সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেও ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য চলিলাম।"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুও যখন সন্ন্যাসী হইয়া জীবের মঙ্গল সাধনার্থ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন তাঁহার মা ও স্ত্রীকে এবং বন্ধু বান্ধবকে ঠিক এই সকল কথায় না হইলেও এই জাতীয় সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপুরুষ বা অবতারেরা জীবের দুঃখ তাপের মূল বিনাশ করিয়া উপকার সাধন করেন, সাংসারিক সুখ ভোগ বা উন্নতি সাধন দ্বারা উপকার করেন না। এই যে বিশ্বজনীন প্রেম,—যে প্রেম জাতি বর্ণ, নির্ব্বিশেষে "দু-বাহু পসারি" জীবজগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, সমুচ্চয়বাদই তাহার শিক্ষার সোপান। বঙ্কিমচন্দ্রের "ওরাও যে আমি," রবীন্দ্রনাথের "তোমাকে জানিলে নাহি কেহ পর", এই ভাবই সমুচ্চয়-বাদের প্রাণ। ইহাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের "অ-দ্বয় জ্ঞান-

তত্ত্ব।” অ-দ্বয় (দুই না এক) জ্ঞানই প্রধান তত্ত্ব। ইহার ধারণা না হইলে সমুচ্চয়বাদে পৌঁছান যাইবে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন “এক জ্ঞান জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান।” শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা বলেন “দু (দুই) নিয়া থাকাই দুনিয়ায় থাকা অর্থাৎ সংসারে থাকা।” এই যে সর্ব্বমত-সমঞ্জস একত্ব জ্ঞান ইহাই সমুচ্চয়বাদের ভিত্তি।

ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান সৎ-চিৎ-আনন্দ ক্ষর-অক্ষর পুরুষোত্তম, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না, প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী-নূতনবউ,—এই যে তিন তিনটি ভাব ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিলে চলিবে না— একেরই এই তিন ভাব, এক-ই এই তিন ভাবে প্রকাশিত। শুধু ব্রহ্মে বা ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মিকভাব বা ভগবদ্‌ ভাব নাই, শুধু আত্মিকভাবে বা যোগে বা আত্মার সহিত পরমাত্মার রমণে ব্রহ্মভাব বা ভগবান ভাব নাই, কিন্তু শুধু ভগবানে ব্রহ্ম ভাব ও আত্মিক ভাব উভয়ই বর্ত্তমান ত আছেই, তা ছাড়া আরও কিছু আছে যাহা ব্রহ্মভাবে কি আত্মিকভাবে নাই।—ভগবানে ব্রহ্ম ও আত্মার সমন্বয়। সেইরূপ সৎ ও চিৎ উভয় ভাবই আনন্দে বর্ত্তমান বা মিলিত। ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ পুরুষোত্তমে যুগপৎ বর্ত্তমান। (শ্রীগীতাসার পরিশিষ্ট ৩০ পৃঃ) ইড়া ও পিঙ্গলা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নাড়ী হইলেও সুষুম্নাতে এই দুই নাড়ীই বর্ত্তমান। প্রফুল্ল ও দেবীচৌধুরাণী দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্ত্রীলোক হইলেও নূতন বউতে এই দুইটি ভাব বা অবস্থাই বর্ত্তমান।—এক ভগবানের উপাসনাতে ভক্ত ব্রহ্ম ও আত্মা ভাবে অনুভাবিত না হইয়াই পারেন না। কিন্তু ব্রহ্মবাদী বা সোঽহং জ্ঞানবাদী এবং আত্মাবাদী বা যোগী ভগবদ্‌ভাবের ভাবুক নহে। গীতার পুরুষোত্তম ক্ষর অক্ষর দুই-ই লইয়া, কোনটা ছাড়িয়া নহে। সেইরূপ নূতন বউ, প্রফুল্ল ও দেবীর সম্পূর্ণ ভাব লইয়া। এই গেল, ত্রিবিধ ভাবের সামঞ্জস্যীভূত একত্বের কথা, তিনে এক একে তিনের কথা। ইহাই সমুচ্চয়বাদের কথা।—এখন ধরা যাউক দ্বিত্ব বা দ্বন্দের মধ্যে একত্বের কথা। বহুতে এক বর্ত্তমান একেতে বহু বর্ত্তমান, একাধারে সব সবাধারে এক, খণ্ডেতে অখণ্ড অখণ্ডেতে খণ্ড, সসীমে অসীম অসীমে সসীম (শ্রীগীতাসারের পরিশিষ্ট ২৩পৃঃ), ঘটাকাশে মহাকাশ মহাকাশে ঘটাকাশ, রূপের মধ্যে অরূপ অরূপের মধ্যে রূপ, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর (গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগ) ঈশ্বরের মধ্যে সর্ব্বভূত (গীতার একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ)—ইহাই সমুচ্চয়বাদ। কর্ম্মের মধ্যে নৈষ্কর্ম্ম্য আবার নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে কর্ম্মযোগ—ইহাই সমুচ্চয়বাদ। জ্ঞানের মধ্যে কর্ম্ম ও ভক্তি, ভক্তির মধ্যে কর্ম্ম ও জ্ঞান, কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে আপাত বিরোধ হইলেও এই বিরোধের সমাধান বা সমন্বয়, ইহাদের মধ্যে একটা মৈত্রী প্রতিষ্ঠা, তাহারই নাম সমুচ্চয়বাদ।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা খণ্ড-অখণ্ডের কথা বোঝাতে একদিন বলিয়াছিলেন, “তুমি যে খণ্ডভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। তুমি যে অখণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি অখণ্ড নহি। আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যে বদ্ধও নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমাকে যদি খণ্ড বল তবে আমাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়, আবার আমাকে যদি শুধু অখণ্ড বল, তাহা হইলেও আমাকে বদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই, আবার সমস্ত বন্ধনই আছে। আমি খাই, ঘুমাই, এগুলি আমার খণ্ডভাব কাজেই আমি সসীম ; আবার আমার আহার নিদ্রার কোনই প্রয়োজন নাই, কাজেই আমি সীমাশূন্য।” (শ্রীশ্রীআনন্দময়ী প্রসঙ্গ, শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত লিখিত।) ইহাই সমুচ্চয়বাদীর কথা।—শ্রীগীতার পুরুষোত্তমবাদই সমুচ্চয়বাদ।

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞেয় জগতের পরিচয় পাইতেছি, আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জগৎ আমার জ্ঞানে বর্ত্তমান। আমি অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া আমাকেই এই জগতের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা বলিয়া অনুভব করিতেছি। এই দ্বৈত অবস্থা মানবজ্ঞানের অতি সাধারণ অবস্থা। আমরা জড় চেতনের, দেবাসুরের, অন্তর-বাহিরের, দ্বন্দ্ব বা প্রভেদ সর্ব্বদাই দেখিতেছি ও জানিতেছি, কিন্তু এই উপলব্ধি মানবজ্ঞানের নিম্নস্তরের উপলব্ধি, চরম সীমা নহে। চরমে গিয়া মানব এই উভয়কে এক একত্বের ও সামঞ্জস্যের মধ্যে অনুভব ও উপলব্ধি করে। এই যে দুই দ্রষ্টা ও দৃষ্ট, জড় ও চেতন, প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুইকে যখন এক সমন্বয়ে লইয়া

গিয়া ইহাদের সেই নিত্য সম্বন্ধের বা মিলনের বা একত্বের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায় সেই সময় অ-দ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব হৃদয় মধ্যে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই উপলব্ধিই সমুচ্চয়বাদের পরাকাষ্ঠা। দ্বিত্বে, ত্রিত্বে, কি বহুত্বে এই একত্ব উপলব্ধির প্রয়াস ব্যতীত সমুচ্চয়বাদ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। একত্ব অনুভবই "তত্ত্বের" অনুভব। এই একত্বের অনুভবে মানুষের আর শোক মোহ থাকে না। "কোমোহস্তত্র কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। আর যদি একত্ব অনুভব করিতে মোটেই চেষ্টা না করিয়া, সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের দিকে মোটেই না গিয়া, কেবল খণ্ড, বহু সসীম, বাহির, যার-যার তার-তার লইয়াই রহিলাম, তবেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে রেষারেষি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনৈক্য, পরস্পর দলাদলি কলহ ঝগড়া ঈর্ষা এবং মতদ্বৈধতার সৃজন করিয়া লইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের মৌরসী পাট্টা বা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম, বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান লাভের কোন চেষ্টাই করিলাম না। অথবা ভগবান লাভ বাদ-ই দিলাম, সংসারেই সুখ শান্তি বা আরামে থাকিবার কোন চেষ্টাই করিলাম না, মুখে মুখে কেবল সুখ শান্তি আরাম চাহিলেই কি তাহা পাওয়া যায়? হৃদয়ের গতি ঐ সমন্বয় সামঞ্জস্যের দিকে জোর করিয়া হইলেও পরিচালিত করিতে হইবে তবেই কোন না কোন দিন, কোন না কোন জন্মে আমরা সমুচ্চয়বাদে পৌছিতে পারিব।

এই একত্ব বা সমন্বয়বাদের সাধনা বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী কি রকম ভাবে করিয়াছেন দেখা যাক।

"Hinduism—Its conception" নামক প্রবন্ধে মহাত্মা বলিয়াছেন :—To me Hinduism is but one branch from the same parent trunk, whose roots and whose quality we judge only by the collective strength and quality of the different branches put together, and if I take care of the Hindu branch on which I am sitting and which sustains me, surely I am taking care also of the sister branches. If the Hindu branch is poisoned the poison is likely to spread to others. If that branch withers the parent will be the weaker for its withering, * * * If God gives me privilege of dying for this Hinduism of my conception, I shall have sufficiently died for the unity of all and even for swaraj."

(A. B. Patrika, 30—11—32 Town edition.)

"আমার নিকট হিন্দু ধর্ম্ম মূলবৃক্ষের একটি শাখা মাত্র। এই বৃক্ষের যাবতীয় শাখাগুলির সমষ্টিগত শক্তি ও গুণ দ্বারা সমগ্র বৃক্ষটির মূল ও ফলের দোষ ও গুণ বিচার করিতে হইবে। যে হিন্দুধর্ম্মরূপ শাখাটিকে অবলম্বন করিয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি সেই শাখাটির যদি আমি যত্ন নিই তবে নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটির অন্যান্য শাখারও যত্ন নিলাম। হিন্দুধর্ম্মরূপ শাখাটি যদি বিষাক্ত হয় তবে সেই বিষ অন্যান্য শাখাতেও সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। এই হিন্দু ধর্ম্মরূপ শাখাটি যদি শুকাইয়া যায় তবে এই শুকাইয়া যাওয়ার ফলে সমগ্র বৃক্ষটিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। শ্রীভগবানের কৃপায় হিন্দু ধর্ম্মের এই বিরাট ধারণা লইয়া যদি আমি মরিতে পারি তবে আমার মরা সার্থক হইল, কেননা তাহা হইলে আমি সর্ব্বধর্ম্মের একত্ব বা সমন্বয়ের জন্য, এমন কি স্বরাজ লাভের জন্য মরিতে পা

মহাত্মার উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটি শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মের ত্রিবিধ ভেদ নাই। ত্রিবিধ ভেদ, যথা—

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ"॥

এই ত্রিবিধ ভেদ এইরূপ :—গাছের পাতা ফুল আর ফল ইহাদের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ; এক গাছ হইতে অন্য গাছের যে ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ; আর ভিন্ন জাতীয় বস্তু যেমন শিলা পাথরাদি হইতে যে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বলেন ব্রহ্মের স্বজাতীয় অপর ব্রহ্ম নাই, বিজাতীয়ও কোন পদার্থ নাই, কিন্তু ব্রহ্মে স্বগত ভেদ বর্ত্তমান আছে, স্বগত ভেদ হইতে তিনি মুক্ত নহেন। গাছের ডাল, পালা, ফুল, ফল ও

মূল ইহারা পৃথক বটে কিন্তু অবয়বী যে বৃক্ষ তাহা এক। ডাল, পালা প্রভৃতি বৃক্ষের শরীর, শরীর দ্বারা শরীরী ভেদ হয় না, তাহার অদ্বৈতত্ব অক্ষুন্ন থাকে। তুমি, আমি, সে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মানুষ বটে—তুমি বলিতে আমাকে বুঝায় না, আমাকে বলিতে তাহাকে বুঝায় না, কিন্তু আমরা সকলেই এক ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন দেহ লইয়া আমাদের মধ্যে এক ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই বর্ত্তমান। শরীর দ্বারা শরীরীর ভেদ সিদ্ধ হয় না। শরীর স্থানীয় চেতনা, চেতনাত্মক জগৎ প্রপঞ্চদ্বারাও ঠিক তেমনই ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয় না। সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, সেই লক্ষ্যে যাইবার পথ, বা মত, বা উপায় মাত্র ভিন্ন ভিন্ন। সেই ভিন্ন ভিন্ন মত বা উপায়গুলি লইয়া যদি কেবল বিবাদ করিয়া জীবন কাটাই তবে লক্ষ্যে পৌছিব কখন্? সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে পৌছিতে হইবে, যদি সিঁড়িতেই থাকিয়া কেবল ঝগড়া করি তবে আর ছাদে উঠিতে পারিব না। কবি গাহিয়াছেন :—

উদ্দেশ্য নাহিকো ভেদ
এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
যোগ ভক্তি পুণ্য, এক উপাদানে গঠিত।
এক দয়া, এক স্নেহ,
এক ছাঁচে গড়া দেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত একবর্ণ লোহিত॥
ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্য স্থান,
যে যেমন পারে, ট্রেণে বা ষ্টীমারে হোক সেথা আগুয়ান॥

প্রকৃত তথ্যই এই, সমুচ্চয়বাদে পৌছিতে ইহাই প্রকৃত সাধনা। তাহা না বুঝিয়া যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাব লইয়াই থাকি, সামঞ্জস্যের মোটেই চেষ্টা না করি, তবে ফল হইবে এই যে জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া অকূল সমুদ্রে কেবলই হাবুডুবু খাইব, কূল কিনারা মোটেই পাইব না।

এখন বোধ হয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে সমুচ্চয়বাদের কথা বুঝাইতে আমাদের বেশী বেগ পাইতে হইবে না। যিনি একটু তলাইয়া পড়িয়াছেন কি পড়িবেন তিনিই উপরিউক্ত কথাগুলি শুনিবার পর গীতা যে সমুচ্চয়বাদে প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই ধরিতে বা বুঝিতে পারিবেন। গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া পরাভক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গীতার পরাভক্তি ভাবপ্রবণতা নহে কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মিলনভূমি। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যে বিরোধ বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সহিত উপনিষদের যে বিরোধ (ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন—গীতা) তাহার সমন্বয় বেদের সংহিতা অংশে আছে। গীতায়ও তাহারই সমর্থন রহিয়াছে। গীতায় বর্ণিত "স্থিতপ্রজ্ঞ" (২য় অধ্যায়) "ভক্ত" (১২ অধ্যায়) "ত্রিগুণাতীত" (১৪ অধ্যায়) সমুচ্চয়বাদেই প্রতিষ্ঠিত। গীতায় ৫ অধ্যায়ের ১৯।২৩ শ্লোক, ৬ অধ্যায়ের ২৯-৩১ শ্লোক, ৭ অধ্যায়ের ১২।২৪ শ্লোক, ৮ অধ্যায়ের ২০-২২ শ্লোক, ৯ অধ্যায়ের ১১।১২।১৭।১৮।১৯।২৪।২৯ ইত্যাদি শ্লোক, ১০ অধ্যায়ের ১১ অধ্যায়ের ১৮ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক, এবং অন্যান্য অধ্যায়ের বহু শ্লোক সমুচ্চয়বাদের পরিচয় দিতেছে, তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। গীতার পাঠক একটু যত্ন পূর্ব্বক গীতাখানা পড়িলে আপনিই তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন।

শ্রীবরদাচরণ সেন

ছন্দোবিচার

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বাংলা ছন্দ নিয়ে বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন সর্বাগ্রে প্রবোধচন্দ্রই। কেউ হয়ত বলতে পারেন, কেন, ৺সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ? এঁরা কি তারো বহু আগে ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেন নি? হাঁ, করেছেন, এবং প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের সারাংশ সে সব আলোচনার কাছে বিশেষভাবে ঋণী সেও কিছু মিথ্যে নয়। কিন্তু সে সব রচনার গোত্রই যে ভিন্ন।

৺সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দঃ সরস্বতী' রূপক ছাঁদের রচনা, অ-ছন্দরসিকের অনধিগম্য এবং অসম্পূর্ণ। কবিগুরুর 'ছন্দ' সাহিত্যিক ঝংকারে মুখরিত। তাতে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং ছন্দঃস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথই সমধিক প্রকাশিত। শ্রেণীবিভাগ, সূত্রগঠন ও ব্যতিক্রম প্রদর্শনের যে প্রচেষ্টা সে যেন প্রবোধবাবুর রচনাতেই দেখতে পাই সব চেয়ে বেশি।

সমগ্র কাব্যসাহিত্যকে তিনটি বৈজ্ঞানিক ভাগে ভাগ করে প্রবোধবাবুই তো দেখালেন। বাংলা ছন্দের ব্যাকরণ চিরঋণী থাকবে তাঁর কাছে এমন কথা সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক মহলে সর্বত্র শুনতে পাই। বিশেষ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দে'র ভূমিকায় ছন্দোবিচারে প্রবোধবাবুর প্রবীণতা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেছেন। এমন অবস্থায় কেউ যদি ছান্দসিকের বৈজ্ঞানিকতার সংশয় প্রকাশ করেন তবে সত্যই সেটা সঙ্গত ঠেকে না। অন্তত প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পায়। অথচ বিচার-পদ্ধতির মূলগত পার্থক্যহেতু অন্যরূপ করার অবকাশ নাই।

তৎপূর্বে প্রবোধবাবুর শ্রেণীবিভাগগুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্বরবৃত্ত :—

রস-বিচারে রসনারই রায়টা চূড়ান্ত,
রাসায়নিক যতই বলুক রসনা ভ্রান্ত।
তেমনি শ্রুতি ভ্রান্তিবিহীন ছন্দোবিচারে,
চোখের কথায় যেজন ভোলে পায় ভুলে তারে॥

এর প্রত্যেক কথায় আছে চারটে করে স্বর; পর্বসংখ্যা তিন; একটা পর্বাঙ্গ; হ্রস্বদীর্ঘ অভেদে মোট মাত্রাসংখ্যা তেরো। এক কথায়, এটা হ'ল 'সিলেবল্ গোনা' ছন্দ।

অক্ষরবৃত্ত ওরফে যৌগিক :—

রসভোগ মন্তব্যটা | রসনারই ঠিক,
রসনারে কহে ভ্রান্ত | কে রাসায়নিক?
অভ্রান্ত তেমনি শ্রুতি | ছন্দের বিচারে,
চক্ষের সাক্ষ্যে যে ভোলে | ভুলে পায় তারে॥

এর প্রচলিত নামটা 'পয়ার'। ছন্দোবিৎ গোড়ায় এর নাম দিয়েছিলেন 'অক্ষরবৃত্ত', অধুনা দিয়েছেন 'যৌগিক।' তাঁর মতে ছন্দটা অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বাঙালী কবিদের "অক্ষর গোনা অন্ধ অভ্যাস" প্রসূত এবং এর মানদণ্ডটাই কৃত্রিম। প্রামাণিক যুক্তিটা এই যে, বৎসর প্রভৃতি শব্দকে কখনো কখনো যে চার মাত্রা বলে চালানো হয় সেটা চোখে দেখার সাক্ষ্যে, তিন মাত্রা ধরতে হ'লে কানে শোনার দোহাই দেওয়া আবশ্যক। (যদিও কানের হিসাবে 'বৎসর'কে আমরা ত্রিস্বর বলেই মনে করি।) কিন্তু এইটেই তাঁর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। "এ ছন্দের স্বরূপ আবিষ্কারের" দাবী করে ছান্দসিক বলেন, "প্রধানতঃ অক্ষর সংখ্যা গুণেই এ

ছন্দ রচিত হয়", কিন্তু "অক্ষরবৃত্ত আসলে একটা মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ।" স্বরান্ত শব্দের মাত্রা গণনা স্বরসংখ্যক, যথা :—বসন্ত=বো সন্ তো=তিনমাত্রা। কিন্তু হসন্ত
১ ১ ১

শব্দের প্রান্তিক হিসাবটা মাত্রিক।

যথা :—বসন=বো সন্=তিনমাত্রা। সুতরাং জল
১ ২

প্রভৃতি একস্বর শব্দ ও যৌগিকে নিত্য দ্বিমাত্রিক। প্রবোধ বাবু বলেন, "এইটেই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলতত্ত্ব।" এই তত্ত্বানুসারে 'ভোম্‌রা' দ্বিমাত্রিক কিন্তু 'ভোমরা' ত্রিমাত্রিক। 'হল্‌দে' দুই মাত্রা কিন্তু 'হলুদ' তিন মাত্রা।

মাত্রাবৃত্ত :—

রসের বিচারে | রসনারি রায় | ঠিক,
রসনা ভ্রান্ত | বলুক রাসায়নিক।
ছন্দোবিচারে | নির্ভুল শ্রুতি | তথা,
ধাঁধির সাক্ষ্য | জানা যায় ভুল | কথা॥

এটা মাত্রাবৃত্ত। এ রাজ্যে 'বল্‌শেভিজম্' পথ পায়নি। এক একটী স্বরের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ধ্বনিগৌরবের আভিজাত্যকেও এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ছন্দ, নির্ভুল, সাক্ষ্য—এরা বহরে ছোট হলে কী হয়, উচ্চমাত্রার আসনে নিজেদের ওজনের জোরে গিয়েই বসেছে।

কেউ যদি আপত্তি তোলেন তো ঠক করে হসন্তের লাঠিটা ঠুকে দাঁড়িয়ে এমনভাবে স্বরব্যাদন করবে যে, তার পরেও সন্দেহ পোষণের লেশমাত্র অবকাশ আর থাকতেই পারে না। এখানে জল ও অম্বু শব্দের মধ্যে অম্বুধির ব্যবধান। মোটামুটি ভাবে প্রবোধবাবুর সটীক শ্রেণী বিভাগটা বোধ হয় এই।

প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য ঘটেছে ঐ বিভাগ নিয়েই, অর্থাৎ গোড়াতেই এবং সেইটে কী বল্‌তে হ'লে গোড়া থেকেই বলতে হয়।

পল্লীবাসীরা শহুরেদের কৃত্রিমতার অপবাদ দিয়ে থাকেন, কিন্তু সে কতক্ষণ? যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেরা শহুরে বনে ওঠেন। দু'বছর আগে যে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে-ছিল, সেদিন পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলনের সঙ্গে গ্রামের অনেক কিছুই সে আমদানি করে এনেছিল। কিন্তু দু'বছর বাদে গ্রামে ফিরে গিয়ে কথায় কথায় গ্রাম্যতার প্রতি সে-ই উপহাস করতে লাগল বেশি। শহুরেদের চেয়েও ঢের বেশি রূঢ় ভাষায়। গদ্য সাহিত্যের তুলনায় কাব্য সাহিত্যের রীতিনীতিটা যে কতকটা 'কৃত্রিম' সেইটে বুঝতে পারি যখন প্রবীণ সাহিত্যিকদেরও বল্‌তে শুনি—কী জানি তোমাদের মার প্যাঁচ বুঝিনে, বিশেষ ঐ ছন্দের। কিন্তু কাব্যের 'কৃত্রিম' হালচালে হালে খানিকটা অভ্যস্ত তাঁদেরই কাউকে যদি ছন্দের স্বপক্ষে লাঠি আস্ফালন করতে দেখা যায় তবে সেটা তেমন বিস্ময়কর কিছু হয় না। বরং তাতে এইটেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কৃত্রিমতা কথাটা আপেক্ষিক।

যৌগিক সম্বন্ধে ছান্দসিকের অ-ধারণা সেও অন্ত কিছু প্রমাণ করে না।

ছন্দো বলেন, যৌগিকের মানদণ্ডটাই কৃত্রিম। আমরা বলি, তাঁর মাত্রা ও স্বরবৃত্তের বাটখারাগুলোও কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থ নয়। দোকানীর তেল-ডাল-মাপা বিভিন্ন মাত্রাদর্শের মত সর্বজনস্বীকৃত কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই তো নয়। সেই সকলে-মেনে-নেওয়া আদর্শটাতে যখন ফের দেখা দেয়, কৃত্রিমতার প্রশ্ন মাত্র তখনই উঠতে পারে, তার আগে নয়

মাত্রা, স্বর ও যৌগিক ছন্দ আমাদের মতে যথাক্রমে লঘিমা, হসন্তিকা ও মন্দ্রা ছন্দ এবং সবগুলোই স্বরমান। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা প্রবোধবাবুর দেওয়া নামই ব্যবহার করব।

স্বর বা ধ্বনি-সংখ্যার হিসাব না রেখে কোনো ছন্দই টিকে থাক্‌তে পারে না, যেমন পারে না কোনো বস্তুই তার সত্তাকে রক্ষা করতে বিদ্যুৎকণিকার স্পন্দন-সংখ্যাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু প্রত্যেকটি ছন্দের মাত্রাদর্শ বিভিন্ন। একের আদর্শে অন্যের বিচার চলে না। মাত্রাছন্দের যে হিসাব স্বরবৃত্তের পক্ষে সেটা অপ্রযোজ্য। তেমনি স্বরবৃত্তের মানদণ্ডে যৌগিকের পরিমাপ দাবী করা চলে না। সে হয় যেন দুধের পোয়ার নজিরে মধু মাপার জবরদস্তি।

ছন্দ নিশ্চয়ই ধ্বনিসাম্যের ব্যাপার। অক্ষরের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখি না। পংক্তি বিশেষে যদি ধ্বনি ও অক্ষর সংখ্যার ঐক্য ঘটে তবে এই জন্যেই ঘটবে

যে, ঐ পঙক্তির মোট ধ্বনিসংখ্যা মোট বর্ণসংখ্যার মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত। এই ধ্বনিসাম্যের কাজে লয়ের সাহায্য অপরিহার্য। লয়ের নামে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার কিছুই নাই। ছন্দোভেদে টান বাড়িয়ে কমিয়ে পড়া—ছন্দ সম্পর্কে লয় অর্থে এইটুকুই বুঝাবে। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিস্ফুট হবে। কিন্তু তার আগে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ছন্দসেতারের বাজনা দুরকম ধ্বনি নিয়ে—ছন্ ও দ, অর্থাৎ দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বর।

ইংরেজী ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘ অভেদ। ছন্দ শব্দের ছন্ ও দ মাত্রাকৌলীন্যে কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। একই পিতার জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ দুই ছেলের মতো। কিন্তু সেখানেও বৈচিত্র্য আন্‌তে হয়েছে উচ্চারণের ঝোঁকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাংলা ভাষা বঙ্গভূমির মতই সমতল, ঝোঁকের বন্ধুরতা তাতে নেই। এখানে ছন্দের কারিগরি ধ্বনির সূক্ষ্ম হিসাব রেখে।

৬ ৬ ৫
কুঞ্জবনের। পথে পথে ঝরা। কুসুম-দল = ১৭ মাত্রা
কুন্ জ ব নের। প থে প থে ঝ রা। কু সুম দল্ = ১৭ মাত্রা
২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

এ ছন্দে কুন্, নের্, সুম্, দল্ এই দীর্ঘ ধ্বনিগুলোকে ঠিক দুটি হ্রস্ব ধ্বনির সমান করে টেনে পড়া হয়েছে, অর্থাৎ একটা লয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। লয় না মান্‌লে আর যাই কেননা মানা হোক, কোনো ছন্দকেই মানা হবে না।

এই লাইনটাই আরেকটু ঢিমে লয়ে পড়া চলবে।

৪ ৪ ৪ ১
কুঞ্জবনের | পথে পথে | ঝরা কুসুম | দল = ১৩ মাত্রা
কুন্ জ ব নের | প থে প থে | ঝ রা কু সুম্ | দল = ১৩ মাত্রা
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

এ ছন্দে দীর্ঘস্বরগুলো হ্রস্বস্বরের ডবল নয়। তাই যদি হত তবে কুঞ্জবনের কুন্ ও নের্ এই দীর্ঘস্বর দুটো দৃশ্যতঃই 'পথে পথে' পর্বটার সমধ্বনি হতে পারত, জ ও ব'র সাহায্যের কোনো প্রয়োজনই হত না।

এমন কথা কেউ কেউ বলতে পারেন যে, স্বরবৃত্তে দাম অভেদ। অথবা সংখ্যা যত বাড়বে, দীর্ঘস্বরের দৈর্ঘ্য সেই অনুপাতে আসবে কমে। চারটে হ্রস্বস্বরের একটা পর্ব যখন চারটে দীর্ঘস্বরযুক্ত আরেকটা পর্বের সঙ্গে পাল্লা দেয় তখন দীর্ঘস্বর হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হবে। এটা তো সিধা হিসাব। কিন্তু হিসাব মোটেই এতখানি সিধা নয়। স্বরবৃত্তের সংখ্যানির্দেশে এতখানি পল্লবগ্রাহিতা প্রশ্রয় পেলে পদে পদে দুঃসহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

৩ ৪ ৫
ঝুর ঝুর ঝুর | গন্ধ হাওয়ায় | এলিয়ে আঁচল | তার
৪ ৫ ৪
ফাগুন আসে | বাজিয়ে নূপুর | ভ্রমর কাঁদানার

এখানে হ্রস্বদীর্ঘ অভেদ বল্লেই তো আর আপদ চুকে যাবে না। তাতে ব্যাখ্যা গ্রহপ্রমাণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যত বেশি, কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হবার আশা সেই পরিমাণেই কম।

এর প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক কলাতে যুক্ত-অযুক্ত নির্বিশেষে বর্ণসংখ্যা এক, কান বলছে ধ্বনিসাম্যও ঘটেছে কিন্তু গণনায় স্বরসাম্য ধরা পড়ছে না। অর্থাৎ প্রবোধবাবুর মতে যৌগিক বলার সমস্ত যুক্তিই বর্তমান। এর সম্বন্ধে কী বলা যাবে? আমরা বলি ছন্দটা স্বরবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের আসল প্রভেদটা কোথায় সেইটে জানলেই তবে স্বরবৃত্তকে সম্পূর্ণ জানা হবে।

মাত্রাবৃত্তের দীর্ঘস্বরটী নিত্য দ্বিমাত্রিক, দুটি লঘুস্বরের পরিমাপে প্রসারিত। অতএব মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘস্বরই হচ্ছে লঘুস্বর তরঙ্গের অনুকারী।

কিন্তু স্বরবৃত্তের দীর্ঘস্বরটি কখনো প্রসারিত হয় না, লয় তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বলে। স্বরবৃত্তের দীর্ঘস্বরটি হসন্তধ্বনিবিশিষ্ট এবং এক বা দুইটি লঘুস্বর ঐ ধ্বনিতরঙ্গের অনুকারী। তাহলে হিসাবটা দাঁড়ালো এই :—

মাত্রাবৃত্তের দীর্ঘস্বর = ২টি লঘুস্বর।

স্বরবৃত্তের হসন্তধ্বনি বিশিষ্ট দীর্ঘস্বর = ১ বা ২টি লঘুস্বর।

৩ ৪ ৫
ঝুর ঝুর ঝুর | গন্ধ হাওয়ায় | এলিয়ে আঁচল | তার

এখানে দীর্ঘস্বর-তরঙ্গকে অনুকরণ করতে গিয়েই সিলেবল্ সংখ্যার এই আপাত অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, হাওয়া পাওয়া প্রভৃতি শব্দের ওয়াভাগের উচ্চারণ যুক্তস্বর অথবা অনেকটা য়া'র

মতন। ছোঁওয়া এবং ছোঁয়ার ধ্বনিগত পার্থক্য তুলনা করলেই বোঝা যাবে। আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে দীর্ঘস্বরের অনুকরণটা হয়েছে এইরূপ :—

ঝুর ঝুর ঝুর | গন্ ধ হা ওয়ার | এলিয়ে আঁচল | তার
১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১

এখানে অনুকারী লঘুস্বর অর্দ্ধমাত্রিক।

আবার

মন্মথ্ বল্লেন | তাই তো বটে | কথাটাতো | ঠিক
মন্ মথ বল্ লেন্ | তাই তো ব টে | কথা টা তো।
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

এখানে একমাত্রিক।

স্বর্ণবরণ | কুজ্ঝটিকার | অস্ত শিখর | লঙ্ঘি
লুকায় মৌন | তলে

এখানে লঘুস্বরগুলো আগাগোড়া অর্দ্ধমাত্রিক কিন্তু হসন্তধ্বনি খুব প্রখর নয়। সেই জন্যেই এ লাইনটা মাত্রা স্বর উভয় ছন্দেই পাঙক্তেয়।

দুইজনে ফুল | তুলতে যখন | গেলাম বনের | ধারে

এখানে লঘুস্বর স্পষ্টতই ঊনদ্বিমাত্রিক দীর্ঘস্বরের অনুকারী। সুতরাং ছন্দটা স্বরবৃত্ত। হসন্ত শব্দের বহুল প্রয়োগে, বিশেষ, প্রাকৃত ক্রিয়াপদের বর্তমানে স্বরবৃত্তের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পথে যেতে তারে কবে দেখেছিনু হায়!

প্রশ্ন হতে পারে, এতে তো দীর্ঘস্বরের ছায়াও নেই। তবে কি প্রবন্ধ লেখকের মতে লাইনটার স্বরবৃত্তে স্থান হবে না। জবাবটা এই যে, এমন বিশুদ্ধ পঙক্তির স্থান অন্যত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে ঠেকা কাজ চালাতে না পারবে এমন নয়। কিন্তু সে হবে রামের দোহাই দিয়ে ভরতের রাজত্ব করার মতো। অর্থাৎ দীর্ঘস্বরের অনুপস্থিতেও লঘুস্বর পদে পদে তাকে স্মরণ করে করে চলবে।

স্বরবৃত্ত :—পথ্ এ যেত্ এ | তার্ এ কব্ এ | দেখ্ এ
ছিন্ উ | হায়!

মাত্রা :—পথে যেতে | তারে কবে | দেখেছিনু | হায়!
মাত্রা :—পথে যেতে তারে | কবে দেখেছিনু | হায়!

সিন্ধুর টীপ | সিংহল দ্বীপ | কাঞ্চনময় | দেশ
চন্দন যার | অঙ্গের বাস | তাম্বুল বন | কেশ

একে খাঁটী দীর্ঘস্বরের ছন্দ বলাই সমীচীন। ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত এইজন্যে বলা সঙ্গত হবে না যে, আদর্শ হ্রস্বস্বরের অবর্তমানে দীর্ঘস্বরের ঊনদ্বিমাত্রিক উচ্চারণই স্বাভাবিক। দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ কৃত্রিমতা সাপেক্ষ। বড় জোর সিন্ধুর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া চলে, কিন্তু পাশেই যে থমকে থেমে যাওয়া টীপ শব্দটি রয়েছে তার হ্রস্বত্ব মোচন শ্রুতিসঙ্গত হবে না। মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এর ধ্বনিগত পার্থক্য আছে কিনা তর্ক না করে অনুভব করবার সুযোগ দেওয়াই ভালো।

চলিতে চলিতে | চরণে উছলে | চলিবার ব্যাকুলতা,
নূপুরে নূপুরে | বাজে বনতলে | বনের অধীর | কথা।

এর লালিত্য লঘুস্বরের প্রাধান্যে।

নব বর্ষার | বারি-সংঘাতে | পড়ে মল্লিকা | ঝরিয়া,
সিক্ত পবনে | সুগন্ধ তার | কারুণ্যে ওঠে | ভরিয়া।

এর ধ্বনিমাধুর্য মিশ্রণনৈপুণ্যে।

হ্রস্বদীর্ঘ ধ্বনির সুনিয়মিত সংমিশ্রণে বাংলা ভাষায় কাব্যরচনা হয়ত চলে না কিন্তু ছন্দ রচনার কোন বাধা দেখি না।

গোপনে গোপনে সেই আসে
পরশ যার ফুল রাঙায়,
জাগিয়া নিরখি নেই কিছু,
সুবাস তার ঘুম ভাঙায়!

অথবা—

ছন্দের দখিণ বায় ফুল ফোটায় ওই,
উন্মন বেদন মোর বাস লোটায় ওই।

এর সঙ্গীত গম্ভীর নয় সত্য কিন্তু সংস্কৃত ঘেঁষা। মাত্রাবৃত্তের ধ্বনির সঙ্গে তার অসবর্ণতা পাঠক স্বতই স্বীকার করে নেবেন এমন ভরসা রাখি।

কিন্তু আমাদের আলোচনা চলছিল স্বরবৃত্ত পর্বের স্বরসংখ্যার গরমিল নিয়ে।

৩ ৪ ৩
(১) এক কন্যে | রাঁধেন বাড়েন | এক কন্যে | খান
৩ ৪ ৪
(২) ও বীণকার | তোমার বীণা | দোলায় আমার | প্রাণ

(৩) বৃষ্টি পড়ে | ঝুম্ ঝুম্ | ঝাপসা গাছ | পালা
এক্ কন্ নে | ও বীণ কার | ঝাপ্ সা গাছ | ঝুম্ ঝুম্।

দেখা গেল, এক কন্যে ও বীণকার ও ঝাপসা গাছ ধ্বনিগুচ্ছগুলো শুধু শ্রুতিশুদ্ধই নয়, আমাদের উল্লিখিত সূত্রানুসারে তার একটা গাণিতিক সমর্থনও রয়েছে।

আমাদের চলার বিভিন্নতা আছে। কেউ চলেন টুক্ টুক্ করে দ্রুত লয়ে, কারো বা চলা পরিমিত, কারো বা ধীর সম্ভ্রান্ত পাদক্ষেপ। যদিচ প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কারো ঠিক ইঞ্চির মাপে সমান হয় না তত্রাচ প্রত্যেক চলায় একটা ছন্দ রয়েছে, চোখ বলে ছন্দপতন ঘটেনি। কিন্তু পদক্ষেপের ছোটবড় হবারও একটা সীমা আছে, সেইটে অতিক্রম করলেই নিষেধ ওঠে। স্বরবৃত্ত পর্বের স্বরের কমি-বেশিটা ঠিক সেই জিনিষটাই। কিন্তু উপরের ঝুম্ ঝুম্ পর্বটা সম্বন্ধে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক।

প্রবোধবাবু তাঁর স্বরবৃত্তের মানদণ্ডটাকে কৃত্রিম বলে থাকেন কিনা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে, ঐ কৃত্রিমতা-টুকুই তার বৃত্ত। স্বরের শাসনে ঐটুকু প্রশ্রয় আছে বলেই ছন্দটা এমন আড়ষ্টভাববর্জিত মেয়েটির মতো চলতে পারে। কিন্তু মাত্রা ছন্দের চলাটা আত্মসচেতন। স্বরের হিসাবে এক তিল শৈথিল্য সয় না। হিসাবটা সেখানে পাকা। নিখুত গিটকিরির সাধনায় মীড়বর্জনটাই সেখানকার আদর্শ। কানের কড়া পাহারা এড়িয়ে যাবার সাধ্য নাই। এতৎসত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ যত নিখুঁতই হোক, পাহারার ব্যবস্থা যত কড়াই থাক, বর্ণে বর্ণে একটি সূক্ষ্ম ধ্বনি বৈষম্য থাকা সম্ভব। এবং বর্ণমালার বাঁশিতে এই ছিদ্রগুলি আছে বলেই ভাষা এমন মধুর সুরে বেজে উঠ্‌তে পারে। এ সম্বন্ধে ধ্বনি বিজ্ঞান কী বলে আমরা অবগত নই।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রবোধবাবুর মাত্রা ও স্বরবৃত্ত আমাদের মতে লঘিমা ও হসন্তিকা এবং এতদুভয়ের মাত্রাদর্শ যে লয় দ্বারা বিভিন্ন সেটা অস্বীকার করা চলে না।

লয়ের সঙ্গে ভাব ও ভাষার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখতে পাই। মানুষের প্রকৃতি দিয়েই দেখা যাবে। তিনিই মধ্যলয় আচার ব্যবহারে যিনি পরিমিত অথাৎ নাতিদ্রুত-মন্থর। তিনি যখন কথা বলেন তখন কথার বিচ্ছেদ-গুলোতে একটুখানি স্বরের লীলা জেগে থাকে, সঙ্গীতের পরিভাষায় তাকে বল্‌তে পারি মীড়। রাস্তায় কারো সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেলে উচ্ছ্বাসাতিশয্যে এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে ফেলাটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেটা দ্রুত লয়ের ধর্ম। আবার গাঢ়কণ্ঠে টেনে টেনে প্রত্যেকটি কথাকে মর্যাদা দান করে বলার পদ্ধতিও তাঁর নয়, সে পারেন রাশভারী লোক যিনি বিল-ম্বিত লয়।

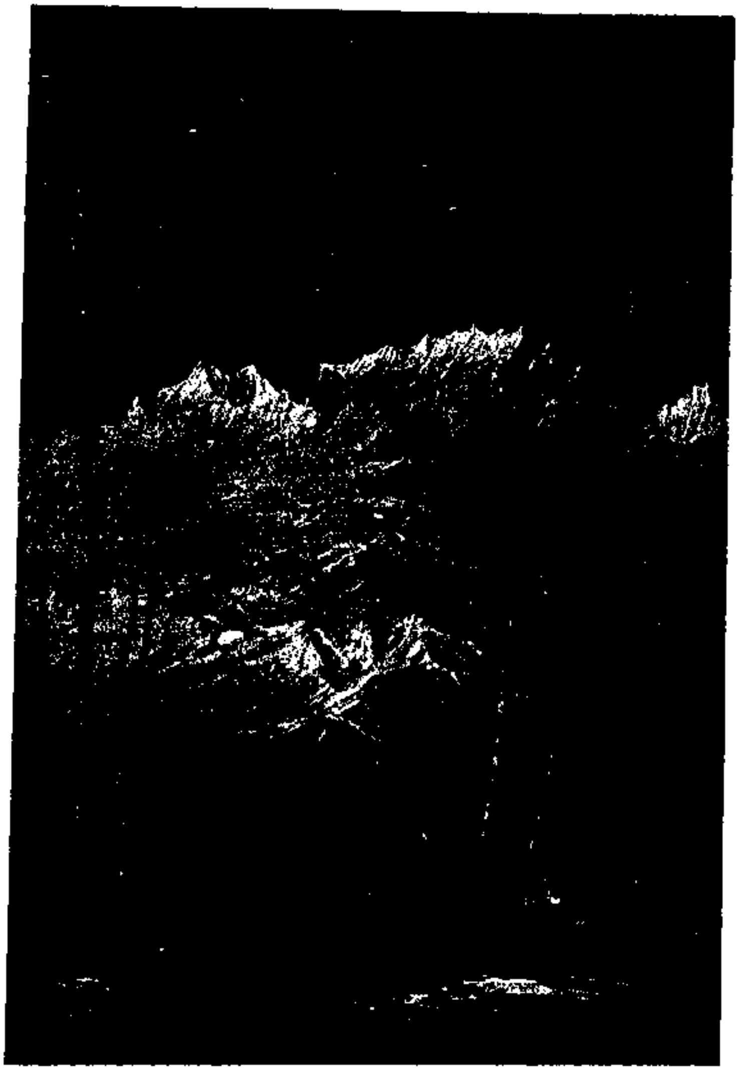
ইংরেজ জ্যোতিষী মেয়েদের শিল্পীর জাতি বলে বর্ণনা করেছেন—তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান, মানসিকতা এবং দৈহিক অবয়বের বিচারে। স্বরবৃত্ত ছন্দটার অন্তঃ-প্রকৃতি লক্ষ্য করে বলতে হয়, ছন্দটা জাতে পুরুষ নয়। গুরুভারবহ ছন্দ এ নয়। সম্যক ভাবগাম্ভীর্য্য সে ধ্বনির ভিতর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, সুরের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করে থাকে। সে যেন ঐ ধরণেরই একটি মেয়ে যার চলা-ফেরার পুঁথ আছে, মার্জিত নয়। কখনো সে হসন্তের কঙ্কণে চলে ঝংকার দিয়ে, কভু বা লঘুস্বরের আঁচলটা পড়ে লুটিয়ে। কিন্তু কালো চোখে আছে তার ভাষা, হৃদয়ে আছে অভিমান। সেই জন্যেই হৃদয়-বৃত্তির সমঝদার সুর তাকে এমন আদরের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে।

গানে :— আজ্ কিছুতেই যায় না মনের ভার।
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার।
মনে ছিল আসবে বুঝি,
সে কি আমায় পায়নি খুঁজি,
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার।

ছড়ায় :— বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

অন্তত্র :— সাঁঝের হাওয়ায় কখন ফোটে কুমুদ-মুকুলিকা,
গোপনচারী জলকন্যার সন্ধ্যাদীপের শিখা।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যেন কোনো কোনো আধুনিক যুবকের মতো ক্ষিপ্রকারী অথচ মার্জিত। সব কিছু নিয়েই অল্প বিস্তর বলতে পারে। সে যেন আমাদের পাইয়ে উকিলবাবু, গানের আসরে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করে থাকেন, আবার



প্রহরী

শিল্পী—
বধূরাণী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

যুক্তিপূর্ণ বা জোরালো কথাও তাঁর মুখে অশোভন ঠেকে না।

গানে :— আজি কি তাহার বারতা পেলরে
কিশলয়।
ওরা কার কথা কয় বনময়।

অন্যত্র :— তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ,
আমি আজ চোর বটে!

যৌগিক ভাবগম্ভীর ছন্দ, কথা বলে যত তারো চেয়ে বেশি বলে না-বলে আপন পদ্ধতিদ্বারা। তাই সে গুরু-গম্ভীর রচনার উপযুক্ত বাহন। মাত্রা ও স্বরবৃত্ত যে-ভারটা নড়াতে গিয়ে হিঁচুকে পড়ে যাবে, যৌগিক তাকে অবলীলাক্রমে বহন করে থাকে। অগভীর জলে ডিঙ্গি চলে, বাণিজ্য তরী চলে বড়ো নদীতে—জলের লয়টা যেখানে গভীর।

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত—উদাত্ত-স্বরিত...

এই অনুদাত্ত-উদাত্ত-স্বরিত সঙ্গীত তরঙ্গ জেগে উঠেছে বিলম্বিত লয়ের বক্ষে, অন্যত্র সম্ভব হত না। সুতরাং এটা এমন কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপার নয় যে, আর দুটো লয়ের মতো ধীর লয়টাও কাব্যে আদৃত হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। বাংলার কাব্য ইতিহাস এর পূর্ববর্তিতার সম্বন্ধে প্রশ্নও তুলতে পারে না। নদী দিচ্ছে তার তটভূমিকে শ্যামল শোভায়, সম্পদে পূর্ণ করে। কোথাও সে হাসির নির্ঝর, কোথাও কল্লোলিনী, কোথাও প্রশান্ত। বাংলার কাব্য-ভূমিকে নিত্য পুষ্পিত ও শ্যামল করে রেখেছে এই ধীর লয়। মহাকাব্যের অনুভাষণে, সারগর্ভ রচনায়, অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে প্রবাহ-লীলা তার নদীরই অনুরূপ।

ভূতপূর্ব অক্ষরবৃত্ত নূতন পদবীতে হয়েছে যৌগিক। নাম পরিবর্তনের ফলে প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে এইটুকু অসুবিধা ঘটেছে যে, যৌগিকের আসল বৃত্তটার হদিস পাওয়া হয়েছে ভার। প্রাচীন নামটার তার আর যত দোষই থাক, অস্পষ্টতার অপবাদ তাকে দেওয়া চলত না। যৌগিক অর্থে বুঝি বা রূঢ়ী নয়,—অর্থাৎ মিশ্র। এই মিশ্র কথাটার মধ্যে কোনো অবিমিশ্র সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া শক্ত। বেহাগ-খাম্বাজ বললে বুঝতে পারি যে, সুরটা বেহাগ ও খাম্বাজের কম-বেশি সংমিশ্রণ। শুধু মিশ্র বল্লে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই তো বলা হল না। কিন্তু সে থাক। ছন্দটা আসলে মিশ্র কিনা সে নিয়েই প্রশ্ন আছে।

যৌগিকের "স্বরূপ আবিষ্কার" করে প্রবোধবাবু লিখেছেন, "এই হল মূল তত্ত্ব"। অথচ তৎসঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, "প্রধানত অক্ষর-সংখ্যা গুণেই এ ছন্দ রচিত হয়"। অতএব আবিষ্কর্তা 'মূলতত্ত্বটিকে' নিজেই প্রাধান্য দেন নি। ভালই করেছেন।

অক্ষরবৃত্ত বা যৌগিক সম্বন্ধে আমাদের মূলতত্ত্বটি যে কী সে প্রায় বলাই হয়েছে। এখন সেটা প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করা যাক।

যৌগিকের সঙ্গে এখানে আর দুটো ছন্দের চলার হিসাবটার পুনরুল্লেখ করা ভালো, তুলনামূলক বিচারের পক্ষে সুবিধাই হবে।

মাত্রাবৃত্ত :—নিত্য দ্বিমাত্রিক দীর্ঘস্বর = ২ টি লঘুস্বর।
স্বরবৃত্ত :—(নিত্য ঊনদ্বিমাত্রিক) দীর্ঘস্বর = ১ বা ২টি লঘুস্বর।

যৌগিকের লয়ে ভারী লঘুস্বরটি নিত্য একমাত্রিক; অনুকারী দীর্ঘস্বরের স্থিতিস্থাপকতা ১ মাত্রা। অর্থাৎ যৌগিকের দীর্ঘস্বর = ১ বা ২টি লঘুস্বর।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঐ তিনটে বিভিন্নগতি ছন্দের মিলন ঘটবার একটা স্বাভাবিক অবকাশ রয়েছে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

একথা বলা হয়েছে যে, যৌগিকের লঘুস্বরটি ওজনে কিছু ভারী। কিন্তু ভারী বলতে সেটা এমন-কিছু বোঝায় না যাকে গোঁজা মিল বা কৃত্রিমতা বলা চলে। তাই যদি হত তবে কানের সায় পাওয়া যেত না।" কানকে উপেক্ষা করে অনেক কিছুই হয়ত করা চলে কিন্তু ছন্দ রচনা চলে না। মনে রাখা উচিত যে, ছন্দ সৃষ্টি করে থাকে মানুষের সমীকরণ-প্রবণতা যাকে জৈবধর্ম্ম বলতে পারি। মানুষ পা ফেলে ছন্দে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে ছন্দে, হৃৎস্পন্দনের ছন্দে একটুখানি গরমিল দেখা দিয়েছে কি কাণ্ড বাধে!

মন্মথ বল্লেন | তাই তো বটে | কথাটা তো | ঠিক

'ছন্দটা স্বরবৃত্ত। এখানে লঘুস্বর 'টে'কে টেনে দীর্ঘস্বর

'লেন'এর সমান করে নেওয়া হয়েছে। আপত্তি ওঠেনি। যৌগিকের লঘুস্বরটি ঠিক ঐ প্রসারিত 'টে'র সমান, খুব অন্যায় কিছু নয়। এখানে এ কথাটা আবার বলে নেওয়া ভালো যে, স্বরবৃত্তে দীর্ঘস্বরের স্বভাবটা বাঁচাতে গিয়ে (অথবা লয় রক্ষার্থে বলাও চলে) লঘুস্বরকে টান ও চাপ দু-ই সইতে হয়।

দুই জনে ফুল | তুলতে যখন | গেলাম বনের | ধারে

এখানে দীর্ঘস্বরকে অনুকরণ করছে একটা লঘুস্বর নয়, দুটো লঘুস্বর। অতএব লঘুস্বরকে এখানে টান নয়, বরং একটু চাপই সইতে হয়েছে।

আবার ৪ ৫ ৫
রূপের বনে | ব্যথার বাঁশি | বাজিয়ে কে সে | যায়

'বাজিয়ে কে সে' তে আছে পাঁচটা লঘুস্বর। তা না হয়ে যদি 'বাজিয়ে কে' হত তবু কাজ চলে যেত। তা হলে একটা স্বরকে নিশ্চয় চেপে রাখা হয়েছে। অবশ্য তাতে আপত্তি করছি না। এমনটা তো হতেই হবে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা বলেছি যে, ছন্দ জিনিষটা হচ্ছে ধ্বনিসাম্যের ব্যাপার এবং তার জন্যে চাই একটা লয় বা নির্দিষ্ট গতির আনুগত্য স্বীকার। বৃহৎ সত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে যে-স্বাতন্ত্র্য লোপ, শাস্ত্রে তাকেই বলেছে 'লয়'। ছন্দঃশাস্ত্রের লয়ের সংজ্ঞাটাও ঐ রকমই হবে। অর্থাৎ বৃহৎ ছন্দঃসত্তার কাছে ক্ষুদ্র স্বরসত্তার আত্ম-সমর্পণ।

যৌগিক সব চেয়ে দীর্ঘলয়ের ছন্দ, লয়ের দাবী মেটাবার জন্যে 'হাতের পাঁচটা' সেখানে দীর্ঘস্বরেরই তো থাকবে, লঘুস্বরে কুলোয় না। এটা এমন কী দুরূহ তত্ত্ব।

স্বরবৃত্তে লঘুস্বরের স্বৈরাচারে যে পাঠক আপত্তি তোলেননি, যৌগিকের দীর্ঘস্বরের অনুরূপ আচরণের প্রতিবাদ অন্তত তাঁর কাছ থেকে আশঙ্কা করিনে।

মৃদঙ্গের আছে দীর্ঘ অঙ্গ; ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির জন্যে তার সার্থকতা আছে। তার একটা দিক ক্রমে সরু হয়ে এসেছে, সেটা চাপা-উঁচু সুরের। অন্য দিকটা ঠিক তার বিপরীত, তার ধ্বনি নিম্ন-গম্ভীর। সরু দিকটার বৈশিষ্ট্য ধ্বনি সংকোচনের, ছড়ানো দিকটাতে আছে প্রসারণের অবকাশ। মধ্যপ্রকৃতি ধ্বনি উৎপাদনের সুযোগ বা প্রয়োজন দুদিকেরই সমান। বলা বাহুল্য, মৃদঙ্গের বোলগুলো সমধ্বনি নয়। অথচ বাদক লয়ের একটুখানি সাহায্য নিয়ে তাল ও মাধুর্য অনায়াসেই রক্ষা করে চলতে পারেন। কেন পারেন এ নিয়ে তাকে জবাবদিহি করা চলে না। না পারাটা সম্ভব হয় না বলেই হয়ত পারেন। যৌগিক ছন্দের মৃদঙ্গের দীর্ঘ অঙ্গটা হচ্ছে তার দীর্ঘলয়। তিন রকম তার ধ্বনি—চাপা-মুখর, টানা-গম্ভীর এবং মাঝারি। অর্থাৎ সংকুচিত দীর্ঘস্বর, প্রসারিত দীর্ঘস্বর এবং লয়েভারী লঘুস্বর। কবি এই ত্রিবিধ ধ্বনিকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে অপূর্ব ছন্দ রচনা করে থাকেন, সেটা পারেন বলেই। তাঁর এ পারাকে একমাত্র যৌগিক কথাটার প্রবর্তক ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ সন্দেহের চক্ষে দেখেন নি। মানুষ চলে, নিশ্চিত তাকে ভারসাম্য রক্ষা করেই কাজটা করতে হয়, অথচ তার জন্যে কোনো বৈজ্ঞানিককেই তাকে কৃত্রিমতার দোষে অপরাধী করতে শুনা যায়নি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘস্বরের সংকোচন-প্রসারণটা নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে।

(১) যুক্তধ্বনি নিত্য সংকুচিত অর্থাৎ এক মাত্রা।

(২) অযুক্তধ্বনি দ্বৈতধর্মী অর্থাৎ এক বা দুই মাত্রা।

(৩) শব্দের অন্তস্থ দীর্ঘধ্বনি নিত্য প্রসারিত অর্থাৎ দুই মাত্রা।

বসন্তের বীণা বাজে ব্যাকুলিত স্বরে,
গুঞ্জন-কঙ্কণ কাঁদে কাননের করে।

(বসন্তের সন্, গুঞ্জনের গুন্ এবং কঙ্কণের কঙ্) সংকুচিত।

কহিলেন রাজপুত মৃত্যু নহে ভয়,
ভীরুতারে করে ভয় রাজপুত-তনয়।

প্রথম 'রাজপুত' প্রসারিত, দ্বিতীয়টি সংকুচিত।

অথবা—

প্রসারণ :—শিউলি সুরভি তন্দ্র নিশীথ সমীর
সংকোচন :—জ্যোৎস্না ঝরে নদীজলে, তরুচ্ছায়া স্থির,
প্রসারণ :—আলপনা আঁকা ; কাঁদে মুরলীর সুর,
এ যেন আমারি ব্যথা সুন্দর-বিধুর।

সমীর, সুন্দর, বিধুর প্রভৃতি শব্দের অন্তস্থ দীর্ঘস্বর প্রসারিত।

বৎসর বৎসর হাঁকে কালের গোমায়ু—
যায় আয়ু যায় আয়ু যায় যায় আয়ু।

এখানে বিলম্বিত লয় বৎসরের 'বৎ'কে দিয়েছে একমাত্রার মূল্য, অন্যত্র 'যায়'কে দিয়েছে দ্বিমাত্রিক মর্যাদা। এমন অবস্থায় ছন্দটা নিঃসন্দেহ যৌগিক।

কাঁধে মই বলে, কই ভুঁইচাঁপা গাছ।
মই ভাঁড়ে ছিপ নাড়ে, খুঁজে কই মাছ॥

এখানে দীর্ঘস্বর আগাগোড়া দ্বিমাত্রিক, কোথাও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ছন্দটা কাজেই মাত্রাবৃত্ত, চার মাত্রার ভাগ। ষাণ্মাত্রিক পর্বেরও হতে পারে।

কাঁধে মই | বলে কই | ভুঁইচাঁপা | গাছ
অথবা— কাঁধে মই বলে | কোথা ভুঁইচাঁপা | গাছ

ঐ পংক্তিগুলোকেই নিয়ম খাটিয়ে যৌগিকের গাম্ভীর্য আরোপ করা চলে কিনা সে নিয়ে তর্ক তুল্‌ব না। কারণ প্রশ্নটা হবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের, ছন্দের নয়। এই সূত্রে একটা কথা উঠে পড়ে। সেটা এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে যৌগিকের প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

(১) যদি কথা মনে পড়ে তবে কলস্বরে···

খাটী লঘুস্বরের ছন্দ বলে এর একটা সহজ্য লালিত্য আছে, কিন্তু তাতে লয় ক্ষুণ্ণ হবার মতো কিছু হয়নি।

(২) মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ··

এতে আছে লঘুস্বর এবং প্রসারিত দীর্ঘস্বর। এর ধ্বনিটাও কোমল।

(৩) কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য-কিঙ্কিণী ··

সংকুচিত দীর্ঘস্বর ও লঘুস্বর। এর ধ্বনি-ঐশ্বর্য কলধ্বনি ও ও শিঞ্জনের বিচিত্র মিশ্রণে।

(৪) মন্দির-প্রাঙ্গণ-তল উৎসব-উজ্জ্বল

বিশুদ্ধ দীর্ঘস্বরের পংক্তি, সংকোচন প্রসারণের সমন্বয়।

(৫) অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা···

এতে তিন রকম ধ্বনিই শুনা যাচ্ছে।

একান্ত প্রসারণ দ্রুত লয়ে আমল পেয়েছে, বিলম্বিত লয় কখনও তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

কল্ কল্ ছল্ ছল্ টল্ মল্ জল···

এ লাইনটা মাত্রাবৃত্তেই চলে ভালো, অতিপ্রসারণ দুষ্ট হবার ভয় যেখানে নেই। যৌগিকে একান্ত সংকোচন 'বর্জিত'।

সপ্তপর্ণ বৃক্ষ শীর্ষে সুপ্ত নৈশ বায়ু

এ লাইনটা নিয়মের নিম্ন আদালতের বিচারে তিনটে ছন্দেই দখল অধিকার পেয়েছে। অথচ কানের রুলিং উল্টো কথাটাই বলে। তাতে অবিচার হয়েছে বলে মনে করিনে।

একেকটি যে বাক্য তার | ছিবলেমিতে ভরা

এ লাইন ছোক্‌রা ছিব্‌লে হলেও সম্ভ্রান্ত যৌগিক বংশীয় বটে। এর বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ থাক, রাগ করে তার বংশগৌরব অস্বীকার করার কোনো যুক্তি দেখিনা। এই জাতীয় ছন্দকে কাব্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া নিরাপদ হবে কিনা সে-প্রশ্ন মীমাংসার দায়িত্ব কবিদের। এটা ভুল করা উচিত হবে না যে, বর্তমান আলোচনাটা ছন্দের।

নিজের বাড়িতে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করছি, তাতে একটুখানি গুরুত্বের সুরও বাজ্‌চে। এতৎ-সত্ত্বেও খুশিমতো পা গুটিয়ে আরাম করে বসা সম্ভব হচ্ছে। ভাষাতেও যথেষ্ট প্রশ্রয় নেবার সুযোগ এখানে রয়েছে—, কেননা সেটা কেউ মনে করছেন না। কিন্তু আলোচনাটা যেখানে ঘরোয়া নয় এবং স্থানটাও ঘর নয়;—অর্থাৎ যেটা দস্তর মত সভাস্থল, সেখানে ছোটো-বড় সবাইকে আসলে ভাষণে সংযত হয়েই চল্‌তে হয়, নইলে গৌরব থাকে না। আলোচ্য পংক্তির ধ্বনি-সংকোচন ব্যাপারে ঘরোয়া মনোবৃত্তিটা অত্যধিক প্রশ্রয় পেয়েছে। তাতে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পংক্তিটার ভিতরে ভিতরে লয়-বিদ্রোহ আসন্ন হয়ে উঠেছে। কথ্য ভাষার একটা স্বাভাবিক তরলতা আছে, একটুতেই দোল খেয়ে ওঠে। এইজন্যেই প্রাকৃত শব্দবহুল ছন্দের হিসাব ঢেউ গণনা করে। এখানে বিলম্বিত লয়ের জবরদস্ত শাসনে অতিকষ্টে সে আত্মদমন করে আছে বটে, কিন্তু ছাড়া পেয়ে তরঙ্গিত হয়ে ওঠার দিকেই তার ঝোঁক। 'তার' কথাটার গায়ে একটুখানি ধাক্কা লাগলেই কিন্তু বাঁধ ভেঙে যায়।

একেকটি যে | বাক্য তাহার | ছিব্‌লেমিতে | ভরা
কিন্তু—ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এখানে 'একেকটি' সন্তান্থলের মর্যাদা দাবী করছে। অতএব চার মাত্রা। এ কেক্ টি = ৪। এই ন্যায্য দাবী মঞ্জুরের
১ ২ ১

মধ্যে চোখের সুপারিশ নেই,—

আশা করি এই সহজ কথাটা চোখের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিও স্বীকার করে নেবেন। 'একেক্টি' তার মেরুদণ্ড 'কেক্'টাকে সোজা করে বসেছে মাত্র। তাতে যৌগিকের আসরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। বরং এটা না করলেই দোষের হত।

তাছাড়া, 'একেকটী' পদটিকে যদি স্বরবৃত্তেই চতুঃস্বর পর্বের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেওয়া যায় তবে তাকে হরিজন বলার মত মহাজন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একেকটি যে | বাক্য তোমার | তপ্ত শলা/কা

এখানে 'একেকটি' তিনমাত্রা।

কিন্তু—বাক্য তো নয় | একেকটি | তপ্ত শলা কা

এখানে ত্রিস্বর হওয়া সত্বেও চতুঃস্বরের সঙ্গে তাল রাখতে সে পারছে। তার গাণিতিক ব্যাখ্যাটা এই যে, উল্লিখিত পংক্তিটার পর্বগুলো আসলে তিনটি দীর্ঘস্বর তরঙ্গের অনুকারী এবং 'একেকটি' পর্বের অনুকারী হ্রস্বস্বর দুটী এখানে একমাত্রিক।

মুগ্ধ তব চক্ষু দুটী মৌন গীতি গায়

এ লাইনটা ছন্দের ত্র্যহস্পর্শ।

তিনজন লোক চলেছে তিন রকমের বেগ নিয়ে। একজন পা ফেলছে প্রতি ২য় সেকেণ্ডে, অন্যজন ফেলছে ৩য় সেকেণ্ডে এবং তৃতীয় ব্যক্তির পদক্ষেপটা প্রতি ৪র্থ সেকেণ্ডে। কিন্তু গতিবেগের এই বিভিন্নতা থাকা সত্বেও এমন একটী মুহূর্ত আসবে যখন ঐ তিন ব্যক্তির পদধ্বনির মিলন ঘটবে। বোধ করি সেটা দ্বাদশ মুহূর্ত। বলা বাহুল্য, উপরের পংক্তিটার পর্বে পর্বে ঐ রকম দ্বাদশ মুহূর্তের হিসাব পাওয়া যাবে। উক্ত পংক্তিটার সম্পর্কে এটুকু বলা বোধ করি অবান্তর হবে না যে, ঐ জাতীয় 'সব-ছন্দে-আছি' লাইনগুলো প্রকৃতপ্রস্তাবে 'সব-কিছু-জানি' লোকের মতই। যোগ্যতাটা শুধু কাজ চালাবার মতই, প্রতিনিধিত্বের নয়।

যৌগিকের স্বরমাত্রিকতা সম্বন্ধে এখনো কারো কারো মনে দ্বিধা থেকে যেতে পারে, বিচিত্র নয়। তার সব চেয়ে বড়ো হেতুটা এই হতে পারে যে, সত্যই যদি ছন্দটা অক্ষর গোণা নয় তবে মাত্রা ও অক্ষর সংখ্যার এমন রাজ-যোটক হয় কী করে। ১৪ মাত্রার পয়ার জাতীয় ছন্দে দেখা যায় শতকরা ৯৯টি পংক্তিরই বর্ণ সংখ্যা চৌদ্দ, এটা হয় কেন।

উত্তরে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, খুঁজলে এমন অনেক মাত্রাবৃত্তের সন্ধান মিলবে যেগুলোর মাত্রা ও বর্ণ সংখ্যার একটুকু অমিল নেই। কিন্তু সেই যুক্তিতে ছন্দটাকে অক্ষর গোণা বলা চলবে কি? দ্বিতীয় কথাটা এই যে, পুনরুক্তি অনিবার্য। কারণ ছন্দ জিনিষটাকে সত্যি বুঝতে হবে।

সব ছন্দের মূলে আছে বিশেষ করে দীর্ঘস্বরের হিসাবটাই। বলেছি, মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘস্বরকে দুটি হ্রস্বস্বরের সমান করে নেওয়া হয়েছে—অবশ্য লয়ের সাহায্যে। কিন্তু আসল ওজনটা তার দুটি হ্রস্বস্বরের চাইতে অনেক কম। দেড়ার মত হবে। 'নানা' এবং 'নয়' এর সঙ্গে তুলনা করলেই জানা যাবে। স্বরবৃত্ত ঐ এক ও দেড়ের অসমান বোঝা দুটোকে দু হাতে নিয়ে মধ্যলয়ে পথ চলেছে। ফলে ভারসাম্য করতে গিয়ে ছন্দটার সর্বাঙ্গে সব সময়েই একটা হিল্লোল থেকে যাচ্ছে! স্বরবৃত্তের হেলে দুলে চলার মূলে আছে ঐ কথাটাই। কিন্তু যৌগিক ছন্দটা কৌশলী। সে নিয়েছে দীর্ঘলয়ের বাঁকের সাহায্য। তার দুমাথায় দুটো অসমান ভারকে ঝুলিয়ে দিব্যি ধীর মন্থর গমনে সে চলে যেতে পারছে। ভারসাম্যের ঝোঁকটা যাচ্ছে বাঁকের উপর দিয়েই। তার গতি-গাম্ভীর্য তাতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। যৌগিকের ধ্বনি-গাম্ভীর্য্যের মূলে আছে ঐ তত্ত্বটাই। অর্থাৎ লয়ের সাহায্য। চোখের চালাকি তাতে একটুকুও নেই। এমনি করে যৌগিকে যুক্ত ও অযুক্ত ধ্বনি সমমাত্রিক হয়ে উঠেছে—পরোক্ষ ভাবেই। অক্ষর গোণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেউ তার বিরুদ্ধে দাখিল করতে পারবে না, পরোক্ষ প্রমাণও না।

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ | লট্‌কনের ছাল

সিট্‌কে মুখ খাবি জয় | আট্‌কে যাবে কাল।

এটাও যৌগিক, ১৪ মাত্রার। কিন্তু অক্ষর সংখ্যার ঐক্য ঘটেনি। কারণটা এই যে, সিট্‌কে, টোট্‌কা, আট্‌কে

প্রভৃতি প্রাকৃত শব্দকে এখানে স্থান দিতে হয়েছে বিষয় বস্তুর অনুরোধে এবং ঐ শব্দগুলোর যুক্তলিপি নাই। কিন্তু এটা সত্যি কথা যে, আসলে ছন্দটা গুরু-গম্ভীর ভাবের এবং যেহেতু প্রাকৃত শব্দবহুল ভাষা বিলম্বিত লয়ের শাসন মেনে চলে না সেই জন্যেই যৌগিকে প্রাকৃত শব্দকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলতে হয়। এটা দেখানো হয়েছে যে, প্রাকৃত শব্দের বহুল প্রয়োগে যৌগিক অজ্ঞাতসারেই স্বরবৃত্তে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। অন্ততঃ তদ্‌ভাবাপন্ন হবে। বলা বাহুল্য, তাতে প্রয়োগকারীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

চলতি ভাষা মানবে শাসন পাগ্‌লা ঝোরা সে যে।

এরও তো মাত্রা সংখ্যা ১৪, কিন্তু দীর্ঘস্বরের স্রোতটা দুর্বার। বিলম্বিত লয়ের বাঁধন এ মানবে না। যে-কোনো ছন্দোবিৎ সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

কিন্তু ঐ ক্ষ্যাপা স্বরধারার পরিমাণটা কিন্তু খুব বেশি নয়। তাকে আমাদের সাধু ভাষার চতুর্দশ অক্ষরের হৃদে অনায়াসে ধরে রেখে গাম্ভীর্য দান করা চলে।

মন্দার-মঞ্জরী তোলে চঞ্চল কঙ্কণে···

অথবা— মন্দির প্রাঙ্গণ-তল উৎসব উজ্জ্বল···

এখানে দীর্ঘস্বরের সংখ্যা কোনো অংশে কম নয়। এ থেকে সাধু ভাষার ধৃতিশক্তির একটা পরিচয় পাওয়া গেল অথবা ভাষান্তরে এও বলা চলে যে, যুক্তবর্ণাশ্রিত দীর্ঘস্বর-গুলো দুরন্ত নয়, বরং সহজবশ্য। বাস্তবিক পক্ষেও তাই। এগুলো বৃষজাতীয় নয়, এগুলো যেন ওষধিজাতীয়, বিলম্বিত লয়ের গভীর ধারার কাছে আপনি মাথা হেঁট করে থাকে। এই স্বভাব-সংকুচিতদের প্রকাশ করা কানের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বিশেষ ধ্বনি আত্মসাৎ করে গম্ভীর হয়ে ওঠাই যেখানে উদ্দেশ্য। এই কারণেই যুক্তবর্ণকে দুই মাত্রা ধরে পয়ার জাতীয় ছন্দ রচনা করতে কোনো কবিকেই দেখা যায় না। নেহাৎ লয়ভ্রান্তি না ঘটলে এ হবার জো নেই। কথাটা আরেকটু বিশদ করে বলা ভালো।

এক বা উভয় পক্ষের যে ন্যূনাধিক খর্বতা স্বীকার তাকেই বলি সন্ধি। কথাটা ধ্বনির বেলাতেও সত্য। সন্ধিবদ্ধ ধ্বনি বা যুক্ত ধ্বনি মুক্ত ধ্বনির চেয়ে ছোটো—সে প্রভেদ যত সূক্ষ্ম বলেই মনে হোক। রাজপুত ও চঞ্চল শব্দের ধ্বনি নিক্তির ওজনে সমান বলে মানব না। 'তিনি রাজপুত' বলার সময় 'রাজপুত'কে দীর্ঘ করে উচ্চারণ করি না। কিন্তু 'ভারী চঞ্চল ছেলে' এখানে চঞ্চল শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ চাঞ্চল্যের দ্যোতক। এক্কা, পক্ষী প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ তীক্ষ্ণ সংকুচিত, অনেকটা তক্ষকের ডাকের মতো। সে-তুলনায় জ্যোৎস্না, জোনাকী (জোয়া নয়) কোমল ও প্রসারিত। বাস্তবিক, যুক্তবর্ণ হচ্ছে রুক্ষ বা দৃঢ় ধ্বনির সংকেত লিপি, আর অযুক্তবর্ণ কোমল ধ্বনির। ভাষান্তরে বলা চলে, ধ্বনির দৃঢ়তা বা কোমলতা শব্দের সংকোচ প্রসারণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। যৌগিকে শব্দের অন্তস্থ দীর্ঘস্বরের কোমলতা প্রসারণ জনিত। কিন্তু কোমল ধ্বনি শুধু শব্দের অন্তে থাকাই উচিত অথবা অকারণেও ধ্বনিকে দৃঢ় করে তুলতে হবে এমন কথা বোধ করি প্রবোধবাবুও বলেন না। রচয়িতার অভিরুচি অনুসারে স্থান বিশেষে 'কুর্চি'র দ্বিমাত্রিক তীক্ষ্ণতা বর্জন করে যদি তাকে ত্রৈমাত্রিক কোমলতা দেওয়া হয় তবে প্রবোধ বাবুর আবিষ্কৃত নিয়মকে নিশ্চয়ই অমান্য করা হবে, কিন্তু তাতে ছন্দের দিক থেকে কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে করি না। ভক্তি শক্তি প্রভৃতি শব্দের হসন্ত বর্জিত প্রয়োগ ঐ ভাবেই তো চল্‌তি হয়ে গেছে। যাই হোক, যৌগিকে কেন যে সাধু ভাষারই প্রাধান্য এবং কেনই বা তার মাত্রা ও বর্ণ সংখ্যার সচরাচর এমন ঐক্য ঘটে থাকে বোধ হয় সেটা যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলা হল।

পুনশ্চ বলি :—স্বরবৃত্তে দীর্ঘস্বরের যে-হিসাব সে হচ্ছে তার চাঞ্চল্য প্রকাশের হিসাব। অর্থাৎ কতবার সে ঢেউ দিয়ে উঠেছে তারি গণনা। আর যৌগিকে হিসাবটা হচ্ছে ঠিক তার উল্টা। অর্থাৎ সংকোচ প্রসারণের বৈতশাসন চালিয়ে কতবার তাকে সংযত করে রাখা হয়েছে সেইটে। মাত্রাবৃত্তের হিসাবটা হচ্ছে 'গ্রেস্ মার্কের'।

দীর্ঘস্বরকে নিয়ে এই যে তিনটে ছন্দের তিন রকম হিসাব দেখা গেল সেটা কি ঐ বেতরো স্বরটাকে সমধর্মী করবার হিসাব নয়? এ থেকে কি বলা চলে না যে, ছন্দ মাত্রই স্বরমান?

ছন্দের নামকরণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

মাত্রা শব্দের অর্থ পরিমাণ, নিজস্ব পরিমাণ বা মাত্রা বিস্মৃত হলে কোন্ ছন্দেরই বা ইজ্জৎ থাকে? মাত্রাবৃত্ত নামটার সার্থকতা সেইজন্যেই আমরা খুঁজে পাইনে।

আবার ছন্দমাত্রই স্বরমান, অতএব 'স্বরবৃত্ত' সম্বন্ধেও আমাদের একই বক্তব্য।

যৌগিক কথাটার বিরুদ্ধে আমরা অন্যত্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। সব চেয়ে বড়ো দরের ছন্দটাকে যৌগিক বললে সব চেয়ে বড় ভুলের কাজটাকে কী বলা হবে? যৌগিক ভ্রান্তি বলা যাবে কি?

গতি ও মাত্রাদর্শের বিচারে মাত্রাবৃত্তের পরিবর্তে আমরা লঘিমা নামেরই পক্ষপাতী। লঘিমার গতি দ্রুত এবং লঘু। ভারী দীর্ঘস্বরটার উপর নিজের লঘু আদর্শ খাটিয়ে সে তাকে হালকা করে নেয়।

স্বরবৃত্ত না বলে হসন্তিকা এইজন্যে বলতে চাই যে ছন্দটা হসন্ত ধ্বনির। দীর্ঘস্বরের স্বাভাবিক ধ্বনিকে আর কোনো ছন্দ এমন আমল দেয়নি।

যৌগিককে মন্দ্রা বলার স্বপক্ষযুক্তি মৃদঙ্গের সঙ্গে তার উপমার মধ্যেই রয়েছে।

আমাদের বক্তব্য শেষ করেছি। স্বমত সমর্থনের নজির বাড়িয়ে বিচারকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

সুবোধ পুরকায়স্থ

সুস্থের চিকিৎসা

শঙ্করানন্দ কবিরাজ

সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তে যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ চেষ্টা করছে কি ক'রে সে দুঃখকে অতিক্রম ক'রবে। দুঃখ কেউই চায় না, তবুও এ যে জীবনের প্রত্যেক সূত্রে নিগূঢ়ভাবে জড়িত হ'য়ে আছে—তাই মানুষের অবিরাম প্রয়াস চলেছে এই অবাঞ্ছিতের হাত থেকে মুক্তি পাবার তরে; তার কর্ম্মে, তার বাক্যে, তার চিন্তায় প্রকাশ পায় এর চিহ্ন, প্রকাশ পায় সুখের অনুসন্ধিৎসা, দেহ ও মনের গ্লানিকে নিঃশেষিত ক'রে সে চায় স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ।

বহু দুঃখের মধ্যে সব চেয়ে বড় হলো এই দেহায়তনটী যখন রোগায়তনে পরিণত হয়। তাই জগতের সকল চাওয়ার আগে চাইতে হয় আরোগ্য, নইলে—'প্রাণ পরিত্যাগে চ সর্ব্বপরিত্যাগঃ,' কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর একবার নিরাময় হ'লেও তো নিষ্কৃতি নেই—বারে বারে একই দুঃখ তাকে অভিভূত করে তোলে। রোগের চিকিৎসা রোগ যন্ত্রণা দূর করে সত্য, অনাগতকে বাধা দেয় কে? এমন অসহায় অবস্থায় প্রতিকার না হলে জীবন কাটানও তো দুঃসহ! কাঁটা ফুটলে তা বের করা সমীচীন, কিন্তু কাঁটা যাতে না ফোটে তার ব্যবস্থা করাটা শ্রেয় সন্দেহ নাই। তাই আয়ুর্ব্বেদ বিধান দিল—শুধু রোগীর নয়, অরোগীরও চিকিৎসা চলে এবং এই চিকিৎসাই মানুষকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য নিরুদ্বিগ্ন জীবনের আস্বাদ অনুভব করিয়ে থাকে।

পৃথিবীর যে কোন জাতির সংস্কৃতির মধ্যে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ যেমন প্রাচীনতম, তেমনি চিকিৎসা তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত দিক দিয়ে আজও ইহা অপরাজেয়। অবশ্য কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রই নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে নেই,—সবই চেষ্টা ক'রছে কী করে দীর্ঘতর জীবনকে পরিপূর্ণ আনন্দ ও শক্তির সঙ্গে উপভোগ করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে জীবন যৌবন ও দৈহিক গঠন প্রভৃতির উপর শরীরের গ্রন্থি সমূহের প্রভাব অসীম। এই ধারণা হ'তেই বর্ত্তমানে গ্রন্থি সংযোগ দ্বারা অথবা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি হ'তে তৈরী ঔষধ দিয়ে যৌবনোচিত শক্তিকে বজায় রাখার চেষ্টা

চলছে। বিশেষতঃ আজ কাল পাশ্চাত্য চিকিৎসার ধারায় জান্তব ভেষজ্যেরই প্রাধান্য। আয়ুর্বেদের সঙ্গে এই মতেরও সামঞ্জস্য খানিকটা আছে।

আয়ুর্বেদ রসায়ন তন্ত্রে এই নিয়ে গবেষণা হ'য়েছে। রসায়ন শব্দের মানে হ'লো "যজ্জরা ব্যাধি বিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্," জরা ও ব্যাধিকে বাধা দেওয়ার মত শক্তি যারা জন্মাতে পারে সেই সব ভেষজকেই রসায়ন বলা হয়। আহার্য্য রসই শরীরের পরিপোষণ ও পুষ্টির মূল। এই রসেরই রূপান্তরে শরীরটাকেও রূপান্তরিত করা যায়, রসায়নের দ্বারা এমন রসের উৎপাদন হয় যাহা মানুষের নিত্যকার চাহিদা ও আনুষঙ্গিক পুষ্টির খোরাক যুগিয়েও এত শক্তি সঞ্চিত হয়ে যাতে ঐ অপ্রার্থিত আধি ছুটোকে বহু কালের জন্য বাধা দেওয়ার ক্ষমতা জন্মে। গ্রন্থিসমূহ শরীরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার মূলেও ঐগুলির রসঃক্ষরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রসের উপাদান বাহিরের খোরাক থেকেই জোটে।

এরই জন্য দেখা যায় একটা কৈফিয়ৎ—"বিশিষ্টরস-জনকত্বে সতি জরা নিবর্ত্তকত্বং রসায়নত্বম্।"

আয়ুর্ব্বেদে জান্তব, উদ্ভিদ্ ও পার্থিব সব রকম ঔষধেরই ব্যবহার আছে। একটা কিছুর দিকে অতিরিক্ত প্রীতি তেমন দেখা যায় না। রসায়নের বেলায়ও তাই। সব রকম ভেষজের প্রয়োগ আছে। শুধু গাছগাছড়ার তৈরী ঔষধের শক্তি কতখানি হ'তে পারে তা একটা সামান্য ফলশ্রুতি পড়লে বোঝা যায়—'জরাব্যাধিং পূর্ণমপাস্যরূপম্ বিভর্তিরূপম্ নব যৌবনানাম্।" আজ-কালের কল্পনা মানুষকে যৌবন গণ্ডীতে আবদ্ধ করার জন্য উন্মাদ করে তোলে—এর বেশী সে ভাবতে পারে না; বার্দ্ধক্যকে একটু পেছিয়ে দেওয়াই তার পরম আনন্দময় সার্থকতা। কিন্তু যে অতীতকে আমরা শুধু শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণই কর্ত্তে পারি সে দিনের দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত, আরও উদার—সে দিনের মরণ রূপকেও চাইতো দূরে সরিয়ে দিতে আর তার একটা উপায় ছিল এই রসায়ন—

'দেবর্ষিভিঃ মরণং জরাবিনাশং কিলাস্মিঃ
রসায়নতপোজপ্য তৎপর্য্য নবা নিবর্তিতং'।

শুধু গ্রন্থির রস দিয়ে গ্রন্থিকে পরিপুষ্ট করা চলে কিন্তু তার যেমন শক্তি জন্মাবার পক্ষে ভারতীয় রসায়ন পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়, এই যুগের নব প্রচেষ্টা এখনও আঁতুরে ধাত্রীর সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে দিন কাটাচ্ছে। দুঃখকে দূর করে আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু লাভ করতে হলে এখনও সেই অতীতের সাধনাই মানুষের আশ্রয়—এর চেয়ে বড় আশ্বাস ভবিষ্যতের আলোকে ফুটে উঠবে কিনা কে জানে?

শঙ্করানন্দ কবিরাজ

যম ও যমুনা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

যম

তোমার মুখের পানে চেয়ে মনে হয়,
তোমাতে আমাতে ভেদ নাই। এ বর্ষায়
দেখ চেয়ে শিহরিত কদম্বের বন,
ঘনশ্যাম বেণুকুঞ্জ, গন্ধে কেতকীর
ধরণী জানায় তা'র নিবিড় মমতা;
য়্‌থিরা পড়িছে ঝ'রে সিক্ত পৃথ্বী 'পরে—
ঝিল্লী আর দাত্বরীর সান্দ্র একতান
চিত্ত মোর ক্ষণে ক্ষণে করিছে বিধুর।
সুন্দর কবরী তব, সুমসৃণ স্তন,
স-মঞ্জীর পদস্পর্শে পুষ্পিতা ধরণী
বারিধারে রোমাঞ্চিত পৃথ্বী মৃত্তিকার
মদির মধুর গন্ধ তোমার নিঃশ্বাসে—
এস তুমি, ধরো হাত; চাহি' তব মুখে
আমারে ভাবিতে দাও জন্মান্তর কথা,
ধারা সিক্ত বনবীথি, নিঃস্তব্ধ গম্ভীর—
আমারে ভাবিতে দাও চাহি' তব মুখে .
তোমাতে আমাতে ভেদ নাই।

যমুনা

প্রিয়তম,
জন্মান্তর কতদূর আসে না স্মরণে।
নব বর্ষা, ধরণীরে বড় ভালো লাগে।
আর বড় ভালো লাগে দীর্ঘ দেহ তব
সুন্দর, সুঠাম। সাধ যায়, বীরদেহ
জড়াইয়া লতাসম সুমন্দ সমীরে
পুষ্পফলবতী হই বসুন্ধরা তলে।

যম

দেখ দূর নত প্রান্ত গগনের কোণে
মেঘের বিচিত্র লীলা—কেহ বা ধূসর,
কেহ বা পিশঙ্গ ঘোর, পর্ব্বতের মত
উচ্চনীচ—সানু-দেহ, আরেক ধরণী
গড়িয়া উঠিছে ধীরে আকাশের গায়।
কি বিচিত্র বসুন্ধরা, বিচিত্র আকাশ,—
ক্ষণকাল বসি হেথা নরকের জ্বালা
ভুলিবারে। দেহীদের জীবন-প্রবাহ
এস করি অনুভব—তপ্ত ধরণীর
জ্বালা আর স্নিগ্ধ প্রেম করি অনুভব।

কান পেতে রই শোনো স্পন্দনে স্পন্দনে
হর্ষে আর দুখে সুখে, উচ্চকোলাহলে
ধরণীর প্রেমতৃষা করি অনুভব।
দ্বিধা হয় এ প্রবাহ—এক ধারা আসে
ল'য়ে যত তৃষ্ণাতাপ, বিভৎস বিকার
যত ক্ষয়, যত ক্ষতি লজ্জা আর ভয়,
যত গ্লানি অপূর্ণতা আসে মোর পানে।
জ্বলে তা'রা, ধসে তা'রা সুতীব্র চীৎকারে
তীব্রতর শোচনায় জ্বলে মরে তা'রা।
অন্য ধারা ব'য়ে যায় বৈজয়ন্ত ধামে
পুণ্যময় শুভ্র স্বচ্ছ প্রেম-মন্দাকিনী,
সেথা মোর জেনো সখি, নাহি অধিকার।
যন্ত্রণার প্রেতভূমে আমি অধীশ্বর
অচল, স্থবির আমি ন্যায় দণ্ডধর—
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই লেলিহ রসনা
পাপদাহী বৈশ্বানরচ্ছটা ; নিদ্রা নাই
নেত্রপ্রান্তে তাই। সদা ক্লান্তি ঘেরে মোরে।
তাই আমি আসিলাম বসুন্ধরা-তলে
সুশোভনা, জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা—
তাঁহারে প্রণমি আর হেরি এই লীলা।
তুমি মোর ধরো হাত, নেত্রে ঘুমঘোর,
আর এস শুনি মোরা তরঙ্গ-কল্লোল।

যমুনা

বলো শুনি সুগম্ভীর সাগ্রহ বচন।
নামুক নিদ্রার ঘোর নেত্র প্রান্তে মম।
তব কণ্ঠস্বরে মোর যেন মনে হয়,
বহিছে রাত্রির নদী, শান্ত জলভার
নিরুদ্দেশা দিগন্তের পানে। প্রিয়তম,
ধরিত্রীর বাহু যেন ঘিরেছে আমারে,

যত তা'র লতাপুষ্প, যত তা'র ফল,
যত ভোগবতী নদী, শান্ত কলস্বনা—
যত পাখী, যত পশু, পতঙ্গের মেলা,
দীর্ঘ দেহ সরীসৃপ, সুন্দর নির্ঝর,
ষড়ঋতু আবর্ত্তনে নাচিছে ঘিরিয়া
আমার সুন্দর তনু, নাচিছে ঘিরিয়া
মোর মুক্ত কেশপাশ,—সেই ছন্দে যেন
নূতন ধরণী আমি চাহি রচিবারে
চাহি রচিবারে নূতন স্নেহের নীড়—
মোর ছন্দে নব পৃথ্বী উঠিবে গড়িয়া—
সেথা তুমি র'বে পাশে সুন্দর দেবতা,
তোমার কিরীট যেন স্পর্শিছে আকাশ,
স্পর্শিছে আমার মন তোমার কিরীট।
তুমি সেথা র'বে পাশে—গড়িবে মেখলা,
রত্নহার, গড়িবে আমার তনু-দেহ,
দিবে লাবণ্যের রেখা আমার কপালে,
উরশ পরশি' মোর মায়াঞ্জন দিবে
নেত্রে মোর-তুমি মোর সুন্দর দেবতা।

যম (নত নেত্রে)

আমারে ফিরিতে হ'বে অধিরাজ্যে মোর

যমুনা

আমারেও ল'বে পাশে অধিরাজ্যে তব
তব সিংহাসন পাশে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে
আমিও শুনিতে চাই করুণ ক্রন্দন,
এস মোরা দুইজনে হই একাকার
এক দুঃখ, এক সুখ একটি শাসন।
এস হই এক দেহ অর্দ্ধনারীশ্বর।

যম (ম্লান হাস্যে)

দগ্ধতাম্র নরকের সেই সিংহাসন ;
সেথা শুধু অন্ধকার, আলোরেখাহীন।
মাঝে মাঝে দেহীদের ক্রন্দন-কল্লোল,
তীব্রজ্যোতি বৈশ্বানর, শুধু কালো ছায়া !
সেথা তুমি র'বে পাশে, পারি না ভাবিতে।
তা'র চেয়ে ধরো হাত, উন্মুক্ত প্রান্তর—
রসাল বনের ছায়ে বসি ক্ষণকাল।
হেথাকার আলোছায়া, অরণ্য মর্ম্মর,
পাখীদের কাকলিতে হ'য়েছি বিহ্বল।
মনে হয় এ ধরণী করুণ সুন্দর,
এরে ছেড়ে যেতে হ'বে—তাই ভালো লাগে
তাই তোমা' ভালবাসি সুন্দরী যমুনে,
সর্ব্বধ্বংসী মহাকাল, মাঝে দণ্ড দুই
নূতন ধান্যের ঘ্রাণ, জড়া'য়ে জড়া'য়ে
পদপ্রান্তে লতাবাহু, পাখী উড়ে যায়—
সময়েরে করি জয় হেন সাধ্য নাই।

যমুনা

তবে কেন সম্ভাষিলে স্নেহস্বরে মোরে
তব কণ্ঠে শুনিলাম জন্ম-জন্মান্তের
প্রণয়ীর গদ্‌গদভাষণ, দু' দণ্ডের
এ ধরণী, শুধু এর নদীস্রোতে নামি'
পান করি স্বচ্ছ জল, বনতলে পশি'
আস্বাদিয়া মিষ্ট ফল, ছুটিয়া প্রান্তরে
জড়ায়ে অলক গুচ্ছে মুক্তা শিশিরের
মাটির মদির ঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে বহি,
এরে ছেড়ে চ'লে যা'বে শুভ্র দেবদূত।
পাখায় বহিয়া ল'য়ে সিন্ধুর শীকর,
শৈবালের ঘন গন্ধ ; তবে নাম ধরি'
স্নিগ্ধ স্বরে তুমি কেন ডাকিলে আমায় ?
আমার তরুণ তনু পারে না সহিতে
অসহ প্রেমের দাহ—দূর নীলাম্বরে
সাধ যায় মিশে যাই বর্ণের সাগরে
মিশে যাই মৃত্তিকায়, মিশি নদী স্রোতে
ফিরে যাই মরজন্ম-রহস্যের মাঝে।

যম

(সহসা পার্শ্বেই নদীর কলধ্বনি শুনিয়া সবিস্ময়ে)

মিশে গেলে নীল জলে হে মর্ত্ত্যদুহিতা ?
অন্তর্মুখ প্রবাহের অয়ি উদাসিনি,
গতি দিলে,—দিলে প্রাণ তৃষাতপ্ত জলে,
ধরণীরে বাণী দিলে, বাণী চিরন্তনী !
এ উদাস প্রাণে দিলে সুদূর ইঙ্গিত,
আপনারে ভুলিবার, চলিবার গান—
হে যমুনা, কলস্বনা, অতুলনা নদী !

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

যবনিকা

(নাটক)

শ্রীসুবোধ বসু

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৈত্যাভ্যন্তর। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চৈত্যের সর্ব্বত্র দীপ প্রজ্বলিত। ভিক্ষুণী সুজয়া দীপ হস্তে আরতি নৃত্যে প্রবৃত্ত আছে। অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ জোড় হস্তে দণ্ডায়মান।

নৃত্যার্চ্চনা সমাপ্ত হইলে সুজয়া বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদদেশে দীপ রক্ষা করিয়া প্রণাম করিল এবং অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। তখন ভিক্ষুণীগণ নিম্নলিখিত শ্লোকোচ্চারণ করিল :

ভিক্ষুণীগণ

যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি ॥

দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং
অরিয়ঞ্চট্ঠাঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং ॥

এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং
এতং সরণমাগম্ম সব্ব দুক্খা পমুচ্চতি ॥

(যদি কেহ বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লয়, এবং দুঃখের কারণ অতিক্রম প্রভৃতি সত্য সম্যক্ জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া দেখে, তবে এমন আশ্রয় আর নাই। এই আশ্রয় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত হওয়া যায়)।

বুদ্ধমূর্ত্তিকে প্রণাম করিল।

সেবিকা

নতুন সঙ্ঘনেত্রী কোথায় গেলেন? পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তার দেমাকটা দেখি বড়ই বেড়েছে : সন্ধ্যার্চ্চনার সময় অনুপস্থিত থাক্তেও তার আটকায় না।

সুজয়া

সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রা নিজ কক্ষে অর্গল রুদ্ধ করে ধ্যানে বসেছেন; ধ্যান সাঙ্গ করে নিজে বেরিয়ে না এলে তাঁকে ডাকা নিষেধ আছে। তার ধ্যান তো এখনও সমাপ্ত হয় নি, সেবিকা। তবে কেন অভিযোগ করচ!

সেবিকা

অভিযোগ আমি করি না; যা দেখি, তাই বলি। রাজাদেশ অমান্য করে ভিক্ষুণী সুমিত্রা সমস্ত সঙ্ঘকে বিপদের মুখে এগিয়ে দিয়ে, এখন কক্ষের অর্গল রুদ্ধ করে বসে আছেন। [সব্যঙ্গে] বড় দূরদর্শিতা, বড়ই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন!

বিনীতা

সঙ্ঘনেত্রীর প্রতি এ ভাষা প্রয়োগ তোমার উচিত নয়, ভিক্ষুণী।

সেবিকা

সঙ্ঘনেত্রীর মধ্যে আমরা বুদ্ধির পরিপক্কতা আশা করি। হঠকারিতা সঙ্ঘনেত্রীর গৌরব বৃদ্ধি করে না।

বিনীতা

সঙ্ঘ-ধর্ম্মে অবাধ্যতার স্থান নেই।

সেবিকা

রাজদ্রোহিনী আবার সঙ্ঘনেত্রী! তাকে আবার মান্‌তে! মরি মরি! শোন্ ভিক্ষুণীরা, তোমার নতুন সঙ্ঘনেত্রীকে অবহেলা করতে আমার একটুও দ্বিধা নেই। [অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] দেখ গিয়ে তোরা, চৈত্যের সিংহদ্বার আমি খুলে দিয়েচি। রাজদৌবারিক যদি আবার আসে, এবার আর সে ফিরে যাবে না।

সুজয়া

সর্ব্বনাশ, এ কি কথা! তুমি করেচ কি ভিক্ষুণী?

অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ

সঙ্ঘনেত্রীর আদেশ অমান্য করেচ!

কে এই দুর্ম্মতি তোমাকে দিল।

কী সর্ব্বনাশ, এবার যদি কাপালিক এসে প্রবেশ করে!

বিনীতা

রুদ্ধ অর্গল তুমি খুললে কি করে?

সেবিকা

যেমন করে সবাই খোলে—চাবি দিয়ে। বৌদ্ধ চৈত্য কারুর গৃহান্তঃপুর নয়; সবার এখানে অবারিত দ্বার—সর্ব্বসাধারণের সে অধিকার স্থাপন করে এলাম।

সুজয়া

ভিক্ষুণী সেবিকা, দুঃসাহসিকা হয়ো না। ত্বরা করো, সিংহদ্বার রুদ্ধ করে এস।

বিনীতা

সঙ্ঘদ্রোহিতা সহজ অপরাধ নয়, ভিক্ষুণী। চাবি দাও আমার হাতে,—সিংহদ্বারে আমি কুলুপ বন্ধ করে আসি।

সেবিকা

দেব না—কিছুতেই দেব না। চাবি আমি গোপন করেচি—কারুর সাধ্য নাই আমার অনিচ্ছায় সে চাবি খুঁজে আনে। চৈত্যদ্বার খোলা থাকবে; রাজদৌবারিকের পথ আটকাবে, এমন সাধ্যি, সুমিত্রার?

রাজা মহীপালের প্রবেশ ও স্তম্ভের পাশে আত্মগোপন।

রাজা মহীপাল যেমন দেশের অধীশ্বর, তেমন এই চৈত্যেরও অধীশ্বর। রাজাদেশে উপেক্ষা দেখিয়ে বুঝি সুমিত্রার আদেশকেই বড় করে দেখব, কেমন? [সাক্রোশে] সঙ্ঘনেত্রী প্রজ্ঞাপতির এমন করে নতুন সঙ্ঘনেত্রী নির্ব্বাচন করার কি অধিকার ছিল, শুনি! তার এ পক্ষপাতিত্ব রক্ত মাংসের শরীরে সহ্য যায় না।

বিনীতা

বুঝতে পেরেচি, তোমার ক্ষতটা কোথায়!

সেবিকা

জেনে সুখী হলাম। কিন্তু মনেও করো না, এ অন্যায় আমি নীরবে সইব। মহারাজ মহীপালের কাছে যদি আমি ওর বিচার না চাই, তবে আমার নাম সেবিকাই নয়।

সুজয়া

[ঈষৎ কৌতুকের সুরে] সে কি গো, ভিক্ষুণী। সঙ্ঘ ছেড়ে তুমি যাবে রাজার সভায় নালিশ করতে? তবে সংসার ছেড়ে সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলে কেন?

সেবিকা

বেশি দূর যেতে হবে না। শুনেচি, মহারাজ মহীপাল অদূরেই শিবির স্থাপন করেচেন। তার কাছে গিয়ে বলব—"মহারাজ, সঙ্ঘনেত্রী প্রজ্ঞাপতি রাজদ্রোহিণী ছিলেন, কিন্তু ভয় পেয়ে তারই মতো অন্য এক রাজদ্রোহিণীর হস্তে সঙ্ঘভার অর্পণ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েচেন। নতুন সঙ্ঘনেত্রীর আদেশে আমাদের চৈত্যে রাজদ্রোহিতার উৎকট প্রেতনৃত্য সুরু হয়েচে। ধর্ম্মের ভাণ করে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচারের ভার নিয়েছে নবনিযুক্তা সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রা।" একবার দেখব, এর পরে মহারাজ মহীপাল কেমন করে' চুপ করে' থাকেন!

বিনীতা

পাগল! সে কি কখনও থাকেন! বরঞ্চ তোমার প্রচুর রাজভক্তি দেখে খুসি হয়ে, সঙ্ঘনেত্রীর পদটা তোমাকেই দিয়ে দেবেন। [ভিক্ষুণীগণের প্রতি] কি বলিস ভাই তোরা?

ভিক্ষুণীগণ হাস্য করিল।

সেবিকা

[সক্রোধে] ঠাট্টা!

সুজয়া

ঠাট্টা তোমার সঙ্গে! তুমি হলে রাজার প্রতিনিধি, তোমার সঙ্গে পরিহাস করতে গিয়ে শেষে বিপদে পড়ব!

ভিক্ষুণীগণ পুনরায় হাসিয়া উঠিল।
মহীপাল অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

মহীপাল

[কাশিয়া অগ্রসর হইয়া] রাজাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করাই কি আজকাল বৌদ্ধচৈত্যের প্রধান কাজ হয়েচে। ধ্যানার্চ্চনার জন্য চৈত্য ব্যবহৃত হয় বলেই লোক জানত।

ভিক্ষুণীগণ বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

বিনীতা

অপরিচিত অতিথি, আপনাকে অভ্যর্থনার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আপনার পরিচয় জানতে পারলে অতিথি-সংকারের ব্যবস্থা করি।

মহীপাল

আমি রাজা মহীপালের অনুচর; চৈত্য ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করতে এসেচি।

সেবিকা

[পুলকিত হইয়া সসম্ভ্রমে] মান্য অতিথি, আপনি স্বাগত, সুস্বাগত! আসুন আসুন। আপনার উপস্থিতিতে আমরা আহ্লাদিত। মহারাজ মহীপালের কুশল তো?

মহীপাল

[ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে] মহারাজ শারীরিক ভালো আছেন; তবে মানসিক—

সেবিকা

শুনে বড়ই আহ্লাদিত হলাম। রাজা সুস্থ থাকলে তবে তো ধর্ম্ম বাঁচে। মহারাজ মহীপালের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হোক্, তবে তো তথাগতের সম্মান বজায় থাকবে।

মহীপাল

[ঈষৎ পরিহাসযুক্ত হাস্য করিয়া ভিক্ষুণীগণের প্রতি] রাজার প্রতি আপনাদের সকলের মনোভাবই কি এই, জানতে বড়ই সাধ হচ্চে।

সেবিকা

[বিনীতার প্রতি] ভিক্ষুণী বিনীতা, নীরব কেন? স্পষ্ট করেই মতামতটা জ্ঞাপন কর। [সুজয়ার প্রতি] সুজয়া ভিক্ষুণী সুমিত্রার প্রতি আনুগত্যটা কি এখনও তেমনি প্রবল? (অন্যান্য ভিক্ষুণীদের প্রতি) ভিক্ষুণীরা, সেবিকাকে আর পরিহাস করচ না কেন—বড় যে চুপ করে গেলে!

বিনীতা

(মহীপালের প্রতি) রাজদৌবারিক, আপনার এ-কৌতূহল মোটেই শোভন নয়। চৈত্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনি যদি জানতে চান, তবে তা আশ্রমস্থবিরের কাছ হতে জানাই রীতি।

মহীপাল

কিন্তু তোমাদের সঙ্ঘনেত্রী আশ্রমস্থবির রুদ্রলোচনকে চৈত্যেই প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না, সে খবরটা রাখ কি?

বিনীতা

সঙ্ঘনেত্রীর আদেশ মানতে হলে আপনাকেও আজ চৈত্যের বাইরে থাকতে হয়। আজ চৈত্য সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।

সেবিকা

(সচিৎকারে) রাজদৌবারিককে অপমান! ভিক্ষুণী বিনীতা, জীবনের মায়া কর না!

জীবনেরই যদি মায়া করব, তবে শ্রীবুদ্ধের কাছে কি উপদেশ পেয়েচি?

সেবিকা

মান্য রাজদৌবারিক, আমার সাধ্য কি এই রাজ-দ্রোহিণীর কাছে আপনার সম্মান রাখি। আপনি দ্রুত মহারাজ মহীপালকে গিয়ে সংবাদ দিন। অবিলম্বে গিয়ে বলুন—নতুন সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রা নেতৃত্ব অধিকার করে' সরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেচে। এমন কি রাজ-প্রতিনিধিকে অপমান করতেও তার দ্বিধা নেই; ভাইলে বামে সে শুধুই রাজার প্রতি অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াচ্চে। চৈত্য তার হাতে পড়ে বিদ্রোহপ্রচারের যন্ত্র হয়ে উঠেচে।

মহীপাল

তার পূর্ব্বে সঙ্ঘনেত্রীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎটা করে' যেতে চাই। তিনি কি এখানে আসবেন না?

সুজয়া

না। তিনি ধ্যানে বসেচেন।

মহীপাল

কখন উঠবেন, কিছু কি স্থিরতা আছে?

সুজয়া

স্থিরতা নেই; তাঁর ধ্যান ভাঙাতে নিষেধ আছে।

সেবিকা

রাজদৌবারিক, আর নয়। আপনি দ্রুত চলে যান। এই গুরুতর পরিস্থিতির কথা মহারাজ মহীপালকে অবিলম্বে

জানান। এর প্রতিকার করতে মহারাজকে আমি যথাসাধ্য—

মহীপাল

(ঈষৎ পরিহাসের স্বরে) সাহায্য করবেন কেমন? পরিস্থিতি সত্যই গুরুতর। যাই, মহারাজ মহীপালকে তবে সকল কথা সবিস্তারেই জানাতে হচ্ছে।

ধীরে হাঁটিয়া প্রস্থান

সেবিকা

(সপুলকে হাসিয়া উঠিয়া) এইবার মজাটি টের পাবে।

বিনীতা

(সন্ত্রস্ত হইয়া) আর দেরি করো না, সেবিকা। চাবি দাও;—দ্বারে কুলুপ বন্ধ করি।

সেবিকা

কিছুতেই নয়, রাজার জন্ত দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে। তিনি এসে বিচার করবেন।

বিনীতা

প্রভুর অর্চ্চনা এখনও সমাপ্ত হয় নি, সেবিকা। আর বিতণ্ডা করো না; চাবি দাও। প্রয়োজন বোধ করলে সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রার সঙ্গে এ বিতণ্ডার মীমাংসা ক'রো; আদেশ অমান্তের দায়ে আমাদের প্রত্যেককে অপরাধী করো না।

সেবিকা

তোমাদের ভয় নেই; এ দায়িত্ব আমার একার। সঙ্ঘনেত্রীর বন্ধ ঘরের দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে এই কথাটা জানাতে চল্লুম। আশা করি কথাটা তার ধ্যানের প্রাচীর ভেদ করে কর্ণকুহরে গিয়ে পৌছুবে।

দ্রুত প্রস্থান

বিনীতা

এ কি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হলো!

সুজয়া

এসো, ভাই, আমরা সকলে মিলে প্রভু, বুদ্ধের পায়ে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাই; তাঁর দয়া এই বিপদের মধ্যে আমাদের রক্ষা করবে।

সঙ্গীত ও নৃত্যার্চ্চনা।

ভিক্ষুণীদের গান

হে পরম আলো,
চিত্তে চিত্তে তুমি সত্যের দীপ জ্বালো,
জয় জয় জয় হে
বিদূরিত কর ভ্রান্তি
তুমি বিঘ্ন নিবারণ স্নিগ্ধ পবিত্র শান্তি,
জয় জয় জয় হে
শঙ্কা ভয় কর চূর্ণ,
ভক্তি সমুত্থিত শৌর্য্যে কর পূর্ণ,
জয় জয় জয় হে

পট পতন

তৃতীয় অঙ্ক

২য় দৃশ্য

সৈন্য শিবির।

রাত্রিকাল। দুই সারি শিবিরের মধ্যকার খোলা জায়গায় পাঁচ সাত জন সাধারণ সৈনিক মশালের তীব্র আলোয় তরোয়াল শান দিতেছে।

একজন সঙ্গীত সহকারে তরোয়াল ধার দিতেছিল: অন্য সকলে সেই গানের তালে তালে নিজেদের অস্ত্র শান দিতেছিল।

সৈনিকের গান

ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে তলোয়ার
কটি কাঁধ পিঠে দোলে, যত হাতিয়ার।
মোরা সব ভারি বীর সম্মুখ-রণে
বেমালুম খাঁড়া হানি নর-গর্দ্দানে।
নিমেষেতে লোকালয় করি ছারখার
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে তলোয়ার॥

সহসা সে গান এবং শান দুই-ই বন্ধ করিল।

২য় সৈনিক

কি হে, বক্কেশ্বর, থেমে গেলে কেন? ধরো, বাবা,

ঘষো; ঘষে' ঘষে' হাতিয়ার যদি সাপের জিবের মতো লিকলিকে করে তুলতে পার, তবেই যদি যুদ্ধ জিততে পারা যায়! সৈন্যাধ্যক্ষের হুসিয়ারিটা একবার দেখলে? আরে রামঃ! দু-পাঁচ-গণ্ডা সন্ন্যাসিনী, জপ তপ করে' দিন কাটায় তাদের সঙ্গে লড়াই করতে নিয়ে এলো কিনা এক দঙ্গল সেপাই! আরে, ছোঃ!

বক্কেশ্বর

আর বলিস কেন ভাই, গজকেষ্ট! এ যেন মশা মারতে বজ্র হানা। হাসির গান, না, কাঁদার গান সুরু করব, বুঝতে পারচি না।

৩য় সৈনিক

তা যা বলেচ, বক্কেশ্বর। শেষ পর্য্যন্ত কি হাসতেই হয়, না, কাঁদতেই হয়, জোর করে' কিচ্ছু বলা যায় না। চৈত্যের দিক থেকে যখন মহারাজ আজ ফিরে এলেন, যা মুখের চেহারাখানা দেখলুম, তাতে ভরসা করবার মতো কিছুই চোখে পড়ল না।

অন্যান্য সৈন্যগণ

কেমন? কেমন?

কি দেখলি, মাইরি বল না ভাই?

রেগে টঙ হয়ে এলেন?

৩য় সৈনিক

টঙ তো টঙ! চেহারা দেখে, মনে হল, এই বুঝি কেঁদে ফেলেন! বলি, যাচ্ছিস কোথায়!

গজকেষ্ট

তাই বুঝি সৈন্যাধ্যক্ষ এসে মধ্য রাত্তিরে তরোয়াল শানাতে হুকুম দিয়ে গেল!

বক্কেশ্বর

আর ভাই, তরোয়াল! মন্ত্রের কাছে তরোয়ালই বল, আর বর্শাই বল, সব ভোঁতা হয়ে যায়!

৩য় সৈনিক

তা আর যায় না! বল দিকি ভাই, কি কাজ ছিল সন্ন্যাসিনীদের ঘাঁটাবার! জপতপ করচে, কারুর পাঁচেও নেই, সাতেও নেই। ওরা কার বাড়া ভাতে জল দিতে গেল বল দিকি, সৈন্য দিয়ে চৈত্য অধিকার না করলেই নয়!

গজ

চৈত্যই যদি অধিকার করে' না বসব, তবে আর আমরা বৌদ্ধ হলাম কোন্ কাজে? শত্রুর রক্ত বুদ্ধঠাকুরের পায়ের কাছে ফেলব, তবে তো উপযুক্ত বৌদ্ধ হবো! মহারাজকে শলা দিয়ে ঐ হোঁতকা দেড়ে' কাপালিকটা বত অনাছিষ্টির কাণ্ড করতে সবাইকে নিয়ে এল!

৩য় সৈনিক

চুপ, চুপ, গজকেষ্ট। কে গিয়ে কাণে লাগাবে, আর গর্দ্দানাখানা তোর চট্ করে' খসে পড়বে। রাজার নামে লাগবি, তবু রুদ্ররলোচনের নামে নয়। —আজকাল রাজ্যে প্রতাপটা কার জানিস্ তো?

গজ

তা আর জানিনা। রাণী মা মারা গেলেন; রাজামহাশয় রাজকার্য্য ছেড়ে মাথা মুড়ু, সগ্‌গ মর্ত্ত ভাবতে বসে গেলেন —জপতপ, তুকতাক, যজ্ঞ হোম এ সবের ছড়াছড়ি পড়ে গেল! ব্যাপার কি, না মহারাজ পরজন্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে চান্। তার এই সুযোগে ঘুঘু তান্ত্রিক মশাই মহারাজকে হাত করে' বসল। কোথায় সগ্‌গ, কোথায় পরজন্ম,—এখন শুধু পঞ্চ মকারের--

সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ

সৈন্যাধ্যক্ষ

কাজকর্ম্ম ফেলে তোরা সব গল্প করতে সুরু করেচিস্ বুঝি? আঁ্যা?

গজ

আজ্ঞে গপ্‌প কোথায় সৈন্যাধ্যক্ষ মশায়, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আর কি, আর সেই সঙ্গে একটু রাজনীতির—ঘষো, ঘষো, ঘষো, বাবা বক্কেশ্বর। ঐ সঙ্গে গানটাও ধরো—গায়ে জোর লাগবে।

বক্কেশ্বর গান ধরিল ও সকলে পুনর্ব্বার তরোয়াল-শাণ সুরু করিল।

বক্কেশ্বরের গান

যদি কেহ বলে—এটা তোমাদের নয়।
ধরণীতে তবে তার খেলা শেষ হয়।
যদি কেহ জিজ্ঞাসে—এইরূপ কেন?
তার গলা দিয়ে স্বর আর বেরুবে না জেনো।

সৈন্যাধ্যক্ষ অগ্রসর হইলেন।

গজ

[থামিয়া] আজ্ঞে, একটা কথা, সৈন্যাধ্যক্ষ মশাই। মেয়েগুলির গায়ে কি তরোয়াল মারলেই চলবে, না, বর্শাও ছুঁড়তে হবে!

সৈন্যাধ্যক্ষ

[বিব্রত ভাবে] তা, তা পূর্ব্বে থাকতে—। মানে সত্যই যে তাদের অস্ত্রাঘাত—। [সহসা কর্ত্তৃপক্ষসুলভ স্বরে] এ প্রশ্ন কেন শুনি, অ্যাঁ? সব রকম হাতিয়ার নিয়েই প্রস্তুত থাকবি এতে আবার তরোয়াল আর বর্শার তফাৎ আসে কোথা থেকে, শুনি?

গজ

বলছিলাম কি, সন্নিসিনীগুলির শরীর যদি খুবই শক্ত হয়, তবে শুধুমাত্র তরোয়ালে খতম নাও হতে পারে; আর যদি তেমন শক্ত না হয়, ত'বে এই রাত্তির বেলায় আর বর্শাটা ঘেঁষে কষ্ট করি কেন? তান্ত্রিক ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞেস করে' নিলে—

সৈন্যাধ্যক্ষ

দেখ, জগকেষ্টা, তোর জ্যাঠামিটা—

গজ

আজ্ঞে, সৈন্যাধ্যক্ষ মশায়, জ্যাঠামিটা কি আর বাড়ে সাধে, গায়ের জ্বালায় বাড়ে। মেয়ে মানষের গায়ে তরোয়ালের খোঁচা মারব, সন্নিসিনীদের বুকে বর্শা ঢুকিয়ে দেব,—বলি আপনি তো এত যুদ্ধে জিতেছেন,—এ যুদ্ধটা কেমন মনে হচ্চে? আমরা তো সাধারণ সেপাই—লজ্জায় হাত থেকে আমাদেরই তরোয়াল খসে পড়বার জোগাড়!

সৈন্যাধ্যক্ষ

ও-সব ভেবে তোর আমার কাজ কি রে, জগকেষ্ট। রাজনীতির আমরা কতটুকু বুঝি। অবশ্য এরকম যুদ্ধ এর পূর্ব্বে কখনও করিও নি, আর এরকম যুদ্ধ করতে—। ওসব কথা থাক। মহারাজের যা হুকুম, তেমনি আমাদের করতে হবে—

বক্কেশ্বর

আজ্ঞে, সৈন্যাধ্যক্ষ মশায়, এরকম হুকুম কি আমাদের মহারাজ কখনও দিতে পারেন? প্রকৃত পক্ষে এটা ঐ তান্ত্রিক ঠাকুরের ইচ্ছে মতই করা হয়েছে। আপনি আমাদের প্রধান, তাই আপনার কাছে অকপটে আমাদের মনোভাবটা জানালুম। একবার যদি রুদ্রলোচন ঠাকুরকে বুঝিয়ে এমন লজ্জার হাত থেকে আমাদের বাঁচান যায়, তবে একবার চেষ্টা করে দেখবেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ

থাম, থাম। বড্ডই ব্যক্তি দেখিয়েছিস। সৈন্য হয়েছিস, রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাতে যাবি, কেন রে? যেমন হুকুম হবে, তেমনি করে' যাবি।—যা কাজ, তাই কর। যা তোর ভাবনার বিষয় নয়, তা নিয়ে মাথা গরম করা কেন?—যাস্' লাগো, যাবার কাজে লাগো। এই আমি চল্লুম, কিন্তু ফিরে এসে যেন দেখি, তরোয়ালগুলি সব আয়নার মতো চকচকে হয়ে উঠেছে?

প্রস্থান

গজ

আর কেন। লেগে যাও; ঘষে' ঘষে' তরোয়ালগুলিকে ইন্দ্রের বজ্র বানিয়ে তোল। নইলে মেয়েমানুষের শরীর ভেদ করবে কেন?

সঙ্গীত ও গান সুরু হইল।

বক্কেশ্বরের গান

তাই মোরা বড় বীর, ভারি বীর সবে
নরমুণ্ডের স্তূপ রচিয়াছি ভবে।
কেন মারি, কেন কাটি, জিজ্ঞাসি যদি
তবে শিরহীনদের দেশে আমাদেরও গতি।
তাই চুপ করে কেটে যাই, যত পাই ঘাড়
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে তলোয়ার।

রুদ্রলোচনের প্রবেশ। তৃতীয় সৈনিকই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া দণ্ডবৎ হইল।

৩য় সৈনিক

দণ্ডবৎ হই, তান্ত্রিক মহাশয়। এত রাত্রে এদিকে?

তখন অন্যান্যেরা চমকিয়া ফিরিল। এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া দণ্ডবৎ হইল।

সৈনিকগণ

আজ্ঞে, প্রণাম হই।

দণ্ডবৎ জানবেন, ঠাকুর মশায়

গজ

প্রণাম জানবেন, তন্ত্রপারঙ্গম মশাই। এত রাত্তিরে হঠাৎ এদিকে কি মনে করে? আজ্ঞে, মধ্যরাত্রে কি ইদিকে কিছু মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করার আছে? একটু এগিয়ে গেলেই শ্মশান পাবেন, আর বলেন তো, মাথা ছাড়িয়ে বক্কেশ্বরের দেহটাকে—

রুদ্রলোচন

না, না, মন্ত্রপাঠ নয়। নিদ্রা হচ্ছে না—শয্যায় শুয়ে শুয়ে ক্রমেই অধিকতর অস্থির হয়ে উঠচি। বিদ্রোহিণীর শাস্তি-বিধান না-করা পর্য্যন্ত রাজ্যের মঙ্গল নেই—তাই হৃদয়ে শান্তি পাচ্চি না। রাজ্যের শ্রীলাভে বিঘ্ন হচ্ছে—কল্যাণ বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ মহারাজ ইচ্ছে করলে সেই মুহূর্ত্তে বিদ্রোহিণীর মুণ্ডুটা মাটীতে লুটিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হয়ে পড়লেন। তাই বড়ই উদ্বেগে রাত্রি কাটাতে হচ্চে। এদিকে তোমার সব প্রস্তুত তো?

বক্কেশ্বর

আজ্ঞে, আমরা প্রস্তুতই আছি। তবে, তান্ত্রিক মশায়, নিবেদন এই, প্রয়োজন না হলে আমরা যেন দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আপনাদের ধার্ম্মিকদের দ্বন্দ্বে আমাদের সৈনিকদের হস্তক্ষেপ করতে না হলেই—

গজ

আজ্ঞে, শুনলেন? একবার ওর কথাটা শুনলেন? বাবা বক্কেশ্বর, বৈষ্ণবকে তুমি লজ্জা দিয়ে ছাড়বে? আমাদের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিকমশায় যেখানে মুণ্ডুটুণ্ডু পর্য্যন্ত মাটীতে লুটিয়ে ফেলতে চান, সেখানে কিনা তুমি হস্তক্ষেপ করতে পর্য্যন্ত ভয় পাচ্চ!

৩য় সৈনিক

তা, গজকেষ্ট, তান্ত্রিকমশাই ইচ্ছে করলে কি আর মন্ত্রপ্রভাবেই মুণ্ডুটুণ্ডু কেটে ফেলতে পারেন না? পারেন বৈ কি, নিশ্চয় পারেন, ইচ্ছে করলেই পারেন। আজ্ঞে, তেমন মন্ত্রটন্ত্র কি নেই?

রুদ্র

আছে বৈ কি, আছে বৈ কি!

বক্কেশ্বর

তবে মন্ত্র প্রয়োগ করলেই তো সকল হাঙ্গামা মিটে যায়, কি বল গজকেষ্ট?

রুদ্র

[যেন ইহাদের মতলব ভেদ করিতে পারিয়া] ওরে, চালাকের দল, যদি মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হয়, তবে তোরা আছিস কেন? অতি সামান্য দুই পংক্তি মন্ত্রে আমি ঘোরতর যুদ্ধে জয়লক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে' নিয়ে আসতে পারি; আমার পক্ষে তা অতি সামান্য ব্যাপার—ভৈরবীতন্ত্র থেকে শুধু মাত্র—[সহসা থামিয়া] কিন্তু কেন করব? কেন তা আমি করব? সৈন্যের ধর্ম্মে কেন বাধা দেব? বীরত্বের অবকাশ থেকে কেন সৈনিককে বঞ্চিত করব? ঈশ্বর যে-কর্ম্ম যাকে বণ্টন করে দিয়েছেন [সহসা সচিৎকারে] সে-কর্ম্ম তার। সে-কর্ম্ম তাকে করতে হবে —শত বার করতে হবে;—সহস্র বার করতে হবে।

গজ

আজ্ঞে, হাঁ, তার আর করতে হবে না।

রুদ্র

তবে? তবে?

গজ

তবে তরোয়াল ঘষা। বাবা, বক্কেশ্বর, এ বড় কঠিন ঠাঁই। আর কেন, গানটা সুরু কর, তালে তালে তরোয়ালে শাণ লাগাই।

বক্কেশ্বর করুণ-কণ্ঠে গান উঠাইল।
সৈনিকেরা শাণ দেওয়া শুরু করিল।

গান

কেন মারি, কেন কাটি জিজ্ঞাসি যদি।
তবে শিরহীনদের দেশে আমাদেরও গতি।

রুদ্র

নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে [সঙ্গীত থামিল] চৈত্য সিংহদ্বারে তোদের উপস্থিত হ'তে হবে—সে-আদেশ পেয়েচিস তো? সৈন্যাধ্যক্ষ কোথায়?

৩য়

আজ্ঞে সে-আদেশ জারি করবার জন্তই এগিয়ে গেচেন।

পুনর্ব্বার সঙ্গীত ও শাণ সুরু হইল।

গান

তাই চুপ করে' কেটে যাই যত পাই ঘাড়
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে তলোয়ার॥

রুদ্র

বেশ, বেশ। তবু যাই, পুনর্ব্বার তাকে হুসিয়ার ক'রে দিয়ে আসি। সামান্যতম বিলম্ব হলে, আমি রুদ্রলোচন, সে-অপরাধ মার্জ্জনা করব না; তাই পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক করে' দিয়ে আসি। বিদ্রোহিণীকে একটা আদর্শ শাস্তি দান করলে তবেই যদি চিত্তে শান্তি পাই।

নানা ন্যাস করিয়া ও মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে প্রস্থান।

গজকেষ্ট

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্রলোচনের উদ্দেশে]

ফট্ ফট্ ফট্ স্বাহা
হঠ্ হঠ্ হঠ্ স্বাহা
চট্ পট্ পট্ স্বাহা
হাঃ হাঃ হাঃ হা হা

সকলের হাস্য

পট পতন

শ্রীসুবোধ বসু

লক্ষ্মণের কলঙ্ক

ডাঃ এন, ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-বি

রামায়ণের লক্ষ্মণ এক অপূর্ব্ব চরিত্র! তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গের এত বড় আদর্শ, বোধহয় মানব সভ্যতার জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহই স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাই ভ্রাতৃভক্তির প্রসঙ্গ হইলেই সংসারে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারি নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। শুধু ভ্রাতৃভক্তি কেন? সহিষ্ণুতায়, ধৈর্য্যে এবং বীরত্বেও তিনি কি আদর্শস্থানীয় নহেন?

রাম-লক্ষ্মণ উভয়েই রাজপুত্র, উভয়েই সুখের কোলে লালিত, উভয়েই নব পরিণীতা বধূর প্রেমে ভরপুর। বনবাস কালে রামের সুখ সাধন ও দুঃখ মোচনের জন্ম লক্ষ্মণ যাহা করিয়াছিলেন লোকের স্মৃতি পটে আজও তাহা জাগরূক রহিয়াছে, এবং চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু দারুণ সে দুঃখ পরম্পরায়, সুকুমার কুমার লক্ষ্মণের দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিত, কে তাহার সন্ধান লইত?

রাম, বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ত্রয়োদশ বৎসরই প্রিয় পত্নী সীতার সঙ্গ-সুখে কাটাইয়া ছিলেন, কেবল শেষের এক বৎসর তাঁহাকে সীতার বিরহ বেদনা সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মণকে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়াই গৃহ-কারায় বন্দিনী এক ম্লানমুখী অশ্রুসিক্তা বালার স্মৃতির আগুন বুকের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

রামের বিরহানলে লক্ষ্মণ ছিলেন সান্ত্বনার সুশীতল বারি! আর লক্ষ্মণের নিরুদ্ধ শোকাবেগে একটী বারের জন্যও আহা বলিবার কেহ ছিল কি?

আবেগ অসহ্য হইলে রাম,—হা জানকি! হা মহারণ্য রামপ্রিয় সখি, হা মদ্‌গতপ্রাণা! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে পারিতেন, অশ্রুপ্রবাহ ঢালিয়া দিয়া হৃদয় শীতল করিতে পারিতেন! কিন্তু লক্ষ্মণ? একটী আক্ষেপোক্তি করিবার কিম্বা এক বিন্দু অশ্রুমোচনেরও অধিকার তাঁহার ছিল কি?

তাহার পরে বীরত্বের কথা! রাম যেমন ত্রিলোক-

ভয়ঙ্কর দশাননকে বধ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণও তেমন এমন এক দুর্দ্ধর্ষ বীরকে নিহত করিয়াছিলেন, ইন্দ্রকে জয় করিয়া যিনি ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

রাবণ বীরাগ্রগণ্য একথা যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, মেঘনাদও তেমনি পিতার সুযোগ্য পুত্র এ কথা ত কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস যেন পিতা অপেক্ষা পুত্রকেই উপরে স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"ইন্দ্রজিত মরিলে রাবণ রাজা জিনি।
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥"

অবশ্য এটা অতিশয়োক্তি হইলেও, বধকালে সে দুর্দ্দান্ত রাবণ আর ছিল না, হতভাগ্য তখন শোকে তাপে জর্জ্জরিত, পরাজয়ের অসহ্য গ্লানিতে বিকৃত, নিস্তেজ, এবং নৈরাশ্যের অবশ্যম্ভাবী অবসাদে অবসন্ন, ম্রিয়মান। কিন্তু বিনাশের কালে ইন্দ্রজিত রাবণের ন্যায় বিশ্ববিজয়ী পিতার অমোঘ শক্তির পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিত, স্বপক্ষের নিশ্চিত জয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাসের পূর্ণবলে বলীয়ান, এবং স্বীয় বীর্য্যবত্তার পরিপূর্ণ তেজে দেদীপ্যমান।

অবশ্য এ কথার উত্তরে সমস্বরে সকলেই বলিয়া উঠিবেন—"লক্ষ্মণতো আর রামের রাবণ বধের ন্যায়, ন্যায়-যুদ্ধে মেঘনাদকে বধ করেন নাই, তিনি বিভীষণ প্রদর্শিত গুপ্তপথে চোরের মত নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া অপ্রস্তুত অস্ত্রহীন অবস্থায় মেঘনাদের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সত্যই কি তাই? সত্যই কি তিনি ক্ষত্রিয়ের অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া একান্তে পূজা-নিরত অস্ত্রহীন নিঃসম্বল শত্রুকে কাপুরুষের ন্যায় বধ করিয়াছিলেন? যদি সত্য সত্যই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন, তবে নিঃসন্দেহ ইহা তাঁহার একটী দুরপনেয় কলঙ্ক, এ কথা কে না বলিবে? কিন্তু আমাদের নিশ্চিত ধারণা এ অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সকলেই জানেন কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার কথাই যে সর্ব্বাপেক্ষা authentic বা প্রমাণ-সিদ্ধ ইহাতে আশা করি সকলেই একমত হইবেন।

আমরা নিম্নে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"বিভীষণ কহিলেন—'রঘুনন্দন, ইন্দ্রজিত যজ্ঞ সমাধা করিবার নিমিত্ত নিকুম্ভিলায় গিয়াছে, এ যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলে আমাদের পক্ষে বড়ই বিপদের কথা হইবে। অতএব উহা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিপুল সেনা বাহিনী লইয়া লক্ষ্মণ তাহাকে আক্রমণ করুন। রাম তাহাতে সম্মতি জানাইয়া লক্ষ্মণকে সেরূপ আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ, রামকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞভূমির উদ্দেশে সসৈন্যে দ্রুত অভিযান করিলেন। স্বীয় সচিব চতুষ্টয় সহ বিভীষণ, বহু বানর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া হনুমান ও অঙ্গদ লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারী হইলেন। যাইতে যাইতে তাহারা পথিমধ্যে জাম্ববান ও তদীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন। বহুদূর অগ্রসর হইলে বিভীষণ কহিলেন—'হে বীর, ঐ দূরে মেঘবৎ শ্যামবর্ণ রাক্ষস সৈন্যের ব্যূহ দেখা যাইতেছে, ঐ ব্যূহ মধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে ইন্দ্রজিত অভিচার কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। ব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অবিলম্বে সৈন্যগণ ব্যূহ আক্রমণ করুক, যেন অভিচার কর্ম্ম সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই আপনি তাহাকে আক্রমণ করিতে পারেন।'

তখন লক্ষ্মণের আদেশে ঋক্ষ ও বানর সৈন্যগণ বড় বড় বৃক্ষ লইয়া রাক্ষসের ব্যূহ আক্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসে বানরে ঋক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এদিকে ইন্দ্রজিত সবেমাত্র হোমে বসিয়াছিল, সে যেমন শুনিল শত্রুপক্ষের আক্রমণে স্বীয় সৈন্যদল অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইল, তাহার হোমানুষ্ঠান আর হইল না। ক্রোধভরে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া তাহার পূর্ব্ব সজ্জিত রথে আরোহণ করিল, এবং হনুমানকে নিজ সৈন্যদল ব্যথিত করিতে দেখিয়া খড়্গ, পরশু প্রভৃতি হস্তে তাহাকে আক্রমণ করিল। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণ ধনুঃ বিস্ফারিত করত ইন্দ্রজিতের সম্মুখস্থ হইয়া কহিলেন—'আমি যুদ্ধার্থী আমাকে যথারীতি যুদ্ধ প্রদান

কর।' লক্ষ্মণের আহ্বানে কোন উত্তর দান না করিয়া ইন্দ্রজিত বিভীষণকে তিরস্কার করিতে করিতে এক অতি বৃহৎ ভীষণ ধনু গ্রহণ করিল। সেই মহাবীরদ্বয়ের তখন ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে শর বর্ষণে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মনে হইতে লাগিল বুঝি বৃত্র ও বাসব অথবা গগনস্থ গ্রহদ্বয় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। বানর এবং রাক্ষসগণও স্ব স্ব প্রতিপক্ষের নিধনের নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিন অহোরাত্রি এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে সেই দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত নিহত হইল।

বাল্মীকি রামায়ণ—
লঙ্কাকাণ্ড—৮৫তম সর্গ—
৯০তম সর্গ।
৺তারাকান্ত কাব্যতীর্থের অনুবাদ

ইহার পরে বোধ হয় আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে লক্ষ্মণের ঐ অপবাদ-কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখন প্রশ্ন হইতেছে যদি মিথ্যা, তবে এ কাহিনী কাহার মস্তিষ্কপ্রসূত? যাহারই হউক সে পাপী সন্দেহ নাই, তবে শক্তিমান পাপী হইয়াও নিশ্চিত। লেখনীর প্রভাবে একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে সত্যস্বরূপ করিয়া তুলিয়া লোকের ধারণাকে একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। এমন দিনে ডাকাতি বড় একটা দেখা যায় না! দেখা যাউক এ ডাকাতটী কে?

দেখা যায়, বাংলা দেশে মহর্ষির রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী হইয়াছেন কবি কৃত্তিবাস ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ্যে কৃত্তিবাস, এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজে মধুসূদনের পঠন পাঠন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাই মনে হয় ইঁহাদের উভয় বা একতর কর্তৃক খুব সম্ভব এ কাহিনী রচিত হইয়া থাকিবে। কেননা এবিষয়ে অপর যে কেহ যাহা কিছু লিখিয়া থাকুন, তাহা তেমন খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই; সুতরাং সে সকল অখ্যাত গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের এতটা খ্যাতি প্রতিপত্তিও সম্ভব মনে হয় না। যাহা হউক আমরা ক্রমে উভয়ের কথাই বলিতেছি।

প্রথমেই কৃত্তিবাসের কথা:—কৃত্তিবাস কোন কোন স্থানে মহর্ষি অনুসৃত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক, কখনও পুরাণান্তর হইতে আহরণ করিয়া, কখনও বা কল্পনার আশ্রয়ে, বহু নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। যেমন রামের দুর্গোৎসব, অঙ্গদ রায়বার, বীরবাহুবধ, তরণীসেন বধ, মহীরাবণ বধ, অহিরাবণ বধ, ইত্যাদি। এগুলি বাল্মীকি রামায়ণে নাই। তবে কি এগুলির ন্যায় লক্ষ্মণের এ কলঙ্ক কাহিনীও তাঁরই সৃষ্টি? আমরা নিম্নে তাঁহার ইন্দ্রজিত-নিধন-বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি:—

রামের চরণে বন্দি বানরগণ সঙ্গে।
বিভীষণ সহ বীর চলিলেন রঙ্গে॥
গড়ের নিকট উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুকে দিয়া চড়া।
হনু দাণ্ডাইল লয়ে পর্ব্বতের চূড়া॥
ঘর পোড়া দেখিয়া রাক্ষস ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে বেড়ে॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁপর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর॥
বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরেতে গাছপাথর করে বরিষণ॥
বানরের তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাঙ্গে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিত আগে॥
ইন্দ্রজিত দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
একলাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড প'রে॥
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম সন্ধানী।
বৃক্ষবাড়ি মারি নিভায় যজ্ঞের আগুনি॥

* * *

যজ্ঞ দ্রব্য ছড়ায়ে ফেলিল চারি ভিত।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিত
মেঘবর্ণ অঙ্গ তার তাম্রবর্ণ দু'লোচন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
এইক্ষণে ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণে দরশন॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥

অষ্টবীর বানর উঠিয়া তার রথে।
দুর্জ্জয় বানর সব লাগিল গর্জ্জিতে ॥
সারথী সহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিত পড়ে ভূমিতলে ॥
বিরথী হইল যদি রাবণ নন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্ষ্মণ ॥
দু'জনার উপরে দু'জনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে দু'জনে সমান।
দু'জনে দেখিয়া বাণ মারে দুইজনে।
দু'জনে পড়িল ঢাকা দু'জনার বাণে ॥
অবশেষ ব্রহ্ম অস্ত্রে পূরিল সন্ধান।
ইন্দ্রজিতের মাথা কাটি করে দুই খান ॥

কি আশ্চর্য্য! দেখিতেছি কৃত্তিবাসও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া সংক্ষেপে মহর্ষির কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। অতএব তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!

এখন বাকী রহিলেন কবি মধুসূদন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখিতেছি তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, কেন না দেখা যাইতেছে তাঁহারই লক্ষ্মণ চোরের মত নৈশ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে লঙ্কার অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। সঙ্গে হনুমান নাই, জাম্বুবান অঙ্গদ প্রভৃতি কেহই নাই, সৈন্যশ্রেণী নাই, আছেন একমাত্র বিভীষণ। দু'টী প্রাণী চলিয়াছেন—

"ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে—
কুজ্ঝটিকা গিরি শৃঙ্গে, পোহাইল রাতি,
চলিলা অদৃশ্য ভাবে লঙ্কা মুখে দোঁহে।"

লক্ষ্মণ প্রকৃত প্রস্তাবে যে ভাবে ব্যূহ ভেদ করিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন মহর্ষির বর্ণনা হইতে পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। এইবার দেখুন মধুসূদনের লক্ষ্মণ কি ভাবে প্রবেশ করিতেছেন—

"যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠ গৃহে
যমদূত, ভীম বাহু লক্ষ্মণ পশিলা—
মায়াবলে দেবালয়ে।"

এবং প্রবেশ করিয়াই পূজানিরত ইন্দ্রজিতকে—

"কৃতান্ত আমিরে তোর দুরন্ত রাবণি!"

বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক—

"উলঙ্গিলা অসি ভয়ঙ্কর।"

মধুসূদনের মতে মেঘনাদ তো আর লক্ষ্মণের মত ক্ষাত্র ধর্ম্মে অজ্ঞ নহেন—তিনি কহিলেন

"সাজি বীর সাজে আমি, নিরস্ত্র যে অরি
নহে রথি-কুল প্রথা আঘাতিতে তারে!"

লক্ষ্মণ নিতান্তই পামর—উত্তর করিলেন:—

"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়েরে কিরাত তারে? বধিব এখনি
অবোধ! তেমতি তোরে? জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম পাপি! কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি পারি যে কৌশলে।"

ইহার পরে—

…"ক্ষত্রকুলগ্লানি শতধিক তোরে,
লক্ষ্মণ, নির্লজ্জ তুই—"

বলিয়া লক্ষ্মণের ললাটে ইন্দ্রজিতের কোষাঘাত, লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা! মূর্চ্ছা ভঙ্গে প্রথমে বাণ পরে খড়্গাঘাতে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের শিরশ্ছেদ। এই হইল মধুসূদনের লক্ষ্মণ? প্রকৃত লক্ষ্মণ কি আপনারা দেখিয়াছেন। এখন বলুন এই অকলঙ্ক চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের জন্য মধুসূদনই দায়ী কি না? ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন—মধুসূদনের কাব্য প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরক্তি লেখকের কাহারও অপেক্ষা কম। তবে শ্রদ্ধা বা অনুরক্তিকে সত্যানুসন্ধিৎসার বাধা স্বরূপ হইতে দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় কি?—"ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম"—একথাটাও সব সময় খাটে না।

কেহ হয়তো বলিবেন এটা poetic license, নিজের প্রয়োজনমত এরূপ চরিত্রকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার অধিকার কবির আছে। আমরা বলিব, "না", এ সকল চরিত্রকে এরূপ বিকৃত করিবার অধিকার কোন কবির নাই, থাকিতে পারে না; এটা poetic license নয়, poetic treason. তোমার কল্পনায় গড়া মানস পুত্রকন্যাদের লইয়া তোমার যাহা খুসি কর, কেহ কিছু বলিতে যাইবে না, কিন্তু ইতিহাসে বা পুরাণে যে সকল চরিত্র চিরন্তন পূজা

পাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের কলুষিত করিয়া খেয়াল চরিতার্থ করিবার অধিকার তোমার নাই।

নল, যুধিষ্ঠির, রাম, লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি পুণ্য-শ্লোকদের চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়া, আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস্ সিজার, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি বীর চরিত্রকে কাপুরুষ সাজাইয়া, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য চরিত্রকে হতমান করিয়া কাব্য সৃষ্টির অধিকার কাহার আছে?

এটা অতি বড় দুঃখের কথা যে, মধুসূদনের ন্যায় অনন্য-সাধারণ কবি প্রতিভার অধিকারী অসামান্য পুরুষ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের বাক্য :—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

এই ভয়াবহতারই একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন "বীরাঙ্গনা," "ব্রজাঙ্গনা" এবং "মেঘনাদের" ন্যায় বিশ্ববিমোহন মহা-কাব্যের স্রষ্টার এই অপসৃষ্টি!

আশ্চর্য্য এই—এই মধুসূদনই মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রথমে :—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস—"

বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর লক্ষ্মণের চরিত্রাঙ্কনে কবিগুরুর পদাঙ্ক কতদূর অনুসরণ করিয়াছেন পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

হায় কবি, তুমি অমন সুধার আধার "মধুচক্র" রচনা করিয়া সম্ভবতঃ তোমার সদ্যঃ পরিত্যক্ত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা বশেই—তাহার মধ্যে এই বিষ-বাষ্প অনুস্যূত করিয়া দিয়াছিলে! তোমার বড় সাধের গৌড়জনেরা, তোমার কাব্যসুধা নিরবধি পান করিতে করিতে এই তীব্র বিষও পান করিয়া ফেলিয়াছে, জীর্ণ করিতে পারে নাই, নীল-কণ্ঠের মত সুধাটুকু পান করিয়া, বিষটা একান্তে রাখি-য়াও দিতে পারে নাই; এতদিন ধরিয়া অনবরত উদ্গিরণ করিয়া গিয়াছে, কাব্যে নাটকে যাত্রায় আবৃত্তিতে! হত-ভাগ্য আমরা ধরিয়া লইয়াছি এই লক্ষ্মণ-চরিত্র! সন্ধান করি নাই, সর্ব্ব বিষয়ে অমন উন্নত উদার মহান্ চরিত্রে এতখানি নীচতা সম্ভব কি না ভাবিয়া দেখি নাই, খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করি নাই!

এন ভট্টাচার্য্য



ভুল

শ্রীদেবব্রত রেজ

আমি আর সাম্‌লাতে না পেরে ব'লে ফেললুম, "আপনার এই ভংগুরে শুষ্ক জীবনটা ভালো লাগে ?"

হাতটা ট্রেণের জান্‌লা থেকে সরিয়ে নিয়ে আমার পাশে বেডিংএর স্তূপটার দিকে চেয়ে হেসে বল্লে—তার অস্বাভাবিক হাসিটার জন্ত দেখলাম তার দাঁত দু'পাটি বেশ ময়লা আর চোখের কোন দু'টো অনেকগুলো রেখায় কোঁচকান—বল্লে "বেশ ত' আছি। চাল থাক্‌লে সেটার উড়ে যাবার ভয় থাকে, আর চুলো থাকলে ভয় থাকে কে কখন এসে লাথি মেরে ভেঙে দেবে···হাঃ, হাঃ, হাঃ, বেশ আছি কি বলেন !"

তার পর তার মুখটা একটু বেশী রকম ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। আমি তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিলেম। তাই দেখে ; "বড় রোদ্দুরের ঝাঁঝ আন্‌ছে, জানলাটা বন্ধ ক'রে দি" ব'লে ঘাড়টা চট্ ক'রে বেঁকিয়ে নিল। দেখলাম অনেক দূরে অজয়ের বালুচর ঝক্ ঝক্ করছে আর খানিকটা দূরে একটা মরা গাছের গুঁড়ি কেটে গেছে আর তার একটা ফাটলে একটা কাঠ ঠোকরা ঠোঁট্ গুঁজে বসে' আছে।

এর আগে কথাবার্ত্তায় যুবকটির পরিচয় পেয়েছি। যশোর জেলায় বাড়ী ; কোন এক ছোট পাড়াগাঁয়ে ; বাপ মা ভাই বোন আছে কিনা কিছুই বললে না। সেই রকম একটা শুকনো খট্ খটে হাসি হেসে বলেছে সে জগতে একা। বাবার নাম বলে নি। 'বিদ্যাসাগরে' 'সেকেণ্ড-ইয়ার' পর্য্যন্ত পড়ে'ছিল। লজিকে নাকি খুবই কাঁচা ছিল।

সে জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে মুখ ফেরাতেই আমি হেসে বললাম, (হাসবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না) কথাটা সত্য নয়, সব মানুষই ছোট্ট একটি শান্তির কোন চায় বই কি, জ্যৈষ্ঠ দুপুরে দামোদরের চরার মত ধূ ধূ জীবন কারু কি ভালো লাগে ?

আমার গলাটা একটু ভিজে গিয়ে থাকবে বোধ হয়, কারণ ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে বললে "কী জানি !"

আমার সামনে এক ভদ্রলোক পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রিষ্ট ওয়াচ-বাঁধা নধর হাতটা সযত্নে-ছাঁটা ঘাড়ে বুলোতে বুলোতে 'ছটাক খানেক' হেসে বললেন, 'সে কী ম'শায়,···এই যে বললেন 'বেশ আছি।" আমি একটু বিরক্ত হোলাম। যুবকটি বাবুটির দিকে বেশ তীক্ষ্ণ চোখে চট্ ক'রে চেয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার অপ্রতিভের হাসি হেসে' বললে, "না, কথাটা ঠিক তা' নয়।"

"কথাটা ঠিক তা' নয়," কথাটা কাণে বেশ বাজল।

একটা ছোট্ট 'ও !' ব'লে বাবুটি দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে আরম্ভ করলেন, লক্ষ্য ক'রলাম তাঁর ছোট মিট্‌মিটে বাম চোখটা ছেলেটির মুখের দিকে নিবদ্ধ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাবুটি আমার পর্য্যবেক্ষণের পথরোধ করলেন।

যুবকটির সঙ্গে আমার কথা চল্‌ছিল······

আমি বল্লেম, "আমরা বলে থাকি, ভাঙা চালে চাঁদের আলো, কিন্তু ভুলে যাই এখন যেখানে ফুটো সেখানে একদিন আচ্ছাদন ছিল। সেই ভাঙা ঘরে কত পলকের জ্যোৎস্নায় আমরা কবি হ'য়েছি, সেই চকিত "চাঁদের আলোয়" আমাদের কত কবিতা, কত গল্প রচনা হ'য়েছে ফাঁকটার দুঃখটাকে চাপা দিয়ে। এখন যখন দেখ্‌ছি ধানের জমিতে আনন্দ হ'চ্ছে তখন কেঁদে উঠেছি, ভগবান্ বাঁচাও। সে একটু আরামের হাসি হেসে বল্লে, "ঠিক এ কথাটা বুঝ্‌তে আমাদের এখন সময় লাগবে।"

পরের ষ্টেসনে ট্রেণ থামতেই গাড়ীতে একজন অন্ধ ভিক্ষুক উঠল আর তার সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। দরজাটা হ'তে

একটু স'রে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গান আরম্ভ করল—কৃষ্ণলীলার গান। পাশের ছেলেটি কাঠের করতাল বাজিয়ে সঙ্গত করে যেতে লাগল।

তখন বেলা চারটে বোধ হয়, অদূরে মাঠের ধারে জঙ্গলের কোল ঘেঁসে ছায়া ঘনিয়ে উঠ্ছে, ম্লান আলো পড়েছে পচা পুকুরের কচুরী পানার ওপর; মাঠের ওপর ভাঙ্গা-চোরা পথ বেয়ে টল্‌তে টল্‌তে চ'লেছে শীর্ণকায় গাই বাছুরের দল। ক্ষুদ্র রাখাল ক্লান্ত স্বরে গালিগালাজ করতে করতে চলেছে সেই দলের পেছনে পেছনে।

অন্ধ গেয়ে চলেছে। তার গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোখের তলায় রেখায় রেখায় জমেছে কয়লার গুঁড়ো। ঠোঁটের কোণ,—সে যদি মানুষ না হ'ত তা'হলে বলতাম, ফেনিয়ে উঠেছে। অসহায় ভাব তার চিবুকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তার পাশের ছেলেটির চোখ দু'টিতে শ্রান্তি ছল্‌ছলিয়ে আছে, তার অভ্যস্ত হাত কাঠের খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে; এক গাড়ী লোকের অপেক্ষা না রেখে তার চোখ চেয়ে আছে লাইনের ধারে ভেরেণ্ডার সারির দিকে, তাদের পাতার সবুজের সঙ্গে যেন বদরক্তের রঙ মিশে আছে।

তারও প্রথম জীবনের সবুজটাতে হয়ত শত আঘাতের কালশিটে পড়ে গেছে।

দেখলাম সেই যুবকটি ছেলেটির দিকে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে আছে। কাছিমের গলা জোর ক'রে তার খোল হ'তে টেনে বাইরে আন্‌লে তার চোখে যে ভাব ফুটে ওঠে হঠাৎ যেন তারও চোখে সে রকম কোন ভাবের আভাস পেয়েছিলাম।

চেকার এসে টিকিট দেখতে চাইলেন। সে সহজ ভাবে জানালে, "নেই।"

তারপর, রেলওয়ে অফিসারের বাক্য বর্ষণের বিরুদ্ধে তার কাচের মত অনুভূতিহীন চোখ দু'টোর চাউনি ছাড়া আর কোনো জবাব তাকে দিতে দেখিনি।

তারপর, যা হয়,······পুলিস এল, ফেরিওয়ালারা একটু থাম্‌ল। অন্ধটা থম্‌কে গেল; সেই বাবুটি মুচকি হেসে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন; ট্রেনের মধ্যে গল্পের জোয়ারটা স্তম্ভিত হ'য়ে রইল······

সে নেমে গেল।

প্লাটফর্ম্মের একধারে কুলীর দল জটলা ক'রে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকদিন ধ'রে পাটকলে ধর্ম্মঘট চ'লেছে; তারা কোথাও যাবে। তাদের ছেলেরা ঘাড়ে বাঁক ঝুলিয়ে, মেয়েরা পিঠে ছেলে ফেলে, বুড়োরা তাদের হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়টা আরো একটু তুলে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সেই অপরাধীর দিকে চেয়ে—তাদেরও চোখে নেমে এসেছিল সেই ভীরু ঔদাসীন্য, অসম্ভব শ্রান্তিতে যার উৎপত্তি।

সাঁওতাল ছেলেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে, বাঁকের ওপর হাতের চাপ আল্‌গা হ'য়ে আসে, বাঁকগুলো এলোমেলো হ'য়ে পড়ে। কারুর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হ'য়ে যায়। কারুর চোখে অবাক চাউনি। কেউ কাণের কাছে ফুলগুলো অস্বস্তিতে নাড়াচাড়া করে। মেয়েরা ছেলেগুলোকে বেশী ক'রে চেপে ধরে।·········

আমি ছুটে' গিয়ে অফিসারকে বল্লেম, "ওর ভাড়া আমি দিচ্ছি, ওকে ছেড়ে দিন।"

সে চট্ ক'রে হাতটা ধ'রে শক্ত ক'রে বল্লে, "দরকার নেই।" কী জানি কেন, বুঝলাম ও আমাদের নয়। ধীরে ধীরে ফিরে এলাম সেই বেডিংএর স্তূপটার পাশে।

অন্য প্ল্যাটফর্ম্মে গেরুয়া কাঁকরের ওপর একজন মুটে একটা মস্তবড় মাল ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে, তার পায়ের পেশীগুলো দড়ার মত মাঝে মাঝে পাকিয়ে উঠছে। তার পিঠটা আর পা' দু'টো যেন তার সব; মুখটা আছে ভারটার অন্তরালে, সেই ভারে চাপা পড়ে আছে তার ভাষাটাও।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে; দূরে গ্রামে কালিমা নিবিড় হ'য়ে এসেছে, দু'একটা পরিশ্রান্ত কাকের ডাক কাণে আস্‌ছে······

চায়ের কাপে সেই বাবুটির চুমুকের সিপ সিপ শব্দ ছাড়া ট্রেণে সব চুপ।

হঠাৎ চলনোন্মুখ ট্রেণ হ'তে ষ্টেসনের দিকে ফিরে চেয়ে দেখি একটা ভাঙ্গা বেঞ্চে সেই যুবকটিকে বসান' হ'য়েছে, তার ধনুকের মত বাঁকা পিঠটায় আর প্রলম্বিত পা'য়ে একটা যেন প্রশ্নচিহ্ন আঁকা হয়েছে, আর সেই প্রশ্নচিহ্ন আমাদের এই সভ্যতার শেষ ছত্রের শেষে নিতান্ত অযাচিত ভাবে ব'সে পড়েছে।

দেবব্রত রেজ

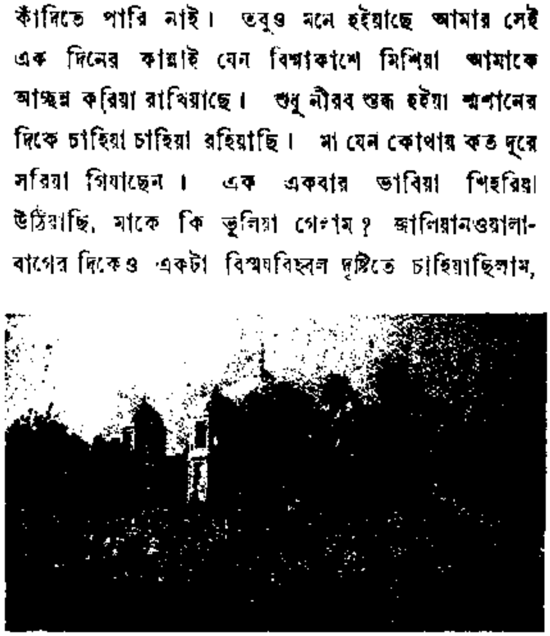
লাহোরের ছবি

শ্রীঅখিল

শিখদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-মন্দির "আকাল তক্ত্" ও "বাবা অটল" নামে আর একটি মন্দির দেখিলাম। "বাবা অটল" প্রায় অক্‌টারলনি মনুমেণ্টের মতন উঁচু। তার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠিবার সিঁড়ি সাধারণতঃ তালাবন্ধ থাকে। গাইড উহা আমাদিগকে খুলিয়া দিল। চূড়ার উপর গাইডকে দাঁড় করাইয়া তার ছবি তুলিলাম। তাকে একটা ছবি পরে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। মন্দির দেখা শেষ করিয়া ঠিক করিলাম জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখিতেই হইবে।

এ বিষয়ে গোড়া হইতেই আমাদের উভয়েরই দুরন্ত আগ্রহ ছিল। কাজেই আর দেরী না করিয়া রওনা হইলাম। কিন্তু মন্দির হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ অতি নিকটে, বেশী দূর যাইতে হইল না। বেলা তখন অপরাহ্ণ। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। দুইটী বাড়ীর মধ্যস্থিত, হাত দুই চওড়া অতি সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়া, চতুর্দ্দিকে ছোট বড় নানা প্রকার বাস-ভবনে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত একটি খোলা জায়গায় ঢুকিয়া পড়িলাম। ইহাই জালিয়ানওয়ালা-বাগ। আগ্রহান্বিত বিস্ময়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া নিলাম। আপনা হইতেই নিজের মনে প্রশ্ন জাগিল —এই-ই জালিয়ানওয়ালাবাগ? আর একবার চতুর্দ্দিকে চক্ষু ফিরাইলাম। কই কিছুইত দেখিতে পাইতেছি না। ওডায়ার, লুইস গান, শত শত ভীত সন্ত্রস্ত নর-নারী, মৃত-দেহের স্তূপ—কই কিছুই ত নাই। শত সহস্র আহত নর-নারীর মৃত্যুকাতর আর্ত্ত-কণ্ঠস্বর কাণে আসিতেছে না।

মাকে যেদিন হারাইয়াছিলাম মনে হইয়াছিল, কে যেন হৃৎপিণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া নিয়া গেল। কিছুদিন পর্য্যন্তও বুক চিরিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিত, নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতাম না। পরে মায়ের শ্মশানে গিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু আর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারি নাই। তবুও মনে হইয়াছে আমার সেই এক দিনের কান্নাই যেন বিশ্বাকাশে মিশিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শুধু নীরব স্তব্ধ হইয়া শ্মশানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রহিয়াছি। মা যেন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এক একবার ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি, মাকে কি ভুলিয়া গেলাম? জালিয়ানওয়ালা-বাগের দিকেও একটা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম,



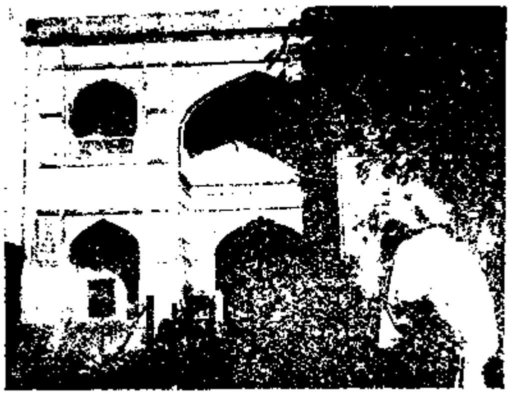
আনারকালির সমাধি ভবন

বাঙ্গলায় "আনার" মানে বেদানা। সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজত্ব-লাভ করিবার পরে আনারকালির কবরের উপরে এই সমাধি ভবন নির্ম্মাণ করেন।

যেন কোন পরমাত্মীয়ের শ্মশানে দাঁড়াইয়া আছি। সেখানকার আকাশ বাতাস কি যেন একটা নিদারুণ অথচ অস্পষ্ট বিপদে আচ্ছন্ন। জালিয়ানওয়ালাবাগ আমার সম্মুখ হইতে যেন কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া যেন চমকিয়া উঠিলাম। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি কি তবে মন হইতে মুছিয়া গেল? কিন্তু, না, তা যায় নাই। মায়ের স্মৃতির মতই আমার প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে—

"ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা,
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর
দিয়েছো যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।"

অভিভূতের মত এক এক করিয়া সব জায়গাগুলি দেখিতে লাগিলাম। এই প্ল্যাটফর্ম্ম—যেখান হইতে ওডায়ার তাহার সমস্ত গোলাগুলি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গুলি



গুলাবি বাগের তোরণ

১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জাহানের পোতাধ্যক্ষ (Admiral) মির্জা সুলতান বেগম কর্ত্তৃক এই বাগান পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হয়। এখন বাগানের অস্তিত্ব নাই শুধু ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কিন্তু তবুও তার চমৎকার কারুকার্য্য খচিত তোরণটির দিকে চাহিলে অতীতের সৌন্দর্য্যের একটা ছবি যেন মানসপটে ভাসিয়া উঠে। তোরণটি এখনও আছে লাহোর হইতে অমৃতসর যাইতে রাস্তায় বাঁ পাশে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর।

চালাইয়াছিল। ঐখানটায় সভা হইতেছিল। প্রাণরক্ষার আকুল আগ্রহে ঐ দেয়াল টপ্‌কাইয়া ভীত সন্ত্রস্ত লোকগুলি বাহিরে যাইবার চেষ্টায় গুলিবদ্ধ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তারি চারিদিকে মৃত ও অর্দ্ধমৃত দেহের স্তূপের ভিতর হইতে তারপরদিন পর্য্যন্ত মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছিল। মাটি হইতে ১২।১৪ ফিট উঁচুতে গুলির কয়েকটা দাগ এখনো আছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দাগগুলির চতুর্দ্দিকে লৌহ বেষ্টনী দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। আর এক জায়গায় একটা দেয়ালে এখনো রক্তের দাগ কালো হইয়া আছে। সবই দেখিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এসব যিনি আমাদের দেখাইলেন তিনি একজন বাঙ্গালী। নাম Dr. S. C. Mukherje। হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস্ করেন এবং জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনার পর হইতেই কংগ্রেস হইতে নিযুক্ত হইয়া এখানকার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁকে দেখিয়া মনে হইল যেন আর একটা tragedy। বয়স ৫৫ কি তার উপর। মুখে একটা বিষণ্ণ বিফলতার ছাপ। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভরা যৌবনে আসিয়াছিলেন, জালিয়ানওয়ালা বাগের তত্ত্বাবধান করিতে। সেই হইতে এখানেই রহিয়া গিয়াছেন এবং বাকী জীবনও এখানেই কাটাইবেন। তখন জালিয়ানওয়ালা বাগ ছিল সমস্ত ভারতের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। উত্তপ্ত রক্তধারা সমগ্র ভারতের শিরায়, উপ-শিরায় ঐ স্থান হইতেই প্রবাহিত হইত। মোহ ছিল, উন্মাদনা ছিল। আজ তার কিছুই নাই। শুধু কখন কখন কোন উৎসুক দর্শককে বাগের নানা স্থান দেখানই তাঁহার এই বৈচিত্রহীন জীবনের একমাত্র আনন্দ। বলিলাম, আপনারও একখানা ফটো নেই। তিনি বলিলেন—"না থাক, আমার আবার কি ফটো নিবেন?" অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ হইলেও এই নিষেধ অমান্য করিতে সাহস হইল না। অন্য একখানা ফটো নেওয়ার সময় তিনি আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্যামেরার পর্দ্দায় তাঁর ছায়াটা পড়িয়াছিল। সেই ছায়ার ছবিটা আমার কাছে আছে। ঐটা দেখিয়াই মিষ্টার মুখার্জ্জিকে মনে পড়ে এবং মনে হয় উহাই তাঁহার সত্যিকারের ফটো। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আমরা আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

আবার লাহোর! কাজের ভিড়ে ও ছুটাছুটীতে সব দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। তবুও আনারকালির সমাধি দেখিতেই হইবে। কার্য্য ব্যপদেশে একদিন Legislative assemblyতে গিয়া জানিতে পারিলাম একই সংবেষ্টনীর মধ্যে আনারকালির সমাধিও রহিয়াছে। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার সেখ রহমত খাঁর সৌজন্যে ও সাহায্যে সহজেই সমাধি মন্দির দেখিয়া তার ছবি নিলাম। মনে কেমন একটা বিশ্রী ভাব জাগিয়া উঠিল। মানুষগুলি কি একেবারে

হৃদয়হীন পশু। আনারকালির সমাধি মন্দির আজ একটি সরকারী দপ্তরে পরিণত। শবাধারটি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে অন্য এক জায়গায়। কত তুচ্ছ বিষয় নিয়া দেশ জোড়া হৈ চৈ এমন কি মাথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া যায় অথচ এত বড় একটা sacrilegeএর বিরুদ্ধে অতীত বা বর্ত্তমানে আজ পর্য্যন্ত কিছুই শুনিলাম না। কথিত আছে আকবর বাদশাহ নাকি পুত্র জাহাঙ্গীরের এই বেয়াকুফিতে ক্ষুব্ধ হইয়া এই নিঃসহায় নিরপরাধ বালিকাকে জীবন্ত অবস্থায় কবরে পুতিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—বিশেষতঃ আকবর বাদশাহ সম্বন্ধে। কিন্তু ছাপার অক্ষরে একাধিক বইতে ইহা লেখা দেখিয়াছি! ইহার কোন প্রতিবাদও চোখে পড়ে নাই। এই ঘৃণ্য ইতিহাস যদি সত্য হয় তবে সম্রাট আকবরের চাইতে কোন ঘৃণ্য কীট আজ পর্য্যন্ত ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছে বলিয়াও আমার মনে হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ নিয়া কোন ঐতিহাসিক বিতর্কের কথা কাণে আসে নাই। অথচ সম্রাট আকবর সম্বন্ধে এই অপবাদটী লোক মুখে এবং নানা ভাবে ঘোষিত হইতেছে।



শহিদগঞ্জ এখন শিখদের দখলে। ইহার স্বত্ব নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মনোমালিন্য এখনও মেটে নাই। ছবিতে যে বেদীর সম্মুখে শিখগণ উপবিষ্ট আছেন সেই বেদীতে বর্ত্তমান শিখদের গ্রন্থ সাহেব রক্ষিত আছে। যে স্থানে বর্ত্তমানে বেদীটি নির্ম্মিত হইয়াছে শোনা যায় ঠিক্ ঐ জায়গাটিতেই ধর্ম্মত্যাগের অসম্মতিতে হত্যা করা হইতে ঐ নরবধের রক্তস্রোতেই "শহিদগঞ্জে রক্তবরণ হইল ধরণীতল"।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিও এক দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তার ছবি তুলিতে পারি নাই কারণ দিন ছিল অত্যন্ত মেঘলা। ঐ জায়গাটাকে বলে শাহদারা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শেষ বিশ্রাম স্থান। কি বিরাট পরিকল্পনা! জীবনে অনেক tomb, অনেক স্মৃতি স্তম্ভ দেখিয়াছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখনো কোন বাদশাহের সমাধি মন্দির দেখি নাই। এক এক সময় মনে হইয়াছে এই মোগল সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হইল না কেন? আজ মনে হয়, এ জিজ্ঞাসার একটা উত্তর মিলিয়াছে? মোগল সম্রাটদের কাছে সাম্রাজ্য ছিল একটু তুচ্ছ খেলনা মাত্র। তাঁরা ত বেণের জাত ছিলেন না যে সাম্রাজ্য আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবেন। ওদের কাছে ভারত সাম্রাজ্যের মত একটা সাম্রাজ্য থাকলেও যা না থাকলেও তাই। ওদের বেহিসেবী মন ছিল সাম্রাজ্যের বহু উপরে। এমন একদিনও আসিতে পারে যেদিন এত বড় সমাধি মন্দিরও ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে, হয়ত কেউ তখন জাহাঙ্গীর বাদশাহের নামও করিবে না কিন্তু বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে যখন ভাবি কী দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব ও

স্পর্দ্ধা ছিল এই মোগল সম্রাটদের যে মহাকালকে দ্বন্দে আহ্বান করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁদের বাঁধে নাই।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধি মন্দিরের অনতিদূরেই আছে ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধি মন্দির। কোনও ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের চিহ্নও তাতে নাই। একেবারে রিক্ত ও নিরাভরণ। প্রথম দৃষ্টিতে এ বড় আশ্চর্য্য ঠেকে। যাঁর অঙ্গুলি হেলনে একদিন সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য চালিত হইত, যাঁর পদতলে গর্ব্বিত মোগল বাদশাহের শিরোভূষণ লুণ্ঠিত হইত, তাঁর সমাধি মন্দির আজ একেবারে বিশেষত্ব বর্জ্জিত? কিন্তু এর উত্তর পাওয়া যায় তাঁরই রচিত দুই ছত্র কবিতায়

"বার মাজারি—মা গরীবান
নে চেরাগ নে গুলে।
নে পারে পারোয়ানা সোজাল
নে সদাই নে বুলবুলে"।



অমৃতসর সহরের দৃশ্য। "বাবা-অটলের" চূড়ার উপর হইতে গৃহীত ফটো।

"আমার মতো দুঃখিনী গরীবের কবরের উপর যেন কোন বাতি না জ্বলে, কোন ফুল যেন না ফোটে। দীপের শিখায় এখানে কোন পতঙ্গ যেন না পোড়ে কোন বুলবুল তার সঙ্গীতে যেন আমার ঘুম না ভাঙ্গায়।" সম্রাজ্ঞীর শেষ ইচ্ছা ছিল এই দুই ছত্র কবিতা যেন তাঁর সমাধি ক্ষেত্রে ক্ষোদিত থাকে। যদিও কবিতাটী খোদিত নাই, তবু মনে হয় যেন ঐ দুইটী ছত্র সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমাধি-মন্দির ঘেরিয়া প্রতিনিয়ত অনুরণিত হইতেছে—

"বার মাজারি—মে গরীবান
নে চেরাগ নে গুলে।
নে পারে পারোয়ানা সোজাল
নে সদাই বুলবুলে।"

সম্রাজ্ঞীর ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে কোন অসহায়া নারী বাস করিত কে বলিতে পারে? সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। আমারও কলিকাতায় ফিরিবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। বিষণ্ণচিত্তে সমাধি মন্দির দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কতদিন অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় "লরেন্স গার্ডেনের ভিতর দিয়া ক্যাণ্টনমেণ্টের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গিয়াছি। ডোয়ার ক্যানেলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হইয়া গিয়া আবার ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। দুই পাশে নানা প্রকারের সবুজ গাছপালা। জোরে মোটর চালাইয়া চলিয়াছি সামনে দেখি রাস্তা ক্রমশঃ একেবারে তিনতলার সমান উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। জোরে আরও জোরে সর্ব্বোচ্চ গতিতে উপরে উঠিয়া আবার আয়াসলেশহীন তীব্র গতিবেগে নীচে নামিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। দেহ মনের সে কী শিহরণ। ক্যাণ্টনমেণ্ট ছাড়াইয়া মাঠ। মাঠের শেষে রাস্তাও শেষ। অন্য রাস্তায় গিয়া মিশিয়াছে। একদিন ফিরিবার মুখে সামান্য একটু অসতর্কতায় গাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল রাস্তা ছাড়াইয়া একটা ছোট খাদের মধ্যে। গাড়ী না এগোয় সামনে না যায় পিছনে। চারিপাশে কোন দ্বিতীয় মানবের চিহ্নও নাই। অপরিচিত জায়গা, ভাড়াকরা গাড়ী। ভাবিলাম কি করা যায়। কিন্তু মনে মনে একেবারে 'কুচ্ পরোয়া নেই ভাব।' এও যেন একটা থ্রিল। একটু পরে একটী লোক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিতেই সে আসিয়া কিছু সাহায্য করিল—এবং কোনও রকমে গাড়ীটিকে উদ্ধার করিয়া আবার চলিলাম শহরের দিকে।

মাঝে মাঝে শহরে ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইতে রাত হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় শহরের উপকণ্ঠে সন্ধ্যালোকিত রাস্তা। দুধারে চমৎকার গাছপালা। নয়ন মন দুই-ই যেন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। বাইরে কনকনে শীত। আপাদমস্তক মায় হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত গরম জামায় ও দস্তানায় আবৃত। শুধু চোখে মুখে আসিয়া শীতের বাতাস লাগিতেছে।

দেহে ও মনে এক অপূর্ব্ব শিহরণ। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বহুদিন বিগত কৈশোর, অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাওয়া অতীত যৌবনের জন্য যেন একটা অশান্ত ক্রন্দন জাগিয়া উঠিল। বহুদিন আগে শোনা একটা গানের দুইটি চরণ (কার রচনা জানি না) মনে পড়িতে লাগিল—

"আমার এই গানের ভেলায়
এলে না—প্রভাত বেলায়
হলে না সুখের সাথী
জীবনের প্রথম দোলায়।"

তখনি আবার মনে হইত এই যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত, এই যে সুখ, এরই কি মূল্য কম? কী হবে অতীতের কথা ভেবে?

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে"

কি কাজ আমার কুড়ায়ে "ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম?" বর্ত্তমানই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর এই বর্ত্তমানও ত শুধু আমাকে স্পর্শমাত্র করিয়া ক্ষণে ক্ষণে আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুদিন পরে ইহাই হইবে আমার অতীতের স্মৃতি। কিন্তু তবু তারা থাকিবে, অনন্ত অতীতের ভাণ্ডারে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া আমার একটি মুহূর্ত্ত অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে, তাহাদের ক্ষয় নাই। সবই "আছে আছে আছে"।

কিন্তু তবুও ত এ ক্রন্দন থামে না। থাকিয়া থাকিয়া অতীতের জন্য হাহাকার করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

"হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা
কও কথা কও।"

লাহোর প্রবাসের কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। অফিসের কাজও প্রায় শেষ। আর এদিকেও লাটাইয়ের সুতায় টান পড়িয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কলিকাতায়। তারা কেমন আছে, কিভাবে দিন কাটাইতেছে। ছোট ছেলেটা অত্যন্ত দুরন্ত, কারো কথা শোনে না। রাশি রাশি নালিশ জড় হইয়া আছে। না আর নয়। এবার বিদায়ের পালা।

সকলের না হোক অনেকেরই স্বভাব বোধ হয় আমারই মত যে থাকিতে কিছুই মনে থাকে না। খেলা যে একদিন ভাঙ্গিতে হইবে তা জানিয়াও জানে না। মনে হয় এমনিই বুঝি চলিবে। তাই হঠাৎ যখন ডাক পড়ে তখন দেখি হায় হায় সব না হলেও পৌনে ষোল-আনা কাজ যে বাকী রহিয়া গেল। কিন্তু বাকী রাখিয়াই যাইতে হয়। উপায় নাই।

মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম লাহোরে দেখবার যা কিছু আছে সবই দেখিয়া যাইব। কিন্তু যাবার সময় হিসাব করিয়া দেখি তার কিছুই দেখা হয় নাই। অধিকাংশই বাকী পড়িয়া আছে এবং যাও দেখিয়াছি সবই যেন উপর ভাসা। তা ছাড়া উপায়-ই বা কি ছিল? "যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না" এ ত জানা কথা। আর এক জোড়াই-ত চক্ষু, সহস্র চক্ষু ত আর নাই।



বিচিত্র পোষাকপরিহিতা অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী পাঞ্জাবী মহিলা।
(লাহোর একজিবিসনে গৃহীত)

কাজেই অনেক কিছুই বাকী রহিয়া গেল। তবে একটা যায়গা দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই নাই। "শহিদ্-গঞ্জ" দেখিয়া আসিয়াছি। 'শহিদ্গঞ্জে রক্তবরণ হইল ধরণীতল" একটা চিরন্তন শহিদ্গঞ্জ মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া ছিল। স্থূল ও বাস্তব শহিদ্গঞ্জটা যে কোথায় তার কোন ধারণাই মনে ছিল না,—পঞ্জাবে কোথাও না কোথাও হইবে। তার পরে শহিদ্গঞ্জ মস্জিদ্ নিয়া গোলমাল কাগজে কাগজে বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু মস্জিদ্ ভাঙ্গাচোরা সংক্রান্ত শহিদ্গঞ্জ এবং যে শহিদ্গঞ্জে "রক্তবরণ হইল ধরণীতল" এই দুইয়ের ভৌগলিক অবস্থান এক হইলেও মনের মধ্যে তার

ব্যবধান একটা রহিয়াই গেল। তবুও মসজিদ্ সংক্রান্ত গোলমালে শহিদগঞ্জের ভৌগলিক অবস্থানটা নির্ণয় করা খুব সহজ হইয়া গেল। শহিদগঞ্জ সম্বন্ধে মনের মধ্যে আগে একটা অস্পষ্ট রকমের ধারণা ছিল যে "নারায়ণগঞ্জ" "বাখরগঞ্জ" "মুন্সীগঞ্জ" জাতীয় কোন একটা ছোট খাট "গঞ্জ" অর্থাৎ শহর বা বন্দরের মত হইবে। কিন্তু যখন শুনিলাম তা নয়, শহিদগঞ্জ লাহোরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত, তখন ভারি একটা আনন্দ হইল এবং ভাবিলাম সহরের একটা অঞ্চলকে বোধ হয় শহিদগঞ্জ বলে এবং আমি নিশ্চয়ই দেখিয়া যাইতে পারিব।



বিচিত্র পোষাকপরিহিতা অপূর্ব লাবণ্যময়ী কাশ্মিরী মহিলা।
(লাহোর একজিবিসনে গৃহীত)

একদিন সকালবেলা কি কাজে শহরের এক প্রান্ত দিয়া যাইতে যাইতে এক ভদ্রলোক বলিলেন এই-ই শহিদগঞ্জ। তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িলাম। ক্যামেরা সঙ্গেই ছিল। নামিয়া দেখি "শহিদগঞ্জ" কোন শহর বন্দর ত নয়-ই এমন কি শহরের কোন অঞ্চল বিশেষও নয়। শুধু ,বিঘে খানেক ঘেরাও জমি। ভিতরে দুই একটি পুরাণো ভাঙ্গাচোরা বাড়ী। দু'পাশে দুইটি প্রবেশ পথ। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে অসি ও বল্লম হস্তে শিখ প্রহরী দণ্ডায়মান। কোনও মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ। আমি মুসলমান নই অতএব ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি বেদীর সম্মুখে উপবিষ্ট কয়েকজন কি একখানা বই খুব সম্ভবতঃ তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছে। মাথার উপরে সমিয়ানা খাটান। এদিকে ওদিকে কয়েকজন শিখ পুরুষ ও রমণী। একপাশে "লঙ্গরখানা" বা free kitchen। যার ইচ্ছা বিনামূল্যে আহার করিতে পারে। ঔৎসুক্যবশতঃ একবার বিনামূল্যে আহারের ব্যবস্থাটার দিকে চাহিলাম। "বিপ্র" না হইলেও, কেন জানি না, আহারের কথা মনে হইলেই মন কিছু না কিছু চঞ্চল হইয়া উঠে। তার উপরে আবার বিনামূল্যে ব্যবস্থা। কিন্তু আহার্য্য সামগ্রীর উপর চোখ পড়িবামাত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং নিজেকে অত্যন্ত নির্লোভ বলিয়া মনে হইল। দেড়সের আন্দাজ ওজনের কাল পোড়া এক একখানা রুটী আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালাপূর্ণ নয়নাভিরাম ডাল। বুঝিলাম আমি বাঙ্গালী আর এ পাঞ্জাবী।

একটা যায়গায় অনেকখানি খনন করিয়া একটা গর্ত্তের মত করা হইয়াছে। মুসলমানগণ দাবী করিয়াছিলেন যে ঐখানটায় একটী পীরের কবর আছে, কিন্তু খনন করিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে ঐরূপ কিছুই নাই। একটী প্রায় ১০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট বাঁধান ইঁদারার মত আছে। তার ভিতর হইতে বহু নরকঙ্কাল, নরমুণ্ড ইত্যাদি তোলা হইয়াছে এবং ঐগুলি একটী আলমারীতে সাজান আছে, সেটী একটি একতলা প্রকোষ্ঠের বহির্গাত্রে দাঁড় করান। ঐ প্রকোষ্ঠটি একটি অন্ধকূপ জাতীয় ঘর। প্রবেশ পথটি ৩.৪ ফুট মাত্র উঁচু, প্রত্যেককে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে বা ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে হইলে প্রায় হামাগুড়ি দিতে হয়। ঐরূপ করিয়াই ভিতরে গিয়াছিলাম। যাহাদিগকে মুসলমান করিবার জন্য আনা হইত তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ঐ প্রকোষ্ঠটির ভিতরে আটক রাখা হইত। যে স্থানে এখন শিখেরা বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছে, শুনিলাম ঠিক সেই যায়গাটায় নাকি শিখদিগকে হত্যা করা হইত, যদি তাহারা মুসলমান হইতে স্বীকৃত না হইত। প্রায় সমস্ত সংবাদগুলিই বিজ্ঞাপনের আকারে ইংরেজীতে একটা যায়গায় লিখিত আছে। আমাকে ফটো নিতে দেখিয়া উহারা খুব উৎসাহিত হইল। ক্যামেরায় ফিল্ম ছিল না বলিয়া, সব ফটো নিতে পারি নাই। যে সমস্ত শিখেরা পুঁথি পাঠ

করিতেছিলেন তাঁদের দেখিয়া মনে হইল আমাদের দেশের পুরোহিত ও পণ্ডিত শ্রেণীর এবং অন্য যাহারা চলাফেরা করিতেছিলেন বা পাহারা দিতেছিলেন তাঁদের মনে হইল আমাদের দেশে যাদের "নিম্নশ্রেণীর" বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি সেই শ্রেণীর। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনও শিখকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। হয়ত সেই বিশেষ সময়টায় কেউ সেখানে যান নাই। না গেলেও পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমস্ত শিখ-সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তি শহিদগঞ্জের পশ্চাতে রহিয়াছে। এক শ্রেণীর বাবু ও সাহেবী ধরণের শিখ লাহোর শহরে চোখে পড়িয়াছে এবং তাহাদের ভিতর স্ত্রী পুরুষ দুই-ই আছে। তাদের দেহ সৌষ্ঠবও দেখিবার মত এবং শহিদগঞ্জ যে মুসলমানগণ



হোটেল ও হোটেল মালিকের যে বর্ণনা ভুক্তভোগীর মুখে শুনিয়াছি তাহাতে নিজের অদৃষ্টকে বহু ধন্যবাদ দিই যে সেই স্বর্গপুরীতে বাস করিবার বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় নাই। বেশী বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হয় নাই। তবে একটি বাঙ্গালী পরিবারের সহিত পরিচিত না



জালিয়ানওয়ালা বাগ

জালিয়ানওয়ালাবাগের অভ্যন্তর। সাদা প্রাসাদটির যে পাশটি গভীর কালো তার পা ঘেঁসিয়া একটি সরু গলি। ২টী লোক অতি কষ্টে গা-ঘেঁসিয়া কোনও রকমে যাতায়াত করিতে পারে এবং উহাই জালিয়ানওয়ালাবাগে গমনাগমনের একমাত্র রাস্তা। তার সম্মুখে যে প্ল্যাটফর্ম দেখা যাইতেছে ঐ যায়গাটিতেই ডায়ার সাহেব তার লুইস গান স্থাপন করিয়া গুলি চালায়। উহা হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে—ঠিক যে জায়গাটিতে মহিলাটি দাঁড়াইয়া আছেন—জনসাধারণের সভা হইতেছিল এবং ঐ সভাস্থ আবালবৃদ্ধ জনতার উপর ঐ লুইস গান হইতে অবিরাম গোলা বর্ষিত হয়। ছবিতে হাটপরা যে ছায়াটি দেখা যাইতেছে তাহা জালিয়ানওয়ালাবাগের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ মুখার্জ্জির ছায়া।

এখনও জবরদস্তি করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করিতেও সাহস করে নাই তাহাতে মনে হয় শিখেরা এখনও শৌর্য্য বীর্য্য হারায় নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিখদের বিলাসপ্রিয়তা ও বাবুয়ানীর বহর দেখিলে ভয় হয়।

লাহোরে বাঙ্গালীদের একটি ক্লাব আছে শুনিয়াছি। কিন্তু কখনো দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। একটি হোটেলও নাকি আছে, নাম Bengali Hotel। কিন্তু

হইয়া বোধ হয় উপায় ছিল না। আমি জানি না এমন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক লাহোরে গিয়াছেন কিনা যিনি সরকার পরিবারকে জানেন না। পরিবারের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার মহাশয় শুনিয়াছি নাকি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ কর্ম্মচারী।

পুলিশের লোক রিটায়ার্ড হইলেও যে এমন সাধাসিধে, অমায়িক এবং আপনভোলা হইতে পারে এ ধারণা শ্রীযুক্ত

সরকারকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার কল্পনার অতীত ছিল। ভদ্রলোক লাহোরে নূতন পদার্পণকারী যে কোন বাঙ্গালীকে যেন নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া সপরিবারে তাঁর সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার ভার লইয়া বসেন। তাঁর বাড়ীর দরজা যে কোন বাঙ্গালীর জন্য সদা উন্মুক্ত এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং নিজের সমবেত সেবা ও আদরের আতিশয্য দ্বারা বোধ করি, যে কোন সমর্থ বাঙ্গালীকেও অসহায় করিয়া তুলিতে পারেন। এঁরাই লাহোরের একমাত্র বাঙ্গালী পরিবার যাদের সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং যাঁহাদিগকে বোধ হয় কখনই ভুলিতে পারিব না।



গমনাগমনের পথে দুইস্থানে অবস্থিত থাকায় এবং পালাইবার জন্য কোন পথ না থাকায় জালালা বিশিষ্ট প্রাসাদটির পার্শ্বস্থিত একটী প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া কতক লোক প্রাণভয়ে পালাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু পলায়নপর লোকের উপরেও গুলি চালনা করা হয়। ফলে মাটি হইতে অনেক উচুতে দেয়ালের গায়ে চারিটি গুলির চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ঐ গুলি চিহ্নগুলি লৌহ বেষ্টনি দ্বারা বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। চারিটি চিহ্নই ছবিতে লক্ষ্য করা যাইবে।

যাহা যাহা দেখিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম তাহা দেখিতে পারি নাই। দেখার চেয়ে না-দেখা রহিয়া গেল অনেক বেশী এবং যাহা বলিতে বসিয়াছিলাম কিছুই প্রায় তার বলিতে পারিলাম না। না-বলার দিকটাই ওজনে হইয়া গেল অনেক ভারি! তা ছাড়া ভাষা ও বাক্যের যাহা অতীত তাহাকে কেমন করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিব? একদিন রাত্রি হইয়া গিয়াছে প্রায় নয়টা। অমৃতসর হইতে লাহোর ফিরিতেই হইবে, কিছুতেই সেখানে রাত্রি কাটাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠিক করিলাম ফিরিয়া যাইবই। ত্রিশ মাইল রাস্তা। শহরের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত কিছু লোক চলাচল আছে। তার পরেই একেবারে জনশূন্য। গাড়ীতে পেট্রল পুরিয়া নিয়াছিলাম শহরে থাকিতেই। দশ মিনিটেই শহরের সীমানা ছাড়াইয়া পড়িলাম একেবারে নির্জ্জন রাস্তায়। নির্জ্জন ও নীরব। শুধু মাঝে মাঝে দৈত্যের মত দুই একটা লাহোর-অমৃতসর যাতায়াতকারী মটরবাস তীব্রবেগে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। দূরে থাকিতে হেডলাইট দুইটা জ্বালায়। আলোতে চোখ ধাঁধিয়া দিয়া কাছে আসিলে লাইট নিভাইয়া দিয়া হুস করিয়া চলিয়া যায়। তারপরে আবার একাকী। দু'পাশে নির্জ্জন প্রান্তর, সম্মুখে পথ। সমস্ত পৃথিবীতে আমি একা। একমাত্র সঙ্গী আমার চিন্তা, আর আকাশে তারা, আর চারিদিকের ম্লান অন্ধকার। —আচ্ছা হঠাৎ যদি গাড়ীখানা বিকল হয়, আমি কি করিব? যদি ডাকাত পড়ে? যদি,—কত অসংলগ্ন চিন্তা মস্তিষ্কের ভিতরে হানাহানি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে পথচলার একাগ্রতা যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মোটর চলিয়াছে পূর্ণ গতিতে, চক্ষের নিষ্পলক দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, কাণ উন্মুখ। যেন দুইটা আমি। একটা আমি সারা বিশ্ব প্রকৃতির ও রাত্রির অন্ধকার নির্জ্জনতার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। আর একটা আমি গাড়ীর ষ্টীয়ারিং ধরিয়া বসিয়া আছি, তার আছে শুধু দুইটা চোখ। হঠাৎ একটা শব্দে শরীরের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল। চক্ষের নিমেষে ব্রেক চাপিয়া গাড়ীর গতি হ্রাস করিতে না করিতেই দেখি আমার সামনে রাস্তার বাঁ দিক হইতে একটা ঘোড়ায় চড়া লোক কি একটা ক্রুদ্ধ কর্কশ শব্দ করিয়া রাস্তাটা পার হইয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর ঐ লোকটার কর্কশ কণ্ঠে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার একটা আমি যেন মুহূর্ত্তের জন্য হতচেতন হইয়া গেল। কিন্তু ষ্টীয়ারিং ধরা আমিটা ঠিক কলের মত কাজ করিয়া গেল। মুহূর্ত্তে গাড়ীর স্পীড বাড়াইয়া দিলাম লোকটা কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। বুকের ধড়ফড়ানি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু অত ভীতি-বিহ্বলতার

সত্যিকার কোন কারণ ছিল না। লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাত নয়। খুব সম্ভবতঃ আমার গাড়ীর শব্দে তার অশ্বটার মেজাজ খারাপ হইয়া যাওয়ায় সে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা অবান্তর। আসল কথা হইল ঐ নির্জ্জন, অন্ধকার, শীতের রাত্রে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে আমার ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রমণ। মাথার উপর অনন্ত নক্ষত্র-খচিত আকাশ, দুই পাশে প্রান্তর, সম্মুখে পথ, পথের উপর দিয়া তীব্র গতিতে চলিয়াছে মোটর এবং তার ষ্টীয়ারিং হুইলটি ধরিয়া বসিয়া আছি আমি।

এই যে আমার জীবনের ঘড়ীর হিসাবে এক বা সোয়া ঘণ্টা সময় আর পাঞ্জাবের কোন্ প্রান্তরের ত্রিশ মাইল পথ, ইহাদের জীবন্ত পরিচয় দিব আমি কোন্ ভাষায়? কোন ক্যামেরায় তুলিব অন্তর ও বাহিরের ঐ চলচ্চিত্রের ছবি?

(সমাপ্ত)

শ্রীঅখিল

শিল্পী

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য

বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়েছে রঙনের। অযত্ন-বিন্যস্ত কুঞ্চিত চুলের রাশি তার শুভ্র ললাটে এসে পড়েছে। স্বপ্নাতুর চোখ দুটীতে তার নিবিড় ক্লান্তির রেখা। অস্থির পদে সে জানালায় এসে দাঁড়ালো, ভোরের আকাশে তখনো শুকতারা দপ-দপ করে জ্বলছে। প্রদোষের স্নিগ্ধ আলোয় সে তার অসমাপ্ত চিত্রটীর দিকে তাকালো। চিত্রটীর নাম "উষা"। তার মায়া তুলিকার স্পর্শে প্রত্যূষের রক্তিম আভা নির্ভুল ফুটে উঠেছে চিত্রের বুকে। সদ্য-ঘুম-জাগা প্রকৃতির নিঁখুত প্রতিকৃতি—ভোরের বাতাসের স্পর্শটুকুও বুঝি অনুভব করা যায়। এইবার চিত্রের মধ্যে মানুষকে তার যথার্থ স্থানটী দিতে হবে। কিন্তু…

·· গভীর অতৃপ্তি নিয়ে রঙন্ পথে বেরিয়ে পড়লো। সে যেন তার জীবনের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হ'য়েছে আজ,—হয় জয়মাল্য কণ্ঠে পরে সে গৌরবের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হবে, নয় পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি নিয়ে সে লোকচক্ষের অন্তরালে সরে যাবে। এই চিত্রটীতেই তার চরম ভাগ্য-নির্ণয় হবে।···

···সহসা উন্মনা রঙনের সম্বিৎ ফিরে এলো। পথিপার্শ্বে সুরম্য প্রাসাদ, তারই অলিন্দে দাঁড়িয়ে অপরূপ এক রমণী। আঁধারের ঢেউয়ের মত রাশীকৃত কেশের মাঝে তার পাণ্ডুর মুখখানি যেন শিশির-স্নাত পদ্মের মত ফুটে রয়েছে। অলিন্দ-প্রাচীরে কনুইয়ের ভর রেখে, হাতের উপর গণ্ডদেশ ন্যস্ত করে সুন্দরী রঙনকেই লক্ষ্য করছিল।

প্রাসাদ নটীশ্রেষ্ঠা চম্পাবতীর। রঙনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই রমণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাকে আহ্বান করলে। মন্ত্রচালিতের মত রঙন্ উপরে উঠে গেল। তার অভীষ্টের সাক্ষাৎ মিললো কি? এই কি উষার মানবী প্রতীক?

রঙনের সামে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চম্পা সুমিষ্ট-স্বরে প্রশ্ন করলে, "কে তুমি, পথিক?"

রঙন্ তখন একাগ্র দৃষ্টিতে চম্পার মুখে কী-যেন অনুসন্ধান করছে। চম্‌কে উঠে বল্লে, "আমি? আমি রঙন্—শিল্পী। কিন্তু···"

"কিন্তু কী, শিল্পী?"

"না।···কোথায় যেন অভাব থেকে যাচ্ছে। সামান্য খুঁত। নাঃ, হোলো না।"

"কী হোলো না, রঙন?"

'তুমি অপূর্ব্ব, নারি! তবু···তবু···। নাঃ, আমি চল্লাম। হয়তো আবার আসবো। আমার যে পাওয়া চাই-ই!" ঝড়ের বেগে রঙন বেরিয়ে গেল।

নিশ্চল মর্ম্মর মূর্ত্তির মত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে চম্পা অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করলে। তার মনে হোলো সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল; মানুষ কি এত সুন্দর হয়? যেন

কোনো সুনিপুণ গ্রীক ভাস্করের সার্থক শিল্প-সৃষ্টি এই রঙন্। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তার চোখ দুটী। সেদিকে চাইলে বুঝি বিশ্ব-সংসার ভুলে যেতে হয়! চম্পার জাগরণ-পাণ্ডু মুখে রক্তের আভা দেখা দিল।……যেন একটানা গানের সুরের মধ্য দিয়ে কী এক মোহের ঘোরে চম্পার সারাটি দিন কেটে গেল। অর্থহীন-ভাবে বহুবার সে উচ্চারণ করলে, "রঙন্, রঙন্।" কথাটীর অনুরণন তার চেতনাকে যেন আবিষ্ট, অভিভূত করে ফেল্লে। একী নবীন উষার সূচনা তার জীবনে? প্রেমের বেসাতি করে সে; প্রেমভিক্ষু অগণন পুরুষ তার পদতলে লুটিয়ে থাকে অনুক্ষণ। সেই তার আজ এ কী হোলো? কোন্ আলোর দেশের দূত তার মনের নিবিড় তন্দ্রার ঘোর ভাঙিয়ে দিলে? 'রঙন্! রঙন্!'…… ……

……সন্ধ্যার আঁধার পৃথিবীর বুক ঢেকে ফেলেছে। আকাশে অসংখ্য তারার মালা আর গৃহে গৃহে সন্ধ্যার মঙ্গল প্রদীপ। নীচে দ্বাররক্ষীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল কোনো অপরিচিত আগন্তুকের প্রবেশে সে বাধা দিতে চায় যেন। চম্পা প্রাসাদ-অলিন্দ হতে ঝুঁকে পড়ে দেখলে রঙন্। রঙন্ এসেছে! উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোত তার কর্ণমূল আরক্ত করে তুল্লে। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে, "আসতে দাও। ওঁকে আসতে দাও, দ্বারী।"

ঋজু, উন্নত দেহ রঙন্ তার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার সুগভীর দৃষ্টি নিজের উপর অনুভব করে অতি-প্রগল্ভা চম্পা আজ চোখ তুলে চাইতে পারলে না। প্রথম-প্রণয়-ভীতা কিশোরীর মত তার বক্ষ দ্রুত তালে স্পন্দিত হতে লাগলো। সাগ্রহ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে রঙন্ ডাকলে, "চম্পা!" চম্পার আপাদ-মস্তক একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। সহস্র চেষ্টাতেও সে চোখ তুলতে পারলে না। ঈষৎ বক্র ঘন-পক্ষশ্রেণী তার আনত চোখে একটা মেদুর ছায়া বিস্তার করেছিল। সে স্পন্দিত বক্ষে কী এক মহাক্ষণের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। তার আরো কাছে সরে এসে রঙন্ তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে। মৃদু অথচ গাঢ়স্বরে ডাকলে, "চম্পা!"

চম্পার মনে হোলো সে যেন একটা চড়া-সুরে-বাঁধা বীণা; রঙন্ তাহাতে নিপুণ অঙ্গুলি চালনা করছে। তার সব তন্ত্রীগুলি এক সঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। উঃ, সে কী দুঃসহ আনন্দ! সে তার অতুলনীয় চোখদুটী তুলে মুহূর্ত্তের জন্য রঙনের মুখের দিকে চাইলে। তার দৃষ্টিতে মধুর সম্ভাবনার আনন্দ আর অনিশ্চয়তার ভীরু আশঙ্কা পাশাপাশি ফুটে উঠলো। চোখদুটী যেন তার আরতির যুগল প্রদীপ—কী ব্যাকুল মিনতি তারা নিবেদন করতে চায় নির্ম্মম দেবতার পায়ে!

রঙনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লো। উৎফুল্ল তৃপ্ত কণ্ঠে সে বল্লে, "পেয়েছি! পেয়েছি!" চম্পার হাত ছেড়ে দ্রুত-পদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চম্পা চীৎকার করে ডাকতে গেল, "রঙন্!" রুদ্ধকণ্ঠে তার স্বর ফুটলো না। বাণবিদ্ধা হরিণীর মতো সে লুটিয়ে পড়লো শয্যার 'পরে।…… ……

……এক পক্ষ পরের কথা। রাজভৃত্য এসে জানিয়ে গেছে সন্ধ্যার পর মহারাজের পদধূলি পড়বে চম্পার কক্ষে। উপযুক্ত সাজ-সজ্জা করে চম্পা রাজ-সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু চোখে তার সুগভীর ক্লান্তি, রক্তিম অধরের কোণেও অবসাদের রেখা সুপরিস্ফুট। প্রসাধনে তা ঢাকা পড়েনি।……

……রাজার আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত হোলো। দুই হাতে চম্পাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে রাজা বল্লেন, "তোমার জন্যে আজ এক অপূর্ব্ব উপহার এনেছি, চম্পা।"

নিরুৎসুক কণ্ঠে চম্পা বল্লে, "কী, মহারাজ?"

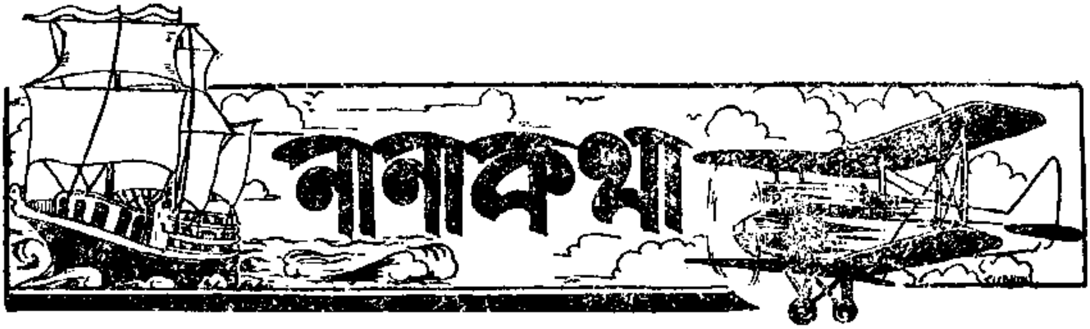
রাজ-আজ্ঞায় দুই জন পরিচারক একটা মূল্যবান বস্ত্রাচ্ছাদিত চিত্র ঘরে এনে রাখলে, রাজা স্বহস্তে আচ্ছাদন বস্ত্র অপসারিত করতে করতে বল্লেন, "আমি পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রঙনের কাছ থেকে এই চিত্র তোমার জন্য কিনে এনেছি। শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি এ চিত্র।"

পলকহীন চোখে চম্পা চিত্রের দিকে তাকিয়ে রইল। উষা—অসীম সম্ভাবনাময় কর্ম্মমুখর দিনের সূচনা, সারা-প্রকৃতির মধ্যে আশা আনন্দ ও নির্ম্মলতা। আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব্ব রূপবতী নারী উদয়াচলের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে তার গভীর সুখাবেশ, নয়নে লজ্জাজড়িত স্নিগ্ধ চাহনি। কিন্তু তারই অন্তরালে কোথায় যেন একটু অনির্দ্দেশ্য কারুণ্য, একটু আশঙ্কা লুকিয়ে আছে—যেন জীবনের দুঃখের দিকটার প্রতি একটী প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত।

চম্পা দু' হাতে মুখ ঢেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো, "উঃ, তোমার দেবী কি নরবলি গ্রহণ করেন শিল্পী? মহারাজ, মহারাজ, আপনার রাজ্যে খুনীর কি কোনো শাস্তি বিধানই হয় না? জানেন, রাজা, মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে এ ছবি আঁকা হয়েছে? উঃ, রঙন্!"

বিস্ময়-বিমূঢ় রাজার মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসৃত হোলো না।

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য



মহাজাতি সদন —

বিগত ১৯শে আগষ্ট ১৯৩৯ কলিকাতা ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক "মহাজাতি সদন"এর ভিত্তি স্থাপনা অনুষ্ঠান সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত ভূমির উপর সুরম্য এবং সুবৃহৎ অট্টালিকা গঠিত হইবে। এই অট্টালিকার মধ্যভাগে আড়াই হাজার লোকের বসিবার উপযোগী হল এবং তৎসংলগ্ন একটি অভিনয় মঞ্চ থাকিবে। ইহা ব্যতীত সুবৃহৎ গ্রন্থাগার এবং ব্যায়ামাগার ইত্যাদি থাকিবে। প্রধানতঃ কংগ্রেস ভবন হইলেও সাধারণের বহুবিধ প্রয়োজনে এই গৃহ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বঙ্গদেশে এই "মহাজাতি সদন" প্রধান উদ্যোক্তা দেশগৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের অক্ষয়-কীর্তি হইয়া রহিল। আমরা সকলে সুভাষচন্দ্রকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এতদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নে আমরা তাহা মুদ্রিত করিলাম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ—

আমার বিশ্বাস য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানাদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্ব যুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্ব মানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহামনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হোলো। আচার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নব যৌবন সঞ্চারে, সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে, নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন ক'রে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণচক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হোলো। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার ক'রে নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন নব নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হোতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না, যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নব যুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায়নি, বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই তার সত্য পরিচয়। এ কথা কারো অগোচর নেই যে একদা রাষ্ট্রমুক্তিসাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলাদেশ, এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা

কারাপ্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন, তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধ-বন্ধনের মুখে যেমন নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশেই এরকম ঘটেনি। এ ঘটনাকেও ফলের দ্বারা বা শাস্ত্র সুবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না, বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য অনুসারে। বাংলাদেশে সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ সুদীর্ঘকাল কারানির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে, জানি সেইজন্যে আজ বাংলাদেশের আকাশ অনুজ্জ্বল, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে-মাটিতে এদের জন্ম, সেই মাটিতে দুঃখজয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

আজ এই মহাজাতি-সদনে আমরা বাংলাজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা জ্ঞানের তপস্যা, এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সমুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি-সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তিরূপ গ্রহণ ক'রে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হোতে থাক্ :—

বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

সেই সঙ্গে এ কথা যোগ করা হোক বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিবেদন—

বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্য্যাতন ভোগ ক'রে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ ক'রে আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীক স্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্ম্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নি। পরিশেষে, আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ বপন করাতে পারছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারব।

আজকার এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবি-

ব্যতের কথা আপনা-আপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি, সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডী মানেনি—এমন কি জাতীয়তার গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন—তাহা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি, আমরা জানি যে আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারি।

নব জাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্মা যখন "বহু"র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে এক দিকে রাষ্ট্র এবং অপর দিকে সমাজ তাঁকে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে। তার পর আরম্ভ হ'ল—রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং সমাজ-বিপ্লব। সেই বিপ্লবের সূচনাও এই ভূমিতে—যেখানে একদিন ধর্ম্ম-বিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়—সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীর ও বিদেশী-বর্জ্জনের যুগ। তারপর এক দিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপর দিকে আমলাতন্ত্রের দমন-নীতি এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলে যে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে, আত্ম-সংযম হারিয়ে, ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা—সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা—অবলম্বন করলে। দশ বৎসর অতীত হতে না হতে, আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম—"অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের" অধ্যায়।

আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্জ্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা, আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে

অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্ক-বিতর্ক আমি শুরু করব না—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী সাফল্যলাভ করবে ব'লে বিশ্বাস করে। সর্ব্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপোষ ক'রে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা—হেলায় ছেড়ে দিবে না।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তাহা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্ব-মানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে—তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরহিত্যের পদে বরণ ক'রে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে "মহাজাতি সদন" নাম সার্থক ক'রে তুলুক—এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত ক'রে তুলি।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন

গত ২রা, ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর সহিত্য-বাসরের উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মাননীয় খান বাহাদুর আজিজুল হক্ মহোদয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের চারিদিনের অধিবেশনে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মূল্যবান অভিভাষণটি আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে প্রকাশিত করিলাম।

শতায়ু মহিলা

১০২ বৎসর বয়সে ২৪ পরগণা নিমতা গ্রামে শ্রীমতী রাজমোহিনী দেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি ধর্ম্ম-পরায়ণা দানশীলা মহিলা ছিলেন। ইঁহার স্বামী নর্থ-দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব সুযোগ্য চেয়ারম্যান বিষ্ণুচরণ মিত্র মহাশয় ত্রিশ বৎসর পূর্বে লোকলীলা সংবরণ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ইনি প্রথম সন্তান। স্বর্গীয় খ্যাতনামা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্রকে ও দেবর প্রবীণ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়কে আমরা আমাদের সম-বেদনা জানাইতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



 শকুন্তলা [শিল্পী — শ্রী অরুণ মজুমদার

বিচিত্রা

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪৬ | ৩য় সংখ্যা

খগোল ও বিশ্বতত্ত্ব

অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ (ক্যাণ্টাব) ; এম, এস্-সি (ক্যাল্), এফ্, আর, এ, এস (ইং) ; এফ, এন্, আই ; আই, ই এস।

স্মরণাতীত কাল হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ও অসীমতা জ্যোতির্ব্বিদ্ ও কবিবৃন্দের চিত্ত বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে গগনের দূর হইতে দূরতর স্থলে নব নব জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হইতেছে। আধুনিক সময়ে যন্ত্রবিজ্ঞানের যেরূপ প্রভুত উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষ্ক শাস্ত্রের অব্যাহত উৎকর্ষ ও ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। বাইবেল গ্রন্থের 'সলের' (Saul) ন্যায় জ্যোতিষী এখন বলিতে পারেন যে, তিনি পিতৃদত্ত রাসভ অন্বেষণ করিতে আসিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

১৬১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী মানব জাতির এক স্মরণীয় দিন। এই দিবস সায়ংকালে গ্যালিলিও (galileo) স্বনির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে বৃহস্পতিগ্রহ ও উহার উপগ্রহগুলি দেখিতে পাইয়াছিলেন। "গ্রহগুলি যে সূর্য্যের চারিদিকে অণ্ডাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে" মণীষী কোপার্নিকাসের এই উক্তির অনুমোদন পূর্ব্ব হইতে গ্যালিলিও করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এক্ষণে উপগ্রহগুলি যে বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া কোপার্নিকাস-নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া নির্ভয়ে প্রচার করিলেন যে কোপার্নিকাসের (Copernicus) উক্তি নির্ভুল ও যথার্থ সত্য। এই অভিমত প্রচার করিতে গিয়া গ্যালিলিওর জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। ইহারই দশবৎসর পূর্বে কোপার্নিকাসের ব্রুণো (Bruno) নামক এক শিষ্যকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে 'Holy Inquisition' নামক রোমান ক্যাথলিক বিচারালয়ে তিনি অভিযুক্ত হন এবং ভীষণ পীড়নের ভয়ে নিজমত প্রত্যাহার করিলেন। গ্যালিলিও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আধুনিক বিশালকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় তাহা শিশুর ক্রীড়নক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কালিফোর্নিয়া প্রদেশে মাউণ্ট উল্‌সন্ পর্ব্বতের শিখরে আপাততঃ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার গোলাকার দর্পণের ব্যাস ১০০ ইঞ্চি। মানব চক্ষুর মধ্যে যে-পরিমাণ আলোক রশ্মি প্রবেশ করে তাহা অপেক্ষা ২৫০,০০০ গুণ আলোক রশ্মি উপযোক্ত যন্ত্র সাহায্যে একত্রীভূত করা যায়। শীঘ্রই কালি-

ফোর্নিয়া প্রদেশের মাউণ্ট প্যালোভার (Mt. Palovar) পর্ব্বতের উপর আর একটি বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইবে। তাহার দর্পণের ব্যাস ২০০ ইঞ্চি হইবে। এই যন্ত্রসাহায্যে মানবের চক্ষুর মধ্যে যে-পরিমাণ আলোক রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা দশলক্ষ গুণ আলোক রশ্মি একত্রীভূত করা যাইতে পারে। বার্ণেট ও পীস্ সাহেব (Burnet and Pease) কিরূপে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যায় তাহার একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। যন্ত্রটির আকার একটি বৃহৎ "চিমটার" ন্যায় (Fork)। আপনারা সকলেই ভূগোল পাঠ করিয়াছেন। আপনাদের নিকট এক্ষণে খগোল কিংবা বিশ্বতত্ত্বের বিষয় কিছু উল্লেখ করিব। নভো-মণ্ডলের ত্রিকোণমিতিক নক্সা বা চিত্র অঙ্কনের জন্য আসুন সকলে আমরা গগনের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশ মানসনেত্রে প্রদক্ষিণ করি। কল্পনাকে সহায় করিয়া আসুন সকলে খ-গোলের সকল স্থানে বিচরণ করি এবং বিবিধ নবতথ্য আবিষ্কার করি। বিরাট বিশ্বে পরিভ্রমণ করিতে হইলে পার্থিব বস্তুর পক্ষে যে চরমগতির বেগ সম্ভব-পর সেই বেগ লইয়া আসুন আমরা গগনে পর্য্যটন করি। এই চরম বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগের পরিমাণ আলোকের গতির বেগেরই সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ইহার বেগ ১৮৬,০০০ মাইল।

চন্দ্রলোকে যাইবার কল্পনা নূতন নহে। চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দূরে। আলোকের গতির বেগ প্রাপ্ত হইয়া যদি আমরা যাইতে আরম্ভ করি তাহা হইলে দেড় সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা চন্দ্রলোকে যাইয়া উপস্থিত হইব। চন্দ্রে নানাবিধ জলশূন্য সমুদ্র, মরুভূমি, নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখবিবর, শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতাবলী ও শৈলশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কোনও রূপ জীব, উদ্ভিদ্ বা বায়ুমণ্ডল চন্দ্রলোকে নাই। এতশত বর্ষ পূর্ব্বে নিউ ইয়র্ক সহরের একটি সংবাদপত্রে চন্দ্রবিষয়ে একটি বিরাট প্রতা-রণার নিষ্পাদন করিয়াছিল। এই সংবাদপত্রে কয়েকটি কপটতামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ-গুলিতে ইহা লিখিত হইয়াছিল যে আফ্রিকাতে এক বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা দ্বারা চন্দ্রের উপরিতল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করা যায়। চন্দ্রলোক অদ্ভুত জীবজন্তু, উড্ডীয়মান মনুষ্য ও বিশালকায় বৃক্ষতে পরিপূর্ণ ইহাই বিবৃত করা হইয়াছিল।

এই সকল বিবরণ দ্বারা এই অপরিচিত সংবাদপত্রের প্রভূত লাভ হইয়াছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহার প্রচলন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং তৎকালীন পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে ইহারই গ্রাহকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল। উপরোক্ত ঘটনায় ইহা প্রকাশ পায় যে মানুষ অতি সহজে কিরূপে প্রতারিত হয়। কোনও রূপ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও মানবের বিশ্বাসপ্রবণতার ইহা পরিচায়ক। নয় কোটি বিশলক্ষ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা আটমিনিটে সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইব। সূর্য্যলোকের উপরিতলের তাপমাত্রা ৫,০০০ ডিগ্রী সেণ্টি-গ্রেড এবং ইহার কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রায় এককোটি চল্লিশলক্ষ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। আমাদের দেহ যদি "অগ্নি-প্রস্তরে" (Silica) নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে সূর্য্যের উপরিতলে পৌছাইবামাত্র আমরা ভস্মীভূত হইয়া যাইব। সূর্য্য হইতে অগ্নিময়ী প্রচণ্ড বাষ্পরাশি মিনিটে সহস্র সহস্র মাইল গতিতে অনবরত উদ্গত হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ উজ্জ্বল বাষ্পখণ্ড সূর্য্যের উপরিতলে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ বাষ্পখণ্ড কলঙ্করূপে সূর্য্যপৃষ্ঠে দৃশ্য-মান হয়। এই সকল সৌর কলঙ্কের অনবরত স্থান পরিবর্ত্তন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে সূর্য্য আবর্ত্তন করিতেছে। সৌরকলঙ্কগুলি আকার পরিবর্ত্তন করে এবং চিরস্থায়ী নয়।

পর্য্যটন করিতে করিতে সৌরজগতের অপর গ্রহগুলির সহিত আমাদের ক্রমশঃ পরিচয় হইবে। শুক্রগ্রহ (Venus) নিবিড় বায়ুমণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত। বায়ুমণ্ডল এত গভীর যে শুক্রের আলোক চিত্র লইলে ইহার কঠিন উপরিতলের কোনও অংশই চিত্রে প্রতিবিম্বিত হয় না। লালরশ্মির আলোকচিত্রে মঙ্গলের পৃষ্ঠে কতকগুলি মলিন অংশ ও রেখা স্পষ্টই দেখা যায়, কিন্তু বেগুনি রশ্মির চিত্রে ওগুলি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র উভয় মেরুর বরফের আবরণ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতিরেকে বেগুনিরশ্মির

আলোকচিত্রে মঙ্গলের ছবি অল্প বৃহৎ দেখায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে লালরশ্মির ও বেগুনিরশ্মির দুই আলোকচিত্রের মধ্যে এত প্রভেদ থাকাতেই বোঝা যায় যে, মঙ্গলে নিশ্চয় বায়ুমণ্ডল আছে। রাইট (Mr. Wright) সাহেবের মতে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল প্রায় একশত মাইল গভীর। শিয়াপারেলী (Schiaparelli) ও লাউয়েল সাহেব (Lowell) মনে করেন যে মঙ্গলের পৃষ্ঠে রেখাগুলি সরল এবং এইজন্য এইগুলি "খাল" বা জলপ্রণালী (Canal) ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের অভিমত, যে এই "জলপ্রণালী" জলপ্রবাহের জন্য কোনও বুদ্ধিমান জীবদ্বারাই নির্ম্মিত। এই জলপ্রণালীগুলি মঙ্গলের উপরিস্থিত মরুদ্যানগুলিকে (Oases) সংযুক্ত করিয়াছে। বার্ণার্ড (Bernard) ও আন্তোনিয়াদি (Antoniadi) সাহেবের মতে এই রেখাগুলি অবিচ্ছিন্ন ও সরল নহে—এক একটি কতকগুলি অস্পষ্ট, অসমান ও পৃথক্ পৃথক্ বিন্দুর সমষ্টি মাত্র। দূর হইতে বিন্দুগুলির মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট দেখা যায় না বলিয়া বিন্দুগুলি মিলিয়া অনেকটা অবিচ্ছিন্ন রেখার মত দেখায়। আপনারা নিশ্চয়ই "নানা মুনির নানা মত" এই প্রবাদ বাক্যটি শুনিয়া থাকিবেন। জ্যোতিষীদের মধ্যে এই বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। ঋতু অনুযায়ী মঙ্গলের পৃষ্ঠের অবস্থার নানারূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে মেরুর বরফের আবরণ গলিয়া কমিয়া যায় এবং শীতকালে ইহার আকার অনেকটা বাড়িয়া যায়। লাউয়েল সাহেব মঙ্গলের মলিন অংশ কিংবা মরুদ্যানগুলির বর্ণ পরিবর্ত্তনের এক সুন্দর কারণ দেখাইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করিতেন যে, এই সকল স্থানে শীতকালে বৃক্ষের পাতা শুকাইয়া গিয়া বাদামী বর্ণের হইয়া যায়। যখন এই পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে তখন গাছের শাখাগুলি বিবর্ণ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন মেরুর বরফগলা জল এই ছায়াময় অংশে "জলপ্রণালীর" ভিতর দিয়া আসিয়া পৌছায় তখন সেই স্থানের বৃক্ষলতাগুলি সতেজ ও সবুজ হইয়া উঠে। আরহেনিয়াস (Arrhenius) সাহেব মনে করিতেন যে এই সকল ছায়াময় অংশ বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ শ্যামলক্ষেত্র নয়। তাঁহার মতে এই সকল অংশের মৃত্তিকা নানারূপ দ্রবণীয় লবণে (Soluble salts) পরিপূর্ণ। বাতাসে জলীয়-বাষ্পের পরিমাণ যখন বাড়িয়া যায় এই লবণগুলি বাতাস হইতে জলের কণা কাড়িয়া লয় এবং সেইজন্য মাটি ভিজিয়া গিয়া আরও মলিন দেখায়। কিন্তু যখন উপরকার বাতাসে বাষ্পের পরিমাণ কম হইয়া যায়, তখন শুষ্ক বাতাস জলের কণাগুলিকে আবার ফিরাইয়া লয় এবং মাটি শুকাইয়া গিয়া পুনরায় বিবর্ণ হইয়া যায়। মঙ্গলের বর্ণচ্ছটা বিশদরূপে পরীক্ষা করিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে বায়বীয় অম্লজান (Oxygen) নাই। সেইজন্য কোনও জীবজন্তু মঙ্গলে থাকিতে পারে না, কেবল উদ্ভিদই সেখানে জন্মাইতে পারে।

গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি আকারে ও জড়মাণে বৃহত্তম। বেগুনিরশ্মিতে ইহার আলোকচিত্র লইলে নানা তথ্য জানিতে পারা যায়। বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে। কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড নামক বায়বীয় পদার্থের মেঘরাশি বায়ুমণ্ডলে ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহের দেহে যে সকল বন্ধনী (Belt) দেখা যায় সেইগুলির অচল ও স্থায়ী অবস্থা থাকে না। বন্ধনীগুলি যেভাবে আকার পরিবর্ত্তন করে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এইগুলি বায়ুমণ্ডলের অংশমাত্র। বন্ধনীর অন্তর্গত বায়ুকণাগুলি চক্রাকারে প্রবলবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। বৃহস্পতির নয়টি উপগ্রহ আছে।

বলয়ধারী শনির মত অপূর্ব্ব আকারের আর কোনও জ্যোতিষ্ক আকাশে দেখিতে পাওয়া যায় না। শনির নয়টি গ্রহ ও তিনটি বলয় দেখিতে পাওয়া যায়। এককালে তিনটি বলয়ই শনির একটি উপগ্রহ ছিল। এক্ষণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উপগ্রহটি তিনটি বলয়ে পরিণত হইয়াছে। রশ (Roche) সাহেব এইরূপ চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমে যদি একটি ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড একটি বৃহৎ জড়পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ যদি ক্ষুদ্র পিণ্ডটির কক্ষের ব্যাস কমিতে থাকে, অবশেষে দেখা যায় যে যখন ছোটটির কক্ষের ব্যাস বড় পিণ্ডটির ব্যাসের ২·৪৫

গুণের কম হইয়া যায় তখন ছোট পিণ্ডটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বহুল অতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় এবং বলয়ের আকার ধারণ করে। পণ্ডিতেরা এই অনুপাতকে রশ-সীমা (Roches Limit) বলিয়া থাকেন। শনির বড় বলয়টির বাহিরকার ব্যাস শনির ব্যাসের ২·৩৯ গুণ মাত্র। আমাদের পৃথিবীর চাঁদও অবশেষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলয়ের আকার লইবে। জেফ্রেস্ (Jeffreys) সাহেব অঙ্ক কষিয়া দেখিয়াছেন যে জোয়ার ভাঁটার সংঘর্ষে নিজের মেরুদণ্ডের চারিধারে পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি কমিয়া যাইতেছে এবং সেইজন্য দিন বড় হইতেছে ও চাঁদ পৃথিবী হইতে আপাততঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ দিন বড় হইতে হইতে এখনকার ৪৭ দিনের সমান হইবে। যখন এইরূপ হইবে তখন কেবলমাত্র পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ হইতে চাঁদ দেখা যাইবে ও অপরাংশ হইতে চাঁদ একেবারেই দেখা যাইবে না। এই ঘটনা বোধ হয় পঞ্চাশ সহস্র কোটি বৎসর পরে ঘটিবে। শেষকালে চাঁদ পুনরায় পৃথিবীর নিকট আসিতে থাকিবে এবং পৃথিবী হইতে যখন ১২,০০০মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে তখন ইহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলয়ের আকার ধারণ করিবে। কোনও একটি বিশেষ ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্য্যের প্রভাবের 'রশ-সীমার' মধ্যে আসিয়া পড়াতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আষ্টিরিয়ড্ (Asteroids) নামক গ্রহ কণিকাগুলিতে পরিণত হইয়াছে

প্লুটো (Pluto) বা যম সৌরজগতের সর্ব্বাপেক্ষা বহিঃস্থ গ্রহ। ইহাকে সৌরমণ্ডলের দ্বাররক্ষকরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ লাউয়েল (Lowell) মানমন্দিরে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে প্লুটোর ব্যবধান ৩৭০ কোটি মাইল। আলোকের গতির বেগে প্রায় ছয় ঘণ্টায় আমরা প্লুটোতে আসিয়া উপস্থিত হইব।

সৌরমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে করিতে বহুসংখ্যক ধূমকেতু দেখিতে পাওয়া যায়। ধূমকেতুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সমষ্টি মাত্র। মাধ্যাকর্ষণশক্তি দ্বারা দ্রব্যকণাগুলি একত্র হইয়া ধূমকেতুর আকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ধূমকেতুগুলির আকার বিচিত্র। নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া ইহারা গগনে সঞ্চরণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে যে সূর্য্যের প্রভাবের "রশসীমার" মধ্যে আসিয়া পড়াতে যে সকল ধূমকেতু বিভক্ত হইয়া যায় সেইগুলির বিচ্ছিন্ন অংশ উল্কাপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়।

আসুন এক্ষণে আমরা সৌরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া আলোকের গতির বেগে মহাশূন্যে বিচরণ করি। পথে প্রথমে আমরা কেবল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণা (dust) ও ভৌতিক রশ্মিকণা (cosmic radiation) দেখিতে পাইব। এইরূপ যাইতে যাইতে চারি বৎসর তিন মাসের পর আমরা নিকটতম নক্ষত্রে আসিয়া পৌছিব। গ্রহ ও উপগ্রহসমেত সূর্য্যকে আমরা সহরতলী ও উপনগর সংযুক্ত নগরীর সহিত তুলনা করিতে পারি। কোনও সহরের উপনগরগুলি (Suburbs) পার হইয়া, প্রথমে আমরা বিস্তৃত বিজন অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হই এবং ক্রমে ইহা অতিক্রম করিয়া নিকটতম অপর নগরীতে পদার্পণ করি। খগোল শাস্ত্রে নিকটতম তারকাকে নিকটতম নগরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ নক্ষত্রের নাম "প্রক্সিমা মহিষাসুর" (Proxima Centauri)। সূর্য্য হইতে ইহার ব্যবধান $২·৫ \times ১০^{১৩}$ মাইল। আরও অনেকানেক জ্যোতিষ্কমণ্ডল ইহা হইতেও বহুদূরে। এই নিমিত্ত আমরা সাধারণতঃ যে দূরত্ব-মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকি জ্যোতিষশাস্ত্রে অতিবিশাল ও অপরিমিত দূরত্ব অবধারণ করিবার পক্ষে তাহা একেবারেই অনুপযোগী। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দূরত্ব মাপিবার জন্য তদুপযোগী এক বিশাল মাপকাঠি প্রয়োজন। জ্যোতির্ব্বিদেরা সাধারণতঃ এক প্রকাশবর্ষকে দূরত্বের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক 'প্রকাশবর্ষ" (light year) সেই দূরত্ব যাহাকে অতিক্রম করিতে আলোকের ঠিক এক বৎসর লাগে। আপনারা অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬, ২৮৪ মাইল বেগে যায়। এক বৎসরে আলোক প্রায় $৫·৮৬ \times ১০^{১২}$ মাইল অতিক্রম করিতে পারে। অতএব এক প্রকাশবর্ষ প্রায় $৫·৮৬ \times ১০^{১২}$ মাইলের সমান। "প্রক্সিমা মহিষাসুর" তারকা সূর্য্য হইতে প্রায় ৪·২৭ "প্রকাশবর্ষ" দূরে অবস্থিত। অতএব উপ-

রোক্ত তারকা হইতে বিশাল শূন্যতা ভেদ করিয়া আলোক-রশ্মি সূর্য্যে পৌছিতে প্রায়ই ৪.২১ বৎসর লাগে। বেতার বার্ত্তাও (Wireless Signal) আলোকের গতির বেগে গমন করিয়া থাকে। আজ যদি এক বেতার বার্ত্তা পৃথিবী হইতে প্রেরণ করা যায় তাহা হইলে "প্রক্সিমা মহিষাসুরের" অধিবাসীরা (অবশ্য যদি কেহ সেখানে থাকে) তাহা প্রায় ৪.২১ বৎসর পরে শুনিতে পাইবে। যদি কোনও বেতার-বার্ত্তা মহাভারত কিংবা মহেঞ্জোদারোর সমৃদ্ধির সময় এবং যে সময় পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছে সেই সময় প্রেরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এমন অনেক দূর হইতে দূরতর জ্যোতিষ্ক আছে যেখানে সেই বার্ত্তা এখনও পৌছায় নাই। ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা আরও কিছুদিন পরে এবং সাড়ে চার বৎসরের মধ্যে "আলফা মহিষাসুর"। (L centanri) নামক যুগল-নক্ষত্রে (binary star) আসিয়া উপস্থিত হইব। আট বৎসর পরে আমরা "লুব্ধক" (Sirius) নক্ষত্রে আসিয়া পৌছাইব। লুব্ধকনক্ষত্র চাক্ষুষ দর্শনে গগনের উজ্জ্বলতম তারকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লুব্ধক ও ইহার ক্ষুদ্র সঙ্গীটী মিলিয়া এক যুগল নক্ষত্র হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সঙ্গীটীর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের তিনগুণ মাত্র, কিন্তু ইহার জড়মান সূর্য্যের জড়মানের (mass) তিন-চতুর্থাংশ। এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রটির ঘনত্ব (density) জলের ঘনত্বের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র গুণ ও প্লাটিনাম (platinum) ধাতুর ঘনত্বের প্রায় দুই সহস্র গুণ। এই ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র হইতে কিছু জড়পদার্থ লইয়া একটি দেশলাইয়ের বাক্স পূর্ণ করা হইলে এই দেশলাইয়ের বাক্সের গুরুত্ব প্রায় আটাশ মন হইবে। ও, এরিডানি বি (O_2 Eridani B) নামক আর একটি নক্ষত্রের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় ৯,০০০০ গুণ। এই সকল ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলিকে "ক্ষুদ্রকায়" শ্বেতভারকা (white dwarf star) বলা হয়। পনের বৎসর পর আমরা "শ্রবণা" নামক (Altair) একটী বৃহৎ নক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হইব।

জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্ব কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় সেই বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বেসেল (Bessel) সাহেব ৬১ হংসারি (61 Cygni) নামক তারকার দূরত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর কাক্ষিক গতির (Orbital rotation) নিমিত্ত যে নক্ষত্রগুলির সাপেক্ষিক স্পন্দন গতি (Relative Swinging Motion) পরিলক্ষিত হয় তাহাকে লম্বনগতি (Parallactic Motion) বলা হয়। তারকাবিশেষের লম্বনগতির হার (rate) নির্ণয় করিতে পারিলে উহার দূরত্ব নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়। পৃথিবীর কক্ষের ব্যাস ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল। এই কক্ষের কোনও একটি ব্যাসরেখার এক প্রান্তে যখন পৃথিবী আসিয়া উপস্থিত হয় তখন একটি নির্দ্দিষ্ট তারকার স্থান নির্ণয় করা হয়। ছয়মাস পরে পৃথিবী যখন সেই ব্যাসরেখাটির অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয় পুনরায় তখন তারকাটির স্থান নির্ণয় করা হয়। নক্ষত্রটির সাপেক্ষিক স্থান পরিবর্ত্তনের (Relative Displacement) হেতু সূর্য্যকে শৃঙ্গ (vertex) করিয়া যে কোণ (angle) রচিত হয় তাহার অর্দ্ধেককে "লম্বন" (parallax) বলা হয়। কোনও নক্ষত্রের "লম্বন" অবধারণ করিতে পারিলে তাহার দূরত্ব অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। যে সকল নক্ষত্র অতিদূরে তাহাদের লম্বন এতই অল্প যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দ্বারাও তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। সেইজন্য যে সকল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব তিন শত প্রকাশবর্ষের অধিক সেইগুলির দূরত্ব লম্বনপ্রণালীর দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অতি দূরবর্ত্তী তারকা ও নীহারিকাগুলির দূরত্ব কি প্রকারে নির্ণয় করা যায় তাহা পরে আলোচনা করিব। জ্যোতির্ব্বিদেরা দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক-গুলির দূরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য আর এক প্রকার মাপ-কাঠি (unit) ব্যবহার করেন। এই মাপকাঠি "লম্বন সেকেণ্ড" (parsec) নামে অভিহিত। যে তারকার "লম্বন" এক সেকেণ্ড তাহার দূরত্ব এক "লম্বন সেকেণ্ড", যে তারকার "লম্বন" $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড তাহার দূরত্ব ১০ "লম্বন সেকেণ্ড"। যে তারকার "লম্বন" $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ড তাহার দূরত্ব ১০০ লম্বন সেকেণ্ডে। এক লম্বন ৩.২৭ প্রকাশবর্ষের সমান। শ্রবণা (Altair) নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া ১৩৫ বৎসর পরে বৃষরাশির অন্তর্গত হাইডাস্ (Hyades) নামক তারকাবহুল জ্যোতিষ্কমণ্ডলে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইব। ৩২৩ বৎসর পরে আমরা কৃত্তিকা (Pleiades) নক্ষত্রপুঞ্জটিতে আসিয়া পৌছিব। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে অতীব মনো-

রম। মুগ্ধ হইয়া কবিরা ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া কতই না কবিতা রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিকাপুঞ্জে শ্বেতবর্ণ ও নীলাভ তারকানিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। হাইডেস্ (Hyades) ও কৃত্তিকাপুঞ্জ ছায়াপথের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগুচ্ছ (Galactic clusters)। একটি "নক্ষত্রকে" যদি "সহরের" সহিত তুলনা করা যায় সেই অনুযায়ী কৃত্তিকা ও হাইডেস্-পুঞ্জ দুইটিকে ভূগোলের বিভাগের (division) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এইরূপে শূন্যে বিচরণ করিতে করিতে চারি সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রনিচয়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইব। পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রগুলিকে (Variable stars) পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র "গ্রাহণিক যুগ্মতারকা" (Eclipsing binary) ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। যুগল নক্ষত্রের একটি যখন অন্যটির অন্তরালে যায় তখন তারকাযুগ্মের উজ্জ্বলতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে। আবার যখন উভয়ই পৃথক হইয়া দৃষ্টিপথে উদিত হয় তখন নক্ষত্র যুগল পুরাতন ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া পায়। এইরূপে ইহাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ, সৌষ্ঠবহীন পরিবর্ত্তনশীল (Irregular Variable) নক্ষত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, দীর্ঘকাল চক্রশীল ও পরিবর্ত্তনশীল (long period variables) তারকাগুলির সংখ্যা অল্প নহে। চতুর্থতঃ এমন কয়েকটি নক্ষত্রও দেখা যায় যাহাদের আয়তন ও সহজাত প্রভার (Intrinsic brightness) হ্রাসবৃদ্ধি যথার্থই ঘটিয়া থাকে। ইহারা নোভা (Novae) কিম্বা স্বল্পকালস্থায়ী তারকা নামে পরিচিত। প্রারম্ভে এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জ অকস্মাৎ বিস্তৃত হইতে থাকে। সেই সময়ে ইহাদের আয়তন ও উজ্জ্বলতাও বাড়িতে থাকে। শেষকালে অত্যধিক বিস্তৃত হওয়াতে ইহারা আলোক বিকিরণ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয় এবং প্রভাহীন হইয়া পড়ে। বিকারটন (Bickerton) সাহেব অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দুইটি প্রভাহীন (dark) নক্ষত্রের সংঘর্ষে নোভা তারকার জন্ম হয়। সংঘর্ষের নিকটবর্ত্তী কিয়দংশ দুইটি তারকা হইতেই বিচ্যুত হইয়া যায়। পরে বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয় মিলিত হইয়া তৃতীয় জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। সংঘর্ষকারী তারকাদ্বয়ের বেগের প্রাবল্য হেতু প্রথমে তৃতীয় জ্যোতিষ্কটি অতিশয় তেজোময় হইয়া উঠে এবং আলোক বিকিরণ করিবার পরে পুনরায় নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সম্প্রতি কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত মাউণ্ট উইলসন্ মানমন্দিরে ষ্ট্রমবার্গ (Stromberg) সাহেব কর্কট নীহারিকার (crab nebula) কিরণচিত্র (spectrum) পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে নয়শত বৎসর পূর্ব্বে যে নোভাটি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা এক্ষণে কর্কট নীহারিকায় পরিণত হইয়াছে। চীনদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে গগনের ঠিক এই স্থলে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে এক নূতন তারকা দেখা গিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে নোভা তারকাগুলি হইতে "ভৌতিক রশ্মির" (cosmic radiation) উৎপত্তি হইয়াছে। জ্যোতিষবিজ্ঞানানুরাগী প্রেণ্টিস (Prentice) নামক এক আইনব্যবসায়ী ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হারকিউলিস্ (Hercules) নক্ষত্রপুঞ্জে এক নোভা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান। কোলহরষ্টার (Kolhoerster) সাহেব তাঁহার ভৌতিকরশ্মি মাপিবার যন্ত্রটি (cosmic raycounters) এই নূতন নোভার দিকে পরিচালনা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে যতই নোভাটি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে ততই ভৌতিক রশ্মির প্রাবল্য বাড়িতেছে। পঞ্চমতঃ, শৈবিক নক্ষত্র (cepheid variable) নামক আর একশ্রেণীর পরিবর্ত্তনশীল ও স্পন্দনশীল তারকা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি দূরবর্ত্তী তারকা ও নীহারিকাগুলির দূরত্ব নির্ণয় করিবার পক্ষে শৈবিক নক্ষত্রগুলি অতীব প্রয়োজনীয়। কোনও জ্যোতিষ্কের দূরত্ব যদি একশত "লম্বন সেকেণ্ডের" (parsec) উপর হয় তাহা হইলে লম্বনপ্রণালী (Parallactic Method) অনুসারে উহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায় না। শৈবিক তারকার উজ্জ্বলতা নিরন্তর হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং এই হ্রাসবৃদ্ধির কালচক্র (Period) শৈবিকবিশেষে কয়েকঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত হয়। যে শৈবিক তারকাগুলির কালচক্র (Period) সমান সেইগুলির প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য, ব্যাস ও বর্ণচ্ছটাশ্রেণীও (Spectrum) সমান। কালচক্র ও উজ্জ্বলতার মধ্যে যে

সম্পর্ক আছে তাহা "তেজস্কাল চক্রবিধি" (Period luminosity law) দ্বারা পরিচালিত। শৈবিক তারকার "প্রকৃত দীপ্তির" (Intrinsic luminosity) পরিমাণ ইহার উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধির কালচক্রের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য শৈবিক তারকাগুলি "আদর্শদীপ" (Standard candles) রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে শৈবিকের কালচক্র ৪০ ঘণ্টা তাহার প্রকৃত উজ্জ্বলতা সূর্য্যের উজ্জ্বলতার ২৫০০গুণ এবং যে শৈবিকের কালচক্র দশদিন তাহার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের ১৬০০ গুণ। যদি কোনও শৈবিক তারকার প্রকৃত ও দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য বিদিত থাকে তাহা হইলে "দূরত্বের বিপরীত বর্গবিধি" (Inverse square law) অনুসারে ইহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। "ক" ও "খ" দীপশিখার যদি সমান ঔজ্জ্বল্য থাকে এবং "ক" যদি "খ" অপেক্ষা চতুর্গুণ উজ্জ্বল প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে "খ" এর দূরত্ব "ক" এর দূরত্বের দ্বিগুণ। সৌভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ তারকাপুঞ্জ ও নীহারিকাগুলিতে শৈবিক জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য এই সকল নীহারিকা ও নক্ষত্রনিচয়ের দূরত্ব অতি সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়। শ্যাপ্লে (Shapley) এবং এডিংটন্ (Eddington) সাহেব মনে করেন যে শৈবিক তারকাগুলি স্পন্দনশীল জ্যোতিষ্ক। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বায়বীয় স্থিতিস্থাপক গুণের (Elasticity of gases) প্রভাবে নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে এই তারকাগুলি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতেছে। জীনস্ (Jeans) সাহেব মনে করেন যে প্রত্যেক শৈবিক জ্যোতিষ্ক একটি আবর্ত্তনশীল তারকা এবং আবর্ত্তনবেগের আধিক্যগুণে ইহা অচিরে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে।

দশ সহস্র বৎসর পরে আমরা গোলাকার তারকাগুচ্ছের (Globular clusters) মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইব। গোলাকার তারকাগুচ্ছগুলির অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক শৈবিক নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ছায়াপথের প্রান্তদেশে এই গোলাকার তারকাগুচ্ছগুলি অবস্থিত। গড়ে গোলাকার তারকাগুচ্ছগুলির আয়তন কৃত্তিকাদি নাতিবৃহৎ জ্যোতিষ্কগুচ্ছের আয়তনের দশগুণ। একটি গোলাকার তারকাগুচ্ছকে ভূচিত্রের "প্রদেশে"র (Province) সহিত তুলনা করা যায়।

ছায়াপথের অভ্যন্তরে নানাবিধ নীহারিকা দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় নীহারিকাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) গ্রহরূপী নীহারিকা (Planetary Nebula)

(২) আকৃতিবিহীন নীহারিকা (Diffuse Nebula)

(৩) নিষ্প্রভ নীহারিকা (Dark Nebula)

গ্রহরূপী নীহারিকাগুলির সহিত গ্রহসৃষ্টির কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু এইগুলি বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়াই উপরোক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। এক একটি গ্রহরূপী নীহারিকার বহু সংখ্যক তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নীহারিকা অতিশয় অনিবিড়। এইরূপ নীহারিকার এক খণ্ড যাহা পৃথিবীর সমায়তন তাহার ওজন মোটে প্রায় ৬০০ মণ।

আকৃতিবিহীন নীহারিকার গঠন সৌষ্ঠববিহীন ও বিক্ষিপ্ত আকার। ঘনত্ব, স্বচ্ছতা, ও উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে উপরোক্ত নীহারিকাগুলি নানারূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে।

গ্রহরূপী ও আকৃতিবিহীন নীহারিকাগুলির ব্যাস ন্যূনাধিক একশত প্রকাশবর্ষ। উপরোক্ত নীহারিকাগুলিকে ভূচিত্রের "প্রদেশের" (province) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

নিষ্প্রভ নীহারিকাগুলি আলোক বিকিরণ করে না এবং ইহাদের পশ্চাৎভাগে যে সকল তারকা আছে সেইগুলিকে অস্পষ্ট ও তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

আমাদের সূর্য্যমণ্ডল ছায়াপথ বা আকাশ বলয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ছায়াপথের আকৃতি দীর্ঘবৃত্তাণ্ডের (ellipsoid) ন্যায়। কেপটিন সাহেব (Kapetyn) আকাশবলয়ের গঠন কিরূপ তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ছায়াপথটি একটি "বিশ্বলোক" (Super galaxy)। ইহাকে ভূচিত্রের "দেশের" সহিত তুলনা করা যায়। ইহার ব্যাস প্রায় এক লক্ষ প্রকাশবর্ষ এবং কেন্দ্রস্থলে ইহার বেধ বিশ সহস্র প্রকাশবর্ষ।

আকাশ বলয়ের কেন্দ্র হইতে সূর্য্য প্রায় তেত্রিশ (৩৩) সহস্র প্রকাশবর্ষ দূরে অবস্থিত। যদিও সৌরজগতের তুলনায় ছায়াপথের আকার অতি বৃহৎ কিন্তু ইহা অসীম নহে। মহাশূন্যে ইহা কেবলমাত্র একটি "দ্বীপজগৎ" (Island Universe) রূপে ভাসিয়া রহিয়াছে। এক একটি "বিশ্বলোক" বা "দ্বীপজগৎ" বহুনীহারিকা বা নক্ষত্ররাশি দ্বারা গঠিত। ছায়াপথে বিংশ সহস্র কোটি (২ × ১০^{১১}) তারকা আছে। পৃথিবীর লোক সংখ্যা দুই শত কোটি হইবে। অতএব উপরোক্ত তারকাসংখ্যা পৃথিবীর লোক সংখ্যার একশতগুণ।

আকাশবলয়ের পরিসীমার ঠিক বহির্ভাগে দুইটি বিশিষ্ট বৃহৎ তারকাগুচ্ছ আছে। স্পেন দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান (Ferdinand Magellan) নৌযোগে ভূ-প্রদক্ষিণকালে সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ আকাশমেরু (South celestial pole) সন্নিকটে এই দুই বৃহৎ তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। ম্যাগেলনের নামানুসারে এই দুইটি গুচ্ছকে ম্যাগেলন ধূম্ররাশি বলা হয় (Magellanic clouds)। পৃথিবী হইতে ইহাদের দূরত্ব ৮৫০০০ ও ৯৫০০০ প্রকাশবর্ষ। ছায়াপথের বাহিরে মহাশূন্যে অনেক নীহারিকা দৃষ্ট হয়। মহাকাশে এইগুলি জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপের ন্যায় ভাসমান। অনেকগুলি নীহারিকার গঠন কুণ্ডলাকার (spiral form) এবং কতকগুলির আকৃতি অণ্ডাকার (elliptical form)। মহাকায়া উত্তরভাদ্রপদা নীহারিকা (Andromeda) সৌরজগৎ হইতে আট লক্ষ প্রকাশবর্ষ দূরে অবস্থিত। বহু বহিঃস্থ নীহারিকার আয়তন অতি বৃহৎ। এই সকল বিশালকায়া নীহারিকাগুলির আয়তন যদি হ্রাস করিতে পারা যায় এবং সঙ্কুচিত হইয়া যদি ইহাদের আয়তন এশিয়া (Asia) মহাদেশের সমান হয় তাহা হইলে সেই অনুপাতে আমাদের পৃথিবী সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণা হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তাতেও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। বহিঃস্থ নীহারিকাগুলিতে বহু শৈবিক জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয় এবং সেইজন্য সহজেই ইহাদের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়। কয়েকটি বিশ্বলোক (supergalaxy) মিলিয়া এক একটি মহালোক (Metagalaxy) হয়। ভূগোলের উপমা যদি লওয়া হয় তাহা হইলে 'মহালোককে' 'মহাদেশ' (continent) বলা যাইতে পারে। কোটি কোটি বৎসর পর্য্যটন করিবার পর 'মহালোকে'র দূরত্ব প্রদেশে আমরা উপস্থিত হইতে পারিব। উর্ট সাহেব (Dr. Oort) প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ছায়াপথ বিশাল এক চক্রের ন্যায় আপন মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া অনবরত আবর্ত্তন করিতেছে। আকাশবলয়ের মধ্যস্থিত অংশ বহিঃস্থ অংশ হইতে দ্রুততর বেগে আবর্ত্তন করিতেছে। গড়ে এই আবর্ত্তনের কালচক্র প্রায় বাইশ কোটি বৎসর।

অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়



গান

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাহিরের বাধা যতই জড়াক
অন্তরে আমি চেয়েছি
তোমারে চেয়েছি।
যত ঢেউ মোরে দূরে নিয়ে যাক
তোমারি তরণী বেয়েছি
পাথারে বেয়েছি।

শত বন্ধন এসেছে বাঁধিতে,
সে-অলীক সুর চাহিনি সাধিতে,
অন্তরযামী! তুমি জানো আমি
গেয়েছি তোমারি রাগিণী
গভীর রাগিণী:

যত ত্রুটি মোর থাক নাথ, তবু
তোমারি তো তারা বহিয়াছি প্রভু!
তুফান-তরাস যতই ঘনাক
ছায়া লাগি' নিশি জাগিনি
কখনো জাগিনি।

বাহিরের বাধা যত ঘিরে আসে
তোমারি মুক্তি চেয়েছি
জীবনে চেয়েছি
তোমারি শরণাগতি-উচ্ছ্বাসে
বরণ-তরণী বেয়েছি
শ্যামল, বেয়েছি।

ঠাঁই দাও পায়, তোমা বিনা যবে
কিছু আর ভালো লাগে না
বন্ধু, লাগে না
হৃদয় গগন রাঙো বৈভবে
নহিলে স্বপন জাগে না
আমার জাগে না।

আপন শক্তি-গরব-বিলাসে
ছিলাম বিভোর কোন্ সুখ-আশে?
জানি না—তবুও বাসনা-ভ্রান্ত
কেন হায় মরি ছুটিয়া
বৃথাই ছুটিয়া

বুঝি না—যখন তোমার কেতন;
জলে করুণায়!—তবু নিবেদন
করি না কেন এ বিরহ বেদনা
রক্ত-কাঁটায় ফুটিয়া
গোলাপে ফুটিয়া?

আজ ডেকে নাও—যবে তোমা বিনা
কিছু মোর ভালো লাগে না
বন্ধু, লাগে না
অভিসার-সুরে বাঁধো প্রাণবীণা,
নহিলে গান যে জাগে না
কণ্ঠে জাগে না!

দশরথ জাতক

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

(পালিভাষা হইতে অনূদিত)

ভারতবর্ষের লোকেরা, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, প্রায় সকলেই জন্মান্তরবাদে আস্থাবান। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব সময়ে সময়ে তাঁহার শিষ্যদের নিকট নিজের অতীত জন্মের ইতিহাস বলিতেন। তাঁহার নির্বাণের পর তাঁহার শিষ্যগণ সেই আখ্যানগুলি সংগ্রহ করিয়া পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। বুদ্ধদেবের ঐ সকল জন্মবৃত্তান্ত "জাতক" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জাতক-সংগ্রহ-গ্রন্থে ৫৫০টী জাতক লিপিবদ্ধ আছে।

ঐ গ্রন্থে "দশরথ জাতক" নামে একটী জাতক দেখা যায়। যে সময় ভগবান্ বুদ্ধদেব বেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এক ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। কিছু সময় পূর্বে ঐ ব্যক্তির পিতৃবিয়োগ হয়। সেই কারণে সে শোকে মুহ্যমান হইয়াছিল। সমস্ত বিষয়কর্ম অবহেলা করিয়া সর্বদা পিতৃ-শোকে অভিভূত থাকিত।

একদিন প্রত্যূষে মানবজাতির প্রতি করুণা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভগবান্ তথাগত জানিতে পারিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ধর্মের প্রথম মার্গের ফললাভের উপযুক্ত হইয়াছে। পরদিন প্রাতে তিনি সশিষ্য শ্রাবস্তী নগরে গিয়া ভিক্ষাকার্য সমাপনান্তে সঙ্গিগণকে বিদায় দিলেন। একটী মাত্র নবীন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া ঐ ভূম্যধিকারীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। অভিবাদনান্তর উপবেশন করিয়া অতি মধুর বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই উপাসক, তুমি শোক করিতেছ?" সে বলিল, "হাঁ, ভদন্ত, পিতৃশোক আমাকে ব্যথিত করিয়াছে।" তখন ভগবান তথাগত বলিলেন, "হে উপাসক, পুরাকালের অষ্টধর্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা কিন্তু পিতৃবিয়োগে অল্পমাত্র শোকও করিতেন না।" তখন ঐ ব্যক্তির প্রার্থনায় ভগবান তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী বলিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারানসীতে মহারাজা দশরথ অসৎমার্গ ত্যাগ করিয়া ধর্মানুসারে রাজ্য করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা ও পট্টমহিষী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে দুইটীপুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামপণ্ডিত, দ্বিতীয় পুত্রের নাম লক্ষণ-কুমার এবং দুহিতার নাম সীতাদেবী ছিল। সময় ক্রমে অগ্রমহিষী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজা বহুকাল শোকে অধীর হইয়া থাকিলেন। পরে অমাত্যগণের নির্বন্ধাতিশয়ে রাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অপর একজন মহিষীকে মহাদেবী পদে অভিষিক্ত করিলেন। নূতন পট্টমহিষী রাজার মনোজ্ঞা ও প্রিয়পাত্রী হইলেন। কালক্রমে তিনিও গর্ভধারণ করিয়া একটী পুত্র প্রসব করিলেন এবং ঐ পুত্রের নাম ভরতকুমার রাখা হইল। রাজা ঐ পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া রাণীকে বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্রকে একটী বর দিতে চাহি, গ্রহণ কর।" রাণী বর লইতে স্বীকৃত হইয়া পুত্রের যখন সাত বৎসর বয়স হইল তখন একদিন রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দেব, আপনি আমাকে আমার পুত্রের জন্য একটী বর লইতে বলিয়াছিলেন, এখন আমাকে সেই বরটী দিন।" রাজা বলিলেন, "গ্রহণ কর।" রাণী তাঁহার পুত্রের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া বলিলেন, "দূর হ' পাপিষ্ঠা, আমার অপর দুইটী পুত্র অগ্নিপুঞ্জের ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; তুই কি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তোর পুত্রকে সিংহা-সনে বসাইতে চাহিস্?" রাণী ভীত হইয়া নিজ

সুসজ্জিত কক্ষে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু পরবর্তী অনেক দিন রাজার নিকট পুনঃপুনঃ রাজ্য যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। যদিও রাজা রাণীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত ছিলেন, তথাপি তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "স্ত্রীলোক মাত্রেই অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাস-যোগ্যা, এই স্ত্রীলোকটি কূটবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমার অসাবধান অবস্থায় কোন পত্রে আমার স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া বা কোন মুদ্রিকা সংগ্রহ করিয়া আমার পুত্রদ্বয়ের বধসাধন করিতে পারে।" অতএব রাজা পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া আনিয়া সকল অবস্থা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন "বৎসগণ! তোমরা যদি এখানে বাস করিতে থাক, তোমাদের কোন না কোনো বিপদ্ ঘটিতে পারে। অতএব তোমরা কোনো সামন্তরাজ্যে বা অরণ্যে গিয়া বাস কর, এবং চিতায় আমার শরীর ভস্মীভূত হইলে পুনরায় এ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় বংশের রাজ্য গ্রহণ করিও।"

তৎপরে রাজা দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া তাঁহার আয়ু-পরিচ্ছেদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, তিনি আর দ্বাদশ বর্ষকাল জীবিত থাকিবেন। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দ্বাদশ বর্ষ পরে অবশ্য ফিরিয়া রাজছত্র উত্তোলন করাইবে।" তাঁহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। "আমিও দাদাদের সঙ্গে যাইব" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া সীতাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুসরণ করিলেন।

বহু লোক পরিবৃত হইয়া তিনজনে নগর পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা জনসমূহকে নিবৃত্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে উপস্থিত হইয়া যেখানে নিকটে জলাশয় আছে এবং যেখান হইতে বনফল সংগ্রহ করা সহজ এইরূপ একটী স্থলে আশ্রম স্থাপন করিয়া বনফল খাইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণকুমার ও সীতাদেবী রামপণ্ডিতকে বলিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃস্থানে অধিষ্ঠিত, অতএব আপনি আশ্রমেই থাকুন, আমরা ফল আহরণ করিয়া আনিয়া আপনার আহার যোগাইব।" রামপণ্ডিত তাঁহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই অবধি তিনি আশ্রমেই থাকিতেন এবং অপর দুইজন বন হইতে ফল আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন।

এই প্রকারে তাঁহারা বন্য ফলমূল খাইয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ওদিকে তাঁহাদের বিরহে কাতর হইয়া নবম বর্ষেই মহারাজা দশরথ লোকান্তরে গমন করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সমাধা হইলে রাজ্ঞী আদেশ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র ভরতকুমারের মস্তকোপরি রাজছত্র ধারণ করা হউক, কিন্তু অমাত্যগণ, "ছত্রের অধিকারীরা অরণ্যে বাস করিতেছেন" এই বলিয়া ইহা হইতে দিল না। ভরতকুমার বলিলেন, "আমি বনে গিয়া আমার ভ্রাতা রামপণ্ডিতকে ফিরাইয়া লইয়া আসিব, এবং রাজছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করিব।" যে পাঁচটী চিহ্ন রাজপদবীর পরিচায়ক, তাহা এবং সম্পূর্ণ চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে লইয়া ভরতকুমার তাঁহার ভ্রাতাদের বাসস্থানের নিকট পৌঁছিলেন। অদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া কতিপয় অমাত্যের সহিত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে লক্ষ্মণকুমার ও সীতা বনে ফল আহরণ করিতে যাওয়াতে আশ্রম হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, রামপণ্ডিত সুগঠিত ও সুস্থাপিত কাঞ্চন মূর্তির ন্যায় আশ্রমের দ্বারদেশে নিঃশঙ্কচিত্তে সুখাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভরতকুমার তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন এবং একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া এ পর্যন্ত রাজ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি এবং অমাত্যগণ রামপণ্ডিতের পাদদেশে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামপণ্ডিত শোকও করিলেন না, ক্রন্দনও করিলেন না—তাঁহার চিত্তে কোন আবেগ উৎপন্ন হইল না। ভরত রোদন হইতে নিরস্ত হইয়া উপবেশন করিবার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে লক্ষ্মণকুমার ও সীতা ফল লইয়া বন হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। রামপণ্ডিত চিন্তা করিলেন, "ইহারা অল্প বয়স্ক, আমার ন্যায় পরিণত প্রজ্ঞা ইহাদের নাই। যদি হঠাৎ শুনে যে, পিতৃদেবের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাদের অসহ্য শোক হইবে—ইহাদের

হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। আমি ইহাদিগকে জলাশয়ে নামিতে প্রবৃত্ত করিয়া, যাহা ঘটিয়াছে তাহা কোনো উপায়ে ইহাদিগকে শুনাইব।"

অনন্তর তাঁহাদিগকে সম্মুখস্থ একটী জলাশয় প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন, "তোমরা আজ অতি বিলম্বে ফিরিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের জন্য এই শাস্তি বিধান করিতেছি—তোমরা উভয়েই জল-মধ্যে গিয়া দণ্ডায়মান থাক।" এই বলিয়া তিনি একটী গাথার প্রথমার্ধ আবৃত্তি করিলেন—

"যাও হে লক্ষ্মণ, যাও সীতে তুমি,
উভয়ে দাঁড়াও প্রবেশি জলে।

এই কথা শুনিবামাত্রই তাঁহারা জলে নামিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তিনি গাথার শেষার্ধ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ শুনাইলেন—

বলিছে ভরত, ধরাধাম ছাড়ি,
রাজা দশরথ গেলেন চলে।"

পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহারা সংজ্ঞাহীন হইলেন। তিনি পুনরায় উহা আবৃত্তি করিলেন, তাঁহাদের আবার মূর্চ্ছা হইল। যখন তাঁহারা তৃতীয় বার মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে উত্তোলন পূর্বক জল হইতে বাহির করিয়া স্থলে স্থাপন করিল। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার পরও তাঁহারা উভয়ে রোদন ও শোক করিতে লাগিলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করিলেন, "আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকুমার ও আমার ভগিনী সীতাদেবী পিতার মৃত্যু সংবাদে শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু রামপণ্ডিত ক্রন্দন বা পরিবেদন কিছুই করিতেছেন না। তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি? আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।" তিনি আর একটী গাথা আবৃত্তি করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

'কি শক্তি প্রভাবে, ওহে রাম তুমি,
না করিলে শোক, শোকের কালে;
শুনিলে যদিও পিতার মরণ,
পড়িলে না কেন শোকের জালে?'

তখন রামপণ্ডিত স্বকীয় শোক সম্বরণের কারণ এইরূপে বুঝাইয়া বলিলেন—

"উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াও যদি,
রাখিতে না পারে মানব কিছু।
তবে কেন যারা ধীমান্ প্রাজ্ঞ
শোক করিতেছে তাহার পিছু॥
বয়সে তরুণ, বর্ষীয়ান নর,
অজ্ঞান অথবা ধীমান্ যে জন।
হোক্ ধনবান্, অথবা নির্ধন,
সকলেরই হবে অবশ্য মরণ॥
বৃক্ষের শাখায় পাকে যদি ফল,
তাহার যেমন পতন ভয়।
সেইরূপ জেনো, নশ্বর মানব,
মৃত্যু-ভয়ে সদা শঙ্কিত রয়॥
প্রাতের আলোকে দেখিলাম যারে,
সাঁঝের আলোকে নিভিয়া যায়।
সায়ং সময়ে দরশন দিয়া,
প্রভাত বেলায় বিলোপ পায়॥
বিলাপ করিয়া মূঢ়জন যদি,
পারিত লভিতে সামান্য শ্রেয়ঃ।
আত্ম-হিংসা করি বিচক্ষণ জন,
লভিতে পারিত অনেক শ্রেয়ঃ॥
আত্মার পীড়নে শরীর শুকায়,
বৃথা হয় হায়! যত কশাঘাত।
এরূপে মৃতক ফিরিয়া আসে না,
শুধু অকারণ এই অশ্রুপাত॥

দাউ দাউ করি অনল জ্বলিলে,
নিমেষে নিবে সে সলিল ঢালিলে।
তেমতি সুধীর, পণ্ডিত ও জ্ঞানী,
নিবারয়ে শোক জানি তার হানি;
বায়ু যথা দেয় তুলারে উড়ায়ে,
দূর করে তারে বিবেকের বায়ে।

মরে এক নর, তখনি আবার
অনুকূল কুলে জনম তাহার।

সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ যত,
শুভাশুভ যোগ-সংযোগ-নিরত।

অতএব বলবান্, শাস্ত্রের অধীন,
ইহলোক-পরলোক-চিন্তায় প্রবীণ,
উভয় লোকের তত্ত্ব জানিয়া নিশ্চিত,
মহান্ শোকেও কভু নহে বিচলিত।

করিব পালন তাই জ্ঞাতিবর্গে মম
আশ্রয় ও ভোজ্য দিয়া ; পালন করিব যত্নে
অবশিষ্ট জনে ; ইহাই বিজ্ঞের কর্ম।"

এই গাথাগুলি দ্বারা রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়াছিলেন।

সমবেত ব্যক্তিগণ বস্তুর অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে রামপণ্ডিতের এই উপদেশ পূর্ণ বাক্য শুনিয়া বিগতশোক হইল। অনন্তর ভরতকুমার রামপণ্ডিতকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে বারাণসী রাজ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। রামপণ্ডিত বলিলেন, "ভ্রাতঃ, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে তোমার সহিত লইয়া গিয়া তোমরাই রাজ্য শাসন কর।" ভরতকুমার বলিলেন, "না দাদা, তা হবে না, আপনাকে রাজ্য লইতে হইবে।" রামপণ্ডিত উত্তর করিলেন, "পিতৃদেব আমাকে দ্বাদশ বৎসর পরে রাজ্য লইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন যদি আমি যাই তাহা হইলে তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করা হইবে। আমি তিন বৎসর অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া যাইব। ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তিন বৎসর কে রাজ্য শাসন করিবে?" উত্তর,—"তোমরা করিবে।" ভরতকুমার তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। রাম তাঁহার তৃণ-নির্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিতে ইহারা রাজ্য-শাসন করিবে।" অতএব বাধ্য হইয়া তাঁহারা তিন জনে পাদুকা গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদের বিবেকী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদলবলে বারাণসীতে আসিয়া পৌছিলেন।

তিন বৎসর যাবৎ পাদুকাদ্বয় রাজ্যশাসন করিল। অমাত্যেরা রাজসিংহাসনে তৃণ পাদুকাদ্বয় রাখিয়া বিচার কার্য সম্পন্ন করিত। যদি ঠিক বিচার না হইত, পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত, এবং এরূপ সঙ্কেতে ঐ বিষয়ের পুনর্বিচার হইত। বিচার ন্যায়মত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃশব্দে স্থির হইয়া থাকিত।

তিন বৎসর অতীত হইলে ঐ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি বন হইতে বহির্গত হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং নগর উপকণ্ঠের এক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্রেরা তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া অমাত্যগণের সহিত উদ্যান-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া এবং সীতাদেবীকে অগ্রমহিষীপদে বরণ করিয়া, উভয়ের রাজ্যাভিষেক করিলেন। অভিষেকানন্তর ঐ মহাপুরুষ এক অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া এবং প্রভূত জনমণ্ডলীদ্বারা পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশান্তর উহা প্রদক্ষিণ করিলেন। তথায় সুচন্দ্রক নামক মহান রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া তখন হইতে ষোড়শ সহস্র বৎসর ন্যায়সহকারে রাজ্য করিয়াছিলেন।

এই আখ্যায়িকায় যে পরিণামের কথা বর্ণিত হইল তাহা পূর্ণজ্ঞান বিষয়ক গাথাতে ব্যক্ত হইয়াছে—

"ষোড়শ গুণিত সহস্র বৎসর
কম্বুগ্রীব মহাবাহু রাম।
পালিলেন দেশ প্রবল প্রতাপে,
রাখিলেন সুকীর্ত্তি ও নাম॥"

শাস্তা (বুদ্ধদেব) এই আখ্যান সমাপ্ত করিয়া সত্যের তত্ত্ব বুঝাইয়া ঐ ভূম্যধিকারীকে ধর্ম্মের প্রাথমিক মার্গের ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; এবং নিজের ঐ জন্মের সহিত বর্ত্তমান জন্মের সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "সেই সময়ে রাজা শুদ্ধোদন রাজা দশরথ, মহামায়া রাম-পণ্ডিতের মাতা, রাহুলের মাতা, সীতা, আনন্দ ভরত, সারী-পুত্র লক্ষণ, এবং আমি রামপণ্ডিত ছিলাম।"

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

রজতের ছুটি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

শরতের আকাশের নীলে যে খানিকটা বেশী স্নিগ্ধতা আছে এবং খণ্ড লঘু মেঘে খানিকটা বেশী বন্ধনহীনতার ভাব, এ কথা ছুটি পড়িতেই রজতের মনে পড়িল। সোনালী রৌদ্র, শ্যামল গাছপালা, রূপালী নদীবুকের দিকে চাহিয়া ভারী নৌকার শান্ত যাত্রায় রজত পরিপূর্ণভাবে ছুটি উপভোগ করিতে লাগিল, প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি ঘণ্টা—সমস্ত অন্তর দিয়া, সমস্ত অনুভূতি দিয়া।

কাল বিকাল হইতে তার ছুটি হইয়াছে, রাত্রের ট্রেণেই সে কলিকাতা ছাড়িয়াছে, ভোর রাত্রে ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিয়াছে, বেলা দশটায় আড়ংঘাটায় ষ্টীমার ছাড়িয়া নৌকা ধরিয়াছে, এখন এগারোটা বাজে, বারোদিনের এক দিনের অর্দ্ধেক প্রায় পার হইয়া যায়।

বড় নদী হইতে ছোট নদী, ছোট নদী হইতে বিল, বিল হইতে খাল ধরিয়া তাহাকে যাইতে হইল, বাতাসের প্রতিকূলতা ঠেলিয়া, স্রোতের বিপরীতমুখে, কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুণ টানিয়া, বড় মন্থর বড় শ্লথ জলযাত্রা। বিজ্ঞানের যুগে হাজার হাজার মাইল যখন আকাশযানে হাতের নাগালের মধ্যে আসিয়া গেছে, যখন যে কোনো দেশ কয়েক ঘণ্টার মামলা, তখন এই সামান্য ২৪৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতে একটি মূল্যবান রাত্রি ও দিন নিতান্ত অকারণেই অতিবাহিত হইয়া যাওয়া একেবারেই বাজে খরচ, এবং গভীর পরিতাপের বস্তু, অথচ উপায়ও নাই।

শুধু দুপাশের গাছপালার দিকে চাহিয়া দেখো, গ্রামের আঙিনায় মৃদু কোলাহল শোনো, মাথার উপরে মেঘ ভাসিয়া যায়, জলে ছায়া পড়ে, অরণ্যে পাখী ডাকে, সহর হইতে সভ্য জগত হইতে বিপুল লোকালয় হইতে জীবননির্ব্বাহের সুবিধাবিহীন পরিচয়হীন জীবনযাত্রা—এমনি একটা জায়গায় তার নিজের গ্রাম, পিতৃপুরুষদের স্মৃতি পরিবৃত শৈশবের খেলাঘর।

এখান হইতে বাহির হইয়া একদা বড় হইবার জন্য বহু আশা লইয়া সে কলিকাতার দিকে গিয়াছিল। বিশেষ কিছুই হইতে পারে নাই, বাজে অফিসের একজন সামান্য কেরাণী। কিন্তু সেই স্বল্প আয়টুকু না থাকিলেও গ্রামে তাহার পরিবার থাকিতে পারিত না। কি যে হইত, ভগবান জানেন। তার মা এবং স্ত্রী দেশের বাড়ীতে।

কিন্তু সে মার জন্য চলিয়াছে না স্ত্রীর জন্য সেও একটা ভাবিবার কথা। নিশ্চয়ই মার জন্য, তার স্নেহময়ী দুঃখিনী মা, যে মাকে সে ভীষণ ভালোবাসে, অনেক অনেকদিন পরে তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইবে সেইটাইত সবচেয়ে আনন্দ করিবার বস্তু! কিন্তু মার দিন কি ফুরাইয়া যায় নাই? আজ কি আর একজনের রোমাঞ্চময় সঙ্গ তাহাকে বেশী আকর্ষণ করিতেছে না? একটি লজ্জাশীলা তরুণী দুই বৎসর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নায় যাহাকে দুই মাসও কাছে রাখিতে পারে নাই, তাহার কাব্যময় কাহিনীময় স্বপ্নময় অবগুণ্ঠিত জীবনের মাদকতা কি অনিবার্য্য নয়? মার চেয়ে বড় স্ত্রী? এ যেন অশোভন এ যেন অন্যায় এ যেন অকৃতজ্ঞতা! কিন্তু পৃথিবীতে ত এই নিত্যকাল ঘটিয়া থাকে। জননীদের দিন একদিন ফুরাইয়া যায়, ঘরণীদের দিন আসে, আবার ঘরণীদের দিনও যেদিন ফুরাইয়া যায় সেদিন কাহার দিন আসে?

রজত ভাবিতে পারে না। নিস্তরঙ্গ নদীতে সন্ধ্যার অন্ধকার অঞ্চল বিস্তৃত হইয়া পড়ে, দূরে গ্রাম ভবনে প্রদীপ জ্বালিয়া ওঠে রক্তবিন্দুর মত। মন্দির শূন্য এবং ভগ্ন পড়িয়া থাকে, ঘণ্টা বাজে না, ঘাট শূন্য এবং ভগ্ন পড়িয়া থাকে কাঁকন বাজেনা।

মাঠ ভাঙিয়া কষ্টকর চার মাইল পথ পার হইয়া আপনার পরিচিত গৃহদ্বারে যখন সে পৌছিল তখন দেহ অবশ, মন ক্লান্ত, আনন্দ জানাইবার মত স্নায়ু সতেজ নয়।

মাকে প্রণাম করিয়া স্ত্রীকে দর্শন দিয়া সে আপনার ঘরে ঢুকিয়া ভাঙা ইজিচেয়ারে দেহ এলাইয়া দিল।

স্যাঁৎসেতে অন্ধকার ঘর, টিনের চালায় গরম ভাব, পুরাতন আসবাবপত্রে শ্রীহীন, মলিন এবং কদর্য্য, কিন্তু বাহিরে মল্লিকার ঝাড়ে ফুল ফুটিয়াছে, হাসনুহানার জঙ্গলে সুগন্ধ উঠিয়াছে, জানালার উপরে শেফালী ঝরিয়া পড়িতেছে মৃদুবায়ুহিল্লোলে, খানিকটা দূরে বাঁশবাগান—কবিদের ভাষায় বেণুবন, তারি ঝিরঝিরে পাতার ফাঁক দিয়া পরিষ্কার চাঁদ উঠিতেছে—এইটাই বিলাস, এমন সুরভি সমাকীর্ণ স্বপ্নময় ঘর সেখানে কোথায় ইঁটকাঠ পাথরের দেশে? মেসের ঘর তার নিজস্ব নয়, এইটুকু তার নিজস্ব। এ তফাৎ বড় কম তফাৎ নয়। এই স্বকীয়তার ভাবনাটুকু ভারী আরামের।

আরো আপনার জিনিস আছে, একান্ত তার নিজের। ঐ ত' আসিয়া পড়িয়াছে। অনেকদিন পরে যে কোনো স্ত্রীকে রমণীয় লাগিতে পারে এত' সুন্দরী স্ত্রী।

রজত তাহাকে কাছে ডাকিল। প্রণাম করিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিতে মুখের একদিকে জ্যোৎস্নার ছোঁয়াচ লাগিল। এবং সে প্রশ্ন করিল কেমন আছ?

হায়রে, সে স্বরে একটুও মাদকতা ঝরিয়া পড়িল না, ভাঙা গলার গতানুগতিক প্রশ্ন 'কেমন আছ'।

কলিকাতার যে মেয়েটির সঙ্গে তার কিছুকাল হইল পরিচয় হইয়াছে সে বলে 'খবর কি?' কিম্বা 'আছেন কেমন'—সঙ্গে সঙ্গে একটু মিষ্টি হাসি টানিয়া আনে।

'কখন এলেন' বলিবার সময়ে 'খ'-এর উপর একটু বেশী জোর দেয় এবং সমস্ত কথাগুলিকে একটি হাসির স্রোতের উপর ছাড়িয়া দেয়—যেন জলতরঙ্গ বাজিয়া উঠে।

কিন্তু লতার এই 'কেমন আছ' যেন কোনো অসুস্থ রোগীকে নীরস প্রশ্ন। এইখানেই শেষ নয়, কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিয়া রজত দেখিল, বিংশত শতাব্দী থেকে সে অনেক পিছাইয়া গেছে। চলায় বলায় আলোচনায় সে এখনো উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অনুসরণ করিতেছে।

যে নারী আধুনিক ছেলেকে ভুলাইতে পারে—এ তার ধার দিয়াও যাইতে জানে না, অথচ এও নারী, আশ্চর্য্য! এর সান্নিধ্য শহরের লোকের কাছে অসহ্য। পাড়া গেঁয়ে জংলীভূত! প্রথম ধাক্কাটা তার বিশ্রী লাগিল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে শুইয়া পড়িল, ক্লান্ত শরীরে জাগিয়া থাকিবার শক্তিও ছিল না প্রবৃত্তিও ছিল না। মাঝরাতে একবার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে ফিরিয়া দেখিল, মনে করিয়াছিল তাহার সহিত কথা কহিতে না পাইয়া লতা হয়ত জাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু না সেও ঘুমে অচেতন।

সকালে উঠিয়া রজত দেখে লতা দিনের কাজে চলিয়া গেছে, জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে বিছানায়।

চা খাইয়া লইয়াই সে পুরাতন পরিচিতদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল, এবং নানা গল্প গুজবে অনেকটা বেলা করিয়া ফেলিল, ইচ্ছা করিয়াই।

পল্লীগ্রামে জুতা পরিয়া বাহির হওয়ার রেওয়াজ নাই পাড়ার মধ্যে ঘুরিবার সময়। রজতও সে চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস করে নাই। পাছে 'সহুরে বাবু' বলিয়া কেহ পরিহাস করে।

কাজেই রান্নাঘরের দাওয়ায় যখন সে উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন মোটেই শব্দ হয় নাই। আর একটি পুরুষ কণ্ঠের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল—বৌদি, আজ ত আমাদের দিকে দেখবেই না, দাদা এসে গেছে।

কোমল অথচ মধুর কণ্ঠে জবাব হইল—তোমরা ত চিরদিনের, উনি ত' কদিনের। তোমাদের আদর কি কমতে পারে? তুমি বরঞ্চ দূরে দূরে থাকতে আরম্ভ করেছ, সকাল থেকে এদিক মাড়াওনি, দিনে ত' এতক্ষণ তিন বার পান সাজবার হুকুম হ'য়ে যেত বাবুর।

—আচ্ছা একখানা মাছভাজা দাও।

কি করো ঠাকুরপো, দিচ্ছি, আঁচল ছাড়ো। আমি কি বলেছিলেন দোবনা। বাসি কাপড়ে ঝাঁ ক'রে ছুঁয়ে দিলে।

ছুয়ে ত' রোজই দিই, কোনদিনত বলোনা, আঁচলে টান না দিয়ে আমার কোনো কথাই বলা হয় না, আজ আবার তোমার বিচার কোত্থেকে এলো!

রজত দাওয়া হইতে নামিয়া একটু কাসিয়া মার ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে দেখিয়া গেল—গয়লাপাড়ার বেচা বলিয়া ছোঁড়াটা এতক্ষণ কথা কহিতেছিল।

'তুমি ত চিরদিনের উনিত কদিনের'—ভাবিতে ভাবিতে রজত চলিল। একথাটার একশো এক রকম অর্থ করা যাইতে পারে, প্রথম অর্থটাই কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক, ক্রমশঃ ভাবিতে ভাবিতে মোলায়েম হইয়া আসে। এমন কি শেষ অবধি কোনো কদর্থ্যই হয় না।

মা ঠাকুর ঘরে ছিলেন, সারাদিন তাঁর পূজা অর্চ্চনা বিচার আচারে কাটে, পুত্রবধুর দিন কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটে দেখিবার সময় পান না বেশ বোঝা যাইতেছিল।

তবু মাকে প্রশ্ন করিল রজত—বেচাটা এখানে কি করতে আসে?

মা বলিলেন, ওমা ও আমাদের কত কাজ ক'রে দেয়। যখনি যে ফরমাস করি তখনি বেচা ছোটে। তুইত এখানে থাকিস না, দায়ে আদায়ে ওদের ওপর নির্ভর করতেই হয়।

বেচাত তখনি সরিয়া পড়িয়াছে।

সারাদিন রজত আপনমনে গর্জ্জন করিতে লাগিল, কোন কিনারাই পাইল না, বেচার হাত হইতে ইহাদের রক্ষা করিতে হইলে কলিকাতায় লইয়া গিয়া রাখিতে হয়, আয়ের দিক দেখিতে গেলে বর্ত্তমানে যা অসম্ভব। এখানে এম্নি রাখিয়া গেলে ঠেকাইবার কোনো উপায়ই নাই।

বেচাকে কেন্দ্র করিয়া দুষ্প্রাপ্য ছুটির মূল্যবান দশদিন অশান্তি ও কলহেই কাটিয়া গেল, একাদশ দিনে কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিতে হইল অপ্রসন্ন মনে।

রজতের লতা রহিয়া গেল বেচাদের জন্য, অসমর্থ জীবনের গ্লানি ও মনোবেদনা বহিয়া চন্দ্রালোকিত নদীতীর ঘেঁসিয়া নৌকা চলিয়া গেল। কাব্যরস পান করিবার আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া যে যুবকচিত্ত গৃহাভিমুখী হইয়াছিল, ফিরিবার পথে রিক্ততা ও তিক্ততায় উন্মাদনাময়ী জোৎস্না নিশীথে তার মর্ম্মভেদী হাহাকার শরতের আকাশে মিলাইয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগ

ডক্‌টর মনোমোহন ঘোষ এম, এ, পি এইচ, ডি, কাব্যতীর্থ

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের মত নাট্য সাহিত্যের সৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। 'নাটক' শব্দটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইলেও বাঙলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য খুব অল্পই। সর্ব্বপ্রথম বাঙলা নাটক লিখিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালীর নাট্যাভিনয় দর্শনের কৌতূহল নিবৃত্ত করিত যাত্রা গান। এই যাত্রার কোন বাঁধা পালা ছিল না। কেবল গানগুলিই পূর্ব্ব হইতে তৈরী থাকিত এবং অভিনেতারা আসরে দাঁড়াইয়া উপস্থিতমত কথোপকথনের মুখেই পালাটিকে ফুটাইয়া তুলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবাসী ইংরেজগণের অবসর বিনোদনের জন্য কলিকাতায় যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই সর্বপ্রথমে আধুনিক নাট্যাভিনয়ের প্রতি এদেশীয় লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহের সঞ্চার করেন দুইজন ইংরেজী অধ্যাপক, হিন্দু কলেজের কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর হারমান্ জেফ্রয়। এই উভয়ের অভিনেতৃসুলভ সেক্‌সপীয়র আবৃত্তি এবং নাট্যানুরাগই তাঁহাদের ছাত্রবৃন্দে সংক্রমিত হইয়াছিল। যাঁহাদের উৎসাহে এবং চেষ্টায় বাঙলা নাট্যসাহিত্যের সূতিকাগার স্বরূপ বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন হিন্দুকলেজ এবং ওরেরিণ্টাল সেমিনারীর ছাত্র। আর সর্বপ্রথম বাঙলা নাটকের লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যানুরাগের মূলেও রহিয়াছে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের প্রেরণা।

বাঙলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদি প্রবর্ত্তক এবং 'মেঘনাদ বধে'র কবি হিসাবেই মধুসূদন সাহিত্যক্ষেত্রে সমধিক পরিচিত, কিন্তু তিনি যে বাঙালীর আধুনিক নাট্যসাহিত্যেরও প্রথম স্রষ্টা তাহা অতি অল্পলোকেই জানেন। আর নাটক রচনা উপলক্ষে যে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল তাহা আরও স্বল্প লোকের পরিজ্ঞাত। কিন্তু এইসকল ইতিহাসের সবিস্তার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কিরূপে ইংরেজীতে কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদন বাঙলার প্রথম নাটক রচনা করিলেন সেই কাহিনী এখানে আলোচিত হইবে। বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাতে অভিনয়ের জন্য সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটিকা অবলম্বনে একখানি বাঙলা নাটক রচিত হইয়াছিল। ঐ নাটকের অভিনয় কালে বহু অবাঙালী নিমন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তাঁহাদের সুবিধার জন্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ বহিখানিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। মধুসূদনকেই করিতে হইয়াছিল এই অনুবাদ। এইরূপে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (rehearsal) দেখিতে দেখিতে তিনি কোন বন্ধুর নিকট ঐ নাটকের অকিঞ্চিৎকরত্বের কথা উল্লেখ করিলেন। বন্ধুটি ভাল বাঙলা নাটকের একান্ত অভাবের কথা তাঁহাকে জানাইলে মধুসূদন স্বয়ং নাটক রচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। মাইকেল সেই সময় বহুদিন যাবৎ কেবল ইংরেজী চর্চ্চা করিয়া বাঙলা ভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন; তাই বন্ধুটি এই কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন কিন্তু মুখে তাঁহাকে এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে বলিলেন। বন্ধুটির অন্তরের ভাব মধুসূদন বুঝিতে পারিলেও এ বিষয়ে তিনি নিরুৎসাহ বা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। অবিলম্বে এসিয়াটিক (অধুনা 'রয়াল' এসিয়াটিক) সোসাইটির গ্রন্থাগার হইতে কতিপয় সংস্কৃত নাটক ও বাঙলা পুস্তক আনিয়া সে সমুদয় মনোযোগসহকারে পাঠ করিলেন। তাহার কিছুকাল পরেই

তিনি মহাভারতোক্ত যযাতির উপাখ্যান অবলম্বনে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নামক নাটক রচনা করেন। এই নাটক তৎকালীন কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞ পণ্ডিতকে সংশোধনার্থ দেওয়া হইলে উহার কিয়দংশ দেখিয়া তিনি অবজ্ঞাভরে বলিলেন "সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই ; কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয়ই নষ্ট হইবে" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য মধুসূদনের নাটক পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত 'রূপকে'র নান্দী ও প্রস্তাবনা তিনি বাদ দিয়াছিলেন। চরিত্র চিত্রণ বিষয়েও অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট নিয়মও তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। এই সকলই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তাগণের অধিকাংশই ছিলেন ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের লোক। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র বা অলঙ্কার শাস্ত্রের খবর তাঁহারা রাখিতেন না। ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের বিচার করিলেন। উহার সুমধুর ভাষা চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু ও চরিত্র সমূহের স্বাভাবিকতা তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিল। প্রাচীনপন্থীদের মত-বিরোধ সত্বেও তাঁহারা নাটকখানিকে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত হইল এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় উহার অভিনয় হইল। এই অভিনয়েও অবাঙালী বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য নাটকখানি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর সকলেই নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। তখনকার দিনের সংবাদপত্র সমূহে শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল। উক্ত অভিনয়ের বিস্ময়কর সাফল্য হওয়াতে মধুসূদনের প্রবর্তিত নাটক রচনার রীতি বাঙলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি সকলেই নাটক নির্ম্মাণে মধুসূদনের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু অভিনয়ের সাফল্য দেখিয়া কোন নাটকের সাহিত্যিক মূল্য অনুমান করিতে যাওয়া ভুল হইবে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, সাহিত্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর অনেক নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে কিন্তু প্রকাশিত পুস্তক হিসাবে তাহা নিতান্ত আকর্ষণহীন। পক্ষান্তরে এমন সুলিখিত এবং সরস নাট্যগ্রন্থও বিরল নহে, যথেষ্ট দর্শক হইবে না আশঙ্কায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যাহার অভিনয় হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের বিষয়ই আলোচিত হইতেছে কাজেই সাহিত্যিক গুণ নাট্যগ্রন্থ আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয় সম্পন্ন হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা যে অভিনয়ে ভাল উৎরাইলেও উহার সাহিত্যিক ত্রুটি ছিল কিছু কিছু। যেমন, ইহাতে অবতারিত চরিত্রগুলি খুব ভাল ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই উহার ভাষা কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকোপযোগী নয় এবং স্থানে স্থানে ইহার ভাব সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বশতঃ কৃত্রিমতাপূর্ণ। কোন কোন নাটকের পাত্রাদি রঙ্গ-মঞ্চে প্রবেশ করিয়া যে নিজ মুখে নিজের সুদীর্ঘ-পরিচয় প্রদান করে তাহা বড়ই অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু নাট্য রচনা শিল্পের প্রথম শিক্ষার্থী মধুসূদনের এ সকল ত্রুটি উপেক্ষার্হ। তাঁহার প্রতিভাগুণে শর্ম্মিষ্ঠার প্রশংসনীয় গুণ বিরল নহে। নাট্যোল্লিখিত নারী চরিত্র সমূহে তাঁহার চরিত্র-চিত্রণে ক্ষমতার পরিচয় রহিয়াছে।

পৌরাণিক কথাবস্তু অবলম্বনে শর্ম্মিষ্ঠা রচনার পর মধুসূদন হাস্যরসাত্মক রচনার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাহারই ফল স্বরূপ তাঁহার দুইখানি 'প্রহসন' রচিত হইল। মধুসূদনের নাটক যেমন সংস্কৃত নাটকের আদর্শে কল্পিত হয় নাই প্রহসন রচনায় ও তিনি সংস্কৃতের আদর্শ অবহেলা করিয়া ইংরেজীর হাস্য রসাত্মক নাটকের অনুসরণ করিলেন। ইংরেজী প্রহসনে (farce) সামাজিক বিপ্লব ও অনাচারের সমালোচনা থাকে। যখন সমাজে পুরাতন আদর্শের আড়ালে ভণ্ডামি চলে বা নূতন আদর্শের অপব্যবহারে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তখনই প্রহসন জাতীয় গ্রন্থের আবির্ভাব হয়। মধুসূদনের যৌবন কালে কলিকাতা সমাজে শিক্ষিত নামধারী এমন এক দল লোক দেখা দিয়াছিলেন যাঁহারা সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের

নামে অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। দলবদ্ধ ভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ, মাংসাদি ভক্ষণ ও জাতীয় আচার ব্যবহারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ইহাদের নিকট উন্নতিশীলতার দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। মধুসূদনের প্রথম প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। ইহার উপাখ্যানটি এইরূপ :—

কলিকাতার কোন বৈষ্ণব ধনী ব্যক্তির নবকুমার নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রতি শনিবারে তিনি অপর সভ্যগণসহ একত্র হইয়া সমাজ সংস্কার ও অন্যান্য দেশ-হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এক দিন নবকুমার উক্ত সভায় গমন করিলে তাঁহার পিতার মনে কোন কারণে সন্দেহ হওয়ায় তিনি এক বৈষ্ণব বাবাজীকে তাহার অনুসন্ধানের জন্য সেখানে পাঠাইলেন। বৈষ্ণব বাবাজী অতি কষ্টে সভায় প্রবেশ লাভ করিয়া বিস্মিত নয়নে দেখিল যে সমাজ সংস্কার বিষয়ক বাগাড়ম্বর পূর্ণ বক্তৃতার পর সভ্যগণের সমক্ষে বারাঙ্গনার নৃত্য আরম্ভ হইল এবং সভ্যেরা হোটেল হইতে আনীত খাদ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। নবকুমার সভাভঙ্গের পর মদ্যপানান্তে গৃহে আসিয়া বিলাতী প্রথার অনুসরণে ভগ্নীকে চুম্বন করিল এবং পত্নীকে পণ্যাঙ্গনার ন্যায় সম্বোধন করিয়া ও পিতাকে মদ্য আহরণের আদেশ দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বলা বাহুল্য নবকুমারের পিতা অচিরে পুত্র ও অন্য স্বজনগণসহ কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাঙালী সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কণা মাত্রও অতিরঞ্জন নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ প্রথম যখন এদেশে আসিল তখন তাহার ফলে এমন একদল প্রকৃত মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়াছিল যাঁহাদের উদার চিন্তা ও অক্লান্ত কর্ম্মের ফলে দেশ উন্নতির পথে চালিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের অনেকে সুনীতি ও সদাচার সম্বন্ধে এরূপ শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে তাহার কুফল এখনো অল্পবিস্তর বর্ত্তমান আছে। কোন কোন সংস্কারকের চরিত্রের দুর্ব্বল দিক্‌কে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচিত হইয়াছিল। অনেক বঙ্গীয় সমলোচকের মত গ্রন্থখানি বঙ্গ ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রহসন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা এই শ্রেণীর প্রহসনের আদর্শ থাকিবে।' দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকে এই প্রহসনের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে।

মধুসূদনের প্রহসনে সমাজের একদিকের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছিল। অপর দিকের চিত্রও অঙ্কিত করার আবশ্যকতা ছিল। কেবল ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাবুদের অনাচারেই হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। গোড়া হিন্দুত্বাভিমানী ভণ্ডের দলও সমাজকে তলে তলে কম আঘাত দেয় নাই। মধুসূদনের সময়ে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমাজ ঐরূপ ভণ্ড শ্রেণীর কতকগুলি লোক ছিল। তাঁহারা বাহিরে মালাজপ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিতেন কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রী গমনাদিতে তাঁহাদের বিশেষ প্রসক্তি ছিল। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর ইহাদের বিদ্বেষের সীমা ছিল না কিন্তু ইহারা যে সব দুষ্কর্ম্ম করিতেন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' এই ভণ্ডদের প্রতি লোকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ লেখা। ইহার কথাবস্তুটি নিম্নলিখিত রূপ : —

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে ভক্তপ্রসাদ নামে এক জমিদার বাস করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, সর্ব্বদা হরিনাম করেন ও মালা জপেন। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের কদাচারে দেশ-ধর্ম্ম উৎসন্ন যাইতেছে বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার দুশ্চিন্তা। একবার খাজনা পরিশোধে অক্ষম হানিফ্‌ শেখ নামক তাঁহার কোন প্রজা তাঁহাকে দুরবস্থা জানাইতে আসিয়াছিল। জমিদারবাবু লোক মুখে শুনিলেন যে হানিফের স্ত্রী যুবতী ও সুন্দরী। তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে হস্তগত করিবার জন্য একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে দূতী করিয়া পাঠাইলেন। অচিরে হানিফ তাহার স্ত্রীর নিকট সকল কথা অবগত

হইল ও তাহা গ্রামের বৃদ্ধ পঞ্চানন বাচস্পতি মহাশয়কে জানাইল। ভক্তপ্রসাদ এই বাচস্পতির কিছু 'ব্রহ্মত্র' জমি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। বাচস্পতির পরামর্শে হানিফ তাহার স্ত্রীকে ভক্তবাবুর সঙ্কেত স্থানে পাঠাইয়া নিজে অদূরে লুকাইয়া রহিল। যথাকালে পাকাচুলে আতর গোলাপ মাখিয়া ও সুবেশ ধারণ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ভক্তপ্রসাদ বাবু ভগ্ন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া হানিফের স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ আরম্ভ করিলে হঠাৎ অন্ধকারে হানিফ আসিয়া ভূতের মত তাহাকে যথেষ্ট উত্তম মধ্যম প্রহার দান করিল। এমন সময় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মত বাচস্পতি মহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত হইলেন। কুকার্য্যে ধরা পড়িয়া ভক্তপ্রসাদ বাচস্পতির ব্রহ্মত্র জমি পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণাসহ ফিরাইয়া দিলেন। হানিফ শেখও প্রহার দানের পুরস্কার স্বরূপ দুইশত টাকা পাইল। পরিশেষে ভক্তবাবু এই কয় ব্যক্তির নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে এমন দুষ্কার্য্য আর কখনো করিবেন না।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র ন্যায় 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'তেও বর্ণিত আখ্যানেও কোন অস্বাভাবিকত্ব নাই। ভক্তপ্রসাদের ন্যায় ভণ্ডগণ এখনো হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে কীটের ন্যায় থাকিয়া তাহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। তাহাদিগকে উপহাস করিবার জন্য এরূপ প্রহসনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

কিন্তু মধুসূদনের রচিত প্রহসন দুইখানি অন্যান্য বিষয়ে উত্তম হইলেও স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট। অবশ্য এই অশ্লীলতা অসৎপ্রবৃত্তি উদ্রেকের জন্য নয়। সামাজিক কদাচারকে জীবন্তবৎ দেখাইবার জন্যই তিনি স্থানে স্থানে অশ্লীল শব্দের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু দোষ গুণ সমস্ত লইয়া প্রহসনদ্বয় বাঙলা সাহিত্যে এক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরবর্ত্তী প্রহসন লেখক মাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মধুসূদনের এই রচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।

মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' ছদ্ম-পৌরাণিক নাটক। উহাতে শচী, রতি ও নারদাদি পৌরাণিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও উহার আখ্যানটি ভারতীয় কোন পুরাণ বা উপপুরাণে পাওয়া যায় না। এই নাটকের কাহিনী মধুসূদনের কবি সুলভ সৃষ্টিকুশলতার ফল। ইংরেজী apple of discord এই বাক্যাংশের মূলে যে গ্রীক পুরাণ কাহিনী আছে তাহাকেই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তিনি পদ্মাবতীর কথাবস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত কাহিনীটিকে তিনি এমন সুন্দর ভারতীয় আকার দিয়াছেন যে পুরাণানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজেই ইহাকে ব্যাসপ্রোক্ত উপাখ্যান বলিয়া মনে করিবে। ইহা নিম্নলিখিত রূপ।

বিদর্ভ দেশের রাজা ইন্দ্রনীল একদিন মৃগয়া প্রসঙ্গে বিন্ধ্যারণ্যের নিকটবর্ত্তী দেবউপবনে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে ইন্দ্রাণী শচী, কামপ্রিয়া রতি এবং যক্ষপত্নী মুরজা এই দেবীত্রয় আকাশ হইতে সেখানে অবতীর্ণ হইলেন। এমন সময় কলহ সংঘটন পটু নারদ তাঁহাদের সম্মুখে একটি 'কনক পদ্ম' রাখিয়া বলিলেন যে আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তিনিই ইহা গ্রহণ করুন।' নারদের প্রস্থানান্তে দেবীত্রয়ের মধ্যে এই কনক পদ্মের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্রনীলকে দেখিতে পাইয়া দেবীগণ তাঁহাকেই বিচারক মানিলেন। ইন্দ্রনীল রতি দেবীকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী জ্ঞানে কনক পদ্ম দান করিলে শচী ও মুরজা তাহার মর্ম্মান্তিক শত্রু হইলেন। পদ্ম প্রাপ্তিতে পরিতুষ্টা রতি রাজা ইন্দ্রনীলকে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটাইবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। তদনুসারে মাহিষ্মতীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। শচী এদিকে ইন্দ্রনীলকে দণ্ড দানের জন্য কলিদেবকে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রনীল যখন পদ্মাবতী লাভে নিরাশ রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধে রত তখন কলি কৌশল ক্রমে পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া এক নির্জন অরণ্যে রাখিয়া আসিল। রতি ইহা টের পাইয়া পদ্মাকে তথা হইতে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিলেন মহর্ষি আঙ্গিরার আশ্রমে। ভগবতীর নিকটে তিনি শচীর এই অন্যায় কার্য্যের কথা জানাইলে দেবীর আদেশে শচী ইন্দ্রনীলের অনিষ্টাচরণে বিরত হইলেন।

এদিকে ইন্দ্রনীল যুদ্ধ জয় করিয়া যখন দেখিলেন পদ্মাবতী অপহৃতা, তখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে

বাহির হইলেন এবং মহর্ষি আঙ্গিরার আশ্রমে আসিয়া পদ্মাবতীকে পুনরায় লাভ করিলেন।

পদ্মাবতী নাটকের আখ্যানভাগে শর্ম্মিষ্ঠা অপেক্ষা ঘটনাবৈচিত্র্য অধিকতর। কিন্তু নাটকোচিত চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন এই নাটকে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। ইহার পুরুষ চরিত্রগুলি স্ত্রী চরিত্রের তুলনায় ঈষৎ অপকৃষ্ট। গ্রন্থনায়ক রাজা ইন্দ্রনীলকে মধুসূদন বীররূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিলেও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। কলিরাজের চরিত্রও যথাযথরূপে বিকশিত হয় নাই। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পদ্মাবতীতেও কতিপয় নাট্যগঠনের দোষ বিদ্যমান। যেমন পাত্র পাত্রী 'স্বগতঃ' উক্তির সাহায্যে আত্মপরিচয় দান করিতেছে। এই সকল ক্রটির কথা ছাড়িয়া দিলে পদ্মাবতীকে নিতান্ত নিকৃষ্ট নাটক বলা যায় না। পদ্মাবতীর ভাষা শর্ম্মিষ্ঠার ভাষা অপেক্ষা নাট্য প্রয়োগের অধিকতর উপযোগী, অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ও দুরূহত্বহীন। এই নাটকে গদ্য পদ্য দুই-ই ব্যবহৃত হইয়াছে। পদ্যনিচয়ের কয়েকটি এমন ছন্দে রচিত যাহা না মিত্রাক্ষর না অমিত্রাক্ষর; ইহার দৃষ্টান্ত চতুর্থাঙ্কে কলির উক্তিতে—

আমি কলি
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজিলা বিধাতা—
জল তলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।

এই উদ্ধৃত কবিতাটির ছন্দই বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নাটকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিকট ইহা 'গৈরীশ' ছন্দ নামে পরিচিত। খুব সম্ভব বাঙলা অমিত্রাক্ষরের উপযোগিতা আবিষ্কারের পর এই ছন্দ আর মাইকেলের মনঃপুত না হওয়ায় তিনি কোন গ্রন্থে ইহার ব্যবহার করেন নাই। পদ্মাবতীতেই পূর্ব্বোক্ত নূতন ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কয়েকটি পদ্যে অমিত্রাক্ষরের ব্যবহারও করিয়াছেন। ইহাই বাঙলা সাহিত্যে সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার।

মধুসূদনের সর্ব্বশেষে রচিত নাটক কৃষ্ণকুমারী। ইহাই বাঙলা ভাষার সর্ব্ব প্রথম বিষাদান্ত নাটক (tragedy)। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কোন নাটক বিষাদান্ত হইতে পারে না। কিন্তু নাট্যরচনায় আরম্ভ কাল হইতে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্য রচনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাহার ফলও কিছু মন্দ হয় নাই। তাই কৃষ্ণকুমারীতে তিনি বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য ট্রাজেডির আদর্শ অনুসরণ করিলেন। উদয়পুরের মহারাণা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর দুঃখময় জীবন কাহিনীই উল্লিখিত নাটকের আখ্যান বস্তুর মূলে। কৃষ্ণকুমারীর অলোকসামান্য রূপগুণে মোহিত হইয়া জয়পুরের লম্পটপ্রকৃতি রাজা জগৎ সিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর মানসিংহ যুগপৎ তাহার পাণিপ্রার্থী হন। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে কৃষ্ণ কুমারীকে না পাইলে উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। দুর্ব্বলপ্রকৃতি ভীমসিংহের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে তিনি উভয় প্রার্থীর কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে সাহস করিলেন না। কৃষ্ণকুমারীই সকল অশান্তির মূল স্থির করিয়া তিনি কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার আদেশ দিলেন। ইহা জানিয়া বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কৃষ্ণকুমারী বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন।

কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের রচিত নাটকাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চরিত্রাঙ্কণ বিষয়ে তিনি ইহাতে যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার অন্য নাটকে দুর্লভ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গ্রন্থখানি দোষবর্জিত নহে। পূর্ব্বের নাটকদ্বয়ের ন্যায় ইহাও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। আর সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পাশ্চাত্য নাটকের সহিত তুলনায় মধুসূদনের রচিত নাট্যগ্রন্থগুলি একান্ত উৎকর্ষবিহীন। অবশ্য তাঁহার নাটক রচনার প্রায় অশীতি বর্ষ পরেও বাঙলা নাটকের এমন অবস্থা আসে নাই যাহাতে উহা সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে কৃষ্ণকুমারীর দোষ গুণ স্বীকার করিয়াও তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলা সঙ্গত যে ইহা একখানি উত্তম নাটক। বাঙলা ভাষায় অতি অল্প বিষাদান্তকই নাটক ইহার সমকক্ষ বিবেচিত হইবে। (১)

(১) প্রবন্ধটিতে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিত মধুসূদন দত্তের জীবন চরিতের বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

নাট্য কৌতুক

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

বাংলা দেশের কোনো এক গ্রাম্য রঙ্গমঞ্চে বন্যা পীড়িতের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য সুবিখ্যাত নাট্যকার প্রহ্লাদচন্দ্র বটব্যালের "বুকের ইঙ্গিত" নামক নাটক অভিনয় হইতেছে। "বুকের ইঙ্গিত" নাকটখানি বঙ্গদেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, ইহা কে না জানে ?

আসল রঙ্গমঞ্চ,—যেখানে "বুকের ইঙ্গিত" অভিনয় হইবে, তাহা ষ্টেজের দক্ষিণদিকে। তাহার সামনে যবনিকা ঝুলিতেছে। যবনিকায় হাতে লেখা নানাবিধ বিজ্ঞাপন আঁটা রহিয়াছে, সেগুলি যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি অপরূপ— "রসিকলাল শর্ম্মার দাদের মলম, অব্যর্থ, অত্যাশ্চর্য্য, নিষ্ফল প্রমাণে মূল্য ফেরৎ দিব (চাহিলেই মূল্য ফেরৎ দিব না, নিষ্ফল প্রমাণ করিতে হইবে, এবং প্রমাণ গ্রহণ করা না করা আমার ইচ্ছা)।" "নায়েগ্রা ফাউণ্টেন পেন্,—নায়েগ্রার জলপ্রপাতের মতো ইহাতে কালীর প্রপাত, বিশেষ দ্রষ্টব্য— আপনার পোষাক চিত্রিত করিতে অদ্বিতীয়।" "রেলের পাঁচন—আজকাল রেলে যেরূপ ঘন ঘন কলিসান হইতেছে, এক শিশি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিলে কলিসানের সময় কাজে লাগিবে।"

ষ্টেজের বামদিকে বৃহত্তর অংশটিতে "সাজ ঘর"। সমস্ত ষ্টেজের বড় যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে সাজঘরে একটি ধূলি ধূসর আয়না টেবিল বহু চায়ের পেয়ালার দাগ বক্ষে ধরিয়া আছে। আয়না টেবিলের উপর কয়েকটি তুলি, রঙের পাত্র, ইত্যাদি এবং দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম। একটি দড়িতে ঝোলানো কয়েকটি সল্মাচুমকির কাজ করা জীর্ণ পোষাক, কয়েকটি পরচুলা, নকল দাড়ি গোঁফ। ঘরের এক কোণে কয়েকটি ডাঁটি ভাঙা চায়ের পেয়ালা ও পিরিচ। একটি ভুষালিপ্ত প্রাচীন কেটলিতে চা ফুটিতেছে। কয়েকটি হুঁকা, কলিকা, তামাক, টিকা, বিড়ির বাণ্ডিল ইতস্ততঃ ছড়ানো। খান দুই চেয়ার। এক কোণে একটি হারমোনিয়াম ও ডুগি তব্‌লা।

প্রম্পটার যতীন সাজঘরের ও রঙ্গমঞ্চের সীমাস্থানে দাঁড়াইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রম্পট করিবে। সিন-শিফটার দারিক যতীনের কাছ হইতে খানিক তফাতে দড়ি হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

এ অভিনয়ে অভিনেতাদিগকে কখনো সাজঘরে, কখনো আসল রঙ্গমঞ্চে এবং কখনো দর্শকদের মধ্যে দেখা যাইবে।

সাজঘরে অসম্ভব ভিড়, অনেক লোক যাওয়া আসা করিতেছে। অনেকে চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহ রাগিয়াছে। এবং এতৎসহ চড়া সুরে হারমোনিয়াম বাজিতেছে। সমস্ত শব্দ সমষ্টিতে মনে হইতেছে যেন ভেড়ার গোহালে আগুন লাগিয়া গেল।

এই জনবহুল থিয়েটার পার্টির একটি মাত্র চাকর হাবুল। সুতরাং কাজ এড়াইয়া চলা তাহার অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এবং আর একটি অভ্যাসও দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—তাহার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

হারমোনিয়ামের প্যাঁ প্যাঁ ছাপাইয়া যে গোলমাল হইতেছে তাহা এইরূপ—

চায়ের কেটলিতে জল কমলেই জল ঢেলে দিও। দুধ চিনি একবার দিলেই চলবে।

—নাও হে নাও, অত রং মাখলে যে সং হয়ে দাঁড়াবে।

—আমার দাড়িটা গেল কোথা। ওহে আমার দাড়িটা দেখেছ ?

—ওরে হাবুল, হা—বুল, ও হা—বুল।

—দেখো যতীন, প্রম্পটা ঠিক মতন কোরো। আমি আবার নার্ভাস মানুষ।

—আরে ধুত্তোর কর কি, কর কি, এখুনি তামাকটা মাড়িয়ে ফেলেছিলে আর কি !

—বিড়ির প্যাকেটটা কোথায় হে—

—চোপ, চোপ, গোল কোরো না। গোল কোরো না। ওরে ঘণ্টা বাজা, এক ঘণ্টা।

—ঢং

—আঃ কিছু শুনতে পাচ্ছি না যে ধুত্তোর। থামাও থামাও হারমোনিয়াম থামও।

হারমোনিয়াম থামিল। গোলমাল কমিল। হেবো চাকর ঝাঁটা হস্তে করিয়া সাজঘরে ঢুকিল

হেবো ওরফে হাবুল। আমি একা লোক তায় মনিষ্যির শরীল তো বটেক। এই এত লোকের ধখোলটি সামলানো তো একটুখানি কথা নয়। হেঁ হেঁ—(এই বলিয়া এক প্যাকেট বিড়ি আত্মসাৎ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল)

একজন অভিনেতা। ওরে হেবো, তামাক সাজ।

হেবো। উই তামাক রয়েচেন, উই টিকে রয়েছেন, আর—উ- উই হুকাটি গড়াগড়ি খাচ্ছেন। আপনি সেজে খাওনা বাবু। (একটা ক্ষুর সরাইতে যাইতেছিল, কিন্তু অপরের চোখ পড়ায় তাড়াতাড়ি টেবিলে রাখিয়া দিল)।

অপর এক অভিনেতা। ওরে হেবো, এক কাপ চা দে, চট করে।

হেবো। উই কেটলিতে ফুটতে নেগেচে টগাবগ টগাবক—তুমি নিজে ঢেলে খাওনা বাবু। আমি একা মনিষ্যি কতদিক সামলাই, হেঁ হেঁ— (একটা দেশলাই আত্মসাৎ করিয়া ট্যাকে গুজিয়া ফেলিল)।

[দর্শকদের বসিবার স্থান হইতে সিড়ির ধাপে উঠিয়া নীতিন্ বাবু সাজঘরে প্রবেশ করিলেন। নীতিন্ বাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি অত্যন্ত নীতি-বাগিশ একরোখা ব্যক্তি। চোখে কাচের চশমা, হাতে লাঠি। সাহিত্যে- স্বাস্থ্যরক্ষা, নাট্যে শ্লীলতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ]

নীতিনবাবু। ওরে হেবো, সুরেনবাবু কোথা, একবার ডেকে দে।

হেবো। কে জানে কুথায়। আপনি খুজে নাও গে না বাবু। আমি একা মনিষ্যি—

নীতিনবাবু। (লাঠি তুলিয়া) তবে রে বেটা—ডেকে দিবি কিনা বল্—

হেবো। এজ্ঞে যাই—

[সুরেনবাবু সাজঘরের এক পাশেই ছিলেন। গোল শুনিয়া তিনি নীতিন্ বাবুর সামনে আসিলেন। সুরেনবাবুর বেশ নাদুস নুদুস চেহারা, গোঁফ দাড়ি কামানো। তিনিই এই থিয়েটারের কর্মকর্ত্তা, চাঁয়ণী এবং ঋষির পার্ট লইয়াছেন। সকলকে যথাসম্ভব খুসী রাখিয়া সমস্ত ব্যাপারটা যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার জন্তই সতত সচেষ্ট। কিন্তু তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ আছে যাহা এখনি প্রকাশ পাইবে]

নীতিনবাবু। বলি ও সুরেনবাবু—

সুরেনবাবু। আরে কেও, ধুত্তোর নীতিনবাবু যে! নমস্কার, নমস্কার, বেশ ভাল আছেন তো?

নীতিনবাবু। আজ কি নাটকের অভিনয় হবে মশাই?

সুরেনবাবু। ঐ যে ধুত্তোর নামটা ভুলে যাচ্ছি। সুবিখ্যাত নাট্যকার ঐ যে কি ধুত্তোর, তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, নামটা তার ধুত্তোর—

যতীন। প্রহ্লাদচন্দ্র বটব্যালের বুকের ইঙ্গিত নাটক আজ অভিণয় হবে।

নীতিনবাবু। কি বললেন, বুকের ইঙ্গিত! মাই গড আমি জানতে চাই—

[ভ্যাঁ করিয়া তারস্বরে হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল]

আঃ, থামাও না বাপু তোমাদের ঐ ভেপু কল। [হারমোনিয়াম থামিল] থিয়েটারের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন!

সুরেনবাবু। দুর্নীতি!

নীতিনবাবু। দুর্নীতি নয় তো কি মশাই! "বুকের ইঙ্গিত"—দুর্নীতি নয়তো কি!

যতীন। নাম থেকেই বুঝলেন দুর্নীতি! দুর্নীতি আপনার নিজের মনে।

নীতিনবাবু। কী—এতবড় কথা!

সুরেনবাবু। তুমি চুপ কর যতীন। আমি শপথ করে বলছি ধুত্তোর—

যতীন। কার বাপের সাধ্য বলে দুর্নীতি!

সুরেনবাবু। আহা, তুমি চুপ কর না যতীন। ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়, এটি হল আমাদের বুকের ইঙ্গিত নাটকের ধুর্ত্তর গোড়ার কথা।

যতীন। এবং এটি হল একদম শেষেরও কথা।

সুরেনবাবু। আহা, তুমি থামোনা যতীন। আপনি দেখবেন নীতিনবাবু, চতুর্থ অঙ্কে নারী জাগরণের নিন্দে করে কতবড় ধুত্তোর বক্‌তাই রয়েচে আর—

যতীন। আর স্বদেশপ্রেমের একেবারে পুংসবন বয়ে গেছে মশাই—

সুরেনবাবু। আর ধুত্তোর পুংসবন নয়, পুংসবন নয়, প্রস্রবন।

যতীন। ঐ হল হল হল প্রস্রবন ও দুয়ের মানে তো। একই।

নীতিনবাবু। তা যেন হল। কিন্তু, কিন্তু, আমি জানতে চাই দেশের এই দারুন দুর্ভিক্ষের দিনে আপনারা কিনা টিকিট করে থিয়েটার করচেন,—একাটা দেশের লোকের হাতে থাকলে তারা খেয়ে বাঁচত। আমি জানতে চাই (লাঠি ঠক্‌ঠকাইয়া) দুর্ভিক্ষ আর দুর্নীতি, আর দুর্নীতি আর দুর্ভিক্ষ (লাঠি ঠক্‌ঠকাইয়া) আমি জানতে চাই—

[ভৃত্য হাবুল ছুটিয়া আসিল]—।

হেবো। আরে করেন কি, করেন কি ম'শয়! অমন ঠক্‌ঠকিয়ে লাটি ঠুক্‌বেননি বাবু! হাফিজুদ্দিনের জামরুল কাঠের তক্তপোষ উটা, একেবারে ঘুণধরা,—সেটিতো বাবুর খেয়াল নেই। যদি মচাৎ করে ভেঙ্গে যায়; তো পড়ে গিয়ে তোমার ঠ্যাং ভাঙবে হুজুর, হাঁ তা বলে দিনু। আপনার, ঠ্যাংটিও যাবেক্, আর তার ওপর হাফিজুদ্দিন মিঞা তেনার তক্তাপোষের দামটিও আদায় করে লিবে; সেটি যেন মনে থাকেন হুজুর, হুঁ।

নীতিনবাবু। (তড়াক করিয়া তিনহস্ত পিছাইয়া) অ্যাঁ, বলিস কিরে ব্যাটা!

সুরেনবাবু। হেবো, তুই নিজের কাজে যা। (হেবোর প্রস্থান) নীতিনবাবু, টিকিট বিক্রীর টাকাটা যে ধুত্তোর বন্যার সাহায্যেই যাবে।

নীতিনবাবু। তাতে কি দুর্ভিক্ষ্য কমবে মশাই! আমি কাগজে এখুনি এক প্যারা লিখতে চল্লুম—(গমনোদ্যত)

সুরেনবাবু। আরে ধুত্তোর ও নীতিনবাবু, আপনাকে ধুত্তোর টিকিট কিনতে হবে না। আপনার কাছে কি আমরা টাকা নিতে পারি!

নীতিনবাবু। (ফিরিয়া) ওঃ, তাই বলুন। তাহলে, তাহলে তো এর মধ্যে কোন দুর্নীতি—তেমন—দেখতে পাচ্ছিনা।

(গমনোদ্যত)

সুরেনবাবু। দাঁড়ান, একটু ধুত্তোর চা খেয়ে যান। ওরে হেবো, হে—বো এই দেখ, কাজের সময় ব্যাটার চুলের ধুত্তোর টিকিটি দেখা যায় না।

নীতিনবাবু। থাক, থাক, আমি সীটে গিয়ে বসি তো, চাটা ওখানেই পাঠিয়ে দেবেন। আপনি আর অমন ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাবেন না। (নামিয়া গিয়া দর্শকদের মধ্যে বসিলেন)

সুরেনবাবু। (গম্যমান নীতিনবাবুর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাবেন না! আমাকে ষাঁড় বলা! ব্যাটা হামবাগ, ব্যাটা ধুত্তোর—

[সুরেনবাবু চায়নীর ভূমিকায় নামিবেন, সেইজন্য ধুতির উপর ঘাগরা পরিতে লাগিলেন]

[হাঁফাইতে হাঁফাইতে পিছনদিক হইতে যাদব সাজঘরে প্রবেশ করিল]

যাদব। সুরেনবাবু, ও সুরেনবাবু—এই যে (ঘাগরা পরিহিত সুরেনবাবুকে দেখিয়া) হি হি হি হি, আপনাকে আর চেনাই যায় না সার। ঘাগরা পরেচেন কিনা। কিন্তু (ক্রন্দনের সুরে) সর্বনাশ হয়েচে সার—

সুরেনবাবু। কি, কি, কি, আবার ধুত্তোর হল কি—

যাদব। ফুলশুদ্ধ গোলাপ গাছ পাওয়া যাচ্ছে না সার।

সুরেনবাবু। এঁ্যা?

যাদব। সেই যে পঞ্চমদৃশ্যে আছে না সার, বেগমের সখীরা আধফোটা গোলাপ তুলতে তুলতে নাচছেন—

সুরেনবাবু। ওঃ এই। আমি বলি কি না কি। আরে গোলাপ ফুল না পাওয়া যায় ধুত্তোর ভাঁট ফুল দিয়ে দিও।

যাদব। কিন্তু এত রাত্রে গোলাপ গাছই বা পাই কোথা সার—

সুরেনবাবু। কেন, আগে থেকে যোগাড় করে রাখতে পার না সব। বিয়ের সময় কণে বলে ধুত্তোর—

যাদব। আজ্ঞে বড্ড ভুল হয়ে গেছে সার—

সুরেনবাবু। তা এক কাজ কর। ধাঁ করে আমার বাড়ী থেকে ধুত্তোর কতকগুলা গাঁদাল গাছ তুলে আন।

যাদব। আজ্ঞে, গাঁদাল গাছে ভাঁট ফুল সার—(মাথা চুলকাইতে লাগিলেন)।

সুরেনবাবু। ওতেই হবে, ওতেই হবে, যাও, যাও—

(যাদব চলিয়া গেল)

[এক সঙ্গে সোরগোল করিতে করিতে রমেন রবীন ও বারীন রঙ্গমঞ্চের নীচে দর্শকদের বসিবার জায়গার সামনে উপস্থিত হইল, এবং গোলমাল করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া সাজ ঘরের উপর চড়াও হইল]

তিনজনে একসঙ্গে। দেখে নেব, দেখে নেব, দেখে নেব। প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই।

(এমন সময় প্রবল ভাবে হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল)

তিনজনে এক সঙ্গে। সুরেনবাবু কই, সুরেনবাবু, সুরেনবাবু, সুরেনবাবু—

[সুরেনবাবু এতক্ষণে চারনীর ঘাগরা পরিয়া ফেলিয়াছেন। বুকে কাঁচলী আঁটিতেছেন]

সুরেনবাবু। কি, কি, কি হে। থামাও না ধুত্তোর হারমোনিয়াম। (হারমোনিয়াম থামিল)

রবীন। হি হি হি, যে ঘাগরা কাঁচুলি পরেছেন, আপনাকে আর সুরেনবাবু বলে চেনাই যায় না। মনে হচ্ছে যেন কোনো ভুঁড়িওয়ালী মাড়োয়ারনন্দিনী গঙ্গা-স্নানে চলেছেন। হি হি, হি, হি।

রমেন। রবীন তুমি হাসি রাখ, এখন হাসবার সময় নয়। সুরেনবাবু, এত কষ্ট করে আমি যে কীবলু খাঁর পার্ট মুখস্থ করলুম, ফিলিং, দিয়ে মোশান দিয়ে, জেসচার দিয়ে, পসচার দিয়ে,—আর শেষে কিনা আমাকেই মশাই বাতিল! কে জানে ঐ কিরণ, কি জানে ও পার্টের—who is he!

সুরেনবাবু। আহা-হা-হা-হা-হা—

রবীন। রাণী সাহেব বলে আমার অমন সুধর তেজী গোঁফ জোড়াটাই কামিয়ে ফেললুম মশাই,—আমার অমন যুগল ভোমরার মতো নধর গোঁফ, আর সেই আমাকেই কিনা গেট্ আউট। (বুক ঠুকিয়া) আমার গোঁফও গেল, পেটও ভরল না!

সুরেনবাবু। আহা-হা-হা-হা-হা—

বারীন। রাখুন আপনার আহা উহু। আপনার আহা উহুতে চিঁড়ে ভেজে না মশাই। তড়বড়ি সিংএর পার্ট মুখস্থ করতে যা খাটনটি খেটেচি মশাই তেমন খাটলে আর আমায় তিন তিনবার আই, এ ফেল করতে হত না। পার্ট যেন আমার মধ্যে সেধিয়ে গেছল দাদা, সেঁধিয়ে গেছল। (বুক ঠুকিয়া ও গো গো—)

সুরেনবাবু। আরে ধুত্তোর—

রমেন। আবার ধুত্তোর! এবার যদি ধুত্তোর বলেন তাহলে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা হব মাশই। (গাঢ়স্বরে) রাত্তিরে স্বপ্নের ঘোরে প্রাণের গভীর আবেগে বার তুত্তিন যেমন বলে ফেলেচি রাবেয়া, প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,—অমনি আমার দ্বিতীয়পক্ষের পরিবার মার মুখো হয়ে রিক্স করে বাপের বাড়ী চলে গেল মশাই,—বুঝলে না তো যে ওটা আমার পার্টের চতুর্থ অঙ্কে আছে। এখন আমি পথে পথে পরিবার হারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। (বুক ঠুকিয়া) কেন মশাই?

সুরেনবাবু। লক্ষ্মী ভাই সব, রাগ কোরো না, আসচে বারে নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল ভাল পার্ট দেব। যাও তোমরা দর্শকদের সঙ্গে গিয়ে বোসো। আমার কথার নড়চড় হবে না। আসচে বারে নিশ্চয়ই দেব। (ওড়না গায়ে জড়াইতে জড়াইতে) সুরেন মিত্তির আর কিছু না হোক, এটা ঠিক যেন, যে সে একটি আসল খাঁটি—(ওড়না জড়াইয়া গেল, ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে)—ধুত্তোর।

(উহারা তিনজন ঘাড় গোঁজ করিয়া নামিয়া গিয়া দর্শকদের মধ্যে বসিল)

(সুরেনবাবু দাড়ি কামাইবার জন্ম মুখে এক মুখ সাবান ঘসিয়াছেন, এমন সময় সাজঘরের যে কোণে সব পোষাক দড়িতে ঝুলিতেছিল তাহা হাঁটকাইতে হাঁটকাইতে কিরণ চীৎকার করিয়া উঠিল—)

কিরণ। ও মশাই, ও সুরেনবাবু,—একি সর্ব্বনাশ—

সুরেনবাবু। কি, কি, কি, আবার হল কি! আমি যে আর ধুত্তোর সামলাতে পাচ্ছি না।

কিরণ। পেন্টুলুন পাওয়া যাচ্ছে না।···চক্ষু অমন ছানাবড়া করচেন কি মশাই, বুঝতে পারচেন না, পেন্টুলুন,

পেণ্ট্লুন পাওয়া যাচ্ছে না। পেণ্ট্লুন না পাওয়া গেলে আমি কীবলু খাঁর পার্ট করব কেমন করে মশাই ?

সুরেনবাবু। কেন পেণ্ট্লুন তো ছিল। যাবে আর কোথায়, ঐ দড়িতেই ধুত্তোর ঝুলচে। ভাল করে দেখ।

কিরণ। তিনবার বার দেখেচি মশাই। এমন ঝঞ্ঝাট হবে জানলে কোন্ তালোব্য শ য় আকার ড্যাস এই পাড়াগাঁয়ে থিয়েটারে প্লে করতে রাজী হয়। বিনা পেণ্ট্লুনে কীবলু খাঁর পার্ট প্লে করতে নামলে শুধু আমার মান মর্য্যাদা রসাতলে যাবে না, পুলিসে ধরবে যে, সে খবর রাখেন মশাই !

সুরেনবাবু। না, না, রাগ কোরো না। যাদব জানে, যাদবকে একবার ডাকত, ওরে ধুত্তোর হেবো, হে—বো—

(নেপথ্য হইতে হেবো) আজ্ঞে যা—ই।

(হেবো আসিয়া দাঁড়াইল, চট্ করিয়া এক বাণ্ডিল বিড়ি চুরি করিয়া ট্যাকে গুঁজিয়া ফেলিল।)

হেবো। এজ্ঞে কি বলতিচ বাবু।

কিরণ। (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে) এখানে দড়িতে পেণ্ট্লুন ঝুলছিল। ভেল্‌ভেটের পেণ্ট্লুন। তা, বেটার যা হাত টান, তুই নিস্‌নি ত ?

হেবো। দোহাই মা চণ্ডীর। হেবোকে কুঁড়ে বলতে পারো, বোকা—হাঁ, একটু ঈষৎ বোকা বলতে পার কিন্তু হেবোকে চোর বলতে পারবে না হেঁ হেঁ—

(প্রস্থান)

(এক বোঝা গাঁদাল পাতা ঝপাৎ করিয়া মেঝেতে ফেলিয়া যাদব প্রবেশ করিল)

যাদব। গাঁদাল পাতা নিয়ে এলুম কিন্তু ভাট ফুল পাওয়া যাচ্ছে না সার।

সুরেনবাবু। ধুত্তোর গাঁদাল পাতা। কীবলু খাঁর পেণ্ট্লুন পাওয়া যাচ্ছে না—সেই যে ধুত্তোর ভেল্‌ভেটের পেণ্ট্লুন—

যাদব। ঐ যাঃ, ভয়ানক ভুল হয়ে গেচে সার—সেটাকে ধোপার বাড়ী দেওয়া হয়েছিল। তারপর পেণ্ট্লুনের কথা একেবারে ভুলে গেছলুম। ভাগ্যিস্ আপনি মনে করিয়ে দিলেন সার।

সুরেনবাবু। তা ধোপার বাড়ী এখ্খুনি লোক পাঠাও—

যাদব। ধোপার বাড়ী এখান থেকে ঝাড়া তিন ক্রোশ।

সুরেনবাবু। হোক গে তিন ক্রোশ, বাইকে করে লোক পাঠাও—

যাদব। এত রাত্রে ধোপার বাড়ী গেলে সে গাধা লেলিয়ে দেবে সার।

কিরণ। কিম্বা গাধা মনে করে তোমাকে খোঁটায় বেঁধে রেখে দেবে।

যাদব। আজ্ঞে না, সে আপনি গেলে হতে পারে। আপনি যা চেঁচান।

সুরেনবাবু। আরে কি তোমরা মস্করা করচ। এর একটা উপায় তো করতে হবে—

যাদব। উপায় একটা হবেই সার। দর্শকদের মধ্যে দু' একজন ডাক্তার টাক্তার নিশ্চয়ই এসেচেন। হয়েচে, হয়েচে, ঐ যে রামবাবু ডাক্তার। রামবাবু, ও রামবাবু, একটিবার দয়া করে এখানে উঠে আসুন তো সার।

(কোটপ্যাণ্ট পরিহিত রামবাবু ডাক্তার দর্শকদের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

রামবাবু। ওখানে আর যেতে পারব না। কি দরকার ওখান থেকেই বল, শুনি।

যাদব। আজ্ঞে আপনার পেণ্ট্লুনটা সার যদি দয়া করে খুলে দিতে পারেন। আমাদের বড্ড বিপদ সার, কিবলু খাঁর পেণ্ট্লুন পাওয়া যাচ্ছে না। পেণ্ট্লুন দিয়ে আমাদের উপকার করুণ সার।

রামবাবু। বাঃ, বাঃ, কি কথাই বললে। যত সব ফক্কোড় ইয়ার ছোকরা, চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি! (বসিলেন)।

(একটি পুরাতন পেণ্ট্লুন লইয়া নরেন সাজ ঘরে প্রবেশ করিল)

যাদব। এই যে নরেন, তোমার হাতে ওটা কি ?

নরেন। পেণ্ট্লুন।

যাদব। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উল্লসিত কণ্ঠে) পেণ্ট্লুন! (নরেনের গলা জড়াইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গানের সুরে) পেণ্ট্লুন আনি মোদের বাঁচালে নরেন, পেণ্ট্লুন আনি মোদের বাঁচালে নরেন।

নরেন। তোমাদের গোলমাল শুনেই আমি বাইকে করে পেণ্ট্লুনের খোঁজে গেলুম। যার কাছেই যাই সেই বলে, সে কি ভায়া এত রাত্তিরে পেণ্ট্লুন কি করবে! কেউ কেউ আবার রসিকতা করে বললে, ভায়ার কি বস্ত্রহরণ হয়েচে নাকি!

যাদব। তা পেণ্ট্লুন পেলে কোথা ?

নরেন। ঐ যে ধুমসো মোটা বিশ্বম্ভরবাবু, গেলুম তাঁর কাছে। তিনি বললেন আঠারো শো আটাত্তর সালে তিনি যখন ছোট তরফের আমমোক্তার হন তখন সদরে মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির করতে হবে বলে একটা পেণ্ট্লুন

গড়িয়েছিলেন। এখন তাতে ধান রাখা হয়। ধান উজাড় করে পেণ্টুলুনটা দিলেন। কিন্তু এতে কি হবে—

কিরণ। আরে বিশ্বম্ভর বাবুর পেটটির ওজনই তো সাড়ে আটাত্তর মন। তাঁর পেনটুলুন আমার পক্ষে যেমন বড় হবে যে—

সুরেনবাবু। আহা-হা-হা—চেষ্টা করে দেখই না। একটু মুড়ে টুড়ে—ধুত্তোর ফিতে টিতে দিয়ে বেঁধে। যাও, যাও, ও নিয়ে আর গণ্ডগোল কোরো না।

কিরণ। (পেণ্টুলুন হাতে লইয়া) আঃ, আচ্ছা ঝকমারি করেচি বাবা—আমি হলুম পাবলিক থিয়েটারের আক্টর—

(পেণ্টুলুন লইয়া এককোণে চলিয়া গেলেন)

(আবার খুব জোরে হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল, খুব গোলমাল হইতে লাগিল)

ওরে চা নিয়ে আয়—

আঃ, বিড়ির প্যাকেটটা আবার কে নিলে ?

হেবোর কাজ। ও হেবো, হে—বো।

আঃ, থামাও হারমোনিয়াম, কিচ্ছু যে শোনা যাচ্ছে না।

(হারমোনিয়াম থামিল)

(দর্শকদের মধ্য হইতে রমেন প্রভৃতি প্রবল-ভাবে গোলমাল করিয়া উঠিল)

রমেন। কী মশায়, আজ সমস্ত রাত ধরে শুধু গ্রীণ-রুমের জটলাই চলবে নাকি। বলি প্লে কি হবার কোনো আশা নেই।

রবীন। আপনারা ত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিকে ছারপোকার কামড়ে আমরা মারা গেলুম। আমাদের পৈতৃক দেহটা ছারপোকার হাত থেকে বাঁচান। ঐ রসিক কুণ্ডুর দাদের মলমই না হয় অনুগ্রহ করে খানিকটা পাঠিয়ে দিন না, মারা গেলুম যে।

নীতিনবাবু। কই আমার চা তো এখনো এসে পৌছালো না, এই যে বল্লেন এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বারীন। না হয় একশিশি রেলের পাঁচনই পাঠিয়ে দিন না মশাই, কজনে মিলে তাই খাই।

(এমন সময় ঢং ঢং করিয়া দুই ঘণ্টা বাজিল)

রমেন। আরে ঘণ্টা তো সেই সন্ধ্যা থেকে হরদমই বাজচে। বলি প্লে সুরু হবে কখন ?

রবীন। আমরা ঘণ্টা শুনতে আসিনি মশাই, প্লে শুনতে এসেচি, আশা করি সেটা আপনাদের মনে আছে।

নীতিনবাবু। আর আমার চা টা—

[সাজঘরে ভীষণ তাড়া পড়িয়া গেল। সকলে সকলকে বলিতে লাগিল ওহে তাড়া-তাড়ি নাও, তাড়াতাড়ি নাও, অডিয়েন্সকে আর রাখা যাচ্ছে না, ইত্যাদি]

যতীন। (বই দেখিয়া) প্রথম দৃশ্যে রাজা তড়বড়ি সিং, রাজ্ঞী চকমকি দেবী, চারনী, প্রহরী ও কাবল খাঁ। নাও হে নাও, তোমরা তৈরী হয়ে নাও। ওহে তড়বড়ি সিং তুমি প্রথমে একলা গিয়ে ষ্টেজে বসে থাক। এখুনি থার্ডবেল বাজাবো। সুরেনবাবু, খুব সাবধান। খবরদার, প্লে করবার সময় যেন ধুত্তোর ধুত্তোর করবেন না। কতবার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি।

সুরেনবাবু। না হে না, তা আর বলতে।

[যিনি তড়বড়ি সিং সাজিয়াছেন তাঁহার মাথার পাগড়ী পর্ব্বতপ্রমাণ বৃহৎ হইয়াছে, টলমল করিতেছে, সামলানো দায়।]

তড়বড়ি সিং। ওহে পাগড়ীটা বড্ড ঢল ঢল করচে, সামলানো দায়। একটু টাইট করে বেঁধে দিলে হত।

[তিনি ষ্টেজে গিয়া বসিলেন]

কাবুল খাঁ ওরফে কিরণ। বিশ্বম্ভর বাবুর পেণ্টুলুন তো পরেচি কোনো রকমে, কোমরে পায়ে ফিতে বেঁধে। আমায় কেমন দেখাচ্ছে কে জানে !

যতীন। নাঃ আর দেরী একেবারে নয়। নাও, তোমরা সবাই তৈরী হয়ে নাও, আমি এখখুনি থার্ডবেল বাজাবো। দ্বারিক হল সিন-শিফ্টার। ওহে দ্বারিক, দ্বারিক কোথায় গেল, ও দ্বারিক, ও দ্বা-রিক।

[দ্বারিক সিনের দড়ি ধরিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। সে 'শ' 'ষ' এবং 'স' সমস্তই উচ্চারণ করে ইংরাজী 'S' এর মত।]

দ্বারিক। কি বোলচেন বলুন না মোস্শাই, হাঁকাহাঁকি করচেন কেন ?

যতীন। নাও, কোসে শক্ত করে সীনের দড়ি ধরে থাক। যেমন থার্ডবেল বাজাবো, অমনি ড্রপসীন ওঠাবে।

দ্বারিক। আমি তো সেই সাড়ে সাতটা সন্ধ্যে থেকে সণ্ডের মতন রশি ধরে দাঁড়িয়েই আছি মোস্-সাই, আপনা-দের থণ্ডো বেল যে আর বাজবে সে আশা নেই মোস্-সাই।

যতীন। এই যে বাজাচ্ছি, বাজাচ্ছি। কই, কই ঘণ্টা বাজাবার কাঠিটা কই, গেলো কোথায়। নিশ্চয় হেবো ব্যাটা চক্ষুদান দিয়েচে। বেটা এমন চোর, দেশলায়ের কাঠি থেকে বারুদটা চেটে মেরে দেয় মশাই— ওরে হেবো, হে—বো !

[সাজ-ঘরে আবার গোলমাল, সকলে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ওহে ঘণ্টা

বাজাবার কাঠিটা দেখেছ, এইখানেই তো ছিল—ইত্যাদি]।

(দর্শকদের মধ্য হইতে নীতিনবাবু তাঁহার লাঠিটা আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন)

নীতিনবাবু। অ-অ-অ মশায়, অ-যতীনবাবু, কাঠি খুঁজে পাচ্ছেন না, নিন আমার লাঠিটা দিয়েই বাজিয়ে দিন। কিন্তু দোহাই, লাঠিটা আবার যেন ফিরে পাই। যে আপনাদের হোবো চাকর।

যতীন। (লাঠি লইয়া)। থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্।

(ঢং ঢং করিয়া তিনবার ঘণ্টা বাজিল। লাঠি ফিরাইয়া দিলেন)

নীতিনবাবু। আমার চা টা—

যতীন। এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরে হেবো—

নীতিনবাবু। হেবো! তবেই হয়েচে। তার হাত দিয়ে চা পাঠালে পেয়ালা পিরিচটাও লোপাট হয়ে যাবে।

(অতিকষ্টে অনেক ধস্তাধস্তির পর ড্রপসীন এ দিকে বাঁকিয়া ওদিকে বাঁকিয়া খানিকটা উঠিয়া উপরে তাল পাকাইয়া গেল। দ্বারিক হেঁইও হেঁইও করিয়া দড়ি টানিতে থাকিলেও আর উঠানো গেল না)।

দ্বারিক। শালার ড্রপটো সবটা উঠতে চাইচে না মোল্-সাই।

যতীন। থাক থাক, যা উঠেচে বেশ উঠেচে। ওতেই হবে।

(ড্রপসীন উঠিলে দেখা যাইবে তড়বড়ি সিং প্রকাণ্ড পগ্‌গড় পরিয়া কাঠের চেয়ারে বসিয়া হাত মুখ মাথা ঈষৎ নাড়িতেছেন। যতীনের প্রম্পটিং খুব অস্পষ্ট শোনা যাইবে)

তড়বড়ি সিং। (ঘোরতর ভাবে অতি-অভিণয়ের ভঙ্গীতে) আমার রাজ্যের চতুর্দিকে শত্রু ঘিরেছে, চতুর্দিকে শত্রু। ওঃ, আমি এখন কি করি, কি করি, কী ক—রি! মা, মাগো, দেশমাতৃকা আমার, আমি যে আশায় বুক বেঁধে আছি মা! উঠবে উঠবে! ঐ হিমাচল কিরীটিনী সমুদ্র-মেখলা ভূতধাত্রী রত্নগর্ভা জন্মভূমি আবার প্রচণ্ড বিক্রমে জেগে উঠবে। বলে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে—আমার নিদ্রা জাগরণের স্বপ্ন আমার কানে কানে বলে যাচ্ছে—কী বলে যাচ্ছে? না, এই বলে যাচ্ছে যে তড়বড়ি সিং, তড়বড়ি সিং, তুমি খোড়বড়ি খাড়া নও,—বলে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে। (এই-খানে প্রম্পট্ করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত যতীন ভাবের আবেগে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী করিয়া—যেন সে নিজেই অভিনয় করিতেছে এইভাবে—খানিকটা ষ্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া আসিবে এবং সম্বিৎ লাভ করিয়া সলজ্জে পিছাইয়া যাইবে) হে আমার অসি! তোমার প্রাণ ভরিয়ে রক্তপান করাব। (যেমন খাপ হইতে তরোয়াল বাহির করিলেন অমনি বহুকালের জরাজীর্ণ টিনের তরোয়াল ধনুকের মতো বাঁকিয়া গেল। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া) হো করাল বদনে, তোমার আলিঙ্গনে জীবন্ত নরমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়ে ভূমি স্পর্শ করবে।

(দর্শকদের মধ্য হইতে) রমেন। তোমার তরোয়াল যে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে দাদা। নরমুণ্ড কেন, একটা টিকটিকির মুণ্ডও ওতে খসবে না।

(হাসি, বিদ্রূপ, ও সঙ্গে সঙ্গে order, order)

(তড়বড়ি সিং লজ্জিতভাবে তরোয়াল ফেলিয়া দিলেন)

তড়বড়িসিং। যারা আমার মাতৃভূমিকে কলুষিত করেচে তাদের রক্ত চাই, রক্ত চাই! তাজা উত্তপ্ত রক্ত!

(দর্শকগণের মধ্যে) নীতিনবাবু। থামো, থামো, আমি বলচি থামো। জানো এর নাম সিডিশন, জানো এর নাম সন্ত্রাসবাদ প্রচার!

(জনকয়েক দর্শক একসঙ্গে)। পুলিস, পুলিস, পুলিস ডাকো। দাও ধরিয়ে বেটাদের।

যতীন। সর্বনাশ করেচে। (তড়বড়িসিংকে) অমন জবু থবু হয়ে সঙের মতো আছ দাঁড়িয়ে কেন। বলে যাও, আমি যা বলচি, বল—(প্রম্পটিং চলিতে লাগিল)

তড়বড়িসিং। (যতীনের প্রম্পটিং মত) রক্তটক্ত সব রূপক সব রূপক। এ হল আমার অসহযোগ অসি, অহিংস অসহযোগ অসি।

(দর্শকগণের মধ্য হইতে) নীতিনবাবু। ওঃ অহিংস অসহযোগ অসি, বটে! রক্ত টক্ত সব রূপক, বটে? তাহলে আর সিডিশন হয় না। রুলিং রয়েছে।

রমেন। অহিংস অসহযোগ টোগ বইয়ে নেই, শ্রেফ বানিয়ে বলেচে।

(সাজঘরে চারণীর পোষাক পরিহিত সুরেনবাবু যতীনকে জড়াইয়া ধরিলেন)

সুরেনবাবু। খুব বাঁচিয়ে দিয়েচ ভাই, নইলে এখুনি ধুত্তোর পুলিস—

যতীন। যান যান আর দেরী করবেন না, এখুনি আপনাকে ষ্টেজে যেতে হবে। (সুরেনবাবু গমনোদ্যত) আর দেখুন, খবরদার ধুত্তোর ধুত্তোর করবেন না।

(ষ্টেজে চারণীবেশী সুরেনবাবুর প্রবেশ)

(যতীনের প্রম্পটিং অস্পষ্ট শোনা যাইবে)

তড়বড়ি সিং। কি সংবাদ চারণী? (প্রম্পটিং ভাল শুনিতে না পাইয়া যতীনের দিকে মুখ ফিরাইয়া) এঁ্যা?— ও হ্যাঁ হ্যাঁ—হলদিগড়ের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত তো?

রমেন। তবে যে বললে অসহযোগ আমি?

(চোপ, চোপ, order, order)

চারণী। মহারাজ, রাজপুত সৈন্য বাহিনীকে ধুত্তোর—(জিভ কামড়াইয়া) কখনো প্রস্তুত থাকতে হয় না। তারা সর্বদা আপনা থেকেই প্রস্তুত। শোনোনি মহারাজ, তোমার পূর্ব পুরুষ বাপ্পারাওএর কাহিনী! এখন সমস্ত নির্ভর করচে তোমার ওপর।

তড়বড়ি সিং। আমার ওপর? কেন চারণী, আমাকে এরূপ অবিশ্বাস করবার হেতু?

চারণী। হেতু? শুনবে কি মহারাজ? বলব কি তবে? শোনো তুমি। (অতি-অভিনয়ের ভঙ্গীতে খুব টানিয়া টানিয়া) আর শোনো তোমরা আকাশের যত তারা,—নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাটির মতো তোমরা মানুষের কলঙ্ক কাহিনী শুনে যাও,—কেঁপ না, ধ্যানস্তিমিত আঁখি তোমাদের নিমিলিত কোরো না—মহারাজ, তুমি, তুমি (বার তিনেক 'ধুত্তোর' বলিবার প্রবৃত্তি অতি কষ্টে দমন করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া) তুমি—ধুত্তোর—স্ত্রৈণ।

(দর্শকদের মধ্য হইতে) নীতিনবাবু। ক্যাপিট্যাল্। খাসা অ্যাকটিং করচে হে।

তড়বড়ি সিং। কী, কী, আমি স্ত্রৈণ!

চারণী। মহারাজ, সত্য কি এ অপবাদ কোনোদিন তোমাকে বিচলিত করবে না! আজো কি তোমায় বিচলিত করবে না! তোমার প্রণয়শয্যা হতে ওঠো মহারাজ, ছিঁড়ে ফেল ঐ কুসুমদাম, বাসর সজ্জা পরিত্যাগ করে রণসজ্জা কর মহারাজ!

তড়বড়ি সিং। স্তব্ধ হও চারণী! (যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া চেয়ার হইতে উঠিলেন অমনি টলটলায়মান পাগড়ী ধপাৎ করিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল) (নিম্নস্বরে) যাঃ, ঘোড়ার ডিম, পাগড়ী পড়ে গেল।

চারণী। মহারাজ, মহারাজ, শান্ত হোন্।

তড়বড়ি সিং। শান্ত হব! তোমার এই কদর্য্য ভাষণের জন্যে এই দণ্ডে যদি তোমার মৃত্যুর আদেশ দিই!

চারণী। মহারাজ, চারণী অবধ্য।

তড়বড়ি সিং। তবে বন্দী কর। এই কে আছ চারণীকে বন্দী কর।

(একদিক হইতে প্রহরী, অপর দিক হইতে রাজ্ঞী চকমকির বেগে প্রবেশ)

চকমকি দেবী। না বন্দী কোরো না। আমার আদেশ। আমি এ রাজ্যের রাণী চকমকি দেবী।

(প্রহরীর প্রস্থান)

চকমকি দেবী। (নাকি সুরে) মহারাজ, এই তুচ্ছ, এই অতি সামান্য নারীর জন্যে তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে! এ আমি সইব না, এ আমি সইতে পারব না। সীতা সাবিত্রীর কুলে আমার জন্ম, আমি বীরের রমণী। আমার স্বামী বিপদকালে বাসর শয্যায় কালহরণ করে না, সমরাঙ্গন তার লীলাভূমি।

তড়বড়ি সিং। আমি তোমার এমনি অসহ্য হয়েছি রাণি!

চকমকি দেবী। (নাকি সুরে) মহারাজ যদি জানতে, যদি বুঝতে—

তড়বড়ি সিং। যদি কি জানতুম, যদি কি বুঝতুম রাণি?

চকমকি দেবী। (অতি-অভিনয়ের ভঙ্গীতে) মহারাজ, চিরদিন কি দুঃখের দাবাগ্নি জ্বলচে এ বুকে। আমি তোমার সহধর্মিণী, উচ্চ হতে উচ্চতর মহত্বের শিখরে তোমায় নিয়ে যাবো,—এই না আমার ধর্ম, এই না আমার ব্রত? কিন্তু, কিন্তু মহারাজ, আমি আজ কি হয়েছি! (ক্রন্দনের অভিনয়ে) আমি তোমার কামনায় ইন্ধন জুগিয়েচি মাত্র, আমি তোমার রজনীর নর্ম-সহচরী মাত্র—আমি তোমার—

(দর্শকগণের মধ্য হইতে) নীতিনবাবু (লাফাইয়া উঠিয়া) চোপ, চোপ, চোপরও! এ অশ্লীল, অতীব অশ্লীল। তবে যে বললে এ নাটকে অশ্লীলতার কিচ্ছু নেই।

[এমন সময় হেবো এক পেয়ালা চা লইয়া আসিয়া নীতিন বাবুকে কহিল]

হেবো। বাবু, এই লিন আপনার চা লিন বাবু। অমন লাফালাফি করতিচেন কেনে বাবু? লিন্ ঠাণ্ডা হয়ে ঠাণ্ডা চা খান।

নীতিন বাবু। ওঃ, বেশ বেশ। (শান্ত হইয়া বসিলেন) কি বললি ঠাণ্ডা চা!

চকমকিদেবী। মহারাজ আর আমি সহ্য করতে পারচি না। দিনরাত এই কুৎসার গর্জ্জন। তাই বিদায় নিতে এসেচি। আজ বিদায় দাও রাজা (মাথা নীচু করিয়া তড়বড়ি সিংএর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলেন)

তড়বড়ি সিং। একি, একি, ওঠো ওঠো।

[চকমকি দেবী প্রণাম সারিয়া যেমন উঠিলেন, দেখা গেল পরচুলা মাটিতে পড়িয়া গেছে এবং তাঁহার নিজের ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা চুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে]

চকমকি দেবী। মহারাজ আমি এখনি আত্মহত্যা করব।

(দর্শকদের মধ্য হইতে) রমেন। ছিঃ ভায়া, অত অবুঝ হয়ো না, সামান্য পরচুলা খসে গেছে বলে কি আত্মহত্যা করতে আছে!

(প্রবল হাস্য, গোলমাল, "order, order")

যতীন। বলে যাও, বলে যাও,—দাঁড়াও রাণী, আত্মহত্যা মহাপাপ। চারণী ও তড়বড়ি সিং উভয়ে। দাঁড়াও রাণী আত্মহত্যা মহাপাপ।

যতীন। আঃ, দুজনে নয়, দুজনে নয়! শুধু চারণী বলবে।

চারণী। দাঁড়াও রাণী আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমায় আত্মঘাতিনী হতে হবে না মা। তুমি নিষ্পাপ, তুমি দেবী, তুমি জননী। মা, আমি তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্রতা সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু মহারাজ ও দেশমাতৃকার মাঝে তুমি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। তাই আমি তোমায় হত্যা করি। (কোমর হইতে পিস্তল লইয়া দুম্‌ করিয়া আওয়াজ করিলেন)

(পিস্তলের আওয়াজ সত্বেও চকমকি দাঁড়াইয়া রহিলেন)

যতীন। (চকমকিকে লক্ষ্য করিয়া হাত পা ছুড়িয়া) আরে পতন ও মৃত্যু, পতন ও মৃত্যু।

চকমকি দেবী। (জিভ্‌ কাটিয়া নিম্নস্বরে) ওঃ, পতন মৃত্যু।

(এই বলিয়াই ধপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন)

তড়বড়ি সিং। ও হো হো, আমার বুক ফেটে গেল, আমার বুক ফেটে গেল।

(চারণীবেশী সুরেনবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে সাজঘরে আসিলেন। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—।

সুরেনবাবু। কেমন প্লে করলাম হে, কেমন লাগল?

দ্বারিক। সুন্দর অ্যাক্টো করেচেন মোস-সাই। সত্যি বলচি। সুন্দর হয়েচে মোস-সাই। একটা সিগরেট আছে মোস সাই?

(সুরেনবাবু খুসী হইয়া দ্বারিককে একটা সিগারেট দিলেন)

(এদিকে অভিনয় চলিতে লাগিল, ওদিকে সুরেনবাবু তাঁহার মাথার চুল, ওড়না, কাঁচুলী খুলিয়া ফেলিয়া দাড়ি গোঁফ আঁটিতে লাগিলেন, কারণ এখনি তাঁহাকে ঋষি সাজিতে হইবে।)

(রঙ্গমঞ্চে বেগে প্রহরীর প্রবেশ। তড়বড়ি সিংএর মূক শোকাভিনয়)

প্রহরী। মহারাজ, (হঠাৎ স্তম্ভিত) হইয়া একী নিদারুণ দৃশ্য। রাজ্ঞী নিহতা, মহারাজ শোকে উন্মাদ! হায় ভগবান, এ দৃশ্য দেখাবার জন্তেই কি তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলে! ও হো হো হো—(এই বলিয়া শোকের অভিনয় করিতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া যেমন চোখ মুখ মুছিলেন, অমনি হস্তের স্পর্শ লাগিয়া দক্ষিণ দিকের কৃত্রিম গুম্ফাংশ ওষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া খসিয়া গেল। বামদিকের অংশটি কিন্তু আটকাইয়া রহিল।)

তড়বড়ি সিং। ওহে, তোমার—(অঙ্গুলি দ্বারা গোঁফের দিকে ইঙ্গিত করিলেন)

(দর্শকগণের মধ্য হইতে) রমেন। বাহবা কি বাহবা। এযে হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা।

(প্রবল হাস্য, গোলমাল ও order, order! প্রহরী বাকি অর্দ্ধেকটা গোঁফ সরাইয়া ফেলিয়া দিল)

যতীন। কী রকম ড্রেসার হে! গোঁফ দাড়ি পরচুলা সব ফস্‌ ফস্‌ খুলে যাচ্ছে!

দ্বারিক। সাড়ে তিনটাকার মজুরির ড্রেসার আর কত ভাল হবে মোস-সাই।

সুরেনবাবু। সাবধান হে বাপু। আমার দাড়িটা খুব ভাল করে এটে দাও, যেন ধুত্তোর খুলে ফুলে না যায়।

ড্রেসার। না সার, এমন করে এঁটে দেব যে কিছুতেই খুলবে না।

প্রহরী। মহারাজ এখন শোক করবার সময় নেই। পাঠান সেনাপতি কীবল্‌ খাঁ দ্বারদেশে মহারাজের সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

তড়বড়িসিং। (লম্ফদিয়া উঠিলেন) কি, কি বললি! পাঠান সেনাপতি কীবল্‌ খাঁ। উত্তম, উত্তম। আজ এ শ্মশানভূমিতে এই মৃত্যুমলিন অপরাহ্ন আলোকে প্রেতেরা নৃত্য করুক। কোথায় তুমি করালবদনী ভীমা ভয়ঙ্করী মা—নাচো, নাচো, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ,—নাচো। তোমার খল খল হাস্যে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হোক। তোমার ক্ষুধার্ত্ত খর্পর থাক্‌, তোমার জিঘাংসুর খেটকখণ্ড আজ শাণিত অসির উচ্ছ্বসিত তপ্ত শোণিতে রঞ্জিত হবে। নিয়ে আয় প্রহরী, পাঠান সেনাপতি কীবলখাকে, দেখবো সে কেমন বীর।

প্রহরী। যে আজ্ঞা মহারাজ (প্রস্থান)

[প্রহরীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে কীবল খার প্রবেশ।

বিশ্বম্ভর বাবুর সুবৃহৎ পেন্ট্‌লুনকে নানাবিধ দড়িদড়া ফিতার সাহায্যে বাধা হইয়াছে। কোমরের নীচে পেন্ট্‌লুনটি ধামার মতো ফুলিয়া ফাঁপিয়া আছে। কোমর হইতে তরোয়াল ঝুলিতেছে]

কীবলু খাঁ। পাঠান সেনাপতি কীবলু খাঁ তোমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না রাজা। সর্বত্র তার অবারিত দ্বার। সে দ্বার ভাঙার মন্ত্র জানে। তার সামনে রুদ্ধ দ্বার চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ে। সুদূর সামারখান্দ হতে অগ্নির লেলিহান জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে এসেচি। কেন জানো? রাজ্য জয়ের কামনা? হাঃ হাঃ হাঃ—ঐশ্বর্য্যের মরীচিকা,—হোঃ হোঃ হোঃ—হিন্দুস্থানের রত্ন সম্ভার ছিঃ ছিঃ ছিঃ—যে ঐশ্বর্য্য আমি হারিয়েচি তার কাছে সকল ঐশ্বর্য্য ম্লান,—নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। পঞ্চনদের ভিতর দিয়ে উল্কার মতো ছুটে এসেছি, অগ্নির সহস্র শিখা আমার বিজয় রথের পথ চক্রচিহ্ন নির্দ্দেশ করেচে, আমার নাম শুনে সদ্য-জাত শিশুরাও ভয়ে শিউরে উঠেচে। (গাঢ় স্বরে) কিন্তু তবু জেন মহারাজ পাঠান সেনাপতি কীবলু খাঁ চিরদিন এমন ছিল না। একদিন সেও ছিল মায়ের বাছা, সেও ছিল ভগ্নীর ভাই, সেও ছিল প্রণয়িনীর প্রিয়তম।

(দর্শকগণের মধ্যে উচ্ছ্বসিত) নীতিনবাবু। ক্যাপিট্যাল, খাসা অ্যাক্ট্‌ করচে হে।

কীবলু খাঁ। একদিন সেও ছিল শিশুর মতো সরল, হাসীতে খুসীতে তারও মন ছিল ভরপুর। সামারখান্দের মাঠে মাঠে গোচারণ করে গান গেয়ে বেড়াত সে—আমার সংচরী, পরীর মতো ছিল তার রূপ, আসমানের চাঁদ জ্যোৎস্না দিয়ে তৈরী ছিল তার রঙ—একদিন সে হারিয়ে গেল। (বিভিন্ন স্বরে) তাবু প্রাণহীন দেহ আমার স্কন্ধে ঢলে পড়ল, তার মৃত্যুবিবর্ণ শীর্ণ শীতল শবদেহ—সেদিন হতে আমি পাগল—পাগল—আমি উন্মাদ—হাঃ, হাঃ হাঃ। (পেন্ট্‌লুনের পকেটে হাত পুরিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ কে এই রমনী! মৃত—মৃত! কে এ, কে এ!

তড়বড়িসিং। আমিও হারিয়েচি কীবলু খাঁ।

কীবলুখাঁ। এ্যা—রাণী, মহিষী! (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া তড়বড়ি সিংএর দিকে ধীরপদে অগ্রসর হইলেন। তারপর তড়বড়ি সিংকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন) আমরা আজ সমদুঃখী, আমরা আজ দুটি ভাই। আলিঙ্গন দাও ভাই!

(উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন) জাতের বাধা ধর্মের বাধা, আজ সব বাধা চূর্ণ করে দিল আমাদের দুজনের এক বিরাট দুঃখ।

নীতিনবাবু। চমৎকার, চমৎকার, ক্যাপিট্যাল্‌। খাসা প্লে করচে হে! (সমবেত করতালি)

(এমন সময় ভাবের অতিরিক্ত অভিব্যক্তি জনিত লাফালাফির প্রাবল্যে এবং বহুবার পেন্ট্‌লুন চাপড়ানোর ফলে বিশ্বম্ভর বাবুর বহুদিন পরিত্যক্ত পেন্ট্‌লুনের পকেটে যে সকল বোল্‌তা চাক বাঁধিয়া সেই ১৮৭৮ সাল হইতে নির্বিবাদে বসবাস করিতেছিল তাহারা সংখ্যা সজাগ হইয়া উঠিল এবং কীবলুখা দেবী কিরণকে হুল ফুটাইয়া দিল। এদিকে অভিনয় বেশ জমিয়া আসিয়াছে, সুতরাং সে যন্ত্রণা যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া কীবলুখা অভিনয় করিয়া চলিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।)

কীবলুখা। বিরাট দুঃখ, মহান দুঃখ (নিম্নস্বরে) উঃ গেলুম রে, গেলুম রে, কি কামড়ালো রে, বোলতা নাকি রে, ওরে বাবারে, উঃ আবার কামড়ালো রে—

(দর্শকগণের মধ্য হইতে) রমেন। বলে যাও, বলে যাও, থামলে কেন—এই খানটাই সবচেয়ে ভাল, বলে যাও, বলে যাও—

কীবলুখা। ওরে আবার একটা কামড়ালো রে—আর কি বলে যাবো রে—ওরে বাবারে—ওঃ—ওঃ—ওই আর একটা কামড়ালো রে—

যতীন ও তড়বড়ি সিং সমস্বরে। কি, কি, কি হল!

কীবলুখা। হল আমার মাথা আর মুণ্ডু রে—এই বিশ্বম্ভরবাবুর পেন্ট্‌লুন—আঠারো শো আটাত্তর সালের পেন্ট্‌লুন—এতে দিব্যি একটি বোলতার চাক বাসা বেঁধে ছিল রে—এখন নাড়াচাড়া পেয়ে আমায় কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলবার দাখিল করেচে রে—উঃ—উঃ আর একটা কামড়ালো রে! (তিড়িং তিড়িং করিয়া ষ্টেজময় লাফাইতে লাগিলেন।)

(রাজ্ঞী চকমকি দেবী এতক্ষণ মৃতের ভাণ করিয়া ষ্টেজের একপাশে পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ তাঁহাকেও একটা বোলতা কামড়াইয়া দিল। তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।)

চকমকি দেবী। উঃ শালার বোলতা আমাকেও কামড়েচে রে মাইরি—

তড়বড়ি সিং। এই অ্যা-অ্যা-অ্যাখো—অ্যাখো, আমার দিকেও তেড়ে আসচে একটা!

কীবলুখা। (নাচিতে নাচিতে) পেল্ট লুন ভর্ত্তী বোলতা মশাই—ইয়া বড় এক চাক বোলতা পকেটে পুরে স্বচ্ছন্দে নেচে বেড়াচ্চি মশাই,এ তক্ষণ জানতেই পারিনি! উঃ আর একটা কামড়ালো রে উঃ গেছি, গেছি, গেছি রে—

(তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে নাচিতে কীবলুখা ষ্টেজ হইতে সাজঘরে, সাজঘর হইতে একেবারে বাহিরে পলাইয়া গেলেন)

যতীন। সর্ব্বনাশ করেচে, ষ্টেজভর্ত্তী বোলতা ছেড়ে দিয়ে লোকটা পালিয়ে গেচে। ও দ্বারিক, দ্বারিক ড্রপ ফেলে দাও, ড্রপ ফেলে দাও।

দ্বারিক। হুইসিল না বাজালে এমনি কি করে ড্রপ ফেলি মোস্-সাই—যেটি রুল নয় সেটি আমি কেমন করে করব মোস্-সাই!

যতীন। হুইসল বাজাও, বাজাও—খাঃ হুইসল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বারিক তুমি এমনি ড্রপ ফেলে দাও।

দ্বারিক। সেটি দ্বারিকের দ্বারা হবেনি মোস্-সাই।

যতীন। উঃ, আমাকেও একটা বোলতা কামড়ালো রে। মরচি বোল্‌তার জ্বালায়, আর তুমি আমাকে আইন দেখাতে এসেচ। সরে যাও তুমি, আমি ড্রপ ফেলে দিচ্ছি।

দ্বারিক। যা রুল নয় তা আমি করতে দেব না মোস্-সাই, সত্যি বলচি মোস্ সাই।

(যতীন ও দ্বারিক ড্রপসীনের দড়ি লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল, হঠাৎ ধপাস করিয়া ড্রপসীন পড়িল, এবং একটা মোটা খুটিতে যতীনের মাথা ঠুকিয়া গেল)

যতীন। উঃ গেছিরে,—মাথাটা বাশের খুটায় ঠুকে বোধ করি চৌচির হয়ে ফেটে গেল।

(সাজঘরের মধ্যে অনেককে বোলতা কামড়াইল—আহা উহু—কামড়ালো—কামড়ালো—শব্দে ঘর ভরিয়া গেল)

(প্রবল গোলমাল ও চীৎকার, কতকটা এইরূপ—)

—ওরে জল নিয়ে আয়, জল।

—না না, জল দিও না, তামাক পোড়া বেটে দাও।

—ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার ডাকো—

—ওরে রেবো, হে- বো, হে-—বো—

—দেখ, দেখ, বোলতা উড়চে, সাবধান, সাবধান!

—উঃ কামড়ালো রে—গেলুম রে—

(দর্শকগণের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য)।

রমেন। এটা থিয়েটার হচ্ছে না ভূত নাচানো হচ্ছে সেটা আমি জানতে চাই।

রবীন। মায়ো বেটাদের ধরে, কোষে মার দিলে তবে ঠিক হয়।

বারীন। আমাদের টিকিটের টাকা ফেরৎ দাও—যত সব জোচ্চোর বেটারা—

নীতিনবাবু। এ সব কী কাণ্ড মশাই, এ সব কী কাণ্ড! তবু বলে দুর্নীতি নেই! এ যে আগাগোড়া দুর্নীতিতে ভরা। (সাজঘরে—)

যতীন। সুরেনবাবু, থিয়েটার বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় নেই; অডিয়েন্স ক্ষেপে উঠেচে মশাই। আপনি একবার ষ্টেজে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বলুন

সুরেনবাবু। কিন্তু এ অবস্থায় আমি যাইই বা কেমন করে। এই যে ধুত্তোর ড্রেসার বেটা এমন মজবুত করে দাড়ি গোঁফ এটে দিয়েচে, এত টানাটানি করচি, খুলচে না। আর কতদিকই বা সামলাবো বলতো, এখনো চায়নীর ধুত্তোর ঘাগরাটাও খোলা হয়নি।

ড্রেসার। আমার দোষ কি স্যর, আপনিই তো আমাকে বলেচেন খুব শক্ত করে দাড়ি গোঁফ লাগাতে, যাতে না খোলে।

দ্বারিক। বেস্—সি দেরী করলে চলবে নি মোস্-সাই।

যতীন। ওই যেমন আছেন তেমনি চলুন, নইলে অডিয়েন্স হয়ত ষ্টেজ চড়াও হয়ে মারপিট করে যাবে।

দ্বারিক। সেটিও আস্-চর্য্যি নয় মোস্-সাই।

সুরেন। আরে ধুত্তোর, তবে চল—

দ্বারিক। আমি নিজে থেকেই ড্রপ তুলে ধরচি মোস্-সাই, এবার হুইসিলের আর দরকার হবে নি।

ড্রপসীন উঠিলে অভিনব বেশে সুরেনবাবু রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাতযোড় করিয়া বলিলেন)

সুরেনবাবু। মাননীয়া ভদ্রমহিলাগণ, মাননীয় ভদ্র-মহোদয়গণ, অনিবার্য্য কারণে আজ থিয়েটার (ধুত্তোর কথাটা বার দুই চাপিয়া গেলেন) এই খানেই বন্ধ করতে হল। আমি যে একান্তই অসহায় তা আমার এ অভিনব বেশ দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন। আপনাদের সকলকে আনন্দ দান করিতে চেষ্টার লাঘব আমরা কিছু করিনি, তবু আপ-দের কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনারা ক্ষমা না করলে কে ক্ষমা করবে। আপনাদের মতন রসজ্ঞ, বিবেচক—

দ্বারিক। বেস্-সি দেরী করবেন নি মোস্-সাই, আপনার কানের ঠিক পেছনে দুটো বোল্‌তা উড়চে মোস্-সাই!

সুরেনবাবু। (লাফাইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া) উ, হু হু—আর দেরী করব না। আপনাদের কাছে আমার এই শেষ নিবেদন—

(কানের পাশে বোলতা দেখিয়া ধুত্তোর!

—যবনিকা—

পুনরাবৃত্তি

(নাটক)

শ্রীআশালতা সিংহ

পাত্র—

রাজেন্দ্র মল্লিক—ললিতকলার উপাসক ধনী যুবক।

সুবোধ রায়—তরুণ ব্যারিষ্টার।

নীরেন্দ্র সেন—কালো স্কলার, মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিভাবান যুবক। কবিতা লেখে।

সমরেশ চাটার্জ্জি—নবীন নাট্যকার। কিন্তু সে নাটক এখনও ছাপা হয় নাই।

কামাক্ষ্যা গুপ্ত—মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু।

রঞ্জন বসু—আধুনিক তরুণ।

এই কয়েকজন ছাড়া আরও কয়েকটি ব্যক্তিকে সামান্য ভূমিকায় দেখা যাইবে।

পাত্রী—

মণিমালিকা—বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মহিলা। নীরেন্দ্রের দিদি।

বাণী—পল্লীগ্রামের কিশোরী।

শিপ্রা—বালীগঞ্জের অভিজাত তরুণী। রাজেন্দ্র মল্লিকের ছোট বোন।

হরকালী—বাণীর মা।

বামাসুন্দরী—নীরেন্দ্রের মা।

মিস কণিকা—আধুনিকা তরুণী।

১ম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পল্লীগ্রামের একটি সাধারণ বাড়ীতে নীরেন্দ্র সেনের মা ও বড় দিদি মণিমালিকা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। নীরেন্দ্রের মা বামাসুন্দরী বিধবা, বর্ষীয়সী। দিদি মণিমালিকার বয়স ছাব্বিশ সাতাশ।]

বামাসুন্দরী। এই কাজটার জন্যেই তোকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়ে আনা করালাম। যেমন করে পারিস এটি তোকে করে দিয়ে যেতেই হবে মা। তোর বুদ্ধির উপরেই আমার ভরসা।

মণি। নীরেন আজকালকার ছেলে, ও যদি নিজে বিয়ে করতে না চায় তুমি আমি হাজার বোঝালেও ক'রবে না। আর করলেও ফল তার ভালো হবে না। বিয়ে জিনিষটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খামোকা অন্যায় অনুরোধ কর্ত্তে নেই।

বামা। শেষে তুইও তাই বলছিস! হায় হায় যে ছেলেকে এতটুকুটি থেকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করলাম আজ কি তার মতেই আমাকে চলতে হবে?

মণি। দেখ মা তুমি ঠিক বুঝতে পারচ না, তোমার মতেই নীরেনকে আমি চলতে বলতুম যদি না বুঝতুম এতে তার সারাজীবনটা অসুখী হবে।

বামা। (আঁচলের খুঁট হইতে দোক্তা খানিকটা খুলিয়া মুখে দিয়া) তোমাদের সুখ অসুখের ব্যাপার আমি ভালো বুঝিনে বাছা। মা বাপ ভেবে চিন্তে যার হাতে ছেলে মেয়েকে সঁপে দেবে তাতে তাদের সুখ হবে না সুখ হবে নিজেদের একটা চোখের মোহে যাকে তাকে না ভেবে চিন্তে হট করে বিয়ে করে ঘরে আনায়। এই কি তুমি আমাকে বুঝতে ব'লো?

মণি। ও কথা নিয়ে আলোচনা করে আর ফল কি। তোমাদের কালে সুখের মানে ঢের সোজা ছিল একালে জীবন আর তত সরল নেই। কি হ'লে যে মানুষের সুখ হয় আজ তা বোধ করি স্বয়ং বিধাতাও বলে দিতে পারেন না।

বামা। কিন্তু তোকেই বা এত সব কথা শেখালে কে? তুইও তো এই পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। আমি যা বুঝি না সে সমস্তই তুই দেখি কখন বুঝে নিয়েচিস।

মণি। (সলজ্জভাবে হাসিয়া) ওঁর কাছেই এ সব

বুঝতে ভাবতে শিখেচি। আশ্চর্য্য উদার মত ওঁর। কিন্তু আমার তো বেশি দিন থাকবার মিয়াদ নেই। পনেরো দিনের কড়ারে নিয়ে এসেচ, আজ তার দু'দিন হ'য়ে গেল। পনেরো দিনের দিনে আমি যদি ক'লকাতায় যেয়ে পৌছাতে না পারি উনি টেলিগ্রাম করবেন, তারপর হয়তো নিজেই এসে হাজির হবেন। জানো তো তোমার জামাইকে।

বামা। নীরেনকে চিঠি দিয়েচি, পরশু থেকে তার বড়দিনের ছুটি সুরু হবে তিন চারদিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে। সে এ'লে তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে তার মত করবি, আমি বাণীর মাকে এক রকম কথা দিয়ে রেখেচি। বাণীকে বোধ হয় তুই দেখিস নি, কাল এলে দেখাব। আহা লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়ে!

মণি। নীরেন ষ্টেটস স্কলারশীপ পেয়েচে শুনেচ তো? সে বিলেত যেতে চায়। তার পক্ষে কি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করা সুবিধা হবে? বাণী না কি নাম বল্লে, তাকে অবশ্য আমি দেখিনি কিন্তু না দেখেও আন্দাজে বলতে পারি এ রকম বিয়ে সুখের হবে না। যাদের মনোবৃত্তি সমান তাদেরই পরস্পরের সঙ্গে বিবাহিত হওয়া উচিত। এর অন্য রকম জোর করে ঘটাবার চেষ্টা করলে সুখের হয় না।

বামা। (রুষ্ট মুখে) কে বল্লে নীরেনকে আমি বিলেত যেতে দেব? যাতে সে না যায় তাই তো তাড়াতাড়ি এ বিয়ের চেষ্টা করা। আমি কোথা তোকে বড় আশা করে আনালুম যে তুই একটু চেষ্টা চরিত্তির করবি এবিষয়ে না তুই আবার উলটো গাইছিস। আচ্ছা মণি একটা কথা সত্যি করে বলবি? কিছু লুকোতে পাবিনে, সত্যি কথা বলতে হবে কিন্তু। ক'লকাতায় বারো মাস থাকা, তোর বাড়ীতে প্রায়ই নীরেন যায় তো, তা তোকে কিছু বলেছে বুঝি?

মণি। কি বলেছে?

বামা। ক'লকাতার কোন মেয়েকে তার পছন্দ হয়েছে বুঝি?

মণি। তা তো কখনো শুনি নাই, তবে মাঝে মাঝে মল্লিকদের সিপ্রার নাম করে। কি যেন বলতে বলতে থেমে যায়। মাঝে মাঝে সামান্য কথায় তার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। স্পষ্ট করে কিন্তু কিছু বলে না।

বামা। (চিন্তিত সুরে) তবে? অথচ গেরস্থ ঘরে সে সব মেয়ে মানাবেও না, সম্ভবও হবে না। তাদেরও নজর উঁচুতে হবে, মাঝ থেকে ছেলেটার মন ভেঙ্গে যাবে। কি যে আমি করি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে। মণি তুই বড় বুদ্ধিমতী, ভেবে চিন্তে একটা উপায় বার কর মা। নইলে এই বিপদে যে আমার হাত পা আসচে না। আমি বলি কি তুই না হয় বাণীকে সঙ্গে করে ক'লকাতা নিয়ে যা। সেখানে দু'দিন তাকে একটু গান বাজনা শেখা, তাহলে হয়তো নীরেনের পছন্দ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীর ড্রইংরুম, সময় অপরাহ্ন। সিপ্রাদেবী অর্গানের সামনে বসিয়া গান গাহিতেছেন। খোলা জানালা দিয়া বিদায়মুখী সূর্য্যের রক্তিম আলো ঘরে ঢুকিতেছে। নীরেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভের মত চলিয়া যাইতেছিল। তাহার পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া]

সিপ্রা। ও কি, নীরেনবাবু এসেই আবার চলে যাচ্ছেন যে বড়!

নীরেন্দ্র। আপনার গানে বাধা দিলুম, বড় লজ্জিত। আপনার দাদাকে খুঁজছিলুম, তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। কখন অন্যমনস্ক হয়ে……

সিপ্রা। [কৌতুকের ভঙ্গীতে] কখন অন্যমনস্ক হয়ে এ ঘরে ঢুকে পড়েছেন, এই তো?

নীরেন্দ্র। (অপ্রতিভ হইয়া) ক্ষমা কোরবেন। বিরক্ত হবেন বুঝতে পারিনি। মনটা বড় চঞ্চল ছিল।

সিপ্রা। বিরক্ত যে হয়েচি সেটা ঠিক, কিন্তু কেন জানেন? আপনি মনে করেন দরকার ছাড়া আমাদের বাড়ীতে আসতে নেই। আর—

নীরেন্দ্র। আর কি?

সিপ্রা। আচ্ছা নীরেনবাবু দাদা ছাড়া এ বাড়ীতে কি আর কারো কাছেই আপনার কোন দরকার থাকে না?

নীরেন্দ্র। (জড়িতস্বরে) এর উত্তর আমি কেমন করে দেব সিপ্রা দেবী। আমার কিন্তু একটা ক্ষোভ রয়ে গেল। অসময়ে এসে আপনার অমন চমৎকার গানে বাধা দিলুম।

নিজেও শুনতে পেলুম না, জিনিষটাকেও অর্দ্ধপথে নষ্ট করে দিলুম। এর কি উপায় হয় না?

সিপ্রা। বেশতো, আপনার সামনেই বাকীটা শেষ করে দিচ্ছি।

[বাজনায় সুর দিয়া গান গাহিতে সুরু করিল]

সিপ্রা। (গান শেষ করিয়া এইদিকে মুখ ফিরাইয়া) কেমন এবারে হ'লো তো? আর কোন ক্ষোভ নেই মনে?

নীরেন। না। শুধু কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছিনে।

সিপ্রা। থাক, ধন্যবাদ না পেলেও চলবে আমার।

নীরেন। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে) আচ্ছা সিপ্রা দেবী জীবন সম্বন্ধে আপনার মতটা কী রকম? আপনার কি মাঝে মাঝে মনে হয় না যে জীবনে আমরা প্রাণপণে যা চেয়ে এসেচি তা পাবার কোনই উপায় নেই অথচ যা একেবারেই চাইনে কোথা থেকে তাই একেবারে হুড় মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে। অদ্ভুত নয়?

সিপ্রা। ও সব ঘোরতর প্রশ্ন আমাকে কেন করচেন? আমিতো আপনার মত কবি নই যে দিন রাত ভাবরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্চি।

নীরেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ভাবরাজ্য থেকে একটানে হঠাৎ আজ এমন একটা ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েচি যে শুধু নিজের বুদ্ধিতে কূল কিনারা পাচ্চিনে।

সিপ্রা। (রুদ্ধ প্রতীক্ষায়) সে এমন কী সমস্যা? বলুন না।

(সুবোধ রায় ঘরে ঢুকিল, সুবোধের সহিত সিপ্রার বিবাহ হওয়া উচিত, সিপ্রা ও সুবোধের আত্মীয় স্বজনেরা তাহাই আশা করে। পরস্পরের মধ্যে হয়তো একটা মন জানাজানির পালা চলিতেছে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।)

সুবোধ। [আহত অভিমানের সুরে] আমি কি আপনাদের আলাপে বাধা দিলুম?

সিপ্রা। দিলেও সেটাতো আপনার মুখের উপর বলা যায় না।

সুবোধ। মাপ ক'রবেন, বুঝতে পারিনি।

(গমনোদ্যত হইল)

নীরেন। না না, সুবোধ বাবু চলে যাবেন না। আমি আপনারও পরামর্শ চাচ্ছি।

সুবোধ। [না যাইয়া ঘরে ঢুকিল] আপনি কোন বিপদে পড়েচেন বুঝি?

নীরেন। বিপদ? হ্যাঁ, বিপদই বটে। ধরুন কোন একদিন সকাল বেলায় উঠে যদি হঠাৎ আবিষ্কার করতে হয়, যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র হচ্চে সে দিনের মধ্যে সাতবার করে গঙ্গাজল স্পর্শ করে পাঁচবার করে স্নান করে। সে ফার্ষ্ট বুকের ঘোড়ার গল্প অবধি পড়েচে আর সুক্তোনি ও নিমঝোল দিব্য রাঁধতে পারে আর অনেক কষ্টে নিজের নামটি ইংরিজীতে বানান করে লিখতে পারে। তাহলে আমার কি করা উচিত? সুবোধ বাবু আপনি বেশ প্রণিধান করে ভেবে উত্তর দিন, আমি কি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব? না ষ্টেটস স্কলারশীপ পাওয়ার একটা কথা আছে, সেইটে জোগাড় করে নিয়ে বিলেত পালাব? কি করবো বলুন সিপ্রাদেবী? আমি তো এ ছাড়া উদ্ধারের আর কোন সদুপায় দেখচিনে।

সিপ্রা। আপনার দস্তুর মত বিদ্রোহ করা উচিত। পালাবেন কেন, ভীরু!

সুবোধ। পালাবার অবশ্য দরকার নেই, কিন্তু দস্তুর মত বিদ্রোহ করবারও তেমন কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্চিনে। নীরেনবাবু সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলেই তো সব বিপদের অবসান ঘটে।

সিপ্রা। সুবোধবাবু আপনি চুপ করুন।

নীরেন। সুবোধবাবু আপনি কী বলচেন তার মানে জানেন?

সুবোধ। কিছু কিছু জানি বই কি। ঐ যে আপনাদের একটা ফ্যাশন উঠেছে আজকাল, যাকে বিয়ে ক'রবেন তার সঙ্গে আগে ভাগে মন মেলা চাই ওটা একটা ধাপ্পাবাজী।

সিপ্রা। কী বল্লেন, ধাপ্পাবাজী!

সুবোধ। তাছাড়া আর কি যে ব'লব ভেবে পাইনে। ভালোবাসতে গেলে যে, মার্কসের সোশালিজ্‌ম এবং শেলীর কবিতা সম্বন্ধে দুইজনের একমত হতেই হবে তার কোন মানে নেই। ওটা মনের আধুনিক ব্যাধি।

সিপ্রা। আমি ভাবতেই পারিনে যে, বিংশ শতাব্দীতে এমন কথা কেউ বলতে পারে!

সুবোধ। কেন পারবে না? ধরুন আমার দিদিমা দাদাবাবুর কথাই আজ যা মনে পড়চে বলি। আমার সমস্ত ছেলেবেলাটাই তাঁদের কাছে কেটেচে কিনা। বড় হয়েও অনেকদিন ছিলুম। দাদাবাবু ছিলেন মস্ত জ্ঞানী ও গুণী ব্যাক্তি। তখনকার দিনে তাঁর মত গাইয়ে পেশাদার ওস্তাদের মধ্যেও দুর্লভ ছিল। কিন্তু তিনি যখন সুরের মোটামুটি ধারাগুলো দিদিমাকে শেখাতে আসতেন তখন দিদিমা সে বিষয়ে তাঁকে লেশমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে বঁটি পেতে আচারের জন্য আম বানাতে ব'সতেন। অথচ তবু দেখেচি তাঁরা দু'জনে দু'জনকে কী রকম ভালোবাসতেন। আপনার কি মনে হয়······

সিপ্রা। আমার কি মনে হয় জানেন, যে পুরুষ মানুষ একজন আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক মহিলার সুমুখে ড্রইংরুমে ব'সে দাদাবাবু দিদিমার টার্মে কথা বলে সে বর্ব্বর।

সুবোধ। আর? সবটা বলুন, আপনি কিছু আমি ভালোবাসিনে। যা বলবার আছে পুরোপুরি বলে দিন, আমায় স্পষ্ট করে জানা দরকার।

সিপ্রা। জানতে চা'ন? আচ্ছা শুনুন তবে। ধরুন আমি যখন ড্রইংরুমে ব'সে পিয়ানো বাজাব তখন আপনি যে আমাকে কেমন করে বড়ি দিতে হয় বা আপনার দিদিমা কেমন করে আচার দিতেন সে সম্বন্ধে ছোটখাট একটি লেক্‌চার শোনাবেন, সে আমার সইবে না। কিছুতেই সইবে না। [illegible] স্পষ্ট করে আরতো বলা যায় না।

[বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান।]

নীরেন। [বিমর্ষভাবে] আপনারা দু'জনে বচসা করে আমার বিপদটা ভালো করে বুঝলেন না বা কোন একটা পরামর্শও দিলেন না। এখন কী করা যায়!

তৃতীয় দৃশ্য

[নীরেন্দ্রদের গ্রামের বাটির প্রাঙ্গণে বামাসুন্দরী বিমর্ষ মুখে বসিয়া আছেন। মণিমালা তাঁহার পাশে বসিয়া কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। বোধহয় সান্ত্বনা দিতেছে। তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি। এমন সময় হরকালী ব্যস্তসমস্তভাবে তথায় আসিলেন।

হরকালী। ওরা যা বলচে তাকি সত্য দিদি? তোমার ছেলে কি সত্যিই বিলেত যাচ্ছে না কি?

বামা। তাই তো এই চিঠিতে লিখেচে ভাই। পড়ে অবধি আমার যা হচ্চে তা অন্যকে বোঝাব কেমন করে। মণিকে ক'লকাতা থেকে আনালাম যে তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে বিয়েতে রাজী করাবে। তোমার বাণীর সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে আমি বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্দি হয়ে কাশী বাস করবো। আসবার জন্যে তাগিদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম তারই উত্তর এলো আজ। পড়ে আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হবার যো হয়েচে।

মনি। মা তুমি অত উতলা হচ্চ কেন বলতো। নীরেন সরকার থেকে বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশ যাচ্ছে, এ তো সুখের কথা। (হরকালীর দিকে চাহিয়া) আর মামীমা, বাণীর সঙ্গে তার বিয়ে বোধ হয় হবে না। বাণী মেয়েটিকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করে আমার ভারি তৃপ্তি হয়েচে। যে কোন পুরুষের পক্ষেই তাকে পাওয়া সৌভাগ্য। কিন্তু এ যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে মেয়েকে যা যা শেখানো দরকার আপনি তা শেখান নি। তাই আমার মনে হয়, বোধ হয় ওকে নীরেনের পছন্দ হচ্চে না। বাণী যদি ইংরেজীতে কথা কইতে পারতো, যদি গান গেয়ে শোনাতে পারতো, যদি টেনিস র‍্যাকেট হাতে খেলতে নেমে একটু ছুটোছুটি করতো তাহলে ওকে সহজেই নীরেনের মনে ধরতো। সত্যি আমার এক এক সময় ভারি মজা লাগে পুরুষগুলো এত বোকা! গানের সম্বন্ধে নিজেরা হয়তো বিন্দুবিসর্গ জানে না তবু মেয়ে দেখতে এসে বেসুরো মিহি এবং নাকিসুরের গান শোনাই চাই। শুনতে পেলে মনে করে খুব জিতেচি, আপটুডেট্ মেয়ে খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার

করেচি। যে সব পুরুষেরা ইংরেজী বিদ্যার আধিক্যজনিত আবেগে মাসে মাসে কাগজে এমন ইংরেজী লিখে থাকে যে পড়ে হাসি চাপা দায় হয় তারাই আবার কনে দেখতে যেয়ে মেয়ের মুখে ফ্যাশন দুরস্ত দু'চারটে ইংরিজী বুক্‌নি শুনে আধুনিকা আবিষ্কারের মহিমায় গদ্‌গদ্ হয়ে ওঠে। কী করবেন বলুন মাসীমা, এই আজকালকার যুগধর্ম্ম। এ হাটে ভালো দাম পেতে হ'লে এ সব দাবী মিটিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আপনাদের ঐ সেকেলে বাড়ী তবু বাণীকে আপনি শিক্ষিত বিলেত ফেরতের হাতে দিতে উৎসুক! এতটুকু আপত্তি নেই!

হরকালী। এ কথা শুধু তুই নয় মা, সবাই শুধোয় সবাই খোঁটা দেয়। কিন্তু আমি কাণ দিইনে। বাণীর বাবা মারা যাবার সময় আমার হাত ধরে বলে গেচেন, আমি আর যাই কেন না করি বাণীকে যেন মূর্খর হাতে কখনো না দিই। নীরেনকে তিনি ছেলের মত ভালোবাসতেন। বরাবর ইচ্ছে ছিল মনে মনে যে ওকে পুত্ররূপেই পান। কিন্তু উনি অকালে মারা গেলেন। দেওরদের হাতে পড়লুম। তাদের কথায় উঠ্‌তে বসতে হয়। বাণীকে কিছুই শেখাতে পারিনি। শুধু নিজেরই চেষ্টায় ও লেখাপড়া যা শিখেচে। ওর বাবারই মত পড়া-শোনাতে ঝোঁক। কিন্তু সে আর কতটুকু। সহরের মেয়েদের তুলনায় কিছুই না।

মণি। [কিয়ৎকাল কি যেন ভাবিয়া] আচ্ছা মাসীমা কিছুদিনের জন্যে বাণীকে আমাকে দেবেন? কাল আমি যাচ্ছি, ওকেও এই সঙ্গে ক'লকাতা নিয়ে যাই। আমি যা পারি, যতদূর সাধ্য ওকে শেখাব। ছেলেপিলে নেই, বড্ড একা থাকি। উনি তো সারাদিন আপিসে। কিছুতেই যেন আর সময় কাটে না। বাণীকে যদি পাই বেঁচে যাই। দেবেন ওকে? আপত্তি নেই তো?

হরকালী। না আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমারই উপরে ওর সব ভার দিলুম। তুমি ওর যতটা ভালো করতে পারবে আর কেউ তা পারবে না।

মণি। (অভিভূত ও বিচলিত হইয়া) আপনার এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে আমি প্রাণপণ কোরবো।

২য় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজেন্দ্র মল্লিকের ড্রইংরুম। ধনীগৃহের প্রথামত যথারীতি সজ্জিত। রাজেন্দ্র একখানা সোফায় হেলান দিয়া শুইয়া আছে অলসভাবে।]

নীরেন্দ্র। (ঘরে ঢুকিয়া, তাহার হাতে এক তাড়া কাগজ) রাজেন, তোমার হাতে যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে তাহলে তোমাকে এই কবিতাটা শোনাই। শুনেচ বোধ হয় সামনের সেপ্টেম্বরে বিলেত যাচ্ছি। দেশ ছেড়ে যাবার পূর্ব্বক্ষণে এই কবিতা লিখেচি এবং তোমাকেই তা উৎসর্গ করেচি। কিন্তু এটার একটা বিশেষত্ব আছে, সেইটুকুই এর নূতনত্ব। সম্প্রতি গদ্য কবিতা এবং পদ্য কবিতা নিয়ে বাদবিতণ্ডার আর অবধি নেই। কাকে ভালো বলে কার মান রাখবো সে এক দুরূহ সমস্যা। তাই এটা দুয়েরই প্রভাব এড়িয়ে লিখেছি। এটার মজা হচ্চে এই যে, মানে বুঝতে হ'লে উলটোদিক থেকে পড়তে হয়।

রাজেন্দ্র। (তেমন উৎসাহ না দেখাইয়া নিস্পৃহ স্বরে) কবিতা শোনাবে আমাকে?

নীরেন্দ্র। হাঁ, তোমাকে। একথা আমি কখনো ভুলবো না যে যখন আমি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলাম তখন তুমিই আমাকে আবিষ্কার করেছিলে এবং উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে প্রকাশ্যতায় টেনে এনেছিলে।

[সিপ্রা এক ঝলক বসন্ত বাতাসের মত সহসা কক্ষে প্রবেশ করিল]

সিপ্রা। আপনি যতই লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করুন, আমি খবর পেয়েচি নীরেনবাবু। আপনি স্কলারশীপ পেয়েচেন, বিলেত যাচ্ছেন। আপনাকে আমি কন্‌গ্র্যাচুলেশন জানাচ্ছি। বাংলায় আপনারা যাকে বলেন অভিনন্দন।

রাজেন্দ্র। (উঠিয়া পড়িয়া) আমার একটু কাজ আছে নীরেন। বড় জরুরি। তোমার ও কবিতাটা তুমি সিপ্রাকে পড়ে শোনাও। তা ছাড়া সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেচি, কবিতায় দেশের কিচ্ছু হবে না। এখন চাই নাটক। একমাত্র নাটকই পারবে এ দেশকে সচেতন করে তুলতে। এমন নাটক, যা দেখে পকেটের রুমাল আপনি

চোখে উঠে আসে। আমাদের সময় যে এমন নাটক লেখে তা আগে কখনও জানতেম না। সদ্য তাকে আবিষ্কার করেচি। সেই নিয়েই বড় ব্যস্ততায় দিনগুলো কাটচে এখন।

[প্রস্থান]

সিপ্রা। কি কবিতা? আমাকে শোনান না। আচ্ছা নীরেনবাবু আপনাকে অত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন? মন ভালো নেই বুঝি? (ঈষৎ হাসিয়া) সেই ফার্ষ্ট বুকের ঘোড়ার গল্প পড়া মেয়েটির কথা আর যে বড় বলেন না। তার কথা মনে পড়েই বিমনা হয়ে গেছেন বুঝি?

নীরেন। বেশ তো ভুলেছিলুম, আবার মনে পড়িয়ে দিলেন।

সিপ্রা। কি?

নীরেন। ঐ বিভীষিকা!

সিপ্রা। ব্যাপার কি, খুলেই বলুন না।

নীরেন্দ্র। এখানে আমার দিদি থাকেন জানেন তো, আপনাদের কাছে প্রায়ই গল্প করি। সেই দিদি ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে করে ক'লকাতা নিয়ে এসেচেন এবং তাকে আমারই জন্যে এস্রাজ বাজাতে ডিমের ওমলেট ভাজতে এবং হীল উঁচু জুতো পরতে শিখিয়েচেন। এখন জোর তলব এসেচে মেয়ে দেখতে যাবার। আর আমার নিস্তার নেই। উদ্ধারের কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্চিনে। তাঁর হুকুম মত আজই সন্ধ্যেতে মেয়ে দেখতে যেতে হবে। কি করবো কিছু বলতে পারেন?

সিপ্রা। আপনি হাসালেন নীরেনবাবু! আপনি না পুরুষ মানুষ, আপনি না কবি? আপনি না ষ্টেটস্ স্কলারশীপ পেয়েচেন? একটু মনের জোর আপনার নেই যে, স্পষ্ট গলায় বলে দিতে পারেন, অমন অর্দ্ধ শিক্ষিত গ্রাম্য বালিকাকে কিছুতেই জীবনসঙ্গিনী কর্ত্তে পারবেন না!

নীরেন্দ্র। মনের জোর?······মনের জোর খুবই আছে। কিন্তু কারও মুখের ওপরেই আমি কিছু বলতে পারিনে। তাছাড়া আমার দিদিকে আপনি চেনেন না। তাঁর সামনে মনের জোর শেষ অবধি বজায় রাখতে পারে না কেউ।

সিপ্রা। বেশ তো, যদি মুখের ওপর না বলতে পারেন, চিঠিতে লিখে দেবেন তাঁকে লিখে দেবেন যতই এস্রাজ বাজাতে শেখান আর আধুনিক পালিশ দেবার চেষ্টা করুন, একজন আপটুডেট্ স্কলারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় সোজা নয়।

সুবোধ (ঘরে ঢুকিয়া) নয়ই তো। ফাঁকি কি দেওয়া যায়! তার চোখের উপর মাইনাস টেন পাওয়ারের এক জোড়া চসমা ঝক্‌ঝক্ করচে। ফাঁকি দেয় কার সাধ্য!

সিপ্রা। কিছু না জেনে শুনেই আপনার একটা ফোড়ন দেওয়া চাই। যাই আমি। আমাকে আবার লজিকটা একটু দেখে রাখতে হবে। রোজ ক্লাসে সুমনাদির কাছে অপ্রস্তুত হই।

সুবোধ। থাক্ আপনাকে আর লজিকের ছুতো করে উঠে যেতে হবে না। এ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এখনই বিদায় নিচ্ছে। সামনের বারান্দাটা দিয়ে টেনিসকোর্টে যাচ্ছিলুম, আপনাদের দু'একটা কথা কানে এ'লো। ভাবলুম, অযাচিত হয়েই নীরেনবাবুকে একটা কথা বলে আসি। বন্ধুবর এখনও চসমার ভিতর দিয়েই জগৎটা দেখচেন। তা'ও আবার রঙিন চসমা।

সিপ্রা। কিন্তু আপনার হাজার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক আছে তারা বরাবর রঙিন আলোতেই জগতটাকে দেখবে। এতে যদি তাদের হোঁচট খাবার ভয় থাকে, ভগবান তাদের চালাবার জন্যে লোকও ঠিক করে রেখেচেন জানবেন।

নীরেন্দ্র। কিন্তু সুবোধবাবু আপনি যদি সত্যি আমাকে চালিয়ে নিতে চান তাহলে আপনাকে একটি অনুরোধ করচি, রাখতেই হবে।

সুবোধ। কি অনুরোধ?

নীরেন্দ্র। তেমন গুরুতর কিছু নয়, আমার সঙ্গে শুধু এক জায়গায় যেতে হবে। ব্যাপারটা তেমন ভয়াবহ কিছুও নয়। আগে থেকেই আপনাকে ভরসা দিয়ে রাখি।

সুবোধ। কিন্তু আপনার ভূমিকার বহর দেখে বিশেষ ভরসা হচ্চে না, কোথায়?

নীরেন্দ্র। হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ীতে কনে দেখতে।

সুবোধ। কার কনে ?

নীরেন্দ্র। ধরুন, আপনারও তো হতে পারে। নিশ্চয় করে দুনিয়াতে কিছুই বলা যায় না।

সিপ্রা। (উল্লসিত সুরে) বাঃ এমন চমৎকার মুক্তির উপায় যে আপনি আবিষ্কার করেচেন তা বুঝতে পারিনি। বেশ হয়েচে, এখন যদি কোন উপায়ে সুবোধবাবুকে সেই পাড়াগাঁয়ের মেয়েটি বিয়ে দিয়ে দেন উচিত শিক্ষা হয় তাঁর। সব লেক্‌চার তাহলে অর্দ্ধপথেই থেমে যায় তাঁর।

সুবোধ। আপনারা কিসের ষড়যন্ত্র করচেন তা অবশ্য আমি জানিনে! কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে জিনিষটা কি তা আপনিও জানেন না আমিও জানিনে। বস্তুতঃ কেবল নামটা শুনেই আমরা ভয়ে কাঁটা হয়ে যাই। এই না ? কিন্তু নীরেনবাবু যে আমাকে কেন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন বুঝতে পারচিনে। এইমাত্র আমি এখানে পা দিতেই একটি ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ লজিকের পড়া মুখস্ত করতে ব্যাকুল হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখবামাত্র পৃথিবীর অপরাপর যাবতীয় মহিলার যে কেমন মনোভাব হবে তা আমি এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এবং বলা বাহুল্য তাতে বড় প্রফুল্লবোধ করচিনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হারিসন রোডের মণিমালার সুসজ্জিত ভবনের একটি কক্ষ। ঘরটি আগাগোড়া দামী কার্পেট দিয়া মোড়া। একপাশে একটি বাক্স হার্মোনিয়াম ও তাহার পাশে একটি এস্রাজ। বাণী বাজনার ডালার উপর একখানি হাত রাখিয়া নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া আছে।]

মণিমালা। (ঘরে ঢুকিয়া) ওকি বাণী ? তোকে না আমি নূতন গানটা গাইতে বললাম ? কয়েকবার না গাইলে অভ্যেস হবে কেন ?

বাণী। আমার ভালো লাগে না। আমি আর গান শিখব না দিদি।

মণি। ওকি, অত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ভাই ? চেষ্টা করলে মানুষে কত কি করতে পারে, আর তুই দুটো গান শিখতে পারবিনে ?

বাণী। সে কথা আমি বলিনি। চেষ্টা করলে রেডিও কিংবা গ্রামোফোনের চলিত গোটাকতক গান কি আমি তোমাকে বাজনা বাজিয়ে গেয়ে শুনিয়ে দিতে পারিনে! তা যদি শুনতে চাও, এখনই শোনাচ্ছি। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। কেন দিদি আমাকে ঝক্‌-ঝক্‌ পালিশ করে বাজারে বিক্রীর জন্যে বার করতে চাও ? কাল আমি পাশের ঘর থেকে তোমার ও জামাই বাবুর কথা শুনেচি। তুমি বলছিলে, মেয়ে দেখতে এসে গান জানেনা বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে তার প্রতীকার করতেই হবে। যে কিনবে তার মন ভোলানো চাই, নইলে কাটতি হবে কেন ?

মণি। পুরুষগুলো বড় বোকা। তাদের ভোলানোই চাই। শুধু আজ বলে নয় অনেকদিন থেকে মেয়েরা তাদের ভুলিয়েই এসেছে। কিন্তু তারা অহমিকায় এমনই অন্ধ যে এইটে নিয়েই আবার পসার করে বেড়ায়।

বাণী। অনেকদিন ধরে যা হয়ে এসেচে সেইটেই যে ভালো এমন কথা আমি মানবো না। আজ বলবার দিন এসেচে দিদি যে, না, ভোলাতে চাইনে। এতে যারা ভোলে ও যারা ভোলায় কোন পক্ষেরই ভালো হয় না শেষ অবধি। তাছাড়া আর একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয় আমাকে কখন কার চোখে লাগবে সেই আশাতেই কি আমার জীবনের সমস্ত আয়োজন সমস্ত প্রয়োজন নিঃশেষিত হবে ? নিজের 'পরে এমনতর শ্রদ্ধাহীনতা কল্পনা করতেই আমার বড় কষ্ট হয়।

মণি। তোর মুখে এসব কথা শুনে চমক লাগচে বাণী। তোকে ভালো করে না জেনেই ভেবে রেখে-ছিলুম তুই পাড়াগাঁয়ের লাজুক ভীরু অবোধ একটি মেয়ে। এখন দেখচি তা নয়।

বাণী। জীবনে সব বড় পরিবর্ত্তন হঠাৎই হয় ভাই দিদি। ধারাবাহিকতার ইতিহাস [illegible] সবটা ধরা যায় না। তুমি আমাকে যা ভাবতে আমি [illegible] ছিলুম কিন্তু একটা বেদনার ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ যেন জেগে উঠেচি। কি ? তা কি তুমি অনুমান করতে পারনা ? সম্পূর্ণ পরের হাতে মা নির্ব্বিবাদে আমাকে

স'পে দিলেন, বাজারের ফ্যাশানের স্রোতে তাঁর মেয়ের নেই কোন মূল্য। ক'লকাতার হালফ্যাশানের স্রোতে তাকে নাইয়ে নিতে হবে নইলে জীবন বিফলে গেল। কেউ কাণাকড়ি দাম দেবেনা।

মণি। বাণী বাণী তুই আমাকে পর ভাবলি? সম্পর্কটাই কি সব? আমি তোকে এই কয়েক মাসে যা ভালোবেসে ফেলেচি নিজের ছোট বোন কিংবা মেয়ে থাকলে তার চেয়ে বেশি বাসতে পারতুম না। কিন্তু দেখচি তোকে আমার কাছে এনে ভালো করিনি। এরই মধ্যে বড় বড় কথা চিন্তা করতে সুরু করেছিস। জীবনে যদি সুখী হতে চাস বেশি চিন্তা করিসনে বাণী। তার চেয়ে উল বোন, কার্পেট বোন, গান গা, ঝগড়া কর, তোর যা খুসী কর। ও সব বড় বড় কথা যেতে দে। এখন কাল যে গানটা শিখলি আমাকে গেয়ে শোনা দিকি।

বাণী। (বাজনায় সুর দিতে সুরু করিল এবং তাহার পর মৃদু সুললিত কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল)

[পাশের ঘরে সুবোধ এবং নীরেন সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে]

সুবোধ। (উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে) বাঃ চমৎকার গলা! আর গায়িকা বড় দরদ দিয়ে গাইচেন। বোধ হয় তিনিই নয়।

নীরেন্দ্র। খুব সম্ভব। কিন্তু সিপ্রা দেবীর পিয়ানো এত শোনবার পরে আপনার এই বাংলা গান ভালো লাগে?

সুবোধ। তাইতো, সেটাতো উচিত নয়। যেহেতু সেটা পিয়ানোর বিলিতী গৎ, আর এ শুধু বাংলা গান। তার চেয়ে বড় বেশি আর কিছু নয়।

নীরেন্দ্র। কি জানি ঐ এক জায়গায় আপনাকে আমি বুঝতে পারিনে কিছুতেই। আপনি নিজে দস্তুরমত কাজচালানো ~~বিলেত~~ফেরত অথচ কিছু বাংলা তারই উপর আপনার এত অযথা মোহ!

সুবোধ। থাক আর বলে লজ্জা দেবেন না। মোহ যদি কিছু থাকেই সে বেচারাকে একটি পাশে লুকিয়ে থাকতে দিন। আপনার তীক্ষ্ণ সমালোচনার বাণে তাকে আর কণ্টকিত করে তুলবেন না।

নীরেন্দ্র। আপনি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা!

সুবোধ। প্রহেলিকা হতে পারে কিন্তু এইটুকু শুধু জানি মোহ আছে বলেই জীবনটা বেঁচে থাকবার যোগ্য। কিন্তু এখানে এ রকম ভাবে দাঁড়িয়ে দার্শনিক আলাপ করাটা কি ঠিক হচ্চে?

নীরেন্দ্র। না না, এই যে ডাকি। ওরে চতুরিয়া তোর মাকে বলে আয় নীরেন বাবুরা এসেচেন।

চতুরিয়া। (ভৃত্য অল্পক্ষণ পর অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া) মা বল্লেন, আপনারা ততক্ষণ ব'সবার ঘরে চলুন। তিনি এখনই আসচেন।

[ভৃত্যের পিছনে পিছনে নীরেন্দ্র ও সুবোধ বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিল। ঘরখানি দেশী ও বিলাতী প্রথার সংমিশ্রণে সজ্জিত। দুই বন্ধু বসিবার মিনিট দশেক পরেই চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম পাঠাইয়া নিজে জল খাবারের রেকাবি হাতে মণিমালা ঢুকিলেন।]

মণি (অপরিচিত সুবোধের সম্মুখে মাথায় একটু-খানি কাপড় দেওয়া। তাব ভঙ্গীতে সঙ্কোচের বাহুল্য নাই, অথচ সংযতশালীনতাপূর্ণ। নীরেনের দিকে চাহিয়া) ভেবেছিলুম আজ বুঝি আর তোমার আসার অবসর হবে না।

নীরেন্দ্র। আসতে যখন হবেই তখন অনবসরের দোহাই দেওয়া মিছে। বিশেষ করে তোমার কাছে। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু সুবোধ রায়। এবং পাত্র হিসেবে আমার চেয়ে শতগুণ বাঞ্ছনীয়। এইটে শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখলুন।

সুবোধ। (নমস্কার করিয়া) আমাকে নীরেন বাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। জোর করেই এক রকম সঙ্গে নিয়ে এ'লেন। জানিনে আমার প্রবেশকে আপনারা অনধিকার প্রবেশ মনে কোরবেন কি না।

মণিমালা। (প্রতিনমস্কার করিয়া, চা ঢালিয়া দিতে দিতে) না, নীরেন ঠিকই করেচে। মেয়ে দেখতে এলে দু' একজন বিজ্ঞ বন্ধুবান্ধব সঙ্গে আনাই ভালো। একলা যাচাই করলে ঠকবার সম্ভাবনা আছে।

সুবোধ। আমাকে দেখে যদি আপনার বিজ্ঞ ব্যক্তি ব'লে ভ্রম হয়ে থাকে তাহলে শেষটায় ঠকবেন আগে থেকে বলে রাখচি।

মণি। (কোন উত্তর না দিয়া চায়ের পেয়ালা পূর্ণ করিয়া দু'জনের সামনে অগ্রসর করিয়া দিল। এবং ছোট দু'টি টিপয় দু'জনের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া জলখাবারের রেকাবি রাখিল।) একটু জল খান। ও বাণী। তোয়ালে আর পানের ডিবেটা দিয়ে যা দিকি।

(বাণী প্রবেশ করিল। তাহার হাতে রূপার পানের ডিবা। পরণে লাল পাড়ের সাদাসিধে শাড়ি। লাল রঙের একটা ব্লাউস। চলনীতে কিংবা পদক্ষেপে সঙ্কোচের জড়িমা নাই। মধুর লজ্জার পরিবর্ত্তে মুখে কিছু দৃঢ় কঠোরতার ভাব।)

মণি। ডিবেটা ঐ টেবিলের উপর রেখে আমার পাশে এই চেয়ারটায় বো'স। (সুবোধের দিকে চাহিয়া) কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে করুন। আমি এখনই আসচি।

(প্রস্থান)

সুবোধ। (নমস্কার করিয়া) আপনার নামটি কি?

বাণী। শ্রীমতী বাণী দেবী। (হাস্য)

সুবোধ। হাসলেন কেন? আমার প্রশ্নে কি কিছু অভদ্রতা প্রকাশ পেয়েচে?

বাণী। না কিছু না। আপনি তো শুধু নাম জিজ্ঞেস ক'রলেন। কত লোকে চলিয়ে দেখে খোঁড়া কিনা। চুল খুলিয়া দেখে নেড়া কিনা। আমি হাসলুম হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেলো। মনে হ'লো, লক্ষ্মীপুরে, আমাদের সেই গাঁয়ে কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে বলতুম, বাণী সুন্দরী দাসী। আর ক'লকাতায় বলচি, বাণী দেবী। এই তফাৎ। কিন্তু সত্যি কোন তফাৎ আছে কি? বলতে পারেন?

সুবোধ। সম্ভবতঃ আপনি নিজেও জানেন না যে আপনি কী সাংঘাতিক প্রশ্ন করেচেন। ও প্রশ্নটা এ যুগের প্রশ্ন: তফাৎ আছে কি? সত্যই কি কোথাও তফাৎ আছে? কেবল মানুষের বাইরের ভঙ্গীটা বদলালেই আসল বস্তুটার কোন বদল হয় কি? সভ্যতা তো বারবার নানাভাবে ভঙ্গী বদল করে দেখচে কোথাও কিনারা পাচ্চে না। অবশেষে তাকে নতশিরে স্বীকার করতে হচ্চে এমন কিছু মানুষের ভিতরে আছে যেটাকে পুরোপুরি বদল না করলে ভঙ্গীর পার্থক্যে কিছুই এসে যাবে না। চরম সর্ব্বনাশ ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই খুব শিক্ষিতা। নইলে কিছু আর এমন সহজ সরল ভাবে এমন ভীষণ প্রশ্ন করতে পারতেন না। অথচ শুনেছিলুম আপনি নাকি মোটেই লেখাপড়া জানেন না। পড়েচেন সবে ফার্ষ্ট-বুক। তাও সবটা নয়। মোটে অর্দ্ধেকটা। সেই যে, 'ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান'—সেই পর্য্যন্ত।

বাণী। না আপনি ঠিকই শুনেছিলেন। আমি ইংরেজী বেশীদূর জানিনে। বাঙালীরা ইংরেজী যেমন জানে তাই জানি হয়তো।

সুবোধ। তবে—

বাণী। তবে কি? ঐখানেই তো আপনারা ভীষণ গোলমাল করে ফেলেন। ফার্ষ্ট বুক পড়ার সঙ্গে শিক্ষার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বুঝি? আমাদের দেশের অনেক মেয়েকেই দেখবেন যাঁরা ইংরিজী জানেন না অথচ শিক্ষার আসল মানে তাঁদের জীবনে ফুটে বার হচ্চে। ইংরিজী শেখা খারাপ কিংবা ভালো, উচিত না অনুচিত তা আমি জানিনে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ কোরবার মত দম্ভও আমার নাই। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি একটা বিদেশী ভাষা মাত্র শেখার সঙ্গে আসল শিক্ষার যোগ কতটুকু রয়েচে? অথচ দেখি এখানে সবাই ঐ একই কথা বলে। আচ্ছা এবার যদি অনুমতি ক'রেন তা'হলে আমি উঠি।

(চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

নীরেন্দ্র। (সুবোধের প্রতি জনান্তিকে) আর কিছু জিজ্ঞেস কোরবে না? পিয়ানো জানেন না নিশ্চয়ই, ইংরিজী যখন জানেন না তখন ইংরিজী গৎ বাজাতে জানা অসম্ভব!

বাণী। (মিষ্ট হাসিয়া) আর কিছু জিজ্ঞেস কোরবেন বুঝি? ঠিকই ধরেচেন, পিয়ানো জানিনে। আর সেলাই? সেলাই দিদির কাছে কতকগুলো করেচি, পুঁতির তাজমহল, পশমের টিয়া পাখী, তুলোর হাঁস, আঁশের [illegible] ফুল (হাসিয়া ফেলিয়া)—সব নাম আমার ঠিক মনে নেই—আচ্ছা দিদিকে ডেকে দিচ্চি।

(প্রস্থান)

নীরেন্দ্র। (জল খাবারের রেকাবি হইতে মুখ তুলিয়া)

নাঃ, বৃথাই আপনাকে ধরে এনেছিলুম সুবোধ বাবু! ফাষ্ট বুক না পড়েই বিশুদ্ধ বাংলাতে এত বড় বড় লেকচার! ক'লকাতার সভ্য সমাজে এ কিছুতেই চলবে না। মাপ করুন সুবোধবাবু, আপনাকে অনর্থক হয়রান কোরবার জন্যে। চলুন এবার ওঠা যাক। পরে একটা খবর দিয়ে দেবেন। ফাঁড়া যা ছিল কাটলো।

সুবোধ। (গভীর অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। চমকিয়া) কী বলচেন? ফাঁড়া কাটলো? উঁহু, আমার সন্দেহ হয়। ফাঁড়া কাটেনি, ফাঁড়া আরম্ভ হলো মাত্র।

(মণিমালিকা প্রবেশ করিলেন)

মণি। (শান্ত স্বরে) আমাকে কি কিছু ব'লবেন?

নীরেন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) দিদি চলুন। রাত হচ্ছে।

সুবোধ। (সরিয়া আসিয়া, মণিমালাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া) আপনাকে বিশেষ কিছু ব'লবার নেই দিদি। শুধু এইটুকু বলে যাই, যাচাই করে দেখতে এসে যা যাচাই করা যায় না তার আভাষ পেয়ে গেলুম।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[সিপ্রাদের বাড়ীর বাগানে সিপ্রা একা পদচারণা করিতেছে। চাকর আসিয়া খবর দিল, একজন মাইজী কোথা হইতে দেখা করিতে আসিয়াছেন।]

সিপ্রা। কে রে তজুয়া? বলচিস ভাড়াটে সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী করে এসেচেন। তার আবার সব দোর জানালাগুলো বন্ধ। এমন পর্দ্দানসীন কে আছেন আমার পরিচিত যে, এ ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন? আমিতো ভেবেই পাচ্ছিনে। আচ্ছা চল দেখা যাক। না, এক কাজ কর, তাঁকে এখানেই নিয়ে আয়।

(তজুয়া আদেশ পালনার্থে প্রস্থান করিল।)

(মণিমালা গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া বাগানের পথে আসিতেছেন দেখা গেল)

মণি। (সহাস্যে সিপ্রার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) আমি আপনার পরিচিত নই। তবে নাম বল্লে যে একেবারে চিনবেন না তাও বোধ হয় না। আমি নীরেন্দ্রের দিদি, মণিমালা।

সিপ্রা। (নমস্কার করিয়া) বড় সুখী হ'লুম আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে। বসুন।

মণি। (বাগানের সবুজ বেঞ্চে বসিয়া) তুমি তো আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট সিপ্রা। তাই আপনি না ব'লে যদি তুমি বলি কিছু মনে কোরো না। তুমি ব'লবার আরও একটা কারণ, আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, এ কেবল ভদ্রতা রক্ষা করে দু'দণ্ড গল্প করে চলে যাওয়া নয়। তুমি শীগ্‌গীর আমাদের বড় আপন হবে। তোমাকে ভালো করে জানতে কাছে পেতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা সিপ্রা শুনলুম নীরেন বিলেত যাওয়ার আগেই নাকি তোমরা পরস্পরের বাকদত্তা হবে। তার আর বড় দেরীও নেই।

সিপ্রা। আপনি ঠিকই শুনেচেন। আমার মা বাবা কেউ নেই। নিজের বিষয়ে পুরোপুরি স্বাধীন। নীরেনবাবুও তাই। তাঁর অবশ্য মা আছেন কিন্তু তিনি মানেন না। আমরা দু'জনে পরামর্শ করে এই স্থির করেচি। এবং এখন পর্য্যন্ত তাই ঠিক আছে।

মণি। ভালোই কোরেচ। কিন্তু শুধু বাক্‌দান কেন? নীরেন চলে যাওয়ার আগে তোমরা বিবাহিত হ'লেই তো পারতে?

সিপ্রা। তা পারতুম। কিন্তু পরস্পরকে পরীক্ষা ক'রবার একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, ছাড়ব কেন? নিজেদের মন বুঝতেও তো সময় লাগে, সে সময় দেওয়া উচিত। এটা ঠিক প্রেম না আর কিছু—হয়তো বা মোহ······ কিম্বা একটা সাময়িক আকর্ষণ হয়তো। সেটা পরখ করা উচিত।

মণি (ঈষদ্ধাস্যে) থাক্ আর বলতে হবে না। বুঝেচি, বুঝেচি। আচ্ছা সিপ্রা কতটা সময় লাগে এ সব বুঝে উঠতে বলতে পারো তাই?

সিপ্রা। তা কি ঠিক বলা যায়। তবে কোন কাজ কোরবার আগে নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি যতদূর সম্ভব

খাটাতে হয়। বিশেষতঃ জীবনের এত বড় একটা সমস্যা যেখানে—এর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করচে।

মণি। কিসের সমস্যা, মনের? আমার তা তো মোটেই মনে হয় না ভাই। সমস্যাটা হচ্চে আসলে টাকার আর জীবন কাটাবার ষ্টাইলের। নয় কি? কিন্তু সিপ্রা, তুমি কি মনে ক'র তুমি যে ভাবে যে ষ্টাইলে অভ্যস্ত আমাদের বাড়ীতে যেয়ে তা পাবে? আমার বাপের বাড়ীতে সবাই পিঁড়ি পেতে ব'সে মুড়ি খায়। তোমাদের সঙ্কল্প স্থির কোরবার আগে এ কথাটা কি ভেবেছিলে?

সিপ্রা। কী আশ্চর্য্য, আমি আপনাদের বাপের বাড়ীতে যেতে যাব কেন? আমাকে বিয়ে কোরবার পূর্ব্বে আমার ভবিষ্যত স্বামী আমার বাড়ী তৈরী করে তুলবেন। সে বাড়ী কেবল আমারই হবে। সেখানে আর কারো মত বা অন্য কোন প্রথার স্থান থাকবে না। সম্ভবতঃ সেখানে পিঁড়ি পাতবার বা মুড়ির বাটি সাজাবার কোনটারই প্রয়োজন হবে না।

মণি। আচ্ছা, যদি তোমার ভবিষ্যত স্বামী চেষ্টা করেও সে রকম ঘর তৈরী কর্ত্তে না পারেন?

সিপ্রা। তা'হলে তিনি কোনদিনই আমার সত্যকার স্বামী হবেন না। অপেক্ষার পালাও অনেকটা সেই কারণেই। এটা আমাদের সমাজের সবাই প্রশ্ন না করেই বুঝতে পাবে।

মণি। তাই তো বলছিলেম একটু আগে, মন জানাজানি নিয়ে এতো যে সমস্যা এতো যে কঠিন প্রয়াস, তার দরকারটা কোনখানে? কারণ সমস্যা তো সত্যি মনের নয়, সমস্যা হ'লো টাকার।

সিপ্রা। মাপ কোরবেন, আপনার কথাগুলো অমার্জ্জিত এবং সম্ভবতঃ রুচি বিগর্হিত। তেমন ভালো শোনাচ্চে না।

মণি। তা তো কিছু বিচিত্র নয় ভাই। সত্যকথা প্রায়ই মার্জ্জিত হয় না। আর রুচির কথা যদি তুললে, রুচি বেশি ঠুনকো হওয়া ভালো নয়। কিন্তু আমি এই ভেবে অবাক হচ্চি, এই যদি তোমাদের সমাজের চুক্তি হয় তাহলে তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে সত্যকার যোগবন্ধন থাকে কোনখানটায়?

একজন বড় চেষ্টায় অনেক যত্নে অনেক ঝড় ঝাপটার পরে ঘর তৈরী করলে তোমরা দয়া করে সেই ঘরের ঘরনী হতে রাজী হবে। আর যদি খাঁচাটা দস্তুর মত স্বাচ্ছন্দ্যকর না হয় তাহলে আরও কোন তৈরী দাঁড়ে ব'সতে উড়ে যাবে। কিন্তু তারপর?

সিপ্রা। তারপর আর কি, তারপর স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, আরাম। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই। নইলে আপনাদের ঘরে ঘরে যেমন দৃশ্য দেখা যায়, হয়তো স্ত্রী, দু তিনটি ছেলে মেয়ে সব শুদ্ধ বাপ মায়ের গলগ্রহ। পরাধীন লাঞ্ছিত জীবন। জীবন সংগ্রামের ধাক্কায় উদভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত —তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। ওটা দস্তুর মত বর্জ্জনীয়।

মণি। সব জানি, সব মানি। কিন্তু তবু তাদের স্ত্রীদের দাবী করবার কিছু আছে। সুখে দুঃখে তারা এক সঙ্গে ঘর বেঁধেচে। সে সৃষ্টি দু'জনের। সে রকম বন্ধন পাবে কোথা তোমরা?

সিপ্রা। তার চেয়ে ঢের বড় বন্ধন আছে আমাদের। আমরা একসঙ্গে চা খাবো একসঙ্গে চেঞ্জে যাব, এক সঙ্গে সিনেমা দেখবো একসঙ্গে শেলী পড়বো। একসঙ্গে শপিং করবো। আরও কি চা'ন এর পরে?

(নীরেন গেটের পথে ঢুকিল। আশা করিয়াছিল সিপ্রাকে একলা পাইবে, কিন্তু মণিমালাকে শুদ্ধ তথায় দেখিয়া ভারি হতাশ এবং অপ্রস্তুত হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।)

মণিমালা। নীরেন, দাঁড়িয়ে রইলে যে! এসো। আমি এরই মধ্যে সিপ্রার সঙ্গে দিব্যি ভাব করে নিয়েচি। দেখে রাগ হচ্চে না তো?

নীরেন। (নিকটস্থ হইয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্ বাঁচা গেলো। আমি শুধু ভাবছিলুম। তোমার হাত থেকে রেহাই পাব কেমন করে? সব শুনেচ বোধ হয়?

মণি। (হাসিয়া ফেলিল) আমাকে দেখে তাই খুসী হ'তে পারোনি। ভাবছিলে, এখানে পর্য্যন্ত ধাওয়া করে এসেচে, মতলব হয়তো ভালো না।

নীরেন। গোপন করে লাভ নেই, অনেকটা তাই ভাবছিলুম।

মণি। ভয় নেই। আমি এসেচি সিপ্রার সঙ্গে ভাব করতে আর তোমাদের কাছে জেনে যেতে তোমাদের বন্ধু সুবোধবাবু লোকটি কেমন। তিনি কাল আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েচেন, বাণীকে তিনি বিয়ে করতে চা'ন। তাঁর এ বিবাহ প্রস্তাব বাণীর মাকে জানাতে; দাবী দাওয়া তাঁর কিছুই নেই। শুধু আমরা যদি তাঁকে গ্রহণ-যোগ্য মনে করি।

নীরেন। (উৎসাহিত হইয়া) সুবোধ লিখেচে এমন কথা! তার চেয়ে ভালো পাত্র আমিতো কল্পনাও কত্তে পারি না। অগাধ টাকা বিলাত ফেরত ব্যরিষ্টার! তোমা-দের সেই পাড়াগাঁয়ে মেয়েটির কপাল ভালো।

সিপ্রা। (নীরেনকে কটাক্ষে বিদ্ধ করিয়া) অগাধ টাকা, তা বটে। কিন্তু অগাধ টাকাও উপেক্ষা করতে পারে দুনিয়াতে এমন লোকও আছে। নীরেনবাবু এত শীঘ্র ভুলে যাবেন না সে কথাটা।

নীরেন। ভুলে যাবো! আমি! আমি আজও তো বুঝতে পারিনে কিসের জন্তে এমন হলো। আমি যে কোনদিক থেকেই এর যোগ্য নই। কেবল আমি তোমাকে পাবার জন্তে মনে মনে সাধনা করেছিলুম, হয়তো শুধু সেই জোরেই—সিপ্রা (লজ্জিত স্বরে) তোমার দিদি রয়েচেন এখানে।

মণি। (সহাস্তে) ওর দোষ নেই। জীবনে এমন সময়ও আসে যখন ও সব অবান্তর কথা মনে থাকে না। কিন্তু আমি যে কথার উত্তর চাইলেম, তাতো পেলুম না। সুবোধবাবুকে তোমরা অনেকদিন থেকে জানো। তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের মত কি? আমার তো যতদূর মনে হয় তিনি স্বভাবতঃই ভদ্রলোক।

নীরেন। ~~তা ছাড়া~~ অগাধ টাকা, বিলেত ফেরত।

মণি। (ঈষৎ হাসিয়া) বারংবার তোমার মুখে ঐ দুটো কথাই শুনচি। কিন্তু তারপর?

(সুবোধ পিছন দিক হইতে একটা লতাকুঞ্জ অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিল।)

সুবোধ। ক্ষমা কোরবেন দিদি। আপনার প্রশ্ন আমি শুনতে পেয়েচি। কিন্তু তারপর কি, সে পরিচয় আজই পাবেন কেমন করে? তার জন্তে অনেকদিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে। যখন পাবেন তখন তো কপালে ফাঁড়া যা ছিলো ফলে গেছে। পরিচয় পেয়েও বিশেষ লাভ হবে না। হা হুতাশ করাই সার হবে।

মণি। না ভাই, সে ভয় আমার নেই। তোমাকে দেখেই তোমার পরিচয় আমি অনেকটা পেয়েচি। কিন্তু তখন থেকে কেবল ভাবচি, তুমি যা চাও তা বাণীর কাছে পাবে কি? এখন যুগ গেছে বদলে, সেকালের মেয়ে আমি, আমি কি জানি তোমরা তোমাদের স্ত্রীর কাছে কি চাও? তাই ভয় হয়—

সুবোধ। মিথ্যে আপনার ভয় দিদি। অনেক দেশ ঘুরেচি, অনেক উল্টোপাল্টা অবস্থার মধ্যে দিয়েও জীবন-টাকে দেখেচি। আমি বলচি আপনাকে নারীর কাছে সমস্ত কালের সব পুরুষের প্রার্থনা একই। যুগে যুগে সেই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি হয়ে এসেছে। বিশেষ কিছু অদল বদল ঘটে নি। স্ত্রীর কাছে তারা চায় শান্তি, চায় নির্ভরতা। এর চেয়ে বড় চাওয়া আর নেই।

মণি। বাণী তোমার সে প্রার্থনা সর্ব্বতোভাবে মেটাতে পারবে। আশীর্ব্বাদ করচি তোমরা সুখী হও।

সিপ্রা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সুবোধবাবু। কিন্তু জানতুম না শুধু এই কথাটি যে, আপনি বিয়ে ক'রতে এমন উতলা হয়ে উঠেচেন। আশা করি এবার আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। পরম শান্তি এবং নির্ভরতায় দিন কাটাবেন। অশান্তির লেশও গায়ে ঠেকবে না।

নীরেন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু সমস্ত পুরুষজাতির হয়ে কথা বলাটা সুবোধবাবুর সমীচীন হয় নি। উপস্থিত ঘটনাক্ষেত্রেই একটি পুরুষ হাজির আছে যার মত সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে বলে, নারীর কাছে আমরা শান্তি চাই না, নির্ভরতা চাইনা। চাই উদ্দীপনা, চাই নিত্যনূতন প্রেরণা বিচিত্ররূপে সঞ্চারিত হয়ে নারী আমাদের প্রতিভাকে সার্থক করে তুলবে। এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আর নেই।

সিপ্রা। (বিমুগ্ধকণ্ঠে) আপনি কবি, আপনি ভাবুক। নীরেনবাবু, সবাই কি পারে আপনার মত করে ভাবতে?

সুবোধ। (হাসিয়া) তা অবশ্যই পারে না। কিন্তু আপনার সমস্ত কবিত্ব সত্বেও শীঘ্রই যেন আপনাকে একদিন আমারই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। নীরেন বাবু, আমি আপনাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।

মণিমালা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমিও প্রার্থনা করচি সত্যিই যেন এ অভিশাপ সফল হয়। এবং শীঘ্র সফল হয়।

সিপ্রা। ওকি, আপনি উঠ্‌চেন নাকি মিসেস্ গুপ্ত? আপনাকে অমনই ছাড়চিনে। একটু চা খেয়ে যেতে হবে। সুবোধ বাবু, আপনিও এমন শুভদিনটায় অমনই পালাবেন না যেন।

মণিমালা। (সুমিষ্টস্বরে) বেশতো! কিন্তু আমাকে মিসেস্ গুপ্ত না বলে দিদি বল্লেও তো পার সিপ্রা।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে সিপ্রা এবং নীরেন্দ্রর বাক্‌দান উপলক্ষ্যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা তখনও আসিয়া পৌছান নাই। নীরেন একধারে বাগানের নিভৃত ছায়াকুঞ্জে বসিয়া আছে। সিপ্রা সবুজ বেঞ্চির হাতায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিকাল পাঁচটা তখনও সূর্য্য অস্ত যান নাই।)

নীরেন। (বিহ্বল কণ্ঠে) সিপ্রা, আজ আমার হাতে যে আংটি পরিয়ে দিলে, আমার জন্ম জন্মান্তর এই একটুখানি বাঁধনে বাঁধা পড়লো, আর ছাড়াবার উপায় নেই

সিপ্রা। (সেই বিহ্বলতায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিতে করিতে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া) ওকী, তুমি বাঁধনের কথা বলচো কেন? এই যে কাল সন্ধ্যেতে তুমি আমাদের 'ইব্‌সেন ক্লাবের' সভ্য হবে বলে কথা দিলে। সে ক্লাবের যারা সভ্য তাদের 'সেন্টিমেন্টালিটি' বিসর্জ্জন দিতে হবে। বাঁধন, বাঁধন আবার কি? উড়ে যাবার রাস্তা সম্পূর্ণ খোলা রেখে যে মিলন সেইটেই যথার্থ মিলন। আর সব জবরদস্তি, ধাপ্পাবাজি। প্রকাণ্ড ফাঁকি!

নীরেন। রঞ্জন বোস ঐকথাগুলো বলছিলো কাল, এইবার মনে পড়চে।

সিপ্রা। কথা কারও একচেটে হয় না। রঞ্জন বোসের কথা এখন আমারও কথা হয়ে দাঁড়িয়েচে। তিনি 'ইব্‌সেন-ক্লাবের' সেক্রেটারি হ'বেন। আমাকে প্রেসিডেণ্ট হবার জন্যে ধরেচেন। কি করি কিছুতেই না বলতে পাচ্চিনে।

নীরেন। যোগ্য লোককেই ধরেচেন। কিন্তু সিপ্রা, এখন 'ইব্‌সেন ক্লাবের' কথা থাকনা ঐ দেখ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, কৃষ্ণচূড়া গাছের উপরটা যেন জ্বলচে। অতিথিদের মোটরের হর্ণ শুনতে পাচ্চি, এই নিঃশব্দ অনন্ত মুহূর্ত্তটি এখনই তো মিশিয়ে যাবে। আর কি তা ফিরে পাবো?

সিপ্রা। যদি ফিরে না পাই ক্ষতি কি? ক্ষণকালের আনন্দটুকু নিমেষের গণ্ডুষ ভরেই পান করে নিতে চাই। অত হিসেব নিকেশ কোরবার দরকার কি? রঞ্জনবাবু কাল তাই বলছিলেন—

নীরেন। থাক। আমিও তা শুনেচি। কিন্তু আজ কিসের যেন একটা অভাব বোধ হচ্চে। আমি তোমার কাছে কি যেন চাই। ঠিক বোঝাতে পারিনে।

সিপ্রা। তুমি আমার কাছে প্রেরণা চাও। 'ইনস্পিরেশন'! সে তীব্র বৈদ্যুতিক স্ফূর্তি কোন বাধা-বন্ধনের মাঝে বিকশিত হতে পারে না। সে বিদ্যুৎ খেলে যেতে হ'লে মুক্ত আকাশের অবাধ বিস্তার চাই।

নীরেন্দ্র। (অন্যমনস্ক হইয়া) কী বলচো? আচ্ছা, সিপ্রা তরকারী রাঁধতে জানো? ......জানোনা। ও, যদি জানতে তাহলে দেখতে শুধু লঙ্কা মরীচের ঝাল দিয়ে তরকারী হয় না, একটু মিষ্টিও দিতে হয়। পাকপ্রণালীতে লেখা আছে। পড়েও দেখনি কোন দিন?

সিপ্রা। তরকারী! উঃ, তোমার মুখে তরকারীর কথা! এইটি হয়েচে কেবল ঘন ঘন সুবোধবাবুর বাড়ীতে যেয়ে। সেখানে তাঁর স্ত্রী বাণী রয়েচে। শুনতে পাই তার সঙ্গে আজকাল তোমার ভারি মতের মিল। তোমার এ অধঃপতনের মূলে ওরাই আছে। ওখানে আর তোমার যাওয়া চলবে না বলে দিচ্ছি। বুঝেচ?

নীরেন। কিন্তু এটাতো শাসনের মতো শোনাচ্ছে।

তুমি কি সত্যিই আমাকে শাসন করতে চাও সিপ্রা? বাঁধন ছাড়াতো শাসন করা যায় না। আকাশের বিদ্যুৎও কি তা'হলে বাঁধা পড়ে সুখ পায়? রঞ্জনবোস এ সম্বন্ধে কিছু বলেনি? আবিষ্কার করেনি কোন নতুন থিওরি? হয়তো তোমার ঠিক মনে পড়্‌চে না। ভেবে দেখ তো।

সিপ্রা। না না, আমি হঠাৎ রেগে ওটা বলে ফেলেচি। তোমার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি যদি তোমাকে বাধা না দেয় তবে তুমি বানীর কাছে যেও। আর সত্যি কথা বলতে কি বানীর কেমন একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। ওর মতামত আমি প্রবল ভাবে ঘৃণা করি তবু ওকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। ওকে দেখলেই মনটা খুসী হয়ে ওঠে। এমন কি কিছুদিন থেকে ওকে মিসেস রায়ের বদলে বানী আর আপনির বদলে তুমি বলতে সুরু করেচি। অথচ ওর সঙ্গে ক'টা দিনেরই বা আলাপ। আমারও অধঃপতন হতে বাকী নেই।

(সুবোধ সস্ত্রীক প্রবেশ করিল)

সিপ্রা। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) এত দেরী করে এলে যে বানী? এত দেরী সুবোধবাবু?

সুবোধ। (সহাস্যে) বিয়ে হয়েচে মোটে মাস দুই। কেমন করে আশা করেন যে সময় সম্বন্ধে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলবো?

বাণী। আঃ, চুপ করো। ঐ দেখ দিদি আসচেন!

(মনিমালা ও তাহার স্বামী কামাক্ষাপ্রসাদ প্রবেশ করিলেন। কামাক্ষাপ্রসাদ হাসিখুসী সদানন্দময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক।)

কামাক্ষা। (বাণীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে) বাঃ বাণী, মাস দুয়েকের মধ্যে ওয়াণ্ডারফুল প্রোগ্রেস! ভীষণ উন্নতি! এরই ভিতর আবার শাসনও চলছে। উঃ, স্ত্রীজাতি না পারে কি! অসাধ্য সাধন করতে পারে।

মণি। (স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) চলো আমরা ঐ দিকে যেয়ে বসিগে। এখানে থাকলে ওরা নিজেদের মধ্যে ভালো করে গল্প গুজব করতে পারবে না।

(বাগানের অপরাংশে যেখানে অপরাপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা সমাগত হইয়াছিলেন তথায় যাইতে যাইতে)

বাণীর কি চমৎকার স্বভাব দেখেচো, সিপ্রার মত ফ্যাসন দুরস্ত, কায়দাকানুন সর্ব্বস্ব মেয়েকেও নিজের আন্তরিক ব্যবহারে দু'দিনে বশ করে ফেলেচে!

কামাক্ষা। চমৎকার মেয়ে বাণী। আর সিপ্রার পক্ষে খুব দরকার ছিলো বাণীর সংস্পর্শে আসবার। এতে তার খুব উপকার হবে। সাহিত্যেই ব'লো কিংবা যে কোন আর্টের বেলাতেই ব'লো সত্যিকার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে হলে আত্মবিস্মৃত হওয়া দরকার। জীবনের বেলাতেও তাই। মানুষের সংস্পর্শে গভীর আনন্দ পেতে হলে যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মবিমোচন করতে হবে। নইলে ড্রইংরুমের বাঁধা ধরা কায়দা মাফিক আলাপে কোন লাভ নেই। সিপ্রার মত মেয়েদের আর সব আছে, এ্যাকমপ্লিশ-মেণ্ট-এরও অভাব নেই, অভাব রয়েচে শুধু ঐ জিনিষটার। ওরা অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন। কথা বলে, গল্প করে, হাসে, ভুরু কুঁচকোয়, সব যেন আগে থেকে রুটিন করে রেখেছে।

মণি। আমারও তাই মনে হয়। সেইজন্যেই আমি বানীর সঙ্গে সিপ্রার ভাব করিয়ে দিয়েচি। কিন্তু চলো আমরা ওঁদের সবারই সঙ্গে বসিগে। নইলে—

কামাক্ষা। নইলে কি?—

মণি। নইলে লোকে মনে কোরতে পারে, নিমন্ত্রণে এসেও এদের দু'জনের একলা গল্প আর ফুরোয়না।

কামাক্ষা। সত্যিই ফুরোয় না মণি!

(যেখানে বাগানের মাঝে মাঝে টেবিল পাতিয়া নিমন্ত্রিত এবং নিমন্ত্রিতারা গল্প গুজব এবং আহার করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া কামাক্ষাপ্রসাদ এবং মণিমালা বসিলেন।)

মিষ্টার সোম। বড় সুখী হলুম নীরেন্দ্রবাবুর সহিত সিপ্রাদেবীর বাক্‌দান উৎসবে এসে।

মিসেস সোম। যথার্থই যোগ্যমিলন হয়েচে। সেই যে সংস্কৃতে কি একটা কথা আছে যোগ্যং যোগ্যেন...... দূর ছাই আমার আবার মনে থাকেনা কিছু।

মিষ্টার রায়। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুযোগ্য মিলন।

মিসেস সোম। আপনি কি বলেন রাজেনবাবু?

সিপ্রার মা বাবা নেই। আপনি ওর একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়।

রাজেন্দ্র। ঠিক। নীরেন যে ভালো কবিতা লেখে এতে আমারও লেশমাত্র সন্দেহ নেই। তবে কি জানেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজন নেই কবি-প্রতিভার। আসল প্রয়োজন এখন নাট্য-প্রতিভার। দু'টোর মধ্যে পার্থক্য কোথায় নজর কোরবেন।

কামাক্ষা। (মৃদুহাস্যে) আপনার বর্ত্তমান আবিষ্কার?

রাজেন্দ্র। (সগর্ব্বে) হ্যাঁ, আমার বর্ত্তমান আবিষ্কার। সমরেশ চ্যাটার্জ্জি! নাট্য-প্রতিভা! কবিতা নয়, চাই নাটক। যে নাটকে চোখের জলের ধারায় অন্ততঃ একটি গোটা রুমাল ভিজে যায়। প্লট যদি অসম্ভব হয়, অস্বাভাবিক হয়, এমন কি হাস্যকরও হয় ক্ষতি নেই। কিন্তু চাই সেন্টিমেন্ট্, রোমাঞ্চ আর অশ্রুজল। এই তিনটেই পুরোমাত্রায় দরকার। কেমন, ঠিক না সমরেশ?

সমরেশ। হ্যাঁ, ও তিনটেই অত্যাবশ্যক। একটাও বাদ দিলে চ'লবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সুদৃশ্য বাড়ীর সম্মুখে গেটে পিত্তল ফলকে লেখা মিষ্টার সুবোধ রায়, বার-এট্-ল। মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। সিপ্রা অবতরণ করিল। দরজার কাছে বাণী দাঁড়াইয়াছিল সে কাছে আসিয়া সিপ্রাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আহ্বান করিল। বাণী এখন এ বাড়ীর গৃহকর্ত্রী, সুবোধের স্ত্রী। সিপ্রাকে আপন বাড়ীতে আজ আমন্ত্রণ করিয়াছে।)

সিপ্রা। আর কে কে আসবেন বাণী?

বাণী। আর বিশেষ কেউ নয়, বলতে গেলে আজ তুমিই আমাদের একমাত্র অতিথি।

সিপ্রা। আর কেউ নয়?

বাণী। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) ভয় নেই গো ভয় নেই, আরও একজন আছেন। নাম বল্লেই চিনতে পারবে। নীরেন্দ্রবাবু। কিন্তু তাঁর আসতে দেরী হবে। তিনি নাকি বিদেশ যাবার আয়োজনে খুব ব্যস্ত। পাসপোর্ট সম্বন্ধে এখনও বুঝি কি গোলমাল রয়েচে। আরও কি কি সব দরকার আছে তিনি আসবেন একটু পরে

সিপ্রা। সে খবর জানতে যেন আমি মরে যাচ্ছিলুম। আচ্ছা বাণী—

বাণী। বল না? থামলে কেন? কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পের ঠিক সুবিধে হবে না। চলো আমরা বাগানে বসি ততক্ষণ। এখনও বেলা আছে।

[ছোট একটুখানি বাগান। গাছপালার মাঝে মাঝে দু'একটা বেঞ্চি এবং ইতস্তত দু একখানা ফোল্ডিং চেয়ার।]

সিপ্রা। আচ্ছা বাণী, তোমাদের দু'জনের প্রথম আলাপ হলো' কেমন করে?

বাণী। (সলজ্জভাবে) সে তো দিদির মুখেই শুনেচ।

সিপ্রা। তবু তোমার মুখে আরও একবার শুনতে ইচ্ছে করচে। বল না।

বাণী। তখন আমি লক্ষ্মীপুরে যাবার জন্যে বাক্স গোছাচ্ছি, ক'লকাতায় থাকতে আর ভালো লাগছিলো না। হঠাৎ উনি ঢ্ুকলেন। আমি অবাক হয়ে ফিরে চাইতেই বল্লেন, 'ভয় নেই। আজ আমি পরীক্ষা নিতেও আসিনি কিংবা নিজের পরীক্ষা দিতেও আসিনি। সমস্ত পরীক্ষার অতীত একটি কথা বাকী রয়ে গেচে, সেইটি আপনাকে জানিয়েই চলে যাব। যদি নামঞ্জুর করেন কোন অভিযোগ কোরব না। কারণ সে বিষয়ে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

আমি হেসে ফেললুম।

সিপ্রা। হেসে ফেললে!

বাণী। ওরকম নভেলিয়ানা ছাঁদে কথা বললে কার না হাসি পায় বলো? তোমার কি পেতো না?

তখন তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সেদিন তুমি কি জান আর কি না জান জিজ্ঞেস করে ভারি ঠকেচি। কারণ তুমি যে এমন করে হাসতে জান সেতো প্রশ্ন করে জানতে পারতুম না। অথচ এখনই যা জানলুম হাজার প্রশ্নেও তার কতটুকুই বা প্রকাশ হোত।'

সিপ্রা। তারপর ?

বাণী। তারপরে বললেন, 'তোমার কাছে আমি তোমার ঐ হাসির স্নিগ্ধতাটুকু ভিক্ষা চাইছি। তুমি কি দেবে ?'—আমি বললুম, এ সব কথা দিদিকে ব'লবেনা। তাঁর হাতেই মা আমার সমস্ত ভার দিয়েচেন। তাঁর মত চাইবেন। আমি কিছু জানি না।

সিপ্রা। তুমি ঐ রকম কাঠ খোট্টা জবাব দিলে ? বেশতো—

[নীরেন্দ্র ও সুবোধ তথায় প্রবেশ করিল। নীরেন্দ্র হ্যাট্ কোট্ টাই পরিয়া নিখুঁত সাহেবি বেশে। সুবোধের পরণে সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি।]

সুবোধ। কোর্ট থেকে ফিরছিলুম, পথে নীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা। ধরে নিয়ে এসেচি। কোন বাজে ওজরে কর্ণপাত করিনি।

বাণী। বেশ কোরেচ। এখন আমি যাই ওদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের আয়োজন করেচি, দেখি কতদূর কি হ'লো।

(প্রস্থান)

সিপ্রা। (সুবোধের দিকে চাহিয়া) এখনই আপনাদের দু'জনের পূর্ব্বরাগের পালা শুনছিলুম, বাধা পড়লো। বাকীটুকু শেষ করে দিন না।

সুবোধ। ও কি শেষ হয় ? আপনারা নিজেদের মধ্যেই কি অহর্নিশি তার অনুরণন শুনতে পাচ্চেন না ? এ বস্তুর ওকি শেষ অবধি বলা যায় !

নীরেন্দ্র। আমরা ? আমাদের সঙ্গে তোমাদের মতামতের আকাশ পাতাল ব্যবধান। যেন উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু।

সুবোধ। মতের কথা ত আমি বলিনি। আমি বলছিলুম, সুরের কথা। সন্ধ্যাবেলায় পুরবী গাইলেও ভালো লাগে ইমন গাইলেও ভালো লাগে। নামের তফাতে কিছু যায় আসে না।

সিপ্রা। ভুল, ভুল। মস্ত ভুল। আমি আপনার মত সেন্টিমেন্টাল নই। বাঁধাধরার প্রতি আমি অতিশয় অশ্রদ্ধাবান। আমাদের মধ্যে যেদিন যে মুহূর্ত্তে যার অবসাদ আসবে তাকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা আর চলবে না। এখানে কোন মিথ্যা মায়া কিংবা মোহের স্থান নেই। বুঝলেন সুবোধ বাবু ?

সুবোধ। কোথা থেকে ঢুকলো এসব মাথায় ?

সিপ্রা। কেনই বা ঢুকবে না। কেন ইব্‌সেন, শ, গলস্‌ওয়ার্দ্দি য়ুরোপের সমস্ত বড় বড় প্রতিভাই তো এর নির্দ্দেশ দিয়েচেন। তাঁরা দেখিয়েচেন, প্রেমের আদর্শে এই বস্তুই শাশ্বত সত্য। আর সব ফাঁকি।

সুবোধ। সর্ব্বনাশ ! আর কি আমি আপনার সঙ্গে পারি সিপ্রা দেবী। একসঙ্গে একেবারে বার্ণার্ড শ, ইব্‌সেন, গলস্‌ওয়ার্দ্দি ! সপ্তরথীর যে নাম করে ব'সেন নি এই আমার ভাগ্য।

সিপ্রা। জানেন, আমরা আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে একটা ক্লাব খুলবো ঠিক করেচি। তার নাম ইব্‌সেন ক্লাব।

সুবোধ। সে ক্লাবের সভ্য হবার নিয়ম বুঝি এই হবে যে, মেয়েরা সেখানে সিগরেট টানবে আর পুরুষরা নাগরা পায়ে দেবে ? নাঃ, আপনাকে আর রাগাবোনা। এই বেলা পালাই। আপনি একা ব'সে আপনার মুগ্ধ ভক্তটির কাণে বীর্য্যবাণী ধ্বনিত করুন। পোষাকটাও তাই নীরেনবাবুর যেন হয়েচে যুদ্ধের বেশ। কলারটা অত্যন্ত গর্ব্বোদ্ধতের মত খাড়া হয়ে রয়েচে। টাইটা নেহাৎ বুক ফুলিয়ে সঙ্গীনের মত দাঁড়িয়ে রয়েচে। আর বেশিক্ষণ থেকে আপনাদের অভিশাপ কুড়োবনা।

(প্রস্থান)

নীরেন্দ্র। সিপ্রা !

সিপ্রা। বল।

নীরেন্দ্র। সারাদিন কত কথা বলি, কত তর্ক করি, কত কি প্রতিপন্ন করতে চাই। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই সমস্ত কথা ছাপিয়ে মনে পড়ে,. আমার যাবার আর মোটে সাত দিন বাকী। একথা তো কিছুতেই ভুলতে পারিনে।

সিপ্রা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া গাছ হইতে একটা ফুল ছিঁড়িয়া) না আমি বাণীর বাড়ী আর আসব না। এখানে

এ'লেই কি এক দুর্ব্বলতা আমাকে পেয়ে ব'সে। কত কি যে স্বপ্নের মত মনে হয় নিজেই ঠিক বুঝতে পারিনে।

নীরেন্দ্র। (অস্ত সূর্য্যের আভাময় আকাশের দিকে চাহিয়া) স্বপ্ন, হাঁ, স্বপ্নই বটে মনে হয় প্রমাণ করতে চাই হৃদয় তা চায় না।

বাণী। (অন্তরাল হইতে সে ডাকিয়া বলিল) সিপ্রা এসো। বাগানে অন্ধকার হয়ে । এখনও দু'জনে এত কি গল্প করচো? দিকে চায়ের পেয়ালাগুলি জুড়িয়ে জল হচ্ছে।

(নীরে চলিয়া গেল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গঙ্গাপুরে নীরেন্দ্র দেশের বাড়ীতে তাহার মা একটা নতুন কেনা আলমারিতে কতকগুলি ছেলের জিনিষ সযত্নে ধোয়া মোছা করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন। হরকালী ঢুকিলেন।)

হরকালী। কি করচো দিদি?

বামাসুন্দরী। (একটু যেন লজ্জিত হইয়া) এই জিনিষ পত্রগুলোর উপর বড় ধূলো জমেচে। তাই একটু গুছিয়ে রাখচি।

হরকালী। (নিকটস্থ হইয়া) ইঃ, এ যে অনেক আসবাব, এত সব আনালে কখন?

বামা। আনিয়েচি। যেটির সেটি না হলে আবার নীরেন ভারি রাগ করে। তার ফিরে আসতে তো আর বড় দেরী নেই। দু'কুড়ি পাঁচ দিন আর মোটে।

হরকালী। ফিরে এ'লেও ক'লকাতা ছেড়ে সেকি আর এই জঙ্গলে আসচে। এই বাণীকেই আজ দেখ না এক বছর ধরে আনবার চেষ্টা করচি। জামাই ছুটি না পেলে আসতে পারে না। যখন ছুটি পায় তখন আবার একটা না একটা বাধা এসে পড়ে। কখনো মনে হয় এর চেয়ে গাঁয়ে ঘরে বিয়ে দিয়ে যদি নিজের কাছে রাখতুম। আমার ঐ একটি মেয়ে, আর তো কেউ নেই।

বামা। দাঁড়িয়ে কেন ভাই? বোস, একটা পান খাও। (পানের ডিবা খুলিয়া একটা পান দিলেন।) তা তুমিই তো জেদ করে বাণীর ক'লকাতায় বিয়ে দিলে।

হরকালী। সে ঠিকই করেচি। আমাদের ছেলে মেয়েরা আর আমাদের ঘরোয়া গণ্ডীটুকুর মাঝে থাকবে না। একা থাকার কষ্ট অসহ্য হয়ে পড়লে আবোল তাবোল পাঁচ রকম মনে করি বটে কিন্তু বুঝতে পারি যা করেচি ঠিকই করেচি।

বামা। তবুও একা আর থাকা যায় না। সমস্ত জীবন যাদের অবলম্বন করে কাটালাম আজ দেখচি তারা দূরে সরে গেছে। এখন বাকী রয়েচে শুধু অন্ধকার আর ধূ-ধূ নির্জ্জনতা।

হরকালী। দূরে গেলে যদি তারা সুখে থাকে তবে দূরেই থাক না।

বামাসুন্দরী। (হাতের ঝাড়নটা রাখিয়া দিয়া, শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া) চলো তার চেয়ে আমরা কাশীবাস করিগে। যেখানে চোখ মেলে চাইলেই ভগবানের মন্দির দেখা যায়। সমস্ত দুঃখ দুর্ভাবনার বোঝা ফেলে রেখে চলে যাই।

হরকালী। না আমার যেতে ইচ্ছে করে না দিদি। বাণী বিয়ের পরে তাদের দু'জনের একত্রে ফটো তুলিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলো, দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। যখনই তার সেই হাসি হাসি মুখখানির উপর নজর পড়ে যায় আমি সমস্ত কষ্ট ভুলে যাই। এই ভালো। আমরা যে কালের মানুষ, আমাদের সেই কালের সঙ্গে আমাদের একালের ছেলে মেয়ের আর সম্পর্ক নেই। আমরা জোর করে সম্পর্ক রাখতে গেলেই তাদের মনে নানা অশান্তি ঘটাবো। কাজ কি ভাই। যাদের সব চেয়ে ভালোবাসি তাদের সর্ব্বরকমে সুখী করবার জন্যে সবই সয়ে থাকবো। একা থাকার কষ্টও সয়ে যাবেই আনন্দে।

বামাসুন্দরী। আমিও যদি তোমার মত করে ভাবতে পারতুম ভাই।

হরকালী। পারবে একদিন। এখন এস, আমি শুদ্ধ লেগে তোমার জিনিষগুলো গুছিয়ে দিই।

(দু'জনে মিলিয়া নীরেন্দ্রর জন্য সমাহৃত আলমারীর জিনিষপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিতে লাগিলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

(সিপ্রার শয়নকক্ষে সে একখানা চিঠি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। ভাবে বোধহয় উক্ত চিঠিখানা অসংখ্যবার পড়া হইয়াছে।)

সিপ্রা। (আপনমনে) কবি মানুষ, চিরকালের কথায় পাওয়া। তা জানি। কিন্তু এসব আমাকে লিখবার মানে কি! এত ফেনিয়ে এত বর্ণনা করে আসল কথাটা বলতে চান কি? মিস্ এলিজা ভুলিট্‌ল্ তাঁকে সমুদ্রের ধারে ব'সে কি বলেছিলো, তার কথার থেকে হঠাৎ তিনি কেমন করে আবিষ্কার করেছিলেন ওদেশের মেয়েদের মধ্যে আছে একটা স্বাধীন আত্মার ছটা—এসব আমাকে লিখবার মানেটা কি? আমি কি এসব কথা শুনবার জন্যে মরে যাচ্ছিলেন! না শুনতে না পেয়ে আমার ঘুম হচ্ছিল না।

[বাণী ঘরে ঢুকিল]

সিপ্রা। (খামখানা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া) এই যে, এসো!

বাণী। কি এত মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলে ভাই, নীরেনবাবুর চিঠি বুঝি? কিন্তু যাই বলো, তুমি যে সেদিন ওঁকে চিঠি লিখেছিলে সেটা আমার ভালো লাগে নি।

সিপ্রা। বাঃ, তুমি সে চিঠি পড়লে কেমন করে?

বাণী। সেদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে তুমি যেই গা-ধুতে উঠে গেলে, অমনি আমি তোমার লেখার টেবিলের ড্রয়ার খুলে—

সিপ্রা। চুরি করে পড়লে। নয়?

বাণী। (স্মিতহাস্যে) পড়লুমইতো। চুরী করেই যদি পড়ে থাকি তাতে কি হয়েচে! কিন্তু পড়ে হতাশ হয়ে গেলুম। সাত পাতা জোড়া চিঠির আগাগোড়া তোমাদের রঞ্জন বসু, অশোক সেন আর 'ইবসেন' ক্লাবের কথায় ভর্তি। আর তার ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বক্তৃতা তুমি কি মনে কর ঠিক এই সব শুনবার জন্যে নীরেনবাবু মরে যাচ্ছিলেন? ও চিঠি পেয়ে তিনি আনন্দে নৃত্য কোরবেন?

সিপ্রা। কি করে জানবো ভাই তিনি কিসের জন্যে মরে যান। আমি তো তোমার মত হাত গুনতে জানিনে। কিন্তু তোমাদের নীরেন বাবুই বা কি এমন অপরূপ চিঠি লেখেন। এই নাও, পড়ে দেখো। সমস্ত চিঠিময় কোথা-কার এলিজা ভুলিট্‌ল্, মিস ডুডিবার্ট এঁদের কথাতেই ভর্তি। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ওদের দেশের মেয়েদের বিশ্বরূপ দর্শন। অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হ'য়েছিলেন ওঁরও সেই দশা!

(বাণীর গায়ে চিঠিখানা ছুড়িয়া দিল)

বাণী। (চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িয়া) বুঝেচি ভাই।

সিপ্রা। কি বুঝলে?

বাণী। এ বুঝি তোমাদের দু'জনের দু'জনকে পরীক্ষা। তা ছাড়া আর কি বলবো।

সিপ্রা। পরীক্ষা? হাঁ, তা বটে। আমরা পরস্পরকে দেখতে চাই যে পৃথিবীর বৃহৎ ক্ষেত্রে চোখ কাণ খোলা রেখেই আমরা—

বাণী। না না, ও সব কিছু না। তোমরা খাঁচার মধ্যেই সেই ঢুকতে অস্থির হয়ে উঠেচ। কেবল মুখে বড় বড় কথার স্রোত এখনও থামলো না।

সিপ্রা। খাঁচা! স্ক্যাণ্ডালাস! কী বলচো তুমি বাণী!

বাণী। খাঁচা ছাড়া আর যে কি বলবো খুঁজে পাচ্ছিনে ভাই। যতই দর্শন-শাস্ত্রের বুলি আওড়াও কিংবা বিলেতী সাহিত্যের চোখা চোখা বাণ সন্ধান কর মান্ধাতার আমলের সেই সনাতনী খাঁচাটা আজও অক্ষয় হয়ে রয়েচে। ঐ যে তুমি নীরেন বাবুর চিঠিখানি আমার গায়ে ছুঁড়ে দিলে, তার মানে জানো কি? না জানো তো বলি।

সিপ্রা। থাক, থাক, আর বলতে হবে না বাণী।

বাণী। (কোমল সুরে) কিন্তু কেন তোমরা এমন করচো ভাই? খাঁচার বন্ধন যদি বন্ধনই হয়, তাতে লজ্জা পাবার কি রয়েচে? মুক্তি কে চায় বলো? বন্ধন যখন এত মধুর। তুমি কি তা মনে মনে অনুভব ক'রনা সিপ্রা? তুমি কি মুক্তি চাও?

সিপ্রা। (টেবিলে মাথা রাখিয়া, মথিতকণ্ঠে) বাণী, তুমি অমন করে আর বোলো না, তুমি আর এসো না। তুমি এলেই আমার সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। এতদিন যা ভেবেচি সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি বলে মনে হয়। সব সংকল্প সব লক্ষ্য জট পাকিয়ে যায়, কিছুতেই আর ছাড়াতে পারিনে।

বাণী। তুমি বারণ করলেও আমি আসব। কারণ আমি জানি জীবনের একটা অবস্থায় সমস্তই গোলমাল না হয়ে গেলে সুখী হওয়া যায় না। আমি তোমাদের সুখী দেখতে চাই। তোমাদের যে এখনও নাড়ী ছাড় ছাড় হয় নি, এখনও যে তোমাদের মগজের ভিতর দিয়ে বড় বড় তত্ত্ব আনাগোনা করচে, এতে আমি অবাক হয়ে গেচি। এইটে ভেঙ্গে দিয়ে সমস্তই আমি এলোমেলো করে দিতে চাই। যাকে বলে কালবৈশাখীর ঝেড়ো হাওয়া

সিপ্রা। (নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া রিষ্ট ওয়াচের দিকে চাহিয়া) কিন্তু মাপ কর বাণী, আমাকে এইবার উঠতে হবে রঞ্জন বসুর ইভনিং পার্টিতে আজ নেমন্তন্ন। প্রায় সময় হয়ে এসেচে।

বাণী। বেশ, আমিও এবারে উঠচি। (একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া) আচ্ছা সিপ্রা কি করে এত ঘুরে বেড়াও? এ পার্টি থেকে সে পার্টি, অমুকের ড্রইংরুম থেকে অমুকের ড্রইংরুমে। শ্রান্তি লাগে না তোমার? ঐ তো আকাশে এক টুকরো চাঁদ উঠেচে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্চে, তোমাদের বাগানে ছায়াতে আলোতে জড়িত নিস্তব্ধ রাত্রির রূপ। এ সব দেখে কখনো হঠাৎ তোমার মনে পড়ে যায় না, তুমি বড় একা?

সিপ্রা। একা ওসব ভাববো কখন? আমি তো তোমার মত কুনো স্বভাবের নই। সর্ব্বদাই সমাজে মেলা মেশা করি। সামাজিক দায়িত্ব কখনো কোন ছলে এড়িয়ে চলিনে।

বাণী। যতই দায়িত্ব বহন করো, তবু তুমি বড্ড একা। নিজেও জান না যেন নিজের কিসের অভাব।

সিপ্রা। (মোহাভিভূতের মত) কিসের অভাব?

বাণী। অভাব তোমার নিজেকে দান ক'রবার। পুরোপুরি দিতে না জানলে চিরদিনই তো ড্রইংরুমের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে। অন্দর মহলে ঢুকতে পারবে না কখনো। বন্ধন স্বীকার করো সিপ্রা, স্বীকার করো তুমি বাঁধতে চাও আর বাঁধা পড়তে চাও। বড় বড় কথায় তোমার সুখ নেই। (হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া) আমি শুধু মিছে বকচি, তুমি নিজেই যেন একথা কিছু কম জানো! শুনলুম আজ দিদির কাছে নীরেন বাবুর পাশের খবর বেরিয়ে গেচে। খুব ভালো করে পাশ হয়েচেন। মাস-খানেকের মধ্যেই নাকি ফিরে আসচেন, সত্যি?

সিপ্রা। হুঁ, সত্যি। কিন্তু আটটা বেজে গেলো, এবার উঠি।

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

বাণী। এক কাজ করনা বোন, ঐ তো একই পথ, চল না দু'জনে এক সঙ্গেই যাই। রাস্তাতে আমার বাড়ী পড়বে, নামিয়ে দেবে। উনি ক্লাব ফেরত নিতে আসবেন বলেচেন, সে অনেক রাত হবে।

সিপ্রা। তার মানে আরও আধ ঘণ্টা তোমার সঙ্গ সহ্য করতে হবে।

বাণী। বড্ড অসহ্য মনে হচ্চে বুঝি ভাই? আচ্ছা নীরেনবাবুর আসবার খবর শুনে শুধু একটা ছোট্ট হু বলে চুপ করলে যে। নিজেকে ফাঁস করতে চাও না বুঝি। কিন্তু তোমার চোখের কোণের চাপা হাসি অনেক কথাই প্রকাশ করে দিচ্চে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[মণিমালার বাড়ীর একতলার ঘরে তাহার স্বামী কামাক্ষা-বাবু এক পেয়ালা চা ব্যস্তভাবে পান করিয়া লইতেছিলেন। বেলা আটটা বাজে। মণিমালা বাইরে বাহির হইবার জন্ত একেবারে প্রস্তুত হইয়া সে ঘরে ঢুকিল।]

মণি। গাড়ীটাকে আনতে বললে? আটটা বেজে গেলো, ন'টায় ট্রেণ আসবে।

কামাক্ষা। (চা পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া) গাড়ী তৈরী। কিন্তু আমি ভাবচি, তোমাকে বা আমাকে দে'খবার জন্যে তো নীরেন খুব বেশী ব্যস্ত হবে নেই। এতদিন পরে এসে সে সবচেয়ে আগে যাকে দেখলে খুসী হবে সে যাবেনা আমাদের সঙ্গে?

মণি। কে? সিপ্রা তো? তাকে আসবার জন্যে লিখেছিলুম। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কই এলো না। আর অপেক্ষা ক'রবার সময় কোথা?

কামাক্ষা। আমাদের সঙ্গে যেতে বোধহয় তার লজ্জা হয়েছে। হয়তো যেয়ে দেখবো সে ওদিক থেকে আমাদের চেয়ে আগেই ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছে।

মণি। খুব সম্ভব তাই। চল, যাওয়া যাক। আর দেরী করা উচিত নয়।

(প্রস্থান)

[মিনিট পাঁচেক পরে বহির্দ্বারে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। ধুতি চাদর পরিহিত নীরেন্দ্র অবতরণ করিয়া ভাড়া মিটাইয়া গাড়ীটাকে বিদায় করিয়া দিল।]

নীরেন্দ্র। (বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে।) সমস্ত বাড়ীটা চুপ চাপ। কেউ কোথাও আছে বলে মনে হচ্চে না। আমি আসবো জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলুম। কোন তারিখে কখন পৌঁছোব জানিয়ে তার করেছিলুম। পায়নি নাকি? কী ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্চে না। কারও কিছু হয়নি তো!

চতুরিয়া। (প্রবেশ করিয়া) আঁ্যা, দাদাবাবু আপনি এসে গেছেন! মা আর বাবু যে এইমাত্র আপনাকে আনতে গাড়ী করে ষ্টেশন গেলে।

নীরেন্দ্র। (রিষ্ট ওয়াচের দিকে চাহিয়া) ও, বুঝেচি ব্যাপারটা। দিন পনেরো থেকে যে নতুন টাইম টেবল অনুসারে ট্রেণের সময় গেছে বদলে, দিদি অতটা খেয়াল করেনি। যাই হোক, ওরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে। ততক্ষণ বসা যাক।

চাতুরিয়া। আসুন, আপনি উপরের ঘরে ব'সবেন আসুন। আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

[নীরেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া উপরের বসিবার ঘরে একটা সোফায় আসিয়া বসিল। ঠিক তাহার সম্মুখের দেয়ালে সিপ্রার একটা ফটো টাঙানো ছিল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ওধারে গেল এবং দেয়ালের হুক হইতে ফটোখানি খুলিয়া লইয়া আপনার একান্ত সন্নিকটে লইয়া আসিল।]

[বারান্দায় সিপ্রার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

সিপ্রা। চতুরিয়া তোমার মা কি এর মধ্যে ষ্টেশনে চলে গেলেন?

চতুরিয়া। হাঁ, অনেকক্ষণ গেছেন। হয়তো এখনই এসে পড়বেন। আপনি ততক্ষণ ঐ ঘরে একটু ব'সুন। আমি চা নিয়ে আসি।

[চতুরিয়া অঙ্গুলী দ্বারা যে ঘরে নীরেন্দ্র বসিয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া গেল।]

সিপ্রা। (হাতের ঘড়িটার পানে চাহিয়া) অনেকক্ষণ আর কোথা গেছেন, এইতো সবে আটটা পনেরো। আচ্ছা, ততক্ষণ বসি। তা ছাড়া ষ্টেশনে গেলেও আমার কেমন যেন নার্ভাস্ লাগছিলো। ঠিক কেমন যে বোঝাতে পারি না।

[সিপ্রা বসিবার কক্ষের দ্বার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরেন্দ্র খানসামার মত একটু হাতে ফটোখানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিপ্রার কণ্ঠ শুনিতে পায় নাই কিংবা তাহার আগমন টের পায় নাই।]

সিপ্রা। (কাশিয়া) আপনি এসে গেছেন!

নীরেন্দ্র। (চমকিত হইয়া) আপনি! (হাতের ফটোখানা তাড়াতাড়ি টাঙাইয়া দিল।)

সিপ্রা। নমস্কার। বেশ ভালো ছিলেন?

নীরেন। (কোন জবাব দিতে পারিল না)

সিপ্রা। (হাসিয়া) বসুন। দেয়ালের কাছে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? মাকড়সার জাল দেখচেন বুঝি? মাকড়সার জাল তবু চোখে দেখা যায়, খুব সূক্ষ্ম তবু হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু সংসারে এমন জিনিষও আছে যা হাতে ধরাও যায় না চোখে দেখাও যায় না। ছিঁড়ে ফেলাও যায় না। কি বলুন তো?

নীরেন। (নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া) কি জানি, ছেলেবেলায় এককালে ধাঁধার উত্তর দেবার খুব নেশা ছিলো। এখন আর পারিনে।

সিপ্রা। তার কারণ এখন নিজেই হয়তো একটি মূর্ত্তিমান ধাঁধা হয়ে উঠেচেন নয় কি? এই যে, চতুরিয়া চা এনেচে দেখচি। বসুন, চা খান।

(চতুরিয়া ট্রের উপর পেয়ালা দুইটা আনিয়া টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান করিল)

নীরেন। (সরিয়া আসিয়া একটা পেয়ালা তুলিয়া লইল। এখন তাহার কণ্ঠস্বর সহজ; পূর্ব্বেকার অভিভূত ভাব আর নাই।) তারপর, আপনি কেমন ছিলেন? আপনাদের 'ইবসেন' ক্লাবের খবর কি? কিন্তু হঠাৎ 'ইবসেন'কে ধরে টানলেন কেন? আমাদের দেশের ক'টা মেয়েতেই বা 'ইবসেনে'র লেখা পড়েচে?

সিপ্রা। না পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু নারী প্রগতির কথা বলতে গেলে আগে 'ইবসেনে'র কথাই মনে পড়ে। আমাদের ক্লাবের নাম তাই জন্তেই ঐ নামে রাখা হয়েচে।

নীরেন। কিন্তু আপনার কি একবারও মনে পড়লোনা আমাদের আপন ঘরের একান্তপ্রিয় দরদী লেখক শরৎচন্দ্রের কথা? আমাদের দেশের মেয়েদের আত্মবোধ জাগাতে তিনি যা করে গেচেন তার তুলনা মেলা ভার।

সিপ্রা। কী আশ্চর্য্য, আপনিও আবার বাংলা নভেল পড়েন না কি? এই যে যাবার আগে সেদিন বসে গেলেন বাংলা বই পড়বার যোগ্য নয়

নীরেন। বলে গিয়েছিলুম, অথচ ওখানে যখনই সময় পেতুম সমস্ত অবসর সময়টাই শরৎবাবুর বই পড়তুম। আমি যাবার দিন অনেকে অনেক রকম উপহার দিয়েছিলেন। বাণী আমাকে একসেট শরৎবাবুর বই দিয়েছিলেন।

সিপ্রা। তাই পড়তেন? আচ্ছা, আর কি করতেন?

নীরেন। পড়াশোনা করতুম। দু'একজন বন্ধু বান্ধব জুটেছিলো; তাদের সঙ্গেও খানিকটা সময় কাটতো। তাছাড়া আরও অনেক কিছুই করতুম। সব কি বলা যায়।

সিপ্রা। (মুচকি হাসিয়া) আচ্ছা, আমি আসবার ঠিক আগে ঐ দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে যা করছিলেন তাই করতেন না তো? সব বলা যায় না। নয়?

নীরেন। সিপ্রা!

সিপ্রা। (সাভিমানে) আর সিপ্রা কেন? এবারে যখন 'আপনি' বলতে ধরেচেন তখন মিস্ মল্লিক বলুন।

নীরেন। সিপ্রা, যা বুঝেছিলুম সমস্ত ভুল। যা চেয়েছিলুম সমস্ত ভুল। দেশকে যে এত ভালোবাসি তা দেশ ছেড়ে দূরে না যেয়ে তো বুঝতে পারিনি। আর—

সিপ্রা। আর কি?

নীরেন। আর কি বলবো। যাবার আগে বড় গর্ব্ব করে বলেছিলুম, তোমার কাছে কেবল বিচিত্র অনুভূতির নব নব প্রেরণা চাই; আর কিছু চাইনে। কিন্তু তুমি যখন লম্বা চিঠি ভরে বিচিত্র অনুভূতির বর্ণনা পাঠাতে তখন বড় কষ্ট হোতো। অনেক চেষ্টায় সে কষ্ট সহ্য করেচি।

সিপ্রা। আর তোমার চিঠিগুলো? সেগুলো বুঝি—

নীরেন। সে চিঠি যে কি, তাও কি বুঝতে পারোনি? যত গর্ব্ব করে গেছি তাকে ধূলিসাৎ হওয়ার থেকে বাঁচাতে গেলে আরও অনেক তেমনই শুষ্ক গর্ব্বের কাঠামো দরকার। সেই দরকারেই ওসব চিঠি।

সিপ্রা। সুবোধবাবুর অভিশাপ কি বর্ণে বর্ণে ফলে গেলো। তাঁরই কথার পুনরাবৃত্তি তোমারও মুখে!

নীরেন। যদিই ফলে যায়, তাহলে তার অভিশাপের জন্মে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার পরিসীমা থাকবে না। তিনি যা বলেছিলেন খুব সত্যি। যুগে যুগে পুরুষরা নারীর কাছে সেই একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করেচে। নতুন যুগের দোহাই এখানে দেওয়া মিছে।

(বাহিরে অনেকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মণিমালা, বাণী, কামাক্ষা এবং সুবোধ ঘরে ঢুকিলেন)।

বাণী। বাঃ, কী চমৎকার! তাই জন্তেই বুঝি সিপ্রা আমাদের সঙ্গে যাও নি?

মণি। আমাদের এমন হয়রাণ করবার মানে?

সুবোধ। এ সমস্তই পূর্ব্ব ষড়যন্ত্রের ফল।

কামাক্ষা। চমৎকার প্ল্যান! উর্ব্বর মস্তিষ্ক! অপূর্ব্ব কল্পনা!

(কামাক্ষা সর্ব্বপ্রথমে বসিলেন আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কটাক্ষে সিপ্রা এবং নীরেন্দ্রনাথের লজ্জিত নত মুখের প্রতি চাহিলেন।)

কামাক্ষা। না এঁরা বড় লজ্জা পেয়েচেন। এঁদের কথঞ্চিৎ সুস্থির হতে দেওয়া প্রয়োজন, নইলে ভারি অন্যায়

করা হয়। তাই বাণী তুমি ততক্ষণ একটা গান কর। সেই অবকাশে এঁরা নিজেদের অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে নি'ন। ওরে চতুরিয়া শুধু চা দিয়েচিস কেন নীরেন বাবুকে ? যা যা, খাবার আন। আরও চা আনবি সেই সঙ্গে। নীরেন ও চা'টা আর তুমি খেও না। ওটা একেবারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ চায়ের প্রতি তোমার তেমন মনোযোগ ছিলো না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক !

মণিমালা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমি যাই। নীরেন আজ কতদিন পরে এ'লো। আজই আর ওকে চতুরিয়ার হাতের চা গেলাতে হবে না। বাণী ততক্ষণ একটা গান কর।

(প্রস্থান)।

বাণী (কটাক্ষে নীরেনের পানে চাহিয়া) আমি তো পিয়ানোর বিলেতী গৎ জানিনে। বাংলা গান কি ওঁর ভালো লাগবে ? হয়তো অস্থির হয়ে উঠ্‌বেন।

নীরেন। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না আপনি। এ কথার জবাব আর মুখে দিতে চাইনে। কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই কি এর জবাব প্রকাশ পাচ্ছে না ?

কামাক্ষা। (বাণীর প্রতি চাহিয়া) কিন্তু এমন একটা গান করা চাই বাণী, যাতে এঁরা দু'জনে নিজেদের অবস্থাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন।

বাণী। তাই তো, বড় শক্ত ফরমাস ক'রলেন দেখছি।

(বাণী উঠিয়া বাজনার কাছে গেল এবং কীর্ত্তনের সুর দিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল :

"কি কহবরে আজুক আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

যবনিকা

শ্রীআশালতা সিংহ

কবিতার জন্মতিথি দিনে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবনের বাতায়ন প'রে সেইদিন স্বপন-দুর্ল্লভ
জ্যোৎস্নার হাসি
পড়েছিল আজিকার মত।
গগনের নীল সিন্ধুপারে আমার এ নয়ন-পল্লব
ঊর্দ্ধগ উদাসী
ধ্যানস্তব্ধ ছিল অবিরত।
দূর কোন্ মৌন গোষ্ঠগৃহে গ্রামান্তের ধান্যক্ষেত্রপারে
প্রাণের বেণুকা
বেজেছিল সকরুণ সুরে।
শতশর্ব্বরীর বার্ত্তা বহি' সমীরণ শ্যামল কিনারে
আলোর রেণুকা
দিয়েছিল দিগন্তবধূরে।

কৈশোরের কিশলয় ঢাকা চিত্তপুষ্প উদার প্রাঙ্গণে
ঋতু-পরিক্রমে
দিল তার প্রথম প্রণাম,
স্নিগ্ধ শ্যামছায়াচ্ছন্ন পথে বনবধূ নুপূরশিঞ্জনে
সুপ্ত বিহঙ্গমে
জাগাইয়া মত্ত অবিরাম ;—
সেইদিন স্বর্গ হ'তে আসি আকাশের নক্ষত্রের তলে
[illegible] বনের কুটীরে
সঙ্গোপনে দিলে তুমি দেখা,
দুরন্ত ভাদ্রের কলোচ্ছ্বাসে না জানি কি যাদুমন্ত্র বলে
সুনিভৃত তীরে
পুষ্পায়িত হোলো স্বপ্ন-লেখা।

মোর চারু চিত্রবীথি মাঝে শরতের মিলন বাসরে
আনন্দ-চন্দন
পরাইয়া দিনু তব ভালে।
সেদিনের সেই সুখস্মৃতি মনে পড়ে বহুদিন পরে
নিত্য চিরন্তন
জন্ম মৃত্যু-ঊর্ম্মি নৃত্য তালে।
আসো নাই তুমি যবে মোর দীর্ণ ক্ষুদ্র উটজ আসনে
গাঢ় অন্ধকারে
ঢাকা ছিল দিবসযামিনী।
কল্পনার আলেপন রেখা জাগে নাই মৃত্তিকার মনে
শুধু পারাবারে
বরষায় ভ্রমিত দামিনী।

আজি তব জন্মতিথিক্ষণে মোর জন্ম-পরাধীন ভূমি
তোর পানে চাহি'
দিল তার অশ্রু-আশীর্ব্বাণী।
হৃদয়ের ব্যর্থতার লিপি আমি দিই তব গণ্ড চুমি'
আর কিছু নাহি,
কাব্যলক্ষ্মি! অঙ্কে তোরে টানি'।
কত সাধ ছিল মোর প্রাণে রত্ন সৌধে বসায়ে তোমারে
পরাইয়া রাখী
দিব অর্ঘ্য স্বর্গ-সুধা সেবি'
দুঃখ শোকে জীবন কুটীর ভেঙ্গে পড়ে তীব্র হাহাকারে,
সে কুটীরে থাকি'
অন্নহীনা দুঃখ পেলে দেবি!

যবনিকা

(নাটক)

শ্রীসুবোধ বসু

চতুর্থ অঙ্ক

পট উত্থিত হইলে দেখা গেল বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মুখে একা সুমিত্রা স্তবনৃত্য করিতেছে। এই সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যস্থলে চৈত্যের পশ্চাত দিকে রাজা মহীপাল প্রবেশ করিলেন; এবং স্তম্ভের আড়ালে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সুমিত্রার সঙ্গীত

নমামি চরণে জীবন-শরণ
প্রণমি চরণে কলুষ হরণ ॥
নাম মন্ত্রে যত কলুষ যায় দূরে
সব সংশয় যায় উড়ে,
অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে
আলোকোজ্জ্বল বরণ ॥
সঙ্গীত আরতি দিনু পদে
চিত্ত নিবেদন নৃত্য স্রোতে
জ্যোতির্ম্ময় রূপে এলে তমিস্র ভেদি
যত বাসনা বন্ধন ছেদি'
জগত জনগণ লাগি
তব আশীর্ব্বাদোচ্চারণ ॥

বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে সুমিত্রা বহুক্ষণ প্রণতা রহিল।—

সুমিত্রা

(উঠিয়া) প্রভু, শ্রদ্ধা গ্রহণ করো। আর সময় নেই। তাই এই গভীর নিশিথে সমস্ত চৈত্য বিহারে যখন সুষুপ্তি মগ্ন, তখন আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেচি।

পশ্চাতে রাজা মহীপাল নিকটবর্ত্তী হইল।

সারা জগতে যে আলো তুমি জ্বালিয়েছিলে, অনাচার রাক্ষসের মতো এসে সে আলো আগলে ধরেচে। তান্ত্রিকতায় দেশ ছেয়ে গেল, ঐহিকের প্রলোভন দেখিয়ে জনসাধারণকে তান্ত্রিকেরা পথভ্রষ্ট করে' অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলেচে। প্রভু, তোমার ধর্ম্ম অপমানিত হবে। তা কেমন করে' সইব?

মহীপাল পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—

ক্ষমা করো, প্রভু, ক্ষমা করো, এই ক্ষীণ দুই বাহু দিয়ে অনাচারের পথ রোধ করে, এমন সাধ্য নেই। (তেজের সঙ্গে) তবু মাথাটা উঁচু করে' তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাব, তীব্র কোলাহলের মধ্যে একবার কণ্ঠ উঠিয়ে তোমার বাণী জানাতে চেষ্টা করব। তারপর এ কণ্ঠের বাণী যদি এবারের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যায়, গেলই বা।

মহীপাল

ভিক্ষুণী!

সুমিত্রা

(চমকিয়া) কে? কে আপনি এই মধ্যরাত্রে চৈত্যে প্রবেশ করেচেন? (ফিরিয়া দেখিয়া) ওঃ, মহারাজ মহীপাল! মহারাজ, বাইরে যান্। যুদ্ধ না করে এ-চৈত্য আপনাকে আমি অধিকার করতে দেব না।

মহীপাল

ভিক্ষুণী, নিজের শক্তির উপর তোমার অগাধ শ্রদ্ধা দেখতে পাই। কিন্তু জেনো, মধ্যরাত্রে চোরের মত চৈত্য অধিকার করতে আমার প্রয়োজন রাজার কখনও হয় না।

সুমিত্রা

তবে আপনার প্রয়োজন?

মহীপাল

প্রয়োজন কিছু আছে বৈ কি; নইলে সুখনিদ্রা হতে

নিজেকে বঞ্চিত ক'রে চৈত্য অঞ্চলে সঙ্ঘনেত্রীর দর্শন আশায় অপেক্ষা করে বসে থাকব কেন। তোমার কাছে আমার প্রয়োজন আছে, ভিক্ষুণী।

সুমিত্রা

(বিস্ময়ের স্বরে) আমার কাছে? আশ্চর্য্য! বলুন, কি প্রয়োজন?

মহীপাল

সুমিত্রা, কাল প্রভাত পর্য্যন্ত বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্য তোমাকে সময় দিয়েচি; যদি রাজাদেশ অমান্য কর, রাজদণ্ড তোমার উপর বর্ষিত হবে, সে আদেশ—

সুমিত্রা

মহারাজের আদেশের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতাই তো ছিল না; তবে মধ্যরাত্রে নিদ্রাত্যাগ করে এসে সে আদেশ পুনর্ব্বার ঘোষণা করবার কিছু কি প্রয়োজন ছিল?

মহীপাল

হাঁ, সুমিত্রা, সে দণ্ড তোমার উপর বর্ষণ করতে আমার চাইতে বেশী অনিচ্ছুক আর কেউ নয়। সে অপ্রিয় কর্ত্তব্য থেকে তুমি আমাকে—

সুমিত্রা

এ কথার অর্থ কি, মহীপাল? আপনাকে অপ্রিয় কর্ত্তব্য হ'তে নিষ্কৃতি দেবার জন্য আমাকে আদর্শভ্রষ্ট হবার পরামর্শ দিতে এসেছেন? মহারাজ, ধর্ম্মের চাইতে ভিক্ষুণী জীবনকে বড় মনে করে না; যা আমার কর্ত্তব্য, তা আমি করব। আপনার কর্ত্তব্য আপনি অনায়াসে করতে পারেন।

মহীপাল

ভিক্ষুণী?

সুমিত্রা

বলুন।

মহীপাল

ভিক্ষুণী, নিজেকে পার্থিব সকল আনন্দ হতে বঞ্চিত করাই যদি ধর্ম্মের মূলসূত্র হয়, তবে ধরণীর এই বিচিত্র আনন্দের মধ্যে বিধাতা কেন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে পাঠিয়েছিলেন, বলতে পার? এত ফুল, এত সঙ্গীত, এত জ্যোৎস্নালোকিত রজনী, এত সুন্দরী নারীর হাস্য, এত বলবান্ পুরুষের শৌর্য্য কেন তবে পৃথিবীকে বিচিত্র করে তুলেচে? এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে কেমন করে' তোমরা আত্মবঞ্চিত রিক্ততার দর্শন সৃষ্টি করে তুললে?

সুমিত্রা

এ রিক্ততা নয়। এই ত্যাগ জীবকে শক্তি দান করে—নির্ব্বাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়; যা অনিত্য তার প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত করে, মহাশান্তিময় জন্মান্তরহীন পরিপূর্ণতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যায়। পৃথিবীর আনন্দ, জাগতিক সমৃদ্ধি ক'দিনের, মহারাজ? যা মাটীর ঢেলা তার প্রলোভনে পড়ে চিরন্তন আনন্দকে সুদূরতর করে তোলা কি প্রকৃত দূরদর্শিতা?

মহীপাল

জাগতিক সম্ভোগ এবং পারলৌকিক আনন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব আবিষ্কার যে দর্শনের ভিত্তি, আমার মতে, সে-দর্শনের মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই একটা ভুল রয়ে গেচে। ধরণীর মতো এমন অপূর্ব্ব বিচিত্র সৃষ্টি যে একটা প্রচণ্ড শয়তানি, এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না। [সহসা সুর বদলাইয়া] হাঁ, দেখ, ভিক্ষুণী, তোমাকে একটা নির্লজ্জ প্রশ্ন করব; সম্ভব হলে অকপটেই তার জবাব দিও।—এই ত্যাগ-সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের মধ্যে প্রকৃতই কি আনন্দ পেয়েচ? সম্পূর্ণ আনন্দ কি পেয়েচ?

সুমিত্রা

এ প্রশ্ন কেন?

মহীপাল

স্পষ্ট করে জেনে নিতে চাই, এক আদর্শ নির্ব্বাণের মোহ ছাড়া আর কোনও আশা, আর কোনও আকাঙ্খা, আর কোনও কামনা কি হৃদয়ে স্থান পায় নি? জীবনে আর কিছুই কি কাম্য মনে হয় না?

সুমিত্রা

[জোর দিয়া] না, হয় না। ধর্ম্মের মধ্যে যদি চিত্তের সম্পূর্ণ শান্তি, মনের পরিপূর্ণ আনন্দ না পেতাম, কেন, তবে কেন, ভিক্ষুণীর দুরূহ ব্রত গ্রহণ করেচি। ঐহিক সমৃদ্ধি, ক্ষণস্থায়ী সুখ, ভঙ্গুর পৃথিবী থেকে দৃষ্টি অপসৃত করে

শাশ্বতের দিকে চাইবার জন্য তাইতো সকলকে আহ্বান করতে পারি। মহারাজ, আপাত মধুরের মায়ায় কেন চিরন্তনকে ভুলে থাকবেন? সমৃদ্ধি, সম্পদ, শক্তি, শৌর্য, একি সঙ্গে যাবে?

মহীপাল

যাবে না। কিন্তু সঙ্গে যাবার মতো কিছু কি সত্যই আছে? বৌদ্ধ শাস্ত্রে যাকে স্কন্ধ বলে, নব নব জন্ম লাভ করে অবশেষে নিষ্পাপ নিষ্কাম অবস্থায় উন্নীত হয়ে যা নির্ব্বাণ লাভ করে, সে কি 'আমি'? মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাকে লোভী করে তোলে। দুদিনের পৃথিবীকে সম্ভোগ করবার জন্য আমরা কাঙালের মতো লালায়িত হয়ে উঠি। সুমিত্রা, এই জীবনের শেষে 'আমি' আর থাকব কিনা, নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারি না। তাই যে-সুযোগ পেয়েচি, তাকে নিঙড়ে রস পান করতে চাই।

সুমিত্রা

বুদ্ধের অভিধর্ম্মকে যদি বিশ্বাস না করবেন, তবে কেমন বৌদ্ধ আপনি?

মহীপাল

সুমিত্রা, বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করি; প্রার্থনা করি—মহা আনন্দময় এক পরিণতি যেন আমার তোমার সবার জন্যই থাকে—অপূর্ব্ব নির্ব্বাণের মধ্যে জীব যেন সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু ভরসা পাই না। কেবলই ভয় হয়—কীটের মতো পাঁকের মধ্যে জন্মলাভ করেচি, মরে আবার পাঁকে পরিণত হয়ে যাব। তাই তো এমন লোলুপতার সঙ্গে এই বিস্ময়কর জীবনের সমস্ত শব্দ রস গন্ধ স্পর্শ ভোগ করে নিতে চাই। তান্ত্রিকতাকে তুমি যতটা হেয় মনে কর, আমার দ্বিধা, আমার সন্দেহ নিয়ে, তা আমি পারি না। ঐহিককে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা আমার পক্ষে অসম্ভব!

সুমিত্রা

মহারাজ, ধিক্ আপনার দ্বিধা, ধিক্ আপনার সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বাসেরই যার স্থিরতা নেই, এতকালের নিষ্ঠাপূত সঙ্ঘ-ব্যবস্থার সংস্কার করতে আসা তার পক্ষে কি উচিত?

মহীপাল

নিজেদের বাধা-বিশ্বাসের কাছে যারা সম্মোহিত হয়ে আছে, আমার সন্দেহবাদ দিয়ে তাদের আমি জাগিয়ে দিতে চাই। তোমাদের বর্জ্জনের দর্শন, অনাবশ্যক আত্ম-নিপীড়নের দর্শন, যে-দর্শন ইহলোক পরলোকের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা আবিষ্কার করেচে, তার কাছে আমি একটা মস্ত প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। সে প্রশ্ন—যুক্তির প্রশ্ন। তোমরা যা বল, তা প্রমাণ কর। যদি প্রমাণ না-করতে পার, তবে কাল্পনিক 'সত্য' প্রচার করো না। হৃদয়ের সহজাত বৃত্তিকে অনুসরণ কর।

সুমিত্রা

বুদ্ধের জ্ঞানকে তবে কি আপনি অসত্য বলতে চান?

মহীপাল

না; চাই না। তাই প্রশ্ন করি, সন্দেহ দূর করতে চাই, নিশ্চিন্ত হতে চাই। কিন্তু পারি না। আমার যুক্তি আমাকে সন্দেহপর করে তোলে!

সুমিত্রা

যুক্তির তীক্ষ্ণতা সৃষ্টির এই মহারহস্যের কতটুকু ভেদ করতে পারে, মহারাজ?

মহীপাল

সামান্যই। কিন্তু যতটুকু পারে, ততটুকুই নির্ভর যোগ্য। তারপর বাকিটা—বাকিটা, সব সময়েই সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে রাখবে। পরকাল আমি আশা করি, উন্নততর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আমার লোভ প্রচুর। কিন্তু তা বলে ইহকাল ক্ষণিক ব'লেই অসত্য নয়। সে অন্তত পক্ষে ক্ষণিক সত্য।

সুমিত্রা

মহারাজ, তান্ত্রিকতার জোয়ারে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েচেন। নইলে প্রভু বুদ্ধের কোন ভক্ত কবে এই সর্ব্বনাশা মিথ্যার আবর্ত্তে পড়ে এমন নিশ্চিতভাবে দুর্গতির দিকে যাত্রা করেচে? শান্তি যদি চান, তর্ক বন্ধ করুন—প্রভু বুদ্ধের পায়ে শরণ নিন।

মহীপাল

ভিক্ষুণী, আমিও তোমাকে অনুরূপ উপদেশ দিতে পারি। বলতে পারি—ভিক্ষুণী সুমিত্রা, এ-জগতও হেয় নয়; অনেক ঐশ্বর্য্য, অনেক সৌন্দর্য্য, অনেক আনন্দ এই

পৃথিবীর ভাণ্ডারে আছে—তাকে তুমি অবহেলা করো না। পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের কোনো বিরোধ নেই: অনন্ত জীবনের এ-ও একটা অধ্যায়। তুমি এসো, এই ধরণীর আনন্দের অংশ গ্রহণ কর।

সুমিত্রা

[সগর্ব্বে] যে-আনন্দের আস্বাদ আমি পেয়েচি, ধরণীর আনন্দ তার তুলনায় কতটুকু?

মহীপাল

খুব নিকৃষ্ট নয়। প্রেমের আনন্দ কোনও দিনই কি জেনেচ? যে আনন্দ পরকে আপন করে নিতে পারে, যে-আনন্দ দুইকে অভিন্ন ক'রে তোলে, যে-আনন্দের সম্মানে বিধাতা-পুরুষ বিশ্বের উপরে নতুন বর্ণ লেপে দেন, যে-আনন্দ জন্ম জন্মান্তরকে মালার মতো গ্রথিত করে তোলে, সে-পুলকের নাম জান? জীবনকে চিরকাল ভয় করেচ, জীবনের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কতটা জান, ভিক্ষুণী।

সুমিত্রা

জানি না, জানতেও চাই না।

মহীপাল

সুমিত্রা?

সুমিত্রা

বলুন।

মহীপাল

রাজরাণী হওয়াকে তুমি কিছু গৌরবের মনে করবে না, আমি জানি। কিন্তু ধরণীর এক পুত্র যদি তোমাকে সঙ্গিনী পেয়ে স্বর্গ সুখ পাবে বলে বিশ্বাস করে, তবে তাকে একবার সুযোগ দেবে কি? সুমিত্রা, আমি একান্ত ভাবে—

সুমিত্রা

[বিস্ময়ের কণ্ঠে] এর অর্থ কি, মহারাজ?

মহীপাল

সুমিত্রা, এস। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গিনী হয়ে একবার তোমার হেম জগতটাকে নতুনরূপে দেখে যাও। বিশ্বাস কর, সে-অভিজ্ঞতা দুঃখ করবার মতো হবে না। আনন্দ কি কখনও পাপ হতে পারে? এমন অপূর্ব্ব পুলক কি কখনও ক্ষতিকর হতে পারে? এমন—

সুমিত্রা

[ক্রোধে আরক্ত মুখে] মহারাজ, বুদ্ধ চৈত্যের অভ্যন্তরে এই ইঙ্গিত শুধু অশিষ্ট নয়, অধর্ম্ম। ছি, ছি, আপনিই না দেশের রাজা! আপনিই না সকল প্রজার রক্ষক, ধর্ম্মের রক্ষক! সেই আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করতে এসেচেন!—প্রভু বুদ্ধের অনুশাসন ভঙ্গ করবার জন্ত আপনিই ভিক্ষুণীকে প্ররোচিত করচেন। ধিক্! [সহসা তীব্র কণ্ঠে] যান্, বেরিয়ে যান্। চৈত্য হতে এই মুহূর্ত্তে—

মহীপাল

শোন, সুমিত্রা কথা শোন—

সুমিত্রা

বিশ্বাসের যার স্থিরতা নেই, সে মত্ত সাগরের ভেলা। তার মতো কম নির্ভরযোগ্য জগতে আর কেউ নেই। তপস্যালব্ধ সত্যের চাইতে অর্থহীন চিন্তা চাপল্যকে যে বড় বলে মনে করে, তার মতো দুর্ভাগ্য আর কে আছে! (আদেশের সুরে) যান্, আর বিলম্ব করবেন না,—বাইরে যান্। আপনার প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ হলে সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত হবেন—চৈত্য সিংহদ্বারে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আর নয়—

মহীপাল

(আহত স্বরে) সুমিত্রা, তুমি ধর্ম্মান্ধ!

সুমিত্রা

আপনি ভ্রান্ত; প্রভু বুদ্ধ আপনার মঙ্গল করুণ।

মহীপাল

সুমিত্রা, তুমি ধর্ম্মোন্মাদনায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারচ না। মিথ্যা বিদ্রোহ করে এমন তুমি একটা সুন্দর জীবনের অবসান টেনে আনচ। সেটা যেমন নিরর্থক, তেমনি করুণ!

সুমিত্রা

করুণ! করুণ কোনটা? বিশ্বাস না অবিশ্বাস?

মহীপাল

অন্তত আমার কাছে করুণ এই, যে রাজাজ্ঞার সম্মান রক্ষার জন্ম আমাকে এমন একজনকে আঘাত করতে হবে, যাকে আঘাত করার চাইতে দুঃখ আমার কাছে বর্ত্তমানে আর কিছু নেই। এবং সব চাইতে দুঃখ এই যে, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পর্য্যন্ত তাকে আমার বক্তব্য বোঝাতে পারব না, প্রচলিত বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার সমালোচনা, আমার দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে একটুমাত্র সাড়া জাগাতে পারবে না— তার বিশ্বাস এমনই পাষাণে পরিণত হয়ে উঠেচে!—সুমিত্রা, তোমার মতো আমারও তান্ত্রিকতার উপর আতঙ্ক আছে। কিন্তু তোমার ধর্ম্ম যখন আমাকে সন্দেহ-বিমুক্ত করতে পারল না, তখন আমার দর্শনে এই তান্ত্রিকতার আংশিক আসন হলো। পরলোকের জন্ম দান ধ্যান সবই আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব, কিন্তু এই জগতকেও অবহেলা করব না। কে জানে এই জীবন যদি শেষ হয়।

সুমিত্রা

মহারাজ বাইরে যান। প্রভু বুদ্ধের সমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর তপস্যালব্ধ সত্যের প্রতি আর অবজ্ঞা দেখাবেন না। বড় কষ্ট হয়, বড় লাগে। যান্, বিশ্বাস না করতে পারেন, সরে যান্। অন্যের বিশ্বাসে আঘাত করে কেন যাতনা দিচ্ছেন? কেন তার স্বপ্নে, কেন তার আদর্শে, কেন তার আনন্দে সন্দেহ ছড়িয়ে দেবেন। বুঝচেন না—কী ব্যথা পাই। যান্ যান্, এবার যান—

মহীপাল

(সদীর্ঘশ্বাসে) তথাস্তু।

করুণ মুখে অতি ধীরে হাঁটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইল।

পুনর্ব্বার যখন রঙ্গমঞ্চ ঈষৎ আলোকিত হইল, দেখা গেল বুদ্ধমূর্ত্তির সমুখে সুমিত্রা নৃত্য করিতেছে।

রঙ্গমঞ্চ ধীরে ধীরে আবার সম্পূর্ণ অন্ধকার হইল। পুনর্ব্বার ঈষৎ আলোকিত হইলে দেখা গেল সুমিত্রা তখনও নৃত্য করিতেছে; কিন্তু বড় ক্লান্ত—পা যেন আর চলিতেছে না, বাহুযুগল আর লীলায়িত হইতেছে না।

অবশেষে অবশ দেহে টলিতে টলিতে সুমিত্রা নৃত্যের ভঙ্গিতে বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদদেশে আসিয়া প্রণামের মতো করিয়া লুটাইয়া পড়িল।

অন্ধকার হইল।

পটপতন

পঞ্চম অঙ্ক

চৈত্যাভ্যন্তর।

অতি স্তিমিত প্রদীপালোকে কোনও কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

রঙ্গমঞ্চ এক মিনিট কাল সেই অবস্থায় থাকিবার পর বাহির হইতে কাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া প্রবেশ করিল। ক্রমে তাহা মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ বলিয়া চেনা গেল, এবং তাহা আরও যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তাহা রুদ্রলোচনের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারা গেল।

ক্রমে সিংহদ্বারে আঘাত পড়িল; এবং সামান্য পরে গম্ভীরশব্দে সিংহদ্বার ঈষৎ বিভিন্ন হইল। সেই ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বার পথে রুদ্রলোচন তার মুণ্ডটা সামান্য প্রবেশ করাইয়া দিল।

রুদ্রলোচন

হুঁ হুঁ, বাবা, উৎপাটন মন্ত্র! যাকে বলে উৎপাটন মন্ত্র! লোহাই হও আর বজ্রই হও, ফাঁক হতেই হবে। তন্ত্রশাস্ত্র, যাকে বলে, গূঢ় তন্ত্রশাস্ত্র! আর আমি তন্ত্র-পারঙ্গম! এই বার মহারাজের নিকট নিশ্চয় প্রমাণ করে দিলাম যে সৈন্যবল বলো আর অস্ত্রবলই বল, তন্ত্রের অমোঘ মন্ত্রের তুলনায় তারা নিতান্তই শিশু! (মাথাটা আরও বেশি প্রবেশ করাইয়া) প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কি আমার সহ্য হয়! সারারাত অনিদ্রায় কষ্ট পাচ্ছিলাম, মনে হল, সৈন্যসামন্তের অপেক্ষায় বসে আছি কেন, এগিয়ে যাই;—সৈন্যবাহিনী পৌঁছবার পূর্ব্বেই মন্ত্রপ্রভাবে চৈত্য অধিকার করে নেই। করলামও তাই।

[চৈত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে করিতে] শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌং মধ্যে বটুকুটা। বৈষ্ণবী সৌং হ্রীং ক্লীং ঐং শ্রীং॥

সশব্দে দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস প্রবেশ করিল এবং চকিতে দীপগুলি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

তান্ত্রিক চমকিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

আঁা! এ কি? এ কী? দীপ নির্ব্বাপিত হল কি কারণে? এতো শুভ সূচনা নয়! (অন্ধকারে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া) ডাকিনী, হাকিনী, রাকিনী, কোথায় তোমরা? জবাব দাও,—প্রেত ভাষায়ই জবাব দাও। চৈত্য বিজয়ে উদ্যত হয়েচি, এ বিঘ্ন ঘটতে দিলে কেন? কেন এই দুর্ঘটনা নিবৃত্ত করলে না—কেন দুষ্টা শক্তিরা এমন যথেচ্ছাচার করবার অবসর পেল! জবাব দাও? বল, কোন প্রেত লোকবাসী এমন দুঃসাহসের কাজটা করতে সাহস পেল? তান্ত্রিক রুদ্রলোচন একটা কেউ কেটা নয়; শবাসনে পূর্ণ তিন বৎসর কাল সাধনা করে তবেই সে প্রেতসিদ্ধি লাভ করেচে। বিঘ্নকারীকে নির্দ্দেশ করে দাও, প্রেতভেদিনী মন্ত্রের প্রথম পংক্তি তার উপর অর্পণ করে দেই—অনন্তকাল ধরে বৃশ্চিকদংশন জ্বালা ভোগ করতে থাকুক।—

সহসা ন্যাস ও নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল।

ডাকিনী রাকিনী বীজে শাকিনী কাকিনীযুগম্
শাকিনী হাকিনী বীজে ক্রমাদাদ্যন্ত্য সুন্দরী॥

অকস্মাৎ থামিয়া উপর দিকে চাহিল।

অবহিত হও, হাকিনী, শ্রবণ কর ডাকিনী, মন্দোদরী রাকিনী, মনোযোগ দাও, যেমন করেই হোক, আলো চাই, যে প্রকারে হোক, আলোদ্বারা এই মসীকৃষ্ণ অন্ধকার তোমরা উদ্ভাসিত করে দাও—

সহসা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল।

উগ্রবীরং মহাবিষ্ণু জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥

এমন সময় চৈত্যের পার্শ্বগৃহে মিলিত স্তোত্রোচ্চারণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। শুনিয়া রুদ্রলোচন চকিতে সেদিকে ফিরিলেন।

কারা সব অন্তরীক্ষে সঙ্গীত করছ? এই কি সঙ্গীতের উপযুক্ত সময়? (সহসা বোদ্ধার মত সহর্ষে) ওঃ হো,—বুঝতে পেরেচি, তন্ত্রের শক্তি দেখে বিজয়ী তান্ত্রিকের জয়-গান আরম্ভ করেচ! বেশ, বেশ। তোমাদের বিজয়াভি-নন্দনে আমি প্রীত হলাম। মধুমেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে তোমাদের সকলকে আমি মধুপান করাব।—একবার লক্ষ্য কর মন্ত্র প্রভাবে অসাধ্য সাধিত হতে পারে,—লৌহকবাট মন্ত্রাঘাতে কি প্রকারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। -কিন্তু শোন, প্রেতিনীরা, আলো চাই! এই মুহূর্ত্তে আলো চাই! এই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে আমি রুদ্রলোচন সমুদ্র তীরে তৃষ্ণার্ত্ত মানুষের মতন অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শুধু মাত্র এই আলোর অভাবে চৈত্যাধ্যক্ষের আসনটা চিনে নিতে পারচি না। আমার ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হবার পূর্ব্বে—

চৈত্যাভ্যন্তর এমন সময় ঈষৎ আলোকিত হইয়া উঠিল।

হা হা হা! এই যে! এই যে! আমি প্রেতসিদ্ধ,—সমস্ত প্রেতলোকের উপর আমি আদেশ চালাতে পারি, আমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে? তবে তো সৃষ্টি-কর্ত্তার ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকতে পারে। বেশ, বেশ, বেশ! সুনয়নী, হাকিণী, সুকেশিনী ডাকিনী, করভোরু রাকিণী, আমি বড়ই প্রীত হয়েচি। [চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া] কোথায়? চৈত্যা-ধ্যক্ষের আসন কোথায়?

সহসা মিলিত সঙ্গীত স্পষ্টতর ও নিকটবর্ত্তী হইল।

একি, তোমরা সদলবলে শরীর ধারণ করেই অগ্রসর হয়ে আসচ যে? উষাকাল আসন্নপ্রায়—এ অসময়ে মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠলে কেন? (ঢোঁক গিলিয়া) বেশ, বেশ; যদি এলেই, তবে এস। চৈত্যাধ্যক্ষের আসনে আমি

আরূঢ় হই,—আমাকে বেষ্টন করে' তোমরা প্রেতনৃত্য সুরু কর।

স্তোত্রোচ্চারণ করিতে করিতে দীপ হস্তে সেবিকাপুরঃসর ভিক্ষুণীগণের প্রবেশ

(সেবিকাকে লক্ষ্য করিয়া) স্বাগতম্ ডাকিনী, স্বাগতম্—

সেবিকা।

(সবিস্ময়ে ও পরে তিরস্কারের কণ্ঠে) ডাকিনী! আমি!! আমি ডাকিনী!!!

রুদ্র

না, না, তবে হাকিনী, রাকিনী (ঈষৎ বিব্রতস্বরে) নইলে কাকি। কোন্‌টি ঠিক বুঝতে পারচি না—

সেবিকা

[রাগতস্বরে] অপমান! আমাকে অপমান! আপনি কে? কী প্রয়োজনে এখানে—

রুদ্র

আমি শ্রীশ্রী শ্রীল শ্রীশ্রীযুক্ত শ্রীরুদ্রলোচন, তন্ত্রপারঙ্গম! ধিক্, ভূতজায়া, আমাকে চিনতে এতই—

সেবিকা

[বিগলিত হইয়া] চৈত্যাধ্যক্ষ শ্রীরুদ্রলোচন! স্বাগত, প্রভু, সুস্বাগত। আমরা চৈত্যের ভিক্ষুণীদল। প্রভু, আমাদের প্রণিপাত—

রুদ্র

ওঃ তোমরা তবে মানবী বট! বেশ, বেশ। আমাকে স্বাগত করতে এসেচ শুনে প্রীত হলাম। তোমাদের সিংহকবাটের দিকে একবার চেয়ে দেখ। মন্ত্রপ্রভাবে লৌহকবাট দ্বিধা হয়ে গেচে—মন্ত্রপ্রভাবে আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করেচি। বেশ, বেশ। শোন তোমরা,—মন্ত্রপ্রভাবে আমি অসাধ্যসাধন করতে পারি। আমি মহাবল, আমি ঈশ্বরের সহচর। আমার মন্ত্রপ্রভাবে—, হ্যাঁ, দেখ,—চৈত্যাধ্যক্ষের আসনটা একবার দেখিয়ে দাও দেখি। মহারাজ চৈত্যে প্রবেশ করে যেন আমাকে চৈত্যাধ্যক্ষের আসনে আরূঢ় দেখতে পান—

সেবিকা।

আসুন প্রভু, আসুন। চৈত্যাধ্যক্ষের আসনে আপনাকে আরূঢ় দেখে নয়ন-মন সার্থক করি।

রুদ্র

বেশ, বেশ। [দ্বিধা করিয়া] কিন্তু তোমাদের সেই দুর্বিনীতা সহচরী,—অর্থাৎ, সেই যে, মানে, সেই দুঃসাহসিকা ভিক্ষুণীকে তো কোথাও—

সেবিকা।

ওঃ, রাজদ্রোহিণী সুমিত্রার কথা বলচেন? সে নিরুদ্দেশ হয়েচে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া—

সহসা সুজয়া তীব্র চিৎকার করিয়া উঠিল।

সুজয়া

ওঃ কে? ওখানে কে?

বিনীতা ও অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ

কি? কি?
কি সুজয়া?
কে?
কোথায়?

সুজয়া

প্রভুর পাদদেশে কে ঐ লুটিয়ে পড়ে আছে?

ছুটিয়া নিকট গেল।

সুমিত্রা! সুমিত্রা! (ঝুঁকিয়া পড়িয়া) জ্ঞান নেই, চক্ষু মেলে আছে কিন্তু নিষ্প্রভ—

বিনীতা ও সকলে অগ্রসর হইয়া গেল।

(নাকের কাছে হাত রাখিয়া) নিঃশ্বাস পড়ে না। বিনীতা, সর্ব্বনাশ হয়েচে—

বিনীতা

(শঙ্কিত কণ্ঠে) জল, জল। ভিক্ষুণীরা, ত্বরা করে জল আন—দেখচ না, সঙ্ঘনেত্রী মূর্চ্ছা গেছেন!

দুইজন ভিক্ষুণী ছুটিয়া বাহিরে গেল।

সুজয়া

(পাশে ভাঙিয়া পড়িয়া সক্রন্দনে) সুমিত্রা, সুমিত্রা,—সঙ্ঘনেত্রী—সাড়া দাও, সাড়া দাও—

সকলে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সেবিকা

কি মুস্কিল ! চৈত্যাধ্যক্ষ প্রভু শ্রীরুদ্রলোচন, এ আবার কি হল ? এ আবার কি বিঘ্ন ?

রুদ্র

(পৈশাচিক হাস্য করিয়া) বিঘ্ন কোথায়, বিঘ্ন তো দূর হয়ে গেল, বৎসে। এ মূর্চ্ছা আর ওর জন্মেও ভাঙবে না—হা—হা—হা।—

বিনীতা

(সভয়ে) সে কি ?

রুদ্র

একদম খতম ! মৃত্যু।

মৃত্যু ? সুমিত্রা ?

সুজয়া

সঙ্ঘনেত্রী !

বিনীতা ও সুজয়া সুমিত্রার পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল। অন্যান্য ভিক্ষুণীদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। যারা জল আনিতে গিয়াছিল তারা জল হস্তে ফিরিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া মাথা নিচু করিল।

সেবিকা

(হতভম্বের স্বরে) মৃত্যু ? না, না—

রুদ্র

রুদ্রলোচনের বিরুদ্ধাচরণ করে, কে কবে বাঁচতে পেরেচে, বৎসে ? ক্রোধ বশে গত প্রভাতে দাহন-মন্ত্রটা ঝেড়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। জানতাম, কাজ করবেই। তবু যদি ক্ষমা টমা চাইত—

বিনীতা

(অগ্রসর হইয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনার স্বরে) হিংস্র হীন তান্ত্রিক, দূর হয়ে যাও। শ্রীবুদ্ধের পবিত্র মন্দির তুমি কলুষিত করেচ—

রুদ্র

(সচিৎকারে) সাবধান ! দুঃসাহসিকা প্রগলভা নারী, সাবধান ! আমাকে পুনর্ব্বার প্রকুপিত করো না, হীনমতি ভিক্ষুণী ! তার ফল বড়ই বিষময়। ভিক্ষুণী সুমিত্রার দুঃসাহসের পরিণতি চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করেও তোমার এত ধৃষ্টতা !

বিনীতা

তুমি তাকে হত্যা করেচ, তান্ত্রিক। তোমার ইতর মন্ত্রের দ্বারা তুমি তাকে হত্যা করেচ—

রুদ্র

(সহুঙ্কারে) রসনা সংযত কর। সংযত কর। রুদ্রলোচনের বিচার শ্রেষ্ঠ বিচার—প্রকৃত ন্যায়ের বিচার। সে বিচারে অনাস্থা প্রকাশ করলে ভিক্ষুণী সুমিত্রার আত্মাকে আমি অনন্ত নরকে প্রেরণ করব। সাবধান ! তবে যদি সমবেত সকল ভিক্ষুণী ক্ষমা প্রার্থনা করে, পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা আমাকে বন্দনা করে তবে দয়া পরবশ হয়ে আমি ওর নরকাভিমুখী আত্মাকে রক্ষা করতেও পারি। ওর শবের উপর আসন করে বসে আমাকে গতিবিধায়িনী মন্ত্রের—

সুজয়া

(দাঁড়াইয়া উঠিয়া) দূর হয়ে যাও, তন্ত্রাচারী। তাকে হত্যা করেও তোমার তৃপ্তি হলো না, তার শবকেও তুমি অপমান করতে চাও ?—

রুদ্র

রসনা সংযত কর, মুখরা বালা। পুনর্ব্বার অশ্রদ্ধার ভাষা উচ্চারণ করলে খণ্ডন মন্ত্রের দ্বারা তোমার জিহ্বা খণ্ডিত করে মাটিতে ফেলে দেব। (সহসা পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে), নিশ্চয় নিশ্চয় ওর শবের উপর বসে আমি মন্ত্র পাঠ করব। এইখানে দাঁড়িয়ে, এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—দেখি, কে আমার সংকল্পে বাধা দান করে। এতে শুধু যে মৃতারই পারলৌকিক উন্নতি হবে, তাই নয় ; দেশের দশের এবং মহারাজের কল্যাণের জন্য শবাসনে বসে এখন আমাকে ইষ্ট অষ্টম মন্ত্রটা আরম্ভ করতে হবে। আর বৃথা বিলম্ব নয় ; স্ত্রীলোকের মূর্খ প্রতিবাদে কর্ণপাত করে প্রতিনিবৃত্ত হবার লোক আমি নই।—এই আমি অগ্রসর হলাম। দেখি কে আমাকে বাধা দেয়—

তান্ত্রিক অগ্রসর হইল এবং মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করিল।

ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্। ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্।

ভিক্ষুণীরা সমবেত হইয়া সুমিত্রার মৃতদেহ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

সুজয়া

সাবধান।

বিনীতা

ঐখানে দাঁড়ান। আর একটুও অগ্রসর হবেন না।

ভিক্ষুণীগণ

ধিক্ কাপুরুষ!

নির্মম ব্যাধ।

দূরে দাঁড়াও।

শবদেহ তোমার স্পর্শে কলুষিত হয়।

রুদ্র

(কুপিত কণ্ঠে) কী, এত বড় ধৃষ্টতা, এত বড় দুঃসাহস! আমাকে বাধা দান! আমাকে অপমান! আমি শ্রীল শ্রীশ্রীযুক্ত শ্রীরুদ্রলোচন, তন্ত্রপারঙ্গম—আমাকে অবজ্ঞা! বটে, বটে, বটে! ছাড়ব তবে দাহন-মন্ত্রের প্রথম পংক্তিটা?

সুজয়া

অনায়াসে; কিন্তু আমরা জীবিত থাকতে সঙ্ঘনেত্রীর মৃতদেহ তোমার কলুষ স্পর্শে অপমানিত হ'তে দেব না।

রুদ্র

বটে, বটে, বটে। তবে বেশ, তবে বেশ।—কি জানি মন্ত্রের প্রথম পংক্তিটা?— (বাহিরে তাকাইয়া) ওঃ, অন্ধকার আর নেই; প্রভাত হয়েচে।—তবে তো এতক্ষণে সৈন্যদল নিশ্চয়ই বাইরে উপস্থিত হয়েচে। (সোল্লাসে) এইবার তবে দুঃসাহসের ফলভোগের জন্য প্রস্তুত হও—রুদ্রলোচনকে বাধা দানের ফলটা প্রত্যক্ষ কর—

কটি হইতে শিঙ্গা তুলিয়া ফুঁ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বার দিয়া রাজসৈন্যগণের প্রবেশ।

এস, এস তোমরা,—অগ্রসর হয়ে এস। এই বিকৃতবুদ্ধি নারীযূথকে বলপূর্ব্বক সরিয়ে দাও। নির্ব্বিঘ্নে শবাসনে বসে আমি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ইষ্ট অষ্টম মন্ত্রটা (সৈন্যদের নিরুদ্যম দেখিয়া) দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এগিয়ে এস। বলপূর্ব্বক এদের অপসৃত কর; প্রয়োজন হলে অস্ত্রাঘাতে মুণ্ড—

সৈন্যাধ্যক্ষ

কিন্তু, আজ্ঞে, তান্ত্রিকমশায়, অযুদ্ধপরায়ণ স্ত্রীলোকের উপর বলপ্রয়োগটা কি—

রুদ্র

(ভেংচাইয়া) স্ত্রীলোকের উপর বলপ্রয়োগ করবে না, তবে তোমাদের মত বীরদের জন্য পুরুষ আমি এখানে কোথা থেকে জুটিয়ে দেব? যাও, এ আমার আদেশ। আদেশ পালন না করলে বিপদে পড়বে। এই মুহূর্ত্তে যাও। আমি তন্ত্রপারঙ্গম মহাবল শ্রীল শ্রীশ্রীযুক্ত শ্রীরুদ্রলোচন, মহারাজ মহীপালের মন্ত্রগুরু, আমি আদেশ করচি। দ্বিধা করো না, বিলম্ব করো না; স্ত্রীলোক বলে বিদ্রোহিনীদের সামান্যতম, সামান্যতম দয়া দেখালে মহারাজকে অপমান করা হবে। যাও, যাও,—এগিয়ে যাও—

সৈন্যগণ দ্বিধাযুক্তভাবে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল—এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অলক্ষ্যে রুদ্রলোচনের প্রতি অঙ্গ ভঙ্গি করিল।

পশ্চাতে মহারাজ মহীপাল প্রবেশ করিলেন।

(অট্টহাস্য করিয়া) হীনমতি অসমসাহসিকারা, এইবার অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ কর। তোমাদের নির্য্যাতন দেখে আনন্দে আমি অট্টহাস্য করি—হা হা হা। আমি হিংস্র, আমি ভীষণ, আমি দুর্ব্বার, আমি সংহারকারী রুদ্রের প্রতীক, আমি ভয়ঙ্কর—আমি ভয়ং—

মহীপাল

এতো বীরত্ব প্রকাশের কারণটা কি হল, তান্ত্রিক মশায়?

সকলে চমকিয়া পিছনে ফিরিল। সৈন্যেরা আর অগ্রসর হইল না।

রুদ্র

(চকিতে পশ্চাতে ফিরিয়া) এই যে মহারাজ। জয়োস্তু, জয়োস্তু। দেখুন, শুধুমাত্র মন্ত্রপ্রভাবে আমি চৈত্য অধিকার করেচি। উদঘাটন-মন্ত্রের প্রথম পংক্তি উচ্চারণ করা মাত্র লৌহসিংহদ্বার বিগলিত হয়ে দ্বিধা হয়ে গেল, মন্ত্রপ্রভাবে—

মহীপাল

তবে এখন হঠাৎ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে সৈন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? মন্ত্রতন্ত্র কি আর নেই? চৈত্য তো অধিকৃত; তবে এ-শৌর্য্য দেখবার হেতুটা কি?

রুদ্র

বলেন কি, এখনও যে প্রধান কাজটাই সম্পূর্ণ হয় নি। শবদেহের উপর উপবেশন করে ইষ্টিঅষ্টম মন্ত্র পাঠ করলে, তবেই যে আপনার পরিপূর্ণ শ্রীলাভ হবে। সেই রাজকার্য্যে এই সকল হীনমতি ভিক্ষুণীরা আমাকে বাধা দান করচে- শবটা অন্যায় রকম ভাবে আগ্‌লিয়ে রেখে এরা—

মহীপাল

(বিস্ময়ের স্বরে) শব? শব? কোথায়? এখানে শব কি করে আসবে। (ভিক্ষুণীদিগের দিকে তাকাইয়া বুদ্ধমূর্ত্তির পাশে শবদেহ আবিষ্কার করিয়া) ওখানে কে পড়ে রয়েচে? কাকে তোমরা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছ, ভিক্ষুণীরা? ওখানে শব কি করে—? (সহসা আতঙ্কের সঙ্গে) সুমিত্রা কোথায়? সুমিত্রা কই? তাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন?—

রুদ্র

(সহর্ষে) মন্ত্রপ্রভাব! মন্ত্রপ্রভাব! সেই দাহন মন্ত্রটা তখন ঝেড়ে দিয়ে গিয়েছিলাম—এসে দেখি একদম খতম করে দিয়েচে। কোথায় না তেজ, কোথায় বা দুঃসাহস, কোথায় বা বিদ্রোহ। মন্ত্রপ্রভাবে—হা হা হা—

মহীপাল

না, না, এ কি কথা! এ অবিশ্বাস্য! কোথায় গিয়েচে সুমিত্রা? বল, বল, কোথায় সে? আমি যে তাকে বাঁচাতে উন্মাদের মতো ছুটে এসেচি। কোথায় সে? কোথায় সে?

দৌড়াইয়া বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশের নিকট গেলেন।

এ কী? মৃত্যু! সুমিত্রা! না না, অবিশ্বাস্য, এ হ'তে পারে না। মাত্র দুই দণ্ড পূর্ব্বে তাকে আমি জীবিত দেখে গিয়েচি—তারপর এত শীঘ্র এ-ও কি সম্ভব? না না,—এ মৃত্যু নয়, কিছুতেই এ মৃত্যু নয়। এ মূর্চ্ছা, শুধু মূর্চ্ছা। ভিক্ষুণীরা, জল আন, ব্যাজনী আন—

বিনীতা

মহারাজ, সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়েচে।

মহীপাল

নির্ব্বাপিত? ওঃ,—তাই তো। হ্যাঁ, তাই তো। (উদ্‌ভ্রান্তের মতো) সুমিত্রা, এ কি বিশ্বাসযোগ্য! কিন্তু সত্যই তো তাই! নিষ্পলক চোখ, নিঃস্পন্দ দেহ—এ যে মৃত্যু, এ যে নিঃসংশয় মৃত্যু।

মহীপাল উন্মাদের মতো চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন—যেন ভর দিবার মতো কোনও আশ্রয় খুঁজিতেছেন।

(শোকের বিকৃতকণ্ঠে) কি করব, বল এখন আমি কি করব? কেউ বলতে পার, মহারাজ মহীপাল এখন কি করবে? কোনও প্রতিকার কেউ জান? মৃত্যুর রাজ্য হইতে কোন্ মূল্য দিলে, কোন্ আত্মত্যাগ করলে মানুষকে ফিরিয়ে আনা যায়? শোন, সবাই শোন, আমি পরাজিত হয়েচি, ভিক্ষুণী সুমিত্রার কাছে অতি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েচি। কিন্তু দুঃখ পরাজিত হয়েচি এইজন্য নয়, দুঃখ এই যে এমন অপূর্ব্ব একটা জীবন, এমন মূর্ত্তিমতী বিশ্বাসকে আমি এমন করে বিনষ্ট করে ফেলেচি—

রুদ্র

মহারাজ, অস্থির হবেন না; রাজ্যপালন করতে গেলে এমন কত শত কঠিন কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। এতে এতখানি করুণার্দ্র হওয়া দুর্ব্বলতার নামান্তর। আমি বলচি,—এতে রাজ্যের কল্যাণ হবে। ইষ্টিঅষ্টম মন্ত্র সমাপ্ত হওয়া মাত্র—

মহীপাল

তান্ত্রিক, তান্ত্রিক, তোমাকে আমি শূলে চড়াব; মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় তোমাকে পিষে মারব; ভূগর্ভে অর্দ্ধপ্রোথিত করে' ক্ষিপ্ত শৃগালের দ্বারা তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করাব। হীন ঘৃণিত চক্রী, তুমি জান না, তুমি কী করেচ। কী অপূর্ব্ব এক সৃষ্টি তোমার ষড়যন্ত্রে—। (সহসা থামিয়া) সৈন্যাধ্যক্ষ, এই মুহূর্ত্তে তান্ত্রিক রুদ্রলোচনকে শৃঙ্খলিত কর—

রুদ্র

সে কি, মহারাজ? আমাকে কেন? আমি কি করলাম? এ কি রকম কাণ্ড।

মহীপাল

তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না, তান্ত্রিক। তোমার মুখ আমার মনের মধ্যে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তুমি দূর হও,—তুমি দূর হও—

সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া রুদ্রলোচনকে শৃঙ্খলিত করিল।

রুদ্র

মহারাজ, এ কি ব্যবহার! শেষে সব দোষই কি আমারই স্কন্ধে অর্পণ করলেন? চমৎকার বিচার তো! আপনার এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাগযজ্ঞ পরিশ্রমের একশেষ হয়েচি, আর তার এই—

মহীপাল

ঠিক বলেচ, তান্ত্রিক। তোমাকে দোষ দিয়ে কি হবে, দোষ কি আমার কিছু কম! তুমি জানতে না, কত বড় সে ছিল; কিন্তু আমি জানতুম। তবু তাকে আমি— (সহসা সৈন্যাধ্যক্ষকে) রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্ঘনেত্রী সুমিত্রার অন্ত্যেষ্টি হবে। ধর্ম্মাধ্যক্ষ, তার ব্যবস্থা কর। তার পূর্ব্বে তান্ত্রিক রুদ্রলোচনকে আমার দৃষ্টির বাইরে নিয়ে যাও। ওকে মুক্তি দিও; কিন্তু আমার চোখের সামনে ও যেন কখনও না আসে। এবার তোমরা বাইরে যাও।

রুদ্রলোচনকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।
কতক্ষণ পর্য্যন্ত মহীপাল স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ভিক্ষুণীদের প্রতি) ভগ্নীগণ, তোমাদের সঙ্ঘনেত্রী সঙ্ঘের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েচেন। তার এ গৌরবের তুলনা নাই; তার মহত্ত্ব যুগযুগান্তর ধরে কীর্ত্তিত হবে।

সুমিত্রার দিকে করুণ চোখে তাকাইল।

যে-বিশ্বাস বুকে নিয়ে সে মরেচে, সে-বিশ্বাসের অনির্ব্বাণ আলো তাকে পথ দেখাবে। আমার সন্দেহ-বিক্ষুব্ধ মনে সে আলো পৌঁছায় নি; সে বিশ্বাসের এক কণা পাবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি। কিন্তু সে তো সহজ ধন নয়। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়েচি— এক কণা বিশ্বাসও লাভ করিনি। এই অবিশ্বাস নিয়ে, সাগর পাড়ি দেব কি করে? (সুমিত্রার মুখপানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া) সুমিত্রা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। আমার অবিশ্বাস, আমার লোভ, আমার ইতর শক্তিদম্ভ তোমাকে হত্যা করেচে। কিন্তু এমন করে অভিমান দেখিয়েই কি আমার সন্দেহকে দূর করতে পারবে—আমার সংশয়কে জয় করতে পারবে? সুমিত্রা, দাও, তবে দাও। রহস্যময় পরলোক হতে তবে একটু আলো পাঠিয়ে দাও— যবনিকার অন্তরাল হ'তে সৃষ্টির এই মহারহস্য বোঝবার মতো একটু জ্ঞান পাঠিয়ে দাও। এই বিক্ষুব্ধ আত্মার শান্তির জন্য কোন্ পথে যাব? পথ বলে দাও, সঙ্ঘনেত্রী, পথ বলে দাও—

ভিক্ষুণীগণ

(একস্বরে) ... শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং-

ঘণ্টিকা ও বাদ্য ধ্বনিতে স্তোত্রোচ্চারণ মিশিয়া একাকার হইয়া গেল।
টলিতে টলিতে মহীপাল বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে সুমিত্রার পার্শ্বে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।
ভিক্ষুণীগণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল।

যবনিকা

শ্রীসুবোধ বসু

মধু-মঞ্জুষা

শ্রীমতী অরুণা সিংহ বি-এ

১

এতদিন পরে তোমারে চিনিতে
লগন এসেছে মিতা—
অবগুণ্ঠন আড়ালে কী আজও
রহিব অপরিচিতা ?
শারদ প্রভাতে—মধু জ্যোছনায়,
কত যে হেরেছি মন আঙিনায় ;
গহন স্মৃতির আঁধারে—সে যেন,
প্রদীপ রেখেছে জ্বালি' ;
সেদিনের সেই বকুল আজিও
উতলা গন্ধ ঢালি' !

২

তব পরিচয় জেগেছিল মনে
সে যেন এখানে নয়—
চোখের বাহিরে তাইত মিলায়,
ভিতরে জাগিয়া রয় ;
সহসা আবার আসি' নিভৃতে,
ভরি দিলে প্রাণ এই সঙ্গীতে—
বাহিরে ভিতরে বিশাল ভুবনে ,
হেরি তব ছবিখানি ।
মুগ্ধ চিত্ত ভরিয়া জাগিছে,
সুগভীর তব বাণী ॥

৩

তোমার সহিত চির পরিচয়,
নিতি নব সুরে দেখি—
মনে মনে যেন, মধুর কী বাণী
লেখনীতে লেখালেখি ;
মলিন নয়নে নিশা মুরছায়—
তোমার আঁখির প্রভাত উষায়,
জীবন আমার স্বপন নিশীথ
আধো ছায়া জাগরণে,
মনে হয় মোর ঘোর বিস্ময়—
আনাগোনা অকারণে !

৪

অতীতে কত সে আঁখির সলিল
ঝরেছে ব্যর্থতায়—
চির চেয়ে থাকা দৃষ্টি বেধেছে,
তব পথ সীমানায় ;
আজি ফিরে যাই সে সবের পিছু,
চিহ্ন তাহারা রাখে নাই কিছু
অতল সায়র সন্তরি' আজ,
ঠেকিয়াছি তব কূলে—
তোমার পরশ—উষার আভায়
চিত্ত উঠেছে দুলে !!

———

প্রবাদ প্রসঙ্গ

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি বহুপ্রচলিত লোকোক্তিসমূহ বাংলা ভাষার এক অতুল সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা প্রবাদ প্রবচনের কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। তাহার ফলে অনেক 'বচন' লোপ পাইতে বসিয়াছে। আবার এমন অনেক 'বচন' আছে, কালের পরিবর্ত্তনে যাহাদের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সেগুলি কালক্রমে লোপ পাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

বাংলা ভাষার এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিচিত্রায় 'প্রবাদ-প্রসঙ্গ' নাম দিয়া একটি পৃথক বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই বিভাগের দুইটি অংশ। প্রথমটি 'অর্থ বিচার'; ইহাতে বিশেষ বিশেষ প্রবাদের তাৎপর্য্য, উৎপত্তি, প্রয়োগবিধি প্রভৃতির আলোচনা হইবে। দ্বিতীয়টি 'সংগ্রহ'; ইহাতে এরূপ নূতন নূতন বচন সংগৃহীত হইবে যাহার ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না, অথবা দেশের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে।

'অর্থবিচার' অংশটিতে মাসে মাসে কয়েকটি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইবে। 'বিচিত্রা'র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বা আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

'সংগ্রহ' অংশটির জন্য পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ যেন তাঁহারা অবসর মত কিছু কিছু 'বচন' সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন।

অর্থ বিচার.

(প্রশ্নাবলি)

(৩) অর্দ্ধেক সকল ঘর-গোষ্ঠী, আর অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী। এই মেয়েলী ছড়ার অর্থ কি ?

(১২) উজানের কৈ। যে কৈ স্রোতের বিপরীত দিকে যায় বোধ হয় তাহাকে বুঝায়। কিন্তু এরূপ কৈ মাছের বিশেষত্ব কি, এবং কি অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় ?

(১৩) এ হাতটি সব জানে, গাছ থাকতে কাঁটা টানে। অর্থ কি ?

(১৪) ওস্তাদের মার শেষরাত্রে। অর্থ কি ?

(১৫) কাক উড়ে, চিল পড়ে; শঙ্খচিলে বাসা করে। অর্থ কি ?

(১৬) খাতির জমা। কাহাকে বলে ?

(১৭) গোবরে খুড়ো কর্ত্তা। অর্থ কি ?

(১৮) ঘর বাঁধবে ছাইবে না,
ধার দেবে চাইবে না,
বাড়ীতে হাট বসাবে,
প্রতি গরাসে মুড়ো খাবে। অর্থ কি ?

(উত্তর ও আলোচনা)

(৪) অষ্টরম্ভা। 'কলা দেখানো' যেমন সাধু ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া 'কদলী প্রদর্শন' হইয়াছে, তেমনি 'কলা'কে ভদ্র রূপ দেওয়া হইয়াছে—'রম্ভা'। বোধ হয় গুরুত্ব বা আধিক্য প্রকাশের জন্য 'অষ্ট' শব্দ যুক্ত হইয়াছে। নিতান্ত একটি আধটি কলা নয়; একেবারে আটটি,—অষ্টরম্ভা। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান।

(৫) অসারে জলসার। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন সামান্য উপায় অবলম্বনে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা। নানা ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশম না হইলে যেমন টোটকা, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা।

(৬) আক ছেঁচতে কুকশিমের কথা। কুকশিম এক-প্রকার আগাছা, আকের সহিত ইহার সাদৃশ্য কিংবা

কোনরূপ সংস্রব নাই। সুতরাং আক ছেঁচিবার সময় কুকশিমের কথা মনে উদয় হওয়াই অস্বাভাবিক, অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু, হাওড়া।

(১০) আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়। ছাগল-ভেড়াকে যত্ন করিয়া কিছু খাইতে দেওয়া হয় না, তাহারা ঘাস ও গাছ-পালা খাইয়াই উদর পূর্ণ করে। সুতরাং ধান, চাল, দাল, কলাই পাইলে তাহাদের লোভ হইবারই কথা। চাউলের মধ্যে আবার আতপ চাউলই অধিক সুস্বাদু। ইহাতে যখন দেবতারাও তৃপ্ত হন তখন ভেড়ার পক্ষে ইহা যে কত উপাদেয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা।

সংগ্রহ

চট্টগ্রাম হইতে মৌলবি আনোয়ার হোসেন, এম্-এ, বি-টি প্রায় দুইশত প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ অতি সাধারণ ও সুপরিচিত। কতকগুলি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। এগুলি বাদ দিয়া নিম্নে কয়েকটী দেওয়া হইল। পরে আরও কতকগুলি প্রকাশিত হইবে। কিন্তু সবগুলির তাৎপর্য্য বুঝা গেল না। ইহাদের অর্থ লিখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়।

(১) নিড়ালেও একছড়া, না নিড়ালেও একছড়া।
(২) আগে তিতা, পরে মিঠা।
(৩) মাগনা মদ বামুনেও খায়।
(৪) এক দেশের বুলি, অন্য দেশের গালি।
(৫) যদি থাকে বন্ধুর মন,
গাঙ সাঁতরাতে কতক্ষণ।
(৬) সাজালে গোজালে বাঁদীর পোলাও রাজা সাজে।
(৭) দেশের ফকির সেখের মত।
(৮) যার হয় না নয়ে, তার হয় না নব্বইয়ে।
(৯) কই বা রাজা ভোজ, আর কই বা গঙ্গারাম তেলি।
(১০) খায় না, কেবল নাকের তলে গোঁজে।
(১১) আপনার আয়ু পরের ধন, কে দেখে কম।
(১২) যে ছা ওড়ে বাসায়ই ওড়ে।
(১৩) টাকার নাও পাহাড় দিয়া চলে।
(১৪) একই গাছে পান-সুপারি, একই গাছে চুণ।
(১৫) এক মুখ ভরা যায় সোনা দিয়া,
পাঁচ মুখ ভরে না ছালি দিয়া।
(১৬) গাঙের মধ্যে ঢেউ দেখে নৌকা ডুবায় কূলে।
(১৭) রাগের ঘরে বারো দেবতা খাটে।
(১৮) শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।
(১৯) বড় বাড়ীর বিড়ালটা যে, সেও বড়লোক।
(২০) জেগে যে ঘুমায়, তারে জাগানো দায়।
(২১) দশের সঙ্গে মরণও ভালো।
(২২) মাথার উকুনেই মাথা খায়।
(২৩) সাচ্চা গুড় আঁধারেও মিঠা
(২৪) বাধা মা মানে গাধায়।

সত্যরঞ্জন সেন

নীড় ও দিগন্ত

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৭

মাসিমা বললেন, ‘এগুলোকে নিয়ে আমি যে কী করব ভেবেই পাইনে। মা গো, এগুলো কি আর জন্মে ইঁদুর ছিল নাকি? চিনির কৌটোটা একেবারে খালি, চা করব কী দিয়ে?’

মেসোমশাই বিকট ভাবে বললেন, ‘কাল এক পোয়া চিনি আনিয়েছি, আজ একটি পয়সাও আর ওজন্যে দিচ্ছিনে। যেখান থেকে পারো, চিনি নিয়ে এসো।’

মাসিমা গর্জে উঠলেন: ‘রাক্ষসগুলোকে খাওয়াচ্ছি ভালো ক’রে! চার বেলা দু’ হাতে খাচ্ছে, তবু এমন জিভ্? আঁশবটি পেড়ে’ ও নোলা কেটে ফেলব না?’

মাসিমা পুত্র-কন্যাদের সন্ধানে ছুটলেন। কিন্তু হিতোপদেশ না পড়লেও জন্মার্জিত সংস্কার-বশে সংসারের সারতত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল। পুত্রদ্বয় ‘অনাগত-বিধাতাকে’ স্মরণ ক’রে দুর্যোগের প্রারম্ভেই সূচনা-দৃষ্টে স’রে পড়েছিল; ‘প্রত্যুৎপন্নমতি’ মেন্তি রায়ের রুদ্র রূপ এবং রুদ্রতর গর্জন শুনে’ তৎক্ষণাৎ খিড়কি দিয়ে চম্পট দান করলে; কিন্তু ‘যদ্ভবিষ্য’ ওরফে ক্ষেন্তি মায়ের কাছে হাতে নাতে ধরা প’ড়ে গেল।

মেয়েটা শুধু হাবা নয়, খানিকটা জড়ও। জননী-রূপ ভিসু-ভিয়াসের লক্ষণ দেখে প্রলয় আশঙ্কা ক’রেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু নিজেকে কেমন ক’রে রক্ষা করবে, এতক্ষণ ধ’রে তা’রই কল্পনা করছিল হয়তো। হাবা হ’লেও নিজের অপরাধের মাত্রা সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল, কারণ লোক ত কোন্টা ন্যায় বা অন্যায়, যে কোনো পশুও তো সেটা অত্যন্ত সহজেই বুঝে নিতে পারে।

মাসিমা অতি সহজেই ক্ষেন্তিকে গ্রেপ্তার করলেন। মেয়েটা আতঙ্কে অর্থহীন অব্যক্ত খানিকটা শব্দ করতে লাগল, চোখের দৃষ্টিতে অসহায় মূঢ়তা। মা বজ্রস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘চিনি খেয়েছিস?’

ক্ষেন্তি মাথা নেড়ে জানালে,—না।

—‘না!’ সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে বোমা ফেটে পড়ল: ‘হারামজাদী, আবার মিথ্যে কথা? আজ তোরই একদিন কি আমারি একদিন!’

তার পরেই মাসিমার দু’টি হাত চলতে সুরু করলে।

মেয়েটা চীৎকার করতে লাগল, অসহায় আর্ত চীৎকার। রাণী ছাড়াতে এসে একটা ধাক্কা খেয়ে দূরে স’রে গেল। মাসিমা আজ হিংস্র, সংসারের যে রূঢ় নির্মমতার অস্ত্র-মুখে তাঁ’কে প্রত্যেক দিন ক্ষত-বিক্ষত হ’তে হয়, এই সামান্য অপরাধের সূত্র নিয়ে বাইরে তা’র নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশ।

শেষ পর্যন্ত চুলের মুঠি ধ’রে তিনি ক্ষেন্তির মাথাটা দেওয়ালের গায়ে ঠুকতে লাগলেন। এ হেন মেসো-মশাই পর্যন্ত এবারে সন্ত্রস্ত হ’য়ে উঠলেন: ‘একি, তুমি কি একেবারে ক্ষেপে’ গেলে? মেয়েটাকে কী একেবারে খুন না ক’রে ছাড়বে না?’

—‘না, ছাড়ব না। এই পোড়ামুখীদের জন্যেই তো সংসারে দশজনের দশ কথা শুনতে হয়! দিই এবারে একেবারে শেষ ক’রে, ওরাও মরুক, আমারও হাড় জুড়িয়ে যাক।’

—‘তা’ এই হাবা মেয়েটাকে এত ধ’রে মারছ কেন? ওটা বোঝেই বা কি? বরং আর গুলো—’

মাসিমা বিকৃত ভাবে বললেন, ‘নাঃ, বোঝে না! পেটে পেটে শয়তানী ঠাসা, না বোঝে এমন আছে কি! বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হ’য়ে যেত এতদিনে।’

ক্ষেন্তির সমস্ত দাঁত মুখ নির্দয় প্রহারে রক্তাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

এতক্ষণ পরে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ক্ষেন্তির মনে মাথা চাড়া দিলে, প্রহারের প্রচণ্ডতা বোধহয় একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো মায়ের গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ে ক্ষেন্তি প্রাণপণে তাঁকে আঁচড়াতে কামড়াতে সুরু করলে। এই আকস্মিক আক্রমণের তীব্রতায় মাসিমা কয়েক সেকেণ্ড স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, হাতের একটা শাঁখা ভেঙে' দু' টুকরো হ'য়ে গেল।

মাসিমার যে ক্রোধটা করুণায় পরিণত হবার উপক্রম করছিল, সেটা আবার এক মুহূর্তের মধ্যেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। দুর্বলকে আঘাত করবার সুবিধে আছে, গ্লানিও আছে; হয়তো সেই গ্লানিই মাসিমার মনে একটু একটু সঞ্চারিত হ'চ্ছিল। কিন্তু ক্ষেন্তির এই প্রতি-আক্রমণে সে বোধটা মুহূর্তে মিলিয়ে তো গেলই, একটা তীব্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে মাসিমা ক্ষেপে উঠলেন, মাতা এবং কন্যায় রীতিমত মল্লযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

নখের আঁচড়ে মাসিমার গা থেকে রক্ত পড়ছিল। সে রক্ত দেখে তাঁর সংযম রইল না, সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে এমনি ভাবে ক্ষেন্তির মুখে তিনি একটা ঠোনা মারলেন যে অর্ধস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মেসোমশাই হুঁকোয় একটা টান দিয়ে নিস্পৃহ ভবিষ্য-বক্তার মতো বললেন, 'মেরে ফেলতে পেরেছ তো? ব্যস, এই বারে গিয়ে মাথায় জল দিয়ে ঠাণ্ডা হও।'

রাণী রান্নাঘর থেকে ছুটে' এলো: 'কি করলে মা, কী করলে!'

মাসিমার একটু একটু ক'রে চেতনা ফিরে' আসছিল। মেয়েটার মুখ দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে নামছে, আহত পাখীর মতো হাত পা গুলো ঝটপট্ ক'রে নড়ছে।

রাণী চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

ঠিক এই সময়ে পার্থ এসে বাড়ীতে ঢুকল। বললে, 'ব্যাপার কি।'

রাণী কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'দাদাবাবু দেখে যাও, মা ক্ষেন্তিকে মেরে ফেলেছে।'

—'মেরে ফেলেছে! সে কি রে!'

শশব্যস্তে পার্থ ছুটে এলো মেয়েটার কাছে: 'মেরে ফেলেছে!' বললে, 'শিগগীর জল নিয়ে আয়।'

রাণী দৌড়ে জল আনতে গেল।

—'ছেলে মেয়েকে কখনো এমন ক'রে মারতে আছে, মাসিমা!'

—'না, মারবে না, পুজো করবে ফুল চন্দন দিয়ে? অমন মেয়েকে মেরে ফেলাই ভালো।'

—'হুঃ, মেরে তো ফেলবে' মেসোমশাই এইবারে মুখ খুললেন: 'এইবারে সামলাও তা'হলে পুলিশের ঝক্কি। ফাঁসি যেতে পারবে তো?'

—'তোমার এ সংসারে থাকার চাইতে ফাঁসি যাওয়াই বা মন্দ কী?' ধীর স্বরে উত্তর দিয়ে মাসিমা সামনে থেকে চলে গেলেন।

রাণী জল নিয়ে এলো।

পার্থ বললে, 'না, না আপনারা মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন, মরবার কিছু হয়নি। তবে ছেলেপিলেদের এমনভাবে মারাটা—'

মেসো-মশাই নেপথ্যের উপলক্ষ্যে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ ক'রে সগর্জনে ব'লছেন, 'দেখেছ কি, ও মাগী আমাকে কাঁদাবে, তবে নিশ্চিন্দি হ'বে। ছোটলোকের মেয়ে ঘরে এনে' আমার তিন কুল গেল।'

ও পক্ষও সশস্ত্র হ'য়েই ছিলেন, ঘরের ভিতর থেকে সমান গর্জনে মাসিমা জবাব দিলেন, 'তোমার তিন কুল মজাবার আগেই ছোটলোকের মেয়ে বিদায় নেবে, তা' ঠিক জেনো।'

—'বিদায় নেবে! আমাকে আমকাঠের তলায় দেবার আগে—'

উচ্ছ্বসিত কাশির আবেগে কথার বাকী অংশটা স্তিমিত হ'য়ে গেল।

পার্থ বললে, 'ছিঃ ছিঃ কী পাগলামি এই সকাল বেলাতেই সুরু করলেন আপনারা। তুমিও কী শেষে ক্ষেপে গেলে মাসিমা?'

—'বল্, বল্, তুই বল্। এ সংসারে কেউ না ক্ষেপে থাকতে পারে?'

মাথায় জল পড়তে ক্ষেন্তি আস্তে আস্তে চোখ খুলল। পার্থ বললে, 'রাণী, ওকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও, আর পারোতো একটুখানি গরম দুধ খাইয়ে দিও।'

—নাঃ, বাস্তবিক, আর সহ্য হয় না।

মনুষ্যত্ব আর মহত্ত্ব ব'লে কোনো অস্তিত্ব এদের জগতে অপরিচিত। সে আলো সমস্ত পৃথিবীকে রাত্রির জড়তা এবং গ্লানি থেকে জাগিয়ে তোলে, সে আলো এখানে প্রবেশ করতে পারে না। নাঙ্গা-পর্বত অভিযানের গান এখানে এসে' পৌঁছোয় না, নায়গ্রা প্রপাতের গর্জন-ঝঙ্কার সেখানকার রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশকে মুখর ক'রে তোলে, তার সীমানা এখান থেকে অনেক দূরে।

এদের জীবন নিয়ে সাহিত্য হয় না, কবিতা তো হতেই পারে না। এদের দারিদ্র্যের যে ইতিহাস, এদের জীবন-যাত্রার যে প্রাত্যহিক দিনলিপি, তা' অশুচিতার এবং অসত্যের ইতিকথায় ও স্বীকারোক্তিতে অস্পৃশ্য, অপাঠ্য। করুণ রস নয়, বীভৎস। এদের কৃপা করা যায় না, ঘৃণা করা চলে।

মানুষ স্বার্থপর, মানুষ বর্বর। কিন্তু এ কী কদর্য সেই আদিম-বৃত্তিগুলোর বহির্বিকাশ! অদৃষ্টের কাছ থেকে যে দান পায়, তাই-ই হাত পেতে নিতে এদের লজ্জা নেই, পঙ্গু-ভগবানের ভাঙা মন্দিরের দ্বারে এদের অন্ধ-কাকুতির আর বিরাম নেই। দুঃখের তিক্ততাকে এরা তিক্ততর করতেই জানে, তাই তীব্রতার মধ্য দিয়ে আনন্দকে আস্বাদন করবার মনোবৃত্তি এদের অনায়ত্ত।

অতীত এবং বর্তমান জীবন!

মানুষ নিজেকে যে কত বিচিত্র পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বিচিত্রতর ভাবে আস্বাদন করতে পারে, পার্থ তার পরিচয় পাচ্ছে। খোলা জানলার ভেতর দিয়ে রাত্রের স্নিগ্ধ বাতাসে আজ আর হাস্নাহানার সুরভি ভেসে আসে না, ম্যাণ্ডোলীনের কান্নায় আকাশ রোমান্টিক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে না। বস্তির পাশে ডাষ্টবিনের গন্ধ, মাথায় পচা কীট-দুষ্ট ঘায়ের যন্ত্রণায় একটা নেড়ি কুকুরের বীভৎস কান্না আকাশকে আবিল ক'রে তুলছে।

বাইরে থম্ থম্ করছে গ্যাসের আলোটা, বাসী মড়ার বিবর্ণ বিকৃত চোখের মতো; জ্যোতি নেই, জীবন নেই, ঘোলাটে মূর্ছাতুর আলোতে গলিটা শবদেহের মতো পড়ে আছে; এ হচ্ছে গ্রীণ-রুমের রূপ। আর বাইরের আলো-কোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে পাঁচশো ভোল্টের বিদ্যুতের আলো, শাণিত, প্রাণ-চঞ্চল; তাজা গোলাপের গন্ধ, দামী সিগারেটের গন্ধ, অদ্ভুত ককটেইলের গন্ধ।

উপমা,—হাঁ একটা উপমা মনে পড়ল পার্থের। ওর মনের খানিকটা আভাস আমি আপনাদের আগেই দিয়েছি ওর রক্তে রক্তে কবিতার একটা উচ্ছৃঙ্খল অসামাজিক প্রবণতা আছে। মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে ও ছাতে এসেছে, এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করবার চেষ্টা ক'রেছে। ভেবেছে: ওই অসংখ্য ছড়ানো নক্ষত্রগুলোকে এক সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে এমন একটা মালা গাঁথা যায় না: একটা মালা—যে মালাটাকে ও নিজে হাতে এই অনন্ত অন্ধকারের কণ্ঠে পরিয়ে দিতে পারে: সেই অন্ধকারকে,—যে অন্ধকার দাঁড়িয়েছে সময়ের সমুদ্র-তীরে যা'র পায়ের নূপুরে অসংখ্য ফস্‌ফরাস্ চিক্ চিক্ ক'রে জ্বলছে, দিগ্বলয়ের বনানী প্রান্তে যার কুন্তল-ভার এলায়িত বিস্রস্ত হ'য়ে পড়ল:

কিন্তু উপমা, একটা উপমা পার্থের মনে পড়ছিল। বিগতশ্রী বারাঙ্গনা এসে দাঁড়িয়েছে খোলার ঘরের দুয়ারে। যৌবন তা'র অপহৃত হ'য়েছে, যেটুকু বা ছিল, অস্বাভাবিক জীবনের অমিতাচারে আর ব্যাধির দংশনে তা'র চিহ্ন মাত্রও নেই। মাঘের শীতের রাত্রি নেমেছে তা'র চার পাশে, সদ্য শাণ-দেওয়া ক্ষুরের স্পর্শের মতো তা'র অনুভূতি। অপ্রচুর আচ্ছাদনকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে বাইরের তীক্ষ্ণতা তার বুকে আঘাত করছে, তা'র রক্তের গতি মন্থর করছে, সমগ্র দেহকে হিমাঙ্ক করছে, দাঁতে দাঁতে তা'র ঠক্ ঠক্ ক'রে শব্দ হ'চ্ছে। তবুও তা'র চোখের প্রত্যাশায় বুভুক্ষা, সে ঘুমতে পারে না সে বিশ্রাম নিতে জানে না। অনিশ্চিত শিকারের আশায় শুরু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ঠিক সেই সময়ে মহানগরীর শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের দ্বারে একখানা মোটর এসে থেমেছে, দামী ঝক-ঝকে একখানা

মোটর। টুপি পরা মাড়োয়ারীর সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমে আসছে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী, বহুমূল্য পরিচ্ছদ আর হীরার অলঙ্কার উপভোগের জগতে তার স্থান নির্ণয় ক'রে দিচ্ছে। চতুর্দিকের প্রতীক্ষমান জনতা মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মতো ঘিরে এসেছে, তরুণীর হাতে পায়ে এসে পড়েছে অগণিত ফুলের তোড়া সর্বাঙ্গকে বিদ্ধ করছে জনতার ক্ষুধাতুর চোখের অসংখ্য দৃষ্টিশর—

—গ্রীণ রুম আর রঙ্গমঞ্চ বই কি!

রাণীর ও ঘরে আলো জ্বলছে, এতরাত জেগে ও কী করে? কল্পনা করা যেতে পারে: রাণী হয়তো এখন ওরই মতো জেগে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কবিতা লিখছে। কিন্তু বাস্তবিক তা' তো আর হবার নয়। কবিতা লিখবার জন্ত মনের যে অবকাশ এবং শিক্ষা, হাঁ, কালচার, তার কোনটাই ওর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা চলে না। পার্থ অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে মনে মনে বললে: হায়, পৃথিবীটা মাটীর!

কিন্তু রাণী কবিতা না হয় না লিখল, জানলার পাশে এসে স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, পারে তো? এবং, নিশ্চয় হয়তো এমন কা'রো কথাও ভাবতে পারে, যা'কে ভাববার জন্তে এমনি একটা অনুভূতি বিচক্ষণ স্তিমিত মুহূর্তের প্রয়োজন হয়, এই সময়ে সুদূরের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে যা'কে মনের সান্নিধ্যে আনতে পারা যায়, কাছে, অত্যন্ত কাছে। আচ্ছা, রাণী কাউকে কী ভালো বাসে? কা'কে ভালবাসে?

আর রমা?

পার্থ জানলাটা বন্ধ ক'রে স'রে এলো। এ ক্ষেত্রে ও মনকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়।

* * * *

ক্ষেন্তি স্বপ্ন দেখছিল।

সমস্ত দেহ ওর প্রহারে জর্জরিত, ঘুমের মধ্যেও তা'র যন্ত্রণা ও অনুভব ক'রছে। ঠোঁট দু'টো থেকে থেকে জ্বালা করছে, মাথায় একটা টনটনে বেদনা। যন্ত্রণায় কয়েকটা অস্ফুট শব্দও বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

অনুতপ্তা মাসিমা অনেক রাত জেগে ওকে পাখার বাতাস করলেন। তারপর কখন ঘুমের মায়া ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত চোখের উপর দিয়ে, কোন এক মুহূর্তে হাতের পাখাটা খ'সে পড়ল বুকের উপর। ঠাণ্ডা, নীলাভ ঘুমের নেশায় মাসিমার সমস্ত চেতনা যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গেল।

ক্ষেন্তি স্বপ্ন দেখছিল: আকাশ থেকে চাঁদটা নেমে আসছে। একটা আশ্চর্য সোণালি শিকল দিয়ে চাঁদটা বাঁধা, কে যেন প্রকাণ্ড একটা সোণার চাক্তিকে শিকল-বেঁধে শূন্য থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। বাইরের থেকে শন শন ক'রে বাতাস ডেকে বলছে: 'আয়, আয়, এখানে আয়—'।

ক্ষেন্তি জিজ্ঞেস করলে: 'কে ডাকছে?'

কোনো উত্তর এলো না, কেবল বাইরের বাতাস তেমনি শন শন ক'রে ডেকে বললে, 'আয়, আয়'—

ক্ষেন্তি দেখতে পাচ্ছে, এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সোণার শিকলে বাঁধা চাক্তিটা ক্রমশ নেমে আসছে,—নেমে' আসছে। একেবারে ওদের ছাতের উপরে—

বাঃ, কী অদ্ভুত, এমন ব্যাপার ও কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। ক্ষেন্তি লাফিয়ে বিছানার উপরে উঠে বসল। সমস্ত ঘরটায় অবাধ ঘুমের রাজত্ব, মায়ের মুঠোয় তখনো পাখাটা ধরা, বিশ্রীভাবে বাবার নাক ডাকছে। ক্ষেন্তি সব যেন অস্ফুট ভাবে দেখতে পাচ্ছে, অস্ফুটভাবে অনুভব করতে পারছে, হঠাৎ যেন মনে হ'ল, বাইরে খানিকটা জমাট অন্ধকার।

কিন্তু নাঃ, চাঁদটা নামছে, নামছেই। নিদ্রাতুরা ক্ষেন্তি খাট থেকে নেমে এলো, খুট ক'রে দরজাটা খুলে ফেললে। বাইরে পৃথিবী কী আশ্চর্য স্বপ্ন জগতের রূপ নিয়েছে, কী অদ্ভুত এই নরম ঘুমের বিস্তৃতি, এই সোণালি শিকল আর এই চাঁদটা!

ঘুমের মধ্যে এরকম বেড়িয়ে বেড়ানোর অভ্যাস ক্ষেন্তির নতুন নয়।

* * * *

পার্থ ঘুমুতে পারছে না।

বাস্তবিক, ওর এখন ঘুমানো প্রয়োজন, অত্যন্ত প্রবল প্রয়োজন। আজ এই রাত্রে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' যখন

স্বপ্নাচ্ছন্ন তন্দ্রার অবাধ অসীম বিস্তৃতি, তখন ওর চোখে ঘুমের আভাষ মাত্র নেই। প্রসুপ্তির প্রবাহ যখন সমস্ত মহানগরীর উপর দিয়ে বন্যার মতো ব'য়ে গেল, তখন সেই সর্বপ্লাবী শক্তির কাছে ওর উত্তেজিত শিরা আর রক্তধারা উদ্ধত একটা মাটির ঢেলার মতো ওকে জাগিয়ে রেখেছে।

কিন্তু রমা?

অতীত ওকে প্রলুব্ধ করে, স্বপ্ন ওকে প্ররোচনা দেয়। যা' হয় না, যা' হ'বার নয়, তার কথা চিন্তা ক'রে চিত্তবৃত্তি অকস্মাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। রমাকে ও কাছে পেতে পারত, দেহ ও মনের ঘনীভূত নৈকট্যে কাছে পেতে পারত, এখনো পারে। কিন্তু অধিকারের একটা প্রশ্ন আছে তো।

পার্থ রোমান্টিক উপন্যাসের নায়ক নয়; সস্তা আখ্যায়িকার দারিদ্র্য গর্বিত নায়ক, মেসের 'বিল' মেটাতে না পেরে' যে তেলহীন রুক্ষ চুলের বোঝা মাথায় নিয়ে ফুটপাথে ফুটপাথে ঘুরে' বেড়ায়, বাঁশিটা হাতে নিয়ে লেকের পারে, ইডেন্ গার্ডেন্সে অথবা খিদিরপুরের কাছে গঙ্গার ধারে বকুল-বীথির নীচে কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে; তারপর ফিয়াট্ গাড়ী থেকে ধনীর নন্দিনী নেমে আসে, বাঁশির সুরে মুগ্ধা কুরঙ্গিণীর মতো নায়কের পাশে এসে' উপস্থিত হয়। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ বা অ্যালজেব্রার ফরমূলার মতো গোটাকয়েক ধাপ অতিক্রম ক'রে অবশেষে একদিন নায়িকা সিনেমার ভঙ্গীতে দু' হাতে নায়কের গলা জড়িয়ে ধরে মিহিকণ্ঠে চিঁহি চিঁহি ক'রে বলে: 'ওগো তরুণ পথিক, তোমাকেই আমার জীবনের মালাগাছি পরিয়ে দিয়ে বরণ করলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করো।'

নায়ক মুখস্ত করা পার্টের মতো ব'লে যায়, 'কিন্তু আমি যে গরীব, আমি যে রিক্ত, একমাত্র এই বাঁশিটি ছাড়া আমার তো আর কোন পাথেয়ই নেই!'

নায়িকা গলার মিহি সুর আরো মিহি ক'রে বলে, 'ওগো আমি মান চাইনে, আই-সি-এস চাইনে, এন্সায়ার এমন কি, 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটেও নাচতে চাইনে।' তারপর মহুয়ার একটা লাইন আবৃত্তি ক'রে বলে: মর্ত্যে বা জিনিবে একমাত্র তুমিই আর'—

অপূর্ব সুখে নায়কের চোখ দু'টো বন্ধ হ'য়ে আসে, প্রেমের সুধায় সমস্ত ক্ষুধা ছায়াবাজীর মতোই মিলিয়ে যায়। পার্থ নিজের মনের ভেতর নিঃশব্দে অট্টহাসি করে ওঠে। গল্প লেখাটা কত সহজ এবং তা' দিয়ে মানুষকে অভিভূত করা আরো কত সহজ!

এবং এই গল্পের জন্যেই তো রমার এমনি মনোবিকার!

—"না," একটা অসীম দৃঢ়তায় পার্থের ওষ্ঠের দু'টি প্রান্ত পেশল হ'য়ে উঠল। রমা ছেলেমানুষ, একান্তভাবেই ছেলেমানুষ। তা'কে ও ওর নিজের হাত থেকেই রক্ষা করবে, করতেই হ'বে। আজকের এই স্বপ্ন-বিলাস এবং দুই বিন্দু অশ্রুর কথা স্মরণ ক'রে অদূর ভবিষ্যতে সেদিন হয়তো স্বামী-সৌভাগ্য গর্বিতা পূর্ণ পরিতৃপ্তা রমার নিজেরই আত্ম-গ্লানির অবধি থাকবে না!

* * * *

ক্ষেন্তি বাইরে বেরিয়ে এসেছে, এসেছে রেলিঙটার কাছে।

সোনার শিকলে বাঁধা চাঁদটা তখনো নামছে, অদ্ভুত হলদে উজ্জ্বল চাঁদ। কিন্তু একি, এতো চাঁদ নয়, এ যে একটা থালা।

—হ্যাঁ, থালাই তো। রেলিঙের প্রায় দু'হাত উপরে সেটা ঝুলছে। ক্ষেন্তি ঘাড় উঁচু ক'রে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে সেই হলদে উজ্জ্বল থালাটার উপরে ঝক্ ঝক্ করছে চিনি, অনেকটা চিনি! লোভে ক্ষেন্তির জিভে জল এলো।

কালো চারতলা বাড়িটার মাথার উপর দিয়ে শন্‌শনে বাতাস বুড়োর মতো খন্‌খনে গলায় হাঁক দিয়ে বললে, 'ক্ষেন্তি চিনি খাও।'

মুহূর্তে ক্ষেন্তির মনটা উদ্যত হয়ে উঠল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ও সামলে নিলে। ঠোঁটে, তখনো একটা চিড়্‌চিড়ে জ্বালা, মাথাটা তখনো টন্ টন্ করছে। ক্ষেন্তির গালের দু'পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়তে লাগল, একটা ঢোক গিলে ও বললে। 'মা মারবে।'

তেমনি বুড়োর মতো ডাক দিয়ে বাতাস বললে, 'না, মা মারবে না। আর জানবেই বা কি ক'রে? এখন তো সবাই ঘুমিয়ে আছে, আর এই-ই তো সুযোগ।'

ক্ষেন্তি তবু ইতস্তত করতে লাগল।

আবার কাণের কাছে বাতাসের সুর বেজে উঠলো: 'নাওনা,—খাও।' কালো চারতলা বাড়িটার ছাতের উপর কাপড়ের মতো সাদা কী একটা উড়ছে, ক্ষেন্তির মনে হল ও যেন কার সাদা লম্বা দাড়ীর গোছা।

ক্ষেন্তি হাত বাড়ালো।

কিন্তু থালাটা আর নামছে না, রেলিঙের উপরে মাত্র দু'হাত উপরে সেটা নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেন্তি বললে, 'হাতে পাচ্ছিনে যে।'

চারতলা বাড়ির ছাতে সাদা দাড়ীর গুচ্ছ শোঁ শোঁ করে উড়তে লাগল; 'রেলিঙের উপর উঠে হাত বাড়িয়ে নামিয়ে নাও।'

—'যদি পড়ে যাই!'

—'দেখতে পাচ্ছ না নীচে ধবধবে সাদা কুয়াসার চাদর পাতা? সেই চাদরই তোমাকে আটকে ধরবে—ওঠো।··· হাঁ, এই কাঠের উপরে পা দাও, এই খুঁটিটা ধরো, আর এই বারে—'

একতলার বাঁধা উঠোনে একটা মাংসল-স্তূপ আছড়ে পড়ার প্রবল শব্দ, আর একটা বিকৃত আর্তনাদে রাত্রিটা দু'খণ্ড হয়ে গেল, সাদা কুয়াসার চাদরটা ওকে আটকে রাখতে পারে নি। আর সোণার সিকলে বাঁধা সেই চিনির থালাটাকে কে যেন একটা হ্যাঁচকা টান মেরে আকাশে তুলে নিয়েছে। একেবারে আকাশের কালো পর্দাটার ওপারে, আর দু ফাঁক হয়ে যাওয়া পর্দাটা এমন ভাবে তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে জুড়ে গেছে যে চাঁদটা যে কোথায় লুকালো, তাকে আর খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। সমস্ত মহানগরী, সমস্ত অরণ্য আর সমস্ত পৃথিবীর দেহের উপরে অমাবস্যার কালো কম্বলটা টানা।···

বাড়িটা জেগে উঠেছে, চীৎকারে আর কান্নায় পাড়াটা জেগে উঠেছে, কিন্তু ক্ষেন্তি আর জাগবে না। রক্তে ময়লা ফ্রকটা টকটকে লাল, মেজের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে রক্তের ধারা। আজ সকালে মায়ের নির্দয় নির্যাতনের মুখে যেমন করে সে নিজের চেতনাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তেমনি করেই জননী ধরিত্রীর আঘাতেই সে মূঢ় অসহায় ভাবে আপনাকে মেলে দিয়েছে। দু'টো দাঁত ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে, ঘাড়টা পেটের নীচে মটকানো।

মাসিমার কান্নাটা পার্থ সহ্য করতে পারছিল না।

৮

সময়: আশ্চর্য এবং অদ্ভুত জিনিষ।

বিজ্ঞানের শক্তিকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে, সদ্য সিদ্ধিপ্রদ ওষুধের বিজ্ঞাপনকে বিদ্রূপ করতে পারে। কিন্তু সময় সম্পর্কে অনায়াসে এবং সর্ববাদীরূপে আমরা পরাজয় স্বীকার ক'রে নিই। সুলভ দার্শনিক ভাবে বলা যায়; এই পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি, আমাদের ক্ষত, আহত স্থানগুলোকে নিরাময় করে নেওয়ার অবকাশ পাই। নইলে সমগ্র জীবনভরা মূঢ়তা বা অপরিপূর্ণতার দিনপঞ্জী যদি আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত থাকে: বিগত দিনের প্রতিটি গ্লানির স্মৃতি যদি বর্তমানের সতেজ প্রাণ পূর্ণতা নিয়ে আমাদের মনে বিরাজ করে, তা' হলে যে কোন মুহূর্তেই আমরা রাঁচীর যাত্রী হ'তে পারি; আত্মহত্যা করতে পারি।

আর, তা' ছাড়াও, সত্যি বলো তো, আমাদের সময় কোথায়? পেছনে চাইবার চেষ্টা করলে অন্ধ-প্রয়োজন আমাদের চাবুক দিয়ে আঘাত করে, স্মরণ করিয়ে দেয়: সময় নেই, সময় নেই। আমাদের সমষ্টিগত বৃন্তগুলি থেকে একটা সতেজ গোলাপ যখন ঝোড়ো হাওয়ায় ঝরে যায়, তখন আমরা তারো দিকে তাকাতে পারিনে; যে ফুল কীটদষ্ট, ব্যবহারিক জীবনে যার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নেই, তাকে কত সহজেই বিস্মৃতির আঁধার-কুটিরে নির্বাসন দেওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তাই এ ক্ষেত্রেও তা'র ব্যতিক্রম ঘটলনা।

প্রায় একমাস বাড়িটা শোকের আবহাওয়ায় বিষণ্ণ হয়ে রইল, তারপরেই কেটে' যেতে লাগল ঝাপসা সেই গুমোট পরিস্থিতিটা। ক্রমশঃ চারদিকে আবার সেই সহজ পরিমণ্ডল ফিরে' এলো,, আবার সেই গতানুগতিক, মুখ-থুবড়ে-পড়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত আড়ষ্ট জীবন। প্রত্যেক দিনের অভাবের সংঘাত, সঙ্কীর্ণতম স্বার্থের পদে পদে আত্মবিকাশ, স্নেহ ভালোবাসা এবং প্রীতির সম্পর্কের নিষ্ঠুর নির্মম সমাধি।

এমনি সময়ে আর একটা আশ্চর্য্য জিনিষ আবিষ্কার করলে পার্থ।

সকালে চা তৈরী করলে রাণী এবং এলো তা মেন্তির হাত দিয়ে। এ বাড়ীতে এমন ব্যাপার অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যাশিত, কারণ এই নিত্য কর্মটি মাসিমারই এক-চেটিয়া এবং তাঁর হাতের ছাড়া আর কারো তৈরী চা-ই মেসোমশাই পছন্দ করেন না। তবুও আজ এই অঘটনটা ঘটল এবং পার্থ আরো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে যে এ নিয়ে মেসোমশাই বিন্দুমাত্রও আপত্তি করলেন না। বরং চায়ের পেয়ালাতে একটা চুমুক দিয়ে প্রশংসা-বাচক সুরে স্বভাববর্জিত মিষ্ট ভাবে বললেন: 'বাঃ রাণীতো বেশ চা তৈরী ক'রতে পারিস! চমৎকার হ'য়েছে। এর পরে কয়েকটা দিন তুই-ই ক'রে খাওয়াতে পারবি ব'লে ভরসা হচ্ছে।'

পার্থের সন্দেহ হল। বেশ কয়েকটা দিন, তা'র মানে কি!

এক সময়ে রাণীকে জিজ্ঞেস করলে, 'মাসিমা কোথায়?

—'শুয়ে আছেন।'

—'কেন।'

রাণী আস্তে আস্তে বললে, 'অসুখ করেছে।'

পার্থ উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, 'কি অসুখ?'

রাণী লজ্জিত মৃদু হাসিতে বললে, 'জানিনে।'

অবশেষে খবর পাওয়া গেল ইঁচড়ে-পাকা মেন্তির কাছ থেকেই। প্রশ্ন শুনে মেন্তি খানিকটা গালে হাত দিয়ে বুড়ির মতো হাঁ ক'রে চেয়ে রইল, তারপর চোক কপালে তুলে বললে, 'ওমা দাদাবাবু, কী ছেলে-মানুষ গো তুমি!'

মেন্তির বলার ধরণ দেখে না হেসে উপায় নেই। পার্থ বিস্মিত কৌতুকে জিজ্ঞেস করলে, 'আমি এমন ছেলে-মানুষ হ'তে গেলুম কেন?'

—'মা'র যে আট মাস, তাও জানো না বুঝি? খালাস হ'তে আর ক'টা দিনই বা বাকী। তাই এখন মা'র নড়া-চড়া করা বারণ, এই ক'দিন দিদিই রাঁধবে, বাড়বে, ঘর সংসার সব চালাবে, বুঝতে পেরেছ?'

—'এর পরেও কী আর বুঝতে বাকী থাকে?'

কেঁচো খুঁড়তে প্রায় সাপ বেরিয়ে পড়বার উপক্রম, কিন্তু পার্থের আজ সুবুদ্ধি হ'য়েছিল। অন্ততঃ এটুকু ও ভালোই বুঝেছিল যে সদুপদেশ দিয়ে আর নীতিকথা শুনিয়ে এই মেয়েটির জ্ঞান চক্ষু এতটুকুও উন্মীলিত করতে পারবে না বা তা'র পরিপূর্ণ পাকাত্বকে এতটুকুও কাঁচা করতে পারবে না। তাই সাহস ক'রে আরো কিছু বিদ্যা সংগ্রহ করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা মেন্তি, তুই এত খবর কোত্থেকে জোগাড় করিস বলতে পারিস?'

মেন্তি অবাক হ'য়ে বললে, 'বাঃ রে, আমি আর কি খবর জোগাড় করলাম! এ তো, সবাই-ই জানে, ট্যাঁপার মাসী, ও বাড়ির ছোটদি,—এরা তো সবাই বলে।'

পার্থ অনুমান করলে, পাড়ার কুলবধু-সঙ্ঘের যে আড্ডা এবং পরচর্চাচক্র, সেখান থেকেই এই অকাল পরিপক্ক মেয়ে খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো এই সব বিবিধ উপাদেয় সংবাদের মণি-মুক্তো সংগ্রহ ক'রে আনে। কিন্তু দুর্বল নাড়ীতে সেগুলো হজম করতে পারে না ব'লে বাইরে অশোভন রূপে প্রকাশ ক'রে ফেলে।

পার্থ আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, ও বাড়ির সেই আইবুড়ো ফর্সা মেয়েটা—'

প্রশ্নটা আর শেষ করতে হ'ল না, মেন্তি উত্তর দেবার জন্যে যেন একেবারে মুখিয়েই ছিল: ''ওঃ, তাও তুমি জানো না বুঝি? আর জানবেই বা কি ক'রে, দিন-রাত্তির তো ওই সব পুঁথি-পত্তোর নিয়েই থাকো, বাইরের একটুও খোঁজ খবরও তো রাখবে না! মেয়েটাকে কাশী নিয়ে গেছে যে, সেখানে কোন এক অনাথ আশ্রমে ছেলেটাকে রেখে—'

পার্থের সভ্য, সুমার্জিত মন আবার লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল। বললে, 'সব বুঝেছি, আচ্ছা, আচ্ছা, এখান থেকে যা' তুই—'

কিন্তু মেন্তি এত সহজেই যাওয়ার পাত্র নয়। বলতে যখন সুরু ক'রেছে, তখন নিজের বক্তব্য একেবারে শেষ না ক'রে ওখান থেকে নড়বেনা: 'আহা-হা শোনোই না ছাই! সে ভারী মজার কথা গো দাদাবাবু! ওরা ঠিক

কাঁদছে কী জানো! ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে না রেখে মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসে বিয়ে দেবে। তার জন্যে এখন থেকেই খুব চেষ্টা ক'রে খোঁজ খবর চলছে, কাগজে কাগজে অবধি ছাপিয়ে দেবে: পাত্তর চাই। ওই মেয়ের আবার বিয়ে হ'বে কি গো, হি হি-হি—'

মান এবং কাণ বাঁচাবার জন্যে পার্থ নিজেই সেখান থেকে উঠে' গেল। কিন্তু সত্যি সত্যিই কী মাসিমার আবার সন্তান হ'বে?

তুমি আমি, আমরা এবং তোমরা, রক্ত মাংসের উপস্থিতি নই, দৈহিক খানিকটা ঘনত্ব নই, আমরা জীবাণু, অসংখ্য অসংখ্য অনন্ত মিলিয়ন বিলিয়ন জীবাণুর এক একটি। আমরা এত ছোট যে কোনো মাইক্রোস্কোপ দিয়েও আমাদের লক্ষ্য করা যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না।

ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টের একটা কথা পার্থ শুনেছিল: যেহেতু তুমি চিন্তা করতে পারো, সেই জন্যেই তুমি আছ। এ দর্শন-গত বিস্তৃত ব্যাখ্যা কী আছে কে জানে, কিন্তু আজ যেন পার্থ এই কথাটার একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেললে।

তোমার যে মন, তোমার নিজের ভিতরে যে ডায়নামোর মতো স্পন্দমান বিরাট ভাব এবং ভাবনার জগৎ, তোমার নিজেকে কেন্দ্র ক'রে প্রেম ও প্রয়োজন, ক্ষুধা ও পরিতৃপ্তির আদর্শ এবং আরম্ভ, আঘাত ও প্রতিঘাত, তার মধ্য দিয়ে তুমি আদি অন্তহীন মহাসাগরকে উপলব্ধি করো, অনুমান করো। তুমি কল্পনা করো: তোমার অন্তরের এই অসীম ব্যাপকতার মাঝখানে তুমি মণ্ডলেশ, তুমি রাজচক্রবর্তী। যেদিন মৃত্যু বা সমাপ্তি আসবে, সেদিন তোমার এই কেন্দ্র-গত জগতের চারদিকে উঠবে শোকের ক্রন্দন, সে ক্রন্দন শুধু তোমার মনেরই নয়। বাইরের,—বাইরের পৃথিবী, এত অসংখ্য কর্মচঞ্চল মানুষ, সবাই তোমার জন্যে শোক করবে, চোখের জল ফেলবে। তোমার বিচ্ছেদ-বেদনায় আকাশের একটি উল্কা খ'সে পড়বে, একটি ফুলের বৃন্ত শিথিল হ'বে, কিছুক্ষণের জন্যও এই পৃথিবীর শিশিরবিন্দু অশ্রুতে সিক্ত হ'য়ে থাকবে।

কিন্তু, কিন্তু, মানুষের সময় কত কম! আর মানুষের পরিধি, তা'র পরিচয়ের পরিসর একটা জীবাণুর চাইতে বেশি নয়, বিস্তৃততর নয়!

নিষ্ঠুর,—শাশ্বত এই সত্য।

ওরা যখন কলেজে পড়ত, তখন ওদের এক সহপাঠী একটা কবিতা লিখেছিল, 'আমার বিদায়-ক্ষণে।'

অনঙ্গ কবিতাটা প'ড়ে টীপ্পনি কেটেছিল: 'বংশী, তোকে যে এখুনি পারত্রিক ভাবনায় ব্যাকুল হ'তে দেখছি! এর মধ্যেই যখন 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' ভাবতে সুরু ক'রে-ছিস, তখন কোন দিন যে ত্রৈলঙ্গ স্বামী হ'য়ে বেরিয়ে যাবি, তা'র ঠিক ঠিকানা নেই। তবে আমাদের মধ্যে তুই-ই চালাকরে, পরলোকের ভাবনাটা বেশ ভেবে নিতে পার-ছিস। আর তা' ছাড়া কবিতাটা প্রেম এবং তত্ত্বকথার একটা অপূর্ব সমবায়, মৃত্যুর পরে এই পৃথিবীর শ্যামলা প্রেয়সীর প্রেমের টানে নক্ষত্র হ'য়ে গিয়ে আকাশে মিটির, মিটির ক'রে তাকিয়ে থাকা, প্রেয়সীর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে চাওয়া, এ সব কল্পনাও দস্তুরমতো রোমাঞ্চকর বলতে হ'বে!"

অনঙ্গের কথায় ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে হেসে উঠেছিল, সমস্ত জিনিষকে বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গ করবার মধ্য দিয়ে অনঙ্গ বেশ দল জুটিয়ে নিতে পারে। বংশী স্বভাবতই একটু তোতলা, কবিতার এ রকম শব-ব্যবচ্ছেদে মর্মাহত হ'য়ে ব'লেছিল: "সেই যে কা-কালিদাস লি-লি-লিখেছেন না যে অর-র-র-র -রসিকেষু—"

অনঙ্গ অট্টহাসি ক'রে ব'লেছিল, "থা-থা-থাম্, অনর্থক শ্বাস-যন্ত্রকে কষ্ট দিচ্ছিস্ বাপু! ও বস্তা-পচা শ্লোকটা সবাই-ই জানে, বাল্য-শিক্ষা প্রথম পাঠেই লেখা আছে।"

কিন্তু ওরা যাই-ই বলুক, পার্থের কিন্তু কবিতাটা ভালো লেগেছিল, বাইরে স্বীকার না করলেও ভালো-লাগাটাকে মনে মনে কখনো অস্বীকার করার উপায় নেই। অনঙ্গের সমস্ত বিদ্রূপ এবং ক্রুদ্ধ বংশীর সকরুণ ও সরস আত্ম-সমর্থনের সমস্ত পটভূমিকাকে পার হ'য়ে সেই কবি-তার কয়েকটা লাইন অপূর্ব একটা সুর-মধুর রূপ নিয়ে এখনো ওর স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে নিবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে:

"আমার বিদায়-ক্ষণে,
কানন-কুঞ্জ কেঁদে উঠিবে না
মর্মর গুঞ্জনে ?
হাসিটুকু তা'র র'বে অম্লান
বল্লরী-কিশলয়ে,
গোধুলি-ধুসর ছায়া নামিবে না
সুদূর দিগ্বলয়ে ?
অঙ্গ-বিহারী বীণায় তোমার
তন্ত্রী কী যাবে ছিঁড়ে,
বুকের নিচোল সিক্তি হ'বে
দু' ফোঁটা নয়ন-নীরে ?
—আমার বিদায়-ক্ষণে,
চেয়ে দেখো প্রিয়া সে কোন্ তারাটি
জাগে তব বাতায়নে।"

কিন্তু সত্যিই কী তাই ?

জড়-প্রকৃতির যদি বা অবকাশ থাকে, মানুষের তো নেই-ই। তুমি যদি আজকে চ'লে যাও, কাল তোমার প্রিয়াকে আরেক জনের সঙ্গে মোটরে দেখতে পাবে, রেড রোডে, ঢাকুরিয়ার লেকে। প্রয়োজন আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে আঘাত করে, অবকাশ দেয় না এক বিন্দুও। বিতৃষ্ণ-মনকে সচেতন করবার জন্তে প্রেয়সী মেট্রো, লাইট হাউসে গিয়ে ঢোকে, সোডা-ফাউণ্টেনে প্রবেশ করে। তা'দের নতুন এক্সকার্শানে, সকলের চোখের আড়ালে গঙ্গার ধারে এলাচি-কুঞ্জের ছায়ায় যা'র গলা জড়িয়ে ধ'রে সে 'মন আমি' উচ্চারণ করে : সে তুমি তো নওই, সেখানে তোমার স্মরণ-মাত্রও নেই।

তাই ক্ষেন্তির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চে নতুন এক জনের প্রবেশ। হয়তো এ ভালোই হ'য়েছে, মাসিমার সাত-মাণিকের কোল, একটি আসনও শূন্য থাকতে নেই। তাই বিকলাঙ্গ হাবা মেয়েটার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তা'র জায়গায় আসছে একটি সুস্থ সতেজ সন্তান।

সুস্থ সতেজ সন্তান ?

মেসো-মশাই বা মাসিমার স্বাস্থ্য দেখে একথা মনে করতে ইচ্ছে হয় না পার্থের।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



পূজা কন্‌সেসন

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

এক

ঘোষাল-গৃহিণী কোথা হইতে ঝড়ের বেগে আসিয়া ঝড়ের মতই বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমার এ হোল কি? পাগল হলে না কি? গরীবের আবার এমন ঘোড়া-রোগ হোল কেন? পুজোর বাজার করতে কল্‌কাতায় যেতে হ'বে! কেন? কি এমন হাতি ঘোড়া কিন্‌বে শুনি?"

ঘোষালমশায় তখন শোবার ঘরের দাওয়ায় বাঙলা সাপ্তাহিক কাগজখানা খুলিয়া বিছাইয়া, তাহারই একাংশে বসিয়া নিবিষ্টমনে এক টুকরা কাগজে কি সব টুকিয়া লইতেছিলেন। এমন অতর্কিত আক্রমণে তিনি ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া গেলেন। গৃহিণী যদি একখানা ছাপানো প্রশ্নপত্র হাতে দিতেন, তাহা হইলে ঘোষালমশায় সকল প্রশ্নের নম্বরওয়ারি উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ অবস্থায় তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? তাই গোড়াকার প্রশ্নগুলা ভুলিয়া গিয়া কেবল শেষ প্রশ্নটির উত্তর দিলেন।

চশমার ফ্রেমের উপর দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া তিনি বলিলেন, "কেন, কল্‌কাতায় কি হাতি ঘোড়া ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না?'

তারপর চশমাখানা খুলিয়া রাখিয়া তিনি বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'শোন বলি,—নতুন জামাইকে প্রথম পুজোর তত্ত্ব করতে হবে। সেটা আমাদের সাধ্যমত ভালো করেই করা চাই তো? শিশির কল্‌কাতায় চাকরি করে, সেখানে মেসের বাসায় থাকে, হাল ফ্যাশন মতন জামা-কাপড় না দিলে সে হয় তো ব্যবহারই করতে পারবে না। টাকাগুলো শুধু শুধু জলে যাবে।"

ঘোষালমশায়ের মুষ্টিযোগ অব্যর্থ। গৃহিণীর মন ভিজিল। তথাপি তিনি হাল ছাড়িলেন না। বলিলেন, "তা না হয় হোল। কিন্তু তাতে খরচ পড়ে যাবে তো অনেক? ট্রেনভাড়া আছে, তারপর কল্‌কাতায় জিনিস পত্রের দরও হয় তো বেশী।"

একটু অনুকম্পার হাসি হাসিয়া ঘোষালমশায় বলি-লেন, "তাও জান না বুঝি? এই সময়ে রেলে যে পুজো কন্‌সেশন দেয়। কলকাতায় যেতে আস্‌তে দু পিঠের পুরো ভাড়া আর লাগবে না, ফেরবার ভাড়া অর্দ্ধেক। তাহলে ঐখানেই ট্রেণ ভাড়ার অর্দ্ধেক বাঁচল। তারপর এই দেখ, কাগজময় বড় বড় অক্ষরে ছাপা,—'সেল! সেল!!' 'ডাপ প্রাইস্‌ সেল,' 'ক্লিয়ারেন্স সেল,' 'পূজা কন্‌সেশন'। এই তালে যেতে পারলে খুব সস্তায় সব পাওয়া যায়। দোকানদারেরা এ সময়ে মাটির দরে সব জিনিস ছাড়ে।"

গৃহিণী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেন, দোকানদারেরা কি দোকান তুলে দিয়ে সবাই বিবাগী হয়ে বনে-জঙ্গলে চলে যাবে নাকি?"

"আহা হা, তা কেন? তারা সারা বছর বেচা-কেনা ক'রে বিলক্ষণ লাভ করে কি না! এ সময়টা যৎসামান্য লাভে খুব বেশী বিক্রি করতে পারলে পুষিয়ে যায়। তা ছাড়া দোকানদারদের ভেতর রেষারেষি চলে, কে কত সস্তায় দিতে পারে। তাতে খদ্দেরদেরই তো লাভ।"

"তার চেয়ে বল না কেন, সারা বছরে যে সব জিনিস বিক্রি হয় না সেই সব দাগী, পুরনো, বস্তাপচা মাল তোমার মতন খদ্দেরদের গছায়?...যাক গে আর কথা বাড়িয়ে কি হবে, কল্‌কাতায় একবার ঘুরেই না হয় এস। তারপর হিসেব করে লাভ লোকসান খতিয়ে দেখা যাবে'খন।...... এখন যাও, বেলা অনেক হয়েছে, সে হুঁস আছে? চট্‌ করে তেল মেখে চান করগে।"

ঘোষালমশায় কাগজ-পত্র গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তুমি কি মনে করেছ, ঘরের পয়সা লুটিয়ে দেবার জন্তে যেতে চাইছি? আমি যা করি খুব হিসেব করেই করি। তুমি আর হিসেবের কথা বলো না,—মেয়েমানুষ আবার হিসেবী হ'ল কবে? কথাতেই বলে, দশ হাত কাপড়েও কাছা দিতে কুলায় না!"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দশ হাত কাপড়ে আমাদের তবু সমস্ত দেহটা ঢাকা পড়ে। তোমাদের সেই দশ হাত কাপড়ই এমন হিসেব ক'রে পরো যে শুধু কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে, তার বেশী নয়। সরু সরু দুটো ঠ্যাং আর বুকের বিষ্ণুপঞ্জরগুলোর বাহার—"

ঘোষাল-গৃহিণী চলিয়া গেলেন, শেষের কথাগুলো আর শোনা গেল না। ঘোষাল মশায় কাগজপত্র তুলিয়া রাখিয়া তেল মাখিতে বসিলেন।

দুই

ভালো দিনক্ষণ দেখিয়া ঘোষাল মশায় দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া বাটী হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে লইলেন একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তাহার ভিতর কাপড় গামছা এবং একটা ছোট সতরঞ্চিতে জড়াইয়া ছোট্ট একটি বালিশ।

ঘোষাল মশায় ইতিপূর্ব্বে বার তিন-চার কলিকাতায় গিয়াছেন, সুতরাং নিতান্ত অপরিচিত জায়গা নয়। কিন্তু এবার তিনি ঠিক করিয়াছেন কাহারও বাসায় গিয়া উঠিবেন না। কারণ পরের বাসায় থাকিতে একটু সঙ্কোচ ভাব আসে এবং স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুবিধা হয় না। থিয়েটার সিনেমা দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা ঘটিয়া উঠে না। কারণ যে সঙ্গে থাকিবে তাহার টিকিটেরও দাম দিতে হয়। তাই এবার কোন একটা হোটেলে গিয়া উঠিবেন, প্রয়োজন হইলে দু-চার দিন বেশী থাকাও চলিবে।

শিয়ালদহ ষ্টেসনে নামিয়া ঘোষাল মহাশয় বিছানা ও ব্যাগ বগলদাবা করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এখন প্রথম কাজ একটা আস্তানা খুঁজিয়া লওয়া। খবরের কাগজে কয়েকটা হোটেলের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহাদের নাম-ঠিকানা কাগজে টুকিয়া আনিয়াছিলেন। পকেট হইতে কাগজটুকু বাহির করিয়া দেখিয়া লইলেন—'দি ইম্পিরিয়ল হোটেল', হ্যারিসন রোডের উপরে, বোধ হয় শিয়ালদহের কাছেই হইবে। নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন প্রকাণ্ড পাঁচতলা একটা বাড়ী, তাহার মাথার উপর বড় বড় অক্ষরে হোটেলের নাম লেখা।

ঘোষাল মশায় ওপারের ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। হোটেলের সদর দরজার পাশে টুলের উপর পাগড়ি পরা একটা লোক বসিয়া আছে। সম্মুখেই যে ঘরখানা তাহা বেশ সুসজ্জিত বলিয়া মনে হইল। তাহার ভিতর লুঙ্গিপরা কে একজন ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, বোধ হইল সে আসবাব-পত্র ঝাড়ামোছায় নিযুক্ত।

একখানা ট্যাক্সি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। পাগড়ি পরা লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। গাড়ী হইতে সাহেবী পোষাকপরা একটি ভদ্রলোক নামিলেন, তারপর একজন শাড়ীপরা মহিলা।

ঘোষাল মশায় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "না বাপু, এ আমার পোষাবে না। এ সব বড়মানুষী কাণ্ড। তাছাড়া বেজায় অনাচার। শেষে জাতজন্ম খোয়াব!"

ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া ঘোষাল মশায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। পকেট হইতে আর একবার কাগজখানা বাহির করিয়াই আবার রাখিয়া দিলেন; বলিলেন, 'দূর কর! ও সবই এক।···কিন্তু এখন যাই কোথা? কাছাকাছির মধ্যে এক আছে দামু ঘোষের আড়ৎ। শেষ পর্য্যন্ত সেইখানে গিয়ে উঠতে হবে না কি? না জামায়ের বাসায়? না না, তা কি হয়!···'

হঠাৎ রাস্তার ওপারে দৃষ্টি পড়িল। দেখা গেল এক ফালি লাল শালুর উপর লেখা রহিয়াছে—'৺পূজা কন্‌সেশন'। একটু ম্লান হাসিয়া ঘোষাল মশায় বলিলেন, "এই! আরম্ভ হোল কন্‌সেশনের পালা! কল্‌কাতা সহরে কনসেশনের তো ছড়াছড়ি; দুঃখের মধ্যে একটু কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় না।"

এমন সময়ে দেখা গেল সেই লাল শালুর নীচেই একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে লেখা:—

শুদ্ধানন্দ আশ্রম
হিন্দু ভদ্রমহোদয়গণের জন্য পবিত্র
আহার ও বাসের স্থান
প্রোঃ—শ্রীশুদ্ধানন্দ শর্ম্মা (পাঠক)।

ঘোষাল মশায় আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন—"এই তো! তবে আর কি!...কিন্তু আশ্রমটি কোথায়? একটা তো দেখছি জুতোর দোকান, তার পাশে মুদিখানা। মাঝে একটা সরু গলি আছে বটে। তবে কি ঐ গলির ভেতর? দেখি।"

গলির ভিতর ঢুকিয়া একটুখানি যাইতেই দেখা গেল একটা খোলার বাড়ীর চালে আবার একটি সেইরূপ সাইনবোর্ড টাঙানো রহিয়াছে। সাইনবোর্ডের নীচে দিয়া ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া ঘোষালমশায় সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

তিন

আশ্রমের মালিক শুদ্ধানন্দ পাঠক ঘোষাল মহাশয়কে অতি অমায়িকভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তিনি কয়েকদিন এখানে থাকিবেন শুনিয়া পাঠক মহা উৎসাহের সহিত আহার ও বাসের জন্য কিরূপ নিখুঁত ব্যবস্থা আছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল, তারপর সঙ্গে করিয়া ঘর দেখাইতে লইয়া গেল।

ছোট ছোট অনেকগুলা কুঠরি, তাহার মধ্যে তিনখানা খালি ছিল, প্রত্যেকের ভাড়া দৈনিক আট আনা। ঘোষালমশায় তাহারই মধ্যে একখানা পছন্দ করিয়া লইলেন। ঘরের ভিতর আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চওড়া একখানা তক্তপোষ এবং কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য কোণাকুণি একটা দড়ি খাটানো আছে।

পাঠকের আদেশে একজন ঝি আসিয়া ঘরের মেজে এবং তক্তপোষ ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। ঘোষালমশায় বাহিরে দাঁড়াইয়া পাঠককে জিজ্ঞাসা করিল, 'খোরাকী কত করে দিতে হয়?'

'[illegible] আমাদের বাঁধা কোন রেট নেই,—আধুনিক নিয়ম। যা যা খাবেন তারই দাম ধরে দেবেন। এতে খদ্দেরের ঢের সুবিধে মশায়, নিজের নিজের রুচিমত সামর্থমত খেতে পারে। আবার গরিব লোকদের খুব কম খরচেই হয়। পাঁচ ছ' পয়সাতেই পেট ভরে খাওয়া হয়।'

'তার ওপর তো আবার পুজো কন্‌সেশনও আছে দেখলাম?'

পাঠক এক গাল হাসিয়া বলিল, 'আর কেন বলেন মশায়, এ সময়ে কনসেশন না দিলে কেউ ছাড়ে না। কাজেই লোকসান করেও খদ্দেরদের খুসি রাখতে হয়। খদ্দেরই তো লক্ষ্মী!

পাঠক চলিয়া গেল। ঘোষালমশায় জামাটা খুলিয়া রাখিয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। একটা বিড়ি ধরাইয়া লইয়া তিনি পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ এক রকম মন্দ হইল না, গোড়া হইতেই কন্‌সেশন আরম্ভ হইয়াছে,—হোটেলেও কন্‌সেশন!

একটুখানি গড়াইয়া উঠিয়া ঘোষালমশায় প্রাতঃকৃত ও স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া সংক্ষেপে জপটা সারিয়া লইলেন। তারপর কিছু খাবার আনিয়া জলযোগ করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পূজা কনসেশনের জন্য ট্রেণে অসম্ভব ভীড় হওয়ায় সারারাত বসিয়া দাঁড়াইয়া কাটিয়াছে, ঘুম মোটেই হয় নাই, কাজেই তিনি অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

চার

ঘোষালমশায়ের যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাড়ে এগারটা। উঠিয়া মুখ ধুইয়া তিনি আহার করিতে গেলেন। পাঠক তখন ছোট্ট একটি তক্তপোষের উপর একটি বাক্স কোলে করিয়া বসিয়া আছে। বাক্সটির উপর বালির কাগজের লম্বাচোড়া একখানা খাতা খোলা রহিয়াছে। তাহাতে পেন্সিল দিয়া অসংখ্য ঘর কাটা।

সহকারীকে ডাকিয়া পাঠক বলিয়া দিল, 'জীবন, ঘোষাল মশায়কে ভালো করে বসিয়ে খাওয়াও। আর

দেখ, পাতা পেতে দাও, থালার আর ভাত দিয়ে কাজ নেই। হাজার হোক ব্রাহ্মণ—

ঘোষাল মশায় বলিলেন, 'কি কি রান্না হয়েছে বলুন দেখি আর কিসের কি দাম?'

'আজ্ঞে, ঐ যে সব লেখা টাঙানো রয়েছে।'

দেখা গেল দেওয়ালে টাঙানো একখানা আলকাতরা মাখানো তক্তার উপর খড়ি দিয়া লেখা রহিয়াছে:—

ভাত……………………‹১০
ডাল…………………‹২
মাছের ঝোল বা ঝাল ‹১০
…………………
…………………
হাঁসের ডিম……………‹১০
চাট্‌নি…………………‹২

৺পূজা কন্‌সেশন।

১ দফা। হাঁসের ডিম ১ জোড়া ⁄০ স্থলে ‹১৫

২ দফা। তিন আনার আহার করিলে চাট্‌নি বিনা মূল্যে।

ঘোষালমশায় খাইবার ঘরে গিয়া একখানা পিঁড়িতে বসিলেন। দেখিলেন ঘরে প্রায় খান দশেক পিঁড়ি পাতা আছে এবং প্রত্যেকের পিছনের দেওয়ালে এক একটা সংখ্যা লেখা। তাঁহার নিজের মাথার কাছে "৬" লেখা আছে দেখিলেন।

আহার্য্য দিয়া জীবন হাঁকিল—"ছ নম্বরে ভাত, ডাল, ভাজা।"

ঘোষালমশায় খাইতে আরম্ভ করিলেন। ভাতগুলো দেখিলেন বেশ ধপধপে সাদা, যদিও স্বাদ গন্ধ কিছু নাই। ব্যঞ্জনাদি এত ঝাল যে মুখে দিয়া আস্বাদ গ্রহণ করিবার সময় পাওয়া যায় না,—সঙ্গে সঙ্গে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যাহা হউক, ঘোষাল মশায় বসিয়া বসিয়া খাইতে লাগিলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হে, কনসেশন চাটনি দেবে তো?"

জীবন বলিল, "দাঁড়ান, জিজ্ঞাসা করি।" তারপর হাঁকিল—"ছ নম্বরে কন্‌সেশন চাটনি?"

পাঠক খাতা দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল, "না, ন' পয়সা হয়েছে।" তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "জানেন তো, বারো পয়সার খেলে চাটনিটা কন্‌সেশন। আপনার ন' পয়সা হয়েছে। আর তিন পয়সার কিছু খান না।……এক জোড়া ডিম নিন না, বেশ ভালো টাটকা ডিম। তা'হলে ডবল কনসেশন হবে।……ডিম আপনার চলে তো?"

ডিম চলে কি না ঘোষালমশায় তাহাই ভাবিতেছিলেন, তাই সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। ডিম তিনি কখনও খান নাই। মাংস খান, তবে বৃথা মাংস কখনও খান নাই। দেখিলেন ডিমের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম খাটানো চলে না। বৃথা মাংস খাইব না বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু বৃথা ডিম খাইব না বলিলে চিরকাল ওরসে বঞ্চিত থাকিতে হয়। কারণ হাঁসের ডিম কোন পূজাতেই লাগে না, সুতরাং ডিম বৃথা ছাড়া হয় না। এখন কি করা যায়? এমন ডবল কন্‌সেশনটা মাঠে মারা যাইবে? বলিলেন, "তবে তাই দিতে বলুন।"

জীবন আসিয়া এক জোড়া ডিম দিয়া গেল। ঘোষাল-মশায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ কি ডিম দিলে হে? এত ছোট যে?"

"আজ্ঞে হাঁসের ডিমই বটে। যা ভাবছেন তা নয়, তার যে দাম বেশী।"

সেই ঘরে আর একটি লোক একটু দূরে বসিয়া খাইতে-ছিল। এতক্ষণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সে ব্যক্তি এইবার বলিয়া উঠিল, "কি জানেন ঠাকুর মশায়, হাঁসগুলোও চালাক হয়েছে। এই কন্‌সেশনের হিড়িকে তারাও ফরমাইসী কন্‌সেশন ডিম পাড়তে আরম্ভ করেছে!"

ঘোষালমশায় হাসিতে লাগিলেন।

ডিম দুটি খাওয়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "কই হে, তোমার কন্‌সেশন চাটনি আন এইবার।"

জীবন আসিয়া পাতের উপর কি ফেলিয়া দিয়া গেল। ঘোষালমশায় ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি হে, আবার এক জোড়া ডিম দিলে কেন?"

জীবন বলিল, "ডিম নয়,—আমড়ার কন্‌সেশন চাটনি।"

হাঁসের ডিমের ক্ষুদ্রাকৃতি যতটা বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল, আমড়া দুটির বৃহদাকৃতি ততোধিক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। যাহা হউক, ঘোষালমশায় একটা আমড়া তুলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা ঝামার মত শক্ত। কামড় দিতে সাহস হইল না, সামনের দুইটা দাঁত একটু একটু নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই চাটিয়া চুষিয়া যতদূর রস গ্রহণ করা গেল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, ঘোষাল মশায় উঠিয়া পড়িলেন।

পাঁচ

বৈকালে একবার বাহির হইয়া ঘোষাল মশায় খুব খানিকটা ঘুরিয়া পথঘাট চিনিয়া আসিলেন। খবরের কাগজে যে সকল দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিয়া নাম ঠিকানা টুকিয়া আনিয়াছিলেন তাহাদেরও সন্ধান লইয়া আসিলেন।

তাহার পর তিন দিন ধরিয়া ঘোষাল মশায় বিস্তর জিনিস কিনিলেন। মেয়ে জামায়ের জন্ত জামা, কাপড়, জুতা, মোজা, প্রসাধন দ্রব্য, কত কি! গৃহিণীর জন্ত একখানি ফরাসডাঙ্গার চিকণ শাড়ী, এবং সর্ব্বশেষ নিজের জন্ত একটা ছিটের কোট। সমস্তই কন্‌সেশন দরে। যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া আনা হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানা প্রকারের জিনিস, সস্তায় যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাই কিনিয়া ঘোষালমশায় 'দু চোখো ব্রত' উদ্‌যাপন করিলেন। তহবিল মিলাইয়া দেখা গেল, ৬৩৮/০ আনার মধ্যে ৬।/.৫ অবশিষ্ট আছে। ঘোষাল মশায় মনে মনে স্থির করিলেন,—এই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়।

পরদিন সকালে উঠিয়া ঘোষালমশায় কালীঘাটে মায়ের পূজা দিয়া আসিলেন। অবশ্য যাহা না হইলে কালীঘাট দর্শনের পুণ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, ফিরিবার পথে তাহাও দর্শন করিয়া আসিলেন,—অর্থাৎ আলিপুরের চিড়িয়াখানা!

তাহার পর দিনটা ছিল রবিবার। ঘোষালমশায় স্পেশ্যাল ট্রামের একখানা 'সারাদিনের টিকিট' কিনিয়া সকাল হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ট্রামে ট্রামে ঘুরিয়া কাটাইলেন। একবার অল্পক্ষণের জন্ত হোটেলে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা সারিয়া লইয়াছিলেন মাত্র।

কলিকাতায় আসার প্রয়োজন এইবার শেষ হইয়াছে। ঘোষালমশায় স্থির করিলেন এখন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,—থিয়েটার সিনেমা দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। কলিকাতায় আসিবার সুযোগ আবার কতদিনে হইবে তাহার তো ঠিক নাই, সুতরাং মনের বাসনা অপূর্ণ রাখা উচিত হইবে না।

ছয়

সেইদিনই বিকালে বাহির হইয়া ঘোষাল মশায় 'সাহানা' চিত্র গৃহের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন 'সংসার চক্র' ছবিখানির দ্বাদশ সপ্তাহ চলিতেছে। ভীড়ের ভিতর দিয়া ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া একটি লোককে খাঁচার ভিতরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এই টিকিট ঘর। সেখানে গিয়া একখানা ।১০ আনার টিকিট চাহিতে লোকটি কিছুক্ষণ মুখ হাঁড়িপানা করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল ।১০ আনার টিকিট সেখানে পাওয়া যায় না, অন্ত পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু ।১০ আনার টিকিট তো আর পাওয়া যাইবে না, সকালেই সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ন' আনার টিকিটও এইমাত্র ফুরাইয়াছে।

ঘোষালমশায় ধীরে ধীরে ফুটপাথে নামিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ মুখে চিত্র দর্শনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য নরনারীর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন বায়স্কোপ দেখা এ যাত্রায় আর ঘটিল না। এমন সময় দেখা গেল একটা লোক হাতে খানকতক রঙিণ কাগজের টুকরা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে বলিতেছে—"ফোর্থ ক্লাশ সাড়ে ছ' আনা।"

লোকটা ক্রমে নিকটে আসিয়া বলিল, "নিবেন বাবু টিকিট?" ঘোষালমশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ।১০ আনার টিকিট এখানে ।৶১০ আনায়

বিক্রয় হইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া ।৶১০ আনা দিয়া একটা টিকিট কিনিলেন। মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, এও একরকম কন্‌সেশনই বলিতে হইবে বৈ কি? নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, ভগবানের সুবিচারে তবু তো বায়োস্কোপ দেখা ঘটিয়া গেল!

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া ঘোষাল মশায় দেখিলেন সেখানে সূচীভেদ্য অন্ধকার। তাহার উপর আবার কোথা হইতে দুই তিনটা লোক ভূতের মত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং টর্চ্চের আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া গুঁজিয়া কোথায় একটা জায়গায় লইয়া গিয়া বসাইয়া দিল।

যাহা হউক অল্পক্ষণের মধ্যেই সামলাইয়া উঠিয়া ঘোষাল মশায় চক্ষের সম্মুখে পর্দ্দার উপরে সবাক চিত্রের বিচিত্র লীলা অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন ছবিতে কিছুরই অভাব নাই,—অগণিত নরনারীরহাস্য লাস্য, হাব-ভাব, নাচ-গান, আবার মারামারি, খুনখুনি, চুরি-ডাকাতি, ঘরে আগুন, সব কিছুই আছে! 'সংসার চক্রের' ঘূর্ণি-পাকে পড়িয়া ঘোষাল মশায় শেষ পর্য্যন্ত হাঁপাইয়া উঠিলেন, মাথা ঘুরিতে লাগিল। টলিতে টলিতে কোনক্রমে বাসায় ফিরিয়া তিনি ধাতস্থ হইলেন।

সাত

সিনেমা দেখিয়া ঘোষাল মশায়ের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু তৃপ্তি হইল না। ভাবিলেন পৌরাণিক নাটকে যেমন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয় তেমন কি আর কিছুতে হয়?

'ভিনাস থিয়েটারে' সে সময়ে 'ঘটোৎকচ বধ' নাটক চলিতেছিল। ঘোষাল মশায় পরদিন যথাসময়ে সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। সেখানেও ।১০ আনার টিকিট আছে, কিন্তু তাহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ॥/০ আনার টিকিট তখনও ফুরায় নাই। অগত্যা সেই টিকিটই একখানা কিনিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে ঘোষালমশায়ের মনে নানা তত্ত্বকথার উদয় হইল।

তিনি ভাবিলেন, চারিদিকে এত কনসেশন, কিন্তু থিয়েটার বায়স্কোপে তো কনসেশন দেয় না, কেহ চাহেও না। টিকিটের দাম বাড়াইয়া দিলেও বোধ হয় এই রকমই ভীড় হয়। বুঝিলেন আমোদ-প্রমোদের সময় লোকে পয়সার কৃপণতা করে না, কৃপণতা করা চলে কেবল ভাত-কাপড়ের বেলায়!

প্রেক্ষাগৃহের দ্বারের নিকট পৌছাইয়া ঘোষাল মশায় আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন কাছেই একটা কাগজ টাঙানো, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—পূজা কনসেশন! মুচকি হাসিয়া ঘোষালমশায় ভাবলেন যাক, এরা তবু কন্‌সেশনের একটু মান রাখিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা "প্রোগ্রাম ৶০ আনা স্থলে /০।"

একখানা প্রোগ্রাম কিনিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া ঘোষালমশায় দেখিলেন বসিবার জায়গা অনেক পিছনে। যাহাদের ।১০ আনার টিকিট তাহাদের স্থান আরও দূরে। সেখান হইতে মাথামুণ্ড কিইবা দেখিতে পায়, শুনিতে পাওয়া তো পরের কথা! ভাবিলেন, সিনেমা ওয়ালা-দের যতই দোষ দেওয়া যাক, তাহাদের তবু একটু বিবে-চনা আছে। গরীবের প্রতি সহানুভূতি আছে,—যাহা-দের ।১০ আনার টিকিট তাহাদের খাতির করিয়া সম্মুখে বসায়।

আট

পরদিন ভোরে উঠিয়া ঘোষালমশায় বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কয়দিন ক্ষৌরকার্য্য হয় নাই, অগ্রে সেটা সারিয়া লইতে হইবে। নাপিতের সন্ধানে পথে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতেই দেখা গেল একজন হিন্দুস্থানী নাপিত একটা গাছতলায় বসিয়া একজনের দাড়ি কামাইয়া দিতেছে। তাহার কাছে গিয়া পৌঁছি-বার পূর্ব্বেই ঘোষালমশায় দেখিলেন পূর্ব্বোক্ত লোকটি উঠিয়া গিয়াছে, একজন খোট্টা মুচি তাহার তল্পি ও যন্ত্রপাতি নামাইয়া রাখিয়া নাপিতের সম্মুখে ইটের উপর বসিয়া পড়িয়াছে। ঘোষালমশায়ের আর প্রবৃত্তি হইল না, তিনি সেখান হইতেই ফিরলেন।

একটি ভদ্রবেশী ছোকরা মত বাঙ্গালী পিছন হইতে আসিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গেল, তাহার হাতে একটা ছোট কাঠের বাক্স ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক কোঁচার খুট গায়ে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ছোকরাকে ডাকিলেন, 'ওহে পরামাণিক, একবার এস দেখি চট করে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভদ্রলোক একটা গলির ভিতর ঢুকিলেন। ঘোষালমশায় ভাবিলেন, তাই তো, চক্ষের সম্মুখ দিয়া নাপিত চলিয়া গেল, ধরা গেল না! তিনি পরামাণিকের ফেরার আশায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আবার একটি ভদ্রবেশী যুবক তেমনই দ্রুতবেগে আসিতেছে দেখা গেল, কিন্তু তাহার বাক্সটি ঠিক সে রকমের নয়। যাহা হউক, ঘোষালমশায় হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিলেন, "ওহে পরামাণিক!" লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, চোখের মাথা খেয়েছ? দেখতে পাচ্ছো না?

তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মত ঘোষালমশায় চাহিয়া দেখিলেন ডাক্তারের নিত্যসহচর ষ্টেথোস্কোপের রবারের নলগুলা পকেটের ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব গলা বাড়াইয়া মালিকের পরিচয় প্রচার করিতেছে। মহা অপ্রস্তুত হইয়া ঘোষালমশায় বলিলেন, ও, বুঝতে পারিনি, আপনি ডাক্তার বাবু? লোকটি একবার কটমট করিয়া চাহিয়া চলিয়া গেল।

পরামাণিকও আর ফিরিল না দেখিয়া ঘোষালমশায় ক্ষুদ্ধভাবে গুটি গুটি চলিতে আরম্ভ করিলেন। আবার চোখে পড়িল সেই বহু-পরিচিত লাল শালুর ফালির উপর লেখা—'পূজা কনসেশন।' তাহার নীচে সাইন-বোর্ডে লেখা—'অভিনব ক্ষৌর কর্ম্মশালা' এবং ইংরাজি অক্ষরে—'দি নভেল হেয়ার-কাট সেলুন!'

ভিতরে প্রবেশ করিয়া জানা গেল, দাড়ি-গোঁফ কামাইতে দুই আনা লাগিবে। ঘোষালমশায় একখানা বড় আয়নার সম্মুখে অতি গম্ভীরভাবে চেয়ারের উপর চাপিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমাদেরও পুজো কনসেশন ?" নাপিত বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বৈকি।"

নয়

ঘোষাল মশায় যখন বাড়ী পৌঁছিলেন তখন ঠিক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডাক দিতে উমা আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল এবং দৌড়াইয়া গিয়া মাকে জাঁকড়াইয়া ধরিল।

ঘোষাল গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। হারিকেনটা একবার তুলিয়া ধরিয়াই দুম্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া তিনি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এ কি চেহারা নিয়ে এসেছ? মুখখানা এমন নইনিতাল আলুর মতন হোল কেমন ক'রে?"

ম্লান হাসিয়া ঘোষালমশায় বলিলেন, "আর কেন বল,—এও পুজো কনসেশন!"

"কি রকম?"

"নাপিত না পেয়ে শেষে একটা সেলুনে গিয়েছিলাম। সেখানে পরামাণিক কামাতে লাগল, আমি চোখ বুজে আরাম করে চেয়ারে বসে আছি, হঠাৎ চম্‌কে উঠে সুমুখের আয়নায় চেয়ে দেখি এক দিককার ভ্রূ উড়িয়ে দিয়েছে! বল্লাম, এ কি হোল? জবাব দিলে, আজ্ঞে ঐ তো পুজো কন্‌সেশনের ফাউ!—"

"তা বেশ হয়েছে, কন্‌সেশনটা টুটিয়ে আদায় করে নিয়েছ! কিন্তু কই, জিনিসপত্র কই? এই ছোট্ট একটি পুঁটুলি নিয়ে তো বাড়ী ঢুকলে। তোমার ব্যাগ, বিছানা—"

ঘোষাল মশায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। "তাই তো, ছোঁড়াটা আবার কোথায় গেল!"—বলিয়া তিনি সদর দরজার দিকে ছুটিলেন। একটা বছর দশেকের ছেলে একটা প্রকাণ্ড মোট মাথায় করিয়া দরজার পাশে অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া মাথার মোট নামাইয়া দিয়া ঘোষালমশায় বলিলেন, "এই তোর মা-ঠাকরুণ, পেন্নাম কর।"

ছেলেটা ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ঘনকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে একটা আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি ফুটিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "এটা আবার কে?"

"ও কে জান? ও পাড়ার ক্যাদার ঘড়ুই ছিল মনে আছে? ঘরামির কাজ করত? সে এই ক' বছর হোল কলকাতায় গিয়ে রয়েছে কি না, এখন সে ছুতর মিস্ত্রি। মাস ছয়েক হোল তার বৌটা মরে গেছে। রাস্তায় একদিন হঠাৎ দেখা, সব কথা বল্লে। তারপর আজ বাড়ী আসব শুনে ছেলেটাকে এনে আমার কাছে গছিয়ে গেল। বললে— দা'-ঠাকুর, মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে বড় আতান্তরে পড়েছি। আপনারা ছীচরণে স্থান না দিলে ও আর বাঁচবে না, কোন্ দিন গাড়ী চাপা পড়ে বেঘোরে মারা যাবে। ওকে নিয়ে যান, একপাশে পড়ে থাক্‌বে, পেসাদ পাবে, ফাই ফরমাস খাট্‌বে।···আমার মনে হয় লোকটা আবার নতুন করে সংসার পাতবার চেষ্টায় আছে, তাই পথের কাঁটাটাকে সরাবার মতলবে আমারই স্কন্ধে চাপালে, বোঝার ওপর শাকের আঁটি!"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তা কেন, ওটাও তোমার পুজো কনসেশন বল না কেন?"

"তা যা বল!"

গোপালমশায় একটু ম্লান হাসিয়া মসৃণ ললাটের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

৮

গদ্যসাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ প্রকাশিত হইবার পর, ঠিক তাহার দুই দুই বৎসর পরে যথাক্রমে "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" বাহির হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের কিছু পূর্ব্ব হইতেই গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কেবল উপন্যাস রচনায় সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই সময়েই তাঁহার মনে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প জাগিয়া উঠে।

বাঙ্গালা দেশের ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের আত্মাভিমান ও বিষয়ীলোকদের পুস্তকপাঠে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে না পারিলে বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশ নিষ্ফল হইবে ইহা বঙ্কিমচন্দ্র ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে বাংলায় এরূপ রচনা করিতে হইবে যাহা সর্ব্বশ্রেণীর সমাদরের যোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" সুধীসমাজে ও জনসাধারণের মধ্যে অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব পুলকের উন্মাদনা আনিয়াছিল। ইহারা সাহিত্যরস পিপাসু বঙ্গীয় পাঠকের চিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে যেন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে বাংলায় যে এরূপ সুন্দর গ্রন্থ প্রচার সম্ভব এ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের মতে 'দুর্গেশনন্দিনী' যে কোন উৎকৃষ্ট ইংরাজী উপন্যাসের সমকক্ষ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মশক্তিতে পূর্ণবিশ্বাস ছিল। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের সাফল্যে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি পূর্ব্বোলিখিত আর দুইখানি উপন্যাসে আরও লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি

নিহিত উচ্চতম আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাহার ফলেই, ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রের লক্ষ্যের বিষয় এইরূপভাবে ব্যক্ত করেন, দেশীয় ভাষার পরিবর্তে বিদেশী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে, বাংলার জনসাধারণের কস্মিনকালে বোধগম্য হইবে না, এবং সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতিসাধন করিতে হইলে মাতৃভাষায় গ্রন্থরচনা আবশ্যক। প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্যলোকদের সহিত মূর্খদরিদ্র লোকদের সংযোগ ও সদ্ভাব স্থাপন কেবলমাত্র জাতীয় সাহিত্যদ্বারাই সম্ভব। পক্ষান্তরে বিদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত লোকের মনে তৎকালীন অপাঠ্য বাংলা পুস্তকের প্রতি বিতৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সৎসাহিত্য প্রচার এবং তৎসঙ্গে সাধারণের পাঠোপযোগী করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সকল উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহা কল্পনায়, ভাব-বৈচিত্রে, এবং ভাষার রসমাধুর্য্যে ও প্রাঞ্জলতায় সম্পূর্ণ অভিনব সামগ্রী। ইহার মূলে ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর স্বদেশ প্রেমজাত একনিষ্ঠ সাধনা। তাঁহার 'বঙ্গ দর্শনের' প্রকাশে সহসা যেন বিশুষ্ক জলাশয়ে নবজীবনের সঞ্চার করিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বঙ্গদর্শন" যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত মুসলধারে ভাব বর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।......বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। "বঙ্গদর্শনের" দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে তাঁহার নানাবিষয়িনী রচনা সম্ভারে এবং অন্যদিকে তৎকালীন অনেক সুলেখকদিগকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের সহায়ক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে যুগপৎ সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টি হইতে লাগিল। এ স্থলে প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শনের লেখকগণের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র
,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জগদীশনাথ রায়
,, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
,, রামদাস সেন
,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার

প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১) পত্র সূচনা
(২) ভারত-কলঙ্ক
(৩) কামিনীকুসুম
(৪) বিষবৃক্ষ
(৫) আমরা বড়লোক
(৬) সঙ্গীত
(৭) ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল।

এই সাতটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও সপ্তমটি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা গঠনের ও তাহার পারিপাট্য সাধনের কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-রচনা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তাঁহার উপন্যাসগুলির তিনটি বিভাগ, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'রাজসিংহ'ই অগ্রগণ্য। তদ্ভিন্ন "আনন্দমঠ" "দেবী চৌধুরাণী" "সীতারাম" "দুর্গেশনন্দিনী" "মৃণালিণী" "চন্দ্রশেখর" এমন কি "কপালকুণ্ডলা" প্রধানতঃ সামাজিকতার ভুক্ত হইলেও ইতিহাসের ছায়া কিছু কিছু ঐ সকল উপন্যাসে পড়িয়াছে। সামাজিক উপন্যাস—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, রাধারাণী, রজনী, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম প্রধানতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হইলেও উহাদিগকে সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ, ইতিহাস বিজ্ঞান, দর্শন, সমালোচনা, রসরচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে নিবদ্ধ। রাজনীতি দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি কমলাকান্তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমাজনীতি সম্বন্ধে রচিত "সাম্য" অধুনা বিলুপ্ত, এবং ধর্ম্মনীতির ও দর্শনের অপরূপ গ্রন্থ "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও কৃষ্ণ



রাধাকৃষ্ণ নৃত্য

[শিল্পী—বি, এন, জিন্না

চরিত্র। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী"র ভাষার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' দুই বৎসর পরে রচিত হয়। এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সমুজ্জ্বল বিকাশ। দুর্গেশ-নন্দিনীতে যে সকল সামান্য দোষ বা ত্রুটি ছিল এই উপন্যাসে উহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা অপরূপ কাব্যে, চিত্তবিনোদনকারী আখ্যানে গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে সংযত ভাষা ও ভাবে বিশ্বসাহিত্যে বরণীয় আসন পাইবার যোগ্য। ঠিক এইরূপ আর একখানি উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে নাই এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলা চলে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ঐ উপন্যাসের বিভিন্ন স্থল হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

নবকুমার দেখিলেন যে গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই। নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক, অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীত নিবারণ জন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত—নদী তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণ নাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার এক স্থানে অধিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল,—যেমন নবকুমারের দেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ প্রান্তর, সমস্ত নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্র গর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন উপত্যকায় কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতিপদে হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

(২)

গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, সাগরগর্জ্জন! ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সৈকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেণরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে, কানন কুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডল মধ্যে সহস্র স্থানে সফেণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগর তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছে। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি হৃদয়ে উড়িতেছিল।

৩

"গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্বমূর্ত্তি। সেই গম্ভীরনাদি বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! কেশভার—সবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল না—

তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতে-ছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়। সে কটাক্ষ এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশ রাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য, বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তি মধ্যে যে একটি মোহিনীশক্তি ছিল তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধ-চন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ ও কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল তাহা সে গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।"

৪

"পূর্ব্বদিকে উষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহন করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত, তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধাশ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে, আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই বৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল। সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণ মেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড় কাল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্র দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরী ফিরাইল। কোন দিকে যাইবে স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমান তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গ মধ্যে হইতে একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে সেই ভীমকান্ত শ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরী ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি।" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকা শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর ও ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।"

উদ্ধৃত অংশগুলির অনুপম চিত্র, কেবল বাংলা সাহিত্যে কেন জগতের যে কোন সাহিত্যে সুদুর্লভ। ভাষার সহিত অনুভূতির এরূপ অপরূপ সামঞ্জস্য, কল্পনার সহিত বাস্তবের এরূপ অপূর্ব্ব মিলন কেবল বঙ্কিম সাহিত্যেই পাওয়া যায়। বাক্যের সহিত ভাবের এরূপ একাত্মতা, কি অভূত পূর্ব্ব আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বাসিত করে, বারবার পড়িয়াও যেন তৃষ্ণা মিটে না। কাব্যের যে সকল উৎকৃষ্ট লক্ষণ, তৎসমূদয়ই ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত আছে।

৫

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে রোপণকারী যাহাই থাকুক না, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধহস্ত, দুইহস্ত পরিমিত হইল; তথাপি যদি কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য পাদপ হয়।" উপন্যাসে চিত্রিত পুরুষ বা নারীর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের আভাষ দিবার পূর্ব্বে এরূপ সাধারণ ভাবে আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতি উপন্যাসেই পরি-লক্ষিত হয়।

৬

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কথনও পরের উপবাস-নিবারনার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদের প্রকৃতি তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে, কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না পরের কাষ্ঠাহরণ যাহার স্বভাব, সে পুনরায় কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?"

উপন্যাসে নীতিপ্রচার দোষাবহ বলিয়া কেহ কেহ মনে করিলেও বঙ্কিমচন্দ্র ইহা তদ্রূপ মনে করিতেন না।

শ্যামাসুন্দরী স্বামী পরিত্যক্তা কুলীনের বধূ, কপালকুণ্ডলা সাগরতটে বর্দ্ধিতা, অধিকারীর পালিতা কন্যা, ভাগ্যবশে এক্ষণে নবকুমারের গৃহিণী। উহাদের মধ্যে কথোপোকথনে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের চরিত্র কিরূপ সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন।

৭

শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

'বলে—পদ্মরাণী বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি ছুটায় অলি প্রাণ-পথিকে দেখে ॥
আবার বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নাম্‌লে ঢল, সাগরেতে যায় ॥
ছি ছি—সরম টুটে কুমুদ ফুটে চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে ॥
মরি একি জ্বালা বিধির খেলা হরিষে বিষাদ।
পর পরসে সবাই রসে ভাঙ্গে লাজের বাঁধ ॥
'তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকবি ?"

মৃণ্ময়ী। (কপালকুণ্ডলার নাম গৃহস্থাশ্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে)

উত্তর করিল, "কেন কি তপস্যা করিতেছি ?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে, মৃন্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল।

"তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না ?"

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন ভাল আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে ?

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই তখনও আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না।

শ্যা। কেন ? দেখবি ? যোগ ভাঙ্গিব। পরশ পাথর কাহাকে বলে জান ?

মৃন্ময়ী কহিলেন "না।"

শ্যা। পরশ পাথরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি ?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশ পাথর আছে।

মৃ। সে কি ?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনী গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পরশ পাথর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি—

বাঁধব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সিঁথীর ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব জোড়া দুল ॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া বাটা ভরে পান গুয়া।
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে।

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "ভাল বুঝিলাম। পরশ পাথর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম ভাল কাপড় পরিলাম; কানে দুল দুলিল, চন্দন কুঙ্কুম চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল, মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ ?"

শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি ?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল। প্রভাত বাতাহত

নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল। বলিলেন, "ফুলের কি! তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তাই যদি না হইল ;—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি।"

মৃন্ময়ী। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্র-তীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে, যে মৃন্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল!"

মৃন্ময়ী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা বিধাতা করাইবেন তাহাই করিব। কপালে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।"

৮

'সুন্দরী হরকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন।

আপনি কি লিখিতেছেন? আমার রূপ?

নবকুমার ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন, আপনি কখন কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন।

সহজে এ কথা বলিলে তিরস্কার স্বরূপ বোধ হইত কিন্তু রমণী যে হাসিয়া বলিলেন তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন এ অতি মুখরা, মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন একটিও না?

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "একটিও না, এমন কথা বলিতে পারি না।"

উত্তরাধিকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনি ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন। আপনি তবে কোন দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে পশ্চিম প্রদেশিয়া মুসলমানী।"

নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন পরিচ্ছদ পশ্চিম প্রদেশিয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গলাও ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন, আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিনী, সে গৃহ কোথায়?

নবকুমার কহিলেন, 'আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।'

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্ম্মা।

প্রদীপ নিভিয়া গেল।

সুদক্ষ রূপকার চিত্রপটে একটি রেখাসম্পাতে যেরূপ ব্যঞ্জনায় অন্তর্হিত অনেক গুপ্তভাব ব্যক্ত করেন, বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রদীপ নিভিয়া গেল।' এই কথাটিতে মতিবিবির হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অনেক ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রদীপ যে মতিবিবির দীর্ঘশ্বাসে নিভিয়া গিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

,এই সুধাকাঙ্ক্ষা পার্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রথমে

নির্ম্মল ক্ষীণধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়। আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না, আপনা আপনি কলকল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত বায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়, কখন আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর-কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবনময় হয়, অগণ্য সৈকতচর মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায় তখন সেই সকর্দ্দম নদী শরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায় কে বলিবে ?

'আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেব মূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত, ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয় সুখাণ্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুণ স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্ত দিয়া বিশিষ্ট অন্তঃকরন পাই।'

২০

"নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত্তদূর হইতে তাঁহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতি গোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষু: কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখ স্রোত কমিত কি বর্দ্ধিত হইত—তাহা কে বলিবে ? সংসার রচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "কপালকুণ্ডলা" সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ও সারবান আলোচনার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

"এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রস পরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থি মজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ওতপ্রোত বাঙ্গলায় আর নাই। কপাল-কুণ্ডলা লিখিলেই কপালকুণ্ডলার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

মূল্য

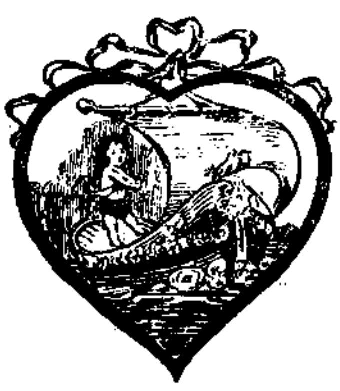
শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-টি

তুমি মনে ভাব জীবন-যাত্রা পথে
যেহেতু তোমার কাজের মূল্য বেশী,
সেহেতু অর্থনীতির থিওরি সাথে
মূল্যের মাপে বাড়িছে বিত্ত-রাশি ;
ওরা বোকা তাই থাকিবার ঘর নেই,
ক্ষিধে পায় তবু খাইবার কিছু নেই,
তোমার তরেতে বাড়িছে অকারণেই,
উঁচু বাড়ী আর পুরু আরামের স্তূপ,
আর ওরা ডুবে যায় কেন না খুঁড়িছে তারা
শুধু বেদনার তলহীন কালো কূপ।

তাই প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন শেষে
যাহা পার তাহা ক'রে যাও সঞ্চয়,
তব বংশের অনাগত যারা এসে
অতিরিক্তের করিবে অপব্যয় ;
শোণিতে ওদের স্বর্ণ জমায়ে শুধু,
ভাণ্ডারে যদি সঞ্চিত কর মধু,
তবে জাগে যেথা শুষ্ক মরুর ধূ ধূ,
শান্তি কোথায় সেথায় তরুর ছায়,
মৃত-কঙ্কালে কাঞ্চন যদি ঢাক,
মনে মনে তুমি পাবে না কী কোন ভয়।

কিন্তু বুঝি না কেন এত বেশী নেবে
যাহাতে কেবল নিজের সুখের ত'রে,
উহারা জীবনে কেবল খাটিয়া যাবে
তবুও অন্ন অভাবে যাইবে ম'রে,
যেভাবে ক'রেছ মূল্যের নিরূপন,
সেভাবে ক'রেছ সমাজ সংগঠন,
কেননা এমন নির্ম্মম লুণ্ঠন
সকলে নীরবে মানিয়া লইবে কেন
আসল রূপের পরিচয় ঢেকে রাখি
টানিয়া দিয়াছ অবগুণ্ঠন কোন।

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়



একটি মিথ্যার গতি

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুই একটা ঘটনার এমন উদ্ভব হয় যাহা বাধা হইয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় —ফলে থমকিয়া গিয়া আমরা বাধ্য হই নূতন কার্য্য-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে। তেমনই একটি বাধা জন্মিয়াছিল মং গাইনের জীবনে তাহার এই কারবারে ফেল পড়াটা! সহর হইতে ফিরিবার পথে ট্রেণে বসিয়া তাহার সর্ব্বনাশের দুঃখ-পূর্ণ ছবি হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে তাহার জন্য সে নিজেকেই সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার এই যে সর্ব্বনাশ, যাহা বহু লোকেরও সর্ব্বনাশ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তাহাতে দায়ী তাহারই আলস্য, অপটুতা ও হঠকারিতা। কি সর্ব্বনাশ, কি কঠোর সত্য এটা! দোষ সম্পূর্ণ তাহারই। নির্ব্বোধ মূর্খ সে আগুন লইয়া খেলা করিয়াছে তাই আজ এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। নিজে ত' দগ্ধ হইলই প্রতিবেশীরও সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এত বড় একটা কারবার সে ফাঁদিয়া বসিয়াছিল ব্যবসায়ের মূলসূত্র ও কর্ম্মপদ্ধতি কিছুই ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার চেষ্টা অবধি না করিয়া: শুধু তাই কি? বৃদ্ধ ইন্সপেক্টরের ঘরটিতে গিয়া মদের ফোয়ারায় ওভাবে ডুবিয়া না থাকিলে বোধ হয় ব্যবসাক্ষেত্রে সুবিবেচনা করিয়া চলিবার যথেষ্ট সুযোগ সে পাইত। মত্ত অবস্থায় পরিকল্পিত যে সব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ সে করিয়া আসিয়াছে সে সব যে অতি শীঘ্রই মূর্ত্ত হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে ধ্বংস-পাতিত বহু পরিবারের কঙ্কাল-সার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া!

নিজের মনোবৃত্তি নিজেই বিশ্লেষণ করিয়া একটি কঠোর সত্য সে সব চেয়ে বেশী আঁকড়িয়া ধরিল—সেটা তাহার হৃদয়ের স্বতঃজাত করুণা ও অনুকম্পা, যাহা, তাহার মতে, মদের নেশা বা অন্য সব কিছুর চাইতেও সর্ব্বনাশের পথে তাহাকে বেশী আগাইয়া দিয়াছে। এই ধারণাটা তাহার পক্ষে দাঁড়াইল দুস্তর সমুদ্রে কাষ্ঠখণ্ডের অবলম্বনেরই মত। সব ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই সে নিজেকে সান্ত্বনা দিত এই ভাবিয়া যে উদ্দেশ্য তাহার ছিল সর্ব্বদাই সৎ। সেই সান্ত্বনার বলেই নিদারুণ অবিবেচনায় বহু কাজ করা সত্ত্বেও সে মনকে বেমালুম প্রবোধ দিতে পারিত আর তাই বিবেকেও তাহার কোনো কিছুই আটকায় নাই মোটেই। এই উদ্দেশ্য ভাল থাকার জ্ঞানটি তাহার ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই নিছক মিথ্যাটিকে সত্যের ছাপে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিত।

আর এখন? বাস্তবক্ষেত্রে ত' আর এই 'সদুদ্দেশ্যের' ফাঁকি দিয়া বেশীদিন চলে না। সেখানে প্রয়োজন হয় আরো কিছুর।

ট্রেণে আসিতে আসিতে তাহার মনে ইহাও উদয় হইয়াছিল যে মজুরদের অবস্থার উন্নতি-কল্পে প্রবর্ত্তিত তাহার চির-সাধের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নীতিটিও তাহাকে এই সর্ব্বনাশের পথে কম আগাইয়া দেয় নাই। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত নীতির দরকার জগতে খুবই আছে কিন্তু তাহাদের প্রয়োগ করা উচিত এরূপ ভাবে যাহাতে যাহাদের উন্নতিকল্পে তাহাদের প্রয়োজন তাহারা যেন উহা দ্বারা উপকৃত না হইয়া বরং দুর্দ্দশাপন্ন না হয়—যেরূপ এ ক্ষেত্রে তাহার মজুরদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

নিজের উপর ক্রোধে সমস্ত মনটা তাহার ভরিয়া উঠিল। সে শপথ করিল—ওই মজুরদের শরীর পাত করা পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা সে পাইয়াছে তাহা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত নিজেকে সে সর্ব্ব-প্রকার ভোগ সুখ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখিবে ও জীবনে কদাপি সে মদ্য স্পর্শও করিবে না। ইহা করিয়াও যে ফল কিছু হইবে তাহা নয়, কারণ এত বহু

লোকের যে অনিষ্ট সে ঘটাইয়াছে নিজ কার্য্য দ্বারা তাহার পরিশোধ সম্ভব নয়, কথনও কোন প্রকারেই।

আর তাহার স্ত্রী ?—যে এত বিশ্বাস তাহার উপর স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে ? তাহার ইচ্ছা হইতেছিল নিজের গলা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া চিরতরে শ্বাস বন্ধ করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ইন্‌স্‌পেক্টরের বাটী হইতে সেই খবরটা শুনিবার পর দ্রুত গতিতে সে চলিল নিজ বাসার দিকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার মন এখন অনেকটা স্থৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। আর সে মাথা নীচু করিয়া না চলিয়া অনেকটা সহজ ভাবে চলিল। কেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া না দেখিলেও তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ও তাহার কাছে সব স্বীকার করার বিভীষিকা তাহার অপেক্ষাকৃত অনেক কমিয়া গিয়াছে মনে হইল।

ইট-খোলার এক পার্শ্বে তাহার বাড়ী। কাছে পৌছিয়া মাত্র একটি জানালার ভিতর দিয়া সে আলোর রশ্মি দেখিতে পাইল। স্ত্রীর অবস্থার কথা তাহার মনে পড়িল। সে যে অসহায়া, পীড়িত আর সেই অবস্থার মধ্যেই কোর্টের পেয়াদা আসিয়াছিল সমন লইয়া। মন তাহার দারুণ ক্রোধে আলোড়িত হইল। এবারকার ক্রোধ নিজের উপর নয়—মেঘনাদের উপর। —"সে কি পাগল—কি তার উদ্দেশ্য !" অপরকে ক্রোধের কারনীভূত করিতে পারিয়া সে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করিল।

ভোজন ঘরে, যেখানে আলো দেখা যাইতেছিল সেখানে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল তাহার স্ত্রী মা-কেট একাকিনী বসিয়া আছে। সম্মুখে একটি ছোট আলো। তাহাকে দেখিয়াই কেট্ যন্ত্র-চালিতবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলে মেয়েরা বিছানায় নিদ্রিত। নানা খাদ্য দ্রব্য তাহারি জন্য টেবিলে সজ্জিত। চিমনীতে আগুন জ্বলিতেছে তাহারি পরিতৃপ্তির জন্য। কি শান্তির নীড়! কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইতে হইল ভীতি বিবর্ণ মুখে কম্পিত হৃদয়ে। এখনি হয়ত কেট জিজ্ঞাসা করিবে "বল এ সব কি সত্য ?

দীর্ঘাকৃতি, সুন্দর সুঠাম তাহার গঠন, গম্ভীর মহিমাময়ী মূর্ত্তি। বয়স তাহার পঁচিশের কাছে। পরিধানে তাহার ছিল একটা ফিকা গোলাপী রং-এর গাউন। মাথা ভরা একরাশ কালচুল মুকুটের মত তাহাকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। টানা দীর্ঘ চোখ দুটিতে প্রতিভাত হইতেছিল গভীর ভাব ও উজ্জলতা। দাঁড়াইয়াছিল সে একখানা চেয়ারের পিছনটা ধরিয়া, আলোর আবরণের (সেডের) অন্ধকারে মুখখানি তাহার অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

নীচু হইয়া সুটকেসটা নামাইয়া রাখিতে রাখিতে গাইন হঠাৎ বলিল—"সব আমি শুনেছি, কেটি" আর সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই শুনিল কেট ধপ করিয়া চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল—"আমার মনে হচ্ছিল আমি পাগল হ'য়ে যাব।"

স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সব বারের মত কৈ কেটি ত' ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল না! তবে কি ওসব বিশ্বাস ক'রেছে ? তাহার মন যুগপৎ ক্রোধ ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সান্ত্বনাও কিছু পাইল ইহা হইতে, কারণ এক্ষেত্রে যে সে বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আর তার প্রমাণ সে অতি সহজেই দিতে পারিবে।

কেটির পিছনে গিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া সে বলিল—"তুমি কি ওটা বিশ্বাস ক'রেছ, কেটি ?"

ক্ষণেক নীরবে কাটিল। গাইনের উৎকণ্ঠা চরমে উঠিল। তারপর কেটি ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি স্বামীর হাতের উপর রাখিল। গাইন জোরে সে হাতখানি চাপিয়া ধরিল। কি নরম, শীর্ণ, উষ্ণ হাতখানি আর যেন বিশ্বস্ততাভরা। এটা ঠিক কিছুদিন হইতে কেটি তাহাকে নানাভাবে তিরস্কার করিয়াছে তাহার অসংযমের জন্য। এমন কি, তাহার টাকাও ফিরাইয়া চাহিয়াছে। কিন্তু যে সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সে উহা করিয়াছে, তাহা যে এ দারুণ অভিযোগের তুলনায় কিছুই নয়! তাই কেটি স্বস্তি লাভ করিয়া স্বামীর দিকে হাতখানি আগাইয়া দিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে সে খাবারের টেবিলের দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—"খাবে এস এখন" ও ধীরে ধীরে চায়ের সরঞ্জাম আনিতে গেল। গাইন কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া টেবিলে বসিয়া খাইতে সুরু করিয়া দিল—উদ্দেশ্য ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাড়াও মুখ হইতে মদের গন্ধ দূর করা। সে লক্ষ্য করিল

টেবিলের উপর আধ বোতল বিয়ার রক্ষিত আছে। বেদনায় মন তাহার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিয়ারের পিছনে অর্থ-ব্যয় করিবার অবস্থা তাহাদের এখন নয়। তাহা সত্ত্বেও কেট তার এই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে তাহার পরিতৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিয়ারটুকু সংগ্রহ করিয়া টেবিলে সাজাইয়া রাখিতে ভোলে নাই।

তাহাকে টেবিলে না আসিতে দেখিয়া গাইন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খেয়েছ ?"

"না, খাইনি। খাবার মত অবস্থা আমার নেই।"

"কিন্তু কেটি তুমি ত' শুধু তোমারি জন্য খাও না আজ-কাল। আর একটি প্রাণী যে অনাহারে থাকবে তুমি না খেলে।"

এই দুর্দ্দশার মধ্যেও ভাবী সন্তানটিকে অবলম্বন করিয়া উভয়ের মধ্যে মিলনের একটি সূত্র গঠিত হইল। অবসাদ, দুঃখ, দৈন্য সব কাটিয়া যাইতে লাগিল। সলাজ্জ-হাস্য বদনে কেটি স্বামীর দিকে তাকাইল। নিরানন্দ গৃহে আনন্দের সাড়া জাগিল। উভয়েরই শঙ্কা কাটিয়া গেল। অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে তাহারা মেঘনাদের ঐ কার্য্যের সমালোচনা করিতে সমর্থ হইল।

চা ঢালিতে ঢালিতে কেটি জিজ্ঞাসা করিল —"ব'লতে পার, কেন মিঃ ভাটা এইরূপ ক'রলেন ?"

তাহার উপর নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চোখ মিলাইতে পারিয়া গাইন বাঁচিয়া গেল। তাহার দিকে চাহিয়া সে বলিল—"কারণ শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। হয় ইহা মস্ত একটা ভুল, নয় ত ?"

"নয় ত ?"

কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার মানসপটে উদিত হইল একটি তারকা। তাহারি নির্দ্দেশ মত সে যেন দেখিতে পাইল এ বিষয়ে একটা বিচার, দোষ-মুক্তি ও ক্ষতি-পূরণ। আব্ছায়ার মত মনের কোণে সে দেখিল ইহার ফলে যেন সে বাঁচিয়াই গিয়াছে, অভিযোগ হইতে ত, বটেই অন্য প্রকারেও।

সে উত্তর করিল—মেঘনাদ এমন একজন যাঁহার সম্বন্ধে কোন সময়েই কিছু ঠিক ক'রে বলা অত্যন্ত কঠিন। এমনও হতে পারে এই দু'হাজার টাকার জন্য বুদ্ধি হারিয়ে এটা তিনি ক'রে বসেছেন।

আশ্চর্য্য হইয়া মা কেটি বলিল—দু'হাজার টাকা ? তাঁর কাছ থেকেও দু'হাজার টাকা তুমি নিয়েছিলে ?

কথাটা এড়াইবার জন্য গাইন কহিল—"চরম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন এ বিষয়ে। এটা অন্ততঃ তাঁর বোঝা উচিৎ ছিল যে দলিলের সাক্ষী যখন বর্ত্তমান তখন কোনো মতেই তিনি এটা এত সহজে এড়াতে পারবেন না।

উভয়ের এই কথাবার্ত্তার অবসরে গাইন এই বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতার ভাব মনে মনে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক স্থৈর্য্যও ফিরিয়া আসিল। তাই বর্ত্তমান অবস্থাটিও তাহার নিকট ক্রমশঃ সহজ ও আশাপ্রদ মনে হইতে লাগিল। নিজের এই ভাব দ্বারা সে অতি সহজেই কেটিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভুলিয়া গেল কি ব্যবস্থা সে সহরে গিয়া করিতে পারিয়াছে—তাহার টাকাটা বাঁচাইতে পারিয়াছে কি না। অভিযোগের বিষয়টা সাময়িকভাবে আর সব ঘটনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

অবশেষে কেটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার টাকার কথা—কোনো বন্দোবস্ত সে করিতে পারিয়াছে কি না।

গাইন কি ভাবে এই মারাত্মক প্রশ্নের জবাব দিবে তাহা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল, "কেটি দুঃখ আমার সবচেয়ে যে—"

আর সে বলিতে পারিল না। কণ্ঠ ঠেলিয়া কান্না আসিয়া তাহার ভাষা রোধ করিল। এ সময়ে ভীত না হইয়া দুর্দ্দশার ভাব দেখাইলে যে সে সহজেই মার্জ্জনা পাইবে তাহা সে ইতিমধ্যে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

ঠিক তাহাই হইল। সে লাফাইয়া উঠিল না। যে মিথ্যা আশ্বাস সে তাহাকে এতদিন ধরিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে লাঞ্ছিত করিবার কোনো

চেষ্টাই সে করিল না। মাথা নীচু করিয়া রহিল ও শুধু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাক এ বিষয়ে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হ'লে—"

সজল চোখে গাইন বলিল—"ও কথা ব'লো না—কত জবাব দিহি যে আমায় ক'রতে হবে তোমার জন্য—"

আলোর দিকে তাকাইয়া, কেটি বলিল—"সব হয় ত' ঠিক হ'য়ে যেতে পারে শেষে, যখন তুমি ব'লছ তুমি নির্দ্দোষ। আর তোমার সম্মান তুমি বজায় রাখতে পারবে।"

যাক, মারাত্মক অবস্থাটা হইতে ত' সে সাময়িক ত্রাণ পাইল। সব খুলিয়া বলিবার বিভীষিকা আর তাহার রহিল না। এত সহজে যে সে রেহাই পাইবে তাহা সে একটি বারের তরে কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই!

ফলে দাঁড়াইল—যে দুঃখ-দৈন্য সহ্য করার, ও অনুতাপের আগুনে সব পাপ দূর করিবার যে শপথ গাইন সেই দিনই ট্রেণে বসিয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল ইহার মধ্যেই তাহা শিথিল হইতে সুরু করিল। নিজের নির্দ্দোষিতার আলোকে সব অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল। সম্মুখে পরিষ্কার পথ সে দেখিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাপের সম্মুখে বরফের মত তাহার মনের সব গ্লানি, দারিদ্র্য, নিরাশা গলিয়া দূরে বহিয়া যাইতে লাগিল।

উৎফুল্ল মুখে সে ছেলে মেয়েদের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের সস্নেহ চুম্বন করিল। ট্রেণে আসিতে আসিতে তীব্র অনুশোচনার মধ্যে সে ভাবিয়াছিল তাহার মত লোক সন্তানের পিতা হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সে গ্লানির ভাব সে কাটাইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে পিতৃত্বের গৌরবে মন তাহার ভরিয়া উঠিল।

ফিরিয়া আসিলে মা কেটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল কত দিন আর তাহারা এ বাটীতে বাস করিতে পারিবে—প্রসবের পূর্ব্বেই তাহাদের এ বাটী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে কি না। কথার ভাবে মনে হইল কেটি নিজেকে অবস্থার সাথে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিয়াছে ইহার মধ্যেই। গাইন তাহাকে আশ্বাস দিল প্রসবের পূর্ব্বে তাহাদের বাটী ছাড়িতে হইবে না এটা নিশ্চিত।

আলো লইয়া ঘরের ভিতর দিয়া তাহারা চলিল। দু জনারই মনে হইতেছিল এই বাড়ী, ঘর, জিনিষ পত্র সবই যে পাওনাদাররা শীঘ্র কাড়িয়া লইয়া যাইবে আর তাহাদের পথে দাঁড়াইতে হইবে। মূল্যবান আসবাবগুলির দিকে তাকাইয়া তাহারা ক্ষণেক দাঁড়াইল। এ সবের মালিক তারা আর নয়। গাইন তাহার সবল বাহু দ্বারা কেটিকে ধরিয়া ফেলিল, তা নৈলে হয়ত সে পড়িয়া যাইত।

ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কেটি বলিল—"তুমি জান কেটি, তোমার প্রসব হ'য়ে গেলে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সব কাজ আমি নিজেই ক'রব ঠিক ক'রছি।"

"ও সব বাজে কথা মোটেই মনে এনো না তুমি।"

"কিন্তু ভেবে দেখেছ—কি দিয়ে আমাদের চ'লবে এর পর?"—কেটি বলিল।

গাইনের মনে পড়িয়া গেল যে সঙ্কল্প সে করিয়াছিল আজই ট্রেণে বসিয়া—যত শীঘ্রই হউক না কেন যে কোনো প্রকার কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সে পরিবার প্রতিপালন করিবে। কিন্তু এখন তাহার মন আর সে কথায় সাড়া দিল না! নিজের নির্দ্দোষিতার জ্ঞান তাহার মনে এখন গর্ব্বের সঞ্চার করিয়াছে। তাই সে সাধারণ ভাবে বলিল—"হয় ত' এখনো কোনো উপায়ে সব বজায় রাখা যাবে।"

সে কেটিকে নিজের আরো কাছে টানিয়া লইল—নিজের মনোভাব দ্বারা তাহাকেও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য। সে স্বামীর কাঁধের উপর নিজ মস্তক ন্যস্ত করিল। তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল যে তাহার স্বামীর উপর যে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সত্য নহে স্বামী তাহার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সম্মান ত' তাহার অটুট থাকবে! অন্য সব পরে দেখা যাইবে।

পরিশ্রান্ত হইয়া সে একটি সোফায় বসিয়া পড়িল। গাইন তাহার পার্শ্বে বসিল। উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

কেটি স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল—"কোর্ট থেকে পিওনটা যখন এসেছিল, তখন বাবা উপস্থিত ছিলেন এখানে।"

"কি ব'ল্লেন তিনি ?"

"সবারই বিশ্বাস তুমিই দোষী। তার উপর মিঃ ডাটা প্রতাপশালী। বাবা আবার কাল আস্‌বেন। তুমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—আর কোনটা না হ'লেও তার কাছ থেকে নেওয়া শেষে হাজার টাকাটার একটা বন্দোবস্ত ক'রে তুমি সহর থেকে ফিরবে!"

মং গাইন মাথা নীচু করিয়া রহিল। তাহার শ্বশুরের পক্ক কেশ, রুক্ষ চেহারা, লাল চক্ষু দু'টি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। কি সে বলিবে বৃদ্ধকে কাল! সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াই যে সে ফিরিয়াছে!

কেটি বলিল—"আর সেই বিধবাটিও এসেছিল যার অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকাও তুমি ফিরিয়ে দেবে ব'লেছিলে।"

গাইন স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল। কি বলিবে সেই বিধবাটিকে তাহা সে একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কেটি বলিয়া যাইতে লাগিল—"কিন্তু সব চেয়ে দুর্দ্দশা হ'য়েছে তোমার মজুরদের। কিছু নেই তা'দের, ধারেও পাচ্ছে না কোথাও। প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তারা —আর এই দারুন শীতে তাদের দুর্দ্দশা—" সে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

হয় ত' তাহারাও কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে। ঘরের অর্দ্ধালোকে সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল সেই পক্ক কেশ রক্ত চক্ষু বৃদ্ধকে, সেই বিধবাটিকে—যাহার সর্ব্বস্ব সে নিঃশেষ করিয়াছে—আর তাহার হতভাগ্য মজুরদের। সবাই তাহারা কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে আর তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে তাহাদের কাছে।

ভাবনায় সে হিম সিম্ খাইয়া গেল। ট্রেণে বসিয়া সে নিজেকে দণ্ডিত করিয়াছিল সেই মনোভাব আবার তাহাকে পাইয়া বসিল। জাল অপরাধে নিজের নির্দ্দোষিতা আর তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। নির্ব্বানোন্মুখ দীপের মত সে রশ্মি কমিয়া গিয়া গভীর এক অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করিল। সেথায় নিজের দায়িত্ব জ্ঞানের চিন্তা তাহার মন নিরাশায় ডুবাইয়া দিল। অনুশোচনা সহস্র-ফণায় তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল চিরকাল সেই অন্ধকার কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ থাকিয়া নরকের অনলে দগ্ধ হইতে হইবে।

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল—"বড় শীত এ ঘরটায় —চল ও ঘরে যাই।"

ও ঘরে গিয়া আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া সে উহার দিকে তাকাইয়া রহিল। অবশেষে বলিল—"যতই ভাবছি ততই ধারণা আমার বদ্ধমূল হ'চ্ছে কেন মেঘনাদ আমায় এত ক্ষতিগ্রস্থ করতে চায়।"

"কেন বলত ?"

সে চায় নিজের মান বাঁচাতে আর সঙ্গে সঙ্গে চায় প্রতিশোধ। গত বছর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হতে পারেনি—আমার মনে হয় সেটা আমারি প্রতিবন্ধকতায় সে ভেবে নিয়েছে।

'হা ভগবান!'

বসিয়া বসিয়া কল্পনার সাহসে মেঘনাদের একটা হিংস্র-মূর্ত্তি সে মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া ফেলিল—মূর্ত্তিমান ক্রোধের দানব মূর্ত্তি সেটা যে কোনো মুহূর্ত্তে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছে।

আবার তাহার মনের সেই নির্দ্দোষিতার ছবিটি স্পষ্টতর হইয়া একটি সূত্রের সৃষ্টি করিল ও তাহাই হইল তাহার মনের শান্তি ও স্থৈর্য্যের একমাত্র অবলম্বন। সে সূত্র আর সে ছিন্ন হইতে দিবে না।

মা-কেট রাত্রির মত তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল। কিন্তু গাইন সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শয্যাকক্ষে গিয়া দেখিল কেট আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া শয়নের পূর্ব্বে দীর্ঘ চুলগুলি ঠিক করিয়া লইতেছে।

ধীরে ধীরে সে বলিল—"বেশ বুঝতে পাচ্ছি এখন মেঘনাদেরই ষড়যন্ত্রে চার্চ্চটি ইট দিয়ে তৈরীর প্রস্তাব ব্যর্থ হ'য়েছিল। কেন জান ? ইট খোলা যেন কিছু না পায় ও থেকে। তার জন্য নিজেই সে নাম মাত্র দামে সমস্ত কাঠ সরবরাহ করবার ভার নিয়েছে।"

ঘরের ভিতর পাইচারী করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া

সে বলিয়া যাইতে লাগিল—"এও আমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি কেন এত পক্ষের সম্প্রতি আমায় ছেড়ে গেল! এই বড় কাঠের কারবারের কেন্দ্র স্থানে এরা চায় না ইটের কোনো কারবার রাখ্‌তে।"

লোকের এই ক্রূরতায় একটা ভীতি আর ইট-খোলার কারবারে ফেল পড়াতে স্বামীর বেশী কিছু দোষ নাই ভাবিয়া আনন্দ এই দুইটি ভাবের একটা মিশ্র অভিব্যক্তিপূর্ণ চোখে কেট আরসি হইতে মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।

বাহিরে ইট-খোলার চিম্‌নীর ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশের এক অদ্ভুত শব্দ হইতেছিল। সিঁড়ির ঘরের একটা দরজা দম্‌কা হাওয়ায় সশব্দে খুলিয়া আবার বন্ধ হইতেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরটি শুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কেট বলিল—"ঐ দোরটা খানিকক্ষণ থেকেই প'ড়ে প'ড়ে শব্দ হ'চ্ছে। আমি যেতে পারিনি বন্ধ ক'রতে ভয়ে। তুমি যদি বন্ধ করে দিয়ে এসো একটি বার!"

ফিরিয়া আসিয়া গাইন বলিল—"আর এই দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্তনে বয়রা সব ভয় পেয়ে আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে, তা' এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি।"

এক একটি করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া তাহার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের প্রমাণ সে খাড়া করিতেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের ভার একটু একটু করিয়া কমিয়া যাইতেছিল। আরো প্রমাণ খুঁজিয়া পাইবার জন্ম সে চিন্তা করিতে লাগিল।

কেট শুনিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া শয্যা পার্শ্বে দাড়াইয়া ঘড়িটায় চাবি দিতেছিল। গাইন আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ ভরে বলিল—

"এখন আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কেটী কেন সহরের কারুর অনুকম্পা আমি পাবনা—কেন তারা আমায় বিশ্বাস ক'রে সাহায্য করতে এগোবে না। তাদের মন বিগড়ে দেবার জন্মই এই মিথ্যা অভিযোগের সৃষ্টি।"

মা কেট ঘড়িটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গাইনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—"আমি বুঝতে পাচ্ছি এখন কি ভুল আমি ক'রে এসেছি তোমায় সন্দেহ করে। ক্ষমা করো আমায়।"

গাইনের মন গলিয়া গেল। সে স্ত্রীকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটিল—কেটি স্বামীর বুকের উপর মাথা ন্যস্ত করিল। উভয়ে বাহিরের লোকের ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করিয়া একে অপরের সাহায্যে ব্রতী হইয়া পরস্পরের শক্তি সাহস বৃদ্ধি করিবে প্রতিশ্রুত হইল।

কেটের আর এখন নিজ টাকার জন্ম স্বামীকে দায়ী করিতে মন সরিল না—দায়ী করিল যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ইট-খোলাটার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাদের। গাইনের মনেও বৃদ্ধ শ্বশুরের সহিত কাল দেখা করিবার বিভীষিকা আর ততটা রহিল না। সেই বিধবা ও দুর্দ্দশাপন্ন মজুরদের সম্পর্কে সে আর নিজেকে দোষী করিল না। তাহাদের জন্য মন তাহার সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ হইল তাহাদেরই উপর যাহারা মূলতঃ তাহাদের এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। এক কথায় সে এখন স্বস্তি লাভ করিল নিজের উপর ক্রোধ প্রতি পক্ষের উপর প্রবর্ত্তিত করিয়া।

কেট বলিল—"এস, শুতে আস্‌বে না?"

"দাড়াও একটু।"

"কিন্তু আমার যে শীতে কম্প হ'চ্ছে।"

তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া বা বিছানায় তাহার সহিত শুইয়া এই দারুণ অপ্রিয় কাহিনীর পুনরুক্তি ও আলোচনা ইহার কোনোটাতে তাহার মন অগ্রসর হইতেছিল না। কিছুক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া সে মিনতির স্বরে বলিল—"তুমি শোও লক্ষ্মীটি। আমি একটু ঘুরে আস্‌ছি বিশেষ একটা কাজ, আজ রাতেই আমার সারতে পারলে ভাল হয়। আর শুলেও ত' ঘুম আমার আসবে না। কাজটা সেরে এক্ষুনি ফিরে আস্‌ব।"

"যাও, কিন্তু দেরী করো না বেশী।"

তাহাকে আশ্বাস দিয়া, ড্রেসিং-গাউনের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া নিঃশব্দে নিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া সে চলিল।

সে ভাবিতেছিল—হয় ত তাহার ইটখোলার দৈনিক আটঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তনের সহিত তাহার এই

কারবারে কেল পড়ার কোনো সম্পর্কই নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার চির-প্রিয় এই নীতিটির নির্দ্দোষিতার কল্পনায় তাহার মন পুলকিত হইল এই ভাবিয়া যে ভবিষ্যতে ইহার পুনঃ প্রয়োগ সে করিতে পারিবে। চিন্তাধারা তাহার দৌড়িল মেঘনাদ প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীদের সমালোচনায়। যক্ষের মত স্তূপীকৃত সঞ্চিত ধন তাহারা আগলাইয়া বসিয়া আছে। সর্ব্বদাই তাহারা শঙ্কিত, পাছে কোনো প্রকারে তাহাদের ধনক্ষয় ঘটে। তাই নূতন যে কোনো নিয়মের প্রবর্ত্তন বা মজুরদের অবস্থোন্নতির যে কোনো অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত চেষ্টারই উপর তাহারা খড়্গহস্ত।

"এবারকার মত ওরা দাবিয়ে রাখল মজুরদের এই ন্যায্য দাবীটি কিন্তু এইত শেষ নয়?" ভাবিতে ভাবিতে সে পৌঁছিল ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়ীর সম্মুখে। বসিবার ঘরে এনখও একটি আলো জ্বলিতেছিল, বিবেক একটিবার তাহাকে স্মরণ করিয়া দিল কি সঙ্কল্প সে করিয়াছিল ট্রেণে বসিয়া। কিন্তু আমরা নিজেদের এত বেশী উন্নত মনে করি কখনো কখনো যে কোনো প্রলোভনই আমাদের মোটেই টলাইতে পারিবে না—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াই আমারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই। গাইনও তাহাই করিল এই ক্ষেত্রে। সে ত' আসিয়াছে ইহাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া মনটাকে একটু হাল্কা করিতে—মিনিট পনের কুড়ি শুধু কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া সে চলিয়া যাইবে।

নূতন পাক করা এক বোতল মদ নাড়িতে নাড়িতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর গাইনকে দেখিয়া বলিল—"কিহে, এখনো গ্রেপ্তার করেনি তোমায় দেখেছি।'

বোতলটি মাঝে রাখিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। মঃ গাইন একের পর এক সহরের বড় বড় সব নাগরীকই যে এই ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত, যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়া তাহাদের উপর তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর মাঝে মাঝে উপযুক্ত ফোড়ন দিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়া মজা দেখিতে লাগিল। আলোচনার শেষে দেখা গেল বোতলটি শূন্য ও যখন গাইন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি তিনটা—পা তাহার টলিতেছিল।

ভিতরে ঢুকিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল—"বহু ঝড়-ঝাপটা ওই ইন্‌স্পেক্টরের হতভাগ্য জীবনটার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সাহচর্য্য দ্বারা তাহাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়াটাও কি এতই গর্হিত?"

ভিতরে ঢুকিয়া শয়নকক্ষের দুয়ারের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। ভয়ে তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল।

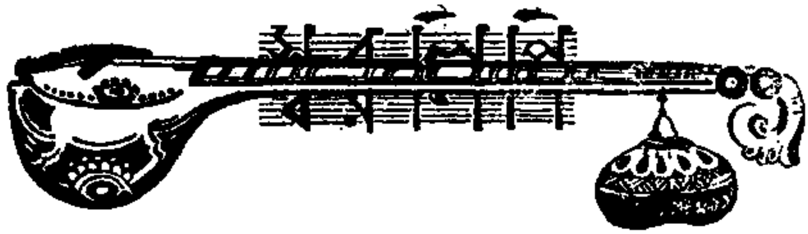
পরদিন ঘুম ভাঙ্গিলে তাহার মাথা খুব ভারী বোধ হইল। স্ত্রীর সম্মুখীন হইতে তাহার লজ্জা করিতেছিল। উপরন্তু হৃদয় তাহার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল যাহারা আজ আসিবে তাহাদের সহিত দেখা করিবার আতঙ্ক।

আবার তাহার নির্দ্দোষিতার চিন্তার ও তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রটির কথা ভাবিয়া সে মনে বল সংগ্রহ করিয়া লইল। পরে যখন সে ষ্টেশনে যাইতে রওনা হইল তখন লোকের সম্মুখে বাহির হইবার ভীতি তাহার মোটেই রহিল না—এমন কি সে মজুরদের কাছে যে একটা বক্তৃতা দিবে তাহাদের উভয় পক্ষের এই সর্ব্বনাশের কারণ কি তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্ত তাহার একটা খসড়াও সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল তাহার কারখানার প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি ও উহার গগনস্পর্শী চিম্‌নিগুলির উপর। কাল ট্রেণে বসিয়া সে যে ভাবিয়াছিল তাহার কারখানা বাটী ও নিজ আবাস-গৃহ অনাবশ্যকভাবে বড় মূল্যবান ও বিলাসিতাযুক্ত, এক্ষণে সে তাহার সেই ধারণাটি পরিবর্ত্তন করিল। সে যে ঐ কারখানাটা সত্য সত্যই তাহার বুকের রক্ত দিয়া গড়িয়া-তুলিয়াছিল এ তল্লাটের সব কারখানার আদর্শস্থানীয় করিয়া, ইহা হইতে সে যথেষ্ট সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত



স্বরলিপি

রাগশ্রী মিশ্র—তেতালা (দ্রুত লয়)

ছেয়েছিল বনবীথি বকুলের ফুলে ফুলে।
কদম কেশর বিছায়েছে বিছায়েছে তরুমূলে।
কে আবার (আজি) দিল ঢালি
উজাড়ি পূজার ডালি
ঝরা শেফালিকা রাশি কি জানি কি মন ভুলে।
বিকশিত শতদল কা'র রাঙা পদ লোভে,
কাহারে ঢুলাবে ব'লে কাশের চামর শোভে,
আগমনী গান গেয়ে
তরী বেয়ে চলে নেয়ে,
মুখরিত গীত রবে ভরা নদী কূলে কূলে।

কথা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু

II	৩ পা	ধা	ণর্রা	র্সা	০ ণা	-া	ধা	পা	১ পধা	পা	মগা	রগা	+ মা	-া	-া	-া	
	ছে	•	য়ে	ছি	ল	•	•	•	ব	ন	বী	•	থি	•	•	•	
	৩ সা	-া	সা	-া	০ গা	রা	গা	মা	১ পা	ধপা	মগা	রগা	+ মা	-া	-া	-া	
	ব	•	কু	•	লে	•	র	•	ফু	লে	ফু	•	লে	•	•	•	
{	০ মা	পা	পা	পা	১ পা	-া	পা	পা	+ ণা	র্সা	র্সা	ণর্র্সা	৩ ণা	-া	ধা	পা	
{	ক	•	দ	ম	কে	•	শ	র	বি	•	ছা	য়ে	ছে	•	•	•	
	০ র্সা	ণা	ধা	পা	১ ধা	পা	মা	গরা	+ গমা	-া	-া	-া	৩ (-া	-া	-া	-া)	} II
	বি	ছা	য়ে	ছে	ত	রু	র	মূ	লে	•	•	•	•	•	•	•	
II	০ মা	মা	ণা	ধা	১ -া	ধা	ধা	না	+ না	র্সা	র্র্সা	না	৩ র্সা	-া	-া	-া	
	কে	আ	বা	•	•	র	আ	জি	দি	•	ল	ঢা	লি	•	•	•	

০ | ১ | + | ৩
র্সা র্সা নর্সা র্রগ র্মা | র্রা র্সা না র্সা | র্রা র্সণা -া -া | ধা পা -া -া
উ ড়া ড়ি ০ | পু জা ০ র | ডা লি ০ ০ | ০ ০ ০ ০

০ | ১ | + | ৩
{ র্সা ণা ধা পা | ণা ধপা মগা রগা | মা -া -া -া | (-া -া -া -া) }
{ ঝ রা শে ফা | লি কা রা ০ | শি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ }

৩ | ০ | ১ | +
সা -া সা -া | গা রা গা -া | মা পা ধপা মগরগা | মা -া -া -া II
কি ০ জা ০ | নি ০ কি ০ | ম ০ ন ভু | লে ০ ০ ০

০ | ১ | + | ৩
II র্সা ণা ধা পা | ধা পা মগা মা | পা -া -া পা | গা মা পা ধা
বি ক শি ত | শ ত দ ল | কা ০ ০ র | রা ঙা প দ

০ | ১ | + | ৩
পধা র্সণা ধা -া | ণা ণা ণা ণা | ণা র্সা র্সা নর্সা | ণা ধা পা -া
লো ০ ভে ০ | কা হা রে চু | মা বে ব ০ | লে ০ ০ ০

০ | ১ | + | ৩
সা -া রা রা | গরা গা মা পা | মগা রগা মা -া | -া -া -া -া
কা ০ শে র | চা ০ ম র | শো ০ ভে ০ | ০ ০ ০ ০

০ | ১ | + | ৩
মা মা গা গমা | ধণা র্সা র্সা র্সা | র্রর্সা -া নর্সা -া | -া -া -া -া
আ গ ম নী | ০ ০ গা ন | গে ০ য়ে ০ | ০ ০ ০ ০

০ | ১ | + | ৩
না -া না না | র্সা নর্সা র্সা র্রা | ধা র্সা ণা -া | ধা পা -া -া
ত ০ রী বে | য়ে ০ চ লে | নে ০ য়ে ০ | ০ ০ ০ ০

০ | ১ | +
ণা ধা পা ণা | ধা পা মগা রগা | মা -া -া -া
মু খ রি ত | গী ত র ০ | বে ০ ০ ০

৩ | ০ | ১ | +
সা -া সা -া | গা রা গা মা | পা ধা মগা রগা | মা -া -া -া II
ভ ০ রা ০ | ন ০ দী ০ | কু লে কু ০ | লে ০ ০ ০

সীতা কার মেয়ে?

শ্রীকালীচরণ মিত্র

প্রসঙ্গশেষে অর্বাচীন শ্রোতার অসংলগ্ন প্রশ্নের উত্তরে বিদ্রূপচ্ছলে বলা হয় —'সাত কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার বাপ!'

পিতা না হউন সীতা কাহার দুহিতা, ইহাই সমস্যা। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। জনকনন্দিনী সীতা—বাল্মিকী রামায়ণের বর্ণনা। ভারতের সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত ঐ দৃষ্টান্তে। কিন্তু সীতা যে রাবণের কন্যা—মান্দু দেড়াই বা মন্দোদরীর গর্ভজাতা, এ মতবাদ শুনাইলে অনেকেই বৃস্ত্রলোচন হইবেন না কি! এই কাহিনী অথচ ভিত্তিহীন নয়। প্রমাণ মালয় দ্বীপপুঞ্জের পৌরাণিক উপাখ্যান।

আবার সীতা দশরথের আত্মজা—এই কাহিনীর পিছনে অকাট্য (!) প্রমাণ বিদ্যমান। 'রাজবংশ' ও 'দশরথ জাতক' নামক পুরাতন পালিগ্রন্থ তাহার সাক্ষী। সীতা দশরথের কন্যা বলিয়াই উহাতে শুধু বর্ণিতা নন, রাম ও লক্ষ্মণের ভগিনীরূপে উল্লিখিতা। পরে রামের বনিতা হন, ইহাও প্রকাশ। টীকা—প্রাচীনকালে সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ অবৈধ ছিল না। আশঙ্কা—এই সকল সমাচারে রামসীতা-ভক্তেরা গদাহস্তে ধাবমান না হন!

আসল কথা—বাল্মিকী মুনির বহু পূর্ব্ব হইতে রামসীতার কাহিনী নানা আকারে ভারতবর্ষে চলিত ছিল। সেই সকল উপাখ্যান মালয়, কাম্বোদিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও পাড়ি জমায়। পরে উহা অবলম্বনে বিবিধ আখ্যান রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়। বাল্মিকী হয়ত ঐগুলি একত্র করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন রূপ দেন শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'রামায়ণে'।

ইক্ষুকাণ্ড হইতে জন্ম আদি পুরুষের, একজন্ম তাঁহার নাম ইক্ষ্বাকু। তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশের সূত্রপাত। এই বংশের নানা রাজা ও রাজপুত্রদের দরবারে রামোপাখ্যান প্রচলিত ছিল প্রধানতঃ সঙ্গীতের আকারে। পাশ্চাত্য মনীষী এচ্ জেকোবির মতে বাল্মিকী গানগুলি সংগ্রহ করেন এবং মূল আখ্যান ভাগের কিছু কিছু রদ বদল করিয়া রামায়ণ রচনা করেন। পুরাতত্ত্ববিদগণের ভিতর এ সম্বন্ধে বিতণ্ডা ও মতভেদ দেখা যায়। সীতার জন্ম-ইতিহাস আলোচনায় এবিষয়ে আলোকপাত সম্ভব।

মিথিলার নৃপতি জনক ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, লাঙ্গলের ফলকে সীতা দেবীর আবির্ভাব ভূমি হইতে। ইহাই বাল্মিকী রামায়ণের গল্প।

'রামকর্ত্তী' (সংস্কৃতে-রামকীর্ত্তি) নামক একখানি রামায়ণ কাম্বোদিয়ায় পাওয়া যায়। ইহাতে লাঙ্গল-ফলকে সীতার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আদৌ নাই। উহার বিবরণ এইরূপ। মিথিলার ভূপতি যমুনা নদীর তটে স্বর্ণ-ফলক লাঙ্গল সাহায্যে ভূমি কর্ষণকালে দেখেন—একটা ভেলায় পরমা সুন্দরী শিশু কন্যা (সীতা) ভাসিয়া যাইতেছে। আর একখানি পুস্তকের মলাটের চিত্রে দেখা যায় যে, ভেলায় নয়—ভাসমান সিন্দুকে।

জাভা দ্বীপের রামচরিতের নাম—'শ্রীরাম'। উপখ্যান-ভাগ এই। যুবতী মান্দু দেড়াই মহারাজা রাবণের মহিষী। রাণী এক কন্যা প্রসব করিলেন—অতি রূপসী, বর্ণ খাঁটি সোণার। জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনার পর ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—কন্যা অশেষ ভাগ্যবতী, যে তাহার পাণিগ্রহণ করিবে সসাগরা ধরনীর অধীশ্বর হইবে। রাবণের ত্রাস হইল—তবে ত ভবিষ্য জামাতা তাঁহাকে পরাজিত করিবে, হয়ত বা তাহার অধীনে সামন্ত রাজারূপে পরিগণিত হইতে হইবে, অতএব কন্যার মস্তক শিলাখণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ। রাণীর কাতর প্রার্থনায় রাবণ এই সংকল্প

পরে ত্যাগ করেন। অতঃপর একটি লৌহপেটিকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে কন্যাকে শায়িত করিয়া সাগর জলে নিক্ষেপ করিলেন। দেবতাদের কৃপায় পেটিকা জলে ডুবিল না, ভাসিয়া চলিল।

কল নামক অপর এক ভারতীয় নরেশ তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সমুদ্রে জানু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া সূর্য্যস্তব করিতেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশ্যে। একদিন ঐ লৌহপেটিকা স্রোতে ভাসিয়া তাঁহার সন্নিকটে আসিল। দ্বিপ্রহরে স্তব শেষ হইলে ঐ পেটিকা রাজপ্রাসাদে আনাইলেন। মহিষীর সম্মুখে পেটিকা খুলিয়া দেখেন—এক কন্যারত্ন দশদিক আলো করিয়া আছে,—অপূর্ব্ব সুন্দরী, চন্দ্রবদনী। রাজা তাহাকে পোষ্যপুত্রী করিয়া লইলেন, নাম রাখিলেন—পৌত্রী সীতা দেবী।

তিব্বতীয় উপাখ্যানও প্রায় অনুরূপ। ত্রিভুবনের শাসনকর্ত্তা দেবতারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দশগ্রীবের গৃহে দৈত্যনিধনে সমর্থা কন্যার জন্ম আবশ্যক। তদনুসারে দশাননের মহিষী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। জ্যোতিষীরা গণনার ফলে মত প্রকাশ করিলেন—কন্যা নিজ পিতার ও দানবগণের বিনাশের কারণ হইবে। উহাকে পিতা তখন একটা তাম্রপাত্রে আবদ্ধ করিয়া সমুদ্রসলিলে ভাসাইয়া দিলেন। ভারতীয় কৃষকেরা উহাকে উদ্ধার ও লালন পালন করে, নামকরণ করে—লীলাবতী।

রাম আখ্যানের খোতানীয় কাহিনী এইরূপ। দশগ্রীবের এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। জ্যোতিষীরা পূর্ব্বোক্তরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিলে কন্যা নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে দেখিতে পান এবং গণ্ডী দিয়া তাহাকে রক্ষা করেন।

ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি রামসীতার যে উপাখ্যান পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাহাই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া তিব্বত, কাম্বোদিয়া, মালয়, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে, ইহা সুস্পষ্ট। ঐ সকল উপাখ্যান অনুসারে সীতা যে রাবণের দুহিতা ইহাই সাব্যস্ত হয়। পুনরুক্তি বাহুল্য যে, আখ্যান ভাগ মোটামুটি এই—শিশুকন্যা পিতারও পিতৃ অনুচরদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনাশের কারণ হইবে, জ্যোতিষ গণনায় অবধারিত হইলে শিশু জলে নিক্ষিপ্ত হইল।

বাল্মিকী রামায়ণে কিন্তু এই কাহিনীর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ক্ষেত্র কর্ষণ কালে লাঙ্গলের ফলকে সীতার আবির্ভাব, সুতরাং ধরিত্রী সীতার জননী—বাল্মিকী মুনি এই গল্পে নিজের রচা অলৌকিক রহস্যের উপর ভর করেন নাই। বৈদিক যুগ হইতে সীতা স্ত্রী-দেবতাগণের মধ্যে অন্যতমা বলিয়া গণ্য এবং বসুন্ধরা দেবজননী সকল দেবদেবীর গর্ভধারিনী রূপে পরিকীর্ত্তিতা। জনকনন্দিনীকে পৃথিবীর কন্যা আখ্যাদানে নূতনত্বের অবতারণা কাজেই হয় নাই।

সীতা কার মেয়ে—এই প্রশ্নের মীমাংসায় এখন কোন মত গ্রহণীয়? উত্তর—যাহার যেমন অভিরুচি। তবে একটা কথা—শ্রীরামচন্দ্র যে বিষ্ণুর অংশ বা পূর্ণব্রহ্ম, অথবা অবতার—এই মতবাদ কি ফাঁসিয়া যাইবে! 'রাম না হইতে রামায়ণ'—প্রবাদ রচিল কে! বিপত্তি তাঁহারই যে ষোল আনা!

মন্তব্য। কোন প্রথম শ্রেণীর কাহিনী বা গল্পাংশ যে কাহারও স্বকপোলকল্পিত নয়, পরন্তু পুরাতনেরই নূতন সংস্করণ, গল্পের 'কাঠামো' প্রাচীন,—পরিবর্ত্তনে ও পরিমার্জ্জনে নব নব রূপে দীপ্তিমান, এই বক্তব্যের নজির অপ্রচুর নয়। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি, গেটের ফাউষ্ট, কালিদাসের শকুন্তলা উহার উদাহরণস্থল। মহাকবি বাল্মিকী এই পন্থা আদিকালে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিলে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার বা রসসৃষ্টির প্রতি কটাক্ষপাত হয় না, বরং তাঁহার কৃতিত্ব আরও বেশী জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পাতিব্রত্য, প্রভুভক্তি প্রভৃতি সকল রকম রসের যে পরিপাক রামায়ণে, তাহার তুলনা জগতের সাহিত্যে কোথাও একাধারে নাই। গল্পের ধারা ও রস অব্যাহত রাখিয়া আদর্শ গড়িবার যে শক্তি রামায়ণে পরিস্ফুট, ভগবানত্বের আরোপ তাহাতে সহজসাধ্য। সীতার জনক বা জননী সম্বন্ধে মতভেদে আসলের সৌন্দর্য্যহানি ঘটে না। সীতার জন্মবৃত্তান্ত যাহাই হউক শ্রীরামচন্দ্রের পূত চরিত্রে কোনই দোষ স্পর্শ করে না। বাল্মিকী রামায়ণ যুগে যুগে ধর্ম্মগ্রন্থরূপেও যেমন সমাদৃত তেমনই রহিবে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর, ধর্ম্মক্ষেত্র হিন্দুস্থানে শুধুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কোঠায় ফেলিয়া উহাকে কোণঠাসা করা চলিবে না।

সীতাকে যে বাল্মিকী মুনি রামচন্দ্রের ভগিনীরূপে বর্ণনা করেন নাই তাহার কারণ কি? পরিবর্ত্তিত সামাজিক রীতিনীতি ও রুচি নয় কি? সহোদরার সহিত পরিণয় পুরাকালে অপ্রচলিত না থাকিলেও সমাজদেহের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার বিলোপ ঘটে, সুতরাং লোকচক্ষে বিসদৃশ সম্পর্ক পরিত্যাজ্য বোধে গল্পাংশের আমূল পরিবর্ত্তন খুবই স্বাভাবিক—বিশেষতঃ বাল্মিকীর মত মুনি ও মনীষীর পক্ষে।*

* Jean Przyluski সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিবরণ অবলম্বনে এই সন্দর্ভ লিখিত—Indian Historical Quarterly, June 1339.

শ্রীকালীচরণ মিত্র

সপ্তপদী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আগে সাতপদ চলিয়াছি পরে
সাত সাতে উনপঞ্চাশ
এই পথে যেই চলা হ'ল সুরু
উভয়েরি নাই অবকাশ।
চমকি চকিত চপল চরণে
খুসি ও খেয়ালে চলি আনমনে
ঘুমঘোরে গাঁথি স্বপ্ন সোনালি
কল্পনাতীত যত্নে
পরাইয়া দিনু সাতনরীখানি
মণি মাণিক্য রত্নে।
পথে চলা এই পথিক প্রণয়
হে পথিক-বধূ তোমারে
পথের বাঁধন নাগপাশখানি
বাঁধিয়া বাঁধিল আমারে
কাটেনা ছেঁড়েনা খোলেনাকো যাহা
দেখা যায় কিবা যায় না
বাঁধা গেছে যা'রা ভাবিছে তাহারা
ছাড়া চায় কিবা চায় না।

চ'লেছি দুজনে পথের পন্থী
বন্ধন নয় এ মহাগ্রন্থি
এ নহে এ নহে কখনও এ নহে
মুক্তির পরিপন্থী
টানিলে বাড়িবে, বাড়িয়া চলিবে
তবু খুলিবে না গ্রন্থি।
সুতা নাই তবু বাঁধন ইহার
পথ বাঁধিয়াছে বিনি সুতা হার
পথের পার্শ্বে নাহি নিকুঞ্জ
স্বেচ্ছায় তবু বন্দী
নাহিক যাচনা মিনতি ভিক্ষা
নাহিক প্রতিদ্বন্দ্বী।
চলেই চলেছি চির নিশিদিন
পথ সুদীর্ঘ পাথেয় বিহীন
মাথায় আতপ, অসহ তুহিণ
বৃক্ষ ধরে না ছত্র
শুধু তুমি আছ আর আমি আছি
এই নিশ্চয় বিশ্বাসে বাঁচি

কভু কিছু দূর কভু কাছাকাছি
নিবাস যত্র তত্র।
শিখর হইতে দিগ্ দিগন্তে
নদী জল সম শীত বসন্তে
গ্রীষ্ম বর্ষা শরত শিশিরে
শুধু অকাতরে ঘুরিয়া ধুলি
উৎসাহ দেয় বনের হরিণ
নাচে শকুন্ত পুচ্ছ তুলি।
তুমি টানিতেছ সম্মুখ পানে
আমার কামনা টানিছে পিছে
কখনো আগাই পিছাই কখনো
চলা ও না-চলা উভয়ই মিছে
শুধু পথ, শুধু পথিক দুজন
পদ্ম-শঙ্খ-সাগর-যোজন
লুপ্ত সংখ্যা সীমানা
শুধু অনন্ত অনাদি কালের
তারকা পুঞ্জে ছন্দ তালের
ঊর্ম্মি দোদুল নিশানা
চিত্রিত হেরি নীল চাঁদোয়ায়
রবি-শশি-তারা ঢেউ তুলে যায়
মেঘ কদম্ব ডমরু বাজায় নীলাম্বরে
আমরা চলেছি নয়নাভিরাম
ধরণীর শ্যাম সরণি ধ'রে।

তুমি যেন সেই নববধূ সম
আমিও নবীন বর
গানে ও ছন্দে পরমানন্দে
অভিভূত জর্জ্জর
রিণি ঝিনি করে তোমার ভূষণ
আমার নয়ন নাচে ঘন ঘন
পুলকাঞ্চিত দোঁহার বক্ষ উথলে
তোমার পূর্ণ অঞ্চল হ'তে
কনকাঞ্জলি উছলে।
বিবাহ বাসর কুসুম শয়ন
শপথ করিয়া এ সহমরণ
জীবনে মরণে এ মহাগমনে চলেছি
ডানা মেলে দিয়ে পলকে যোজন
কূজনোচ্ছাসে উড়েছি দুজন
জানিবার যাহা শুনিবার যাহা
বলিবার যাহা ব'লেছি।
শুধু তুমি আছ পার্শ্বে আমার
আগে পিছে নাহি অন্ত
আশায় মায়ায় নব কামনায়
আমি তাই প্রাণবন্ত।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত



চিত্তে তোমায় হেরি

শ্রীনিত্যানন্দ দাস

নিত্য আমার ধ্যানের মাঝে রূপটী তোমার জাগে ;
ডাক্‌তে গেলে প্রাণের প্রভু তোমায় ডাকি আগে।
প্রেমের কুসুম মঞ্জরী
তোমার গানেই গুঞ্জরি
ক্ষুব্ধ মানস সবার মাঝে ভিক্ষা তোমার মাগে ॥

সন্ধ্যা যখন চাঁদের সাথে রূপ সাগরে ভাসে,
তুমিই যেন কর্‌ছো খেলা হাসছো চাঁদের পাশে।
পূজার ধূপজ-সৌরভে,
গাই যে তোমার গৌরবে,
রিক্ত মনের কথার মালা বিলাই মধুর বাসে ॥

রাত্রি যখন ঘুমিয়ে পড়ে এলিয়ে শিথীল কেশে ;
স্তব্ধ ধরার নিদ্রা শ্বসন বেড়ায় মৃদুল বেশে।
সুপ্ত আঁখির অন্তরে,
তোমার পূজার মন্তরে,
ধ্যানের দেউল সাজাই আমি চিন্তাধারার দেশে ॥

নিশার পাখী গায় প্রভাতী ভোরের কুসুম বনে,
মাধবিকার ঘুম ভেঙ্গে যায় সুখের স্বপন্‌ সনে।
হঠাৎ জাগি সেই গানে,
ঘুমের আগল যেইখানে,
সেইখানেতে দাঁড়িয়ে তুমি হাস্‌ছো আমার মনে।

ডেন হাগে একদিন

শ্রীমতিলাল দাশ এম্-এ, বি-এল্

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল হইতে ডেন-হা যাত্রা করিলাম। ব্রুসেল হইতে বাড়ীতে একটা চিঠি লিখি—তাহাতে বন্ধু-হীন ভ্রমণের দুঃখের কথা লিখি। "পাশের হোটেলে বাজনা বাজছে, নাচের বাজনা, তালে তালে এদের বাজনা বেশ লাগে, গানের সুর কেবল ওঠা নামা, মনে হচ্ছে তুমি যদি সঙ্গে থাকতে তবে এ বাজনার আনন্দ পুরাপুরি পাওয়া যেত—নিরুদ্দেশ এই ভ্রমণ আর ভাল লাগে না—হাঁপিয়ে উঠতে হয়—বেড়াতে চলে চাই সঙ্গী, চাই বন্ধু—আমি বন্ধু পাতাতে পারিনে, আমার নিজের কৃপণতা বুঝি খুব ধরা পড়ছে আমার কাছে—পয়সা বাঁচাবার জন্ত কি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, এক একবার ভাবি, যদি পয়সা খরচ না করবি, তাহলে কেন এসেছিলি এই পয়সা চাওয়া লোকেদের দেশে—এখানে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে লোকে হাঁ করে চেয়ে আছে—দেও পয়সা। ফেল কড়ি নাও সওদা, ভালবাসা, ভদ্রতা এসব এরা তত বোঝে না—পয়সার সঙ্গেই এদের সৌজন্ত।' ভ্রমণের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা আছে—সে নিবিড় ভোগ-সুখের। যখন কেবল দেখিব বলিয়া অনর্থক ধাবন করি, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সমস্ত শিল্পকলায় সার্থকতা অনুভবের অপরিসীম আনন্দে। যখন হৃদয়কে স্পর্শ করে না, তখন তার মূল্য নাই। পথিক যখন পথ-চলা শেষ করিতে ব্যস্ত, পথকে তখন রসলোকে সার্থক করিতে তাহার দৃষ্টি থাকে না—পথ তাই বাধা হয়। কিন্তু যখন যাত্রাকে সে প্রীতি দিয়া প্রেম দিয়া পরিপূর্ণ করে, তখন অনুভব লোকে রসের অমৃত পরিবেশিত হয়।

য়ুরোপ-ভ্রমণের অতি ব্যস্ততার মধ্যে এই দুঃখ অনুভব করিয়াছি। কর্ম্ম-সূচী স্থির করিয়া শেষ করিতে হইবে—এই পন্থা অনুভবের নয়—দুরন্ত-পথিক মনোভাবের।

সকাল আটটায় যাত্রা করিলাম। দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব চমৎকার লাগিল। নদীমাতৃক গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমির দেখাই যেন পশ্চিমে মিলিল। হলাণ্ডকে এরা বলে নিম্নদেশ। বাংলা যেমন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপে সৃষ্ট, হলাণ্ডও তেমনই রাইন এবং মিউজ নদীর বাহিত বালু ও পলি মৃত্তিকায় নির্ম্মিত সমতলভূমি। হিমালয় গড়িয়াছে বাংলা উত্তর পশ্চিম ভারতের মৃত্তিকা প্রস্তরে-আল্পস ও তেমনই জার্ম্মাণীর কঠিন ভূমি দিয়া হলাণ্ডকে সমুদ্রগর্ভে জন্ম দিয়াছে। বাড়ীর চিঠিতে লিখি "হলাণ্ডকে আমার খুব ভাল লেগেছে—বাংলাদেশের মত সমতল; বাংলাদেশের মত এর নদনদী, বাংলাদেশের মত অত তরুলতা নাই, কিন্তু শ্যামল মাঠ চলেছে শ্যামল মাঠের পারে; বেশ ভাল লাগে।—সুদূর দিগন্তে মিশে গেছে সুনীল প্রান্তর উপরে রৌদ্রকরোজ্জল আকাশ; হলাণ্ডকে আমার খুব সুন্দর লেগেছে। বেলজিয়াম থেকে হেগ পর্য্যন্ত যাত্রা চমৎকার, পথে পড়েছে দু তিনটি নদী—সুন্দর ও সোনা। হল্যাণ্ড দেশটা খালে ভরা—চারিদিকে খাল দেখলাম। চাষারা মাটির ভিতর আলু পুতে রেখেছে—গাজর পুতে রেখেছে—শীতের সময় ভাল থাকবে এ ব্যবস্থাটাও আমরা অনুকরণ করতে পারি। গরমের সময় আলু পুতে রাখা মন্দ নয়।

রেলপথে একজন নাবিকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে ইংরেজী জানে। ডেনহাগে নামিলে একটি গাইড্ আসিয়া ধরিল—সে একটি পাসিওতে নিয়া চলিল। এই গৃহস্থের কেহই ইংরেজী জানে না, কাজেই মুখ নাড়িয়া হাতের ইঙ্গিতে ও ইসারায় কাজ চালাইতে হইল। গৃহস্থ শিক্ষিত—আহার করিতে দিল তাহার পাঠাগারে—ঘরটি চমৎকার, সুবিন্যস্ত ও সুদৃশ্য। লাঞ্চ দিল মন্দ নয়—কলাইসুটি সিদ্ধ ঘি মাখিয়া লবণ দিয়া অনেকগুলি খাইলাম। এদেশে সবাই বিয়ার খায়—জল খায় না। পরিচারিকা খাওয়ার

টেবিলে একবোতল বিয়ার আনিয়া দিয়াছে। পরিচারিকাকে জল আনিতে হইবে বুঝাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইল। আহারাদি শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

হেগ সহরকে ডাচেরা বলে ডেনহা—ইহা হল্যাণ্ডের রাজধানী। ইহাকে য়ুরোপীয়েরা বলে সর্ব্ববৃহৎ গ্রাম—নগর বলিয়া ইহার মর্য্যাদা দিতে চায় তাঁহারা। ডেনহার চেয়ে আমষ্টার্ডম বড় সহর। ডেনহা উত্তর সাগর হইতে দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত—অল্পক্ষণ ছিলাম বলিয়া সমুদ্র দেখা সম্ভব হয় নাই।

ডেনহা দেখিতে খুব খারাপ নয়। সুন্দর ও সুরম্য গৃহভবন খালের পাশে পাশে বেশ ভাল দেখায়। খালের পাশে পত্রল লাইম গাছ। ল্যইম-জুস এই গাছের ফলের রসে তৈরি হয়। এই লেবু গাছের পত্রল শাখা প্রশাখায় তীর ভূমি সুন্দর দেখায়।

বাহির হইয়া প্রথমে ষ্টেসনের দিকে চলিলাম—ডাক ঘরের সন্ধান করিলাম। রবিবার বলিয়া ডাক ঘর বন্ধ। একজন বলিয়া দিল ছোট ছোট মণিহারি দোকানে পোষ্ট কার্ড ও টিকিট কিনিতে পাওয়া যায়। একটি বুড়ীর দোকান হইতে উড়োজাহাজের 'carte posteli' কিনিলাম। বাড়ীতে চিঠি ফেলিয়া সহর দেখিতে চলিলাম।

ডেনহাতে আন্তর্জাতিক বিচারালয় আছে—সেটিই দেখিবার জন্ম প্রথমে যাত্রা করিলাম। এই বিচারালয়ের নাম শান্তি প্রাসাদ। লীগ অব নেশনের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই হেগে শান্তি সম্মেলন হইত এবং রাষ্ট্রের বিবাদগুলি যাহাতে যুদ্ধ না করিয়া আপোষে নিষ্পন্ন হয় তাহার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী হয়। ট্রামে উঠিলাম, কিন্তু কন্‌ডাক্টর আমার গন্তব্য পথ বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে আমাকে kurhaus নামক স্থানে নিয়া গেল।

ডেনহা দক্ষিণ হল্যাণ্ডের প্রধান নগর। kurhaus পৌর ভবন। তাহার পৌর ভবনের বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করিবার সুবিধা হইল না। একটী বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণের চারিদিকে সরকারী দপ্তরখানা—তাহাদের উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া ফিরিলাম। এই স্থানটিকে Binnenhof বলে—কথাটির মানে Inner court—এখানেই মধ্য যুগের স্থাপত্যরীতিতে নির্ম্মিত রাজকীয় কর্ম্মশালা—তাহাদের নয়ন মনোহরণ রূপ নাই। কাছেই Haagsche Borch বা বনভূমি। এই বনভূমিতে ওক এবং বীচ বনস্পতি শাখা প্রশাখায় চমৎকার দৃশ্য সৃজন করিয়াছে। মধ্যে বন ভবন নামক একটী সুদৃশ্য প্রাসাদ আছে—তাহার বড় ঘরটির নাম orange saloon, এখানেই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শান্তি-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

হেগ প্রথমে হলাণ্ডের কাউণ্টদের মৃগয়া-ভূমি ছিল। পঞ্চম ফ্লোরিস ইহাকে আপন বাসভবনে পরিণত করেন। তাহার ফলে এখানে হল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের অধিবেশন হয় এবং কালে ইহা রাজধানীতে পরিণত হয়।

শান্তি-প্রাসাদে ফিরিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। খুলিবার বিলম্ব ছিল; খানিকক্ষণ এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া লইলাম। বোধ হয় বেলা পাঁচটার সময় প্রসাদ-দ্বার খুলিল।

রুষিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের চেষ্টায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যে শান্তি-সম্মেলন বসে তাহার ফলে হেগে আন্তর্জাতিক বিচার মন্দির স্থাপিত হয়। পৃথিবী রণদানবের তাণ্ডব নৃত্যে বিক্ষিপ্তওপর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছে—নানা দুর্ভোগ পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে উন্মাদনা জাগাইতেছে। জীবনকে বিচিত্র ও সুরস করিবার চেষ্টা ফেলিয়া রাষ্ট্র কেবল সমরোপকরণের ক্রমবর্দ্ধমান আয়োজন করিয়া চলিয়াছে। সেই সমরপ্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই বৈঠক বসিয়াছিল। বলদৃপ্ত জার্ম্মানির প্রতিবন্ধকতার জন্য সমর-সম্ভার হ্রাস করিবার প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। তথাপি এই অধিবেশনে অনেকগুলি সুন্দর ব্যবস্থা স্থির হয়। তাহাদের অন্যতম—আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিময় নিষ্পত্তি। এত দিন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মতদ্বৈধ ঘটিলে যুদ্ধই তাহার সমাধান করিত।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শান্তি-প্রাসাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আসনরূপে উৎসর্গীকৃত করা হয়।

এই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে কতকগুলি দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই প্রাসাদের নানা কক্ষে দেখিলাম। যে সমস্ত বিচারক এখানে বিচার করিয়াছেন

তাহাদের অনেকের ছবি দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। এই শান্তি-প্রাসাদে দাঁড়াইয়া মনে হইল—বিশ্ব-শান্তির সুমধুর স্বপ্ন যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহারা সমস্ত কবি। তাহাদের আশা বারে বারে ব্যর্থ হইবে—তবুও সেই কবি ও মনীষিদের স্বপ্ন হয়ত এক সুদূর ভবিষ্যতে সফল হইবে।

মৃত্যুর পথ, সংহারের পথ, সৃষ্টির পথ নয়—সভ্যতার জয়যাত্রাকে সে অবরোধ করে। বুদ্ধিজীবি মানুষ তবু দেশে দেশে কেন যে সেই মৃত্যুর আয়োজন করে কে জানে? শান্তিকামী আমরা তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারি না।

বীরেরা বলিবেন—ধ্বংস অসুন্দর নয়। ধ্বংসের পথেই নূতনের আবির্ভাব। জরাজীর্ণতাকে অবলম্বন করিয়া থাকাই পৌরুষ নয়। এ সকল তর্ক। বিবাদের মূলে স্বার্থ ও অবিচার—মানুষের বিদ্যা যত বাড়িবে—দেশে দেশে নিদ্রিত নরনারীগণ যত জাগিবে, ততই তাহারা বুঝিবে যে যুদ্ধ কল্যাণের পথ নয়—দেশহিতৈষিতা নয়। যুদ্ধ স্বার্থান্ধ দাম্ভিকের প্ররোচনায় সংঘটিত হয়। সে অনলে আত্মাহুতি দেওয়া পৌরুষ নয়—একান্ত মূর্খতা। অবশ্য কবে যে এই বোধ বিশ্বমানবকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবে, একমাত্র মহাকালই বলিতে পারেন।

নয়ন মনোহরণ শান্তি-প্রাসাদ দেখিয়া ইহার সম্মুখেই একটি বাড়ীতে প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। চিত্র-প্রদর্শনী—আয়োজন বিশাল নয়। ডাচেদের নিজস্ব ও বর্তমান শিল্পকলা সমাবেশ বেশ লাগিল।

বাহির হইয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া ইহাদের মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম দেখিলাম। বিশেষ নূতনত্ব চোখে পড়িল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি অনুভব করিলাম—তখন ইহাদের পুরাতন পার্লামেণ্ট বাড়ীর মধ্য দিয়া একটি সিনেমায় গেলাম। যে ছবি দেখিলাম তাহার নাম বা ঘটনা মনে নাই—তবে এই ছায়া ছবির বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্যই নাই। বাহির হইয়া ট্রামে করিয়া অনর্থক খানিকটা ঘুরিয়া সহরের উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম।

তাহার পরে Scala theatre নামক প্রমোদ-ভবনে Revue দেখিলাম। এই ধরণের অভিনয় আমাদের দেশে নাই। ইহাতে বিচিত্র সজ্জায় নানাপ্রকার নৃত্য ও গীত দেখানো হয়। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে এই ধরণের আনন্দোৎসব শরীর ও মনকে শীতল করে। কোথাও কোথাও এই সমস্ত নৃত্য গীতে অশ্লীলতার আমদানি করা হয়। উলঙ্গ নৃত্য দেখাইয়া মানুষের কাম-জ্বালাতে ইন্ধন যোগায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। অধিকাংশই নির্দ্দোষ আমোদের আয়োজন। এখানে একজন বাটেভিয়া প্রবাসী ডাচের সঙ্গে আলাপ হইল।

ডাচের একদিন সমুদ্র পথে বিজয়াভিযানে বাহির হইয়াছিল। ইংরেজ বা ফরাসীর মত তাহাদের প্রতিষ্ঠা অধিক হয় নাই। কিন্তু আজিও সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বালি দ্বীপ প্রভৃতি ইহাদের দখলে আছে। যে জাহাজে বিলাতে আসি সে জাহাজেও একজন বাটেভিয়া প্রত্যাগত পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপ বেশী জমে নাই—অবসরের অবকাশে বাটেভিয়ার কথা কিছু কিছু জানিয়া লইলাম। রাত্রি সাড়ে এগারোটায় বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ শেষ করিয়া রওনা হইলাম। বাড়ীওয়ালা বিল দিল। গাড়ী যেরূপ যেরূপ চলিয়াছিল তাহার অনেক অধিক—ভাষা না জানায় তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইলাম। ওদের লোক ষ্টেশনে আমার সুটকেশ দিয়া গেল—কিন্তু মন উষ্ণ থাকায় তাহাকে আর বকসিস দিলাম না। অবশ্য তাহার প্রভু আমার নিকট প্রায় দ্বিগুণ দাম আদায় করিয়া দিল।

পথে দেখিলাম নদীমাতৃক হলাণ্ডের শ্যাম তৃণভূমি—কোথাও কোথাও দু একটী পুষ্পোদ্যান চোখে পড়িল। সযত্ন বিন্যস্ত ফুলবনগুলি একান্ত চিত্তাকর্ষক। বেলা দশটা এগারোটায় আমষ্টার্ডমে পৌছিলাম।

হলাণ্ডকে বলে নিম্নদেশ—নিম্নবঙ্গের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আছে। আমাদের দক্ষিণে যে বঙ্গোপসাগর সে উত্তরসাগরের মত দুরন্ত নয় তাই বাঙালী আদ্র জল বায়ুতে ক্লীব হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু ডাচেরা দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ—সমুদ্রকে শাসন করিয়া তাহারা বাসভূমি আদায় করিয়া লইতেছে। বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলকে আনন্দ ও স্বাস্থ্যের নিকেতন করা চলে।

যখন পুটুয়াখালি ছিলাম তখন একবার সমুদ্র ভ্রমণে

নাই। একটী প্রবন্ধে বরিশালের দক্ষিণস্থ তীর ভূমিতে স্বাস্থ্য নিকেতন গড়িবার কথা বলি। দুর্ভাগ্যক্রমে মাসিক সম্পাদকেরা এই নূতনত্বে প্রতি আকৃষ্ট হন নি—কাজেই সে লেখাটি লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া গেছে।

ডাচেদের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তাই ওদের নিকট হইতে দুঃসাহাস কর্ম্মনৈপুণ্য শিক্ষার অবকাশ আছে। ডাচেরা জীবিকার জন্য কৃষি, পশু পালন বাণিজ্য এবং জাহাজ নির্ম্মাণের উপর নির্ভর করে। ডাচেরা পৃথিবীতে মাখন প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য সরবরাহ করে। ইহাদের নিকট হইতে পশুপালন বিদ্যা শিক্ষা দরকার।

ডাচেরা পণ্ডিত কম নয়। প্রায় কুড়িজন ডাচ বৈজ্ঞানিক নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। ডাচ কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

গত শতকে বাংলাভাষায় যেমন স্বর্ণযুগ গিয়াছে—কবি ও সাহিত্যিকেরা আনন্দ ভাস্বর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছে—ডাচেরাও ঠিক তেমনই করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকে ইহাদের সাহিত্যিকেরা অনেকগুলি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন—কিন্তু এই স্থইই বড় কথা নয়—তাহারা ডাচ ভাষায় যে ভেরী বাজান তাহার সঙ্গীত আজিও বাজিতেছে। কাব্যে ও গানে ডাচ ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

ডাচেরা খুব বিদ্যোৎসাহী। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইহার নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছে। নানা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছে। হেগ সহরে Institute of language, Geography and Ethnology of dutch India নামে একটি সুন্দর সমিতি আছে। ইহাদের প্রচেষ্টায় উপনিবেশের সঙ্গে ডাচেদের হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইয়াছে।

লণ্ডনে এইরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া জানি না। ভারতবর্ষ ও তাহার বিচিত্র সংস্কৃতিকে জগজ্জন সভায় পরিবেশন করিবার আয়োজন আমাদের অত্যন্ত কম।

য়ুরোপে দেশদেশান্তর ঘুরিয়া এই কথাটিই বারে বারে মনে হইয়াছে বিশ্ব জনসভায় আমাদের সভ্যতার সুচারু পরিবেশনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের সহিত সংযোগহীন হইয়া কোণে বসিয়া রহিবার যুগ গিয়াছে—বিশ্ব মানুষের সাথে মিতালি পাতাইতে হইলে পরস্পরকে জানাজানির প্রয়োজন। তাহার প্রচেষ্টা কি জাগ্রত নব ভারত করিবে না?

শ্রীমতিলাল দাশ



চিত্রশিল্পী বীরু গুপ্তের সৌজন্যে

কোনার্কের গঙ্গামূর্ত্তি

শরৎ বধূ

শ্রীনিশীথ চক্রবর্ত্তী

হে শরৎ রাণী !
কত ছলে বারে বারে
কত রূপে, জানি,
এসে যাও ফিরে
ধীরে অতি ধীরে।

প্রথম ফাল্গুনে এলে
বসন্তের গন্ধ নব ঢেলে,—
বনানীর কুসুম-হিয়ায়।
নৃত্যের লীলায়
ঝিল্লীর নূপুর তানে জাগালে কানন
ফাল্গুনের বন-কবি দিল তোমা
প্রাণ-ভরা শুভ-আলিঙ্গন।

ক্ষণ পরে ফিরাইয়া আঁখি
হেরি হায় বিস্মৃতির স্বপ্ন ছায়ে
যেন গেলে ঢাকি।
গগনে উঠিল মেঘ—
আলো নাই,—শুধু অন্ধকার
তার মাঝে তুমি বরষার
মৌন বেশে একা বিরহিনী।
আঁখি-কাদম্বিনী
ঝরিয়া পড়িল তব নিঝর ধারায়।
কারে প্রাণ চায়,
বিশ্বে তাহা কেবা ওগো জানে ;
বারে বারে তাই প্রশ্ন করা—
মন নাহি মানে।
সকাল সন্ধ্যা রাতে
যেথা ছিল তব হাসি, তব খেলা
মলয়ের সাথে—
— সেথা শুধু বাজে,
তোমার বুকের ব্যথা জলদের মাঝে।

সহসা লুকালে পুনঃ
অম্বরের ঘন-মেঘ-দলে
ক্ষণ-প্রভা ছলে।
বিস্ময়ে রহিনু চাহি
একি মোর স্বপ্ন-ঘেরা মন ?
হাসিল গগন।
চেয়ে দেখি নহে তুমি বিরহিনী নও
শেফালির ফুল-শয্যে বধূরূপে রও
সেই হাসি—নব রূপে নব উদ্বোধনে
আজও এলে শরতের এ মধু লগনে ॥

বিশ্বের গণ-সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

আধুনিক কালে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহা শত সহস্র যুগ যুগান্তের অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলপ্রসূত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভূমিখণ্ডের গর্কি, রোমা রোঁলা বা রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি, তাহা কোনও দৈব বা আকস্মিক ঘটনা হইতে সংঘটিত নহে—মানব সভ্যতার আদি যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বিশ্বের যাবতীয় সংস্কৃতি ধারার অনুসৃতি হইলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

স্মরণাতীত প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কি ভাবে সাহিত্যকলার ক্রমবর্দ্ধমান উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যখন মনুষ্য সমাজ তাহাদের আন্তরিক শুভ কামনা চাহিয়াছিল, তখন প্রথম আসিল ভাষা, তারপর সাহিত্য এবং তাহা হইতেই শিল্পের সৃষ্টি। মনুষ্য সমাজ যেদিন নিজ শক্তি ও ভাব প্রকাশ করিতে চাহিল, সেদিন তাহাদের মধ্যে একটা সুগভীর আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণা আসে। এই অনুপ্রেরণা হইতেই ভাষার উৎপত্তি। ভাষা যখন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল, তখন অন্তরের নিহিত ভাব প্রকাশের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। ভাষা আর সাহিত্য যখন সুদৃঢ় হইয়া প্রকাশ পাইল, মনের ভাব প্রকাশের জন্য শিল্পকলার উৎপত্তি হইল, যেহেতু ভাব প্রকাশের জন্য গভীর ও ব্যাপক-রূপে কাজ করিবার শক্তি শিল্পকলার যথেষ্ট বেশী।

মানব সভ্যতার আদি যুগে ভাষা সৃষ্টির পর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার রূপ কি প্রকার ছিল? সেদিন শিল্পকলার কাগজ, মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তাহা হইলে সাহিত্যের অণুপ্রকাশ ছিল কোথায়? সেদিন বালক, যুবা, বৃদ্ধ নর-নারী নির্বিশেষে আদি মানুষেরা তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী অবকাশ সময়ে গল্প গুচ্ছাকারে বলিত। সেই যুগে গণ-মনের সুখদুঃখের কাহিনী যে উপায়ে বলা হইত, তাহা হইতেই গণ-কাহিনীর (Folk-tales) সৃষ্টি। আদি মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের আর শুধু কাহিনী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তাহারা তখন তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী-সনৃত্যে ছড়াগানের আকারে গাইতে লাগিল। এই ছড়া গান হইতেই গণ-কাব্য ও গণ-নৃত্যের (Folk-lores and Folk-dances) উৎপত্তি হইল। পরবর্ত্তীকালে মানব সভ্যতা ফলফুলে বিকশিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমাজের রূপকথা এবং কাব্যও উন্নততর হইল। এইরূপে রূপকথা ও কাব্য সাহিত্যই গণ-সাহিত্যের (Folk-literature) আকার ধারণ করিয়াছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যায়। শিলালিপি, পত্রলিপি, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। গণ-সাহিত্য ও উন্নত হইতে উন্নততর হইতে লাগিল। শত শত যুগ ধরিয়া গণ-সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনে যে নূতন সাহিত্যের ধারা রূপায়িত হইল, তাহা হইতেই বিশ্বের আধুনিক সাহিত্য-কলায় (Modern art literature) উৎপত্তি হইয়াছে। এই সব কারণেই শত সহস্র যুগব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনে সংরক্ষিত গণ-সাহিত্য আমাদের পরম আদরের বস্তু।

প্রাচ্য ভূখণ্ডের ভারত, পারস্য, আরব প্রভৃতি স্থানে এবং প্রতীচ্য দেশের গ্রীস, তুরস্ক, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে যে সব প্রাচীন রূপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের মিল রহিয়াছে। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্যোপন্যাস প্রভৃতিতে প্রাচ্য দেশের অনেক প্রাচীন রূপকথা সংগৃহীত হইয়া লিখিত হইয়াছে। Grimms' Fairy Stories, Hans AnderSon's

Fairy Tales বইগুলি প্রতীচ্য দেশের রূপকথা ও গীতি-কাব্য সমূহের রচনা কৌশল, বর্ণনা প্রণালী। বিষয়বস্তু প্রভৃতিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত রূপ-কথার প্রত্যেকটী হইতে বালক বালিকারা উপদেশ শিক্ষা পায়। In it "justice always prevails, active talent is every where Successful, the amiable and generous qualities are brought forward to excite the sympathies of the reader and in the end are constantly rewarded by triumph over lawless power." (১) এগুলির মৌলিক উৎপত্তি স্থল কোথায়, লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাদের দেশের folk-tales "Strongly bear the impress of a remote Eastern original." (১) ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে আমাদের দেশের বহু রূপকথা পাশ্চাত্য দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সুবিদিত, ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের বহু গল্পই ইউরোপে প্রায় মৌলিক ভাবেই প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং "exercised very great influence in shaping the literature of the Middle ages of Europe." (২) ভারতবর্ষের রূপকথার আরবী অনুবাদের সাহায্যে ইউরোপীয়েরা তাহাদের দেশে এগুলি গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি, দেখা গিয়াছে বহু রূপকথা ভারতবর্ষে যে ভাবে প্রচলিত আছে তদনুরূপ ইউরোপের প্রদেশগুলিতেও বর্ত্তমান। "Europe was thus undoubtedly indebted to India for its Mediaeval literature of fairy tales and fables." (২) পারস্য ও আরব দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নিকট হইতে রূপকথার বর্ণনারীতি শিক্ষা করিয়াছে। "The style of narration was borrowed from India by the neighbouring oriental peoples of Persia and Arabia, who employed it in composing independent works. The most notable instance is, of course, the Arabian Nights." (২) W. R. Gourlay M. A., C. I. E. I. C. S., লিখিয়াছেন—"To those of us who come from the west, it comes as a pleasing surprise to find in the folk-tales of India scenes and incidents which are familiar to us from our early reading of Grimms' Fairy Tales and Hans Anderson's Fairy Tales. This similarity early attracted the attention of Scholars…Sir William Jones and the early Sanskrit Scholars who worked with him, found two Conections of these tales so complete as to leave no further doubt that the origin was ...in the East." (৩) সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের রূপকথাগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে লোক যাতায়াতে আরব, পারস্য, তুরস্কের মধ্য দিয়া ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিশ্বের গণ-সাহিত্যে ভারতবর্ষের গণ-সাহিত্যের প্রাচীন রূপ-কথা ও গীতি-কাব্যের দান অপরিসীম। ভারতবর্ষের গণ-সাহিত্য ভারতবাসীর অমূল্য সম্পদ্।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

(১) Grimms' Popular Stories, Oxford university Press, 1909, preface p. X.

(২) Dr. Macdonell's History of Sanskrit Ep. 1899, p. 421-420-369.

(৩) Dr. D. C. Sen's Folk literature of Bengal, Calcutta university Press, 1920, Forward p. vii.

শরতের প্রতি

শ্রীশতদল গোস্বামী

পুষ্প মোর ছিন্ন করি' বিদায় নিয়া গিয়াছো
নয়ন মোর করিয়া গেছো অন্ধ
অশ্রুভরা শূন্য বুকে আগুন জ্বালি দিয়াছো,
আজিকে কেনো ছড়াও মৃদু গন্ধ ?

যে ফুল তুমি দলিয়া গেছ পাষাণ হ'য়ে চরণে
কেনোবা আজি ফুটাতে চাও তাহারে ?
যে প্রাণ মম জাগিয়াছিল গন্ধে, রূপে, বরণে
মৃত্যুবাণ হানিয়াছিলে যাহারে।

সে প্রাণ আজি বাঁচাতে চাও কিসের ওগো প্রয়াসে
কেনোবা তারে আগুনে চাহ দহিতে ?
নিঠুর তুমি পরাণহীন, নিঠুর তব বিলাসে
জীবন যায় নূতন খেলা সহিতে।

কে বলে তব অঙ্গ মাঝে জড়ায়ে আছে সৌরভে
জ্যোৎস্নারাশি, বন পাখীর কাকলী,
কে বলে তব রৌদ্রছায়ে পাতায়-ফুলে-পল্লবে,
কবির প্রাণ উঠিছে সদা ব্যাকুলি ?

মিথ্যা তুমি, তোমার হাসি তোমার ফুলরাশিতে
অতীত ব্যথা ভাসিয়া আসে স্মরণে,
বিরহভরা বুকে চাহিনা ভালবাসিতে
ক্ষান্ত হোক জীবন মম মরণে !

শুভ্র মেঘ ভাসিয়া আসে হৃদয় তা'র শূন্য
দীর্ঘ ডাকে ডাকিয়া মরে প্রিয়ারে
করুণ তার বিরহ ডাকে নয়ন হয় পূর্ণ,
ব্যথাতে মোর ভরিয়া তোলে হিয়ারে।

চাহিনা তব শেফালি ফুল, রৌদ্রছায়া প্রভাতে,
চাহিনা তব জ্যোৎস্নাভরা যামিনী
ফিরায়ে দাও বকুল তরু বাদলময় সভাতে
হাস্নুহানা, মাধবীলতা, কামিনী।

একদা রাতে তোমাকে আমি বাসিয়া ভাল নয়নে,
চাহিয়া ছিনু অতুলনীয় শোভাতে,
তুমিই আসি পুষ্প মম করিয়া চুরী গোপনে,
চাহিছ এবে আমার প্রাণ ভুলাতে !

যে ফুল মম লইয়া গেছ ঝরায়ে গেছ মুকুলে,
যে দীপ মম নিবায়ে গেছ বাতাসে,
জ্বালায়ে দাও সে দীপ মম ফুটায়ে দাও সে ফুলে,
দৃষ্টিহীন জীবন ফুল বিকাশে।

সচেতন ও অবচেতন চিন্তাধারা

অধ্যাপিকা শ্রীনলিনী চক্রবর্তী

মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে, কোনও না কোনও চিন্তা তার মনে ঘোরে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি-নাটি সহস্র চিন্তা; ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নানান ঘটনা; দেশ বিদেশের কত কথা; কত বিজ্ঞান দর্শন কাব্য-সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনীতি; চিন্তার আমাদের অভাব নাই। একেবারে অন্যমনস্ক অবস্থায় যখন আমরা থাকি, তখনও একাগ্রতার অভাব ঘটলেও ভাবনার অভাব ঘটে না—কত অসংলগ্ন, অলস চিন্তা তখন আমাদের মনের মধ্যে দিয়ে ভেসে যায়।

অলস চিন্তা মানে কিন্তু অলস অবস্থায় আমরা যা চিন্তা করি তাই নয়—দেহের আলস্য আর মনের আলস্যে প্রভেদ আছে। আমরা যখন কোনও কাজ করি না, তখন আমাদের দেহ থাকে অলস, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে তখন আমরা জ্ঞাতসারে চালনা করিনা। এই রকম অলস অবস্থাতে আমরা শুয়ে বসেও থাকতে পারি আবার হেঁটে চলেও বেড়াতে পারি, কিন্তু সেই গতির মধ্যে কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকে না।

দৈহিক আলস্যের মধ্যেও মন খুব সক্রিয় থাকতে পারে। শুধু যে গভীর ভাবে চিন্তা করবার সময়ে আমরা স্থিরভাবে বসে আমাদের দেহ মনের সমগ্র শক্তিকে একাগ্রীভূত করে নিই তাই নয়, যখন আমরা নেহাৎই অলসভাবে থাকি, তখনও নানা প্রকার কাজের চিন্তা আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

দুষ্টু ছেলের পড়ার বই হাতে নিলেই আলস্য আসে, বইয়ের খোলা পাতা ফেলে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও কিন্তু তার চিন্তার অন্ত নাই—মনে মনে হয় তো সে ভাবছে কেমন করে মাষ্টার মশাইয়ের চোখে ধুলো দিয়ে ক্লাস পালানো যায়—ল্যাও মারবার একটা নতুন প্যাঁচ হয় তো সে কল্পনাতে আয়ত্ত করে নিচ্ছে। চলিত কথায় আমরা বলব যে সে পড়ার বই ছেড়ে অলস চিন্তায় মন দিয়েছে, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার চিন্তাগুলি মোটেই অলস নয়—কারণ একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তার মনকে চালনা করেছে, তার পড়া শেখা বন্ধ থাকলেও মস্তিষ্কের পরিশ্রম যথেষ্টই হচ্ছে।

মন তখনই সত্য সত্য অলস থাকে, যখন কোনও প্রকার উদ্দেশ্য চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে না। সাধারণ মানুষের প্রত্যেকটি বাক্যের বা চিন্তার কোনও অর্থ থাকে। তার প্রত্যেকটি কার্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 'আজ' যখন সারাদিনের কাজ শেষ হয়ে যায়, তখনও আমরা রাত্রে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করি 'কাল পরশুর' কথা। এই সব চিন্তা কিন্তু মোটেই অলস নয়। এদের উৎপত্তি আমাদের জীবনের নানান্ অভাব ও আকাঙ্ক্ষা থেকে। এদের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের মনের সচেতন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি সমূহ।

এইখানে আমাদের মনের অলস ও অনলস চিন্তার মধ্যে প্রথম পার্থক্য চোখে পড়ে। অলস চিন্তাধারা বলতে যদি আমরা মনের একটি গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থা বুঝি, তাহ'লে কথাটা "সোণার পাথর বাটির" মতনই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে, কারণ মন স্বভাবতই সক্রিয়। আগেই বলেছি যে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মনে সর্বদাই কোনও না কোনও চিন্তা থাকে। আর চিন্তা থাকলে তার নিজস্ব একটা গতিও থাকে। এইজন্য অনলস ও অলস চিন্তা ধারার মধ্যে পার্থক্য গতি ও গতিহীনতায় নয়—সুনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট গতিতে;

বহু ভাব বা idear সমাবেশে আমাদের চিন্তা ধারার সৃষ্টি হয়। একটি ভাবের সঙ্গে তার সদৃশ, বিসদৃশ কত ভাবই সে আমাদের মনে সংযুক্ত বা associated থাকে তার

সীমা নাই। 'ঘুড়ি' বলতে আমাদের নীল আকাশের কথা মনে হতে পারে, লাটাইয়ের কথা মনে হ'তে পারে, আবার ঘুড়ি সংক্রান্ত ছোট বেলাকার কোনও একটি ঘটনার চিত্রও মানসপটে উদিত হ'তে পারে। কোন্ বিশেষ মুহূর্তে কোন্ ভাবটি মনে আসবে, সেটা নির্ভর করে তৎকালীন মানসিক অবস্থার ওপর।

গৃহকর্ত্রী যখন বাজারের হিসাব করতে বসেন তখন তাঁর চিন্তাধারা একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—চাল ডালের সঙ্গে সঙ্গে তেল-ঘী-আলু-পটলের দর দাম তাঁর মনের মধ্যে একে একে ভেসে ওঠে। এই ভাবগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের একটা সুস্পষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু মন যখন অপেক্ষাকৃত অলস থাকে তখন একটি ভাবের সঙ্গে পরবর্তী ভাবের কোনও সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না—তখন আমাদের মন থাকে বিক্ষিপ্ত, চিন্তাধারা অসংলগ্ন। তখন আমরা ইচ্ছাপূর্বক চিন্তা করি না, স্বতই আমাদের মনে যে সকল চিন্তা উদিত হয় সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকি মাত্র। এইখানেই কাজের চিন্তা ও অলস চিন্তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রভেদ।

আগেই বলেছি যে যখন আমরা কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করি তখন সেই চিন্তার গতিশক্তি আসে আমাদের সচেতন বা conscious মনের ইচ্ছা বা volition ও প্রবৃত্তি বা impulse থেকে। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন অলস-চিন্তায় এই সচেতন মন দ্রষ্টা মাত্র—চিন্তার গতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের মনের অবচেতন বা Subconscious স্তরের ওপর।

অন্যমনস্কভাবে বসে আছি, কড়াইশুটির কথা বলতে কেন গোলাপ ফুলের কথা মনে পড়ে গেল তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবো না। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে মনে পড়বে কবে আমাদের বাগানে কড়াইশুটি ও গোলাপফুল দুইটিই খুব ভাল হয়েছিল—চেতন মন থেকে তার সব চিহ্ন মুছে গেলেও, অবচেতন মনে এই দুইটি ভাব সংযুক্ত হয়ে রয়েছে।

মনের এই আস্তর্জ্ঞানিক অবচেতন স্তরে আমাদের আজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। মনোজগতে কোনও জিনিসই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায় না। আধুনিক মনোবিদ্গণের মতে এই অবচেতন সত্তাই আমাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে দিনের প্রতি অলস মুহূর্তের চিন্তার মধ্যে এই আস্তর্জ্ঞানিক মন প্রকাশ পায়।

একই সমাজে বাস করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বাহ্যিক কথাবার্তা আচার ব্যবহার একই ছাঁচে গড়া হয়ে যায়। তার চেতন মন থাকে সামাজিক বিধি নিষেধের বন্ধনে বদ্ধ, সচেতন সত্তার অহঙ্কারের দ্বারা চালিত। অবচেতন মনটিই তার স্বাভাবিক ব্যক্তিগত সত্তা। কিন্তু মনোরাজ্যের অতি সামান্যই আমরা সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করি অধিকাংশই থাকে অবচেতন। এই অবচেতন সত্তার স্বরূপ প্রকাশ পায় আমাদের অলস চিন্তার মধ্যে, আমাদের রাত্রের স্বপ্ন ও দিবা স্বপ্নের মধ্যে। সেই জন্য মানসিক প্রতিভায় যাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে ঊর্ধ্বে তাঁহাদের প্রতিভার বিশেষত্ব লক্ষিত হয় তাঁদের অবসর সময়ের অলস চিন্তাধারায়। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষের অবচেতন দিবাস্বপ্ন শুধু কল্পনার আকাশ কুসুম রচনা করে—সেইখানেই অসাধারণ লোকে সহসা বড় একটি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করে ফেলেন, অথবা এমন একটী কাব্য বা চিত্র রচনা করে ফেলেন যা তাঁদের সচেতন চেষ্টার অনধিগম্য। যে অবচেতন চিন্তার মধ্যে সাধারণ মানুষে পায় ছুটি, যে কল্পলোক থেকে সে আহরণ করে তার ব্যক্তিগত জীবনের দুই চারিটি রঙীন মুহূর্ত, সেইখানেই মহাপুরুষের প্রতিভা পায় কোনও শাশ্বত সত্যের সন্ধান।

বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে অবচেতন চিন্তার প্রয়োজন আছে, কথাটা শুনতে একটু আশ্চর্য বোধ হ'লেও খুবই সত্য। আমরা মনে করি যে বুঝি বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কোনও একটি বিশেষ সত্য আবিষ্কার করবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করতে বসেন ও মানসিক প্রচেষ্টার ফলে সত্যটি তাঁদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই ধারণাই যদি সত্য হ'ত তাহ'লে বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে অবচেতন চিন্তার কোনও স্থানই থাকতো না। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। মনকে যখন আমরা একটি বিশেষ দিকে চালনা করি, তখন তার গতি হয় কলের গতি, তার মধ্যে না থাকে প্রাণ না থাকে প্রেরণা। অবশ্য এ কথা আমি

বলতে চাই না যে মানসিক শ্রমের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। মনকে ও বুদ্ধিকে আমরা সর্বদাই কোনও না কোনও কার্যে নিযুক্ত করি, এবং তার কাজ সে ভাল ভাবেই সম্পন্ন করে। ইচ্ছা শক্তির দ্বারা মনকে চালনা করেই সাধারণ লোকে সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে। এইভাবে মানসিক শ্রম ও গবেষণার ফলেই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বহু সত্যের আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সহসা যখন কোনও পণ্ডিত একটি মহাসত্য আবিষ্কার করে ফেলেন সাধারণত দেখা যায় যে তখন তাঁর মন অনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করছিল। এই অবচেতন চিন্তাধারা থেকেই তাঁর মনে সহসা একটি প্রেরণা বা inspiration এসেছে।

একটি সুবিদিত ঘটনা থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যাঁরা গণিত বিদ্যার চর্চা করেছেন তাঁরা সকলেই The principle of Archimedesএর সঙ্গে সুপরিচিত। এই আর্কিমিডিস্ ছিলেন সাইরাকিউস দেশের একজন গণিতজ্ঞ। একবার এক স্বর্ণকার অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত একটি সোনার মুকুট তৈরী করে ঐ দেশের রাজার কাছে বিক্রয় করতে নিয়ে গিয়েছিল। রাজা মহাশয় সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে বললেন, মুকুটটি না গলিয়ে, না ভেঙ্গে, বা কোনও প্রকারে নষ্ট না করে সেটা খাঁটি সোনার তৈরী কিনা পরীক্ষা করে দেখতে। আর্কিমিডিস্ও তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—কিন্তু তাঁরা সমবেতভাবে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। পরদিন আর্কিমিডিস্ স্নান করতে যাচ্ছেন, চৌবাচ্চার কাণায় কাণায় ভর্তী জল—জলে নামবামাত্র খানিকটা জল উছলে পড়ল। সহসা আর্কিমিডিসের মনে একটি মহাসত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল—"Eureka, Eureka" বা "পেয়েছি, পেয়েছি" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তিনি সেইরকম অর্ধস্নাত অবস্থাতেই ছুটে চলে গেলেন রাজ-সভার মধ্যে। সভার লোকে ভাবল বুঝি বা তাদের প্রিয় পণ্ডিত পাগলই হয়ে গেছেন। আর্কিমিডিস্ সভার মধ্যে দুইটি বড় পাত্রে জল পূর্ণ করতে বললেন। মুকুটটির ঠিক সমান ওজনে একতাল সোনা নিয়ে তিনি সোনার তাল ও মুকুটটিকে দু'টি পাত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন—দুটি পাত্র থেকে কিছুটা জল উছলে পড়ল। মেপে দেখা গেল যে দুইটি পাত্র থেকে ঠিক সমান ওজনের জল পড়েছে। এ'তে প্রমাণ হল যে মুকুটটি খাঁটি সোনার তৈরী। কোনও দুইটি ধাতুর ঘনত্ব যেহেতু সমান হ'তে পারে না—কাজেই মুকুটের সোনায় যদি অন্য কোনও ধাতুর খাদ মিশ্রিত থাকতো, তাহ'লে মুকুটের সমান ওজনের খাঁটি সোনায় যতখানি জল উছলে পড়ল, মুকুটে ঠিক ততখানি পড়তে পারতো না—সোনার ঘনত্বের সঙ্গে সেই ধাতুর ঘনত্বের অনুপাতে হয় কিছু কম নয় তো কিছু বেশী পড়ত। আজও বিজ্ঞান জগতে এই তথ্যটির সঙ্গে পণ্ডিত আর্কিমিডিসের নাম অমর হয়ে রয়েছে। নিতান্তই অলস, অবসর মুহূর্তে আর্কিমিডিস এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন—অথচ তিনিই যখন প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছিলেন সচেতনভাবে তখন অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

অবচেতন চিন্তা থেকে অনুপ্রেরণার আরো বহু দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস থেকে দেওয়া যেতে পারে।

শিল্প ও কাব্যের রাজ্যে মনের গতি হওয়া চাই স্বাভাবিক ও বন্ধনহীন। এইজন্য দেহ ও মনের নানা প্রকার সচেতন শ্রম দ্বারা আমরা দূর করি দেহের অভাব, আর অবচেতন কল্পনা রাজ্য থেকে চয়ন করি শিল্প ও কাব্য যা দিয়ে আমাদের মনের পরিতৃপ্তি হ'তে পারে।

প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কখনও কখনও দুই চারিটি কবিসুলভ মুহূর্ত্ত আসে যখন তার সচেতন মন তাকে চালনা করে না—অবচেতন ভাবে সে বিচরণ করে কল্পলোকে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত কবি ও শিল্পী তাঁদের কাব্য ও শিল্পী-সৃষ্টির প্রেরণা আসে সেই অবচেতন কল্পলোক থেকে। তাঁদের মনের গতি অধিকাংশ সময়েই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকে।

যে সকল কবি ও শিল্পীরা গতানুগতিক ভাবে কাব্য-বিদ্যা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মগুলি রক্ষা করে শিল্প ও কাব্য রচনা করে গেছেন—তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে অতি সচেতন একটি উদ্দেশ্য আছে—তাঁদের কথা আমি বলছি না। আবার তাঁদের কথাও আমি বলতে চাই না, যাঁরা শিল্প ও কাব্যকে উপলক্ষ্য মাত্র করে কোনও একটি বিশেষ ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বা মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন। ভাবটিই

তাঁদের কাছে চরম সত্য, শিল্প বা কাব্য তাকে রূপ দিয়েছে মাত্র। কান্তবিদ্যার দিক থেকে এই রকম শিল্পীর শিল্প সুনিপুণ হতে পারে, এইরকম কবির কাব্য ভাষা ও ছন্দে নিখুঁত হতে পারে, তবু তা হ'বে অসাড় প্রেরণাহীন, কারণ তার মধ্যে একটি বিশেষ মতবাদই ফুটে উঠবে, স্রষ্টার প্রাণের কোনও সন্ধান পাওয়া যাবে না।

প্রকৃত কবি ও শিল্পী তাঁরাই যাঁরা আপন সৃষ্টির মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ সত্বাটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। মানুষের মনোরঞ্জন করবার জন্ম এঁদের কোনও প্রচেষ্টা থাকে না—মনের স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুপ্রেরণায় এঁরা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে চলেন। তর্ক বা Logic দিয়ে এঁরা বুঝে দেখেন না, নিয়ম কানুন বিধি নিষেধ মেনে চলেন না। বস্তুত তাঁরা সচেতন ইচ্ছা বা চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করেন না—তাঁদের অবচেতন মন স্বতঃই সৃষ্টি করে।

সুরদাসের প্রার্থনায় রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটির বড় সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। চারিদিকে প্রকৃতির অপরূপ শোভা সুরদাসের কবিচিত্ত এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে তাঁর মনের ওপর তাঁর ইচ্ছা শক্তির কোনও প্রভাবই নাই—তিনি বলছেন—

"ইহারা আমারে ভুলায়ে সতত কোথা লয়ে যায় টেনে,
মাধুরী মদিরা পান করি শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে,
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরি কাড়ি,
পাগলের মত রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি,
আপন ললিত রাগিনী শুনিয়া আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুম গন্ধ বসন্ত সমীরন।"

এই কবিচিত্ত কিছুতেই নিজেকে সচেতন বাস্তবের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারে না। সেই অলস কবিচিত্তকে সম্বোধন করে রবীন্দ্র তার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে বলেছেন—

"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে, একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে,
দূর বণ-গন্ধ-বহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি!'

কবি ও শিল্পীদের প্রতি অনেকে দোষারোপ করেন যে তাঁরা 'কাজের লোক" নন—সচেতন ভাবে চিন্তা করে সাংসারিক সমস্যার সমাধান তাঁরা করেন না। কিন্তু এ কথা বলা বৃথা কারণ আগেই বলেছি যে কবি ও শিল্পির মন সব সময়ে তাঁদের চেতন ইচ্ছাশক্তির অধীনে থাকে না। কবি গেয়েছেন বটে—

"এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে, হে কল্পনে রঙ্গময়ি!'

কিন্তু ফেরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মন যে উপাদানে গড়া সব সময়ে কাজের চিন্তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কবি বলেছেন—

"যেদিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমাকে দিলি শুধু এই খেলবার বাঁশি?
বাজাতে বাজাতে তুই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে,
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে,
ছাড়ায়ে সংসার সীমা!

তাই বলে কিন্তু, বাস্তব জগতে কবি বা শিল্পীর মূল্য কিছু হ্রাস হয় না। কর্ম্মীরা কাজ করে মানুষকে দেন অন্নবস্ত্রের সংস্থান—কবি ও শিল্পী তাঁকে দেন আনন্দ। বাস্তবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ছিল অপ্রকাশিত তাকেই শিল্পী দেন রূপ, আর বাস্তববাদী মানুষ যে ভাবটি কোনও দিন ফুটিয়ে তুলতে পারে নি তাকেই কবি দেন ভাষা। তখন তাঁর সেই অবচেতন 'খেলবার বাঁশিতে' অমর রাগিনী বেজে ওঠে। তাই কবি প্রার্থনা করেছেন—

সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীত শূন্য অবসাদপুর,
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি মৃত্যুঞ্জয় আশার সঙ্গীতে;
কর্ম্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে;
শুধু মুহূর্ত্তের তরে দুঃখ যদি পায় তার ভাষা;
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি; তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।"

যেমন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণ "আবিষ্কার করব" এই সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে বসে আবিষ্কার করেন না—তাঁদের

অবচেতন চিন্তাধারা থেকে এমন একটি মহাসত্য সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ে, যা তাঁদের সচেতন চেষ্টার অনধিগম্য। তেমনি কবি ও শিল্পীগণ সচেতনভাবে "কবিতা লিখব" বা "ছবি আঁকব" বলে রূপসৃষ্টি করেন না—অবচেতন পরিকল্পনা তাঁদের এমনই সৌন্দর্য্যের সন্ধান দেয় যা তাঁরা সচেতনভাবে পেতে পারতেন না। এই মহাসত্য ও মহাকাব্যগুলি সমগ্র মানব জাতীর চিন্তা ও ভাব জগতের অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকে। কি করে মানুষ এই অবচেতন, চিন্তাধারার মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠতম সচেতন সাধনাকে অতিক্রম করবার প্রেরণা পায় এই সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান আমাদের সম্যগ্‌ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। হয়তো অবচেতন চিন্তার মধ্যে মানুষ অবচেতন বিশ্বমনের (collective unconscious) সঙ্গে যুক্ত হতে পারে—কিন্তু তার সচেতন সত্ত্বা স্বীয় অহংকারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী

আহ্বান

শ্রীমমতা ঘোষ

যে ব্যথা আমার অন্তরে কেঁদে মরে
তাহা বুঝে প্রিয় এস তুমি মোর ঘরে।
বিরহ-বেদনা কার কাছে কহি আর ?
দুখের কাহিনী শোন তুমি বারবার।
অন্তরযামী, তোমার দেখা না পাই,
মূরছিয়া আসে প্রাণ মন মোর তাই।
আসিছ না কেন আমারি এ মন্দিরে ?
মোহন যামিনী পোহাইয়া যায় ধীরে।
তোমারি আশায় পথপানে চেয়ে থাকি'
শ্রান্ত হয়েছি—শুকাইয়া এল আঁখি।
তুমি বিনা দাদু বড়ই দুঃখী দীন,
হে সাথী, টানিছ মন মোর রাতি দিন।

পটুয়া সঙ্গীতের আলোচনা

শ্রীনারায়ণ রায় এম্-এ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া "পটুয়া সঙ্গীত" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বাঁকুড়া তথা রাঢ় অঞ্চলের চিত্রকরদিগের রচিত ও গীত এইরূপ পালাগানগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নহি, সুতরাং রাঢ়ের পটুয়া সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ অতি আবশ্যক হইয়া পড়ে।

গ্রন্থটিতে বারটী সংগ্রহ রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত (১-১২); চারটী রামচন্দ্র বিষয়ক (১৩-১৬) ; দুইটী সিন্ধুবধ (১৭, ১৮) ছয়টী হরপার্ব্বতী (১৯-২২,২৮,২৯), দুইটী গৌরাঙ্গ বিষয়ক (২৩ ২৪) দুইটী গোপালন (২৫-২৬)।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সকল পালাগুলির বিষয় বস্তু একই, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পুতনাবধ, বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন, ননীচুরি আবার কোন কোনটিতে কালীয়দমন, দানখণ্ড বা নৌকাখণ্ড ইত্যাদি।

সিন্ধুবধ ও রামচন্দ্র বিষয়ক পালাগুলিতে পাই দশরথ কর্তৃক ভ্রমক্রমে মুনিপুত্র সিন্ধুবধ, রাম অবতার, রামলক্ষ্মণ কর্তৃক তাড়কাবধে যাত্রা, রামের সীতা বিবাহ, পরশুরামের সহিত যুদ্ধ, পিতৃসত্যপালনে রামের বনগমন ; গুহকচণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণ, সূর্পণখার সাজা, মায়ামৃগ, সীতাহরণ ইত্যাদি। অবশ্য সকল পালাগুলিতে সকল অংশ নাই। চারিটি পালাতে পাই আমাদিগের বহু পরিচিত মহাদেব কর্তৃক ভগবতীকে শাঁখাপরান পালা। একটীতে মহাদেবের চাষ ও অপরটীতে মহাদেবের মাছধরা। গৌরাঙ্গবিষয়ক পালা দুইটীতে আছে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের বিবরণ।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পালাগুলিতে শ্রীরাধার সহচরীগণ ও যশোদা ব্যতীত অপর একটী স্ত্রী চরিত্র আমরা পাইতেছি—সেটী বড়াই বুড়ীর চরিত্র। এখানে বড়াই বুড়ী বড় রসিকা। রাধিকার সহিত তিনিও মথুরায় যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছি—শ্রীরাধার দধি দুগ্ধের ভার বহন করিতে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ভার গ্রহণের বিবরণ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে কৃষ্ণের ভার বহনের বৃত্তান্তের সহিত এক মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সত্য নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে রাধার প্রেম লাভের পূর্ব্বেই, তাহার সন্তোষ বিধানের জন্য কৃষ্ণ ভার বহন করিতেছেন। এই পালাগুলির বিবরণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পটুয়া সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেম পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, ভার বহন করিতেছেন মাত্র সেই প্রেমের সম্পর্কে। বড়াই বুড়ীর চিত্রটী এই স্থলে বড় সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভৎর্সনা তাহা বেশ স্নেহ পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভার গ্রহণের পূর্ব্বেই গোপীদিগের বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

গোপীদিগের বস্ত্রহরণ ব্যাপারে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। গোপীদিগের সামান্য অনুনয়েই শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতেছেন, বাহুল্য দোষ কুত্রাপি নাই। ইহার পর দানলীলা—এই দান নৌকায় পার হইবার শুল্ক মাত্র। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বেশ দিমাবী। শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দাবী বড় বেশী—

"সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কাণের সোনা॥"

কিন্তু এই সব সখী কাহারা। আমরা চন্দ্রাবলীর নাম পাইতেছি। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, রাধা ও চন্দ্রাবলী কি পৃথক ?

"রাধিকে বলে ঠাকুর খেয়েছো রাধির কড়ি হয়েছ বিপারী
আজ কেন বলো দীননাথ ব্রজে ভার বইতে নারি।
ভারখানি নামিয়ে বসিল বনমালী

মুখে বসন দিয়ে হাসে চন্দ্রাবলী।" (পৃঃ ২২)

আবার অপর স্থলে—

"অর্দ্ধেক দূরে যেয়ে ঠাকুর বসলেন বনমালী
মুখে বস্ত্র দিয়ে হাসে রাধা-চন্দ্রাবলী।" (পৃঃ ৭)

এই রাধা ও চন্দ্রাবলী কি পৃথক ?

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালাগুলির কুত্রাপি অশ্লীলতা দোষ নাই। বেশ সাধারণ ভাবে, অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভার গ্রহণ বা দান গ্রহণ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মত অসংযমের পরিচয় নাই বা অপ্রাসঙ্গিক কিছু নাই

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে যেরূপ কংসের নিকট নালিশ করিতে যাইবার ভয় কৃষ্ণকে দেখান হইয়াছে, এই পালাগুলিতেও অনুরূপ বর্ণনা পাই বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে। তবে এই স্থলে বস্ত্র ভিক্ষার ভাষা দৃষ্টে মনে হয় তাহা না করিলেও চলিত— "বস্ত্র দাও প্রাণ বন্ধু"—শ্রীকৃষ্ণ ত' এই পালায় গোপীদিগের প্রাণ বন্ধু।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে বৈষ্ণবভাব অথবা ভক্তির নামোল্লেখ নাই, পটুয়া সঙ্গীতের কৃষ্ণলীলায় আমরা তাহা পাইতেছি।

সিন্ধু বধ ও রামচন্দ্র বিষয়ক পালাগুলি কৃত্তিবাসের অনুসরণে রচিত। রামলক্ষ্মণকে তাড়কা বধের জন্য পাঠাবার পূর্ব্বে দশরথ তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া ভরত শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইতেছেন,—এ বর্ণনা কৃত্তিবাসেই পাওয়া যায়।

মহাদেব কর্ত্তৃক ভগবতীকে শাঁখা পরান বা শিবের চাষ বা মাছধরা এগুলি বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিষ, আমাদিগের শিবায়নের অন্তর্ভুক্ত।

এক এক বিষয়ক বিভিন্ন পালাগুলির ভাষার মধ্যে মিল বড় বেশী। এমনকি পঙক্তিগুলিও বহুস্থলে এরূপ হুবহু এক যে, ভিন্ন ব্যক্তির রচনা বলিতে বাধে। পালাগুলির আর একটী বিশেষত্ব আছে। বহু পালার শেষে যমরাজা ও পাপের শাস্তি সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা এক ত বটেই উপরন্তু কথিত মত ভাষাও এক। মনে হয় পালা শেষ করিবার ঐরূপ একটী রীতি চিত্রকরদিগের মধ্যে ছিল।

আরম্ভ করিবারও হয়ত ঐরূপ কোনও একটী রীতি ছিল। উহার পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে, তবে সর্ব্বত্র তাহা অনুসৃত হয় নাই। এই বিশেষ রীতিটী হইতেছে "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়" এই কথা কয়টী পালার পূর্ব্বে বলা (পৃঃ ১, ৪১) এবং এই সঙ্গে শনিকে জয় করার প্রসঙ্গ।

পালাগুলির ভাষায় প্রাদেশিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। মারিলি স্থলে 'মেলি' ভাইয়ে ভাইয়ে স্থলে 'ভেয়ে ভেয়ে' ইত্যাদি রাঢ়ের বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত অপর কয়েকটী বিশেষত্ব নজরে পড়ে যথা স্থলে স্থলে সর্ব্বত্র স্থপল ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুস্থলে 'র' স্থলে 'অ' ও ব্যবহৃত হইয়াছে যথা "অবির পুত্র যম", "রজ পুত্র দশরথ", "রযোধ্যা" ইত্যাদি।

পটুয়া সঙ্গীতের ভাষায় বহুস্থলে সাধারণ বাঙ্গালা হইতে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার কারণ, রাঢ়ের নিম্নশ্রেণীর কথা ভাষাই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা "ভালাই", "কাউরি" ইত্যাদি। পালাগুলি রচিত হইয়াছিল কোন পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা নহে ; প্রথমতঃ ভাষাই তাহার প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ ছন্দের গরমিল। বহুস্থলে ছন্দ নাই। নরকযন্ত্রণা বা যমরাজা কর্ত্তৃক পাপীকে শাস্তিদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

"ঢেকি পেতে যে জন লোককে ধান ভানতে না দেয়
মৃত্যুকালে যমের দূতে ঢেকিতে তার মাথাতে
পাহাড় দেয়" (পৃঃ ৮)

কবি পাপীর তালিকায় যাহাকে ফেলিয়াছেন, তাহা দৃষ্টেও সাধারণ গ্রামালোকের দ্বারা পালাগুলি রচিত হইয়াছিল,— এই ধারণা সমর্থিত হয়। উদ্ধৃত শেষ পঙক্তিতে পাহাড় দেয় অর্থ পাড় দেয়। এই "পাড় দেওয়া" কথা রাঢ়ে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বেশ প্রচলিত।

ভাষা বিচারে গানগুলি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। যে ভাষা আমরা ইহাতে পাইতেছি, রাঢ়ের বর্ত্তমানের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সেই ভাষাই পাইতেছি।

অপর একটী দিক বিচার করিলেও মনে হয় পালাগুলি বেশী প্রাচীন নহে। দত্ত মহাশয় বহুস্থলে দেখাইয়াছেন পালার বহু পঙক্তি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত পুস্তক বা পদের পঙক্তির অনুরূপ। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণ

নিশ্চয়ই এই গ্রাম্য পটুয়াদিগের নিকট হইতে ঐ সকল পঙক্তি ঋন গ্রহণ বা না বলিয়া অপহরণ করেন নাই! ইহারাই বৈষ্ণব কবির পদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলা বরং যুক্তিসঙ্গত।

এগুলি যে, অতি আধুনিক, তাহাও বলিতে পারিনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক এক বিষয়ক বিভিন্ন পালার বিষয় বস্তু ও ভাষায় বড় বেশী মিল। অনেক স্থলে পঙক্তি পর্য্যন্ত একরূপ। এই সকল দৃষ্টে মনে হয় এক এক বিষয়ক পালাগুলি এক এক ব্যক্তির রচিত তবে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সঙ্গীত গীত হইবার ফলে স্থানে স্থানে সামান্য রদবদল হইয়াছে ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সেই আকারে বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে। একই ব্যক্তির রচনা বিভিন্ন ব্যাক্তির নিকট এইরূপে পৌছাইতেও নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগিয়াছে, সেই হিসাবে ইহা প্রাচীন। কিন্তু অতি প্রাচীন ইহাকে বলা চলে না।

দত্ত মহাশয় পুস্তকে পটুয়াদিগের অঙ্কিত কয়েকটী চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন ও ভূমিকায় সেগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; বস্তুতঃ এই সঙ্গীত ও চিত্রগুলি বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ।

শ্রীনারায়ণ রায়

আগামী সংখ্যা হইতে :—

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু লিখিত

'দেশের কথা'

ও

শ্রীযুক্ত নিখিলকৃষ্ণ মিত্র লিখিত

'বিদেশের কথা'

যথাপূর্ব প্রকাশিত হইবে।

বিঃ সঃ

সহরের সাহারায়

শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন, অতি প্রাচীন বাড়ী—
বর্ষা-বসন্তের অনিবার্য্য, আতিথ্যে ঋতু-উৎসবের অদৃশ্য আলপনায়
অঙ্গে হয়েছে অতীতের ছায়াপাত।
দেখোনি ?—মধ্যাহ্নের অলস অবসরে, উত্তর কলকাতার এক গলিতে চলতে,
তোমার দৃষ্টিতে পড়েনি সে বাড়ী ?
নাম-না-জানা শিল্পি লিখে গেছে তার উপর যুগান্তরের পরিচয়!
হাঁ,—সেদিন সেই বিরাটপুরীর দ্বিতলকক্ষে, আঁধ-অন্ধকারের পটভূমিকায় দেখলুম একখানা মুখ
আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্তে চেয়েছিল একখানা ঝলমল মুখ!
ঐ রহস্যপুরীর সঙ্গে হয়েছিল শিশু-কলকাতার প্রথম প্রেম!
আজ জরাজীর্ণ জীবনের প্রান্ত থেকে ও চেয়ে রয়েছে প্রাপ্তযৌবন, ওর দিকে!
কলকাতার যৌবন আজ জেগেছে—আরও দক্ষিণে—বিজাতীয় বনিকসভ্যতার অন্তরালে!
দেখোনি সে বিরহিণীকে ?—চারিদিকের চাকচিক্যময় আবেষ্টনে খাপছাড়া উপস্থিতি ?—
ওর ও'পর দিয়ে বয়ে গেছে হাজারো ঢেউ—
ওর সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টার মাঝে একদিন এসে সাড়া দিয়েছিল রামমোহন রায়ের বিজয়বার্ত্তা;
ওর নিভৃত প্রকোষ্ঠে একদিন আলোচনা হয়েছে ও পাড়ার, ঐ যোড়াসাঁকোর
অতিবিখ্যাত পরিবারের বিনা ও প্রত্যাগত ব্যক্তি বিশেষের স্লেচ্ছপনার;
ওদের কোন এক সুতনু কিশোর হয়ত জয় করে নিয়েছিল এখানকার এক কিশোরীর অন্তরকে!
সেই কিশোরী আজও বেঁচে আছে:
নগরের প্রাণধ্বংসী স্পর্শ বাঁচিয়ে ঐ রহস্যপুরীর গোপনপ্রকোষ্ঠের অন্ধকারে—
শুচিস্মিতা' অসূর্য্যম্পশ্যা চিরকিশোরী আজও বেঁচে আছে।
কাল তাকে স্পর্শ করতে পারেনি—
দেশাচারের গতি রুদ্ধ হয়ে আছে তার পায়ের তলায়!
সেইদিন আমি তাকে দেখলুম্—রহস্যচারিণী সেই বন্দিনীকে!
বিস্মৃতদিনের পথে যেতে, কৌতূহলী মেয়ে নেমে এসেছে আজকের পৃথিবীতে;
কলকাতার সভ্য সুন্দর সমাজের মেয়েরা দাঁড়াতে
পারল না তার পায়ের তলায়!
সেদিনের মধ্যাহ্নের অলস অবহেলায়, সেই নিভৃতচারিণী কিশোরী
যুগান্তরের পর্দা তুলে, দেখে নিল এক ঝলকরূপে বিংশ শতাব্দীর!
আর, জনবিরল পদ-পথের এক নাম-না-জানা পথিককে!

বিজ্ঞানের কতিপয় বিস্ময়কর আবিষ্কার

এফ, রহমান এম, এস-সি

অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ পরশ পাথরের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলেছে। এই জন্যে "আল-কেমিষ্টদের" উদ্ভব হয়েছিল। তারা ইতর ধাতুকে মহামূল্য স্বর্ণে পরিণত করার উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস ব্যর্থতার ইতিহাস। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণ পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছে বলে। যুগযুগব্যাপী সাধনা বৈজ্ঞানিকের শিরে সাফল্যকিরীট অর্জনের পথে নিয়ে চলেছে তাদের। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তারই কিঞ্চিৎ আভাষ দেবার প্রয়াস পাব।

পৃথিবীতে আমরা যে সমুদয় বস্তু দেখি তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—মৌলিক ও যৌগিক। দুই, তিন বা তদধিক মৌলিক পদার্থের (elements) রাসায়নিক সংযোগে একটী যৌগিক পদার্থ (compound) উৎপন্ন হয়। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হল :—

মৌলিক পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। হাইড্রোজেন	১। জল
২। অক্সিজেন	২। নাইট্রিক এসিড
৩। নাইট্রোজেন	৩। অ্যামোনিয়া
৪। স্বর্ণ	৪। দুগ্ধ
৫। রৌপ্য	৫। প্রস্তর
৬। পারদ	৬। কয়লা
৭। অঙ্গার	৭। কাঠ
প্রভৃতি	প্রভৃতি

দু'টী মৌলিকের যোগে একটি যৌগিক—

১। হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = জল (তরল)
গ্যাস

২। হাইড্রোজেন + নাইট্রোজেন = অ্যামোনিয়া (গ্যাস)
গ্যাস

তিনটি মৌলিকের যোগে একটি যৌগিক—

১। হাইড্রোজেন + অক্সিজেন + নাইট্রোজেন = নাইট্রিক এসিড (তরল)।

চারটী মৌলিকের যোগে একটি যৌগিক

১। অঙ্গার + হাইড্রোজেন + অক্সিজেন + নাইট্রোজেন = পিকরিক এসিড।

অদ্যাবধি ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্য থেকে দুই বা তদধিক পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোগেই যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি বিশ্বের যাবতীয় বস্তু বিশ্লেষণ করি তা' হলে ৯২টি ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট পদার্থ পাব। এই গুলোই মৌলিক পদার্থ।

অতীতে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী জলন্ত বাষ্পময় সৌরদেহ-পিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সৌরদেহের আভ্যন্তরীন উত্তাপ অত্যধিক। তবে তার পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ খুব কম হলেও ৬০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই উত্তাপে কোনও পার্থিব পদার্থ কঠিন বা তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে পারে না। সব পদার্থই বাষ্পাকার লাভ করে। এই কারণেই সূর্য্যের দেহ-পিণ্ড যে সকল পদার্থ নিয়ে গঠিত সে সবই বাষ্পাকারে রয়েছে। এককালে পৃথিবীরও সেই অবস্থা ছিল। পৃথিবী সৌরদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাগত তাপ বিকীরণ করতে লাগল। কোন বস্তু অনবরত তাপ বিকীরণ করতে থাকলে তা' ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই কারণে পৃথিবী কালক্রমে এত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাপ বিকীরণের আর একটী ফল এই যে, এতে বিকীরক বস্তু ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সঙ্কোচনের ফলে বস্তুটীর অণু-পরমাণু ঘন সন্নিবিষ্ট হয় এবং বস্তুটী অতি শীতল হলে বায়বীয় অবস্থা থেকে ক্রমশঃ তরল অবস্থা এবং তারপর কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই পৃথিবীও অনুরূপভাবে বায়বীয়

অবস্থা থেকে আংশিক কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। বায়বীয় অবস্থায় থাকাকালে পৃথিবীর বস্তুনিচয় মৌলিক অবস্থায়ই ছিল। তারপর পৃথিবী-দেহের সঙ্কোচনের ফলে বিভিন্ন মৌলিক অণু-পরমাণু মিলিত হয়ে নানা বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। এই কারণেই পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বায়ু, জল, মাটী, পাথর ইত্যাদি নানা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর আমিবা নামক নিকৃষ্ট জীব জড় থেকে কেমন করে জলচর, উভচর, স্থলচর জীবজন্তুর আবির্ভাব এবং তাদের ক্রমপরিণতির ফলে নর-বানর ও নরের উৎপত্তি হয়েছে তা' এক বিরাট ব্যাপার। এই বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) সম্বন্ধে অন্য সময়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে প্রাকৃতিক উপায়ে নানা বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রকৃতিকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিক তাঁর বিজ্ঞানাগারে বসে কাঁচ, পিতল, কাঁসা, এবোনাইট, সেলুলয়েড, রবার, সেলোফেন ইত্যাদি নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিজ্ঞানাগারে এমন কতকগুলি জিনিষ প্রস্তুত করেছেন যা প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যাদির সমকক্ষ হয়েছে। আরও সুবিধার কথা এই যে, এইরূপে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সুলভতর হয়েছে উদাহরণ স্বরূপ নকল রং, নকল রেশম, নকল রং নকল কর্পূর, নকল গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব দ্রব্য রূপে গুণে স্বভাবজাত দ্রব্যের মত হয়েছে।

একমাত্র কয়লা থেকেই যে কত দ্রব্য প্রস্তুত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যিনি কবি তিনি কুৎসিতের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের আভাষ পান, কালোর মধ্যেও আলোর উৎস অনুসন্ধান করেন। তিনি কাক, কোকিল, কেশ বা কাল আঁখির তারায় দেখেছেন সৌন্দর্য্যের বিচিত্রলীলা; আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দিয়েছেন কাল কুৎসিত কয়লার ভেতর কি মহা-সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রয়েছে—অমানিশার অন্ধকারের পশ্চাতে দিনের আলোর আত্মগোপন করার মত!

আজকাল সভ্যজগতের তরুণীরা প্রজাপতির পাখার রংএর যে সব অঙ্গাবরণ ব্যবহার করেন তার রংএর জন্য ঐ কাল কয়লা থেকে। অলক্তক রঞ্জিত চরণা, নখররঞ্জিতা, অধর-রঞ্জক বিলাসিনী তরুণীর যে সৌন্দর্য্য-লালিমা দর্শনে আমরা বিমুগ্ধ হই তা' ঐ কাল কয়লা প্রসাদবৎ। অঙ্গে সুগন্ধি অঙ্গলেপনাদের যখন বসরাই গোলাপের কথা মনে পড়ে যায় কিম্বা ইভনিং ইন প্যারিসের স্মৃতি মনে জাগে তখন কাল কয়লার কথা ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে। কয়লার গ্যাসে আমাদের রাতের অন্ধকার দূর না করলে কিম্বা রান্নার বন্দোবস্ত না করলেও আমাদের ক্ষতি নেই কিন্তু যখন প্রিয়তমা স্বহস্তে পান সেজে আদর করে খেতে দেয় তখন কয়লা থেকে লব্ধ কত্থা না হলে সে পানের স্বাদও হয় না গন্ধও হয় না। রোগাক্রান্ত আমরা যখন শয্যায় এলিয়ে পড়ি তখন যেসব ঔষধ আমাদের পুনর্জীবন এনে দেয় তা ঐ কৃষ্ণাঙ্গ কয়লারই অঙ্গ-নিঃসৃত পীযূষ ধারা।

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির অধিকাংশই কয়লা থেকে উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বলব। প্রথমে জ্বালানী দ্রব্য ও আলোর উৎপত্তির জন্য যে সকল বৃক্ষ, কাঠ বা প্রাণীদেহ নিঃসৃত চর্বি, তৈল ও মোম ব্যবহৃত হয়ে আসছিল কয়লা তার স্থান অধিকার করল। অবশ্য কয়লার উৎপত্তি ভূগর্ভ প্রোথিত বৃক্ষাদি থেকেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শেল-অয়েল (shale oil) এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম এসে প্রাণীদেহ নিঃসৃত তৈলের সাহায্যে আলো জ্বালানো বন্ধ করে দিল। এখন অপরিষ্কৃত পেট্রোলিয়াম থেকে মোটর ও অন্যান্য এঞ্জিনে বহুল ব্যবহৃত পরিষ্কৃত পেট্রোলিয়াম, ভেসলিন, মোম এবং পীচ্ তৈরী হচ্ছে

কয়লা যখন ধাতব কটাহে উত্তপ্ত করা হয় তখন কয়লার গ্যাস ও কোককয়লা ছাড়াও নানা প্রকারের গ্যাস পাত্র সংলগ্ন নল দিয়ে বাইরে আসবার সময় ঠাণ্ডা পেয়ে জমে যায়। তাহাই আলকাতরা। ঐ কুৎসিত আল-কাতরা পাইপের ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতে বলে লোকে তার হাত থেকে উদ্ধার লাভের নানা পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় মনঃনিবেশ করলে। ফলে আলকাতরা থেকে বেঞ্জিন, টলুয়েন, যাইলীন; কার্বলিক এসিড, ন্যাপথালিন, ক্রেজল এবং অ্যানথ্রাসিন ইত্যাদি পাওয়া গেল। যেটা অবশিষ্ট রইল সেটাই পীচ।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম পার্কিন লণ্ডনের রয়াল কলেজ অব কেমিষ্ট্রীর ল্যাবরেটরীতে সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম রং প্রস্তুত করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি Greensford Greenএ একটী ছোট যন্ত্র সাহায্যে ঐ রংটী প্রস্তুত করতে থাকেন। উহাই বেগুণী বর্ণের 'maure' নামে পরিচিত। তারপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের Lyons নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে 'মেজেণ্টা' নামক রং প্রস্তুত হতে লাগল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে Greele and Liebermann নামক জার্ম্মাণ রাসায়নিকদ্বয় পূর্ব্বোল্লিখিত অ্যানথ্রাসিন থেকে কৃত্রিম alizarin নামক রং প্রস্তুত করেন। ইতিপূর্ব্বে এই রং ফ্রান্সের Maddar Plant নামক বৃক্ষের মূল থেকে প্রস্তুত হত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে জার্ম্মানীতে কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত করণ বেশ ভাল ভাবে চলছে। এই সময়েই Von Baeyer কর্ত্তৃক নীলের উপাদান নির্ণয় অনেকের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করল। ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে রং-সম্রাট নীল বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে পুনর্জ্জন্ম লাভ করল। এই নীল থেকেই বহু রং তৈরী হয়েছে। আলকাতরা থেকে রং প্রস্তুতের সাফল্যের ফলে ফ্রান্সের Maddar Plant এবং ভারতের নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

রংএর মত ঔষধও এখন কয়লা থেকে তৈরী হচ্ছে। বর্ত্তমানে কয়লা থেকে নানা প্রকারের রং, ঔষধাদি, রোগ প্রতিশেধক, রোগ নিরোধক সংজ্ঞাপহারক, নেশাদ্রব্য, বিস্ফোরক, এবং রঞ্জন প্রস্তুত হচ্ছে। এই কারণে ঔষধের জন্মে লতাগুল্মাদির চাষ, এবং সুগন্ধির জন্মে নানা ফুলের চাষে যুগান্তর এসেছে।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং বিস্ময়কর তোল রেশমের প্রতিদ্বন্দ্বীর আবিষ্কার। একে 'রেয়ন' বলে। এ সবে মাত্র সেদিনের আবিষ্কার। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফল দূর প্রসারিতা এখনও বলা যায় না। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই আবিষ্কারের ফলে সিল্ক-চাষ তো উঠে যাবেই; চিনির জন্য আঁখের চাষও উঠে যাবে বলে মনে হচ্ছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে Cross and Bevan কর্ত্তৃক "সেলুলোজ" এবং এর "সোডিয়াম সেলুলোজে" রূপান্তরণ এবং একে "কার্বন বাই সালফাইড" সাহায্যে দ্রবনীয় Cellulose Xanthrate নামক পদার্থে রূপান্তরণ রেয়ন-সূত্র (rayon fibre) প্রস্তুতের পথ উন্মুক্ত করে দিল। আবার এই শেষোক্ত পদার্থকে glycerd নামক পদার্থ সাহায্যে "সেলোফেন" নামক সুদৃশ্য, মসৃন কাগজবৎ পদার্থে পরিণত করা যায়। এই সেলোফেন দিয়েই আজকাল প্রসাধন ও অন্যান্য দ্রব্যের বাক্স মুড়িয়ে দেওয়া হয়। যে 'সেলুলোজ' থেকে কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত হচ্ছে তা' বৃক্ষ-কাণ্ড থেকে নেওয়া হয়। আবার এর থেকেই যথেষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজ নামক এক প্রকার মিষ্ট শর্করা পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে করাত দিয়ে কাঠ চিরবার সময় যে কাঠের গুঁড়া পাওয়া যায় তা' থেকে গ্লুকোজ তৈরী হচ্ছে। অচিরেই ইক্ষু, বীট এবং ম্যাপল থেকে শর্করা প্রস্তুত না হয়ে কাঠের গুড়ো থেকে চিনি প্রস্তুত হবে। জেরুজালেমের artichoke থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলোজ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে পাওয়া যায় inulin নামক এক পদার্থ। এর থেকে fructose নামক শর্করা পাওয়া যায় যা গ্লুকোজ থেকে তিনগুণ এবং ইক্ষু শর্করা থেকে দেড়গুণ মিষ্টি। জার্ম্মানীতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে একটী কাষ্ঠ-শর্করা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তক্তা প্রস্তুতের পর গাছের যে ডাল পালা ও পত্রাদি অবশিষ্ট থাকে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। চিনি প্রস্তুতকালে Lignin নামক এক প্রকার waste product পাওয়া যায় যা' থেকে বোতামাদি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। এতদ্ব্যতীত এই পদ্ধতিতে গ্লুকোজও পাওয়া যায়। এই গ্লুকোজ থেকে গ্লিসারিন এবং গ্লিসারিন থেকে নাইট্রোগ্লিসারিন নামক এক প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি কাষ্ঠ থেকে নকল পশম প্রস্তুতের সংবাদ পাওয়া গেছে। কিছুদিন হোল জার্ম্মানীতে এই উদ্দেশ্যে একটী কারখানাও স্থাপিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে ঘৃতের ন্যায় বা মাখনের ন্যায় রূপ ও গুণ বিশিষ্ট কৃত্রিম পদার্থও বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ এই রূপ আরও কত যৌগিক পদার্থ যে পরীক্ষাগারে তৈরী হবার অপেক্ষায় রয়েছে তা' হিসাব করে বলা যায় না।

বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ আরও এক ধাপ উঁচুতে উঠেছেন। তাঁরা এক যৌগিক পদার্থকে (compound) অন্য যৌগিক পদার্থে রূপান্তরণ বা নতুন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত ছাড়া আরও একটি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করেছেন। সেটা এই যে তাঁরা এক মৌলিক পদার্থকে (element) অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান জগতে এটা পরমাশ্চর্য্যকর আবিষ্কার। যে ৯২টী পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোজনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি সেই ৯২টী মৌলিক পদার্থ যদি মাত্র একটি পদার্থ থেকে প্রস্তুত করা যায় তবে ঐ মৌলিক পদার্থটীই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মূল। অর্থাৎ ঐ পদার্থ যদি নিজেরা আয়ত্বে থাকে তবে তা' থেকে ৯২টি মৌলিক পদার্থ প্রস্তুত করে তাদের থেকে লক্ষ লক্ষ বস্তু প্রস্তুত করা সম্ভবপর হবে। মনে করুন অল্প মূল্যের সীসকই সেই পদার্থ। তাহলে সীসক থেকে তাম্র, লৌহ, পারদ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভবপর। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের পরশ-পাথর লাভের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে বলা যায়। একটী মৌলিক পদার্থকে অন্য একটী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে Transmutation বলে।

Transmutation সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করে এ প্রবন্ধের উপসংহার করব। এর পূর্ব্বে মৌলিক পদার্থের গঠনতত্ত্ব জানা প্রয়োজন। যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর (atom) কেন্দ্র ও কক্ষ রয়েছে। যেমন আমাদের পরিচিত সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে সূর্য্য আর নানা কক্ষে আবর্ত্তণ করছে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে কতিপয় প্রোটন ও নিউট্রন এবং বিভিন্ন কক্ষে আবর্ত্তন করছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। পরমাণু কেন্দ্রের নাম Nucleus আর ইলেকট্রন কক্ষের নাম electronic orbiit, হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সরলতম। এর Nucleusএ মাত্র একটী প্রোটন রয়েছে যাকে আবর্ত্তণ করছে একটি ইলেক্ট্রন। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে দু'টো প্রোটন ও দু'টো নিউট্রন আর এদের আবর্ত্তন করছে দু'টো ইলেক্ট্রন। ঠিক এমনি ৯২টি মৌলিক পদার্থ প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনএ গঠিত। এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য আছে তা' নির্ভর করছে তাদের প্রত্যেকের Nucleusএর প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যায় এবং আবর্ত্তণকারী ইলেক্ট্রন সংখ্যার উপর। নিম্নোক্ত উদাহরণে কয়েকটি পরিচিত elementএর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার মূল তথ্য জানা যাবে।

মৌলিক পদার্থ	কেন্দ্রস্থ জড়কণা		কক্ষস্থ ইলেক্ট্রন
	প্রোটিন	নিউট্রন	
১। হাইড্রোজেন	১	০	১
২। হিলিয়াম	২	২	২
৩। স্বর্ণ	৭৯	১১৮	৭৯
৪। পারদ	৮০	১২০	৮০

উপরোক্ত উদাহরণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পারদ পরমাণু থেকে ১টি প্রোটিন, ১টি নিউট্রন এবং একটি ইলেক্ট্রন বের করে দিলেই সেটা স্বর্ণে পরিণত হবে। বস্তুত একটী মৌলিক পদার্থের অন্য একটী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার রহস্যমূল এই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলতে গেলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হবে এই জন্যে এখানেই এর সমাপ্তি করছি। পরবর্ত্তী কোনও সংখ্যায় Transmutation সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল

এফ্ রহমান

হাঁপানীর দৈব ঔষধ



বিলেত দেশটা মাটির (গল্প সংগ্রহ)

রক্তগোলাপ (উপন্যাস)

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত। প্রত্যেকটির মূল্য এক টাকা।

লেখিকা বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা নহেন। তাঁহার রচনার নিজস্ব মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণে তিনি বহুপূর্ব্বেই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনের একান্তে স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছেন। তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গী অতি সুন্দর, এবং তিনি যাহা বলিতে চাহেন তাহা সুন্দর ও সরস করিয়া বলিতে পারেন। কথা সাহিত্য রচনায় এইটিই সর্বাপেক্ষা বড় গুণ।

"বিলেত দেশটা মাটির' নামক পুস্তকে তিনি দুইটি দেশী ও চারিটি বিদেশী গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সব কটি গল্পই মনোহর। তবে তাহার মধ্যে 'রাশিয়ান্ ক্যাট্' ও 'পরিচয়' শীর্ষক গল্প দুইটি সত্যই অপূর্ব্ব, এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ হইতে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ সাহিত্যিক বৃন্দ উক্ত গল্পগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য গল্পগুলিও প্রথম শ্রেণীর!

লেখিকা স্বয়ং বহুকাল ইয়ুরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া ওদেশের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই গল্পগুলি লিখিত। যথাসম্ভব অপক্ষপাত দৃষ্টিতেই লেখিকা ইয়ুরোপীয় সভ্যতাকে বিচার করিয়াছেন,—অন্যায়ভাবে নিন্দা বা স্তুতির চেষ্টা কোথাও করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার কথা এই যে লেখিকার রচনায় স্বীয় অভিজ্ঞতার অযথা জাহিরীপণা কোথাও লক্ষিত হয় না। কথাটা বলা প্রয়োজন এইজন্য যে, আধুনিক কালের কয়েকজন লেখক —তাঁহারা যে একদা ইয়ুরোপ গমন করিয়াছিলেন, এই তথ্যটি—প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে সর্বত্র এমন উৎকট উগ্রতার সহিত প্রচার করিতে ব্যগ্র যে, তাহাতে তাঁহাদের রচনা যে প্রায়ই অপাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, এ খেয়াল থাকে না।

'রক্তগোলাপ' আধুনিক সমাজের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। চরিত্রগুলি বাস্তবিকই মনোহর, এবং তাহাদের চিত্রন প্রণালীতে লেখিকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকার ভাষাও চমৎকার,—আর তাঁহার বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে দিলীপকুমারের অপূর্ব্ব রচনা ভঙ্গীর যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সামান্যই, এবং তাহাতে লেখিকার স্বকীয়তার কিছুমাত্র হানি ঘটে নাই। তা ছাড়া লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন এবং নিজস্ব, এবং এইটিই সবচেয়ে বড় কথা।

মোট কথা বই দু'টি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, এবং এ কথা স্বীকার করিয়া যথার্থ ভাল বইকে ভাল বলিবার যে নিঃসঙ্কোচ নির্ম্মল আনন্দ, তাহা লাভ করিতেছি।

বাংলার পাঠক সাধারণকে বই দু'টি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার এবং সেই হিসাবে মূল্যও আশাতীত সুলভ।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত প্রবেশিকা

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক—সঙ্গীতসুধাকর শ্রীসুধাংশুশেখর বর্ম্মণ, চুচুড়া। মূল্য ১৸৹ টাকা।

সঙ্গীত বিষয়ক এই পুস্তকে ৩৫টি বাঙলা গানের স্বরলিপি আছে। পুস্তকের প্রথম ভাগে স্বর, তাল এবং স্বর সাধন প্রণালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

এই স্বরলিপি পুস্তকটি পরীক্ষা করিয়া আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পুস্তক প্রণেতা অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় একজন শক্তিশালী গায়ক এবং যন্ত্রশিল্পী। তিনি যে একজন সুকবি, তাহার পরিচয় ও তাঁহার রচিত এই পঁয়ত্রিশটি গানের মধ্যে সুস্পষ্ট। সুতরাং হিন্দী গানের স্বরলালিত্য এবং বাঙলা কাব্যের ভাব মাধুর্য্য এই দুইয়ের মিশ্রণে এই গানগুলি সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। গানগুলিতে বিশুদ্ধ রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই পুস্তকটি প্রথম শিক্ষার্থীগণেরও পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মসমর্পণ—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২৯।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

মণিবাবুর এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রসিদ্ধ তপোবন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। যে সময়ে ইহা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হয় তৎকালেই ইহা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রন্থকার ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের যে মিলনের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে তাঁহার আশা ফলবতী হউক ইহা সকলেরই কাম্য। এই গ্রন্থে যে সকল চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহার সবগুলিই সুস্পষ্ট কোথাও কষ্ট কল্পনার ভাব নাই। গ্রন্থখানি সুলিখিত—কথা সাহিত্যিক হিসাবে মণিবাবু যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন ইহা রচনায় তাহা অক্ষুন্নই আছে। গ্রন্থখানি সকলের হাতেই দেওয়া যায়—ইহার নায়ক নায়িকা কিশোর কিশোরী হওয়ায় ইহা কিশোর বয়স্কবালক বালিকাগণেরও পঠনীয় হইয়াছে। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রতন দিঘির জমিদার বধু—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২৯।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

রামপদবাবুর এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার প্রতিটি চরিত্রই মানিক, আলোকনাথ, রেণু, অনীতা, সুরেনবাবু, মহামায়া, সবগুলিই স্বাভাবিকভাবে এবং সুন্দরভাবে চিত্রিত। গ্রন্থকার ইহাতে যে একটি সামাজিক সমস্যার কথা তুলিয়াছেন তাহার সমাধানও সময়োপযোগী হইয়াছে। আজকালকার এই উপন্যাসপ্লাবিত যুগে এই পুস্তকখানি আমাদিগকে প্রকৃতই আনন্দ দিয়াছে। রামপদবাবু সুসাহিত্যিক, কথা সাহিত্য রচনায় তাঁহার বেশ হাত আছে এ গ্রন্থে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সংগঠন—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তি স্থান প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

মতিলাল রায় মহাশয় কর্ম্মী, সংগঠন কর্ম্মে সিদ্ধলব্ধ। তিনি এই পুস্তকে জাতির জীবন গঠনের জন্য সংগঠনের যে নীতি ও দিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভাবিবার কথা অনেক আছে। যাঁহারা জাতীয় সংগঠনের কাজে লিপ্ত আছেন, যাঁহারা জাতীয় সংগঠনের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

রেখা

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

স্যানিটারী ইনেস্পেক্টর সুন্দর সুশ্রী তরুণ যুবক বাঙলার চব্বিশ পরগণার নানাগ্রাম ঘুরিয়া এবারে মল্লিকপুরে আসিয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সরল সুন্দর অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রায় এবং পরোপকার বৃত্তিতে ছোট গ্রামখানিকে যেন একান্ত আপনজন করিয়া লইয়াছে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-ছোক্‌রা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলেরই ইনেস্পেক্টর বাবু।

ঘোড়ায় চড়িয়া সকাল সন্ধ্যায় শীর্ণ-মরা নদীটির তীর প্রান্ত বহিয়া ছুটীয়া চলা---খাঁকির হাফ্‌প্যাণ্ট আর হাফসার্ট পরা সুন্দর তরুণ যুবকটি—শ্রান্তির মাঝেও মুখে মিষ্ট হাসিটি যেন লাগিয়াই আছে।

গ্রামে বন জঙ্গল হইয়াছে—এক পাল ছেলে লইয়া এলো মেলো রুক্ষ চুলে অক্লান্তভাবে বন কাটিতে দেখা যায় ইনেস্পেক্টর বাবুকে। ম্যালেরিয়ার সময় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কুইনাইন বিতরণ--আশ পাশের নালা ডোবায় ক্যারাসিন তৈল ঢালিয়া মশককুল নিবারণের প্রচেষ্টা—রাত্রি জাগিয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে সেবা শুশ্রূষা, ছেলেদের লইয়া ফুটবল খেলা, থিয়েটার করা সর্ব্ববিষয়েই স্যানাটারী ইনেস্পেক্টরকে দেখা যায় পুরোভাগে।

গ্রামের লোকে বলে বড় তপস্যার এবং পুণ্য বলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে এমন একজন কর্ম্মচারি মিলিয়াছে।

কিন্তু ছেলেটি কেমন যেন রহস্যময়—বিশ্ব সংসারকে সে আপনজন করিয়া লইয়াছে, অথচ বিশ্ব সংসারে তাহার সাংসারিক পরিচিতি সকলেরই অবিদিত।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়াছে।

মরা নদীর দাম পরিপূর্ণ কালো জলে দিগন্তের শ্যামল শোভা। অস্তমিত সূর্য্যের খানিকটা রক্তিম আভা দিগন্তের শেষ প্রান্তে মিলিত আকাশের বুকে পরিব্যাপ্ত।

ঘাটের পথ হইতে গ্রাম্য বধূরা সন্তর্পণে পুরুষের দৃষ্টি এড়াইয়া জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে।

অদূরে শোনা গেল খট্‌ খট্‌ ঘোড়ার পদক্ষুরের শব্দ। ঝড়ের গতিতে যেন ছুটিয়া আসিতেছে কোন রাজার দুলাল।

গৃহস্থ বধূরা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া গেল চোখে মুখে তাহাদের উৎসুক কৌতুকের ছায়া! কবি প্রিয়া থাকিলে হয়ত বা গুন্‌ গুন্‌ করিয়া আবৃত্তি করিত—

কোন রাজার দুলাল চলি গেল
মোর ঘরের সমুখ পথে

অস্পষ্ট কণ্ঠে শুধু উচ্চারিত হইল ইনেস্পেক্টর বাবু। ঝির ঝিরে সন্ধ্যার বাতাস ভেদ করিয়া খট্‌ খট শব্দ ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর আরও নিকটতর হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু অকস্মাৎ মৃদু-গুঞ্জনের অন্তরাল হইতে ভীতি-কোলাহল কেমন করিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

গেল-গেল-এই গেল বুঝি ভীতি-উৎকণ্ঠার মধ্যে ত্রস্তে একটি তরুণী বধূ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। আকস্মিক এবং নিমেষের মধ্যেই যেন শান্ত সন্ধ্যার আকাশে রুদ্র কাল বৈশাখ ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জাইয়া উঠিল—শীর্ণ নদীটির বুকে যেন উত্তাল অম্বুরাশি সাপের ফণা বিস্তার করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—কোথা দিয়া কেমন করিয়া না জানি কি হইয়া গেল।

ছেলেটি বাঁচিয়া গেছে।

লাগাম ঘুরাইয়া অশ্বের গণ্ডদেশে আঘাত করিতেই আরোহীসমেত অশ্বটি পাশের ডোবাটিতে লাফ মারিয়াছে। ইনেস্পেক্টর বাবু ঘোড়ার পিঠ হইতে ছিটকাইয়া ওধারে পড়িয়া কপাল কাটিয়া দর দর ধারায় রক্ত স্রোত গড়াইতেছে এবং এতক্ষণে বুঝিবা সংজ্ঞাও হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বধূটি তখন হতভাগা ছেলেটিকে নামাইয়া দিয়া সিক্ত অঞ্চল দিয়া তরুণ ইনেস্পেক্টর বাবুর রক্ত স্রোত মুছাইয়া দিতেছে—দু' একজন সহানুভূতি বশে মুখে চোখে জল ছিটাইয়া দিতেছে।

তার পরের ঘটনা আরও রহস্যময়।

সমস্ত রাত্রির সংজ্ঞাহীনতার পর প্রভাতের প্রথম আলোকে ইনেস্পেক্টর বাবু প্রথম দৃষ্টি মেলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল ইহা তাহার পরিচিত ঘর নয়।

মাটিরদেওয়ালে অসংখ্য ফাটল অন্ধকার মেটে ঘরের একটি তক্তাপোষের পরিচ্ছন্ন শয্যায় সে শুইয়া আছে—পাশে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা একটি নারী তাহার শুশ্রূষায় রত।

তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া কপালের ব্যাণ্ডেজটি ওডিকলোনের জলে আর একবার ভিজাইয়া দিয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা কহিল কোথায় বেশী লেগেছে? মাথায়?—ভয় নেই ডাক্তার বলেছেন দুতিনদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

ইনেস্পেক্টর বাবুর বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল—কে লেখা? আমি এখানে—তোমাদের বাড়ী কেন?

হাসিয়া লেখা বলিল কেন তাতে কি তোমার জাত যাবে? চুপ করে শুয়ে থাকো বেশী কথা বলো না—এঁরা আবার বড় সেকেলে সঙ্কীর্ণ লোক, হতভাগা ছেলেটার জন্যেই তো এই কাণ্ড!

তোমার ছেলেই বুঝি আমার ঘোঁড়ার মুখে এসে পড়েছিল? তার কিছু লাগে নি তো? আমার ঘোঁড়াটী কোথায়।

কয়টি কথাতেই ইনেস্পেক্টর বাবু হাঁফাইয়া উঠিল—বুকের মাঝেও যেন অসহ্য আঘাতের বেদনা!

লেখা মৃদু ভৎর্সনার সুরে কহিল তোমায় না বারণ করছি শেখরদা বেশী কথা বলোনা এখনও তুমি কথা বল্‌তে গেলে হাঁপাচ্ছো, তোমার ঘোঁড়া নিরাপদেই আছে। আমার ছেলেরও কোন আঘাত লাগে নি।

কথার মাঝেই কালো আধা বয়সী একটি পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লেখা উঠিয়া চলিয়া গেল।

এখন কেমন আছেন ইনেস্পেক্টর বাবু?

শেখর বলিল, বুঝতে পারছিনি—মাথায় আর বুকে বোধ হয় আঘাত লেগেছে কিন্তু আমি এখানে কেন? আমায় বাড়ী দিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।

নানা, ওকি কথা এখনই যাবেন কেন? এখানে আপনার কোন অসুবিধেই হবে না। বাড়ীতে আপনার তো কেউ নেই কে, দেখা শোনা করবে? আর আপনি তো আমাদের পর নন এতদিন না হয় পরিচয় ছিল না আপনি ওর ভাই একথা কি আগে জানতুম? লোকটির আকৃতি কুৎসিত হইলেও কথার বেশ বাঁধনি আছে. অন্তরও ভালো।

গরম একবাটি দুধ আনিয়া লেখা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, নাও খেয়ে ফেল, কাল সারারাত কিচ্ছুটি আর মুখে পড়েনি।

কোন প্রতিবাদই টিকিল না। নিঃশব্দে লেখার হাত হইতে দুধটুকু খাইয়া ফেলিতে হইল।

লেখা তাহার স্বামীকে বলিল যাও একবার ডাক্তার কাছে বাবুর, কাল ইন্‌জেকসনের পর থেকে আর কোন ওষুধ পড়েনি।

লেখার স্বামী চলিয়া গেল এবারেও শেখরের কোন আপত্তিই টিকিল না।

লেখা আর শেখর।

লেখা শেখরের চুলগুলি আস্তে আস্তে টানিয়া দিতে লাগিল।

বহুদিন, বহুদিন পরে আবার লেখার করস্পর্শ। ইচ্ছামতীর শান্ত নদী বক্ষে আবার যেন উত্তাল তরঙ্গের আবির্ভাব হইল

প্রশান্ত নীরবতার মাঝে লেখা কহিল আবার কি ভাবছো? মাথায় আঘাত লেগেছে এ অবস্থায় এখন কিছু ভাবা উচিত নয়।

শেখরের রোগক্লিষ্ট মুখে খানিকটা হাসির রেখা খেলিয়া গেল একেই বলে বুঝি ঘটনাচক্র!

ইচ্ছামতীর গাঙের বুকে আবার বুঝি সেই নৌকা ভ্রমণের ছবি নূতন করিয়া অনুভূত হইতে লাগিল।

টাকীতে কয়েকটি দিন জীবনের কোন স্মৃতির অধ্যায়ে বুঝি চাপা পড়িয়া গেছে। সে স্মৃতিকে নূতন করিয়া রং দিয়া আবার টানিয়া আনার সার্থকতা কি ?

কিন্তু মানুষের মন এমনই দুর্ব্বল কোন একটা সূত্র পাইলেই মন হাতড়াইয়া আবার পিছনের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে।

ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় শেখর আবার কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

কয়েকদিনের অক্লান্ত সেবা যত্নে আর চিকিৎসায় শেখর আরোগ্যের পথে ক্রমশঃ আগাইয়া চলিয়াছে। চলিয়া হাঁটিতে না পারিলেও এখন সে উঠিয়া বসিতে পারে।

লেখাকে প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে আবার দেখা গেল শেখরের শয্যাপাশেই এবং দুধের বাটি লইয়া তাহা পান করিবার জন্য ঠিক তেমনই সুরে অনুরোধ জানাইতে।

শেখর বলিল এমনি করে আর কতদিন চলবে ? আর কতদিন এমনি ভাবে তোমাদের বিরক্ত করবো। এইবার আমাকে বাড়ী দিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।

লেখা রাগিয়া কহিল যাবে গো যাবে। চিরদিন তোমায় ধরে রাখার জন্যে এখানে আনা হয়নি সে কথা নিশ্চয়ই তুমি জানো। পয়সাই না হয় আমাদের নেই কিন্তু মনটা অত ছোট নয়, এ অবস্থায় কি করে তোমাকে একলা ছেড়ে দিই বল তো ?

লেখা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিমূঢ় শেখর শুইয়া খোলা জানালা দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

দূরের নিমগাছটাকে বড় যেন এখন করুণ দেখাইতেছে, ঝাকড়া মাথায় তাহার প্রভাতের সূর্য্য !

লেখা দারিদ্র্য রাক্ষুসীর সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া সংসারের শত আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান লেখা আজ কি করুণ, তাহার ফরসা ধব ধবে রং যে পুড়িয়া কালি বর্ণ হইয়া গেছে, কোঁকড়া চুল উত্থিত অনাদরের ছায়া সুন্দর ঢল্ ঢলে মুখখানি শীর্ণ বিবর্ণ, নীল শিরায় শিরায়িত উজ্জ্বল চক্ষু তারকার দীপ্তি নিষ্প্রভ, হৃদয়ে যেন প্রাণের কোন অনুভূতি নাই—যন্ত্রের সামিল এই লেখা।

বনহরিণীর মত চঞ্চল প্রীতিময়ী সে লেখার সহিত এ লেখার যেন কোন মিলই নাই।

শেখর কিন্তু তেমনই আছে তেমনই খেয়ালী আর সৃষ্টি ছাড়া। নীড় বাঁধিয়া সাধারণ জীবন যাপন করিয়া সংসার সুখ উপভোগ করা এ তাহার কল্পনার বাইরে। নীড় তাই আজও সে বাঁধিতে পারে নাই। আজ ও সে নীড়হীন ছন্ন ছাড়া।

জীবনে একদিন সে এক কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মনে বুঝি তাহার রং ধরিয়াছিল, আজীবনের সংস্কার এবং সাধনা বুঝিবা বিচ্যুত হইতে গিয়াছিল, কিন্তু খুব সামলাইয়া লইয়াছে সে।

সে এই লেখাকে কেন্দ্র করিয়াই—সেদিনের সেই কিশোরী তন্বী লেখা।

শেখর শিহরিয়া উঠিল।

সংসারে থাকিলে সেদিনের সেই প্রীতিময়ী লেখাকে এমনই বিশীর্ণা মূর্ত্তিতে দেখিতে হইত এবং তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইত সেই।—

কিন্তু সেদিনের সেই একটি মুহূর্ত্ত শেখরের মনে স্মৃতির উজ্জ্বলতায় আজিও বর্ত্তমান। সে ছবিকে সে কিছুতেই মনের পাতা হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

তখনও তাহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় নাই। মনটি তখন আকাশের সাতরঙা রামধনুর মতনই রঙিন।

টাকীতে বন্ধুর গৃহে অতিথি হইয়া শেখর দেখিল লেখাকে। সুন্দর সুশ্রী চঞ্চলা কিশোরী লেখা। থড়কে ডুরে শাড়ীতে আর বনফুল হারে তাহাকে অপূর্ব্ব মানাইতেছিল। তাহার মিষ্টিগলার গান যেন শেখরকেই আহ্বান জানাইয়াছিল। শেখর গল্প বলিত ভালো। দেশ বিদেশের কাহিনী কয়দিনেই লেখা হইয়াছিল শেখরের একান্ত অনুরাগী শ্রোতা, ভক্ত এবং প্রেমিকা।

তারপর একদিন টাকীর ইচ্ছামতীর গাঙে নৌকা বিহার।

শান্ত গাঙেরজলে অকস্মাৎ কেমন করিয়া উত্তালতা জাগিল। ঢেউএর পর ঢেউ আর জলের গর্জ্জন নৌকা বুঝি বা উল্‌টাইয়া যায়।

শেখরের চোখে ভীতির ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল লেখা তো হাসিয়াই খুন।

তালি দিয়া সে তখন ঢেউগুলিকে যেন আমন্ত্রন জানাইতেছিল এবং সেই কিশোরী বয়সেই শেখরকে ঠাট্টা করিয়াছিল শেখর দা এত ভীতু তুমি ?

শেখরের কণ্ঠ তখন কাঁপিতেছিল—ভয় করে না এই বিশাল নদী নৌকা উলটালে বাঁচবার আর কোন ভরসাই নেই।

লেখার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসির ঝঙ্কার—মরণকে এত ভয় তোমার ? নৌকা ডুবলে কেমন আমরা এক সঙ্গে জলের মাঝে মিলিয়ে যাবো।

একি কাব্যের সময় ? শেখর চটিয়া উঠিয়াছিল। তারপর একটি ঢেউ আসিয়া লাগিতেই নৌকা টলিয়া উঠিল, প্রাণপণ শক্তিতে মাঝিরা তাল সাম্‌লাইল।

উচ্ছ্বসিত লেখা তখন শেখরের ভীতবক্ষে স্থান লইয়াছে। নদীর ওপারে নৌকা ভিড়িল।

দিগন্তের কোলে তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়াছে।

আর কোন ভয় নাই—শেখরের মুখে প্রশান্ত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় লেখাকে দেখাইতেছিল অপূর্ব্ব !

শেখর হাসিয়া বলিল কি সুন্দর তুমি লেখা।

ছাই বলিয়া তাহার গলার ফুলের মালাটি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু কে জানিত সেই ছেঁড়া মালা গাছটি আজ অবেলায় এমনই করিয়াই মনে পড়িবে।

কি প্রয়োজন ছিল আবার লেখার সহিত দেখা হইবার ? যাহা অতীত তাহা বিস্মৃত সেই বিস্মৃতিই ভালো।

শেখর ভুলিয়াছে। নির্ম্মম ভাবে সে লেখাকে মনের পাতা হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

হঠাৎ বাহিরের অস্পষ্ট কলরবে শেখরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

লেখার কণ্ঠস্বর—হ্যাঁ লেখারই কণ্ঠস্বর।

ভিজে কান্নার সুরে লেখা বলিতেছে—তুমি যদি জানতে শেখরদা কত মহৎ!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ তোমার শেখরদা খুব মহৎ আর আমি অতি নীচ। এখন তো সেরে উঠেছে—যেতে চাইছে যেতে দাও না। এত আত্মীয়তা কিসের? আর তা ছাড়া এ'কদিনে আমার খরচাও বড় কম হয় নি।

লেখার স্বামী বলিয়া চলিল আমি ভেবেছিলাম বুঝি তোমার আত্মীয়!

আর শুনিবার প্রবৃত্তি হইল না। সংসার বুঝি এমনই নীচ এমনই সঙ্কীর্ণ!

শয্যা ছাড়িয়া শেখর উঠিয়া দাঁড়াইল। শরীর টলিতেছে তবুও তাহাকে যাইতে হইবে।

অসুস্থ শেখর সেই দিনই বিদায় নিল।

দশটি টাকার নোট একখানি লেখার স্বামীর হাতে দিয়া শেখর কৃতজ্ঞতা জানাইল।

বিদায়ের সময় লেখাকে দেখা যায় নাই।

কিছুদিন পরে সবিস্ময়ে সকলেই দেখিল ইনেস্পেক্টর বাবু আর নাই।

রুদ্ধ ঘরে তালা ঝুলিতেছে।

কেহ বুঝিল না কেহ জানিল না কেনই বা সে আসিয়াছিল কেনই বা সে এমনি করিয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের পথে নদীর ধারে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় লেখা বুঝি কেবল উৎকর্ণ হইয়া শোনে—অদূরে কোন ঘোড়ার পদশব্দ শোনা যাইতেছে কিনা!

কিংবা শান্তশীর্ণ নদীটির স্রোতে ইচ্ছামতীর সেদিনের সেই চঞ্চলতা জাগিয়াছে কি না!

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য





ইউরোপীয় যুদ্ধ—

প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল ইউরোপের ভীষণ সমরাণল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জার্মাণী ও রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড অধিকৃত এবং বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। স্বাধীন পোল্যাণ্ডের উপস্থিত ত কোনো অস্তিত্ব নাই। যুদ্ধ যদি চলে এবং তাহার শেষ ফল অনুযায়ী যদি অবস্থার রদ বদল হয় তাহা হইলে স্বাধীন পোল্যাণ্ড পুনরায় আবির্ভূত হইবে কি-না তাহা বলা কঠিন।

এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপে হইলেও পরোক্ষভাবে সমস্ত পৃথিবী ইহার সহিত অল্পাধিক জড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধ যদি এখনি শেষ না হইয়া আরো কিছুকাল চলে তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে একটা পরিবর্তিতরূপ গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পরিবর্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ কিপ্রকার রূপ গ্রহণ করিবে তাহা শুধু ভারতভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্তৃক যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আমাদের মতে কংগ্রেসের প্রস্তাব অতিশয় সমীচীন এবং তাহা যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত এবং গৃহীত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি অধিবাসীর ধনবল এবং বাহুবল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে এক প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। পোল্যাণ্ডের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত এই যুদ্ধে নিবিড়ভাবে যোগদান করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

গত ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। স্যার লাল-গোপাল মুখোপাধ্যায় কে-টি, এই সম্মেলনের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মূল সভাপতি এবং অন্যান্য অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থিত করেন। এই সম্মেলনে মূল সভাপতির কর্তব্য আমাকে সম্পাদন করিতে হইয়াছিল।

এলাহাবাদে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এই প্রথম। সেইজন্য বিশেষ সমারোহ এবং উৎসাহের সহিত ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দুইদিনে তিনটি কালের সভার সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়। বহু সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি কয়েকটি ল্যান্‌-টার্ন সহযোগে পঠিত হইয়াছিল, আনন্দের ব্যবস্থাও যথেষ্ট ছিল। দুইদিন এই সাহিত্য উৎসব লইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা এলাহাবাদবাসী বাঙালী প্রচুর জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্রথম প্রবন্ধটি এলাহাবাদ বিশ্ব-

বদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের শীর্ষস্থানে অবস্থিত আছেন। অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণা এবং গভীর পাণ্ডিত্যের জন্ত ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

আগামী কার্তিক মাসে আমরা প্রয়াগ সাহিত্য সম্মেলনের সম্পূর্ণ বিবৃতি ও সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও গৃহীত আলোকচিত্রাদি প্রকাশিত করিব।

যাঁহাদের বিশেষ উৎসাহে ও পরিশ্রমের জন্ত এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত্র সুলেখক শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় তাঁহাদের অন্যতম।

হিন্দুস্থান কেমিক্যাল এণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কস

উক্ত কোম্পানীর প্রস্তুত কেশলিন হেয়ার অয়েল ও নিভালিন বি পুষ্পনির্যাস আমরা উপহার পাইয়াছি। এই দুইটি প্রসাধন দ্রব্যই ব্যবহার করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যাঁহারা এই দুইটি সামগ্রী ব্যবহার করিবেন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন একথা নিশ্চয় বলা যায়।

শারদীয়া পুজার ছুটি :—

আগামী শারদীয়া ছুটি উপলক্ষে বিচিত্রা কার্যালয় ১৮ই অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত চিঠিপত্রাদির উত্তর ছুটির পর দেওয়া হইবে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙলা শিক্ষা :—

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝার পুত্র অধ্যাপক ডক্টর অমরনাথ ঝা এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের বর্তমান ভাইস-চেন্সলার। ইনি পিতার ন্যায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং সহৃদয়তার জন্ত অতিশয় জনপ্রিয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্ত ইনি সতপ্রবৃত্ত হইয়া একটি বাঙলা বিভাগ প্রবর্তিত করিয়াছেন। একবৎসর চালাইয়া যদি উৎসাহজনক ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট হয় তাহা হইলে এই বিভাগটীকে স্থায়ী করা হইবে। উপস্থিত এই বিভাগে ইহারই মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ আড়াই শত ছাত্র হইয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটী বাঙালী ছাত্র ভিন্ন নিম্নশ্রেণীগুলিতে সকল ছাত্রই অবাঙালী। যুক্তপ্রদেশবাসী কয়েকজন মুসলমান ছাত্র আছেন। সু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুকমল দাশগুপ্ত এম্-এ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপস্থিত ছাত্রগণের নিকট হইতে কোনো বেতন লওয়া হইতেছে না। বাঙলা ভাষার প্রতি ডক্টর ঝার এই শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ যুক্ত প্রদেশীয় বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করিয়াছে। এই বাঙলা বিভাগটী যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বিশ্ববিস্তালয়ের একটী স্থায়ী বিভাগে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে স্থানীয় বাঙালী মাত্রেরই বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়।

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য :—

তরুণ সাহিত্যের লেখক কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তিনি সংবাদপত্রাদিতে নানা বিষয়ে রচনা প্রকাশিত করিতেন। টুকটুকে রামায়ণ, ছেলেখেলা, পুষ্পাঞ্জলি, শিশুরঞ্জন রামায়ণ প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী বৎসরের বেশী হইয়াছিল।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৩ দিন কলিকাতা সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে বিশ্ববিস্তালয়ে আশুতোষ হলে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত

প্রফুল্লকুমার সরকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন ও চার দিনের উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ করেন। প্রথম দিন—উদ্বোধক ভাইস-চেন্সলার খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক, সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। দ্বিতীয় দিন—উদ্বোধক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সভানেত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। তৃতীয় দিন—উদ্বোধক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু। চতুর্থ দিন—উদ্বোধক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। খগেন্দ্র বাবুর অভিভাষণটি আমরা গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি।

আমরা এই সম্মিলনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পরলোকগত অভেদানন্দ স্বামী—

কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক অভেদানন্দ স্বামী সম্প্রতি পরোলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ মন্ত্র শিষ্যের তিরোভাব ঘটিল। অভেদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করিয়া বেদান্ত মঠ প্রচার করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে যে কয়েকজন অতি উচ্চশ্রেণীর মনিষী আছেন তাঁহার মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ একজন ছিলেন।

নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি উনিশ শ' সাত সালে স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'গস্‌পেল অফ রামকৃষ্ণ' নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি স্বামীজী সেই গ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া 'দি মেময়ার্স অফ রামকৃষ্ণ' নামকরণ করিয়া প্রকাশিত করাইয়াছিলেন। ইনি সব শুদ্ধ ২৫।২৬খানি পুস্তকের রচয়িতা। স্বামী অভেদানন্দজীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলা দেশের ধর্ম জগতের যে ক্ষতি হইল তাহার পরিমাণ অল্প নহে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিচিত্রা

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪৬ | ৪র্থ সংখ্যা

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এম-এ, পি-এইচ-ডি

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্ম্মিষ্ঠা (১৮৫৯) বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। খুব সম্ভব তাঁহারই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০—১৮৭৭) নাটক রচনায় হাত দিলেন। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে যে পন্থা তিনি অনুসরণ করিলেন তাহা মধুসূদনের পন্থা হইতে পৃথক। পৌরাণিক আখ্যায়িকার বদলে দেশের সমসাময়িক অবস্থা হইল তাঁহার নাটকীয় কথা বস্তুর ভিত্তি। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষতঃ নদীয়া ও যশোহরে ইংরেজ নীলকরগণ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চাষীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া নীলের চাষ করাইতে ছিল তাহারই চিত্র দেশবাসীর সমক্ষে ধরিবার জন্ত তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করিলেন। এই নাটকের আখ্যান ভাগ নিম্নলিখিত রূপ :—

রোগ (Rogue) ও উড্ (Wood) নামক ইংরেজ-নীলকরদ্বয় স্বরপুর গ্রামের কয়েকজন চাষীকে নীল চাষ করাইবার জন্য জুলুম করিলে ঐ গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক গোলোক বসু তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া উক্ত সাহেব দ্বয়ের শত্রু হইয়াছিলেন। এই সাহেবেরা কেবল নীল চাষ করাইবার জন্য জুলুম করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। প্রায়ই তাহারা দরিদ্র ও অসহায় কৃষকগণের স্ত্রীকন্যাগণকে ছলে বলে কুঠিতে আনাইয়া নিজ দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। গোলোক বসুর প্রতিবেশী রাইচরণের গর্ভবতী কন্যা ক্ষেত্রমণিকে একদিন রোগ সাহেবের লোকজন আসিয়া তাহার কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গেল।

কুঠিতে আনীত ক্ষেত্রমণি সাহেবের বশ মানিতেছে না দেখিয়া উক্ত নরপশু তাহার উদরে ঘুসী মারিয়াছে, এমন সময় গোলোক বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধব প্রতিবেশী মুসলমান চাষী তোরাপকে সঙ্গে লইয়া জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্ষেত্রমণির অবস্থা দর্শনে ক্রুদ্ধ তোরাপ সাহেবকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বুকের উপর বজ্রসম হাটুর গুঁতো মারিতে লাগিল এবং সেই অবসরে নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করিল। কিন্তু সাহেবের ঘুসীর ফলে নিদারুণ আহত ক্ষেত্রমণির প্রাণ রক্ষা হইল না।

এ সকল ঘটনার ফলে নীলকরদ্বয়ের সহিত গোলোক বসুর শত্রুতা বাড়িয়া গেল। তাহাদের চক্রান্তে মিথ্যা মোকদ্দমার আসামী হইয়া উহার কারাদণ্ড হইল। জেলে জাতিনাশের ভয়ে নিষ্ঠাবান্ গোলোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। সেই শোকের আতিশয্যে তাঁহার পত্নী হইলেন ঘোর উন্মাদ এবং উন্মত্ত অবস্থায় তিনি নিজ অতি আদরের পুত্রবধূকে করিলেন হত্যা কিন্তু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার অনুতাপের ও শোকের সীমা রহিল না।

'নীলদর্পণ' বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইল। এই অনুবাদে স্বজাতীয়দের

নিন্দাবাদ আবিষ্কার করিয়া এ দেশের ইংরেজ বণিককুল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের চেষ্টায় উক্ত অনুবাদের প্রকাশক অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই সকল কারণে 'নীলদর্পণ' অচিরে দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিল। মুদ্রিত গ্রন্থে নাট্যকারের নাম না থাকিলেও দেশের লোক এ বিষয়ে অজ্ঞ রহিল না। কিন্তু সমসাময়িক অবস্থার প্রভাবে নীলদর্পণের বিশেষ খ্যাতিলাভ ঘটিলেও নাটক হিসাবে উহা উচ্চশ্রেণীর নহে। গ্রন্থকার 'ট্র্যাজিডি' রচনা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কারণ উহার কথাবস্তু ঐ জাতীয় নাটকের পক্ষে অনুপযুক্ত। এতদ্ভিন্ন হৃদয়াবেগের উপর অতি মাত্রায় নির্ভর করিয়াও গ্রন্থকার নাটকখানিতে ট্র্যাজিডি-সুলভ গাম্ভীর্য্য সৃষ্টির ব্যাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু নীলদর্পণ যখন লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল তখন তজ্জাতীয় নাটক এদেশে সবেমাত্র প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন নাটক এদেশে ছিল না, তাই উল্লিখিত ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা সহজেই লোকের মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। লোক মুগ্ধ হইলেও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দীনবন্ধু নিজ রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার পরবর্ত্তী কালের রচনার মধ্যে এই শ্রেণীর বিষাদাত্মক নাটক একখানিও মিলে না। নীলদর্পণের করুণ রস ছাড়িয়া তিনি একেবারে প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টির দিকে মন দিলেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্যতাও লাভ করিলেন বহুল পরিমাণে।

নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক। এই মিলনান্ত নাটকখানি আধুনিক কালের পাঠকের নিকট খুব চিত্তাকর্ষক বিবেচিত না হইলেও কোন প্রাচীনপন্থী সমালোচকের মতে উহা 'একটি উৎকৃষ্ট নাটক'। 'লীলাবতী' (১৮৬৭) তাহার কিছুকাল পরে রচিত। এই সামাজিক নাটকখানিতে দীনবন্ধু প্রসঙ্গক্রমে কৌলীন্য প্রথা ও মদ্যপানাদির কুফল বর্ণনা করিয়াছেন এবং নবীন তপস্বিনীর মত ইহাতেও তিনি পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহার চতুর্থ ও সর্ব্বশেষ নাটক 'কমলে-কামিনীর' সহিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বর্ণিত কমলে-কামিনীর কোন সম্পর্ক নাই। উহার নায়ক নায়িকাদি মণিপুর ও ব্রহ্মের রাজবংশীয় বলিয়া কল্পিত। এই নাটকের কোন বিশেষত্ব নাই।

উল্লিখিত নাটক চতুষ্টয় ব্যতীত দীনবন্ধু তিনখানি প্রহসন রচনা করেন। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নামক প্রহসনে তিনি জনৈক বৃদ্ধব্রাহ্মণের বিবাহস্পৃহা লইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। 'সধবার একাদশী'তে মদ্যপায়ীর চরিত্র অঙ্কন প্রসঙ্গে হাস্যরস ফুটিয়াছে। 'জামাই বারিক' নামক প্রহসনের উপাখ্যানটি বড়ই কৌতুকপ্রদ। ইহা নিম্নলিখিতরূপ :—

এক ধনাঢ্য কায়স্থ জমিদার বড় বড় কুলীন সন্তানগণকে কন্যাদান করিয়া স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা স্ত্রীর দেখা পাইত না। শ্বশুর তাহাদের সকলের একত্র অবস্থানের জন্য বাড়ীটিতে একটি প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহাই 'জামাই বারিক' বা 'জামাই barrack' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঘর জামাইয়ের দল এইখানে থাকিয়া মদ গাঁজা আদি নেশায় ও নানা অকিঞ্চিৎকর আমোদে সময় নষ্ট করিত, এবং জমিদারগৃহিণীর পাশ পাইলে দরওয়ানকে তাহা দেখাইয়া তবে অন্দর মহলে নিজ নিজ স্ত্রীর নিকট যাইতে পারিত। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত ঘরজামাইকুলকে তাহাদের স্ত্রীগণ নিতান্ত কৃপার চক্ষে দেখিত। অভয়কুমার নামে ঐ জামাতাদের একজন একদা স্ত্রীর তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বন্ধু পদ্মলোচন নিজ দুই স্ত্রীর নিত্য কলহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্থির হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়াছেন। অভয় তাঁহারই সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়া অচিরে বৈষ্ণব হইলেন। এদিকে স্বামীবিরহিত অভয়ের স্ত্রী নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া স্বামীর অন্বেষণে বৃন্দাবন গেলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল তদীয় পিতৃকুলের বিশ্বাসভাজন এক দম্পতি। তাহাদের সহায়তায় বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে অভয়ের স্ত্রী তাঁহারই সহিত কণ্ঠি বদল করিলেন। এই সকল ঘটনার রহস্য প্রকাশিত হইয়া প্রহসন পরিসমাপ্ত হয়।

এই তিনখানি প্রহসনই হাস্যরস প্রাচুর্য্যের জন্য বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল। উল্লিখিত প্রহসননিচয় ছাড়া দীনবন্ধু 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র প্রহসন

রচনা করিয়াছিলেন। যে কয়জন স্বজাতীদ্রোহী বাঙালী স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ইংরাজী নীলদর্পণের প্রকাশক মহোদয়ের শাস্তিদাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলসের অভিনন্দনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছিল।

বিষাদাত্মক নাটক নীলদর্পণের কথা বাদ দিলে প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই দীনবন্ধু মিত্রের খ্যাতি। তাঁহার নবীন তপস্বিনী এবং লীলাবতী নাটকেও তিনি প্রচুর হাস্য-রসের অবতারণা করিয়াছেন। বোধ হয় অদ্য পর্য্যন্ত আবির্ভূত বাঙালী নাট্যকারগণের মধ্যে দীনবন্ধু যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহার মূলেও তদীয় হাস্যসৃষ্টি-কুশলতা। চরিত্র চিত্রণেও তিনি বেশ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষমতা প্রায়ই প্রকটিত হইয়াছে মধ্যম বা নিম্ন শ্রেণীর পাত্র পাত্রীর বেলায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আদুরী, তোরাপ, রাজীব, কাঞ্চন, নদেরচাঁদ, নিমচাঁদ, ঘটিরাম ডেপুটি ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে উচ্চশ্রেণীর পাত্র পাত্রীর চরিত্র অঙ্কনে দীনবন্ধু তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যথা, গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্তা বয়ঃস্থা কুমারী লীলাবতীকে তিনি যে ভাবে নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন বা যে কথা তাহার মুখে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা মোটেই স্বাভাবিক হয় নাই। কামিনী, ললিত, এবং বিজয় আদির চরিত্র চিত্রণেও দীনবন্ধুর উল্লিখিত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়াও তাঁহার নাটকাদিতে অন্যান্য দোষ রহিয়াছে; যথা, তিনি নীল দর্পণ নাটকে নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর মুখে সাধুভাষা যোজনা-দ্বারা এবং কতিপয়স্থলে নায়ক-নায়িকার মুখে পদ্যছন্দের দীর্ঘ বক্তৃতা সন্নিবেশ করিয়া রসভঙ্গ করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর নাটকের মুখ্য দোষ অশ্লীলতা। কতিপয় নায়ক নায়িকার চরিত্র তিনি যথাযথ ভাবে (realistically) অঙ্কিত করিতে গিয়া তাহাদের মুখে এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা গুরুজনবর্গের সঙ্গে একত্রে বসিয়া শ্রবণ করা লজ্জাজনক বিবেচিত হইবে। সেকালের রুচিকে এজন্যে দায়ী করিতে পারিলেও দীনবন্ধুর নিজ দায়িত্ব তাহাতে বিশেষ লঘু হয় না। তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্য যদি আরো উচ্চশ্রেণীর হইত তবে তিনি অশ্লীলতা পরিহার করিয়াও হাস্য রস সৃষ্টি করিতে পারিতেন। নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরুচি সম্পন্ন হাস্য রসাত্মক রচনা দুর্লভ নহে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর হাস্য-রস স্থূলবুদ্ধি প্রাকৃত জনের বোধগম্য নহে। তাহাদের জন্য চাই মোটা রকমের ভাঁড়ামি শ্রেণীর রসিকতা। দীনবন্ধুর রচনায় অশ্লীলতার জন্য অংশতঃ তাঁহার নাটকের তৎকালীন দর্শকেরাই যে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার রচনায় যে দোষই থাকুক না কেন পরবর্ত্তী যুগের রঙ্গ-মঞ্চাশ্রিত নাট্যকারগণের উপর তাঁহার প্রভাব নগণ্য নহে। এই হিসাবে দীনবন্ধু একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

মনোমোহন ঘোষ

বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

তিনটী বস্তু মানুষের নিতান্ত আবশ্যক—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। অন্নাভাবে জীবন ধারণ হয় না, বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ হয় না এবং বাসস্থানাভাবে শীত, আতপ ও বর্ষা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। আদিম অবস্থায় স্বীয় প্রকৃতির উপযোগী যে-সে খাদ্য পাইলেই, যাহা-কিছু দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিতে পারিলেই এবং যেখানে-সেখানে একটু আশ্রয় পাইলেই মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিত। এই সামান্য সামান্য অভাব মোচন করাও তাহার পক্ষে সব সময় সম্ভব ছিল না—অনেক চেষ্টা দ্বারা, অনেক বিপদের মুখে পড়িয়া তাহাকে স্বীয় অভাব পূরণ করিতে হইত। প্রথম প্রথম সে তাহার শারীরিক অভাবগুলি দূর করাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিত। কিন্তু ক্রমশঃ সে শুধু তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিল না—শুধু আবশ্যক বস্তুতেই তাহার রুচি সীমাবদ্ধ রহিল না। সে পূর্বাপেক্ষা ভাল খাদ্য দিয়া তাহার রসনার তৃপ্তি-সাধন করিতে, এবং ভাল আচ্ছাদনের দ্বারা তাহার দেহ সজ্জিত করিতে, অভিলাষী হইল। অধিক আরাম-প্রদ বাসভবন ভিন্ন সামান্য কুটিরে আর তাহার মন উঠে না। ভাবপ্রবণতা তাহাকে অধিকার করিতে লাগিল। উন্নততর জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন হইল এবং সেই সকল উপকরণ উদ্ভাবন ও নির্মাণ করিবার জন্য তাহার মস্তিষ্ককে খাটাইতে হইল। এই মস্তিষ্ক-চালনা দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমিক বিকাশ হইতে লাগিল এবং নূতন নূতন আরামের দ্রব্য উদ্ভাবিত ও উৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু উপভোগ-প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য অধিকতর আয়েশের বস্তুর জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল। পুরাতন দ্রব্যে সে বীতরাগ, এবং অনাবশ্যক নূতন দ্রব্যের জন্য লালায়িত হইতে লাগিল। মনুষ্য-সমাজে অসন্তোষ দেখা দিল। এ সমস্তই ভাব বা হৃদয়ের আবেগের কাজ। অবাস্তব ভাব হইতে বাস্তব অভাব, অভাব হইতে অসন্তোষ, অসন্তোষ হইতে উদ্যম এবং উদ্যম হইতে মানব-সভ্যতা। সুতরাং সভ্যতার মূলে ভাবের প্রভাব।

মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া এবং কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়াও তো বাঁচিয়া থাকা যায়। তবে কেন লোকে পোলাও, কালিয়া, সন্দেশ, রাবড়ীর জন্য লালায়িত? তবে কেন লোকে আদ্ধি, মলমল, তসর, গরদ, কারুকার্যময় বেনারসী শাড়ী ও কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র? তবে কেন লোকে বাসের জন্য মর্মর-মণ্ডিত বৃহদায়তন দ্বিতল, ত্রিতল, চতুস্তল অট্টালিকা নির্মাণ করায়? অনাবশ্যক দ্রব্যে মানুষের এত রুচি কেন? অনেকে বলিবেন, অতি দূষণীয় বিলাসিতাপ্রবণতাই ইহার কারণ। কিন্তু উপভোগ-প্রবৃত্তিরই অপর নাম বিলাসিতা। সাধারণ বস্তু যখন মনকে সন্তোষ দেয় না, তখন উৎকৃষ্টতর বস্তু দিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন করার আকাঙ্ক্ষা উদ্‌বুদ্ধ হয়। আনন্দ পাইবার জন্যই এই আকাঙ্ক্ষা। আনন্দ বাস্তব পদার্থ নয়—উহা একটী ভাব মাত্র।

কতকগুলি বস্তুকে আবশ্যক এবং কতকগুলি বস্তুকে অনাবশ্যক বলিয়া ধরা হয়। যে সকল বস্তু আমাদের কোন কাজে লাগে না, তাহারাই অনাবশ্যক। সকলেই অনাবশ্যক বস্তুকে ছাঁটিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী। কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তু আবশ্যক এবং কোন্ কোন্ বস্তু অনাবশ্যক তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এমন অনেক বস্তু আছে যাহা সাধারণতঃ অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা আবশ্যক। কতকগুলি কাজ অনর্থক বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। জীবজন্তুর নিঃশ্বাস-বায়ু উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। আবার গাছপালা দ্বারা দিবাভাগে

পরিত্যক্ত বায়ু জীবদেহের কল্যাণকর। ডাল, তরকারী ও ফলের খোসা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু গরু, ছাগল ইত্যাদি পশুর উহা উপাদেয় খাদ্য। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই সে অনেক বস্তুকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ভাবে। জড়ের সহিত জড়ের এবং জড়ের সহিত জীবের সম্বন্ধের অনুসন্ধানে বিজ্ঞান নিযুক্ত আছে। একদিন এমন আসিবে, যখন বিশ্বের কোনো বস্তু বা কার্যই অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

যাঁহারা তাপস-জীবন-পথের পথিক, তাঁহারা কঠোর তপঃসাধনের নিমিত্ত সংসারের যাবতীয় বস্তু ও কর্ম পরিহার করেন, এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম উড়াইয়া দিয়া মানুষকে জড়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পরামর্শ দেন। তাঁহারা বলেন যে, জীবাত্মার পক্ষে বাহিরের কোন দ্রব্যই প্রয়োজনীয় নয়। জড়ের অধীনতা জীবাত্মার পক্ষে ত্যাজ্য। তপস্বীদের পক্ষে যে সকল কার্য করা প্রয়োজনীয়, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। মানুষকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি সম্পর্কীয় সহস্র অত্যাচার সহ্য করিতে হয় সত্য, কিন্তু জড়ের নিকট হইতে ভয়ে তপোবনে পলায়ন করিয়া নিজের মুক্তি-সাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে পারিলে তো আরও ভাল হয়। বিজ্ঞান সর্বসাধারণের জন্য তাহাই করিয়া দিতেছে। অতএব মনুষ্যজাতির পক্ষে স্থায়িরূপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে তৎপূর্বে তাহার বিজ্ঞানানুশীলন নিতান্ত আবশ্যক।

এই ক্রমবিকাশমান সংসারকে অধিকতর আনন্দময় করিবার প্রবৃত্তি মনুষ্য জাতির মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা পরস্পরের সহিত একটি প্রীতির বন্ধন স্থাপনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইহার নাম সমাজ। কেবল জড়ের সহিত মানবের সম্বন্ধ-স্থাপন ও তাহার উন্নতি বিধানই মানবের একমাত্র লক্ষ্য থাকিল না, কেন না বিজ্ঞানে কেবল শুষ্ক জড় প্রকৃতির গুণাগুণ লইয়া কারবার—স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, স্বার্থবিসর্জন, করুণা প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তির সেখানে স্থান নাই। অথচ জীবনকে মধুর ও উপভোগ্য করিতে হইলে এই কোমল বৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারা যে ধরাতলকে নন্দন-কাননে পরিণত করে। যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া আর সমস্ত দূর করিয়া দিতে হয়, তবে সমাজের কাজ, গৃহস্থ-জীবনের কাজ কি করিয়া চলিবে?

আবশ্যক বস্তু উৎপাদনে নারীর দান অধিক না হইলেও জগতে নারীজাতি নগণ্য নয়—গৃহস্থালীতে তাহার স্থান অতি উচ্চ। শত বাধার মধ্যেও কত মধুর করিয়া, কত শান্তভাবে, কত ধৈর্যের সহিত সে সংসারতরী চালায়—কত ব্রীড়ার সহিত সে পাদবিক্ষেপ করে, কত বিনয়ের সহিত সে কথা কয়, কত মিষ্ট করিয়া সে হাসে, কত মমতার সহিত সে প্রত্যেক কর্মে প্রবৃত্ত হয়! প্রকৃতি তাহাকে কোমলে ও মধুরে মিশাইয়া গড়িয়াছে। সেই স্বাভাবিক কোমলতা ও মাধুর্য রক্ষা করা তাহার কর্তব্য। বেশ-বিন্যাসে সামান্য মনোযোগ দিতে সে বাধ্য। পারিপাট্যের জ্ঞান না থাকিলে কি সে গৃহস্থালীকে এত পরিপাটী করিয়া গুছাইতে এবং আমাদের মাতার কাজ ও স্ত্রীর কাজ এত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিত? সে উদাসীন থাকিলে অসহায় সন্তানের পালন ও নিরুপায় পুরুষের সন্তোষ-বিধান কে করিত? গৃহস্থাশ্রমের চালনায় বাস্তব অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই অধিক।

বিজ্ঞান ও দর্শন যুক্তি-তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শুধু যুক্তি-তর্কের দ্বারা সংসারের কাজ চলে না। বুদ্ধির জগৎ ছাড়া আরও একটি জগৎ আছে—সেটী হৃদয়ের জগৎ, ভাবের জগৎ। সংসারে যুক্তি অপেক্ষা ভাবের গুরুত্ব অধিক। কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, স্নেহ, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদির সম্পর্ক ভাবের সহিত, এবং চিন্তা, যুক্তি, স্মৃতি, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির সম্পর্ক বুদ্ধির সহিত।

ভাব হইতেই সৌন্দর্যাদি মধুর অনুভূতির উৎপত্তি ও সুকুমার বৃত্তি সমূহের সৃষ্টি হয়, এবং জীবনে সুখের ধারা প্রবাহিত হয়। এই বিশ্ব সৌন্দর্যের একটি বিশাল সাগর। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদি শিল্পী এই মহার্ণব হইতে নানা রত্ন উদ্ধার করেন এবং স্বকীয় অন্তরস্থ ভাবের প্রয়োগ দ্বারা সংগৃহীত রত্নসমূহের সংস্কার করিয়া আমাদের সম্মুখে

উপস্থাপিত করেন। তাঁহাদের সৌন্দর্যে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সৌন্দর্যের উপলব্ধি করিয়া কবি ভাষা দ্বারা, চিত্রকর আলেখ্য দ্বারা, ভাস্কর মর্মর-মূর্তি দ্বারা, গায়ক সঙ্গীত-লহরী দ্বারা, নর্তক শারীরিক গতি ও ভঙ্গী দ্বারা স্ব স্ব শক্তি অনুসারে বিশ্বের অনির্বচনীয় ও অক্ষয় সৌন্দর্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হন এবং জনসাধারণকে তাঁহাদের আনন্দের ভাগ দিয়া কৃতার্থ করেন।

আবার কখনো বা তাঁহারা অন্তরের মধ্যেই কোন সুন্দর ভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বাস্তব উপাদানের সাহায্যে স্থায়ী রূপ দান করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করেন। তাঁহারা জগৎ হইতেই উপাদানসমূহ চয়ন করেন এবং উহাদিগকে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিতে চাহেন। কত স্মৃতি, কত বাধা, কত আবেগ, কত উচ্ছ্বাস—যাহা সাধারণ লোকের মনে সুখ-দুঃখের ঢেউ তুলিয়া উদ্যোগ বা শক্তির অভাবে অনর্থক বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা শিল্পীর অন্তরে সঞ্চিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্যের আদর্শ অনুসারে কাব্যের, চিত্রের, ভাস্কর্যের, সঙ্গীতের বা নৃত্যের আকারে বাহিরে পরিস্ফুট হয়। যাঁহার প্রতিভা যত অধিক, তিনি সেই পরিমাণে সাফল্য লাভ করেন। অতি উচ্চ প্রতিভা-বান্ শিল্পীর অনেক কীর্তি অমর হইয়া যায়। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, শাহজাহানের তাজ, শেক্সপীয়রের নাটকাবলী, বাল্মীকির রামায়ণ, কালিদাসের শকুন্তলা ও মেঘদূত অমর শিল্পের উদাহরণ।

সৃজনের একটি বিপুল আনন্দ আছে এবং তাহা বিলাইয়াও নিবিড় তৃপ্তিলাভ হয়। বিশ্বকর্মা এই সৌন্দর্যময় বিশ্ব সৃজন করিয়া অপার আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং ইহা আমাদিগকে উপভোগ করিতে দিয়া আনন্দময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আমরা সেই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়া চিরদিন আনন্দে অভিভূত হইতেছি। সৌন্দর্যের অনুভূতি বা সৃজন ভাবের কার্য, বুদ্ধির কার্য নয়। প্রবল কল্পনা-শক্তি না থাকিলে সৌন্দর্যের যথার্থ অনুভব বা সৃষ্টি সম্ভব নয়।

শিশুরা অবাস্তব ভাব-রাজ্যের অধিবাসী। তাহাদের খেলায় কল্পনার ইয়ত্তা নাই। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাও যেন বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তব রাজ্যে বিচরণ করিতে পারিলে সুখী হন। যাঁহারা কাব্য, নাটক বা কথা সাহিত্য রচনা বা পাঠ করেন, তাঁহারা সাময়িকভাবে স্বপ্নিল অনুভূতি-সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকেন। যাত্রা, থিয়েটার এবং অবাক্ বা সবাক্ চলচ্চিত্রের অভিনয়-কালে দর্শকগণ—কল্পলোকে স্থানান্তরিত হন। গায়ক যখন তাঁহার গানে কোনো বেদনা পরিস্ফুট করিতে ব্যস্ত থাকেন, তিনি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। সাধক যখন অনন্যমনা হইয়া তাঁহার উপাস্য দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, তখন তিনি এই স্থূল জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া যে রাজ্যে উপস্থিত হন, সেখানে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। পাগলের তো কথাই নাই—সে অবাস্তবেই ডুবিয়া আছে। কোনো কোনো লোক ইচ্ছা করিয়া পাগল হয়। মাদক সেবনের তাৎপর্য কি? বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া অবাস্তব জগতে থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কি?

বাস্তব লইয়া মানুষের যতটা কারবার, অবাস্তব লইয়া তদপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। প্যাণ্ডোরার পেটিকার দুষ্ট কীটগণের মধ্যে আশা নাম্নী ক্ষুদ্র পরীটি রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া জীবন কতকটা সহনীয় হইয়াছে। কিন্তু ঐ পরীটি কি উপাদানে গঠিত? সে উপাদানটী অবাস্তব-তন্তু-নির্মিত জাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিরহিণী ভাব-ভেলায় আরোহণ করিয়া প্রবাসী প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হয়। মানিনীর মানকে এক প্রকার নাট্যাভিনয় বলিলেও চলে। স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, দয়া, দান, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য, ক্ষমা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি সকলই হৃদয়ের বৃত্তি, অতএব ভাব হইতে সমুৎপন্ন। বাস্তব জগৎ অপেক্ষা ভাব জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

বিসর্জ্জন

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অপূর্ব্ব লেখক। কিন্তু গতানুগতিক লেখক নয়। স্বাধীন চিন্তা ও সেই চিন্তাকে রূপ দিবার ক্ষমতা তাহার আছে। যে সকল কথা সর্ব্বদা তাহার মুখে মুখে ফিরে শুনিয়া শুনিয়া আমাদের—অর্থাৎ অপূর্ব্বর বন্ধুবান্ধবদের তাহা একপ্রকার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। সেদিনটা সকাল হইতে বাদলা করিয়াছে, ধূমাইত চায়ের পেয়ালা হাতে স্ত্রী ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার হাত হইতে পেয়ালাটা লইয়া কহিলাম, বোস।

আমার দিকে একবার শঙ্কিত নয়নে চাহিয়া তিনি বলিলেন, সত্যি বিশ্বাস ক'রো আমার বসবার একটুও সময় নেই। আজ বাদলা বলে সেই অজুহাতে ঝিটা আসেনি। চা জল খাবারের ব্যাপার ষ্টোভে সেরে নিয়েছি এবারে উনুনে আগুন দিয়ে রান্নাবান্নার যোগাড় ক'রতে হবে। মেঘে মেঘে বেলা কম হয় নি।

তাঁহার দিকে হতাশভাবে তাকাইয়া কহিলাম, ঐতো তোমাদের দোষ! স্ত্রী যে স্বামীর কেবলমাত্র খাদ্য পানীয় যোগাবার যন্ত্র নয় এটা তোমরা কিছুতেই মনে রাখতে পার না। কিন্তু য়ুরোপে তা নয়, অপূর্ব্ব বলে। তার ভাবী স্ত্রী যদি রান্নাবান্না সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ হয় কিছু এসে যায় না কিন্তু কম্প্যানিয়নশীপ (companionship) চাই। ওটা নইলে একদণ্ডও চলবে না। হোটেলে ইচ্ছে করলেই খাবার কিনে খাওয়া যায় কিন্তু মনের খোরাক একান্ত দুর্ল্লভ।

আমার স্ত্রীর অধরে একটি মৃদু সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। একটু যেন ব্যঙ্গ করিয়াই কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু বুঝি তোমাদের সবাইকার হয়ে চিন্তা করবার ভার নিয়েছেন। তাই অপূর্ব্ববাবু কি বলেছেন আর কি না বল্লেছেন দিনের মধ্যে এমন হাজারবার শুনচি তোমার মুখে। কিন্তু আর না, এবার যাই। আর দেরী করলে হয়তো তোমার অফিসের ভাত দিয়ে উঠতে পারব না।

তিনি চলিয়া গেলেন। খোলা জানালাপথে মেঘাবৃত ধূসর আকাশ এবং টেবিলের উপর ক্যালেণ্ডারের তারিখের দিকে চাহিয়া বিরাট এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলাম, হায় আফিস! হায় স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের গতানুগতিক জীবন যাত্রা!

কিন্তু যেহেতু অপূর্ব্বর বাপ ব্যাঙ্কে বিস্তর টাকা রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকে দশটা পাঁচটা আফিস করিতে হয় না সেই কারণে সে তাহার জীবনে গতানুগতিকতার গন্ধমাত্র পাইলে বেজায় খাপ্পা হইয়া উঠে। তাহার বেশভূষা নূতন, তাহার চিন্তার প্রণালী নূতন, তাহার লেখা গল্প উপন্যাস নূতন, তাহার মুখের কথা নিত্য নূতন। কাজেই আমরা, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা—যাহারা বাঁধা গরুর মত অলস মন্থরতায় রোমন্থন করি এবং দুপুরে একবার আফিসে চরিয়া আসিয়া খুঁটিতে হেলান দিয়া দিব্য আরামে সন্ধ্যায় একপেট জাবনা খাই, আমাদের এই আনন্দহীন নূতনত্বহীন জীবনে অপূর্ব্বর যে একটা অত্যন্ত দুর্নিবার আকর্ষণ থাকিবে তাহা কিছু বিচিত্র নয়। এ হেন অপূর্ব্ব সেবার বড়দিনের ছুটির পরেই বিবাহ করিয়া বসিল। বড়দিনের বন্ধে সে দেওঘর বেড়াইতে গিয়াছিল, সেই-খানেই উজ্জয়িনী দেবীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়।

ব্যাপারটা এতই অকস্মাৎ এমন ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইল দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুহল হইল। উপেন অপূর্ব্বর সহিত দেওঘর গিয়াছিল, তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, ব্যাপারটা কি?

উপেন কহিল, "উজ্জয়িনী দেবীর সঙ্গে অপূর্ব্বর প্রথম আলাপ হয় পাহাড়ে বেড়াতে যেয়ে। ওর বাড়ীর মাতা পিতা প্রভৃতি সকলেই বনভোজন করতে গিয়েছিলেন। দৈবের চক্রান্তে অপূর্ব্বও সেদিন বেড়াতে গেছে। তর্কের মুখেই ওদের প্রথম সম্ভাষণ। অপূর্ব্বর লেখার প্রসঙ্গ উঠ্‌লো। উজ্জয়িনী অম্লান মুখে বললেন, আপনার লেখার আর সবই ভালো কেবল কাণ্ডজ্ঞানেরই যা একটু অভাব। তা ছাড়া আরতো কোন ত্রুটি দেখিনে। অপূর্ব্ব রুখে উঠে বললে, কাণ্ডজ্ঞান বলতে আপনি কি বোঝেন? কতকগুলো কুলি বস্তির গল্প আর দারিদ্র্যের অসহ্য ন্যাকামি লিপিবদ্ধ করিনে বলে আমার লেখায় আপনি কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখচেন! আমি চেয়েছি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে মানব মনের নানা অভীপ্সা, নানা ধরা ছোঁয়ার অতীত অনুভূতি। আমি তারই দিশারী। নাম না জানা বেদনার পসারী। দারিদ্র্যের বেদনার চেয়ে এ বেদনা কম নয়। উজ্জয়িনী হেসে ফেলে বললেন, কি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সেটা প্রণিধান করে দেখিনি অত। কিন্তু ঐ লেখা পড়ে আমারই মত সাধারণ পাঠক পাঠিকার যা মনে হয় সেইটে খুলে বলচি। মনে হয়, আপনার কাব্যের ফুলগুলি কাগজের। তাদের কাঁচি দিয়ে কেটে রং করে রাঙিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা হয়েচে। গন্ধের জন্য এক ফোঁটা আতরও যেন মাখিয়েছেন। কিন্তু তবু আর কিছু ওদের সত্যিকার ফুল বলে তো মনে হয় না। মাটিতে মূল নেই যে!

অপূর্ব্ব তর্কের ভঙ্গীতে বলে উঠলো, মাটিতে মূল থাকার নমুনাটা কি রকম একটু বিশদ করে বুঝিয়ে দিন না। বাধিত হব তাহলে, উপকারও হবে।

উজ্জয়িনী বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন পত্র' বইখানা পড়েচেন নিশ্চয়? আর নিজের হাতে বাজার করেছেন কোনদিন? জমা খরচের হিসাব রেখেচেন কখনো?

অপূর্ব্ব বিনীত ভঙ্গীতে বললে, "ছিন্নপত্র" বহুবার পড়েচি। কিন্তু মাপ ক'রবেন, বাজার করা বা হিসেব লেখা ওছ'টো কাজই এ যাবৎ ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। এবং তারজন্যে নিজেকে দুর্ভাগা বলেও মনে হয়নি কোনদিন।

—তাহলে আর কি আপনি বুঝতে পারবেন? একস্থানে কবি তাঁর ছিন্নপত্রে লিখচেন সে সময় তিনি ষ্টেটের জমা খরচ মায় এক পয়সার সর্ষের তেলের হিসাব রাখচেন অথচ আর একদিকে তাঁর মন যে স্বপ্ন দেখচে, সে স্বপ্নের মায়ায় আজ বিশ্বজগতের লোকে অঞ্জন পরেচে। এ'ও সম্ভব হয়। আর বলতে কি ওকেই বলে জীবনের ভিত্তিভূমিতে মূল থাকা, যার অভাবকে আপনার লেখায় আমি যৎকিঞ্চিৎ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব বলছিলুম। বোধ হয় রূঢ় কিছু বলিনি যদিচ কিছু অপ্রিয় বলে থাকতে পারি।'—উজ্জয়িনী গভীর স্বরে বললেন।…"

উপেনকে বাধা দিয়া কহিলাম, বল কি, এত বড় কড়া সমালোচিকার প্রেমে পড়ে তাঁকেই বিবাহ করে ফেললে অপূর্ব্ব? এযে দেখচি ঘরের ভিতরে সমালোচনার একটি আফিস খুলবার যোগাড় করলে সে। সহ্য হবে কি?

উপেন ভক্তিগদগদ কণ্ঠে কহিল, "ঐখানেই তো অপূর্ব্বর বিশেষত্ব। বললে সে 'আমার প্রত্যেক কথায়, কাজে, ব্যবহারে এবং মতামতে যদি স্ত্রী সায় দিয়ে চলেন সে স্ত্রী নিয়ে করবো কি? শান্তিতে ঘর কন্না চালাতে পারি কিন্তু ব্যস, ঐটুকুই ওর শেষ। আমি চাই বিদ্রোহের অরুণাভা, আমি চাই স্বাধীন মতামতের দুঃসহ বেগ'… আরও কত কি ভালো ভালো কথাই বললে সমস্ত মনে নেই। চপটা খাসা রেঁধেছিল, অপূর্ব্বর ওখানে গেলেই দস্তুর মত খাওয়ায়। উজ্জয়িনী দেবীর সমালোচনার ধাতটা যতই কড়া হোক না কেন রান্নার হাতটা চমৎকার! সেদিন আহারে কিঞ্চিৎ তন্ময় থাকায় অপূর্ব্বর ভালো ভালো কথার অনেকগুলোই ভুলে গেছি! এখন আফ্‌শোষ হচ্চে।"

চাঁদের আলোয় ছাদে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। ঘরকন্নার সর্ব্ববিধ কাজ সারিয়া অঞ্চলে চাবির গুচ্ছ বাঁধিতে বাঁধিতে গৃহিণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন মনে মনে কোন রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছি। কবির গানের চরণ মনে দূরশ্রুত তানের মত ভাসিয়া আসিতেছে,

'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।'

কিন্তু সুর কাটিয়া গেল। মাদুরের অনতিদূরে উপবেশন করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গৃহিণী সুরু করিলেন, অপূর্ব্ব বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হ'লো। যতই বলো অত ভালো মানুষ মেয়ে কিছু ভালো নয়। নিজের মত একটু আধটু থাকবি তা নয় স্বামী যা বলচে সেই কথাগুলি হুবহু নিজের কথা করে নিয়েচে। হ'লোই বা স্বামী বিদ্বান লেখক। তাই বলে তুমিও তো মানুষ; অত অনুকরণ কেন? তার উপর আজকালকার মেয়ে! বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলাম। উজ্জয়িনী দেবীর বর্ণনা যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে একটি দৃপ্তা অপ্রিয়-সত্যভাষিণী তেজস্বিনী রমণীর ছবি মনের সুমুখে ভাসিয়া উঠিত। কিন্তু সে ছবির সঙ্গে তো এ বর্ণনা মেলে না।

আমার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিতে গৃহিণী বলিলেন, কে জানে বাবু আমি তো ঠিক তার উলটো দেখে এলাম। তবে এ'ও বলি মেয়েমানুষের আবার মত কি? সে যাকে ভালোবাসে তার মতই নিজের মত হয়ে দাঁড়ায়। নিজের আবার আলাদা বলে কিছু থাকে না কি?

এ কথার উত্তরে ক্ষণিকের উত্তেজনা বশতঃ অনেক কথাই বলিতে ইচ্ছা হইল, দেশ বিদেশের অনেক দৃষ্টান্ত অনেক নজীর তুলিয়া তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা হইল যে, জগৎ সংসারে নিজের স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বিসর্জ্জন না দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসা যায়। কিন্তু ছাদে চাঁদের আলোর সহিত দিব্য দক্ষিণা বাতাস দিতে সুরু হইয়াছিল। নিতান্ত আলস্য বশতঃই অত কথা আর বলিতে ইচ্ছা হইল না। চুপ করিয়া শুইয়া আলোক এবং বাতাস অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু কে জানিত যে, বিধাতা পুরুষ তাঁহার পরিবর্ত্তে আমারই চোখে আঙ্গুল দিয়া এত শীঘ্র আমার একটা বিরাট ভুল ভাঙ্গিয়া দিবেন।

উজ্জয়িনী দেবী ক্রমশঃ আমাদের সামনে বাহির হইতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব তাহার স্ত্রীকে একে একে বন্ধু বান্ধবের সহিত পরিচিত করাইয়া দিতে লাগিল। সেদিন আমরা এক সঙ্গে সিনেমা গিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে উজ্জয়িনী কহিলেন, যাই বলুন যেখানে সেখানে গান দিয়ে বাংলা ছবির অনেকখানি ফোর্স আর চার্ম একেবারে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এই দেখুন না যে ছবিটা আমরা এইমাত্র দেখে এলাম তার এক জায়গায় রয়েচে, ঝি কাপড় মেলে দিতে দিতে ওস্তাদি হিন্দি গানের গিটকিরি দিচ্ছে। এটা কত অসম্ভব ও কী বিসদৃশ! যাকে ঝি সাজানো হয়েছে সে ওস্তাদ গানে, তাই লোক সামলাতে না পেরে [illegible] তাকে দিয়ে বাসন মাজাতে মাজাতে এবং কাপড় কাচাতে কাচাতে দু'টো গমক গিটকিরি শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরে কোনখানে ঝি কালোয়াতি গান গায় দেখাতে পারেন?

উজ্জয়িনীর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ চমকের হেতু ছিল। ঐ ছবিখানার নাম ডাক অতিশয়। তাই দিন দুই পূর্ব্বে কেবল অপূর্ব্বকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলাম আমার সঙ্গে। সেদিন ফিরিবার পথে অপূর্ব্ব যাহা বলিয়াছিল উজ্জয়িনী যেন আজ অবিকল তাহাই কণ্ঠস্থ বলিতেছেন। একটি অক্ষরও বাদ যায় নাই! একটি কথাও বদল হয় নাই। আর একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রসঙ্গান্তর তুলিয়া কহিলাম, মাইকেল মধুসূদন এক সময়ে বাংলা দেশের নাট্যশালার জন্যে যে সব নাটক লিখেছিলেন সেগুলো সিনেমায় লোককে দেখাতে পারলে কেমন হয় বলুন তো? কিন্তু শ্রীমধুসূদন কী বিলাসীই ছিলেন! একেবারে যাকে বলে রাজপুত্র!!

উজ্জয়িনী তৎক্ষণাৎ কহিলেন, বিলাসিতার চরম! ভেবে দেখুন শুধু কলেজে যাবার সময় একটা আধটা নয় তিন তিনটে সুট সঙ্গে নিয়ে তবে তিনি যেতেন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কতবার বেশ পরিবর্ত্তন দরকার হতো তাঁর। তিনটে সুটের একটাও কম হলে খুঁত খুঁত করতেন।

আর একদফা চমকিত হইলাম। সেই অপূর্ব্বর প্রত্যেকটি অক্ষর কণ্ঠস্থ বলিয়া যাইতেছেন। মাইকেল মধুসূদনের ঐ তিনটে সুটের গল্প অপূর্ব্বর বড় প্রিয় ছিল। এ সম্বন্ধে উজ্জয়িনীর বক্তব্য কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াই ওকথা তুলিয়াছিলাম। শুনিলাম তাঁহার আলাদা বক্তব্য কিছু নাই। এবং দেখিলাম তিনি মুগ্ধের মত অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দে হাসিতেছেন। অন্যের প্রতিটি কথা

হুবহু নকল করিয়া বলার মধ্যে যে কিছু নির্লজ্জতা থাকিতে পারে তাহার লেশমাত্র তাঁহার মাথায় ঢুকিতেছে না।

অপূর্ব্বদের গেটের কাছে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব্ব সযত্নে স্ত্রীকে নামাইয়া দিয়া কহিল, আমি এখনই আধ ঘণ্টার মধ্যেই এদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসচি। তার বেশি দেরী হবে না।

উজ্জয়িনী এই আধ ঘণ্টার বিরহের কল্পনায় এমন গভীর এমন মধুর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন যে সেই দৃষ্টি-পাতের মধ্যেই তাঁহার অসীম বিসর্জ্জনের ইতিহাস নিহিত দেখিতে পাইলাম। এবং সত্য কথা বলিতে কি তাঁর এই বিরাট অধঃপতনে যতটা ক্লিষ্ট বোধ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহার কিছুই বোধ হইল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে সব চোখা চোখা বুলি মনে ও মুখে আসিয়াছিল সে সমস্তরই খেই কোথায় হারাইয়া গেল।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

কথা

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

পলাতক

সে থাকে দূরে দূরে
আসে না কাছে হায়,
তাহারি তরে হিয়া
কাঁদে যে তিয়াসায়!

যদি বা আসে কভু,
ধরা না দেয় তবু,
বারেক দিয়ে দেখা
অসীমে ভেসে যায়!

গুমরি' মরে প্রাণে
না-বলা যত বাণী,
নীরব হয় বুকে
বেদন-ছায়াখানি!

কেন গো এ-ছলনা?—
মিছাই দিন গোনা;
ব্যাকুল আঁখি দুটি
কেবলি পিছে ধায়॥

স্মৃতি

এই পথে সে কখন এসে
স্মৃতিটি তার গেছে রেখে,
সকাল-সাঁঝে বয় যে মলয়
তারি দেহের সুবাস মেখে।

হয় নি দেখা তাহার সনে,
জানি না কোন গোপন ক্ষণে
পালিয়ে গেছে, পথের ধূলায়
রাঙা-পায়ের দাগটী এঁকে।

প্রভাত বেলার ফুলের রাশি
যেন তারী রঙীণ হাসি;
পায়ে-চলার পথখানি মোর
সেই হাসিতে গেছে ঢেকে।

হিয়ার সকল বাঁধন টুটে'
তারি স্মৃতির তুফান উঠে
বারে বারে যাই ছুটে তাই
মেটে না সাধ ক্ষণিক দেখে ॥

অসময়ে

ওগো সাথী মোর, চির জনমের সাথী,
এ-পথে আমার এলে তুমি ভুলে'
আসন তোমার বল আজ কোথা পাতি ?
ঝরে' গেছে হায় শেষ-ফুল-মঞ্জুরী,
অশ্রুতে আজ নয়ন উঠিছে ভরি
বাসি মালাগাছি তাও দিছি হায় ফেলে,
রুধেছি দুয়ার হতাশে নিভায়ে বাতি !

ঝরা ফুলদলে ভরেছে কানন-বীথি,
কাঙাল-নয়ন রহে শুধু চেয়ে
শাখায় শাখায় বিরল-বিহগ-গীতি।
মালা কোলে হায় ছিনু বসে উদাসীন,
ধূলায় লুটায়ে কেঁদেছে নীরব-বীণ ;
মরমের মাঝে মূরছিছে আজ কেয়া,
ঘিরেছে হৃদয়ে শ্রাবণ-আঁধার রাতি ॥

লীলা

তোমাতে আমাতে
চলে খেলা অহরহ,
বিরহ তোমার
নহে আর দুঃসহ।
বাদল-নিশীথে মেদুর গগনে
বেণুটি তোমার বাজে যে সঘনে,
তব নীল আঁখি সদা জাগে মনে
হেরি শ্যাম সমারোহ।
কনক-প্রভাতে
বাতায়ন ফাঁকে এসে,
নিতি তুমি মোরে
পরশিয়া যাও হেসে।
তারায় তারায় আঁখিতারা তব
নিমেষে নিমেষে হেরি অভিনব ;
জানি জানি তুমি মলয়ের সাথে
কি কথা আমারে কহ ॥

দুরাশা

দিবসের আলোর মাঝে জীবনে চাই গো যারে
বেদনা-মলিন সাজে আঁধারে পাই গো তারে।
অজানা গভীর দুখে
যারে হায় রাখি বুকে
সে যে গো মলিন মুখে মিশে যায় অন্ধকারে।
কোথা হায় রয় সে সরে' কোথা রয় হিয়ার প্রীতি,
বেদনায় ভরা বুকে জাগে তার করুণ স্মৃতি।
না যেতে মিলন-তৃষা
চলে যায় মধু-নিশা
আঁখি মোর অনিমিষা ভেসে যায় অশ্রুধারে ॥

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

নীড় ও দিগন্ত

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাণী বড় হয়েছে।

এটা আজ ওর নূতন আবিষ্কার। এতদিন পরে ওর ধমনীতে ধমনীতে প্রখর রক্তধারা ওকে সচেতন ক'রে তুলেছে, দৈনন্দিনের পরিচিত ভাবনার ওপর থেকে একটা নতুন ভাবনা তরঙ্গিত হ'য়ে এসেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আর সেই ঢেউয়ের দোলা ওর অবশিষ্ট ভাবনাগুলোকে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই প্লাবিত করে তুলেছে।

রাণী কী চায়, কী ওর প্রয়োজন, তা' ও বুঝতে পারছে না, নির্ণয় করতে পারছে না। কিন্তু প্রয়োজনটা তো একান্তভাবেই সত্যি। মন ছাপিয়ে, দেহের অণু-পরমাণুতে আঘাত ক'রে এই প্রয়োজনটা দুঃসহ বুভুক্ষার মতো কেঁদে ওঠে।

যেন কিসের একটা আকর্ষণে রাণী এ পাশের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। সেই ছেলেটাকে ক'দিন থেকে দেখা যায় না, তার বাঁশিও আর শুনতে পাওয়া যায় না। সে কি ওখান থেকে চ'লে গেছে?

কোথায় সে চলে গেল? রাণীর নিজে থেকে কেমন একটা অভিমান জেগে উঠতে লাগল, কেনই বা সে চলে গেল? আর দু'দিন থাকলে কীই বা ক্ষতি হ'ত তার? তার বাঁশী শুনতে রাণীর তো ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। চ'লে যাওয়ার তা'র কী প্রয়োজন ছিল?

পরক্ষণেই রাণী বিশ্লেষণ করতে সুরু করলে নিজেকে: সে চলে গেছে, ভালোই হ'য়েছে। তা'র জন্যে তোমার এতটা দুশ্চিন্তার কী প্রয়োজন? কেন তোমার মনের এই চঞ্চলতা? এই পৃথিবীতে তার সঙ্গে তোমার কিসের এতটুকু সম্পর্ক?

না, সম্পর্ক হয়তো নেই। কিন্তু ছেলেটা চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারে তো। আর কী সুন্দর চেহারা!... কোনো রাজপুত্রেরো চেহারা অমন হয় কি-না, রাণী তা জানে না, অবশ্য কোনো রাজপুত্রকেও কখনো দেখেনি, আর সম্পর্ক? হাজার হোক, ছেলেটাতো ওর প্রতিবেশী ছিল! প্রতিবেশীর সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্কই কী থাকতে নেই?

ও ঘর থেকে মা ডাকলেন, 'রাণী?'

সাড়া দিয়ে রাণী বেরিয়ে এলো। মায়ের মনটা ক'দিন থেকে কেমন স্নেহশীল হয়ে উঠেছে, কথায় একটা সস্নেহ মাধুর্য। নবাগত সন্তানের সম্ভাবনায় মায়ের দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে যেন স্নেহের ক্ষীর সঞ্চিত হয়ে উঠছে।

—"কি করছিলি বসে?"

নতমুখিনী রাণী তেমনি মৃদুস্বরেই উত্তর দিলে, 'সেলাই।'

মা'গিমার কণ্ঠে স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার আভাষ: "দিনরাত ওই করে কী শেষে চোখ দু'টোকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলবি? দুপুর বেলা এক ঘণ্টা জিরোতেও তো পারিস?"

মায়ের কথায় রাণীর চোখ দিয়ে জল এলো। জিরোবে: এমন কপালই করেছে কি না। মনে পড়ল কয়েকদিন আগের কথা। হাতের কাজগুলো শেষ করে ও একখানা বাঙলা মাসিকের পাতা খুলেছিল। বাবার চোখে সেটা পড়তেই তাঁর মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে' উঠল:

"বিদুষীর বিদ্যেলাভ হচ্ছে? যাবে কোন হতচ্ছাড়া অকাল-কুষ্মাণ্ডের ঘরে, নভেল-পড়া অত বিদ্যের দরকার কী! ষোলো বছরের ধাড়ী মেয়ে রাজ্যের কাজ ঠেলে সরিয়ে রেখে নভেল নিয়ে বসেছে, লজ্জাও করে না?"

তাই মায়ের কথা শুনে রাণী শুধু নীরবে বসে রইল, অভিমানে একটা কথাও বেরোতে চাইল না ওর মুখ দিয়ে। অনেক দিনের লুকিয়ে থাকা স্রোতের মতো মায়ের অযাচিত স্নেহ যেন আজ গঙ্গোত্তরীর মতো উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে :

"শরীরের কী অবস্থা হয়েছে, খাটতে খাটতে আর কিছু বস্তু নেই দেহে। দিনে-রাত্তিরে একটুখানিও তো বিশ্রাম পাস্‌নে। রুক্ষ চুল গুলোতে জট বেঁধে' গেল যে।"

রাণী আস্তে আস্তে বললে, "তেল নেই।"

—"তা তো দেখছিই। কী কপাল নিয়ে যে এ সংসারে এসেছিলি বাছা, কোনদিন এতটুকু ভালো জিনিষ দিয়ে আদর করতে পারলুম না। এমন সুন্দর চুলের গুছি, তেলের অভাবে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নাঃ, একটা ভালো তেল এমাসে তোকে কিনে দেওয়াবই। পরণের কাপড়তো নেই, সেই তালি আর গিঁট দিয়েই বুঝি চলছে ?"

রাণী নিরুত্তর রইল।

মাসিমার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ বেদনার সুর বাজতে লাগল : "ভগবান যে কবে মুখ তুলে' চাইবেন ! এমন লক্ষ্মীর মতো মেয়ে আমার, এত কষ্টও তা'র বরাতে ছিল। এ ঘরে তো সুখের মুখ দেখলিনে' মা, যদি সময় মতো ভাল ঘরে বরে তোর একটা গতি করতে' পারতুম, তা' হ'লে বাঁচতিস, আমরাও শান্তি পেতুম। কিন্তু দীন-দুঃখীর কোন আশাই কী পূর্ণ হয় ?"

মায়ের কাছ থেকে রাণী উঠে' চলে' এলো। এ রকম কথা ও শুনতে ভালো বাসে না, ওর শুনতে ভাল লাগে না। নিতান্ত অবচেতনভাবে ও মনে মনে ভগবানের প্রতি বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে : প্রশ্ন করতে চায়। বার বার ভাববার চেষ্টা করে : এমন বধির দেবতার কাছে প্রার্থনার কী মূল্য ? এ পর্যন্ত শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন চাওয়াইতো ও দেখে' এসেছে, কোনো পাওয়াই ওর নজরে পড়ল না। মানুষের অন্ধ আকুতির প্রচণ্ড আঘাতেও তা'র চিরন্তন রুদ্ধ দুয়ার এতটুকুও তো উন্মোচিত হতে দেখা গেল না।

কিন্তু ভগবানের প্রতি ওর আক্রোশ নেই : বলা যেতে পারে, আক্রোশ রাখবার সাহস নেই। ঈশ্বরের সম্বন্ধে ওর জন্মগত বিশ্বাস রক্তে মাংসে, অণুতে পরমাণুতে জড়িত হয়ে আছে। প্রয়োজনের উদ্বেগ কলরবের মাঝখানে তাঁর নিশ্চল নীরবতা ওকে বিক্ষুব্ধ করে, ব্যথিত করে, কিন্তু সন্দিগ্ধ করতে পারে না অবিশ্বাস জাগাতে পারে না। ওর নিজের অস্তিত্ব বোধের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাস জাগ্রত হয়ে আছে ; নিজেকে ও যে পর্যন্ত স্বীকার করবে, সে পর্যন্ত ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পারবে না।

কিন্তু ওর অস্বস্তির কারণ তা' নয়। যে ঈশ্বর পাথরের মতো নিষ্ঠুর, তাঁর কাছে অসহায়ভাবে ভিক্ষা জানিয়ে মানুষ যে প্রত্যাশী হ'য়ে ব'সে থাকে, দেবতার দুয়ারে ঠুকে' ঠুকে' মাথাটাকে রক্তাক্ত ক'রে তোলে, সে দৃশ্য যেন ও সহ্য করতে পারে না। ওর প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে, চীৎকার ক'রে তীব্র প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে। আশা নিরাশাকে নিয়ে এই কঠোর আত্মপ্রবঞ্চনা ওকে পীড়াক্রান্ত, ক্লিষ্ট ক'রে তোলে, অন্তরটা ভ'রে যায় পৃথিবীর প্রতি একটা সীমাহীন করুণায়।

মা, বাবা এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

বাবার হাঁপানিটা দিনের পর দিন কেবল বেড়ে' যা' কেমন বিশ্রী হাঁপানির ধরণ। লক্ষ্মীর ভয় করে। বাগতের ওই তো শরীর, চামড়ার নীচে হাড়গুলো স্পষ্ট হ'য়ে যোগন্ট জিল্ জিল্ করছে, গলাটা শুকিয়ে অস্বাভাবিক সরু হ'য়ে উঠেছে। কাশির টানে টানে বুকের পাঁজরগুলো যখন ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করে, চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন আশঙ্কায় রাণীর মুহূর্তগুলো আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে।

আর এই হাঁপানি সারবার জন্যে ভগবানের কাছে দোহাই আর মানতের অন্ত নেই। ওষুধ আজকাল প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেছে, কোনো ফল হয় না ব'লে। বাবার দু' হাতে প্রায় গোটা তিরিশেক মাদুলী জমে' উঠেছে, কিন্তু হাঁপানি তা'তে কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

আর, মা !

ছেলে মেয়েদের নিয়ে সামলাতে তাঁকে কতদিন ব্যতি-

ব্যস্ত হ'তে হয়েছে, কতদিন শুনেছে মায়ের বিনীত কাকুতি : "ভগবান, দোহাই তোমার, আর দিয়ো না। এগুলোকে নিয়ে তো আর পারিনে, যন্ত্রণায় একেবারে যে মারা গেলুম!"

কিন্তু ভগবান সে প্রার্থনা শোনেননি। তা'র প্রমাণ মেন্তি, ক্ষেন্তি, খুকীটা এবং আর, আর যে আসছে।

ক্ষেন্তির কথা মনে ক'রে রাণীর কান্না পেতে লাগল।

বাইরে নির্জ্জন দুপুর, মধ্য রাতের জড়তার খানিকটা আভাষ যেন সহরের উপরে। কোথা থেকে একটা ফেরিওয়ালার ক্লান্ত স্বর ভেসে আসছে : —"চা-আনা চুর—"

সামনের ডাষ্টবিন থেকে একটা ভিখারিণী কী যেন তুলে খুঁটে' খুঁটে' খাচ্ছে। বোধ হয় ও পাশের পাইস্ হোটেল থেকে ফেলে দেওয়া পচা ভাত তরকারী। দূরে একটা কুকুর ব'সে ব'সে লেজ নাড়ছে, তা'র জিভ থেকে টস্ টস্ ক'রে লালা ঝরে' পড়ছে।

ওই কুকুরটার সঙ্গে যেন কিছুটা সামঞ্জস্য ছিল ক্ষেন্তির।...

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল রাণীর।

[illegible]া টিপে টিপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বুধু ডাকলে : [illegible]?"

রাণী চমকে উঠল : "কে রে?"

বুধু একেবারে রাণীর কাণের কাছে মুখ এনে বললে, "তোকে একটা কথা বলতে এলাম দিদি!"

—"কথা তো বলতে এলি, কিন্তু ইস্কুল নেই আজ? দাঁড়া, বাবাকে—"

বুধু মুখ ভারী ক'রে বললে, "বাঃ রে, ইস্কুল সারাদিনই বুঝি থাকবে? আজ যে শনিবার, তাও জানিস্ নে বুঝি? কিন্তু তোকে যে একটা কথা বলতে এসেছি।"

—"কী কথা?"

বুধু গলার স্বর একেবারে নামিয়ে এনে বললে, "তুই অপরূপ বাবুকে চিনিস?"

রাণী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, "কে অপরূপ বাবু?"

—"আহা, ঐ যে আমাদের সামনের বাড়ীতে থাকে না? ফর্সা, লম্বা লম্বা চুল, রোজ জানলার কাছে ব'সে বাঁশি বাজাত, সেই যে—"

রাণীর সমস্ত বুকটা একেবারে ধক্ ক'রে উঠল : হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। কম্পিত গলায় বললে, "থাম, আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। তা' সে অপরূপ বাবুর কী হয়েছে?"

—"কিছু হয়নি, তোকে চিঠি দিয়েছে একটা।"

—"আমাকে!" কথাটা এত অস্পষ্টভাবে রাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো যে তা প্রায় শোনাই গেল না।

—"হঁা, তোকে"—বুধু জামার পকেট থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে একখানা সেণ্ট মাখানো পুরু গোলাপী লেফাপা বের করে আনলে। কলের পুতুলের মতো হাত বাড়িয়ে রাণী সেটাকে গ্রহণ করলে।

বুধু অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো বললে, "কাউকে বলিসনি, বলতে মানা করে দিয়েছে। ব'লেছে, তুই যদি ওর কথা শুনিস্, তা হ'লে তোকে অনেক জিনিষ দেবে, গয়না, কাপড়, তোর কোন অভাব থাকবে না।...আচ্ছা দিদি অপরূপ বাবু কী তোকে বিয়ে করবে?"

—"চুপ কর্!"

কিন্তু বুধুর তখনো বলা শেষ হয়নি। সে চুপ করলে না! 'সত্যি দিদি, অপরূপবাবু ভারী চমৎকার লোক, কী সুন্দর বাঁশী বাজান, আর এমন মিষ্টি কথা! জানিস্ দিদি, ওদের অনেক টাকা, ওরা ময়মনসিং না কোথাকার জমিদার কি-না!"

রাণী বলে ফেললে, 'সত্যি?'

—'বা সত্যি না তো কি? আমি ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলুম যে। একটা বাঘের ছবি আর তিনটে যা বড় বড় আলমারী আছে, তা তুই কোনদিন চোখেও দেখিসনি। কিন্তু সব চাইতে ভালো অপরূপবাবু, আমাকে কী দিয়েছেন, দেখবি?'

তেমনি অভিভূতের মতো রাণী বললে, "কী?"

বুধু সোল্লাসে বললে, 'একটা টাকা,—একেবারে নগদ করকরে। দেখবি?' বুধু জামার পকেট থেকে টাকাটা বের ক'রে মেজের উপর ফেলে' একবার ঠন ক'রে বাজালে 'কেমন বাজছে, না?'

—'হুঁ।'

—'রাজা মার্কা টাকা, একেবারে নতুন। কত কী কিনব এবারে, চকোলেট্, ঝাল চানা আর একটা সুপ্রীঙ দেওয়া লাট্টু। কিন্তু সত্যি দিদি, তোর দিব্যি, বাউকে বলবিনে, বুঝলি? যদি না বলিস, তা হ'লে তোকেও আমি চকোলেট্ এনে দেব। বলবিনে তো?'

—'না।'

বুধু এবারে ছুটে চ'লে গেল। একটা সম্পূর্ণ টাকার বত্রিশ ভাগেরও এক ভাগ ও কখনো একসঙ্গে হাতে পেয়েছে কি না সন্দেহ, তাই প্রাপ্তির এই আনন্দ যে কী ভাবে কোথায় ধরে রাখবে এবং কেমন ক'রে এই টাকাটা ও ব্যয় করবে বুধু যেন তা কল্পনাই করতে পারছিল না। হাতের তেলোয় টাকাটা নিয়ে ও অবাক বিস্ময়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল, একটা টাকা, একটা আস্তো টাকা। কী সুন্দর ঝক্‌ঝকে রঙ, কেমন গোল!

এদিকে চিঠিটা হাতে নিয়ে রাণী স্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে রইল।

বেশিক্ষণ নয়, কয়েক মিনিট, রক্তের চাঞ্চল্য প্রশমিত হ'তে যতটুকু সময় লাগে। এর মধ্যে রাণীর সত্তার সমস্ত স্বাধীনতা যেন কোথায়, কী ক'রে মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল: ওর দেহ নেই, অনুভূতি নেই, সমস্ত দেহটা একেবারে হালকা শোলার মতো হ'য়ে বায়বীয় রূপ নিয়েছে।

ধীরে ধীরে রাণী আত্মস্থ হতে লাগল। কে যেন বললে: এ অন্যায় অত্যন্ত অন্যায়। এ চিঠি তোমার পড়া উচিত নয়, পড়বার অধিকার নেই। ওটাকে বরং টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে' হাওয়ায় উড়িয়ে দাও। ছিঃ ছিঃ, লোকে জানলে—

কিন্তু রাণী কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না, অত্যন্ত দুর্নিবার ওর প্রলোভন। টাকাকড়ি বা গয়নার জন্য দুর্ভাবনা রাণীর নেই, কিন্তু ওই ছেলেটা, ওই ছেলেটাকে ওর মন্দ লাগে না। তবে কি, তবে কি, ও ওকে ভালোবাসে?

ভালোবাসে! বসন্তের এক রৌদ্রোজ্জ্বল শান্ত সকালে একটা প্রজাপতি যদি তার রঙিন পাখা মেলে তোমার খোঁপায় এসে বসে, অথবা সামনের ফুলদানীটার আকস্মিক ভাবে একটা ভ্রমর এসে গুন্ গুন্ করতে থাকে, তা হ'লে সেই মুহূর্তে তোমার মনে যে রোমাঞ্চ মিশ্রিত খানিকটা আনন্দ সঞ্চারিত হ'য়ে যায়, সেই আনন্দের সঙ্গে এই ছোট্ট কথাটি জড়িয়ে আছে: ভালোবাসে!

আমি জানি, অনঙ্গ আমার এই লেখা পড়লে কী রকম নাক কুঁচকাবে; নরেন কী ভাবে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একটুখানি হাসবে এবং পশুপতি কী রকম ক'রে লাফিয়ে উঠে 'লাইফ ফোর্স' 'লাইফ ফোর্স' ব'লে চীৎকার করবে। তবু আজ রাণীর এই নির্জন ভাবনা চঞ্চল মুহূর্তটির দিকে তাকিয়ে আমার আরো অনেক মেয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভালোবাসাকে তারা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে, তাদের মনোবিতান এই জিনিষটির সঙ্গে সঙ্গে সত্যি সত্যিই বর্ণে গন্ধে মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে, সমুদ্রের জোয়ারের মতো তা'দের শরীরে মনে বিচিত্র কল্লোলের উচ্ছ্বাস জাগে।

এই সব মেয়েরা অনঙ্গ, নরেন, পশুপতির বুদ্ধি জগতের সন্ধান রাখে না, এরা তথাকথিত ইণ্টেলেকচুয়াল জায়াণ্ট নয় বা এই সব জায়াণ্টদের বুঝবারো চেষ্টা করে না। এরা মেয়ে, এরা সেণ্টিমেণ্টাল; এবং আরো তীক্ষ্ণ ক'রে বলা যায়: ইর্‌র‍্যাশানাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব মেয়েরা ভাবে এবং রাণীও ভাবে; ভালোবাসা জিনিষটা কী বিচিত্র, কী একটা অনাস্বাদিত অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা!

এক মুহূর্তে নিজের প্রাত্যহিক জীবন, সঙ্গী, সাথী, কামনা কল্পনা ছায়া হয়ে পটভূমিতে মিলিয়ে যায়: সমস্ত দিনরাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে একখানি মুখ মনের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। বিনিদ্র রাত্রি অর্থহীন বেদনা এবং অসংযত কল্পনায় আমন্থর হ'য়ে উঠে, মনে হয়: সংসারে আর কারো কাছে ওর কোন দাবী নেই, এতটুকু প্রয়োজন মাত্র নেই, একটা আকণ্ঠ তৃষ্ণা সমস্ত দেহকে দগ্ধ করছে, মনকে দুর্ব্বিষহ করে তুলেছে: এর একমাত্র পরিতৃপ্তি—

মেয়েদের মনো-জগতের কথা বেশি অনুমান করতে

নেই। মন অনেকটাই ভাবতে পারে, কিন্তু সে সব কথাই তো আমি আপনাদের কাছে বলবার অধিকারী নই। তবে একটা কথা আমি নিশ্চিত বলতে পারি: আমরা সংস্কৃতি বা পরিমার্জ্জনার স্পর্শে বাইরে যতটাই পরিবর্ত্তিত হই না কেন, অন্তর্জগতে আমরা আদিম রাজ্যে বাস করছি। যে কোন মুহূর্ত্তে, অবশ্য যে কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারি। আর রাণীর তো কথাই নেই, কোনো কিশোরী মেয়ের চিন্তা যে কতদূর যেতে পারে এবং মনোজগৎ পার হয়ে তা যে কত সহজেই দেহগত ভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

রাণী ঘরে এলো এবং দরজায় খিল এঁটে দিয়ে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসীম লজ্জা এবং ভয়ে ওর মুখের বর্ণ বিচিত্র হ'য়ে উঠল। রাণী একবার, দুবার, তিনবার করে চিঠিটা পড়লে, একবার ভাবলে সেখানাকে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু মন বললে: না: থাক।

রাণী জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন ?'

—ছিঁড়েই বা কী লাভ ? এত কষ্ট করে তোমাকে লিখেছে, এত দুঃখ করে নিজের মন জানিয়েছে, তা'র সেই কাকুতির কোন মূল্যই কী নেই ? আর সে চিঠি এম্‌নি ভাবে ছিঁড়ে ফেলবার তোমার কী অধিকার ?

না:, কোন অধিকার নেই। রাণী চিঠিটাকে ভাঁজ করে নিজের বুকের মধ্যে রেখে দিলে।

চিঠিতে লেখা ছিল:

—থাক্ পুরানো কথা। এসব চিঠিতে যা' লেখা থাকে, তাই-ই ছিল। কিন্তু রাণীর জীবনে এই-ই তো প্রথম আবির্ভাব, নইলে হয়তো এ চিঠি ওকে এমনভাবে বিচলিত করতে পারত না। কিন্তু তোমার আমার অভিজ্ঞতা তো রাণীর নয় ও বয়সে আমাদের থেকে অনেক ছোট। ওর ছোট আকাশের নীচে এ পর্যন্ত আর ইন্দ্রধনু ওঠেনি, ওর আকাশে বাসন্তী পূর্ণিমার এই প্রথমতম সঞ্চার।

কিন্তু অপরূপ! নামটাও কী সুন্দর! যে মানুষ সুন্দর হয়, তার সবটাই কী সমান সুন্দর হতে হবে? রাণী বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল।

সামনের বাড়ীর জানালাটা খুলে গেল এবং দেখা গেল অপরূপ দাঁড়িয়ে। রাণী আজ আর সরে গেল না, বিস্মিত চোখে অপরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অপরূপ হাসল, আবার সেদিনের সেই ক্ষুধিত হাসি।

রাণীর বুকের ভেতরটা সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল, এরকম হাসিকে ও ভয় করে। ভয় হয়: ওর মনের সঙ্গে এ হাসি যেন মিলছে না। ও যা চায় তার খানিকটা আভাষই যেন পেয়েছে, সবটা তো নয়।

একটা অজানা আশঙ্কা সেই মুহূর্ত্তে ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো।

কয়েকদিন পরে বুধু আবার তেমনি একটা চিঠি নিয়ে চুপি চুপি এসে উপস্থিত। বললে, 'জবাব চেয়েছে এইবারে। তুই আমার হাত দিয়ে দে দিদি, আমি ঠিক পৌঁছে দেব।'

রাণী চটে' উঠল: 'বার বার তুই কেন এমন করে যার তার চিঠি ব'য়ে আনতে যাস ?'

বুধু বিপন্ন হ'য়ে বললে, 'বা: রে, যা'র তার কি!'

রাণী ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'না:, যার তার নয়! ওর সঙ্গে ভা-রী আমাদের সাত পুরুষের সম্পর্ক কিনা! যা:, চিঠি ফিরিয়ে দিয়ে আয়, আর বলবি, ফের এমনি চিঠি লিখলে আমি বাবাকে বলে দেব, বুঝলি? যা:।'

—"আচ্ছা," বুধু ম্লান মুখে যাওয়ার উপক্রম করলে। প্রত্যেক চিঠিতে একটা ক'রে টাকা, উ: সে কী সোজা রোজগার! কিন্তু দিদিটা যে কী, ওর ক্ষতি এতটুকুও বুঝল না। আর অপরূপবাবু! এমন চমৎকার লোকটা তার উপরে দিদির এত আক্রোশের কী কারণ হতে পারে ?

চিন্তাকুল মনে বুধু পা বাড়ালো।

—"এই, শুনে যা।"

বুধু আশান্বিত হ'য়ে ফিরল: "ডাকছিলি ?"

—"হুঁ, চিঠিটা আমায় দে।"

বুধু উৎসাহিত হ'য়ে বললে, "জবাব দিবি তবে ?"

—"না, না।" রাণী চিঠিটাকে নিয়ে আবার বুকের ভেতর রেখে দিলে, বললে, "এ চিঠি এই রেখে দিলুন, কিন্তু জবাব দেব না। তুই খবর্দার আর কখনো অপরূপ বাবুর কাছে চিঠি আনতে যেতে পারবিনে, বুঝলি ?"

—"আচ্ছা—" মাথা নীচু ক'রে অসন্তুষ্ট বুধু চ'লে গেল।

......এত ক'রে যে লেখে, এমন ভাবে যে মিনতি জানায়, সত্যিই কী ওকে সমস্ত মনে প্রাণে ভালোবাসে ?

রাণীকে না পেলে সত্যিই কী ও বাঁচবে না ? কিন্তু এ কথা রাণী বিশ্বাস করতে ভয় পায়। ওর সমস্ত জীবন ভ'রে এমন কথা ও কারোর কাছে শোনেনি, ওর নিজের যে এত মূল্য আছে তাই-ই বা ও কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল নাকি ? ও নারী, ও মহীয়সী, ও নইলে আকাশে চাঁদ ওঠা মিথ্যে হ'ত, বনে বনে ফুল ফুটত না, দক্ষিণ বাতাস মাধবী কুঞ্জে বৃথাই গুঞ্জন ক'রে যেতো। ওর দেহ নয়, দেহ যমুনা, মন নয়, মণিমঞ্জুষা। ওর চলার ছন্দে ছন্দে স্থলকমলেরা বৃন্তচ্যুত হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ওর এলায়িত কালো চুলে শ্রাবণের ঘন-গম্ভীর মেঘ-মায়া, ওর চোখের চঞ্চলতায় খঞ্জন লজ্জা পায়। ওর হাসিতে বিদ্যুৎ ঝলকে যায়, অথবা কুন্দ ফুলের রাশ এক সঙ্গে প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে।

রাণীর হাসি পায়, অপরূপ বেশ কাব্য ক'রে কথা বলতে পারে।

কিন্তু সত্যিই কী সুন্দর ?

দিন তিনেক পরে আবার তেমনি চোরের মতোই বুধু এসে উপস্থিত হল: "রাগ করবি নে তো দিদি ? বলব একটা কথা ?" বুধু কী বলবে রাণী তা' এত বেশী অনুমান করতে পারছে যে শুনতে ওর ভয় করছে। তবুও ও নিজেকে সামলাতে পারলে না, জিজ্ঞেস করলে: "কী কথা ?"

—"রাগ করবিনে ?"

রাণী অধৈর্য হ'য়ে উঠল: "না, না; তুই বল্।"

—"অপরূপ বাবুরা হিন্দু নয় !"

—"কী বললি ?"

—"ঠিক বললুম দিদি। পাড়ার সব্বাই তো এ কথা জানে। অপরূপ বাবুর বাবা বিলেতে গিয়ে মুর্গী খেয়ে মেম বিয়ে ক'রে খৃষ্টান হ'য়ে এসেছে, তাই দেশের লোক ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। মেমের ছেলে কি-না, সেইজন্যে অপরূপ বাবুর গায়ের রঙ এত ফর্সা।"

—"আচ্ছা, তুই যা—" রাণীর সমস্ত মুখের উপর যেন এক দোয়াত কালি উল্‌টে পড়ল।

—খৃষ্টান! ছিঃ ছিঃ, কী ঘৃণা, কী লজ্জা! আর রাণী এতদিন ধ'রে তা'কেই মনে মনে পুজো ক'রে এসেছে! এ লজ্জা ও কোথায় রাখবে ?"

না, রাণীকে আমরা ভুল বুঝব না, ও বাঙালির মেয়ে। এবং বাঙালি মেয়ের অত্যন্ত সাধারণত্ব সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলা যায়, ওর সম্পর্কেও সেগুলো নির্ভুল ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্নেহশীল ও ভীরু, এবং জন্মার্জিত সংস্কারের কাছে সর্ব্বদা আনত। কাব্যের ভাষায় নয়, সত্যি সত্যিই নিজের বুকের রক্ত দিয়ে ওরা জগতের কাছে আত্ম-নিবেদন করতে পারে।

তাই এই ব্যথা এবং বিস্ময়ের আঘাতের সাথে সাথে রাণীর মনটা দৃঢ়, নির্মম হয়ে উঠল। আজ থেকে ও অপরূপকে ঘৃণা করবে, সাপের মতো দূরে সরিয়ে রাখবে। রাণী জানে, রাণী বিশ্বাস করে, যাকে বিয়ে করা চলে না, সামাজিক ভাবে যা'র সঙ্গে কোনো মিলন সম্ভব নয়, তা'কে ভালোবাসা পাপ, মহাপাপ।

কিন্তু নিশ্চিন্তে ব'সে খানিকক্ষণ আহত মনটাকে পরিচর্যা করবারো উপায় নেই।

স্যাণ্ডেলের চট পট শব্দ করতে করতে লক্ষ্মণ ঘরে এলো। ঢুকেই প্রশ্ন করলে, "দিদি, মা কোথায় রে ?"

বয়সে ভাইটি বছর খানিকের ছোট হ'লেও মুরুব্বিয়ানায় দশ বছর এগিয়ে গিয়েছিল, এ জিনিষটা রাণী আদৌ পছন্দ করত না। তা' ছাড়া ওর মনে এখন প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই বললে, "ঘুমিয়ে আছেন।"

—"ঘুমিয়ে আছেন ? যাক্, নিশ্চিন্দি তা' হ'লে,—" লক্ষ্মণ হাতের তেলোয় লুকোনো একটা সিগারেট বে'র ক'রে

লম্বা গোছের টান মারলে: "বাঁচিয়েছে। নইলে সিগ্রেট দেখলে আবার ক্যাট ক্যাট করত।"

রাণী এবার এদিকে মুখ ফেরালো।

ওর মুখ দেখেই অকৃত্রিম বিস্ময়ে লক্ষ্মণ বললে, "একি দিদি, তোর চোখে জল! তুই কাঁদছিলি নাকি বসে' বসে'? কেন কাঁদছিলি রে?"

রাণী চট ক'রে চোখ দু'টো মুছে' ফেলে বললে, "কই কাঁদছিলাম?"

—"কাঁদছিলি নে? তোর চোখে আমি জল দেখলুম যে।"

রাণী ভারী গলায় বললে, "ও কিছু না। কিন্তু তুই কবে থেকে সিগ্রেট ধরলি লক্ষ্মণ?"

—"কবে থেকে?" লক্ষ্মণ হেসে উঠল: "সে অনেক দিন।"

—"অনেক দিন! অনেক দিন থেকে তুই সিগ্রেট খাস্?"

—"খাই বই কি, তা'তে এত আশ্চর্য হ'বার কী আছে? এ তো সব্বাই-ই খায়। আর তা' ছাড়া জানিস দিদি, সিগ্রেট না খেলে' ব্রেইন পরিষ্কার হয় না।"

—"না, হয় না!" রাণী ভ্রূকুটি করে বললে, "দাঁড়া, বাবাকে ব'লে দেব আজই।"

—"দিস দিবি—" লক্ষ্মণ একেবারে ডোণ্ট্ কেয়ারভাবে হেসে উঠল: "বাবা আমার মাথাটাতো একেবারে কেটে' নেবে আর কি! আমি তো আর বাবার পয়সায় সিগ্রেট খাইনে'। দেখিস, বাবা আমাকে একটি কথাও বলতে সাহস পাবেন না। কিন্তু তুই যে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গেলি, কেন কাঁদছিলি, তা' তো বললিনে?"

রাণী রুষ্টভাবে বললে, "সব কথাই তোকে বলতে হ'বে নাকি?"

লক্ষ্মণ সিগারেট শেষ ক'রে সেটাকে জুতোর নীচে মাড়াতে লাগল। তারপর বললে, "বলবিনে? বেশ, না বললি, কিন্তু তুই কী আমাকে এত বোকা ঠাউরেছিস? আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

রাণীর সমস্ত বুকটা ধড়াস ধড়াস ক'রে উঠল: "কী বুঝেছিস তুই?"

লক্ষ্মণ একটা হাই তুলে' বললে, "নিজের বিয়ের কথা ভাবছিলি তো? তা' সে ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।"

বিস্ময় এবং বিরক্তিতে রাণী তিক্ত হ'য়ে উঠল: "বিয়ের কথা ভাবছিলুম কে বললে তোকে? তুই আজকাল বড্ড বেশি ব'খে গেছিস লক্ষ্মণ!"

ভর্ৎসনাটা লক্ষ্মণ গায়ে মাখলে না, ও সব তা'র বিস্তর স'য়ে গেছে। বিজ্ঞের মতো একটুখানি হেসে' বললে, "আমাকে কি একেবারে নাবালক পেলি দিদি? আমি সত্যি বলছি তোকে, একটুও ভাবিসনি, তোর সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে।"

রাণী এবার কুপিত হ'য়ে বললে, "ব্যবস্থা কি রকম?"

লক্ষ্মণ তেমনি মুরুব্বিয়ানা সুরে বললে, "সে চমৎকার। শুনলে তোর খুশিতে নাচতে ইচ্ছে হ'বে।"

—"ই-স!" টিকালো নাকটি কুঞ্চিত ক'রে রাণী বললে, "শুনি?"

লক্ষ্মণ গম্ভীরভাবে আবার একটা হাই তুলে বললে, "দাদাবাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে।"

—"দা-দা বাবুর সঙ্গে!!"

সমস্ত ঘরের দেওয়ালগুলো, ছাত, মেজে, জিনিষপত্র সবাই যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে' অদ্ভুত তাণ্ডব তালে নাচতে সুরু ক'রে দিয়েছে! রাণী নিজের কাণ দু'টোকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

কলের পুতুলের মতো বললে, "দাদাবাবুর সঙ্গে!"

লক্ষ্মণ ওর বিমূঢ় ভাব দেখে বেশ আমোদ উপভোগ করছে, সামনের টেবিলটা বার কয়েক তবলার ভঙ্গীতে বাজিয়ে রসিকতার সুরে বললে, "হাঁ, হাঁ, দাদাবাবু, মানে পার্থসারথি রায়ের সঙ্গে। তুই একেবারে থ' মেরে' গেলি যে? দিব্যি পার্থ-সারথির গিন্নী, কী বলে রুক্মিণী না সত্যভামা, তাই হ'বি—"

রাণীর সেলায়ের ছুঁচটা এবার হাতের ভেতর অনেকটা বিঁধে গেছে। সেটাকে টেনে বে'র ক'রে আনতে হাতের কার্পেটটা রক্তে রাঙা হ'য়ে গেল।

রাণী তীক্ষ্ণ গলায় বললে, "তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কী করছিস?"

—"ইয়ার্কী!" লক্ষ্মণ অকৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করলে, "আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই কি-না, তাই তোর সঙ্গে ব'সে ব'সে ইয়ার্কী দিতে গেলুম! আমি যা শুনেছি, তাই-ই বলছি।"

—"কী শুনেছিস?"

লক্ষ্মণ বিশ্বস্তভাবে বললে, "সকালে তুই উনুনে আগুন দিয়ে রান্নাঘরে চ'লে গেলি না? তখন মা আর বাবা বলাবলি করছিলেন, আমি ঘরের ভেতর থেকে শুনলুম। মা বললেন, 'আমার লক্ষ্মীর মতো মেয়ে, অমন ছেলের হাতেই তো মানাবে'। বাবা বললেন, পার্থ যেদিন থেকে এখানে এসে' উঠেছে, সেদিন থেকেই এ কথাটা আমি মনে মনে ভেবেছি। কিন্তু এদ্দিন পার্থের কোনো চাকরী বাকরী ছিল না, তাই সাহস ক'রে বলতে পারিনি'। এখন যখন একটা সুবিধাই হ'য়েছে, তখন আর দেরী না ক'রে দু' হাত এক ক'রে দেওয়াই ভালো।' মাও বললেন, 'হাঁ শুভকাজে দেরী করতে নেই।' ব্যস, এর পরে আর কি চাস?"

লক্ষ্মণ অত্যন্ত উৎফুল্ল চোখে রাণীর মুখের দিকে তাকালো।

রাণী তেমনি কলের পুতুলের মতো বললে, "পার্থ দা' রাজী হয়েছেন?"

লক্ষ্মণ টেবিল চাপড়ে সজোরে বললে, "রাজী বলে' রাজী, একেবারে নির্ঘাৎ রাজী! প্রথমে নাকি একটু বিনয় ক'রে 'চাল'চুলো নেই টেই' গোছের দু' চারটা কথা ব'লেছিলেন কিন্তু বাবা একটুখানি চেপে ধরতেই আর অমত করতে পারলেন না।"

রাণী নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল।

লক্ষ্মণ হঠাৎ অট্টহাসি ক'রে উঠল: "এবার তো মন ভালো হ'য়ে গেল? এখন একেবারে পুরোদস্তুর ঘরণী-গিন্নী হ'তে চললি; যাঃ, আর কাঁদিসনে'।"

লক্ষ্মণ পকেট থেকে নতুন একটা সিগ্রেট বে'র ক'রে ধরালো, তারপর স্যাণ্ডালের তেমনি চটপট্ শব্দ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর রাণী তেমনি আড়ষ্ট হ'য়েই সেখানে ব'সে রইল। ওদিকের জানালায় অপরূপের বাঁশিটা তখন গুমরে' গুমরে' দুঃসহ ব্যথায় কেঁদে ফিরছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



অনন্তের খেলা

ডাঃ এ, গুপ্ত এম্-বি, বি-এস

গল্পে শুনিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর আছে, হাজার বৎসর পর পর কোন অতিকায় বিহঙ্গম আসিয়া তাহার গাত্রে চঞ্চু ঘর্ষণ করে। এইরূপ ঘর্ষণ ফলে যেদিন পর্ব্বতটী সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হইবে—অনন্তকালের এক মুহূর্ত্ত সেইদিন পূর্ণ হইবে!

বোধ হয় উপরোক্ত কল্পনা দ্বারা অনন্তকাল সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা আরম্ভ করিতে পারা যায়। এই একটী কথায় আমাদিগের অন্তরাত্মা যেমন সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতে চাহে, তেমন আর কিছুতে নহে।

যুগে যুগে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ অনুভব করিত, তাহারা অস্তিত্বের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে প্রায় উপনীত হইয়াছে। মিশরের সভ্যতা অস্তমিত হইলে ব্যাবিলনের উদয় হইল। তারপর আসিল, গ্রীক সভ্যতা। তারপর কত সভ্যতাই আসিয়া আবার বিলুপ্ত হইয়া গেল, মানুষ কিন্তু অস্তিত্বখানি বহন করিয়াই চলিয়াছে—পূর্ণতার দ্বার এখনও তাহার নিকট গগনস্পর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই লুপ্ত সভ্যতাগুলি কবে উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিল, আবার কখন ধীরে ধীরে অবনতির প্রান্তে উপনীত হইল, তাহা আমরা নিরূপণ করিয়া দিতে পারি। অতীতের ভাস্কর্য্য, স্থপতিকলা ও মৃৎশিল্পের নিদর্শন হইতে আমরা বলিয়া দিতে পারি, তাহার মধ্যে কোনগুলি মৌলিক এবং কোনগুলি অনুকরণ। মৌলিকগুলি হইতে তাহাদের পূর্ণ গরিমার কাল নির্ণয় করা যায়, আর অনুকরণগুলি হইতে তাহাদের অবনতির কারণ পাওয়া যায়। মৌলিক বস্তু ও অনুকরণের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অনুভূতির। মৌলিক যাহা প্রবল আন্তরিকতার সহিত অনুভব করে, অনুকরণ তাহাতে প্রাণের সাড়া দেয় না। একের যে সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক, অন্যের তাহা কৃত্রিম। একের যাহা গৌরবের অভিযান, অন্যের তাহা ব্যবসায়-বুদ্ধির চতুরতা। দেখা গিয়াছে, মানুষের জীবন যখন গৌরবের সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে, তখন তাহার বাণী জাতির প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত করিতে, জাতীয় জীবন উন্নত করিতে, এক অভিনব মূর্ত্তি গ্রহণ করে। তারপর সেই জলদগম্ভীর ধ্বনি যখন দূর দিগন্তে মিলাইয়া যায়, অনুকরণকারীর দল আসিয়া সেই বাণী ঘোষণা করে, কিন্তু সেই প্রাণহীন বাণী আর তেমন সুরে বাজিয়া উঠে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের দেশে স্বরাজের বাণী দিকে দিকে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার প্রাণহীন প্রতিধ্বনি কয়েক জন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিকের ভিতর পর্য্যবসিত রহিয়াছে। এক সময়ে যে বিশ্বপতির নামে মানবাত্মা ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে চাহিত, আজ সে নাম শুধু পুস্তকের পৃষ্ঠায় অথবা রঙ্গালয়ে অভিনেতার কণ্ঠে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

জাতীয় বাণীকে দেশহিতৈষণা ও ধর্ম্মের ভিতর সঞ্জীবিত রাখিতে হয়। প্রাণহীন অনুকরণ বা প্রতিধ্বনি হইতে সমাজকে মুক্ত রাখিতে পারিলে বুঝিতে হইবে তাহা দেশের সেবা, মানব সভ্যতার সেবা, এমন কি ভগবানের সেবায় লাগিল। জাতীয় পতাকার গৌরব রক্ষার্থে যখন নবীনের দল আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন অশ্রুতপূর্ব্ব পুরাতন বাণী তাহাদিগকে যেরূপ অভিভূত করিবে, কর্ত্তব্যের পথে নিয়োজিত করিবে, তেমন আর কিছুতে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, আমরা যদি ভারতীয় সভ্যতাকে জগতের আদর্শরূপে ধরিয়া রাখিতে চাই, আমাদিগকে উহার প্রত্যেকটী কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে

হইবে। নচেৎ, কতকগুলি বড় কথার আস্ফালন অথবা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন হইবে না।

অনন্তের ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক সময়ে আমাদিগের মন গৌরবের শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল, এবং সেই ভাব একদিন দেবমন্দির ও বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণে এবং কবিত্বের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা সেই ভাব ব্যক্ত করি, গানের মজলিসে, বিমুখ রমণীর প্রতি প্রেম নিবেদনে আর নিম্নস্তরের কবিতা রচনায়। নিতান্ত প্রাণহীন অনুকরণ, যাহাতে অনুভূতির লেশমাত্র নাই।

কিন্তু ফল কি দাঁড়াইল? আমরা এখন জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে কেবলমাত্র অস্তিত্বটুকু বহন করিয়া চলিয়াছি, যাহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই, এবং কোন অভিনবত্বের অনুভূতিও নাই। নদীর স্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় চলিয়াছি, যাহার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু জীবনের সার মর্ম্ম কি তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। অনন্তের চিন্তা দর্শনবিদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন ব্যক্তি এই ভাব ছাড়া মস্তিষ্ক চালনা করিতে পারে না। অনন্ত, ভাব প্রবণতার স্বপ্ন নহে, ধারণার বহির্ভূত উন্মাদনাও নহে। যুক্তিযুক্ত চিন্তার প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া, আমরা ইহার কি অর্থ করিতে পারি?

আজ আমরা ঘড়ি ছাড়া সময় নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন ঘড়ি ছিল না, তবু সময় ছিল। ঘড়ি বা মানমন্দির আবিষ্কারের পূর্ব্বেও মানুষ সময় নিরূপণ করিত। সূর্য্য উদিত হইত আবার অস্ত যাইত। বীজ বপন করিবার সময় ছিল আবার শস্য কাটিবার ক্ষণও ছিল। সূর্য্যের উত্তাপ এক সময়ে খরতর হইত আবার অন্য সময়ে পৃথিবী তুষারাবৃত হইত। মানুষ এই সব দিয়া সময় নিরূপণ করিত। কিন্তু যখন সূর্য্য চন্দ্র ছিল না, তখন সময় কোথায় ছিল? সৌরজগত বিহনে তখন সময়ের নিরূপণই বা কি প্রকারে হইত? সৃষ্টির আদিতে, যখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র কাহারও অস্তিত্ব ছিল না, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কেবল শূণ্য দিয়া পূর্ণ ছিল, তখন কালের অস্তিত্ব কোথায় ছিল?

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের চিন্তা আমাদিগকে পাইয়া বসে। কাল বা সময়ের সম্পর্কের বাহিরে যাহা বিদ্যমান, তাহাই অফুরন্ত, তাহাই অনন্ত। ঘড়ি বা মান মন্দিরের কথা ভুলিয়া যাও, দিন রাত্রির কথা ভুলিয়া যাও, মাস ও বৎসরের কথাও ভুলিয়া যাও, সেই অনাদি অনন্তের ভাব আসিয়া তোমার কল্পনার দ্বারে আঘাত করিবে। কালের জন্ম হইল অর্থাৎ কালের অস্তিত্বের সূত্রপাত হইল, গাছের ফলের মত, ফুলের কলির মত। কিন্তু যে অস্তিত্ব হইতে কালের জন্ম হইল, তাহারই নাম অনাদি, অনন্ত কাল! কাল অনন্তের সন্তান। আমরা ধরণীতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য আসিয়াছি। আমরা সকলেই কালের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কাল যদি আমাদের গর্ভধারিণী হন ত অনন্ত কাল আমাদের গর্ভধারিণীর জননী। সুতরাং আমরা কাল ও মহাকালের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছি।

ধরণীর বেলাতেও সেই কথা প্রযোজ্য। এক সময়ে মানুষ কল্পনা করিত, ধরণী বিশ্বের কেন্দ্র এবং সূর্য্য চন্দ্র তাহাকে আলোকিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পরে জানা গেল, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সে এক নগণ্য ক্ষুদ্রতম অংশ। এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে বিষাদের সঞ্চার হইল। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের বসুমাতা, ক্ষুদ্রই হউন আর বৃহৎই হউন তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। অনন্ত বিশ্বের অংশ যিনি, তাঁহার বিশালত্ব বা ক্ষুদ্রত্বের উপর মূল্য নির্দ্ধারণ কদাচ সম্ভব নহে।

আমাদিগের পার্থিব সময়ের বেলাতেও ঐ কথা বলিতে হয়। পৃথিবীর গতির দ্বারা যে জিনিসের অর্থাৎ সময়ের সৃজন হইল তাহা আমাদিগের মনকে অধিকার করিল। পৃথিবীর গতি আমরা ঘড়ি ও পঞ্জিকা দ্বারা বাঁধিয়া দিলাম কিন্তু যে অনন্তের ভিতর আমরা রহিয়াছি তাহাকে কি কেহ কখন বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে? আমাদের নিজ হস্তে সৃষ্ট সময়কে মন হইতে বিদূরিত করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত কাল হইতে আপনাকে কি করিয়া বিচ্ছিন্ন করিব?

এই অনুভূতি হইতে এইটুকু বলিতে পারি, দিবস ও রজনীর মায়াচক্রে ঘূর্ণমান অনন্তের আরম্ভ নাই, পরিসমাপ্তিও নাই। ভগবান অনাদি, আবার অনন্তও বটেন। তিনি অতীতে ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, এরূপ না বলিয়া

বরং এইটুকু বলিলেই সমীচীন হইবে যে, তিনি বর্ত্তমানে আছেন। তিনি নিত্য, তিনি সনাতন। কালের প্রহেলিকা চক্রে তাঁহার সত্তা আচ্ছন্ন হইবার নহে। কালের পরিবর্ত্তন ও সৃষ্টির বিবর্ত্তনের পশ্চাতে তিনি অবিনশ্বর সত্যরূপে চিরদিন অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই ধারণা আমাদিগের নিকট আরও প্রাঞ্জল বলিয়া বোধ হয় যখন অনন্তের কল্পনা আমাদিগকে সেই চিরানন্দের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রাখে এবং কালের সম্পর্কে যে বস্তুর মূল্য নিরূপিত হইয়াছে তাহার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ে বুদ্ধি প্রদান করে। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য যে সময়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ভিতর অনন্ত সত্যের স্থান আছে বলিয়া বোধ হয় না।

এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমরা যে কোনও বিষয়ের যথার্থ মূল্য অনুসন্ধান করিতে পারি। কাল ও অবস্থা ভেদ ভুলিয়া একমাত্র সাত্ত্বিক বিষয়েতেই যথার্থ মূল্য অর্পণ করিতে পারা যায়। পানাহারে নহে—আত্মত্যাগে ও দয়াদাক্ষিণ্যে ; বসন ভূষন ও ধনে নহে—জ্ঞানে ও বিচার শক্তিতে ; ভক্তি, প্রেমে ও পবিত্রতায় !

এইরূপে আমরা মনের এমন একটী অবস্থায় উপনীত হই যেখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা আর ক্ষুদ্র শশকের ন্যায় জন্মের রহস্যময় অন্ধকার হইতে মৃত্যুর কুহেলিকায় ঝাঁপাইয়া পড়ি না। চার্ব্বাকনীতি আমাদের মনকে আর স্পর্শ করিতে চাহে না। মানবের দুঃখময় অতীতের কথা ভুলিয়া ভবিষ্যতে তাহাকে পুনরায় গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হই। অতীতের যে সকল সভ্যতার একদিন অবসান ঘটিয়াছে তাহাদের কেহই জীবনকে অনাদি অনন্তের অংশরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাদের শান্তি, তাহাদের আনন্দ ও তাহাদের সমৃদ্ধি সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না সুতরাং বাস্তবের দিকে অগ্রসর না হইয়া মায়ার সংস্পর্শে আসিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

একথা যখন আমরা বুঝিতে পারি, এক উদ্দাম অপ্রতিহত জীবনী শক্তি আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করে। আমাদিগের আত্মা তখন আর দেহপিঞ্জরে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয় না—রোগ, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আসিয়া তাহাকে অধিকার করিতে পারে না। অনন্ত আকাশে মুক্তবায়ু সেবন করিয়া, স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া, সেই ভক্তি জ্ঞান ও প্রেমের সীমাহীন রাজ্যে গিয়া মনের আনন্দে বিচরণ করে।

এ, গুপ্ত

এনার্কিষ্ট

শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্

(১)

সেদিন পর্ব্বোপলক্ষ্যে হাইকোর্ট বন্ধ ছিল। এলাহাবাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট নীলরতন চট্টোপাধ্যায় ওরফে এন্, আর্, চ্যাটার্জ্জী স্কোয়ার ব্রীফ্ বন্ধ করিয়া স্নানের পূর্ব্বে আর একবার কলিকাটী বদলাইয়া দিবার জন্য ভৃত্যকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে মুখ তুলিতেই দেখিলেন বৈঠকখানার দরজায় একটী অপরিচিত যুবক দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুকের বয়স আন্দাজ ২৫।২৬ বৎসর হইবে ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখশ্রী ও দেহাবয়ব দেখিলেই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যুবক ভদ্রবেশী হইলেও পরিচ্ছদ মলিন এবং বোধ হয় কয়েকদিন অনাহার ও অনিদ্রাহেতু মুখ শুষ্ক ও কেশ রুক্ষ। হাতে একটী চামড়ার সুটকেশ।—চ্যাটার্জ্জী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ? কি চাও ?"

যুবক উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আমার বাটী বাঙলা দেশে, রংপুর জেলায়। আমি পশ্চিমে একটী চাকুরীর আশায় এসেছি।"

"তোমার নাম কি ?"

যুবক একটু ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে আমার নাম নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী কহিলেন, "তোমার পিতার নাম কি ?"

যুবক একটু কিন্তু হইয়া বলিল, "আমার পিতার নাম ৺রামজীবন মুখোপাধ্যায়।"

"তিনি কি করতেন ?"

"বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম করতেন না ; সামান্য যে জমী জমা ছিল তাতেই কষ্টে দিনাতিপাত হ'ত।"

"তুমি কি বরাবর রংপুর থেকে আসছ ?"

"আজ্ঞে না। আমার এক আত্মীয় কাশীতে বাস করতেন, তাঁরই নিকট প্রথমে এসেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁ'র বাসা খোঁজ ক'রে গিয়ে শুনলুম প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে তিনি স্বর্গে গিয়েছেন, এবং যিনি তাঁ'র অভিভাবকরূপে ছিলেন তিনিও দেশে ফিরে গেছেন। সেখানে আশ্রয় না পেয়ে আমি ঐ স্থানের একটী ভদ্রলোকের বাটীতে একটী ঘর ভাড়া ক'রে কয়েকদিন ছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে একদিন বৈকালে বেড়িয়ে এসে ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি যে, আমার ট্রাঙ্কটী নেই। কেউ আমার অনুপস্থিতে চাবি খুলে আমার ট্রাঙ্ক চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। তার মধ্যে আমার কিছু টাকা এবং কাপড় জামা ছিল। বাটীর মালিককে বললে তিনি অনুসন্ধান করার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত রাগত হ'য়ে আমাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন এবং পরদিনই আমাকে বাটী পরিত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে আদেশ দিলেন। তারপর আমার পকেটে সামান্য যা ছিল তা থেকে খরচ ক'রে আমি পরশু এখানে এসেছি। ধর্ম্মশালায় ছিলাম। দুইদিন আহার হয় নি। আপনি বাঙ্গালী ও ব্রাহ্মণ, সেই আশায় এখানে এসেছি। তা ছাড়া শুনলাম যে আপনার ছোট ছেলের জন্যে আপনার বাড়ীতে থেকে পড়ায় এমন একজন লোককে খুঁজচেন। যদি দয়া ক'রে আমাকে রাখেন তা হ'লে আমি যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে পড়াব।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব বলিলেন—"দেখ, তোমার এই গল্প সত্য কিনা জানি না। সত্য হলেও অপরিচিত লোককে বাটীতে স্থান দেওয়ার আমি বিরোধী। আমি তোমাকে বরং নগদ দুই এক টাকা সাহায্য করতে পারি। কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল লোককে বাড়ীতে রাখা সম্বন্ধে আমি বরাবর চাণক্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী। বিশেষতঃ আজকালকার দিনে তোমার মত বয়সের বাঙ্গালীর ছেলেকে আশ্রয় দেওয়া বিশেষ

বিপজ্জনক। কে বলতে পারে যে তুমি একজন এনার্কিষ্ট নও, আর পুলিশের ভয়ে নাম ধাম বদলে এইরূপ বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ না। ছোট ছেলের জন্যে আমার একটী রেসিডেণ্ট টিউটার প্রয়োজন সত্য, কিন্তু তোমাকে আমি রাখতে পারি না।"

"আজ্ঞে, আমি খুব যত্নের সহিত পড়াব।"

"ধ'রে নিলুম যে তোমার পড়াবার মতন জ্ঞান আছে, এবং তুমি ভাল করেই পড়াতে পারবে, কিন্তু ঐ যা বল্লুম তোমাদের মতন ইয়ং বেঙ্গলকে এখন খুব ভয়ের চক্ষেই দেখতে হয়। বাপু তোমাকে রেখে আমি নিজে একটা বিপদে পড়ি এ ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। বাংলার বাইরে এই বিদেশে পুলিশ আমাদের উপর আদৌ সন্দেহ করে না, কিন্তু বাংলার ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোমার পিছনে যে কোন গোয়েন্দা লাগে নি এই আশ্চর্য্য।"

যুবক অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বড় বড় সজল চক্ষু দুইটী মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর উপর ন্যস্ত করিয়া কহিল, "মহাশয়, আমার অন্যান্য যত দোষই থাকুক, আমি শপথ ক'রে বলছি যে আমি এনার্কিষ্ট নই এবং পুলিসের চক্ষে কখনও ছিলাম না, ও এখনও নাই। আমি বড় বিপন্ন; আপনি দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিন।"

চ্যাটার্জ্জী সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেলা প্রায় এগারটা বাজে। দেখ, তুমি বাঙ্গালী। দুইদিন আহার হয় নি বলছ। বিদেশে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে তাড়িয়ে দেয় না, তুমি এখানে স্নান ও আহারাদি কর। পরে যা হয় বলব।"

ভৃত্য রামঅবতারকে ডাকিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "এই বাবুকে দরওয়ানের ঘরের পাশের কামরায় নিয়ে যা। এঁর নাইবার বন্দোবস্ত করে দে, আর পাঁড়েজীকে বলিস্ ঐ ঘরে এঁকে যেন খেতে দেয়।"

আহারে বসিয়া চ্যাটার্জ্জী সাহেব গৃহিনীকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া অন্নপূর্ণা দেবী কহিলেন, "আহা, তাড়িয়ে দিও না। তোমারও ত টুনোর জন্যে একজন মাষ্টার দরকার। ও যদি ভাল করে পড়াতে পারে ত ওকেই রাখ না, বোধ হয় বড় গরীব।"

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "তুমি বোঝ না কিছু। মাষ্টার রাখা এক জিনিস আর ও ছোকরাকে রাখা আর এক জিনিস্। আজকাল বাংলার অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছে তাত সবই জান। ওকে রেখে শেষকালে কি বিপদে পড়ব? জামাইটাকে মুন্সেফ করে দেবার জন্যে চেষ্টা করছি, ও রকম একটা কিছু হলে আর কোনো আশাই থাকবে না।"

ভীত হইয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে বাড়ীতে থাকতেই বা দিলে কেন। তখনি যাহোক কিছু নগদ দিয়ে বিদেয় করলেই ত হত।"

"তখনই বিদায় কল্লুম না কেন জান? ছেলেটা যখন বল্লে যে সে এনার্কিষ্ট নয়, আর পুলিসে তার পিছু নেয় নি, তখন তার মুখে এবং কথায় এমন একটা সরলতা ও সত্যের ছাপ দেখলুম যে ও কথা সত্য বলেই মনে হ'ল। দেখ, উনত্রিশ বৎসর ওকালতী করছি। জুয়াচোর ও মিথ্যাবাদী লোক নিয়েই সারা জীবন কাটল। যে কথা আদৌ সত্য নয় তা প্রথমেই বুঝতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঐ কথাটাই বোধ হয় ছেলেটীর সত্য, বাকীটা হয়ত সত্য নয়। আমার মনে হয়, নাম ধাম যা বলেছে তা মিথ্যা, এবং আমার নিকট গোপন করেছে। আর তা ছাড়া দুদিন খাওয়া হয় নি বল্লে, আমি না খাইয়ে তাড়িয়ে দিতে পাল্লুম না। দেখি কাল যা হয় একটা বিহিত করবো।"

কিন্তু কাল আর বিহিত করা হইল না। নীলরতন বাবু নিজের আদালতের কার্য্যে এমন ডুবিয়া রহিলেন যে এবিষয়ে আর মনঃসংযোগ করিলেন না। ফলে নরেন্দ্র বাগানের প্রান্তভাগে দ্বারবানের কক্ষের পার্শ্বের কামরাতেই রহিয়া গেল এবং টুনোকে পড়াইবার ভার তাহার উপরই পড়িল।

২

নীলরতন বাবুর সংসারে অন্নপূর্ণা ও দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান পুত্র অজিতনাথ বি-এ ক্লাসে পড়ে। তাহার পর দুইটী কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা উমার বিবাহ এলাহাবাদেই হইয়াছে। জামাতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল। পসার বলিতে গেলে কিছুই নাই। পদস্থ শ্বশুরের

সুপারিসে মুন্সেফী জুটিবে এই আশায় বসিয়া আছেন। কনিষ্ঠা কন্যা কমলার বয়স সতের পার হইতে চলিল। বিদেশে কন্যাকে অল্প বয়স্ক অবস্থাতেই পাত্রস্থ করিবার ঝঞ্ঝাট নাই, সে কারণ কমলার বিবাহের জন্য নীলরতন বাবুকে এখনও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। তৎপরে একটী পুত্র অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র অমর ওরফে টুনো বাড়ীতেই পড়া শুনা করে, কোন স্কুলে তাহাকে এখন ভর্ত্তি করা হয় নাই। টুনো সকাল সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহরের কতক সময়েও নরেন্দ্রনাথের নিকট কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস এবং প্রধানত গল্প করিয়া কাটায়। নরেন্দ্রনাথ এ বাটীতে আসিবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যার পর নীলরতনবাবু জলযোগান্তে বাহিরের ঘরে যাইবার সময় দালানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন গৃহিণী অন্নপূর্ণা কন্যা কমলার হাতে এক বাটী দুগ্ধ ও একটি রেকাবীতে গুটিকয়েক মিষ্টান্ন দিয়া বলিতেছেন, "যা, টুনোর মাষ্টারকে দিয়ে আয়। বলিস, মা আপনাকে খেতে বল্লেন।"

কমলা চলিয়া যাইতেই নীলরতনবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "ওকে বুঝি রোজ দুধ ও খাবার পাঠিয়ে দিতে হয়? ছোকরা খুব তোয়াজে আছে দেখচি!"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "না, না, অমন্ কথা বলো না। বেচারা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কোন দিনও একটি কথাও বলে না। ঠাকুর যা দিয়ে আসে তাই হাসি মুখে খায়। গেল একাদশীর দিন বাছা সমস্ত দিন রাত উপোস ক'রে কাটিয়েছে। আমি কি ছাই জানতুম। পরের দিন দরওয়ান যখন বল্লে কাল মাষ্টার বাবু কিছু খায় নি তখন টের পেলুম। এ পোড়া বাড়ীতেও সব পাটই নেই, কে বলবে যে বামুনের বাড়ী। সকাল বেলা চান গেল সন্ধ্যা আহ্নিক গেল কেবল কাঁড়ী কাঁড়ী চা আর বিস্কুট খাওয়া! চা তৈরী করতে করতেই ত কমলীর বেলা আটটা পেরিয়ে যায়। নিজেও যেমন ম্লেচ্ছ, বাড়ী শুদ্ধ সকলকেই তেমনি করে তুলেছ। তোমার হাতে পড়ে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই গেল। এবার আমি মন্ত্র নোবই, তা তুমি অনুমতি দাও আর না দাও। ফাল্গুন মাস পড়লেই বাপের বাড়ী চ'লে যাব। দাদাকে ব'লে গুরুঠাকুরকে আনিয়ে সংক্রান্তির দিন মন্ত্র নোব।"

নীলরতনবাবু বলিলেন, 'আজ তা হলে বুঝি একাদশী? একাদশীর সন্ধ্যা ভোজ যাচ্চে?'

"তোমার এক কথা। বাছা দু বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক না করে কিছু খায় না। একাদশীরদিন সমস্ত দিনের পর রাত্রে একটু মিষ্টি খায়। গেল বারে ত কিছু জানতুম না, সেই জন্যে এবারে আগে থেকে খোঁজ রেখেছি কবে একাদশী পড়বে।"

নীলরতনবাবু বলিলেন, "হুঁ তা কমলীকে না পাঠিয়ে বুধিয়ার মা কিম্বা ভজুয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হত?"

"বুধিয়ার মা বিকেলায় এটো বাসনগুলো মাজছে আর ভজুয়াকে পাঠাই কেমন করে বল। মাগো, যে, নোংরা কাপড় তার, সারাদিন চান পর্য্যন্ত করে না। বাছা একাদশীর দিন একবার একটু জল খাবে তা অত নোংরা কাপড়ে কি নিয়ে যাওয়া যায়।" নীলরতনবাবু কেবল একটী হুঁ বলিলেন। যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বেশী বাড়াবাড়ী ভাল নয়।"

(৩)

সে দিন রবিবার। মধ্যাহ্নের বিশ্রামান্তে বৈঠকখানার পার্শ্বে একটী সুসজ্জিত কক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া নীলরতনবাবু খবরের কাগজখানি লইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসেই বেশ শীত পড়িয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া সমস্ত বাগানটী দেখা যাইতেছিল। বাসার সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া মধ্যে মধ্যে মোটর গাড়ী প্রচুর ধূলি উড়াইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। শীতের অপরাহ্ণে শীতল বাতাস ঝাউ ও ইউক্যালিপটস্ বৃক্ষের পত্রগুলি কাঁপাইয়া গবাক্ষ মধ্য দিয়া প্রবেশ করত বেশ একটু সজাগ ভাবের সঞ্চার করিতেছিল। পার্শ্বস্থিত প্রস্তরমণ্ডিত গোল টেবিলটির উপর কন্যা কমলা চা ও জলখাবার রাখিতেই নীলরতনবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু সেই সময়েই জানালার মধ্য দিয়া তাঁহার দৃষ্টি

বাগানে ও ফটকে পতিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁারে কমলি, পণ্ডিত সুন্দরলালের ছেলেটা হামেসা বাগানে দরওয়ানের ঘরের দিকে কি করতে যায় ?"

কমলা বলিল, "গৌরীশঙ্কর দার কথা জিজ্ঞাসা করছ বাবা। সময় পেলেই টুনোর মাষ্টারের কাছে পড়তে আসে।"

"টুনোর মাষ্টারের কাছে পড়তে আসে ? সে কি পড়াবে ওকে ? ও ত অজিতের সঙ্গে পড়ে না ?"

"হাঁা বাবা, পড়তে আসে। উনি ত গৌরীশঙ্করদাকেও পড়ান, দাদাকেও পড়ান।"

"দাদাকেও পড়ান !" একটু আশ্চর্য্য হইয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, 'ডাকত অজিতকে।'

অজিত আসিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যারে সুন্দরলাল বাবুর ছেলেকে প্রায়ই বাগানের দিকে যেতে দেখি। কোথায় যায় ?'

'নরেনবাবুর কাছে পড়তে যায় বাবা। গৌরীশঙ্করের ফিলজফিতে অনার্স কি না, সে ওঁর কাছে ফিলজফি পড়ে। আমাকে উনি ইংলিশ পড়ান।'

'তোর কিসে অনার্স ?'

'আমার ইংলিসে অনার্স বাবা। এমন সুন্দর পড়ান— আমি ত এ্যাংলো স্যাকসান কিছুই বুঝতে পারতুম না, ওঁর কাছে এই কয়দিনে ফিলজফী আর এ্যাংলো স্যাকসান আমার অনেকটা তৈরী হয়ে গেছে। আর History of English Literature এমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন যে অবাক হ'য়ে যেতে হয়।'

নীলরতনবাবু বলিলেন—"হুঁ—আচ্ছা যা।'

সিগার ধরাইয়া নীলরতনবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, নাঃ উহাকে তাড়াইতেই হইবে। ও এনার্কিষ্ট না হইয়া যায় না। এনার্কিষ্টকে আশ্রয় দিয়া শেষে কি বিপদে পড়িব !

বড়দিনের ছুটী আগতপ্রায়। কয়েকটা জটিল আপীল মোকর্দ্দমার জন্ম নীলরতনবাবু এ কয়দিন আদৌ সময় পান নাই। এবং একটু মিষ্ট করিয়া নরেনকে বিদায় করিবার কার্য্যটাও সম্পন্ন হয় নাই। সেদিন সন্ধ্যার পরে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া নজীর দেখিতেছিলেন, এমন সময় হীরালাল ক্ষেত্রী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালালবাবু এলাহাবাদ সহরে একজন বড় জুয়েলার এবং সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নীলরতনবাবু বলিলেন, 'আসুন আসুন হীরালালবাবু। খবর সব ভাল ?'

'হাঁ বাবু, রামজীর কৃপায় খবর সব ভাল। আপনি ভাল আছেন ? আপনাকে একটু যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'না, বিশেষ কোন অসুখ নয়। গেল দুই হপ্তা বড় খাটুনী যাচ্ছে, বোধহয় সেই জন্যে।'

'এই বড়দিনের ছুটীতে বাবু আপনি এখান থেকে কোথাও পালিয়ে যান। এখানে থাকলেই ছুটীতে খাটতে হবে আর সারা বছর খালি খেটে খেটেই শরীর ভেঙ্গে যায়। যা নসীবে আছে সে টাকা আসবেই। আপনি বেঁচে থাকলেত টাকা।'

'তা মিথ্যা নয়।—তারপর এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন নাকি ?'

'হাঁ অন্য দুই একটা কাজ সেরে মনে হল আপনাকে একটা কথা বলে যাই। আপনি অনেক সময়ে আমার অনেক উপকার করেচেন, আপনার নিকট এ কথা আমার গোপন রাখা উচিত নয়।'

নীলরতনবাবু একটু উদ্গ্রীব হইয়া বলিলেন, 'কি বলুন ত ?'

হীরালালবাবু বলিলেন, 'দেখুন, আজ বৈকালে আমার দোকানে একটী বাঙ্গালী বাবু একটী আংটী বিক্রয় করবার জন্যে যায়। বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর হবে। হীরার আংটী এবং খুব দামী জিনিষ। বড়লোকের বাটীতে ভিন্ন অত দামী হীরা সাধারণ গৃহস্থের আংটীতে দেখা যায় না। লোকটি যেন একটু ভয়ে ভয়ে বিক্রয়ের কথাটা বললে। তার বয়স দেখে, বিশেষত বাঙ্গালী ব'লে আমার কেমন সন্দেহ হ'ল। চোরাই মাল ব'লে মনে হ'ল। আংটির ন্যায্য দাম চারিশত টাকার কম হয়, আমি একটু তাচ্ছল্য ক'রে বললাম, এর দাম পঞ্চাশ টাকার বেশী নয়, আমি ঐ টাকায় কিনতে পারি।"

নীলরতনবাবু সাগ্রহে বলিলেন, "তারপর ?"

হীরালালবাবু বলিলেন, "ছোকরা হেসে বললে, পাঁচশো টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করতে হবে। এখন থাক আমি ওটাকে কলকাতায় বিক্রয় করব। এই ব'লে আংটী ফেরৎ নিয়ে চ'লে গেল।"

"তা হলে দেখা যাচ্চে লোকটা আংটীর প্রকৃত দাম জানত এবং সেই দামেই বিক্রয় করতে চায়।"

"তা ঠিক বলা যায় না হয়ত একশত কিংবা দেড়শত টাকাতেও বিক্রয় করতে পারত।"

"কিন্তু এর সঙ্গে আমার কি সংশ্রব তাত বুঝতে পাচ্ছিনা।"

"আজ্ঞে, সেই কথাই বলছি। আপনি ত জানেন গত বৎসর জমীরুদ্দীনের ব্যাপার নিয়ে মিথ্যা মিথ্যা পুলিস আমাকে কিরূপ হায়রান করেছিল। সেই জন্যে লোকটা একটু দূরে গেলেই আমি রামকিষণকে বললাম, তুই সঙ্গে যা, দেখে আয় লোকটা কোথায় থাকে বা আর কোথায় যায়। রামকিষণ ফিরে এসে বললে—যে, লোকটা বরাবর আপনার বাটীতেই প্রবেশ করলে। রামকিষণ আপনার দ্বারবানের নিকট আরও জেনে গিয়েছে যে, ঐ লোকটী আপনার বাটীতেই থাকে এবং প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে এসেছে কিন্তু আপনার কোন আত্মীয় নয়। আজকাল এই সব বাঙ্গালী যুবকদের ব্যাপার ত আপনি জানেন। সেই জন্যে মনে করলাম আপনাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল।

"তা ভালই করেছেন। আপনাকে এ জন্ত ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এ বিষয়ে ভাল করে অনুসন্ধান করব।"

নীলরতনবাবুর আর নজীর পড়া হইল না, হীরালাল-বাবুকে বিদায় দিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আহারে বসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ ঐ মাষ্টারটীর সম্বন্ধে আমার ভুল হয়েছিল। আমি ওর কথা-বার্ত্তা শুনে ও মুখ দেখে ধারণা করেছিলাম যে ও সৎলোক কিন্তু এখন বেশ প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে যে ও ছোকরা এনার্কিষ্ট। ওকে বাড়ীতে রেখে আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছি। পুলিসে সন্ধান পাওয়ার আগেই ওকে বিদায় দেওয়া উচিত। আমি কালই ওকে ডেকে বলব আমার এখানে থাকা চলবে না। ও যে কদিন পড়িয়েছে তার জন্যে কিছু দিয়ে ওকে শীঘ্রই বিদায় করতে হবে।"

অন্নপূর্ণা দেবী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, "কি জানি বল। এধারে ত মাটির মানুষ, মুখে কথাটী নেই। কাহারও সহিত বেশী কথা কয় না। সকালে উঠে রোজ সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে খানিকক্ষণ গীতা পড়ে......

গৃহিণীর কথা শেষ হইল না। নীলরতন বাবু চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "গীতা পড়ে ? তা হলে ত কোন সন্দেহ-ই নেই। স্বদেশী ডাকাত না হয়ে ও যায় না। হীরালালের দোকানে যে আংটী বেচ্‌তে গিয়েছিল নিশ্চয়ই সেটা ডাকাতীর মাল। এই ধরণের বাঙ্গালীর ছেলেগুলো সর্ব্বনেশে লোক। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেশ লেখা-পড়া জানে, বি-এ, এম্-এ পাশ। বাহিরে অতি শান্ত-শিষ্ট, মুখে কথাটী নেই, কিন্তু ডাকাতি করতে কিংবা দলপতির হুকুমে খুন পর্য্যন্ত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। আবার তেমনি হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতেও মজবুত। কি কুক্ষণেই ও হতভাগা আমার বাটীতে এসে ঢুকেছিল। কাল সকালে ওকে দূর করে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।"

গৃহিণী একটু মিনতির স্বরে বলিলেন, "আহা, কালকে তাড়িও না। বাছা দুদিন হ'ল জ্বরে ভুগছে। যে ঠাণ্ডা পড়েছে তার উপর গরম কাপড় চোপড় বলতে গেলে কিছুই নেই। আমি তবু কমলীকে দিয়ে একখানা কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, সেইটেই রাত্রে গায়ে দেয়। ঠাণ্ডা লেগেই জ্বর হয়েছে। পথ্য পেলেই পাঠিয়ে দিও।"

নীলরতন বাবু আহার্য্য অভুক্ত রাখিয়াই উঠিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "রেখে দাও তোমার জ্বর। অত মায়া দেখিয়ে আর কাজ নেই। এর জন্যে যে আমার কি সর্ব্বনাশ হবে তা ভগবানই জানেন। আমি এফিডেভিট করে বলতে পারি ও হারামজাদা ডাকাত আর এনার্কিষ্ট। পুলিসের ভয়ে বাংলা থেকে পালিয়ে এসে এলাহাবাদে লুকিয়ে আছে।"

গর্জ্জন করিতে করিতে চ্যাটার্জ্জী সাহেব দ্বিতলে নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু নরেনকে পরদিনও বিদায় করা হইল না। বড় দিনের ছুটি আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতেই দুইজন এ্যাডভোকেট বন্ধু আসিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীকে মোটরে তুলিয়া পার্টিতে লইয়া গেলেন ফিরিতে প্রায় অপরাহ্ন হইল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই নীলরতন বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, "ওগো, এই মাত্র সত্যেনের টেলিগ্রাম পেলুম। সে রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে আসছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কে সত্যেন ?"

নীলরতনবাবু অধীর হইয়া বলিলেন, "সত্যেন আমার ভাগনে। তুমি এরই মধ্যে তাকে ভুলে গেলে নাকি ?"

"আমাদের সতু, তাই বল!—তা সে নাকি এখন কোথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সে বিলেত থেকে আই সি এস পাশ করে এসে এখন হুগলীতে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি অজিতকে ওকে বলে দাও যেন সোফার ঠিক সাড়ে আটটায় গাড়ী তৈয়ারী রাখে, আমি নিজেই ষ্টেসনে যাব।"

পরদিন প্রত্যুষে অন্নপূর্ণা দেবী দ্বিতলের দালানে আসিয়া দেখিলেন নূতন জয়েণ্ট সাহেব একটী জানালার কবাট দুইটী ঈষৎ ফাঁক করিয়া মনোনিবেশ সহকারে বাগানের ভিতরে কিছু একটা দেখিতেছেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখছ বাবা ?"

সত্যেন বলিল—"মামীমা ও লোকটী কে ? ওই দরওয়ানের ঘরের দিকে যাচ্ছে ?"

"ও টুনোর মাষ্টার। আজ মাস দেড়েক হল এখানে আছে।"

"কি নাম মামীমা ?"

অলক্ষ্যে পশ্চাতে কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অগ্রসর হইয়া বলিল, "নরেন চাটুয্যে। কিন্তু বেশ লেখাপড়া জানে,—দাদাকে ও অনার পড়ায়।"

"বটে—মাস দেড়েক হল এসেছে ? বেশ ভাল লেখা পড়া জানে,—না কমলা ? অজিতকে বেশ পড়াতে পারে—না ?"

কমলা বলিল, "হ্যাঁ বড়দা। দাদা ত ওর খুব সুখ্যাতি করে।"

অন্নপূর্ণা দেবীকে সম্বোধন করিয়া সত্যেন বলিল, "মামীমা, একটা কাজ তোমাদের করতেই হবে। ও লোকটার ওপর দিন পাঁচেক একটু কড়া পাহারা রাখতে হবে। যেন ও না পালায়। আর ওর সামনে আমার নাম বা পরিচয় কেউ যেন না করে। আমি এখানে এসেছি এ কথাও যেন ও জানতে না পারে। আমি এখুনি সিটি হোটেলে চ'লে যাচ্ছি, চার পাঁচ দিন সেখানে থাকব। তুমি কিছু মনে ক'রো না মামীমা, বিশেষ জরুরী ব্যাপার না হলে আমি এমন করে যেতুম না।"

"এখুনি যাবে, খাওয়া দাওয়া না করেই ?"

"হ্যাঁ মামীমা—তা না হলে সব পণ্ড হবে। সব কথা যখন শুনবে তখন তোমার কোন রাগ থাকবে না, এবং আমি এখন যা করচি তুমি তাই সমর্থন করবে। আমার সুটকেশ আর বিছানাটা চাকরকে দিয়ে লুকিয়ে সিটি হোটেলে পাঠিয়ে দিও।"

ভয়ে অন্নপূর্ণা দেবীর মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলেন, "কোন বিপদ ঘটবে না ত বাবা ?"

হাসিয়া সত্যেন বলিল, "না তোমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু ও যদি এখান থেকে পালায় ত আমার বিশেষ ভয়ের কারণ আছে। মামাকে সব কথা বুঝিয়ে বোলো মামীমা, যেন ও লোকটা না পালাতে পারে। আমিও হোটেল থেকে চিঠি লিখব।"

উপরিউক্ত ঘটনার পর চতুর্থ দিবসের প্রাতে আন্দাজ আট ঘটিকার সময় মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, এমন সময় আমাদের নূতন জয়েণ্ট সাহেব মিষ্টার এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি পুরা দস্তুর সাহেবী পোষাকে প্রবেশ করিয়া মাতুলকে যথারীতি হিন্দুমতে প্রণাম করিলেন। তৎপশ্চাতে একজন শুভ্র গুম্ফশোভিত বিরল কেশ স্থূলকায় বৃদ্ধও প্রবেশ করিয়া চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে অভিবাদন করিলেন।

নীলরতনবাবু বলিলেন, "কি ব্যাপার সতু! আমি তোমার চিঠি পেয়েই দরওয়ানকে সব কাজ ছেড়ে ওর বডি গার্ড করেই রেখেছি। তুমি ওকে দেখেই এখান থেকে পালিয়ে গেলে, আমাকে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে

বারণ করে পাঠালে। আমি ত অনেক ভেবে চিন্তে কিছুই ঠিক করতে পারি নি। খুনী আসামী নয় ত ?"

"আপনি ঠিক অনুমান করেছেন মামা—একজন অতি নিরীহ স্ত্রীলোককে হত্যা! এখন কাউকে দিয়ে আপনার ওই নিরীহ মাষ্টার মশাইটিকে একবার ডেকে পাঠান ত।"

বাহিরের ঘর হইতে ভিতরে যাইবার যে দরজা সেখানে কমলা পিতার চুরোটের বাক্স হাতে কাট হইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। নরেন হত্যাকারী দস্যু! উঃ! এ কথা আগে জানিলে সে কি আর···! দুঃখে ও বেদনায় কমলার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

নরেন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই জয়েণ্ট সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ইংরাজীতে বলিলেন, "মিষ্টার নরেন্দ্রনাথ, আমি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। জাল নাম ব্যবহার করা এবং জাল লোক সাজার অপরাধে অদ্য আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। অতঃপর তোমার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি থানার হাজত ঘরে থাকিবে।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে বিবর্ণ-মুখ নরেন বলিল, "সতু!" সত্যেন্দ্রনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "সাট্ আপ্ ইউ রাস্কেল! মাকে খুন করতে বসেছ! ভাগ্যে ক্রীসমাসের ছুটিতে আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম না হলে আরও মাস খানেক খবর না পেয়ে কাকীমা কেঁদে কেঁদেই মারা যেতেন। মামাকে ও ভিতরের দরজার পরদার ওপারে মামীমাকে সম্বোধন করিয়া সত্যেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"আপনাদের এই গুণধর নরেনটিকে জানেন মামা? গৌরীপুরের জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়; বার্ষিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা; হতভাগা প্রেসিডেন্সী কলেজে চার বৎসর জালিয়েছে, এখনও জালাচ্চে। ওর জালায় মামা, কখন ফার্ষ্ট হতে পারলুম না। হোষ্টেলে এর ঘরে ওর ঘরে সমস্ত দিন গল্প করে কাটাত, আর কেমন করে যে একজামিনে ফার্ষ্ট হত কিছুই বুঝতে পারতুম না। বি-এ তে ও ইংলিশ ফিলজফিতে ডবল অনার্স নিলে। আমি কেবল মাত্র ইংরাজীতে অনার্স নিলুম। ভাবলুম ডবল অনার্স নিয়েছে পারবে না, বিশেষতঃ ও যে রকম আড্ডাধারী ছিল মনে ভরসা হল যে এবার ওকে বিট্ ডাউন করবই করবো। প্রাণপণে দিবারাত্রি খেটেছিলাম মামা, কিন্তু মাই গড্ যে সেকেণ্ড সেই সেকেণ্ড! রেজাল্ট বেরুলো, হতভাগা ডবল অনার্সেই ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট। রাগ করে ওর সঙ্গে এম্-এ দিলুম না। আই-সি এস্ দেবার জন্যে বিলেত চলে গেলুম।"

নীলরতন বাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "তা ওঁর এখানে এরূপ ছদ্মভাবে থাকার কারণ কি সতু ?"

"পাগলামী মামা—মীয়ার ইনস্যানিটি। মা একটী পাত্রী স্থির ক'রে পাকা দেখার দিন ঠিক করেছিলেন। গুণধর পুত্র (oath) ওথ নিয়েছেন কখনও বিবাহ করবেন না; চিরকুমার থেকে দেশের ও দশের সেবা করবেন। ওঁর মতে বিবাহ করলে মানুষ গণ্ডীর ভিতর পড়ে যায়, নিজের পরিবারবর্গের স্বার্থেই নিমগ্ন হয়ে থাকে। সংসারের গণ্ডীর বাহিরে একটা যে দেশব্যাপী বৃহত্তর সংসার আছে তার কোন সাহায্যই সে করতে পারে না। ফলে মাতা পুত্রে কথা কাটাকাটি, বিবাদ, অশ্রু বর্ষণ, এবং [illegible] গুণধরের পলায়ন। আমি সেদিন সকালে জানালা খুলতেই দেখি যে বাবু বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। মনে হল হয়ত ঠিক সেই রকমই দেখতে অন্য লোক। ··· কমলার মুখে শুনলাম মুখুয্যে, আর অজিতকে পড়াতে পারে। সন্দেহ ভয়ানক বেড়ে গেল। হোটেলে গিয়েই দেওয়ানজীকে আর্জ্জেণ্ট টেলীগ্রাম করলাম। জবাব সেই রাত্রেই পেলাম, আর দেওয়ানজী সশরীরে কাল রাত্রে এসে হাজির।"

দেওয়ান বসন্ত বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া গিয়া নরেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু-বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, এই রকম পাগলামীই কি করতে হয়। বৌমাত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবার সামিল। কত জায়গায় যে টেলিগ্রাম করেছি, আর লোক পাঠিয়েছি তা কি বলব। চার পাঁচখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, কিন্তু কোন খবরই পাই নি। শেষে সত্যেন বাবুর তার পেয়ে ছুটে আসছি।"

অন্তরাল হইতে কমলা ছুটিয়া গিয়া তাহার আদরের বেড়ালটাকে ধরিয়া লোফালুফি করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

কর্ত্তা আহারে বসিলে গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া অত্যন্ত ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "একালতী বেশীদিন ধরে করলেই মনটা কেমন

সন্দিগ্ধ হয়ে যায়। বাছাকে তুমি বিনাপরাধে কত রকম সন্দেহই না করেছ।”

নীলরতন বাবু কেবলমাত্র হুঁ বলিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনান্তে উঠিয়া গেলেন।

ইহার পরে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের মধ্যভাগে একদিন প্রাতে দেওয়ান বসন্তবাবু হঠাৎ এলাহাবাদে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ওখানে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই নীলরতনবাবু সাদর অভ্যর্থনায় বলিলেন, “আসুন, আসুন, দেওয়ানজী মহাশয়, ভাল আছেন বেশ? আগে খবর পেলে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে পারতুম।’

‘না, না, আমার কোন কষ্টই হয় নি। আর আমাদের এই পাকা হাড়ে সব রকমই অভ্যস্ত আছে। আপনার খবর সব ভাল ছেলেপুলেরা সব ভাল আছে?’

‘হ্যাঁ. ভগবানের কৃপায় সব মঙ্গল। সে দিন সেই [illegible] মধ্যে আপনাদের কোন যত্নই করতে পারি নি, আজকে আর ছাড়চি না। চা দিতে বলি। আপনি স্নান আগার সেরে বিশ্রাম করুন। কোন কথা থাকে ত এসে [illegible] শুনব।’ —দেওয়ানজী বলিলেন, ‘তাত বটেই নিশ্চয়ই আহার করবো। আর ভগবান দিন দেন ত এর পর অনেক দিনই আহার করবো।’ বলিয়াই দেওয়ানজী মহাশয় হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর চা খাইতে খাইতে দেওয়ান বসন্তবাবু বলিলেন, ‘আপনি ত সমস্তই শুনেছেন কেন শুভেন্দু বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়েছিল। কি বিপদেই যে পড়েছিলাম তা আর কি বলব।—ভগবানের কৃপায় সত্যেনবাবুর চক্ষে পড়েছিল তাই রক্ষে, নতুবা বৌমার যে কি অবস্থা হত ভাবলেও ভয় হয়। বাড়ীতে পৌঁছে কি কান্না! মাও যেমন কাঁদে, ছেলেও তেমনি কাঁদে। এখন বাবাজীর মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। মার মনে আর কষ্ট দেবেন না স্থির করেছেন। এখন ত দেখছি মার বড় বাধ্য।’

‘তা হলে কি বিবাহের দিন স্থির করে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন?’

‘আজ্ঞে না, বিবাহের দিন এখনও স্থির হয় নি। বাবাজী বিবাহ করতে সম্মত হয়েছেন বটে কিন্তু বৌমা যে পাত্রী স্থির করেছিলেন তাকে নয়। শুভেন্দু নিজেই মাকে বলেছে যে, আপনার কন্যা কমলার সহিত যদি বিবাহ দেন ত তার কোন আপত্তি নেই। আমরা আপনাদের পালটি ঘর; আর শুভেন্দু ছেলেটাও ভাল। সত্যেনবাবুর সঙ্গে বরাবর একত্র পড়েছে। সত্যেনবাবু আমাদের বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছেন। সব জানেন বৌমা সেই কারণেই আপনাকে অনুরোধ করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য আপনার মতামতের উপরই সমস্ত নির্ভর করছে।”

ইহার পরে আর যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলে পরবর্ত্তী ফাল্গুণ মাসের একদিন প্রাতে সালঙ্কৃতা ও সুসজ্জিতা হইয়া কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে মাতৃপিতৃচরণে প্রণাম পূর্ব্বক গৌরীপুর যাইবার জন্য শুভেন্দুর সহিত মোটরে উঠিয়া বসিল। যাইবার পূর্ব্বে উমা বলিল, “ওগো নরেন মাষ্টার, তোমার দেড় মাসের মাহিনা পাওনা আছে, টাকাটা নিয়ে একটা রসিদ দিয়ে যেও।”

মুখ নত করিয়া শুভেন্দু কহিল, “এখন ঠিকানা ত জেনেছেন, মনি অর্ডার ক’রে পাঠিয়ে দেবেন। পোষ্ট আফিস থেকেই রসিদ পাবেন।”

উমা কহিল, “কেন মনি-অর্ডার করতে যাব কেন। দু’হপ্তা বাদে তুমি নিজেই আসবে, এসে রসিদ লিখে দেবে। আর তা ছাড়া, একটা দাসখতও লিখে দেবে। আমি তোমার ভায়রাভাইকে ব’লে একটা মুসাবিদা করিয়ে রাখবো।”

শুভেন্দু সহাস্য মুখে কহিল, “মুসাবিদায় কি প্রয়োজন? আপনার বেলায় যে খত হয়েছিল সেইটে নকল করে নিলেই ত হবে।”

পশ্চাৎ হইতে একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন,—“তবে যে শুনেছিলুম বড় ভাল মানুষ, সাত চড়ে কথা বেরোয় না। এখন ত মুখে খই ফুটচে দেখছি!”

শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

গদ্য সাহিত্য

(১)

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম উপন্যাস 'বিষ বৃক্ষ'। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে উপন্যাস ভিন্ন বিবিধ রচনা সম্ভারের দীপ্ত আভায় তদানীন্তন বঙ্গীয় পাঠক সমাজ এক অপার্থিব আনন্দ রাজ্যের সন্ধান পায়, এবং তাহা চিরদিন সাহিত্যরসপিপাসুর চিত্ত সুধাসিক্ত করিবে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে রবির কিরণ যেরূপ নব নব শোভায় প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ প্রতিভাশালী কবির প্রথম, মধ্য ও শেষ রচনা বিভিন্নরূপ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বঙ্গদর্শনে পূর্ণতা লাভ করে। ভাদ্র মাসের কূলপ্লাবিনী গঙ্গার সহিত উহার তুলনা করা যায়। "কপালকুণ্ডলা" ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসগুলির রচনার সহিত বিষবৃক্ষের রচনা তুলনা করিলে সর্ব্বদিক দিয়া অভ্যুদয়ের চিহ্ন জাজ্জ্বল্যমানরূপে পাঠকের মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কি ভাব প্রকাশে, কি বর্ণনায়, কি চরিত্র চিত্রণে, কি অন্তর্দৃষ্টিতে, কি অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে বিষবৃক্ষের প্রাধান্য অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। উহার প্রমাণের জন্য এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থল হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিব। তৎপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসখানি শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বিধেয়।

এ বিষয়ে নানামুনির নানামত। তবে অধিকাংশের মত বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অত্যুত্তম উপন্যাস বলিয়া জ্ঞান করিলেও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রতি সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। স্যার গুরুদাসের মতে "দেবী চৌধুরাণী"ই শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। আবার কোন কোন মনীষী "আনন্দ মঠে"র প্রাধান্য দিয়া থাকেন। 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যাংশে যে একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এ বিষয়ে কোন মত ভেদ নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ

১

নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। পথে দুই একদিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নদীর জল, অবিরল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে, আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত অনন্ত ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গরু চরাইতেছে, কেহবা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহবা তামাকু খাইতেছে, কেহবা মারামারি করিতেছে, কেহবা ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক গালি দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাক ছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা

মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিত নয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ নিমজ্জিত কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণ বিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক। কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে, আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।'

লিপি কুশলতার চাতুর্য্যে, ভাষার মাধুর্য্যে, অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশে ও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে ইহার তুল্য বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে কেবল বিরল নহে, এইরূপ আর আছে কিনা আমি জানি না। ইহার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণরস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। শুধু বর্ণনায় নিখুঁত হইলেও পর্য্যাপ্ত হইত না। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব।

উদ্ধৃতাংশের কিছু পরেই, ঝড় বৃষ্টির কথা সহজ ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন।

(২)

'ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে মল্ল-যুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোফে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমৎ মোল্লার টুপী উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃষ্টি করিল। দাঁড়িরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সার্সী ফেলিয়া দিলেন, ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধ তমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহপ্রান্তর, পথ নদী কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বন বিটপি সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোৎমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক-খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে চমকিতে ছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারিসমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়। রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্তরব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতন শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধুনন শব্দ। মধ্যে মধ্যে শাসিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দুসকলের এক-কালীন পতন শব্দ।

নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর বৈঠকখানা, কাছারী বাড়ী, পূজার বাড়ী, নাটমন্দির, পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালার নিখুঁত বর্ণনা করিয়া ঐ বিবিধ স্থানে লোকদের কার্য্যকলাপ আলোকরশ্মি সাহায্যে চিত্রের ন্যায় মনোরম।

(৩)

গলায় মালা চন্দন তিলক বিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচ-কের দল, কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। অতিথি-শালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী জটা এলাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চে করিয়া দত্ত বাড়ীর দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগ-বদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোন উদরপরায়ণ

'সাধু' ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় অর্দ্ধকলা নড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া 'কথা কইতে যে পেলাম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল কথা কইতে যে' বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগী-রঞ্জন রসকলি কাটিয়া খঞ্জনীর তালে 'মধু কানের' কি 'গোবিন্দ অধিকারীর' গীত গায়িতেছে।

(৪)

সাবেক অন্দরে বহু সংখ্যক আত্মীয় কুটুম্ব কন্যা, মামী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কলকল করিত এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, 'জল আন' 'কাপড় দে' 'ভাত রাঁধলে না', 'ছেলে খায় নাই' 'দুধ কই' ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।

রন্ধনশালায়—সেখানে আরও জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা কাঁচা কাঠে ফু দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসে ভিজা কাট কাটাইয়াছে তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ততৈলে মাছ দিয়া, চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া আছেন, কেন না তপ্ততৈল ছিটকাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহবা স্নানকালে বহুতৈলাক্ত অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাঠি দিতেছে—যেন রাখাল পাঁচনী হস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটোল শাক কুটিতেছে। তাতে ঘস-ঘস কচ-কচ শব্দ হইতেছে; মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদীর স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসের জামায়ের বড় চাকরী হইয়াছে সে দারোগার মুহুরি, গোপাল উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে বিশ্ব-বাঙ্গালায় নাই, ইংরাজেরা নাকি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্টাচার্য্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস এইরূপ নানা-বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। কোনও কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী প্রাঙ্গনে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্য প্রাণ সংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীর গৌরব এবং হস্ত লাঘব দেখিয়া ভয়ে ক্ষান্ত হইতেছে না; কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদর্শনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাওবা ভাণ্ডারি ঘরে দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে, কাঙ্গালী, কুকুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারি করে না—তাহারা অবকাশমতে 'দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ' করে বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকার প্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটোলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

সকলেই জানেন বঙ্কিমচন্দ্র তামাক বড় ভালবাসিতেন এবং সুসজ্জিত আলবোলায় তামাক সেবনে বড় তৃপ্তি পাইতেন এবং প্রমোদপ্রমোদন করিতেন। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে দেবেন্দ্রনাথের তামাক খাইবার বর্ণনায় তামাকের পঞ্চমুখে উহার স্তুতিবাদ করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বর্ণনাটি বেশ উপভোগ্য।

৫

'হে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনী! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবোলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদাই যেন আমাদের নয়ন পথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁক্কে! হে আলবোলে! হে কুণ্ডলাকৃত ধূমরাশি সমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিত দীর্ঘনল সংসর্পিণি! হে রজতকিরিটমণ্ডিত শিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীট বিভ্রষ্ট ঝালর ঝলঝলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্বুবিত্ত বক্রাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভর্ৎসিতজন-চিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজন সাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও; ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও; বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক। তোমার গর্ভস্থ জল-কল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক। তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরোষ্ঠের যেন তিলেকের বিচ্ছেদ না হয়।

দুঃসাহসী বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালে আধুনিক দাম্পত্যপ্রেমের যে মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, শ্রীশচন্দ্র ও কমলমনির কথোপকথনের কিয়দংশের ভাষা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

৬

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌছে মহারাজ!"

ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আবার শশা চুরি নাকি?

ক। শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারী জিনিষ চুরি গিয়াছে।

শ্রী। কোথায় কি চুরি হলো?

ক। গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কানা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, তোমার দাদাবাবুর সোনার কৌটাত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়িটি কি?

ক। সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিখানি।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, 'তাই লোকে বলে যে, যে খেলে, সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই'—কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখ টিপিয়া দিলে শ্রীশ বলিলেন, "তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। তাও জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে, সে কাণা কড়িটি খোয়া গিয়াছে।

* * * *

শ্রীশ হাসিয়া বলিল, 'তা লাগতে এসো কেন?'

কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিল, "আমার খুসি লাগবো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন, "আমার খুসি বলবো।"

গোবিন্দপুরে গিয়া কমলমণির কুন্দনন্দিনীর সহিত আলাপ এইরূপ:—ওলো কুঁদী কুঁদী মুদী ছুঁদী, ভাল আছিস ত কুঁদী?

কুঁদী অবাক্ হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্ তো ঘুমিয়ে থাক্‌বি, আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

(৭)

হীরার বাড়ীর বর্ণনা।

হীরার বাড়ী প্রাচীর ঘাঁটা। দুইটা ঝরঝরে মেটে ঘর। তাহাতে আলপনা—পদ্ম আঁকা—পাখী আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান,—এক পাশে রাজা শাক, তার

কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুল গাছ পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাক সাজিয়া দেয়। হীরা কাল চুড়িপরা হাতখানিতে হুকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে।

(৮)

'টিট্-ফিট্-সিট-সিটি-খাট বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজন মাত্র কখনও কখনও শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান রাত ভীত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাত শিকল নাড়িলে বলে, 'কট্ কট্ কটা, তোর মাথা মুণ্ড উঠা। কড় কড় কড়াং, খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।' তাত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, কিট্ কিট্ কিটি! দেখি কেমন আমার হীরেটি! খিট খিট ছন্, উঠলো আমার হীরামন। ঠিট ঠিট ঠিঠি ঠিনিক—আয়রে আমার হীরামাণিক। হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল; বাহিরে দুয়ার খুলিয়া দেখিল স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল,—'কে ও গঙ্গাজল! একি ভাগ্য!' হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্র পোড়া মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা—কপালে উল্কি। কসে তামাকু পোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্রবাবুর দাসী নহে, আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই, কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্রবাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি?"

মালতী দুই আঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি? তোর মনের মত কথা তুই জানিস্ এখন চ।"

* * * *

কথা ব্যক্ত হইবার পর, হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি হীরা?"

হীরা—আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে—সে কি? তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা—আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন? হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে—একেই বলে স্ত্রীচরিত্র!

হীরা রাগিল—বলিল, "স্ত্রী চরিত্র? স্ত্রী চরিত্র মন্দ নহে। তোমাদের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বৌ হইলে কি হইতাম বলিতে পারি না। দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিলেন।

৯

ক্ষেত্রভেদে বিষবৃক্ষে নানাবিধ ফল ফলে। পাত্র বিশেষে বিষবৃক্ষে রোগ শোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্ত সংযম পক্ষে প্রথমতঃ চিত্ত সংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্ত সংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রবৃত্তি জন্য; প্রবৃত্তি

শিক্ষা জন্য। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্ত সংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না; অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখ ভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্তি, রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, নীরোগ শরীর, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকল ঘটিয়াছিল। প্রধান পক্ষে নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরসংকল্প; পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে, তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত ও প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী, ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান; অনুগতের প্রতিপালক, শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাগ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ; নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান; বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব তাহার তাহাতেই লোভ।......লোভ সংবরণ করার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্ত সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

হরদেব ঘোষালের নগেন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে একস্থলে আছে;—

১০

"মনের অনেকগুলি ভাব আছে তাহার সকলকেই ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য, আমরা আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃপ্রস্তুত হই" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্খায় নহে। সুতরাং রূপভোগ লালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্ত চাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকে আর্য্য কবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদের গাত্রে গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মের মৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহ মাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারে ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি, বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট ও সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপীয়র, বাল্মিকী, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কথোপকথনে ঐরূপ নীতি ব্যাখ্যা সমীচিন নহে বিবেচনায় লিপিকৌশলে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শিল্পকলা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই পত্রের শেষাংশে যে কথা লিখিত হইয়াছে বিশ্বের শান্তির জন্য ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা সেই কথা বিভিন্ন ভাবে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় উহা প্রকাশ করি।

১১

"ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেননা ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল ও অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসা মনুষ্য জাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্র

পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে আর থাকিবে না।

সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সন্ধানে চলিলেন। তৎকালীন তাঁহার মানসিক অবস্থা বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন।

১২

"যেমন দাবানলে বনদাহকালীন শাবক সহিত পক্ষীনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিনী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই বাসা নাই, শাবক নাই; তখন বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে সেই দগ্ধবনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেইরূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন অনন্ত সাগরে অতলজলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপনীয়া হইলেন।"

সীতাবিরহে রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থার বর্ণনায় কবি ভবভূতি অতুলনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিরহী নগেন্দ্রনাথের মুখে সূর্য্যমুখীর গুণাবলীর স্মরণ ভবভূতি বর্ণিত রামচন্দ্রের মুখে সীতার গুণাবলীর উল্লেখ অনেকের চিত্তপটে সমুদিত হইবে। আমার ধারণা যে এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতি অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

(১৩)

"সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার, আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য? আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

সূর্য্যমুখীর ঘরে চিত্রাবলীর বর্ণনার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

(১৪)

একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বত শিখরে বেদীর উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিত হেম বেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে, মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেইকালে হরধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্ত—পুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভু সম্মুখে প্রণাম জন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমি স্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধ সহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিত। মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে, বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে বসন্ত-প্রফুল্ল বন মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কাইত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন। আর এক চিত্রে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, উভয়ে এক রত্ন মণ্ডিত বিমানে বসিয়া শূন্য মার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া আর এক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নিম্ন পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমান চতুস্পার্শ্বে নানা বর্ণের মেঘ—নীল, লোহিত, শ্বেত—ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্য করে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতি দূরে "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা"—তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী "তমালতালীবনরাজিনীলা

সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে।

আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চ সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণ মধ্যে এক অত্যুচ্চ রজত নির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার একদিকে ভর করিয়া বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ নানালঙ্কারভূষিত প্রৌঢ় বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন, তুলা যন্ত্রের দুইভাগ ভূমি স্পর্শ করিতেছে। আর একদিকে নানা রত্নাদির সহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রীয় সেই ভাগ উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলা পাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নত দেহ বিশিষ্টা, পুষ্ট কান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা, কিন্তু—তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে। ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে। অধরে দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বর্ণ প্রতিমা রূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তিনি স্বামী প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষন্মাত্র অধর প্রান্তে হাসি হাসিতেছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির যেন জানেন না, কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্র বসন, শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ, তিনি আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন; বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় ও শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিকে বহু সংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহু সংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল স্বামীর সঙ্গে সোনারূপার তুলা?"

সর্ব্বশেষে রচনানৈপুণ্যের আদর্শ স্বরূপ যাহা বহু পুস্তকে স্থান পাইয়াছে তাহা পুনরায় উদ্ধৃত করিলাম। ইহা বার বার পাঠের যোগ্য।

(১৫)

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন, সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে। একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ। গৈরিক বর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ কপালে চন্দন রেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ—কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একেত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না তিনি সংসার ত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসার ত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারে স্তূপ স্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষ শিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক কিন্তু তথাপি মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় বেদনাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন. পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্ত্ত জন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্য দেহে কর স্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন, "দুর্গে এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র, তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকার মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশু সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পুর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে 'মৃণালিনী' শেষ উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে তাঁহার যে সকল উপন্যাসাদি প্রকাশিত হয় তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। বিষবৃক্ষ—১২৭৯ সালের বৈশাখে আরম্ভ হইয়া ঐ সালের চৈত্রে শেষ হয়।

২। ইন্দিরা—১২৭৯ সালের চৈত্র।

৩। যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ সালের বৈশাখ

৪। চন্দ্রশেখর—১২৮০ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮১ সালের ভাদ্রে শেষ হয়।

৫। কমলাকান্তের দপ্তর—১২৮০ সালের ভাদ্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের বৈশাখে শেষ হয়।

৬। রজনী—১২৮১ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণে শেষ হয়।

৭। রাধারাণী—১২৮২ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

৮। কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮২ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৮৪ সালের মাঘে শেষ হয়।

৯। কমলাকান্তের পত্র—১২৮৪ সালের পৌষ, ফাল্গুন ও ১২৮৫ সালের শ্রাবণ।

১০ রাজসিংহ—১২৮৪ সালের চৈত্রে আরম্ভ হয়। বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই।

১১। মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত—১২৮৮ সালের আশ্বিন।

১২। আনন্দমঠ—১২৮৭ সালের চৈত্রে আরম্ভ ও ১২৮৮ সালে শেষ।

১৩। দেবীচৌধুরাণী—১২৮৯ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৯০ সালের মাঘ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, বঙ্গদর্শনে সম্পূর্ণ হয় নাই।

মৃণালিনী উপন্যাসখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, চিন্তাশীল পাঠকের মনে এই ভাব উদিত হয় যে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী নাটকাকারে লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সে বাসনা পরিত্যাগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল উপন্যাসের মধ্যে 'মৃণালিনী' যত সহজে নাট্যাভিনয়ের উপযোগী করা যায় অন্য কোন উপন্যাস ঐরূপভাবে করিবার উপায় নাই। ইহার কারণ এই যে নাটকের ক্রিয়া বাহুল্য এবং ঐ কার্য্য করিবার সময় পাত্রপাত্রীর মনোভাব সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত, এই উপন্যাসে যেরূপ আছে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে সেরূপ নাই। ইহাতে বর্ণনার বাহুল্য নাই, কথোপকথনের আধিক্য। ইহাতে সঙ্গীতেরও প্রচুর সমাবেশ। এই সকল লক্ষণগুলিই নাটকের।

'মৃণালিনী'র ভাষা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সন্দেহ নাই, কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা' লিখিবার পর 'মৃণালিনী' লিখিত হওয়ায় ঐ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিপক্ক হস্তের রচনা-কৌশল স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্র—তুমি অধঃপাতে যাও, মনের কথা কিছু বুঝিলে ?

গিরিজায়া—বর্ষাকালে পদ্মের মত, মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।

হেমচন্দ্র—পরগৃহে কি ভাবে আছে ?

গিরিজায়া—এই অশোকফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।

গিরিজায়া কহিল, আগে কি জানি। বলিয়া গায়িতে লাগিল,—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "আগে কি জানি, বলিয়া গায়িতে লাগিল,—

"ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে।"

মৃণালিনী কহিল, "কূলে ফিরিয়া যাওনা কেন ?"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,—

"মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "তবে ডুবিয়া মর না কেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু— আবার গায়িল,—

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ, তরণীর অঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া এ কোন্ অপ্রেমিকের গান ?"

গিরি—কেন ?

মৃ—আমি হইলে তরী ডুবাই।

গিরি—সাধ করিয়া ?

মৃ—সাধ করিয়া।

গি—তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।

মৃণালিনীর গিরিজায়া চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অদ্ভুত সৃষ্টি। আর একটি অদ্ভুত সৃষ্টি মনোরমা।

২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ—

"হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে একখানি কুসুম নির্ম্মিতা দেবী প্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব। তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে। বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশলসীমা-রূপিনী বালিকা অথচ পূর্ণ যৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।"

৩য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

মনোরমা কহিল, 'ভালবাসিতাম কি ? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন ? কি ? আমি তোমার স্নেহের পাত্রী অপরাধী হইয়াছি বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে ? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে ? বলিতে বলিতে মনোরমার প্রৌঢ়ভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল পদ্মবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে লাগিল, চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল। কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিস্ফুট আগ্রহ কম্পিত হইতে লাগিল, বলিতে লাগিল "এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্পমাত্র। অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায় ? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হাঁ কৃষ্ণ, মানুষ সকলেই প্রতারক।"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ইহাকে এক-দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম।"

মনোরমা কহিতে লাগিল, তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহ স্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর পাদপদ্ম নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী, যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতার স্বরূপ, যে প্রণয় বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে সহস্রমুখী হয়; প্রণয় স্বভাব সিদ্ধ হইলে শত পাত্রে ন্যস্ত হয়, পরিশেষে সাগর সঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়, সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।"

হে—তোমার উপদেষ্টা কি বলিতেছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?

ম—পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে মনে স্থান দিবে, কেননা প্রণয় অমূল্য। তাই যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

এ স্থলে অনেকেরই মনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের "কুরুক্ষেত্রের" নিম্নলিখিত কবিতাংশ মনে পড়িবে।

সেই জন পুণ্যবান, কে না তারে ভালবাসে?
তাহাতে মাহাত্ম্য কিবা আর।
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে
সেইজন দেবতা আমার। ইত্যাদি

ঐ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে মনোরমার বালিকা ভাব কিরূপ সুন্দর বিকশিত হইয়াছে।

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম্ম ঝুলিতেছিল। মনোরমা চর্ম্ম হস্তে লইয়া কহিল, 'ভাই হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া?'

হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা।

মৃণালিনী উপন্যাসে, হেমচন্দ্রের দুর্ব্বার প্রেম ও কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃণালিনীর একনিষ্ঠ প্রেম যে শ্রীরাধিকার প্রেমের আদর্শে গঠিত ইহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। ইহাদের পরিচয় একে একে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি।

হেমচন্দ্র—মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ মন্ত্রণা কাহার? আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে মৃণালিনী আমার আঙ্গটী দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ নাই। আমার আঙ্গটী আপনি পাথের জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গটীর পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম কিন্তু আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এইজন্য বিনাবিবাদে আঙ্গটী দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে। যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া বাপের রাজ্য হারাইয়াছ, যবন গমণকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরার না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধ জয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃণালিনী পাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে? সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।"

হে—আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্য্যন্ত।

মা—তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেব ভক্তি? ভাল তাহাই না হউক। দেবতারা আত্মকর্ম্ম সাধন জন্য তোমার ন্যায় মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও তবে

কি প্রকারে শত্রু শাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীর গর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজ-বংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?

হে—রাজা,—শিক্ষা—সর্ব্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।

একনিষ্ঠ প্রেম, ও অনন্যসাধারণ ভাব মৃণালিনী চরিত্রে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। মৃণালিনী কর্ত্তব্যে অবহিতা কিন্তু প্রেমাস্পদের অদর্শনেও অধীরা। প্রাণাধিক প্রিয় হেমচন্দ্রের নিষ্ঠুরাচরণেও কোন রাগ নাই, অভিমান নাই, নিজের উপর দোষারোপ করে, প্রিয়তমের কোন দোষ তাহার চক্ষে পড়ে না।

মৃণালিনী—নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না।

গিরিজায়া—কেন? তিনি কি সেখানে নাই।

মৃ—সেইখানেই আছেন। কিন্তু তুমিত জান যে, আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব?

গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, "তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না?"

মৃ—না।

গি—তবে যাইতেছ কেন?

মৃ—তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

হেমচন্দ্র এক বার মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া স্থির করিয়া তৎপ্রেরিত লিপি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করেন। গিরিজায়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃণালিনীর নিকট সবিশেষে বিবৃত করিলে অশ্রুভারাক্রান্তমুখী মৃণালিনী গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া আর একবার তোমাকে যাইতে হইবে।"

গি—আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?

মৃ—পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন। এ সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব তুমি সঙ্গে চল।

…আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।

গি—প্রাণ বিসর্জ্জন! সে কি মৃণালিনী?

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।

অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধভরে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে বক্ষশ্চ্যুত করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিবার পর সোপানে আহতা জ্ঞানহারা মৃণালিনীকে গিরিজায়া আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল,—'ঠাকুরাণি আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?'

মৃণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত?"

গি—মাথায়

মৃ—মাথায় আঘাত? আমার মনে হয় না।

মৃণালিনীর সুখ কি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর মর্ম্মকথা কি সুন্দর লিপিকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাহার প্রেমের গভীরতা, একাগ্রতা ও পবিত্রতা একত্র সংযুক্ত।

গিরিজায়া—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?

মৃণালিনী—গিরিজায়া, হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার রাগ হইল, সে বলিল, 'ছি ঠাকুরাণি, তুমি এখনও সেই পাষণ্ডের দাসী?'

মৃণালিনী—গিরিজায়া, যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন তুমি স্থানান্তরে তাঁহার নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী, তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল এবং বলিল, হাজার বার

পাষণ্ড বলিব। পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?

মৃ—সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।

গি—ঠাকুরাণি! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।

গি—কি দেখিলে?

মৃ—বেদনা।

গি—কেন হইল?

মৃ—মনে নাই।

গি—তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাথরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না, বোধহয় আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিস্মিত হইল। বলিল, "ঠাকুরাণি! এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ—কেন?

গি—আপনি রাগ করেন না।

মৃ—আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি—তবে কি?

মৃ—হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল কবি ছিলেন না, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, দার্শনিক এবং নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। এ নিমিত্ত তাঁহার কবিত্ব ভিন্ন সমাজ, দর্শন ও নীতি বিষয়ে তিনি সকল উপন্যাসে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী উপন্যাসে ঐরূপ লেখা রীতি বিরুদ্ধ এবং হাল আইনে ইহা একেবারেই অচল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতেন না; তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। উহার দোষ গুণ আলোচনায় বিরত থাকিয়া 'মৃণালিনী' হইতে ঐরূপ দৃষ্টান্ত কয়েক স্থল হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশেও ইহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছি।

৩য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হেমচন্দ্র কহিলেন, তুমি এক প্রকার অন্যায় বলিতেছ না। বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে; লোক আত্মপরিকল্পনায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে "বিস্মৃত হও" এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকেও বলে না, অর্থচিন্তা ছাড়, যশের ইচ্ছা ছাড়, জ্ঞান চিন্তা ছাড়, ক্ষুধা নিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর; নিদ্রা ছাড়, তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড়; ভালবাসা কি এ সকলের চেয়ে ছোট? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় নূতন নহে—কিন্তু ধর্ম্মের অপেক্ষা নূতন বটে। ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম স্বতীত্ব। সেইজন্য বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর।"

মনোরমা—আমি অবলা, জ্ঞানহীনা, বিবশা, আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিনা। আমি এইমাত্র জানি ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

কেবল উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর কথোপকথনে নহে, স্বতন্ত্রভাবে উপন্যাসের কোন কোন স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপ ভাবে লিখিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

৩য় খণ্ড নবম পরিচ্ছেদ

"যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্য মধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, যে পৃথিবীর সুখ সে কখনও ভোগ করে নাই—। পরের সুখ কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে কোন আত্মচিত্তজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সহ্য করিতেছেন এবং করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তবিজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।"

৩য় খণ্ড দশম পরিচ্ছেদ

"ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাঁহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত—কথা কহিবে কি প্রকারে?

এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকট অবস্থিতিতে এত সুখ যে হৃদয় মধ্যে অন্য সুখের স্থান থাকে না। যে সে সুখ ভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার বাসনা করে না।

সে সময় এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা আগে বলিব তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্য ভাষায় এমন কোন শব্দ আছে যে সে সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারে ?"

"সপ্তদশ যবন সৈন্য গৌড় জয় করিল। হীনবীর্য্য বাঙ্গালী উহাদিগকে রোধ করিতে পারিল না। বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রাণে বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক শেলের ন্যায় বিঁধিয়া-ছিল। সত্যই কি কোন যুদ্ধ হইয়াছিল ? বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রকৃত তথ্য "মৃণালিনী"তে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীকে অগৌরবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

"সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির (প্রধান সেনাধ্যক্ষ) কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন।...দৌবারিকেরা রণ সজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই নিহত হইল।

...মহিষী—রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কী-পথে সুবর্ণ গ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজকুলকলঙ্ক অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড় রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।"

চিরদিনই বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছে। ক্লাইবের বাঙ্গালা জয় ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থল।

স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র এইজন্য সখেদে বলিয়াছেন, "ষষ্ঠি বৎসর পরে যখন ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজ উদ্দীন এইরূপ (ষোড়শ সহচর সহ বখতিয়ার খিলিজি গৌড় অধিকার করে) লিখিয়াছিলেন, ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে ? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমান কর্ত্তৃস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্র ফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মূষিক তুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রু হস্তে চিত্র ফলক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের গভীরতা তাঁহার যে কোন রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত। উপন্যাসেও উপযুক্ত অবসরে ইহা পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার এই ভাবটি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

রূমের পৌত্তলিক

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট্-ল

স্বর্গের উদ্যানপ্রান্তে অপরূপ ফলের গাছ,
সাদরা তুল মান তাহা, .
তাহে বসি জিব্রাইল, দেখেন বিশ্বের শোভা,
কিবা মনোরম আহা !

সহসা শ্রবণে তাঁর পশিল স্রষ্টার বাণী ;
"তুমি ভক্ত মম, স্তব তব সত্য বলে মানি !"
নিজ মনে কহিলা ফেরেস্তা, কে এই ভাগ্যবান ;
স্তবে যার বিগলিত হয়গো, মহাপ্রভুর প্রাণ !
সঞ্চালিয়া পক্ষপুট, ফেরেস্তাপ্রবর, ধায় ধরাধামে ;
নিজ চোখে, দেখিতে সেই মহাভাগে, সিদ্ধ মনস্কামে !
নদনদী, পর্ব্বত প্রান্তর, কানন কান্তার,
সন্ধান কোথাও নাহি, পেলাম তাঁহার !
ব্যর্থ মনোরথ, বসিলেন পুনঃ গিয়ে, সাদরা শাখা পরে ;
মহাপ্রভুর, বাণী পুনঃ, পশিল তাঁর শ্রবণ কুহরে !
অদম্য কৌতূহলে, বিচলিত হল এবে, অন্তর তাঁর ;
আল্লার সাহায্যে, খুলিবেন নিশ্চয়, এ রহস্য দ্বার !
সঞ্চালিয়া পক্ষপুট, গেলেন ফেরেস্তা, দীগমণ্ডলের সুদূর ওপারে ;
মহাপ্রভু বিরাজেন যেথা, অতুল গৌরবে, আরশে মো আল্লা পরে !
বিনীত কণ্ঠে, কহিলা ফেরেস্তা, প্রভু মোর, কে সেই ভাগ্যবান ;
যার স্তব শুনি, অন্তর তব ধরণী পথে, হয় ধাবমান !
কহিলেন মহাপ্রভু, রূম দেশে বৎস্য, অমুক নগরে ;
গেলে দেখা পাবে, ভক্তের মম, অমুক মঠের ভিতরে !
চোখের পলকে, অতিক্রমি কোটি কোটি যোযনের পথ ;
ব্যাগ্র, ব্যাকুল অন্তরে ;
মঠ দ্বারে উতরিলা জিব্রাইল, হেরিতে সেই
ভাগ্যবান বান্দারে !
একি, এযে এক পৌত্তলিক, প্রতিমার সম্মুখে, নতজানু হয়ে বসি
স্তব স্তুতি করে যায়, একান্ত ভক্তির সাথে, মিথ্যারে সম্ভাষি !

কাণ্ড দেখি তার, বিস্ময়ে হইল অবাক, মহামতি জিব্রাইল ;
একি ব্যাপার, পৌত্তলিক শেষে, দখল করিল, আল্লার দীল !
দ্বিগুণিত বেগে, ধাইলা ফেরেস্তা পুনঃ, আকাশের পথে ;
অদ্ভুত এ সমস্যার, বদ্ধ দ্বার, আল্লার সাহায্যে খুলিতে !
সম্বোধি আল্লারে, কহিলা ফেরেস্তা, প্রভু মোর ওগো বিশ্বরাজ, একি কাণ্ড তব ;
মোর পৌত্তলিক, মিথ্যার পূজারী, তার প্রতি কর তুমি আজ, প্রেম অনুভব ?
ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে, সম্বোধি জিব্রাইল, ফেরেস্তাপ্রবরে ;
কহিলেন মহাপ্রভু, হয়োনা বিস্মিত বাছা, মম ব্যবহারে !
একান্তই ভক্ত মম, রূমের এই পৌত্তলিক ;
আমারেই পূজিছে, সদা সে জন, দিকবিদিক !
সরল পথের সন্ধান যদিও পায় নি সে ;
তবুও আমারে, কভু তো বাছা, ছাড়েনি সে !
পুতুলে আশ্রয় করি, আমারি পথে, সদা সে ধাইছে ;
দিবানিশি, আমারি কথা ভাবিছে, আমারি তরে সে কান্দিছে !
সব পাপ, তাই তার, ক্ষমেছি আমি ;
ভক্তের অন্তর দ্রষ্টা, আমি অন্তর্য্যামী !
ভ্রান্তির বিঘ্নসঙ্কুল পথ বেয়েই আসিবে সে, স্বর্গের দ্বারে ;
সত্য ভক্ত যে জন, হাত তার মহান আল্লা, কভু নাহি ছাড়ে !
ফিরে যাও ধরাধামে, জানাও এখনি তারে শত শত সালাম আমার ;
শ্রেষ্ঠ ভক্ত মম, তার-তরে নিশ্চয় খোলা আছে, জিন্নতের দ্বার !
নমিলেন ফেরেস্তাপ্রবর, মহাপ্রভু পদে, একান্ত ভক্তির সাথে,
বিভুর আদেশ লয়ে, উড়িলেন মহানন্দে, পুনঃ ধরা পথে !

জরা ও মৃত্যু

"ডাক্তার"

জীবনের সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে, কেশে যখন পাক্ ধরে, তখন ঊর্দ্ধপানে চেয়ে কবি পরকালের ডাক শুনতে পান কিনা জানি না কিন্তু যারা নিতান্ত মাটীর মানুষ, আমাদের দৃষ্টি পড়ে নিজের দেহের দিকে। দেখতে পাই, মাথায় কালোর চেয়ে সাদা চুলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, দাঁতেও তেমন আর জোর নেই—তারা যেন নিজের জায়গায় আর বেশী দিন থাকতে রাজি নয়, মনে ভরসার চেয়ে ভয়ই বেড়ে গেছে ; এই রকম নানা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়। ক্রমে আরও যখন বয়স্ বাড়ে "শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের কথা" মাঝে মাঝে মনে উঁকি মারে। মনে হয় যেন শরীর যন্ত্রের নানা জায়গায় মরিচা ধরেছে, এ মরিচা কোন রকমেই পরিষ্কার হয় না যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে যন্ত্র একেবারেই অচল করে দেবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হয়।

দেহকে একটা বিরাট যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা প্রথা আছে এবং সত্য সত্যই দেহের সঙ্গে মানুষের তৈয়ারী যন্ত্রের খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। অন্য যন্ত্রের মতনই এর ক্ষয় হয় এবং একে সচল রাখতে হ'লে, সে ক্ষয়ও সময় মত মেরামত করতে হয়, মাঝে মাঝে কোনও কোনও অংশ বদল করিতেও হয়, তবে নির্জীব যন্ত্র মেরামত মানুষে করে আর এই সজীব যন্ত্র নিজেই খাদ্য থেকে উপাদান নিয়ে সেই কাজ করে। এতদিন যেখানে যা কিছু ক্ষয় হয়েছিল সে সমস্ত বেশীর ভাগই বেশ নিপুন ভাবে মেরামত কিম্বা বদল হয়েছিল,—কিন্তু এই মেরামত কিম্বা বদলেরও ত একটা সীমা আছে! শৈশবে প্রথম যে দাঁত ওঠে সেগুলি তত মজবুত নয়—কিছুদিন ব্যবহারেই তাদের শক্তিক্ষয় হয়ে আসে—সেগুলি পড়ে যায়, আবার তার জায়গায় নূতন দাঁত ওঠে কিন্তু সেগুলিও যখন অনেকদিন ব্যবহারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে তখন আর নূতন দাঁত হয় না।

জরার প্রথম লক্ষণ শরীরের কাঠামোতে প্রকাশ পায় না—তার প্রকাশ হয় বিশেষ বিশেষ অঙ্গে, যেমন মস্তিষ্ক পেশী, মূত্রগ্রন্থী প্রভৃতি। ছেলেবেলা স্মরণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ থাকে, বার্দ্ধক্যে সে রকম থাকে না। জরা যে সমস্ত অঙ্গে এক সঙ্গেই আরম্ভ হয় এবং একই ভাবে বৃদ্ধি পায় তা নয়, কোনও অঙ্গে ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি আবার কোনও অঙ্গে দ্রুত। বয়স হ'লে মুখে বলীরেখা দেখা যায়—তার জন্য সৌখীন লোকে নানা রকম ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করেন। দেহের চামড়ার নিচেই মেদ এবং মাংস থাকে—বয়স্ হলে এই মেদ কম হয়ে যায় বলে তার উপরকার চামড়া আগের মতন মোলায়েম হয়ে বসে না, লোল হয়ে পড়ে এবং সেই জন্য কুঞ্চিত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে—যেমন চল্লিশ বছর বয়সের পরই চখে চালিশা ধরে। বয়স হলেই, শ্রবণ শক্তি, চিন্তাশক্তি এমন কি পরিপাকশক্তি ক্রমেই কম হয়ে আসে। কিন্তু সকলেরই যে সব ইন্দ্রিয়, একই সঙ্গে, সমান ভাবে কম জোর হয়ে যায়—তা নয়। এবিষয়ে ব্যতিক্রমই হচ্ছে বিশেষত্ব। অন্য অনেক বিষয়ে পঙ্গু হলেও, অনেকের ধীশক্তি অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যে তীক্ষ্ণ থাকে সেটা প্রায়ই দেখা যায়। দেহকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেও বলা যায় যে নির্জীব যন্ত্রেরও সব অংশ একই সঙ্গে খারাপ হয় না—মানুষ ত সজীব।

জরার রাসায়নিক কারণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। খাদ্যের ক্যালসিয়ম্ বা চুন দেহসাৎ করবার ক্ষমতার সঙ্গে এর যে এক বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। এ ভিন্ন অনেকের মতে, স্বাভাবিক কারণে শরীরের যে ক্ষয় হয় এবং সেইজন্য যে আবর্জ্জনা হয় সেগুলি ঠিক মত পরিত্যক্ত হয় না বলে সেগুলি বিষের কাজ করে এবং দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ক্রমশঃ ক্ষয়ের জন্য এমন দিন

আসে যখন দেহের অতি প্রয়োজনীয় কোনও অঙ্গ—যেমন হৃদযন্ত্র কিম্বা মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু হয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যদিও দেহ মানে কোটী কোটী কোষ সমষ্টি কিন্তু কোষের পক্ষে মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে কোনরূপ দুর্ঘটনা না হলে, যেমন খাদ্যাভাব বা বিষ প্রয়োগ, কোষ মাত্রেরই অনন্ত জীবন। প্রশ্ন হতে পারে—সেই কোষ দিয়েই যখন দেহ তৈরী হয়েছে তখন দেহের মৃত্যু হয় কেমন করে? গরুর গাড়ীও যন্ত্র আবার মোটর গাড়ীও যন্ত্র কিন্তু মোটর গাড়ী যত সামান্য কারণে অচল হয় গরুর গাড়ী তেমন হয় না; তার মানে মোটর গাড়ীর ভিতর এত বেশী খুঁটিনাটী যন্ত্র আছে যে সেগুলি খারাপ হতেও দেরী হয় না এবং সেগুলি একটু বিকল হলেই গাড়ী অচল হয়। দেহের বেলাতেও তেমনি—কোষ জিনিষটি এতই সরল এবং সহজ ভাবে তৈরী যে সেটীতে খারাপ হ'বার মতন ব্যাপার খুবই কম কিন্তু দেহ অতি সূক্ষ্মভাবে এবং জটীল ভাবে তৈরী, তার প্রত্যেক অংশের ওপর নির্ভর করছে তার কার্য্য ক্ষমতা সেইজন্য সেটা খারাপ হ'বার সম্ভাবনাও খুব বেশী। যন্ত্র যত বড় হয় তার খারাপ হ'বার সম্ভাবনাও তত বেশী হয় এবং সেই খারাপ হওয়ার কারণও খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। দেহ যদিও কোষ সমষ্টি এবং কোষের যদিও স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয় না—কিন্তু এক্ষেত্রে কোষগুলি একটি বিরাট যন্ত্রের অঙ্গমাত্র; সেই যন্ত্র যদি কোনও কারণে অচল হয় তাহা হইলে কোষেদের খাদ্যাভাব হয় কিম্বা তাদের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত হয় এবং তখনই তাদের মৃত্যু হয়।

মৃত্যু অনিবার্য্য—একথা মানুষ বেশ ভাল করে জানে বলেই অনাদিকাল থেকে তার চেষ্টা মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া বা ঠেকিয়ে রাখা। সাধারণ মানুষের কাছে অতি মানবের একটা গুণ হচ্ছে অনেক বেশী দিন বেঁচে থাকবার ক্ষমতা। দেবতাদের কথা ছেড়ে দিলেও, পুরাণে যাদের মানুষের পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে তাঁদের আয়ু দু'কুড়ি চার কুড়ি হিসেবে থই পাওয়া যায় না। এমন কি দুইশত চারশত নিতান্ত নগণ্য—তাঁদের আয়ু হিসাব করা হয় সহস্র দিয়ে। কেবল বেঁচেই তাঁরা থাকতেন না, তাঁদের ছিল অটুট যৌবন। রাজা দশরথ সহস্র বৎসর বয়সেও পুত্র কামনা করেছেন। আমাদের এখন আর সহস্রায়ু হবার আকাঙ্খা করবার মতন মনের জোর নেই, আমরা এখন শতায়ু হলেই ভাবি পৃথিবীর লোক চমকে যাবে।

শতায়ু যে হওয়া যায় এবং সেটা যে খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয় তার প্রমাণ অনেক আছে। শত বৎসরের বেশী বয়স এমন লোক অনেক দেখা যায়—অন্ততঃ খবরের কাগজে পড়া যায়। তাঁদের সকলেই যে শত বৎসর পার হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও অনেকের যে বাস্তবিক শত বৎসর কিম্বা তার কাছাকাছি একটা বয়স সেটা বলা যেতে পারে। প্রাণী জগতে কিম্বা উদ্ভিদ জগতে বহুদিন বেঁচে আছে এমন উদাহরণের অভাব নেই। ভূষণ্ডী কাকের কথা বাদ দিলেও, অনেক পরিবারে দুই তিন পুরুষ ধরে একই কাকাতুয়া বেঁচে থাকতে দেখা যায়। কুমীর এবং কচ্ছপের পরমায়ু ত কিম্বদন্তীর মতন। শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে বুড়ো বট বহু দিনের ইতিহাসের সাক্ষী স্বরূপ বেঁচে থেকে যদিও সেদিন মারা গেছে কিন্তু তার ডাল পালা থেকে যে সব গাছ জন্মেছে তারা এখনও বেশ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। দেরাদুন ফরেষ্ট কলেজে একটা গাছের গুড়ী রাখা আছে তার পরমায়ু যে অন্ততঃ আট শ' বছর হয়েছিল সে প্রমাণ তার গায়েই লেখা আছে। চার পাঁচ হাজার বছর পরমায়ু হয় এমন গাছের কথাও শোনা যায়।

মানুষকে পাখীর মতন খাঁচায় পুরে কিম্বা ঐ রকম ভাবে সাবধানে রাখা যদি সম্ভব হত তা হলে তার আয়ু যে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী হ'ত সেটা আন্দাজ করা যেতে পারে। একবার সহরের রাস্তা পার হতে, হয়ত গাড়ী চাপা না পড়ে কোনও রকমে বেঁচে ফেরা যায় কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টার দরুণ যে মানসিক উত্তেজনা হয় তা'তে আয়ুক্ষয়ই হয় বৃদ্ধি হয় না। মানুষের আয়ু কম হ'বার আর একটি কারণ—আমরন তার নূতন অভিজ্ঞতা লাভের বাসনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সারাজীবন গরম দেশে বাস করার পর পরিণত বয়সে হাঠৎ কাশ্মীর যাওয়া কিম্বা

সুইডেন যাওয়া যে স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় এটা নিশ্চিত।

শরীরে অনেকগুলি Gland বা গ্রন্থী আছে—মস্তিষ্কে পিটুইটারী, পিনিয়াম, গলার থাইরয়েড্ পেটে এ্যাড্রিনাল প্রভৃতি। এই সব গ্ল্যাণ্ডের (Gland) কাজ বিভিন্ন রস তৈরী করা। কতকগুলি গ্ল্যাণ্ডের রস শরীরে অন্যত্র যাবার বিশেষ নালী আছে, কতকগুলির সে রকম কোনও নালী নাই। একেবারে রক্তেই তার রস মেশে; আবার কতকগুলি একাধিক রস তৈরী করে—তার মধ্যে কোনও রসের জন্য নালী আছে আবার অন্য রস সোজা রক্তে মেশে। যে সব রসের বিশেষ নালী আছে তার মধ্যে পড়ে লিভার বা যকৃতের রস, যাদের নালী নাই তাদের মধ্যে নাম করা যায় পিটুইটারী, এ্যাড্রিনাল থাইরয়েড প্রভৃতির রস আর যাদের দুরকম ব্যবস্থা আছে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে প্যানক্রিয়াম এবং Testes বা শুক্রাসয়। প্যানক্রিয়াসের যেটা জীর্ণ করিবার রস সেটার জন্য নালী আছে এবং আর একটা রস যার নাম Insulin (ইন্সুলিন), যার অভাবে ডায়াবিটিস হয়, সেটার জন্য বিশেষ কোনও নালী নেই সেটি সোজা রক্তে মেশে। যে সব গ্রন্থীর রস সোজাসুজি রক্তে মেশে তাদের ইংরাজীতে বলে Endocrine glands এবং সেই রসের নাম হচ্ছে Internal Secretions।

মানুষের জীবনে এই সব internal secretionএর কার্য্যকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক—মনের দিক থেকেও বটে আবার দেহের দিক থেকেও বটে। পিটুইটারী যদি কোনও কারণে বিগড়ে যান তা হলে মানুষের চেহারা অত্যন্ত বদখৎ এবং ভীষণ হয়, থাইরয়েড্ বেঁকে দাঁড়ালেও চেহারা কিম্বা বুদ্ধি মোটেই সুবিধার হয় না। এদের মধ্যে কোনও একটি যদি কোন কারণে খারাপ হয় তা'হলে হয় অন্য কোনও গ্ল্যাণ্ডের ওপর খুব বেশী কাজের চাপ পড়ে কিম্বা হয়ত আর একটি গ্ল্যাণ্ড লাগামহীন ঘোঁড়ার মতন বেয়াড়া চালে চল্‌তে আরম্ভ করে।

পণ্ডিতেরা বলেন মানুষের জীবন যাত্রা নির্ভর করে এই সব Endocrine glandএর কার্য্যকারিতার ওপর। এরা যদি ঠিক্ তাল মাফিক চলে তা হলে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না। অনেক পণ্ডিতের মতে জরার একটি কারণ হচ্ছে শুক্রাশয়ের internal secretionএর (যে রস সোজাসুজি রক্তে মেশে) অভাব। এই রসের কাজ দেহের শক্তি ও কমনীয়তা বজায় রাখা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন শুক্রাশয়ের ক্ষমতা কমে আসে তখন জরা ধীরে ধীরে দেহকে আক্রমণ করে। Steinach অপারেশন করে এর অভাব রোধ করবার চেষ্টা করছেন এবং কতকটা সক্ষমও হয়েছেন—সময় মত এই অপারেশন করলে জরার গতি কতকটা রোধ হয়। Voronoff অন্য প্রাণীর এই গ্রন্থি মানুষের শরীরে লাগিয়ে দিয়ে (অনেকটা গাছের কলম লাগানোর মতন) তাঁর চেয়ে একটু বেশী কৃতকার্য্য হয়েছেন। আবার অনেকের মতে এই রসের ইঞ্জেক্‌সন্ দিলে যৌবন ফিরে আসতে পারে। যৌবন যদি কেবল শুক্রাশয়ের internal secretionএর ওপর নির্ভর করিত তা হলে হয়ত তাকে ধরে রাখবার আশা কিছু বেশী হ'ত কিন্তু কেবল শুক্রাশয় বাঁচালেই চলবে না, অন্যান্য গ্রন্থীদেরও রক্ষা করিতে হবে। দেহটা যদি আদর্শ যন্ত্র হ'ত তা'হলে জরাকে দূরে রাখা কিছু সহজ হ'ত কারণ তা হলে ক্ষয় সব জায়গায় সমান ভাবেই হ'ত এবং সেই ক্ষয়ের হিসাব পাওয়া যেত বলে পূরণ করাও সহজ হ'ত কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য—ভবিষ্যতে হয়ত এমন দিন আসবে যখন মানুষের গড়পড়তা আয়ু অনেক বেশী হয়ে যাবে কিন্তু মনে হয়না এমন দিন আসবে যখন মৃত্যুকে মানুষ একেবারেই জয় করবে।

মৃত্যু মানে কি? রামবাবু মারা গেলেন তারপর পৃথিবী দুটি জিনিষ হারাল। প্রথম হচ্ছে তার দেহটা নষ্ট হয়ে যায় যদি সেটাকে বিশেষ কোনও উপায়ে রক্ষা না করা যায়। কিন্তু সেটাত পৃথিবী থেকে একেবারেই চলে যায় না। দেহটা যে সব জিনিষ দিয়ে তৈরী অর্থাৎ কার্ব্বন, ইত্যাদি সেগুলি সবই এখানে থাকে। দ্বিতীয় জিনিষ যেটা পৃথিবী হারায় সেটা হচ্ছে তাঁর নিজত্ব অর্থাৎ যে কারণে তাঁকে রামবাবু বলে লোকে চিনতে পারত—তাঁর চেহারার সঙ্গে কিম্বা চরিত্রের সঙ্গে শ্যামবাবুর অনেক মিল হয়ত ছিল কিন্তু তবুও তাঁর নিজের একটা বিশেষত্ব ছিল যেটা শ্যামবাবুর ছিল না।

দেহ নষ্ট হওয়া বা দেহের প্রোটোপ্লাজম্ নষ্ট হওয়াই যদি মৃত্যুর লক্ষণ হয় তাহলে প্রায় সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের অহরহ মৃত্যু হচ্ছে। মানুষের শরীরে ক্ষয় অনবরত হচ্ছে, ভিতরে কি হয় সে কথা বাদ দিলেও আমরা দেখতে পাই নখ চুল প্রভৃতি ক্রমাগতই উঠে যাচ্ছে। গায়ের চামড়াও উঠিয়া যায়—এমন কি হিসাব করিয়া দেখা হয়েছে যে স্নায়ু বাদ দিলে মানুষের শরীরের কোনও অঙ্গই ছ' বছরের বেশী বাঁচে না—অর্থাৎ তার মানে এই নয় ঠিক ছ' বছর পূর্ণ হ'ল অমনি পুরানো লিভার চলে গেল তার জায়গায় নূতন লিভার এল এর অর্থ হচ্ছে। ক্ষয় এবং ক্ষয় পূরণ হিসাব করলে দেখা যায় ছ' বছরে পুরানো অঙ্গটা সবটাই ক্ষয় হয়ে গেছে এবং তার জায়গায় নূতন অঙ্গ হয়েছে। এ ভিন্ন আমরা দেখতে পাই হরিণের শিং বছর বছর পড়ে গিয়ে তার জায়গায় নূতন শিং তৈরী হচ্ছে। শরীরের মধ্যে এই যে অবিশ্রাম ভাঙা গড়া চলছে, এর মাল মশলা আসে খাদ্য থেকে কিন্তু এর জন্য যে শক্তি দরকার হয় তার অনেকটা আসে প্রোটোপ্লাজম্ ভেঙে। এই সব ব্যাপারকে যদি মৃত্যু বলা যায় তাহলে মৃত্যু কথাটার কোনও মানে থাকে না। শরীরের এমন কোনও অঙ্গ যদি মারা যায় যার দরুণ সমস্ত কোষ অচল হয়ে যায়, যেমন হৃদ্‌যন্ত্র, তাহলেই মৃত্যু হয়েছে বলা যেতে পারে! একটা পা কিম্বা একটা হাত কাটা গেলে যদিও অনেকগুলি কোষ ধ্বংস হয় কিন্তু তাকে মৃত্যু বলা যায় না।

রামবাবু মারা যাওয়ার দরুণ তাঁর দেহের সমস্ত কোষ ধ্বংস হয়ে গেল, এ কথাটা সত্য হয় তখনই, যদি তিনি নিঃসন্তান মারা গিয়ে থাকেন। যদি তিনি একটি মাত্র সন্তান রেখে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয় যে তাঁর দেহের একটি কোষও আজ জীবিত আছে। মোটর কার যখন খুব বেশী পুরানো হয়ে যায় তখন আর তাকে মেরামত না করে নূতন কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেহ যখন খুব পুরানো হয়ে যায় তখন প্রকৃতির মতেও তার পিছনে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করে নতুন সৃষ্টি করাই সহজ।

"ডাক্তার"

একটি মিথ্যার গতি

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌-এ,বি-এল্‌

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন কাটিল, মেঘনাদ অভিযোগটি প্রত্যাহার করেন নাই। খবরের কাগজ সংবাদটা ছাপিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যত বেশী প্রচার ইহার হইতে লাগিল ততই ইহার প্রত্যাহারের ব্যবস্থায় লোকসমাজে হেয় হইবার বিভীষিকা ও যতদিন কাটিতে লাগিল ততই উহার দুরূহতা মেঘনাদকে অস্থির করিয়া তুলিল। দিনের পর দিন তাহার মনের শোচনীয় ভাব বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

মেঘনাদ ভাবিলেন-- ইহার ফল হইবে নিজের সুনাম নিজেই পদদলিত করা। করুণা-প্রণোদিত হইয়া গাইনের সাহায্য করার ফল কি অতদূর গড়াইবে? আর তাহার শত্রুরা? তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে উহারা সুযোগ পাইলেই একটু তৃপ্তির হাসি মুখ টিপিয়া হাসিয়া লইবে ইহার উল্লেখ করিয়া। সমস্ত সহরের লোকের কাছে যেরূপ অপদস্থ তাহাকে হইতে হইবে ইহার জন্ত তাহা ভাবিয়া তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। এক কথায় ইহারই জন্য তাহাকে থাকিতে হইবে সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া

সমস্ত সহরের লোক তাহার মতে, দুইভাগে বিভক্ত—একদল তাহাকে প্রশংসা করে, সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে ও অপর দলটি তাহার নিন্দা ও অনিষ্ট সাধনে তৎপর। ইহাছাড়া আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক তাহার নজরে পড়ে না। প্রথম দলের লোকেরা তাহার কাছে সৎ ও ন্যায়-নিষ্ঠ, দ্বিতীয়েরা—অসৎ, হিংস্র ও নিন্দাপরায়ণ। বর্ত্তমান সময়ে সহরে আর কোনো আন্দোলনই নাই। সবাই ব্যস্ত তাহারি এই বিষয়টির আলোচনায়। সহরের প্রতি ঘরে-ঘরে, পথে-ঘাটে, আড্ডায়, চায়ের দোকানে, অফিসে বৈঠকখানায় সর্ব্বত্র এই বিষয়েরই আলাপ-আলোচনা হরেক রকম হাব ভাব ও ভঙ্গিমা সহকারে। উত্তেজনায় সহর তোলপাড় ইহা লইয়া। কি যে সাংঘাতিক অবস্থা তাহাদের ঘটিবে ইহারি মধ্যে যদি তিনি তাঁহার স্ত্রীর এই নির্ব্বোধ অভিযোগের গূঢ় কথা সবার কাছে ব্যক্ত করেন। ইহা ভাবিয়াই মনটা তাঁহার বাঁকিয়া বসিল।

কিন্তু বহুলোক ত ইহারই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্ত তাঁহার কাছে আসিতে সুরু করিয়াছে! কি জবাব তিনি দিবেন তাহাদের! কিছু ত' একটা বলিতেই হইবে। প্রথম প্রথম প্রকৃত উত্তরটি এড়াইয়া চলিতে তিনি চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহাতেও ত' তাহাদের সন্দেহ জন্মান খুবই স্বাভাবিক! অবশেষে তিনি ভাবিলেন—"কি মূর্খ ই না আমি? কোনো একটা কৌশলে এ নালিশটা যখন তুলেই নিতে হবে আমার, তখন সে সময়টা পর্য্যন্ত যাইনা বলি, কি আসে যায় তাতে? এবং এই চিন্তা অনুযায়ী একদিন তিনি নিজ মুখে এই গুজোবের সত্যতা স্বীকার করিয়া ফেলিলেন—অনেকটা প্রশ্ন কর্ত্তার কবল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই।

কিন্তু লোকটি চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই আবার ভাবনায় তাঁহার মন অধীর হইয়া উঠিল—'তবে ও যে গিয়ে সবারই কাছে ব'লে বেড়াবে, আমার মুখ থেকেই ও এই জালের ব্যাপারটা শুনেছে। আর নিজ মুখে ব'লে ফেলে আবার আমি কি ক'রেই বা সেটা প্রত্যাহার ক'রব?'

যাহা হউক, এখন এটা স্থির হইয়া গেল যে কোর্টে সোজাসুজি গিয়া ইহার প্রত্যাহার করা আর চলিবে না। এই ভাবেই তাঁহাকে এখন চলিতে হইবে। ফলে বাধ্য হইয়া এই মিথ্যা তাঁহাকে পর পর অসংখ্যবার বলিয়া

যাইতে হইল। কিন্তু মিথ্যার এই বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিটি প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহাকে পীড়া দিত, তবুও ঐ মিথ্যা দ্বারাই আবার দিনের পর দিন তাঁহাকে সেই মূর্ত্তির পরিপোষণ করিতে হইত। অবস্থাটি তাঁহার দাঁড়াইল সার্কেসের সিংহের মাষ্টারেরই মত। সিংহটির দিকে তাকাইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও পিছন ফিরিবার উপায় নাই, একটি বারের তরেও এধার ওধার করিতে পারিবেন না—এমন কি ভীত ভাবটি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলে মৃত্যু। সেই মিথ্যাকেই দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া থাকিতে হইবে তাঁহাকে!

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রভাত। বৃদ্ধ উঠানের এদিক-ওদিক পাইচারী করিতেছেন। কখনও বা অন্তঃবলে ঢ়ুকিয়া প্রায় অহেতুক সহিসটাকে একটু বকিয়া ঝকিয়া লইলেন; কখনও বা অন্য দিকে ছুটিয়া গেলেন—যেন তিনি কতই ব্যস্ত। এদিক ওদিক চাহিয়া যখন দেখিলেন কেহ কোথাও নাই তখন মাটির দিকে চাহিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া হাতটি ছুঁড়িয়া তিনি বলিলেন—"আর কিছু না…ঐ বিক্রমের বিদ্রূপ ও উল্লাসের ভয়টা যদি না থাক্‌ত?" ঊর্দ্ধদিকে তাকাইলেন…"নাঃ, তা যে হয় না। ঐ তো ঐ টিলাটার উপর আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে ওর বাড়ীটা, আর ঐ ঘরটাতেই হয় ত' ও ব'সে আছে এখন…হয় ত বলছে মনে মনে…"কি হে মেঘনাদ, ভাল লাগছে না বুঝি কিছুই…মনে শান্তি পাচ্ছ না—না?"

রান্নাঘরে ইলা তাহার মায়ের কাছে গিয়া বলিল… "মা, লক্ষ্য ক'রেছ বাবার চেহারাটা কত খারাপ হ'য়ে গেছে এই ক' দিনের ভিতর? নিশ্চয় কোনো অসুখ ক'রেছে ওঁর।"

মা বলিলেন…"অসুখ নয়, এই মং গাইনের ব্যাপারটাই ওঁর মনটাকে ভেঙে দিয়েছে। এ ঝঞ্ঝাটের ভিতর বাধ্য হ'য়েই আমাদের যেতে হ'য়েছে। এতে দোষ আমাদের মোটেই নেই, গাইনই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।"

সেইদিন হইতে ইলা দ্বিগুণ উৎসাহে পিতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচর্য্যার রত হইল। ঐ গাইনের জন্য চিন্তা করিয়াই যে তাহার পিতার শরীর খারাপ হইয়াছে তাহাতে পিতার উপর শ্রদ্ধা তাহার বাড়িয়া গেল। লোকের সম্ভ্রমও তাঁহার উপর বাড়িয়া যাইবে…ইহাতে সে মনে একটু শান্তি পাইল। কারণ পিতাকে সে দেবতুল্য মনে করিয়া আসিয়াছে চিরকাল।

কিন্তু কি ভয় তাহার হইয়াছিল যে দিন সে শুনিল গাইন বলিয়া বেড়াইতেছে যে এই ব্যাপারে তাহার জেল না হইয়া জেল হইবে পাল্টা মেঘনাদেরই। দোষী বলিয়া মং গাইনের উপর একটা করুণ ভাব তাহার মনে ছিল এতদিন পর্য্যন্ত। এখন সে তাহার চ'ক্ষে একটা নিছক্ শয়তানের মূর্ত্তি। কিন্তু যদি সে বাস্তবিকই তাহার পিতাকে মুস্কিলে ফেলে? তার মার কাছে, কারুর কাছেই সে তাহার মনের এই শঙ্কার কথা প্রকাশ করিতে পারে নাই; আর এই না বলিতে পারাতেই ক্রমশঃ সে ভয় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এমন কি, রাত্রে সে শান্তিতে ঘুমাইতে পারে নাই ইহারই জন্য।

তাহার পর তাহার এই ভয় সে ভগবানের চরণে নিবেদন করিল ও নিজের তরফ হইতে প্রতি রাত্রে অনেকক্ষণ সে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনায় অতিবাহিত করিত। ক্রমে তাহার বিশ্বাস হইল ভগবান তাহার প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছেন। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইল তাহার পিতা অসহায় নন, বহু অশরীরী শক্তি দ্বারা তিনি দৃঢ় রক্ষিত। সেইদিন হইতে সব ভয় তাহার দূর হইয়া গেল। গাইন আর তাহার পিতার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না…সে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিল। যত চেষ্টাই করুক, সব নিষ্ফল হইবে! সেই দিন হইতে অন্তর প্রফুল্ল হইল…মনের আনন্দে নির্ভাবনায় সে চারিদিকে নিজকাজে মনোনিবেশ করিল।

মেঘনাদ ও মেরীর বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। তবুও সত্যটা তাহার কাছে বলা অসম্ভব এ সময়। কোনো একটা উপায় স্থির করিয়া না লইতে পারিলে যে উহা একান্ত অসম্ভব।

ইহারই মধ্যে একদিন ইভার স্কুল খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে রেঙ্গুনের ট্রেণে উঠাইয়া দিবার জন্য মেঘনাদ

টম্‌টমে করিয়া তাহাকে লইয়া চলিলেন। দারুণ শীত, চতুর্দ্দিক কুয়াশাছন্ন। বৃদ্ধ ওভার কোটে সমস্ত দেহটি ঢাকিয়া বসিয়া আছেন···ইভা তাঁহার পাশে। কন্যার দিকে বৃদ্ধ বহুবার তাকাইয়া দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন কি সুন্দর ইভাকে দেখাইতেছে, শীতে তার গাল দুটি যেন গোলাপ ফুলের মত রক্তিমাভ হইয়াছে। সে বাবার কাছে হাসিয়া হাসিয়া কত কথাই বলিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ কিন্তু অন্যমনস্ক···ভাবিতেছিলেন বোধহয় এই নিষ্পাপ মেয়েটির সরল ভালবাসাটুকু গ্রহণের যোগ্যতা তিনি হারাইয়াছেন।

সম্মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি বলিলেন, "চিঠিপত্র নিয়মমত লিখিস্—গাফিলি করিস্ না। কিছু দরকার হ'লে চেপে থাকিস না—আমাকে জানাস কিন্তু।"

ইভাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার পর ইঞ্জিনটা যখন চলিবার পূর্ব্বে কর্কশ বংশীধ্বনি করিল, বৃদ্ধের মনে খুব একটা ইচ্ছা হইতেছিল মেয়েটার মাথায় একটু হাত বুলাইয়া তাহার কপালে একটা চুম্বন দিয়া তাহাকে একটিবার আদর করেন। কিন্তু ওসব অভিব্যক্তি তাঁহার আসিল না। তাই তিনি উহার পরিবর্ত্তে পকেটে হাত ঢুকাইয়া এক মুঠা টাকা বাহির করিয়া ইভার কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যা ভাল লাগে তোর, এ দিয়ে কিনে নিস্;"—এই তাঁর চুম্বন

বাড়ী ফিরিবার পথে কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, সংসারে তিনি একা। হয় ত' গিয়া দেখিবেন কি যেন এক অনিশ্চিত বিপদ তাঁহার জন্য সেথায় অপেক্ষা করিতেছে।

বাড়ী ফিরিয়া প্রথম সাক্ষাৎ হইল তাঁহার স্ত্রীর সাথে। তিনি বলিলেন—"বেরিয়ে গেলে, কিন্তু সেই যে লেখনটি সই ক'রে পাঠিয়ে দেবে ব'লেছিলে সেটা ঠিক ভুল ক'রে বসে আছ ?"

"এত তাড়াতাড়ি কি এমন ওটার জন্য," বলিয়া মেঘনাদ ওভার কোটটি খুলিতে লাগিলেন।

"এক হপ্তা থেকে প'ড়ে আছে ওটা শুধু শুধু। কাল আবার ওর জন্য তাগিদ এসেছে একখানা, তাড়াতাড়ি নয়ই বা কেন। তা' ছাড়া অযথা দেরী করবারও ত' কোনো কারণ দেখছি না।"

মেঘনাদ ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। টেবিলের উপর লেখনটা প'ড়েছিল তাঁহার সহির অপেক্ষায়। এতদিন মং গাইনের এই জালিয়াতির ব্যাপারটা মুখে মুখেই তিনি বলিয়া আসিয়াছেন। আজ সেটাকে লেখার মধ্যে আনিয়া ফেলিবার সময় আসিয়াছে। দুইটির প্রভেদ কিন্তু অনেকটা!

মেরী পিছন পিছন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ডাক ঘরে যাচ্ছি আমি। সই ক'রে দাও, আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওটা।"

মং গাইনের এই ঘৃণিত জালিয়াতির উপযুক্ত সাজা দিবার ব্যবস্থায় মেরীই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল হয় ত' দয়া পরবশ হইয়া বা পরের অনুরোধে তাঁহার স্বামী এ বিষয়টা মিটাইয়াও লইতে পারেন। তাই তিনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহিটা করাইয়া লইবার জন্য নিজেই উপস্থিত হইয়াছেন।

মেঘনাদ কলমটা কালিতে ডুবাইয়া চিন্তিত মনে ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন—"এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে কোর্ট আদালত না ক'রলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।"

শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে মেরী বলিলেন—"ব্যাপারটা সামান্য এ ধারণাটাই যে তোমার ভুল। দু'হাজার টাকা তুমি ছেড়ে দিতে পার অনায়াসেই; কিন্তু এ জালিয়াতিটার প্রশ্রয় দেওয়ার কোন কারণই ত' আমি দেখতে পাচ্ছিনা, কোন দিক দিয়াই।"

অন্যমনস্কভাবে "বোধহয় তাই," বলিয়া কম্পিত হস্তে হৃদয়ে একটা গভীর আশঙ্কার ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া তিনি ধীরে ধীরে সহি করিলেন—"মেঘনাদ দত্ত।"

স্ত্রী বাহির হইয়া গেলে মেঘনাদ তাঁহার গন্তব্য পথের দিকে বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিলেন—যেন তিনিই তাঁহাকে পাঠাইতেছেন তাহা সত্বেও তাঁহাকে ফিরান একান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে শক্তি তাঁহার নাই—ঠিক যেমনটি প্রথম দিনটাতে সেই সাইকেলওয়ালাকে তিনি ঢালু রাস্তা দিয়া নামিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন ও প্রাণপণ দিয়া চাহিয়াছিলেন তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে কিন্তু তাহা তিনি পারেন নাই।

কাজটা রীতিমত পাকাপাকি হইয়া গেল। ওই মিথ্যা লেখনটি তিনি নিজ সহি দিয়া সম্পাদিত করিয়া পাঠাইলেন। মেঘনাদ দত্তর নাম পূর্ব্বের মত লোক সমাজে আদৃত হওয়ার যোগ্যতা চিরতরে হারাইল।

গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে তিনি ভাবিলেন—"কোনো একটা কাজে নিযুক্ত হওয়ার আমার চাইই, যদি কিছু শান্তি তাতে পাওয়া যায়।"

কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ মানসিক তেজ যে শরীরেরও শক্তিটুক সঙ্গে সঙ্গে হরণ করিয়া নেয়? তাই আবার তিনি সোফায় বসিয়া পড়িলেন। ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ মন তাঁহার এলাইয়া পড়িল…মনে হইল, যেন তিনি আর উঠিতে পারিবেন না কখনো।

এই দারুণ ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্যে আর একটি বিষয় তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিত। অহরহ গাইনের এক ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইত। ইহা সুরু হইয়াছিল যে দিন তিনি অযথা একটা অজুহাতের দোহাই দিয়া মনকে যা-তা বুঝ দিয়া আদালতে গিয়া স্ত্রীর ঐ মিথ্যা অভিযোগটি প্রত্যাহারে বিরত হইয়াছিলেন সেই দিন হইতে। এই বিভীষিকার মূর্ত্তি এমন কি তাঁহার রাত্রির নিদ্রাটুকও হরণ করিয়াছিল। বহু যাতনার পর ঘুম আসিলেও সেই নিদ্রার তৃপ্তিটুকুও অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল গাইনের সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি। নিদ্রার জাগরণে তিনি দেখিতে পাইতেন গাইনের রুক্ষ ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি রক্ত চক্ষু ও বিদ্রূপের অট্টহাসি। সে মূর্ত্তি যেন তাঁহাকে অবহেলা করিয়া বলিত—"আমি ত জালিয়াৎ, কিন্তু তুমি কি মেঘনাদ? বিচারে কোথায় তুমি দাঁড়াবে? সাক্ষীটি মারা গিয়াছে, কিন্তু দেখেনিও বিনা মেঘে বজ্র এসে প'ড়বে তোমার মাথায়, তোমায় ধ্বংস ক'রতে।"

এই সব বিভীষিকা মূর্ত্তির তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে একদিন তিনি উঠিয়া পড়িয়া ভাল করিয়া চক্ষু দুটি রগড়াইয়া বলিলেন—"কোন একটা কাজে লেগে প'ড়তে না পারলে দেখছি পাগল হ'য়ে যাব আমি।"

তিনি পোষাক পরিয়া বাহির হইলেন। পথে মুরগীর ঘরটায় উঁকি মারিতে কয়েকটি মোরগ সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

"কি, ওরাও কি আমায় ঘৃণা ক'রতে সুরু ক'রল? তাদের এ চিৎকার ঘৃণার ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি কয়েক পা' পিছাইয়া গেলেন। সেখানে ছিল একটা কাকাতুয়া। সেটা তার একটা ডানা তাঁহার দিকে আগাইয়া দিল।—ইচ্ছা, যেন তিনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। সেটার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন—"কি এখানেও গাইনের ক্রুদ্ধমূর্ত্তি?" গো-শালায় গিয়া গরুগুলির মুখেও তিনি একটা স্পষ্ট রূপান্তর লক্ষ্য করিলেন। পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন—"কী মূর্খ আমি? নিজের অলীক কল্পনা দিয়া নিজের জীবন অসহ্য ক'রে তুলেছি আমি!" কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সেই অলীক পরিকল্পনারই আতঙ্কে তিনি আস্তাবলে ঢুকিতে সাহস করিলেন না। সহিসকে ডাকাইয়া একটা ঘোড়া আনাইয়া তিনি সহরে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহার এই প্রিয় ঘোড়াটিও যেন তাঁহাকে পিঠে লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় পথ চলিতেছে। সেও কি সব বুঝিতে পারিয়াছে? যে ঘোড়াকে কখনো পূর্ব্বে কশাঘাত করিতে হয় নাই তাহাকে চাবুকের পর চাবুক হানিয়া তিনি তীরবেগে ছুটিয়া চলিলেন।

"কেন আমি এই সব অনাবশ্যক মানসিক অশান্তি নিজেই ডাকিয়া আনিয়া জীবনটাকে ছারখার করিতে বসিয়াছি? লোকের চ'খে সম্ভ্রম যে আমার বাড়িয়া গিয়াছে তার প্রমাণ ত সবারই কাছে পাচ্ছি"…এই ভাবিয়া মনটা তাঁহার একটু সুস্থ হইল। গাইনের উপর সহরময় লোকের ক্রোধ তাঁহার মনে কিছু শান্তির যোগান দিল। তিনি দেখিলেন একটা লোক যদি গাইনের পক্ষে কিছু বলিয়া থাকে তাহা হইলে সেই স্থানে অন্ততঃ কুড়িজন তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া নানা প্রশংসাবাদে ও শুভেচ্ছা জানাইয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ফিরিবার পথে বিশেষভাবে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া কখনও প্রচলিত অভিবাদন অবধি করে নাই তাহারাই আজ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে

নমস্কার করিয়াছে। দেখিয়া বৃদ্ধ মনে মনে একটু হাসিলেন ...“আমার এই পাপের জন্য পশুপক্ষীরা আমায় দেখছে ঘৃণার চ'খে। তা হ'লে কি হয়, মানুষের সম্ভ্রম আমার উপর বেড়ে গিয়েছে, হায়রে দুনিয়া !”

“কিন্তু ওদের ঐ সম্ভ্রমের অন্তরে পরিহাস নেই ত ?” এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য মনে হইল। ইহার সঠিক সন্ধান না জানিতে পারিলে কিছুতেই শান্তি পাইবেন না। জটিলতার চেষ্টা তাঁহাকে করিতেই হইবে।

পরদিনই পাদ্রি সাহেব দেখিলেন মেঘনাদ তাঁহার বড় টম্-টমটিতে খটাখট শব্দে ফটক পার হইয়া তাঁহারই কাছে আসিয়া নামিলেন। মুখখানি তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল। হাঁটুতে মোটামোটা অঙ্গুলি দিয়া তাল ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন যে শনিবার রাত্রে বিলিতি কায়দা অনুযায়ী তিনি একটা আস্ত শূকর রোষ্ট করিয়া এক খানার বন্দোবস্ত করিয়াছেন...তাই জানাইতে আসিয়াছেন তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহাতে যোগ দিয়া দু' একটা হাড় টানিয়া লইয়া চিবাইতে পারেন। পাদ্রী ও তাঁহার স্ত্রী হাসিতে লাগিলেন, কারণ ঐরূপ ভাষায় নিমন্ত্রণ করা মেঘনাদের এক বিশেষত্ব। মেঘনাদ মনে মনে ভাবিলেন... “ওদের ঐ হাসির মধ্যে কপটতার লেশমাত্র নাই বলিয়াইত মনে হইল। কিছুমাত্র সন্দেহ আমার উপর থাকলে ও ধরণের হাসি ওদের মুখে দেখ্‌তাম না।” তাঁহারা উভয়ে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মেঘনাদও উৎফুল্ল মনে সেথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পর পর তিনি জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, কৌঁসুলি ও বহু উচ্চ রাজকর্মচারী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোকের কাছে গিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া যখন বাড়ীতে ফিরিলেন তখন মনটা তাঁহার বেশ শান্ত, প্রায় নিরুদ্বেগ।

ভোজের দিন। বাড়ীটি কল-হাস্য মুখরিত, আর ভোজটিও পূর্ব্বানুরূপ বিরাট ও অনিন্দনীয়। এত রূপার বাসনের জৌলুস সহরের আর কোনো বাড়ীতে কেউ দেখে নাই। মূল্যবান মদে সবাই পরিতৃপ্ত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভোজের মধ্যে মেঘনাদ উঠিয়া সবারি সম্মুখে আসিয়া কথা কহিয়া, হাসিয়া, নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সবারি মুখে তিনি অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলেন এক আন্তরিক আনন্দের ছাপ, আর দেখিলেন তাঁহার প্রতি একটা অনাবিল প্রীতির উচ্ছ্বাস...সন্দেহের বা কপটতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। সবারই মুখে যেন স্পষ্ট লেখা...“কি সুন্দর, অমায়িক লোক তুমি, বন্ধু।”

ভোজ সাঙ্গ হইলে অতিথিরা যখন প্রকাণ্ড ড্রইং ঘরে ছোট ছোট চা-কফির টেবিলের চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ছড়াইয়া বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন তখন মেঘনাদকে ডাকিয়া এক কোণে লইয়া গিয়া পুলিস ইনস্পেক্টর তাঁহাকে বলিলেন যে মূল জামিননামার দলিলখানা তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিটা অনেকটা মিলিলেও মং পোর সহিটা হইতে জাল বেশ ধরা পড়িবে। সে সহিটা যেন কপি বুকের লেখার ধরণের। মং পোর সাধ্য নাই ওভাবে লেখা। ইহা তিনি হলফ করিয়া বলিতে পারেন। তা ছাড়া, মং পোর অন্য লেখাও তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাহা একেবারে বিভিন্ন রকমের।

মেঘনাদ মনে মনে বলিলেন, “একটি আস্ত গাধা তুমি। একটা লোক যে দু রকমে নিজ নাম লিখতে পারে, তাহা এর বোধের অগম্য। বলিহারি তোমার বুদ্ধির !”

প্রকাশ্যে বলিলেন—“গাইন কি বলে এ বিষয়ে ?”

ইনস্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, “সে বলে আপনি নিজে গ্রাণ্ড হোটেলে ব'সে দলিলটা সই করেছিলেন।”

মেঘনাদ মনে মনে বলিলেন, “মিথ্যা কথা। গ্রাণ্ড হোটেলে নয়। সইটা হ'য়েছিল কাল'টন হোটেলে।”

ফিরিয়া যাইবার সময় ইনস্পেক্টর বলিলেন, “দলিলের একমাত্র সাক্ষীটি ত' মৃত। সহি হইতে আর কেউ দেখেনি। এক্ষেত্রে শুধু নিজ কথারি উপর ওর যা' নির্ভর। ওর চরিত্র সম্বন্ধে লোকের ধারণা ত' খুবই উচ্চ ! অনেকেই ব'লছে যে বহু বিল তারা এখন পাচ্ছে ওর কাছ থেকে ওর দোকানের বাবদ, যে টাকা বহু দিন তারা চুকিয়ে দিয়েছে।”

একে একে সবাই চলিয়া গেল। মেঘনাদ একা ঘরে পাইচারী করিতে লাগিলেন। গতিতে তাঁহার একটা স্পষ্ট সুস্থতার ভাব। কারণ লোকের কাছে

তাঁহার সম্মান একতিলও কমে নাই…বরং বাড়িয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন তিনি পাইয়াছেন এই ভোজের সম্পর্কে।

তিনি ভাবিতেছিলেন…"কি মিথ্যাবাদী! জীবনে কখনো আমি কোন কাগজে একটা আঁচড় অবধি দিই নাই ওখানে। কি ভীষণ মিথ্যুক?"

গাইনের উক্তির যে অন্ততঃ এক অংশও মিথ্যা তাই ভাবিয়া তিনি বেশ একটু আরাম পাইলেন। দুনিয়ায় কেউ কখনো প্রমাণ করিতে পারিবে না যে তিনি গ্রাণ্ড হোটেলে কোনো দলিল কখনো সম্পাদন করিয়াছেন।

চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন…"এ মোকর্দ্দমা চালাইলে জিত আমার নিশ্চিত কোনো সন্দেহ তাতে নেই।"

মনের মেঘ কিন্তু কাটিল না। সঙ্গে সঙ্গেই মন তাঁহার প্রশ্ন করিল…"কিন্তু জিতিব কি বাস্তবিক?"

টেবিলের উপর হইতে এক বোতল মদ তুলিয়া লইয়া তিনি পাশের ঘরে এক সোফায় গিয়া বসিলেন। খানিক-ক্ষণ পরে মেরী তাঁহার খোঁজে সেখানে গিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে তিনি সুরাপানে উন্মত্ত প্রায়। বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে তিনি উঠাইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আসিয়া দেখিলেন মেঘনাদ সেই খালি বোতল হাতে সোফার উপর গভীর নিদ্রামগ্ন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নদীর বাঁকটির কাছে অনতিবৃহৎ সবুজ গাছগুলির বেষ্টনীর মধ্যে ফুল বাগান পরিবৃত সুন্দর ছোট একখানি বাংলো বাড়ী। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সামাজিক জীবনের এক প্রকার পরিসমাপ্তি করিয়া মিসেস সুমিত্রা গৌতম নিরিবিলি ঐ ছোট বাড়ীখানিতে বাস করিতেছেন। সুন্দর বাগানটিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া গাছ লাগান ও তার আনুসঙ্গিক তদ্বির করিয়া তিনি সময় কাটান। কখনো কখনো কোনো গরীব দুঃস্থের বাটীতেও তাঁহাকে দেখা যায় তিনি রোগীর পরিচর্য্যায় রত। বয়স তাঁহার চল্লিশ পার হইয়া গেলেও মনটা ছিল তাঁর খুবই সজীব। সামাজিক সব ব্যাপারেই ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত থাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমোদে আহ্লাদে তাঁহার জীবনটা এতদিন কাটিয়াছে। এখনো তার সব জের তিনি একেবারে ঘুচাইয়া দিতে পারেন নাই। দুঃস্থ মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের সাহায্যের অংশটুকুতে এখনো তাঁহাকে লিপ্ত দেখা যায়। এখনো তাহারা সেলাই ও জামা কাটা শিখিবার জন্ত তাঁহার কাছে প্রায়ই আসে। তিনিও যথাশক্তি তাহাদের সাহায্য করেন। মোট কথা সমাজের উৎসবের দিকটা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অপ-সারিত করিলেও দুঃখ বিপাকের সংবাদে তাঁহার মন এখনো চায় দুঃখিতের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে ও সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে।

তাই মং গাইনের এই বিপদের সংবাদ তাঁহার কাণে পৌঁছামাত্রই মনটি তাঁহার হতভাগিনী মা কেট ও তাহার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বেদনায় অধীর হইয়া উঠিল। মা কেট তাঁহার খুব পরিচিত। বান্ধবী শ্রেণীরও বলা চলে। শুনা অবধি সমস্ত ক্ষণ তাহারি এই শোচনীয় দুরদৃষ্টের কথা অন্য সব বিষয় ছাপাইয়া তাঁহার মনটা পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। আর তাঁহার সামান্য একটি পুত্রও তাঁহার আছে, যার জন্য সংস্থান তাঁহাকেই করিয়া যাইতে হইবে। তাহা সত্বেও মন তাঁহার সর্ব্বক্ষণই বলিতে-ছিল—"এদের সাহায্য ক'রতে আমায় যেতেই হবে। তিন-তিনটা শিশু, পিতা মাতার সংস্থান নাই তাদের খাওয়াবার, তার উপর আবার ঐ অভিযোগ। এ ক্ষেত্রে না গেলে যে পাপের অবধি থাকবে না।" তিনি ভাবিলেন, "লোক-মুখে ও সব দিক ভেবে দেখলে সত্যই মনে হয় মং গাইনই এক্ষেত্রে দোষী। মেঘনাদের মত লোকের পক্ষে ঐ সামান্য টাকার জন্য এই মিথ্যা অভিযোগ আনার কোনো হেতুই থাকিতে পারে না। সহরের দু' দল লোকের এ বিষয়ে বিরুদ্ধ অভিমত হ'লেও অনেক বেশীর ভাগ লোক ও সমঝদারেরা প্রায় সবাই মং গাইনকেই দোষী ব'লে সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছে। কিন্তু সে নির্দ্দোষ বা দোষী কিছু আসে যায় না তাতে আমার। দোষী ব'লে ঘৃণা আমি তাকে ক'রতে পারি না; বরং যে দোষী সেই ত আমাদের সব চেয়ে বেশী সহানুভূতির পাত্র। তাই এ বিপদে তাদের যে

সাহায্য করা উচিত তাতে কোনো দ্বিধাই আসতে পারে না।"

মং গাইনের বাটীর দিকে রওনা হইয়া মনে তিনি কিছু শান্তি পাইলেন।

গিয়া শুনিলেন কেট একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে ও এখন সে আতুর ঘরে। প্রসবের পর চারি দিন কাটিয়া গিয়াছে, তাই সেই ঘরে যাইতে তাঁহার কোনো বাধা ছিল না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এই সুন্দরী, সৎ স্বভাব মেয়েটির ভাগ্য-সূত্র গ্রথিত হইয়াছে মং গাইনের মত লোকের সহিত। তাহার দুর্দ্দশায় সুমিত্রার চোখে জল আসিল। শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইলে কেট দু' হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। উভয়ে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কথার পর সুমিত্রা অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কোমল করিয়া তাহার সন্তান তিনটিকে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য তাঁহার নিকট রাখিয়া সাগ্রহে তাহাদের প্রতিপালনের ভার লইবার প্রস্তাব করিলেন। মা কেট ইহাতে নিজেকে দারুণ অপমানিত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। ফিরিয়া যাইবার সময় সুমিত্রার কেবলি মনে হইতেছিল এ প্রস্তাব করিয়া ভাল অপেক্ষা অনিষ্টই তিনি করিয়াছেন; না করিলেই বোধহয় ভাল হইত। সুমিত্রা চলিয়া যাইবার পর গাইন আসিয়া এ প্রস্তাবের কথা শুনিল ও ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিল "বেশ, চমৎকার! ওরা এখন চায় ছেলেদেরও ছিনিয়ে নিতে আমাদের কাছ থেকে! বা!"

স্বামীর ভাব দেখিয়া কেট উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "কেন ওভাবে কথাটা তুমি নিচ্ছ বলত? কোনো খারাপ ভাব নিয়ে যে সুমিত্রা ও কথাটি পাড়েনি' সে আশ্বাস তোমায় আমি খুবই দিতে পারি।"

"হাঁ, ঠিক, সবাইকার অভিসন্ধিই খুব সৎ" বলিয়া খানিকক্ষণ পরে গাইন আবার বলিল, "আমার মনে হ'চ্ছে ওরা এটা খুবই বুঝতে পেরেছে যে আমার মেরুদণ্ডটি ওরা কিছুতেই ভাঙতে পারবে না যতক্ষণ আমি আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যার আবেষ্টনীর মধ্যে বাঘের ভর ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব···কিন্তু মিসেস গৌতমও শেষে......"

উঠিয়া গিয়া সে জানালা দিয়া দেখিতে লাগিল। বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে। সুমিত্রা সেই ঝড় ঠেলিয়া নত হইয়া অতি কষ্টে পথ অতিক্রম করিতেছেন। গাইনের মনে হইল যেন এই ঘৃণিত প্রস্তাবের জন্য অনুতাপে তিনি সোজা হইয়া চলিতে পারিতেছেন না। কি দারুণ ধৃষ্টতা! লোকের পরিহাসের কি কোনো মাত্রাই নাই, স্থান কাল, পাত্র ভেদ নাই? তাহার ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া গায়ের বলে এ ধৃষ্টতার উপযুক্ত শিক্ষা তখনই তাহাকে দিয়া আসেন। সমস্ত শরীর তাহার ক্রোধে কাঁপিতেছিল।

হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেট বলিল, "তুমি একটিবারও মনে ক'রো না আমাদের মধ্যে কেউ তোমায় পরিত্যাগ ক'রব তোমার এই বিপদের সময়।"

গাইন কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার দু'টি হাত দিয়া স্ত্রীর মাথাটি তুলিয়া ধরিল ও সস্নেহে তাহার কপালে একটি চুম্বন করিল।

কেট বলিল, "কিন্তু আমার মনে একবারও এটা উদয় হয় নি যে মানুষ কখনো এত নিষ্ঠুর, এত অকরুণ হ'তে পারে।"

চলিয়া যাইবার সময় ক্রোধ-কম্পিত স্বরে গাইন বলিল "আচ্ছা, আমারো দিন আসবে; তখন দেখা যাবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিক্রম মেটা তাহার বসিবার ঘরে বসিয়াছিলেন। দৃষ্টি তাহার মেঘনাদের বাড়ীটার দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। মন তাহার চিন্তাকুল মেঘনাদের উপর দৃষ্টি তাহাকে সব বিষয়েই রাখিতে হয়, তাহা না হইলে যে সে তাহাকে ছাপাইয়া উঠিবে!

কাষ্ঠ-ব্যবসায়ের সঙ্কটের সময় বা রাজনৈতিক নির্ব্বাচন-সব ক্ষেত্রেই মেঘনাদের বিরুদ্ধ পক্ষের নেতৃত্ব করিতে হয়। নিজ দলের জিত হইলে মন তাহার উল্লসিত হয় ও বহুদিন তাহার মেজাজ অত্যন্ত প্রফুল্ল থাকে। আর মেঘনাদ জয়ী হইলে লজ্জায় তিনি বাহির হন না—মনে হয় যেন গর্হিত কোনো দোষে তিনি দোষী। একে অপরের অনিষ্টে

সর্ব্বদাই তৎপর থাকিলেও দেখা হইলে তাহারা অন্তরঙ্গেরই মত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তাহাদের উভয়ের এই বৈরী ভাবের প্রধান কারণ—প্রতিদ্বন্দীতার আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি এ তল্লাটে কেহ নাই।

মেঘনাদের ঐ বাড়ীটির দিকে চাহিয়া বিক্রম ভাবিতে-ছিলেন—"মেঘনাদের এই চালটির মানে কি? গাইনের সাথে শুধু শুধু একটা ঝগড়ায় মাতিবার লোক ত' সে নয়! আর এও হ'তে পারে না যে শুধু টাকাটা আদায়ের জন্যই সে এটা ক'রেছে। নিশ্চয় গভীর একটা কিছু আছে এর ভিতর।"

শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন নিশ্চয় এই চালের অর্থ গাইন দেনাগুলির একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে আবার নিজ পায়ে দাড়াইতে না পারে, আর সেই সাথে সে চার গাইনের ঐ ইট খোলাটি নিলাম চড়াইতে ও নিজে উহার মালিক হইতে। তাই কি?

বহুক্ষণ বিক্রম বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ও আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিলেন—কোনো একটা বিপরীত চাল এবিষয়ে উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া। গাইন দোষী বা নির্দোষ—কিছু তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই তাহাতে। একমাত্র চিন্তা তাহার মেঘনাদ।

"ইট খোলাটা আমারই কি নেওয়া উচিত? কোনো লাভ নেই। তবে মেঘনাদ ওটা নিতে চায় কেন?"

হঠাৎ একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাহারি এক মজুর থাপ্পা ঐ দলিলের মৃত সাক্ষী মং পোর কাছে আগে কাজ করিত। গাইনের ত' এখন কোনো সাক্ষীই নেই। থাপ্পা যদি এবিষয়ে তাহার কোনো উপকারে আসে!

এই শ্রেণীর লোককে কি করিয়া হাত করিতে হয় বিক্রম তাহা খুবই জানিতেন। তাই এক বোতল মদ বাহির করিয়া আনিয়া তিনি থাপ্পাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সে খাইতে বসিয়াছিল। কোনো মতে খাওয়াটা শেষ করিয়া ভয়ে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে মনিবের ঘরে প্রবেশ করিল। ভয়, কারণ মনিবের খাস কামরায় এত জোর তলব কই কাহারো ত' হয় নাই এর পূর্ব্বে।

ঘরে ঢুকিলে বিক্রম তাহাকে বসিতে বলিলেন। সে ভূঁয়ে বসিতে যাইতেছিল দেখিয়া তিনি তাহাকে ছোট সুন্দর টুলটির উপর তাহার সম্মুখে জিদ করিয়া বসাইলেন। ভয়-ত্রাস-লজ্জার যুগপৎ প্রকাশে মুখে তাহার এক অদ্ভুত ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে কোনো মতে বসিলে বিক্রম তাহাকে বলিলেন—"দেখ, তুই না মং পোর কাছে আগে চাকরি ক'রতিস?"

প্রায় আড়ষ্ট স্বরে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল—"হাঁ।"

"আচ্ছা, তোর বোধহয় মনে নাই মং পো একদিন তোকে ব'লেছিল যে মেঘনাদ সাহেব আর বিক্রমের একটা দলিলে সে সাক্ষী ছিল?"

তাহার মনে নাই মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিলে বিক্রম বলিলেন—"ওভাবে মাথা নাড়িলে চ'লবে না। বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখ ত' দেখি।"

সে কিছুক্ষণ ভাবিল কিন্তু কৈ কিছুই ত' মনে পড়িল না। তাহা দেখিয়া বিক্রম বলিলেন—"ভাল ক'রে ভাবতে বলছি কেন জানিস্? কারণ, হয় ত' ওরই উপর মেঘনাদ ও বিক্রমের মামলাটার ফলাফল নির্ভর ক'রবে; তাই বেশ ক'রে ভেবে দেখে আমায় বল্‌বি, বুঝলি?"

আড় চোখে একবার মনিবের দিকে তাকাইয়া দেখিল মনিবের ভাব খুব আগ্রহপূর্ণ—চেহারা খুব গম্ভীর। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বুক তাহার দুরুদুরু—পা কাঁপিতে-ছিল।

তাহা দেখিয়া বিক্রম হাসিয়া বলিলেন—"তুই কাঁপছিস কেন? শীতে। আর, শীতও এবারটা যা প'ড়েছে! আচ্ছা যা, ঐ বোতলটা নিয়ে যা," বলিয়া মদের বোতলটার দিকে দেখাইয়া দিলেন।

থাপ্পা অপরাধীর মত একটু ইতস্তত করিয়া, বোতলটা কোনোমতে উঠাইয়া লইয়া মনিবকে দীর্ঘ এক সেলাম ঠুকিয়া বাহির হইয়া একছুটে হাজির হইল তাহাদের আড্ডায়। সেখানে গিয়া রীতমত একটা বীররসের অবতারণা করিয়া সবাইকে জিজ্ঞাসা করিল তাদের মধ্যে কেউ কি কখনো মনিবের খাস্ কামরায় ঢুকিবার

অধিকার পাইয়াছে আজ পর্য্যন্ত···শুধু তাই নয়, সেখানে গিয়া মনিবের সম্মুখে ব'সতে পেরেছে কি ? তাহার পর মদের বোতলটি সবাইকার সম্মুখে উচু করিয়া ধরিয়া বলিল···"আর আসবার সময় এই যে দেখছ, এটি মনিবই নিজ হাতে দিলেন আমাকে ; বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছ না বুঝি অ'তটা ?"

তাহার কথায় সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল দেখিয়া মহা খাপ্পা হইয়া উঠিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া খাপ্পা সবাইকে জানাইয়া দিল যে সে তাদের ঠাট্টার পাত্র নয় মোটেই। তারই উপর মেঘনাদ গাইনের মামলার ফলাফলটা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে।

অবাক্ হইয়া দুই তিন জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল··· "তোর উপর ?" কেউ কেউ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

"হাঁ, আমারি উপর" বলিয়া সে গম্ভীর হইল।

সেই দিন হইতে তাহার মনে আর শান্তি নাই। রাত্রি দিন কাটে তাহার একটা অস্বস্তি লইয়া। মনিবের সাথে দেখা হইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন সে মনে করিতে পারিল কি না। চার পাঁচ বছর সে মং পোর কাজ করিয়াছে সেটা সত্য, আর এটাও সত্য মং পো অনেক কথাই তাহার সাথে কহিয়াছে।' কিন্তু, কিন্তু.. মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সে দিনের মধ্যে অনেকবার ভাবিতে বসে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে। সেও তাহাকে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে বলে। সেও ভাবে...দিন রাত্রি ভাবে ; কারণ, তাহারি উপর যে এত বড় একটা ব্যাপার নির্ভর করিতেছে।

আচ্ছা, সেই যখন মং পো আর যে...নাঃ, তখন ত' না। যদি হয় ? হাঁ নিশ্চয় তখন, যখন দুইজনে তাহারা টমটমটা রং করিতেছিল···মং পো উপরকার অংশটা আর সে চাকা দুইটা। সে দৃশ্যটি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সেই সময়েই রং করিতে করিতে অনেক কথা মং পো তাহাকে বলিয়াছিল···তখন না বলিলে আর কখন বলিবে ? হাঁ তখনই ত' বলিয়াছিল বেশ মনে পড়িতেছে।

খাপ্পা যখন এই খবরটা তাহার মনিবের কাছে জানাইল তিনি শুনিয়া খুব খুসি হইয়া সে দিনের জন্য তাহাকে ছুটি দিলেন, আর বিক্রমের কাছে গিয়া দরবার হইলে তাহাকে সাক্ষী মানিতে বলিয়া আসিতে চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক বিচারের দিন ঘনাইয়া আসিল ; যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল মেঘনাদের মনের অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সমস্যার সমাধানের কোন উপায়ই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। মান ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া কোনো উপায়ে যে তিনি ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবেন সে আশাও তাহার নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। যে দিক দিয়া যাইবেন, অপদস্থ তাঁহাকে হইতেই হইবে, কারণ তাঁহার নিজের কথাই ত' সব কিছুর অন্তরায় হইয়া দাড়াইবে। বহুলোকের সঙ্গেই ত' তিনি ইতিমধ্যে বহু কথা কহিয়াছেন এই সম্বন্ধে। এতদিনে তাহা লোকমুখে, চিঠি-পত্রে, খবরের কাগজে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে কথা ত' আর অস্বীকার করিবার নয়। কিন্তু এটা ঠিক্, বিচারের সময় নিজে তিনি কোর্টে যাইবেন না কোনো মতেই। কারণ সেথায় যে তাহাকে হলফ্ লইতে হইবে, আর হলফ লইয়া মিথ্যা তিনি কিছুতেই বলিতে পারিবেন না।

রাত্রি দিন এই একই চিন্তা ছায়ার মত তাহাকে অনুসরণ করিত। লোকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্ত্তার সময়েও এই বিষয়টাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনটি তাহার অধিকার করিয়া বসিত। মনে তাহার অন্যকোনো চিন্তার বিন্দুমাত্র স্থান আর নাই। কথোপকথনের সময়ে সর্ব্বদাই তাহাকে খুব সতর্ক থাকিতে হইত, পাছে বেফাঁস কিছু একটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। ফলে এক মিথ্যা ঢাকিতে গিয়া পর পর সহস্র মিথ্যার অবতারনা তাহাকে করিতে হইত। শেষে তাহার ভয় হইত পাছে নিদ্রায় স্বপ্নাবেশে কোন কিছু তিনি না বলিয়া ফেলেন। তাই নিদ্রাও তাহার দূর হইল। ফলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তিনি আসিয়া পৌছিলেন।

যদি বাধ্য হইয়া বিচারেই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে কি তিনি বলিবেন তাহার একটা খস্‌ড়া যে তাহাকে খুব চিন্তা করিয়া তৈরী রাখিতে হইবে তাহা তিনি বেশ উপলব্ধি করিতেন। কিন্তু যাহাই তিনি বলিবেন, নিজের মান-ইজ্জৎ বজায় রাখিতে হইলে তাহা যে হলফ লইয়া মিথ্যা বই সত্য হইবে না, ইহা ভাবিয়া মেঘনাদের অবস্থাটি হইল দুস্তর পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু হটিতে থাকা ঘোড়ার সওয়ারের মত।

এরূপ মানসিক অবস্থায় লোকে সব ঘটনা হইতেই খারাপটুকু টানিয়া লইয়া নিজের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তাই মেঘনাদ যেদিন শুনিলেন তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন তখন মনটা তাহার বলিয়া উঠিল—"এবার তোমার পালা, মেঘনাদ।" সেদিন রাত্রে তিনি বিছানায় শুইয়াছিলেন। স্ত্রী তাহারি পার্শ্বে শায়িতা। আলোটা নিবান হইয়াছে হঠাৎ তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানুষ, যে কোনো মুহূর্ত্তেই পট্ ক'রে মরে যেতে পারে, তারাই আবার পরের অনিষ্ট লইয়া সর্ব্বদাই ব্যাস্ত।"

মেরী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলেন—"হাঁ, তা ঠিক্।"

"আর এটাও আমার মনে উদয় হয় যে তলিয়ে ভেবে দেখলে যাদের আমরা দোষী ব'লে ধ'রে নিয়ে সাজা দিবার জন্ম উঠে প'ড়ে লাগি তাদের চাইতে হয় ত' আমরাও কম দোষী নই অপর অনেক ক্ষেত্রেই; আর তাই দোষীকে মার্জ্জনা করাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়, সব দিক থেকেই।"

"তা' ঠিক্; যদি দোষী লোকটি নিজের দোষ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিল। হঠাৎ মেঘনাদ বলিলেন—"আমি কি ভাবছি জান মেরী?"

প্রায় ঘুমন্ত চোখে মেরী বলিল—"না।"

"ভাবছি, আমাদের দুষ্কৃতির ফল আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে শেষ হ'য়ে যায় তা নয়। সেগুলি জ্যান্ত থেকে যাদেরই আমরা রেখে যাই, তাদেরও অনিষ্ট ক'রতে থাকে।"

"হুঁ"

"কিন্তু তুমি ব'লতে পার কি, কেমন ক'রে মৃত্যুর পর তার আত্মা এ সত্ত্বেও শান্তি লাভ করতে পারে?"

মেরী জবাব দিল যে মৃত্যুর পর কি হয় না হয় তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি-বৃত্তি তাহার নাই ও অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বৃদ্ধের ঘুম আসিল না। অন্য ধারায় চিন্তা করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন—এই মিথ্যার জন্য অনিষ্ট যে শুধু গাইনেরই হইবে তাহা নয়। ইহার ফল হয় ত' তাহার পুত্র-পৌত্রাদিতে সঞ্চালিত একটা মহা অনিষ্টের স্পষ্ট ধারা বহাইয়া দিবে। ইহা সত্ত্বেও তাহার পরকালে শান্তির আশা বাতুলতা মাত্র। ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মন শিহরিয়া উঠিল।...যে ক্ষতি তিনি গাইনের করিয়াছেন ইহারি মধ্যে তাহা বোধ হয় অপরিশোধনীয়। উহার জন্য দণ্ড মাথা পাতিয়া লইলেও তাহার সে ক্ষতির পূরণ হইবে না। এই মিথ্যার জন্য যে কষ্ট-ভোগ সে করিয়াছে ও অসংখ্য লোকের মধ্যে ইহা ছড়াইয়া পড়ায় যে ক্ষতি তাহার হইয়াছে ও হইবে তাহার পূরণ অর্থ দ্বারা সম্ভব নয়। এইরূপ নানা চিন্তা তাহার অন্তরটা ব্যথিত ও অস্থির করিয়া তুলিল। সারা রাত্রি তিনি বিনিদ্র অবস্থায় ছট-ফট করিয়া কাটাইলেন।

পরদিন প্রাতে এই চিন্তাধারা হইতে অন্ততঃ আংশিক অব্যাহতি লাভের আশায় তিনি তাঁহার জঙ্গলে চলিয়া গিয়া নিজেকে কাজে জোর ব্যাপৃত করিয়া ফেলিলেন। কায়িক পরিশ্রম ও উন্মুক্ত বাতাসে মনটা তাঁহার কিছু হাল্কা হইল। যত দূর দৃষ্টি যায় বড় বড় গাছ আর কাঠের স্তূপ। তিনিই এ সবের মালিক। একটু আত্মপ্রসাদ তিনি লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে উদয় হইল—"যদি গাইনের সাথে না হইয়া অন্য কোনো উপযুক্ততর লোকের সহিত এ দ্বন্দ্বটা তাহার হইত!—যদি বিক্রমের সাথে ইহা বাধিত! কিন্তু গাইন,—ও যে লোক সমাজে হেয়, অপদার্থ—নিঃস্ব গরীব। ওরই উপর একটা মিথ্যা অভিযোগ আমি চালাচ্ছি—মরার উপর খাঁড়ার ঘা' দিচ্ছি।" নিজেকেই আঘাত করিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি সর্দ্দি বোধ করিলেন—একটু জ্বরও হইল।···হয় ত' ইহা টাইফয়েড জ্বরেরই সূচনা! হয় ত' ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে! তাহাতেও এই পাপের পরিসমাপ্তি নাই। পরকালে ইহারি জন্য তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।

পরিশেষে এই জীবন্ত নরক ভোগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন প্রাতে ইহার অবসান করিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন—স্থির করিলেন অবিলম্বে তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়া সব খুলিয়া বলিবেন। তাহার পর ইনস্পেক্টরের কাছে চলিয়া গিয়া যে কোনো প্রকারে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। যাক্, মন তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ভগবানকে তিনি সহস্র ধন্যবাদ দিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইবেন এমন সময় স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, কে একজন দেখা করিবার জন্য বহুক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছে। হয় ত' ইনস্পেক্টর—ভাবিয়া মনটা তাহার একটিবার কাঁপিয়া উঠিল। আসিয়া দেখিলেন তাঁহারি অধীনস্থ বৃদ্ধ এক মজুর মং কিন। এই বার্দ্ধক্যে, তাহার শরীরের জীর্ণ দশায় তিনিই তাহাকে আশ্রয় দিয়া সপরিবারে তাহার ভরণ পোষণের সমস্ত ভার লইয়াছেন। অফিস ঘরে আসিতে বলিলেন। মনে মনে বিরক্তও তিনি হইলেন এই ভাবিয়া যে ইহারই জন্য তিনি ভীত হইয়াছিলেন ও এক অজ্ঞাত শঙ্কায় তাড়াতাড়ি দেখা করিতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

টেবিলের কাছে, নিজ চেয়ারে বসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাস্ তুই?"

বেশ একটু অবাক হইয়া তিনি দেখিলেন মং কিন তাহার সম্মুখে আসিয়া একটা টুলে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"যা বল্‌ব তা একটু কঠোর হ'লেও তা আমায় ব'লতেই হ'চ্ছে। আপনি এই গাইনের বিষয়টা সম্বন্ধে আপনার বিবেকের সাথে মিটিয়ে নিন—তাই ব'লতে আমি এসেছি।"

মেঘনাদ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ও চেয়ারে আরো হেলান দিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এই দুর্দ্দশার মধ্যে ও তাঁহার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাহার শ্বশুরের মূর্ত্তি তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইল। তিনি অনুভব করিলেন তাহার শ্বশুরই যেন চেয়ারে বসিয়া আছেন।··· কি স্পর্দ্ধা! যাহাকে তিনি আশ্রয় ও দুমুঠা খাইতে দিয়া এই দুর্দ্দিনে সপরিবারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন সেই কিনা তাহারি উপর হুকুম জারি করিতে আসিয়াছে আর এমন এক বিষয়ে যাহার সহিত কোন সংস্রবই তাহার নাই! না! এ অসহ্য। ক্রোধে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মনে হইতেছিল, এ বৃদ্ধকে এখনি এক পদাঘাতে ঘর হইতে বিতাড়িত করেন।

তাহার পর কিঞ্চিৎ সংযত হইয়া তিনি কহিলেন—"সে বিষয়ে কি সংস্রব আছে তোর?"

বৃদ্ধটি লাঠিতে ভর দিয়া স্থিরভাবে বলিল—"মৃত্যু আমার ঘনিয়ে এসেছে কর্ত্তা। আমি শুধু চাই একটু শান্তি মৃত্যুর আগে। আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হ'লে আমি তা হারাব। তাই আপনাকে ব'লতে এসেছি।"

মেঘনাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"কি? কেউ কি তোকে পাঠিয়েছে এ কথা আমায় ব'লতে?"

"হাঁ।"

"কে? গাইন বুঝি? হয় ত' ধারে তার কাছ থেকে কিছু কিনিছিনি?"

"আমায় পাঠিয়েছে আমার বিবেক, যাকে আমি ভগবানের আদেশ বলে মানি।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তাহার পর একটু কাশিয়া মেঘনাদ বলিলেন—"কি সাক্ষী তুই দিবি এ বিষয়ে?"

"আমি যে আপনার সাথে সহরে গিয়েছিলাম সেবার।"

"কোন বার?"

"যে বার আপনি দলিলটি সম্পাদন ক'রেছিলেন।"

মেঘনাদ শক্ত করিয়া চেয়ারের হাতোল দুটি আঁকড়িয়া ধরিলেন। তাহার পর একটু কাশিয়া মেঘনাদ বলিলেন—"বুড়ো হ'য়ে মাথা খারাপ হ'য়েছে তোর, বাড়ী ফিরে গিয়ে চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্‌গে যা।"

তাহার পর উঠিয়া গিয়া জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরে অন্য ভাবের উদয় হইল তাঁহার মনে। তিনি বৃদ্ধের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—

"যদি তুই কোর্টে সাক্ষী দিতে যাস্, তাহ'লে আমি প্রমাণ ক'রে দেব—তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে, তুই পাগল ; যা।"

বৃদ্ধ ধীরে শান্তস্বরে বলিল, "নমস্কার—আমি শুধু চেয়েছিলাম মরবার আগে একটু শান্তিতে কাটাতে।" তার পর সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মেঘনাদ প্যাণ্টলানের পকেটে হাত দু'খানি ঢুকাইয়া দিয়া জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিজের ছাড়া অপর একজনার উপর রাগ করিতে পারিয়া মনটা তাহার খানিকটা শান্ত হইল।

তাঁহার বিবেকের সহিত বুঝা-পড়ার বিষয়েও অপরের হস্তক্ষেপ কেন? এ ধৃষ্টতার ব্যবস্থা করিবার শক্তি তাঁহার আছে। তাঁহার দৌর্ব্বল্য দেখিয়াই কি এই সব অনধিকার চর্চ্চা করিতে ওরা সব সাহসী হইতেছে? এই বৃদ্ধ স্থবিরের হুম্‌কীর ভয়ে মেঘনাদ দত্ত যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, এটা ঠিক্। আজ আর কিছু করা হইবে না। কোনো একটা উপায় ইহার পর উদ্ভাবন করিয়া লইলেই চলিবে।

সেদিন আহারের সময় মেরী তাঁহাকে বলিলেন—"শুনেছ, মিসেস সুমিত্রা গৌতম গাইনকে সাহায্য করবার জন্ম তার কাছে গিয়েছিলেন?"

"না।" সুমিত্রার মার্জ্জিত চেহারাখানি তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল সুমিত্রা তাহাকে দেখিয়া স্মিতহাস্তে অভিবাদন করেন। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তিনি ভাবিলেন সুমিত্রাও তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে—গাইনের সাহায্যে তৎপর! সহর শুদ্ধ সবাই তাহার বিরুদ্ধে হইলেও তিনি মোটেই ভীত নন; আর সেই ভয়ে তিনি নিজ দোষ স্বীকার করিবার জন্ম ব্যস্ত নন মোটেই। ব্যস্ত এইজন্ম যে তিনি চান শান্তি।

যে কোনো কঠিন বাধা বা বিরুদ্ধাচরণের কথা তিনি জানিতে পারিলেই পৌরুষ তাহার জাগিয়া ওঠে—ইহাই মেঘনাদের প্রকৃতির একটা প্রধান বিশেষত্ব। বাধার ভয়ে তিনি কখনো পশ্চাৎপদ হন নাই জীবনে কোন কাজেই। তাই মিসেস গৌতমের কথা তাঁহার মনে খোঁচার মত বিঁধিয়া রহিল। যে শিক্ষকটির নিয়োগ লইয়া বিদ্যালয় সমিতির সভায় তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি যে মিসেস গৌতমের বন্ধুস্থানীয়, তাহা মেঘনাদের মনে পড়িয়া গেল। হয়ত সেই তাহাকে গাইনের কাছে লইয়া গিয়াছিল। রাত্রে শুইয়া শুইয়া তিনি কল্পনা করিতেছিলেন হয় ত' আরো অনেকে তাহার দল ছাড়িয়া বিক্রমের পক্ষে যোগদান করিতেছে।

"আমার শত্রুপক্ষ দেখ্‌ছি এই ব্যাপার লইয়া তাহাদের শত্রুতা সাধন করিবার বেশ একটা সুযোগ পাইয়া বসিয়াছে"—ভাবিতে ভাবিতে মেঘনাদের মন আরো কঠোর হইতে লাগিল। মনে বিবেকের দংশন হইতে কিন্তু এই চিন্তা তার কাছে বহু গুণে অল্প কষ্টকর মনে হইল।

একদিন তিনি শুনিলেন তাহার চির-বৈরী ব্যারিষ্টার ফিটিং গাইনের পক্ষ সমর্থন করিবে। এবং সে বলিয়া বেড়াইতেছে যে গাইনকে খালাস করিয়াই তিনি মেঘনাদকে রেহাই দিবেন না—এই মিথ্যা অভিযোগ আনয়নের জন্ম তিনি তাহার নিকট হইতে প্রচুর খেসারৎ আদায় করিয়া তবে ছাড়িবেন। এ কথাও তিনি বলিয়াছেন—বহু সাক্ষী তিনি পাইয়াছেন—তাই অতি সহজেই তিনি প্রমাণ করিয়া দিবেন যে মেঘনাদ বহুদিন হইতেই নানাপ্রকারে গাইনের ক্ষতি করিবার জন্ম নানাভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। পিছনের দিকে হাত দুখানি সংবদ্ধ করিয়া তিনি কয়েকবার ঘরে পাইচারী করিয়া লইলেন। তাহার পর থামিয়া স্বস্তির এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি মেরীকে বলিলেন—

"দেখছ মেরী শৃগালগুলোও জোট বাঁধিয়া আমার পিছনে লেগেছে? ফিটিং তা'হলে এতদিন পরে একটা মামলা পেল। আমি এতদিন গাইনের সাথে বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আস্‌ছি! বটে? এত মিথ্যা সম্পূর্ণ অসহ্য।"

মেরী বলিলেন—"আমি ত তোমায় আগেই ব'লেছিলাম।" কতগুলি কাঠ তাহাকে কিনিতে হইয়াছিল আর তাতে নাকি মেঘনাদ বহুটাকা তাহাকে ঠকাইয়া নিয়াছে। সে যা'ক্, তা ছাড়া এক বিধবা নাকি বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রচুর ধন-রত্ন মেঘনাদের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিল, আর মেঘনাদ তাহাকে বঞ্চিত করিয় যথা-

সর্ব্বস্ব তাহার উদরসাৎ করিয়াছে—ফলে সে স্ত্রীলোকটি এখন পথের ভিখারী। এইরূপ বহু অযথা মিথ্যা গাইন এখন মেঘনাদের নামে কিছুমাত্র না ভাবিয়া যেখানে সেখানে প্রচার করিতে সুরু করিয়াছে। ক্রমশঃ সেগুলি মেঘনাদের কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। শুনিয়া গাইনের উপর একটা তীব্র ঘৃণা বিজাতীয় ক্রোধ বৃদ্ধের সমস্ত মনটা অধিকার করিয়া বসিল নিজের মিথ্যার কথা তিনি প্রায় ভুলিয়াই গেলেন; তাহার পরিবর্ত্তে মনে তাহার ধারণা হইল তিনিই চতুর্দ্দিক হইতে মিথ্যার আঘাতে আক্রান্ত। পীড়িত ও উদ্ব্যস্ত হইতেছেন গাইন ও অন্যান্য শত্রুদের দ্বারা।

অন্যদিকে এই সব নিছক মিথ্যার দৌরাত্ম্য মনে একটা জিদ দাঁড়াইয়া গিয়া এ সবের প্রতিবিধানের আবশ্যকতা ও চেষ্টায় তাহার মানসিক তেজ ও নষ্ট স্বাস্থ্য উভয়ই ফিরিয়া আসিল। পূর্ণোদ্যমে তিনি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কে দোষী তাহা আর তাহার বিচার্য্য বিষয় মোটেই রহিল না—শুধু একএক প্রশ্ন এখন তাহার মনে স্থান পাইল—"কে জিতিবে?" এখন আর এইটি তাহার ও তাহার বিবেকের মধ্যে বুঝা-পড়ার বিষয় রহিল না ইহা দাঁড়াইল এখন তাঁহার ও তাঁহার শত্রুদের মধ্যে দারুণ সংগ্রামে—হার-জিতের সমস্যায়। যখনই নূতন নূতন সাক্ষীদের নাম তাঁহার কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল তখনই তিনি প্রচেষ্টা হইলেন কি করিয়া তাহাদের বাধা দেওয়া যায় বা কেন তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে তাহা ধরিয়া দিবার পন্থা বাহির করিতে। অনুধাবন করিয়া সব ক্ষেত্রেই তিনি দেখিলেন পূর্ব্বেও উহারা তাহার উপর নানারূপ বিরুদ্ধাচরণের প্রয়াস পাইয়াছে ও প্রতিবারই তাহাদের অপদস্থ হইতে হইয়াছে বিফল মনোরথ হইয়া। তাই তাহারা চায় সেই পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে। সে সব পুরাতন কাহিনী মনে পড়ায় তাঁহার ঘৃণা, ক্রোধ ও সঙ্গে সঙ্গে এ সবের প্রতিকারের একটা জিদ তাহার বাড়িয়াই যাইতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে মেঘনাদের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে, নিজ মিথ্যাজনিত যে একটা ক্ষত সঞ্চিত ছিল এই সব মিথ্যার তাড়নায় সেটা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন নগণ্য যে সব ক্ষত তাহার দেহের উপরকার চামড়া সামান্য একটু ছিন্ন করিয়াছে সেইগুলি লইয়া। তাই ক্ষুধা, নিদ্রা মনের বল সব তাহার ফিরিয়া আসিল। একটি লোকের বিরুদ্ধে যদি একুশটি অভিযোগ আনিত হয়, আর তাহার মধ্যেই সে যদি হয় কুড়িটিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। শুধু একটিতেই দোষ স্পর্শ তাহার ঘটিয়া থাকে, সে যেমন সহজেই তাহার বিবেককে এই বলিয়া বুঝ্ দেয় যে এই বিশটি অন্যায় আঘাতের দ্বারা তাহার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে—মেঘনাদের মানসিক অবস্থাটাও হইল তাহারি মত।

নীরবে বসিয়া অহরহ বিবেকের দংশন সহ্য করার অবস্থা আর তাহার নাই। চতুর্দিকে এখন তাহার কলরব উত্তেজনা, কর্ম্মের উদ্যোগ, বিচারের জন্য প্রস্তুত হইবার।

মেঘনাদের মনে সেদিন হইতে সকলের উপরই একটা সন্দেহের ভাব উপস্থিত হইল। কে কে, কোনসূত্রে তাহার দল ছাড়িয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিবে তাহাই এখন তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। "বহু সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিবে", "কি?" "যাহা মিথ্যা!" গাইনের ক্ষতি করার কোনো চিন্তা কখনো যে তাঁহার মনোপথে উদয়ই হয় নাই! ফলে এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রের পাল্টা জবাব দিবার জন্য একটা জিদের সৃষ্টিতে তাহার দেহ ও মনে শক্তি উভয়ই ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

প্রাতঃকাল। মেঘনাদ তখনো শয্যা ত্যাগ করেন নাই; এমন সময় মেরী আসিয়া বলিলেন যে খাপ্পা বলিয়া একটি লোক মং পোর কাছে কাজ করিত, সে নাকি সেই সই করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল ও গাইনের তরফে সাক্ষ্য দিবে। খাপ্পা বিক্রম মেটার কাছে কাজ করে এখন।

শুনিয়া তিনি তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া চটি জোড়া খুঁজিতে খুঁজিতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন:—"বেশ; বেশ, বিক্রমও অবশেষে এ গুহায় নাক ঢুকিয়েছে, দেখ্‌ছি!"

তাহার বিবেকের শেষ বোঝাটুকু নামিয়া গেল। গাইন আর এখন তবে নিঃস্ব, অসহায় নয়—ভারি ভারি লোক

তাহার সাহায্যে তৎপর। তাই সে বেপরোয়া মিথ্যা ছড়াইয়া বেড়াইতেছে তাঁহার নামে ও বড় বড় লোকের সাহায্যে সাক্ষীর যোগাড় করিতেছে। ব্যাপারটা তাহ'লে এবার মেঘনাদ বিক্রম সমরে পর্য্যবসিত হইল! যা'ক, অন্ততঃ বুঝিবার মত একটা প্রতিদ্বন্দী তাঁহার মিলিল।

আরো নানা গুজোব পর পর তাঁর কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। গাইন নাকি বলিয়াছে—একবার জন্ম তিনি এখন সর্ব্বদাই ব্যস্ত। রেঙ্গুনে গিয়া তিনি একজন ভাল কৌঁসুলির সহিত সমস্ত বিষয় পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ খণ্ডন ও প্রস্তাবিত মিথ্যা সাক্ষীগণের প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সব লিপিবদ্ধ করাই হইল তাহার এখনকার প্রধান কার্য্য; অবসর সময়েও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। আর অন্য কি প্রকারে তাঁহার শত্রুগণ তাহাকে আঘাত করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও তাহার কাজের মধ্যে দাঁড়াইল। ওরা ব'লছে—'টাকাটার জন্যই এই কাজ আমি ক'রেছি, নয় ত' স্ত্রীর ভয়ে!' 'বাঃ দু' হাজার টাকার জন্য বা স্ত্রীর ভয়ে মেঘনাদ নিজের সহি অস্বীকার ক'রছে— ব'লতেও ওদের বাধল না?—মূর্খের দল!

প্রাথমিক বিচারের দিন ঘনাইয়া আসিল। বৃদ্ধ টম্‌টমে করিয়া পূর্ণোদ্যমে উহাদের প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রতি-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বিচারের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত



ইষ্ট আফ্রিকার জঙ্গলে সাত হাজার মাইল

শ্রীহীরেন বসু

ইউগাণ্ডার পথে ও কেনিয়ার পথে পার্থক্য অনেক। কেনিয়া কলোনির সুগঠিত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অপেক্ষা ইউগাণ্ডার রাস্তা অনেক সুন্দর ও সুশ্রী। কেনিয়া কলোনির এলাকা ত্যাগের পর আমাদের মটর যখন ইউগাণ্ডার রাজ পথে পড়লো মনে হলো উত্তাল সাগর দোলার ঝাঁকানি শেষ করে বুঝিবা পুকুরেই সাঁতার কাটছি।

পথে বেলা ২॥০টার সময় এক নদীর ধারে বসে আহারাদি সমাপন করেছিলাম। এই নদীই কেনিয়া কলোনি ও ইউগাণ্ডার সীমান্ত নির্দ্ধারণ করছে। ইউগাণ্ডা প্রবেশ পথে প্রথম পেলাম আমরা "নৈবাশা" হ্রদ। ইউগাণ্ডার বিশিষ্টতাই হচ্ছে হ্রদ শ্রেণী। পরিব্রাজক ও টুরিষ্টরা লিখেছেন যে "Entering Uganda we feel that we are in the region of the great lakes." "নৈবাশা, নকুরু থেকে সুরু করে ভিক্টোরিয়া নায়ান্জা পর্য্যন্ত এই ইউগাণ্ডায়ই অবস্থিত। নৈবাশার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমাদের মটর তারই পাশে নিয়ে দাঁড় করালাম। তখন হ্রদের মাঝে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল অথচ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে রৌদ্রের নেই অন্ত। এরই পাশে ইংরাজদের বসতি ও হোটেল। সেটলারসরা এরই মিঠেন্ জলের সাহায্যে ক্ষেত-খামার করেন। বিশেষ করে এ জায়গার ফসল হচ্ছে (Cofee) কাফি।

নৈবাশার অনতিদূরে হচ্ছে "গিলগিল" সহর। গিলগিল গিরিশৃঙ্গের উচ্চ শিখর হতে আজও ধূমোদ্গারণ দেখা যায়। যুগযুগান্তের স্মৃতি বহন করে এই গিলগিল গিরিশৃঙ্গ আজও প্রচার কচ্ছে—যে আফ্রিকার বুকের মাঝে তাদেরই পরিবারের একছত্র রাজত্ব ছিলো—যদিও তা' ধুয়ে মুছে, শান্ত খাদে পরিণত হয়েছে—তবুও তার উত্তরাধিকারী সূত্রে গিলগিল আজও বর্ত্তমান। তাই বছরে একবার করে তার হুঙ্কারের সাড়া ওখানের অধিবাসীরা শুনতে পায়।

দেখতে দেখতে আমাদের মটর গিলগিলের রুদ্রতার এলাকা ছাড়িয়ে এসে পড়লো "নকুরু" সহরের মাঝে। ছোট্ট সহর অথচ সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। যেন খেলাঘরের সাজান হাট তারই পাশ ঘেঁড়ে রয়েছে পাহাড়-ঘেরা "নকুরু হ্রদ"। সোডা ও খারের খনি তারই বুকে। জল শুখিয়ে মাটীর পলির বদলে এখানে পাওয়া যায় খারের বা সোডার পলি। এই হ্রদের মাঝে বসতি বেঁধেছে লাখ লাখ সারস ইংরাজিতে যাকে বলে "Flamingos". বর্ণ এদের গোলাপী যেন জলের বুকে রক্ত পদ্ম। এদের ছবি নেবার অবকাশ যদিও আমাদের ফিরতি পথে হয়েছিলো তবুও এদের পেতে যা কষ্ট তার পরিচয় কিছু জানাবো। নকুরু হ্রদের ধারে ধারে মাইলের পর মাইল শুখনো সোডা বা খারের পলি কাজেই মটরে করে কাছে যাবার সময় নাকের মধ্যে সেই ধূলিকনা ঢুকে হাঁচির পর হাঁচির সৃষ্টি করে। নস্যির নেশাখোরা হয়ত বা তা সহ্য করতে পারেন কিন্তু ও নেশায় যারা বঞ্চিত তাদের অর্থাৎ আমাদের অবস্থা দুর্দ্দশাগ্রস্থ করে তুলেছিলো। জল হতে প্রায় মাইল খানিক দূর হতেই, পদব্রজে পথ অতিক্রম ছাড়া আর গতি নেই এবং এই গতির অন্যথা পথ অতিক্রমান্তেই ফ্লেমিঙ্গোসদের দেখা পাবো। ক্যামেরাম্যান সুধীর বসু ও আমি, উৎসাহের আতিশয্যে ছুটে চললাম। দু' দশ কদম যাওয়ার পর হঠাৎ দুজনে এক সঙ্গে একেবারে পুতে গেলাম সেই পঙ্ক সমুদ্রে। পঙ্কজের আশায় পাঁকের বিপাকে পড়ায় আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সত্যিই এ দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না; যতই নিজেদের মুক্ত করে নিতে চাই ততই সখাদ খাদে ডুবে চলি। অদূরে বন্ধুবর্গের উন্মত্ত হাসিতে আমাদের আরো ধৈর্য্য হারা করে দিচ্ছিল। সর্ব্বশেষ উপায়ন্তর হয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধরে পূর্ব্ব পথ বেয়েই পঙ্কোদ্ধার করলাম। ছবি

উঠাবার সর্ব্ব আশা ক্ষান্ত হলো। সারা অঙ্গে নাকে মুখে শুধু সোডার গুড়ো আর খার মাটির অনন্ত জ্বলুনি।

দূরের পানে চেয়ে দেখি সেই রক্ত পদ্মের রাশি। আবার অশান্ত উত্তেজনায় আমরা এগুলাম। সঙ্গীরা হাসি থামিয়ে এক পাথরের চূড়ায় আমাদের নীচু থেকে ঠেলে তুলে দিলে সেখান থেকে করলাম চিত্র সঙ্কলন।



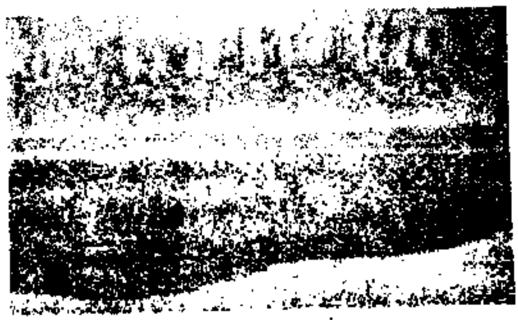
লেক নৈবাশা

নকুরু অভিজ্ঞতার সমাপ্তি করে আমরা কিসুমুর পথেই পাঠকদের নিয়ে যাই চলুন। কিসুমু নৈরবী সহর থেকে ২৮৫ মাইল। নকুরু ছাড়ার পর পথে পেলাম পূর্ণিমার চাঁদ। সারা বনানী বুকে সোনার লহর। মটর পাহাড় বেয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে লাগলো। ৮৩২২ ফিট উচ্চতায় মটর উঠে পড়লো। "মাউণ্ট সামিট" অর্থাৎ Mount Summit হচ্ছে আফ্রিকার রেলওয়ে ষ্টেশন। উচ্চতায় উর্দ্ধ ৯০০০ ফিট। এখানকার ষ্টেশন মাষ্টার ভারতীয়। তাঁর ডেরায় আমাদের সান্ধ্য ভোজনের আয়োজন পূর্ব্ব হতেই ছিলো। তাই মটর থামলো। ভালই হ'লো কারণ উপরে অজস্র ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সারা পাহাড়ের গা পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে তাই সঙ্গী প্রধান মিঃ পাটেলের ইচ্ছা ছিলো সেই রাত্রে মাউণ্ট সামিটেই আমরা থাকি কিন্তু কিসুমু পৌঁছিয়ে আমাদের নানা কাজ; দেরী হলে লোকসান অধিক তাই স্থির হলো সেই রাত্রেই কিসুমু পৌঁছিতে হবে।

প্রায় ঘণ্টা দেড় বাদ আমরা পুনর্যাত্রা করলাম। এবার উৎরাই। কাজেই মটরের স্পিড যত আস্তে হওয়া সম্ভব করা হয়েছে। পথে মটরের আলোয় বন্য হরিণ ও শশক হাওয়ায় চকিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও একটী হরিণ ও একটী শশকের প্রাণ গেলো। তাদের মৃত্যুতে বয়দের আনন্দ—খাদ্য মিলেছে কিনা। ক্রমে ভীষণ রাত্রের অন্ধকার ঠেলে আমরা যখন কিসুমু পৌঁছিলাম তখন রাত সাড়ে চারটা।

কিসুমু ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জার ধারে প্রতিষ্ঠিত বড় সহর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকান পসার পরিপাটিভাবে সাজানো। ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জার উপর জাহাজ ও সিপ্লেনের বন্দর। আধুনিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

সকালে উঠেই প্রথম দৃষ্টি পড়লো ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা হ্রদের উপর। বাড়ীর সামনেই এই বিশ্ববিদিত অপরূপ নায়েঞ্জা, অপার সমুদ্রের মত বিস্তারিত; বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। নায়েঞ্জা লেকই হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত,



নকুরু হ্রদের সারসপুঞ্জের পদ্মশোভা

শত-ইতিহাস জড়িত নাইল নদীর উৎস-ক্ষেত্র। কাপ্তেন স্পেকের আবিষ্কৃত নাইলের জন্ম কথার আদি মাতৃভূমি। খ্যাতি হিসাবে এই নায়েঞ্জা লেকই দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং মিঠে জলের হ্রদ হিসাবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। নায়েঞ্জার বিস্তার আইয়ারল্যাণ্ডের পরিধির চেয়ে বেশী।

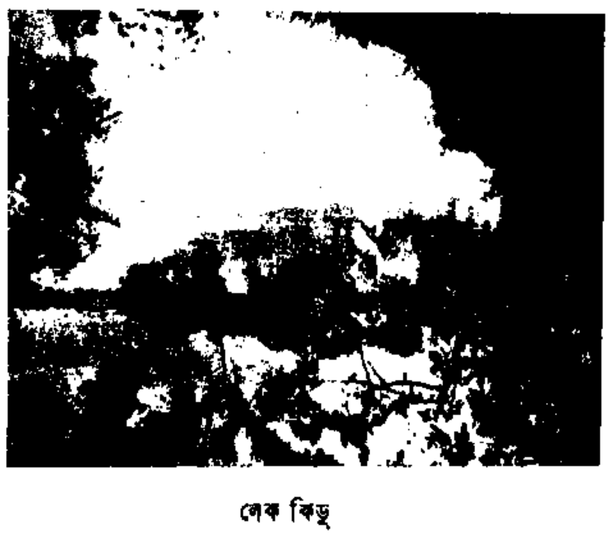


ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা

আজকাল জলীয় বিমান-পোত বিভাগের বন্দর ও পারাপারের জাহাজ-বন্দর। কিসুমু হতে অপর পারে জাহাজ পৌছিতে লাগে সাত দিন। নায়েঞ্জার উচ্চতা সমুদ্র বক্ষ হতে প্রায় ৪৫০০ ফিট। অসীম জলরাশি বিস্তারের ধারে ধারে ইষ্ট আফ্রিকার বহু বিখ্যাত সহরের স্থিতি। তারমধ্যে কাম্পালা ও এনটিবি সহরে আমরা গিয়েছিলাম যা যথাযথ সময় জানাবো।

ইউগাণ্ডার বিশিষ্ট হ্রদমালার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে প্রায় সব হ্রদই সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির স্ফুরণ অবশিষ্ট গর্ত্ত বা খাদের গভীর গহ্বরে। লেক নায়েঞ্জা থেকে সুরু করে প্রায় সব হ্রদই তাই বিশিষ্ট উচ্চতায় স্থিত। ইষ্ট আফ্রিকার হ্রদমালার আধুনিক নামকরণ তালিকা হচ্ছে—ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা, আলবার্ট নায়েঞ্জা, লেক এডওয়ার্ড, লেক জর্জ্জ, লেক নকুরু, লেক নৈবাশা এ ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ সংখ্যায় গণনাতীত। টোরো মহকুমার ১১টী ক্রেটার লেক আছে। ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা যেমন সবচেয়ে বড় তেমনি "লেক কিভু" সবচেয়ে সুন্দর। লেক কিভুর উচ্চতা ৫০০০ ফিটের উপর। "লেক কিভু" বেলজিয়াম কঙ্গো ও ইউগণ্ডার মধ্যবর্ত্তী হ্রদ। এর প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য জগৎ বিখ্যাত।

কিসুমুর কাজ শেষ করে আমরা কাম্পালা যাত্রা



লেক কিভু

করলাম। কাম্পালা ইউগাণ্ডার প্রধান সহর বা রাজধানী। ২৩৫ মাইল পথ, মধ্যে পড়ে অনেক সহর তারই মধ্যে "জিঞ্জার" বিশিষ্টতা ঐতিহাসিক। এই জিঞ্জা নায়েঞ্জার ধারে অবস্থিত। এইখানেই নায়েঞ্জার জলস্রোত প্রপাতের সৃষ্টি করেছে; নাম তার "রিপন প্রপাত" Ripon Falls.



ছোট ছোট ক্রেটার লেকের একটি

বিশাল ধারে নায়েঞ্জার সফেন নীল জল উন্মুক্ত উল্লাসে ছুটে চলেছে আর এই নীল ধারার পাকে পাকে জগতের সর্ব্ব দীর্ঘ-নদী, "নীলা-নাইল" বা 'Blue Nile', কৌতূহল জড়িত রূপকথার ও ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এরই অনতি দূরে মানুষ বিরোচিত জিঞ্জার পুল। বিশ্বকর্ম্মার-সৃষ্টি-পাশে জগতের ক্ষুদ্রতম কারখানা যেন খেলাঘরের সেতু বন্ধ।

জিঞ্জা ত্যাগ করতে আর মন চাইছিল না তবু কর্ত্তব্য টেনে নিয়ে চললো কাম্পালায়। সাতটী পাহাড় চূড়ায় এই সহরের বসতি। রাত্রের অন্ধকারে সহরের বিজলী-বাতি দীপালির সৃষ্টি করেছিল। এইখানে আমরা 'পাটেল-সমাজে' রাত্রি বাস করি। সকালে উঠেই "এন্টিবি" যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। (Entebo) এন্টিবি পুরাতন সহর ও নায়েঞ্জার ধারে বড় বন্দর। ইউগাণ্ডার সমস্ত বাণিজ্যই এই পথে রপ্তানি হত আজ রেলওয়ে কোম্পানির কৃপায় তা স্থগিত করেছে।

এন্টিবিতে ছবি সঙ্কলনের বিশেষ বস্তু থাকায় বেলা ১২টার সময় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এন্টিবির কুমীর বিশ্বখ্যাত। এর বয়স হয়েছে হাজার বছরেরও উর্দ্ধে। জনপ্রবাদ যে পুরাকালে, এই বৃদ্ধ কুমীর ছিলো দেশীয়দের বিচারক। যদি কেউ অপরাধী হ'ত তাকে এই বিচারকের কাছে আনা হ'ত। কুমীরের বিচারে যদি অপরাধী সাব্যস্ত হ'ত তা হলে কুমীর তাকে গ্রাস

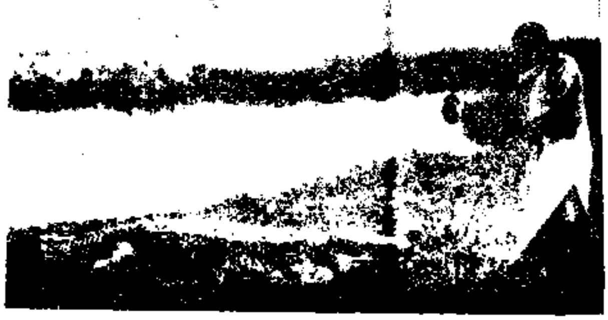


রিপন প্রপাত-নাইলের জন্মকথা

কর্ত্ত আর যে হ'ত নিরপরাধী সে পেতো মুক্তি। আজও এই বিচারক জীবিত তবে বিচারকের পদ হতে পেন্‌সন নিয়েছেন। এখন এঁকে স্মরণ করে ডাকলেই তীরে উঠে আসেন এবং পেনসন স্বরূপ কিছু মাছ বা মাংসের টুকরো নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে নায়েগ্রার গভীর জলে গা ভাসান। আমাদের ভাগ্যেও তাঁর দেখা পেলাম। দেশীয় রক্ষক নাম ধরে ডাকতে লাগলো হাতে তার মাংসের টুকরা। কিছুক্ষণ আহ্বানের পরে সেই বৃদ্ধ বিচারক উঠে এলো।



জিঞ্জা সহরের সীমান্তে নাইল নদীর সেতু



ভিক্টোরিয়া নায়েগ্রার ধারে এটিবির হাজার বছরের বিচারক।

রক্ষক তার পিঠে চড়ে বসে নানা ভোজবাজীর খেলা দেখালে পরে তার প্রাপ্য—অর্থাৎ মাংসের টুকরা দিয়ে তাকে বিদায় করলো। শুনে আপনাদের অবস্থা যে রকম হচ্ছে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপই হয়েছিল। পরে চক্ষুর বিবাদ ভঞ্জনের জন্ত বিচারকের চিত্র সঙ্কলন করলাম—তার প্রতিকৃতি দেওয়া হলো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন বসু

গতজন্ম

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

পানীয় জলের অভাবে গ্রাম কলেরায় উজোড় হয়ে যাচ্ছিল, তাই গ্রামসুদ্ধ লোক এসে তরুণ জমিদারকে যখন ধরে পড়ল, তখন মৃগাঙ্ক আশ্বাস দিল, নিজের ব্যয়ে পুকুর কাটিয়ে দেবে। পুকুর কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। আর দু' হাত হলেই বোধ হয় জল বেরুবে।

পুকুর কাটা হ'চ্ছে পুরোনো আমলের একটা ইঁদারা উদ্ধার করে। সে-ইঁদারা ভরে গিয়েছিল নানা বন-জঙ্গলে, কচুরী পানার দামে, বড় বড় জিরেল গাছের দীর্ঘকালের প্রভুত্বে আর অসংখ্য সাপে। এ-ইঁদারা যে কবেকার কাটা, তা নির্ণয় করতে প্রয়োজন প্রত্নতত্ত্ববিতের।

বাড়ীর বুড়ো সরকার-মশাই পুকুর কাটার তত্ত্বাবধান করছেন, মৃগাঙ্ক টাকা দিয়েই খালাস। সে-দিন সকালে সে তার বসবার ঘরে আগের দিন বিকেলের 'ডাকে' কলকাতা থেকে আসা একটা খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সত্তস্নাতা সুমিত্রা এসে নত হয়ে স্বামীকে প্রণাম করল, এবং বিস্মিত ও পুলকিত মৃগাঙ্কর গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল।

—ব্যাপার কী সুমিত্রা ?

সুমিত্রা কথা বলল না। মৃদু হেসে কাছে এগিয়ে এলো। মৃগাঙ্কর মনে পড়ল, আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে এমন দিনে তাদের বিয়ে হয়েছিল। গত বছর-ও ঠিক এমন দিনে সত্তস্নাতা সুমিত্রা এমনি ভাবে তা'কে প্রণাম করে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। তা'র সমস্তটা মন খুসীতে ভরে উঠল।

বাইরে থেকে এমন সময় বৃদ্ধ সরকার মশাইয়ের কণ্ঠে প্রশ্ন এলো,—ভেতরে আসব মৃগাঙ্ক ?

—আসুন।

সুমিত্রা চলে গেল আর গলার মালাটা মৃগাঙ্ক খুলে নিল।

—তোমায় একটু পুকুরের কাছে যেতে হবে মৃগাঙ্ক। "কুয়োতীরা" কাজ করতে চাইছে না, আজ ভোরে মাটি খুঁড়তে গিয়ে দু'টো মানুষের কঙ্কাল উঠেছে। কী কাণ্ড দেখো, মানুষের কঙ্কাল আবার কোত্থেকে উঠল। যত সব ফ্যাসাদ! তুমি গিয়ে মজুরী একটু বাড়িয়ে দেবার কথা বোল, তা' হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিস্মিত মৃগাঙ্ক সরকারের সঙ্গে চলল কঙ্কাল দেখতে।

পরদিন প্রভাত। মজুরী বাড়িয়ে দেবার কথায় "কুয়োতী"রা আবার কাজ আরম্ভ করেছে। মুখ হাত ধুয়ে এসে মৃগাঙ্ক তার পড়ার ঘরে বসেছে। মুখ চিন্তাকুল, চোখ ক্লান্ত, চুল রুক্ষ, রাত জাগা চেহারা। সুমিত্রা এসে ঘরে ঢুকল।

—কে ? সুমিত্রা ? বোস।

জবাব না দিয়ে সুমিত্রা কাছে এসে বসল।

—জান সুমিত্রা, কাল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। শুনবে ?

—বল।

কনুইএর ওপর মাথা রেখে মৃগাঙ্ক বলতে আরম্ভ কোরল।

দেখলাম, যেন কোথায় চলেছি বাড়ী থেকে। অন্ধকার রাত। সঙ্গে অনেক লোক—বরকন্দাজ, লেঠেল। বনের মধ্য দিয়ে পথ; নিঃশব্দে আমরা চলেছি। সঙ্গে আমাদের আলো নেই কোন, সকলের হাতে এক একটা মশাল—জ্বালানো নয়। অনেক দূর গিয়ে বাজনা শুনতে পেলাম—উলু, শাঁখের শব্দ কানে এসে বাজতে লাগল। সেই শব্দ ধ'রে আমরা এগিয়ে চলেছি। গিয়ে দেখি, একটা বাড়ীর উঠোনে সামিয়ানা খাটানো—সেখানে বিয়ে হ'চ্ছে। কনে সম্প্রদান তখন সবে হচ্ছিল, কেউ গান করছিল, কেউ

আনন্দে চেঁচামেচি করছিল, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। চারদিকে আলো। আমরা যেতেই সব আনন্দ, থেমে গেল। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো সবাই। আমরা তখন তাদের সব আলো গুড়ো করে দিয়েছি লাঠি মেরে, মশাল জ্বালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি সামিয়ানায়, আর সবগুলো ঘরে। চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। কেউ বাধা দিতে এলো সাহস করে, বরকন্দাজের লাঠির ঘায়ে তা'দের কারো ভাঙলো হাত-পা, কারো মাথা। আগুনের রক্ত আভায় অন্ধকার আকাশ উঠলো লাল হয়ে। মৃত্যুর আর্তনাদে শিউরে উঠলো চারদিক।—ওকি সুমিত্রা? অমন কোরছ কেন তুমি? ভয় পাচ্ছ? থাক, আর বোলব না তবে।

—না, না, বলো তুমি। থেমো না, বলো।

—তারপর আমরা ফিরলাম সবাই। আমি নিজে সেই মেয়েটিকে, যা'র বিয়ে হচ্ছিল তা'কে, পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে চললাম। ভয়ে তখন সে প্রায় চেতনাহীন, সে বাধা দেয়নি নিয়ে আসার সময়। সে শক্তি তা'র ছিল না, কণ্ঠরুদ্ধ ছিল আতঙ্কে।

যেন এই বাড়ীতে নিয়ে এলাম তা'কে। আমাদের এক পুরুত মন্ত্র পড়ল, আর সেই মেয়েটির সাথে হল আমার বিয়ে। কিন্তু, কি জান সুমিত্রা, তার মুখখানি ঠিক তোমার মুখের মত। তোমার মত কি, সে ঠিক তুমি। তোমার মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন সুমিত্রা? স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটির মুখ ভয়ে ঠিক এই রকম দেখাচ্ছিল।

সুমিত্রার মুখ কাগজের মত সাদা দেখাতে লাগল। তন্দ্রাচ্ছন্নর মত সে বললে—সে আমি, আমিই সে। তার পর?

—তার পর? তারপর সেই রাত্রিতে বাসর ঘরের মধ্যে কী শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি অন্ধকারে ছায়ার মত একটা লোক। "কে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জবাব পেলাম না। শুধু দেখলাম, একটা ছুরি অন্ধকারে ঝকঝক করে উঠে প্রায় আমার বুকের কাছে এলো। ছুরি-সুদ্ধ হাতটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। দুর্ব্বল সে, আমার শরীরে তা'র চেয়ে ঢের বেশী জোর। ছুরীটা মুঠো থেকে খসিয়ে এনে মারলাম তা'কে লক্ষ্য করে। মাঝে এসে সেই মেয়েটি দাঁড়ালো—তুমি দাঁড়ালে মাঝে এসে। ছুরী লাগলো তোমার গায়ে। চীৎকার করে উঠলাম, লোকজন এসে ধরল সেই ছায়া-মূর্ত্তিকে, তুমি তখন মুমূর্ষু। আলোয় দেখা গেল, তোমার যে সম্প্রদান করছিল, ছায়ামূর্ত্তি সে। ও কি? সুমিত্রা? অমন কোরছ কেন সুমিত্রা? শোন, তারপর—

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে অস্ফুট স্বরে সুমিত্রা বলে চলল—তারপর তোমাদের বরকন্দাজ এসে তোমাদের হুকুমে দাদার রক্তে বাসর ঘর ভাসিয়ে দিল। তারপর আমার মুমূর্ষু দেহটা আর দাদার প্রাণহীন শরীর রাতারাতি তোমরা মিলে ওই দীঘির মধ্যে পুঁতে ফেললে।

সুমিত্রার দেহ এলিয়ে পড়েছিল। তা'র মুখের কাছে ঝুঁকে মৃগাঙ্ক বিচলিত ভাবে প্রশ্ন কোরল,—"এমন কেন হোল সুমিত্রা।"

ফিস ফিসে আওয়াজে উত্তর এলো—তোমরা জমিদার হ'লেও বংশ গৌরবে আমরা ছিলাম বড়ো। তোমার বাবা আমাদের বংশের মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। তোমার ওপরে তিনি দিয়ে গেলেন প্রতিশোধ নেবার ভার। আমার ছোট বেলায় এসব কথা শুনেছি। তাই এমন প্রতিশোধ তুমি নিলে।

চেতনাহীন সুমিত্রা জ্ঞান ফিরে পেল ডাক্তারের হাতে।

এর পরে পাঁচটা বছর একে একে পার হ'য়ে গেছে। প্রতি বৎসর বিবাহের স্মরণ দিনে মৃগাঙ্ক আর প্রাতঃস্নাতা সুমিত্রার প্রণাম আর ফুলের মালা পায় না। বছরের এই দিনটা তা'দের স্মরণীয় হ'য়ে আছে বটে; তবে অন্য হিসেবে। দুজনে সশঙ্ক থাকে, বছরের এই দিনটা কবে এসে বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ব্যবধান এক মুহূর্তে উড়িয়ে দেবে, আর সেই অতি পুরাতন দিনের বীভৎস কাণ্ডের জের এ জন্মেই তাদের এই দিনটায় বইতে হবে।

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার



শ্রীসুশীলকুমার বসু

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন—

অনেকদিন ধরিয়া 'দেশের কথা'র উৎসুক পাঠকবৃন্দের নিকট হইতে আমাকে বাধ্য হইয়া দূরে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু অনিবার্য্য কয়েকটি কারণ এবং অনতিক্রম্য নানা অসুবিধার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অপরাধে অপরাধী হইতে হইয়াছে। অপরাধ অনিচ্ছাকৃত বলিয়া পাঠকবর্গের মার্জ্জনা পাইবার আশা করিতেছি এবং এখন হইতে নিয়মিতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিব বলিয়া মনে করিতেছি।

'দেশের কথা'র আলোচনা সম্পর্কে যাঁহারা আগ্রহ দেখাইয়াছেন তাঁহারা লেখককে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জরুরী আইনের হাত এড়াইয়া আলোচনাগুলির পূর্ব্ববৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে না। এজন্য পাঠকবর্গের মনে কোন ভুল ধারণার উদ্ভব হইবে না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বর্ত্তমানে এই সকল আলোচনা লিখিতে সাহসী হইতেছি।

আমাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অনৈক্য—

ইংরেজ যখন জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িলেন তখন ভারতবর্ষের সকল নেতারাই এই আশা করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে ভারতবাসীর সদিচ্ছা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পাইবার জন্য ভারতবাসীর হস্তে স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আরও কিছু পরিমাণে দেওয়া হইবে। বিশেষ করিয়া এই সময় যখন বিলাতের নামকরা পত্রিকাগুলি এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ পরিচালিত এই দেশীয় পত্রিকাগুলি ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের পক্ষ সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন তখন যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষের কিছু পরিমাণ অধিকার লাভ সম্পর্কে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বড়লাটের এই সম্পর্কিত বক্তৃতায় এই আশাকে নিতান্ত রূঢ়ভাবে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারত-সচিবের উক্তিতে এই অস্বীকৃতির পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছিল।

আমাদের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে আমাদের অযোগ্যতার কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে আমাদিগকে শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রদানে আমাদের ভাগ্যবিধাতাদের অনিচ্ছাকে ঢাকিবার জন্য অতি সূক্ষ্ম আবরণ মাত্র সে সম্পর্কে ভারতবাসীদের কাহারও মনে অণুমাত্র সংশয় নাই। ৩৫ কোটি লোকবিশিষ্ট একটি বিরাট জাতির মধ্যে এমন সময় কখনই হইবে না যখন কোন একটি বিশেষ বিষয়ে দেশের সকল লোক একমত হইবেন। বিশেষ করিয়া যখন দেশে এমন অনেক লোক রহিয়াছেন, যাঁহাদের স্বার্থ বর্ত্তমান ব্যবস্থার সহিত অবচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় দেশের দরিদ্র, নিরন্ন এবং শোষিত জনসাধারণ বহু ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। তাঁহাদের স্বার্থের সহিত যে সকল শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধ আছে সেই সকল শ্রেণীর লোক এই পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইবেন। কাজেই দেশের জমিদার, মহাজন, পুঁজিদার, রাজন্যবর্গ, চাকরী ও পদমর্য্যাদা প্রত্যাশীরা স্বভাবতই কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইবেন। আবার বর্ত্তমান ব্যবস্থার আওতায় সুখ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ একমাত্র ইঁহারাই পাইয়াছেন এবং শিক্ষাদীক্ষা ও

শক্তির অধিকারী ইঁহারাই হইয়াছেন, এইজন্য ইঁহাদের সংখ্যা অধিক না হইলেও, ইঁহারাই সমাজের সবাক অংশ। সমাজের নির্ব্বাক অংশের লোকের সংখ্যা অনেক অধিক এবং তাঁহাদের স্বার্থও পূর্ব্বোক্তদের স্বার্থের বিরোধী। কিন্তু ইঁহারা নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় এবং নিজেদের কথা বলিবার মত শিক্ষা ও সংঘবদ্ধতা না থাকায় ইঁহারা সহজেই পূর্ব্বোক্তদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে নেতা ও প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। একথা সকলেই জানেন যে, ইঁহারা নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধি মাত্র, দেশের লোকের প্রতিনিধি নহেন; কাজেই জনসাধারণের স্বার্থের পথে ইঁহাদিগকে দাঁড় করাইয়া বাহিরের লোকদের কাছে ভারতের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের কথা বলা যাইতে পারে বটে তবে, সঠিক অবস্থার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই প্রদর্শিত অনৈক্যের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন।

দেশের জনসাধারণের স্বার্থবোধকে জাগ্রত করিবার জন্য কংগ্রেস বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—এবং সে চেষ্টায় তাঁহারা বহুলাংশে সফলতা লাভও করিয়াছেন। কংগ্রেসের চল্লিশ লক্ষাধিক বিপুল সদস্য সংখ্যা হইতে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কংগ্রেসের সদস্য নহেন, এমন বহুলক্ষ লোক—হয়ত কোটিও হইতে পারেন—প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সমর্থক। কংগ্রেসের প্রভাবাধীন লোকের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনও কংগ্রেসের পরিপোষক। ইঁহাদিগকে ধরিলে এ কথা কোনপ্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বলা যায় যে, কংগ্রেস গণস্বার্থ বিরোধী মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত ধর্ম্ম বর্ণ ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই রাষ্ট্রনীতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারেন।

কাজেই একথা বলা সত্য নহে যে, রাষ্ট্রীক আকাঙ্খার ও লক্ষ্যের দিক দিয়া ভারতবাসীরা বহুদলে বিভক্ত অথবা তাঁহাদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ট ও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রশ্ন অতিশয় তীব্র।

আমাদের সংখ্যালঘিষ্ঠেরা প্রকৃত কোন সমস্যার সৃষ্টি করেন নাই—

ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ নহে, একথা কেহ বলিলে তাঁহাকে লোকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, প্রশ্নটাকে আমাদের একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। আসল কথা হইতেছে, সকল সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে কোন বিরুদ্ধতা নাই। একজন হিন্দু কৃষকের স্বার্থ হইতে একজন মুসলমান কৃষকের স্বার্থ অভিন্ন। শ্রমিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। এক সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকের স্বার্থ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকের স্বার্থের সহিত সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। আবার অন্যদিকে এমন কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নাই, যাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে সকলের স্বার্থ এক। একই সম্প্রদায়ের জমিদার ও কৃষকের অথবা পুঁজিপতির ও শ্রমিকের অথবা মনিব ও কর্ম্মচারীর স্বার্থ এক নহে। আমরা এমন কোন কল্পিত বা বাস্তব স্বার্থের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি না যাহা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু কোন এক সম্প্রদায়ের সকল লোকেরই স্বার্থ এবং যাহা আবার অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীরই স্বার্থের সহিত এক নহে। কাজেই, যখনই কেহ সংখ্যালঘুদের স্বার্থের অথবা নিরাপত্তার কথা বলেন তখন একথা আমাদের পক্ষে অনুমান করা অন্যায় অথবা অসঙ্গত নহে যে, এই সকল লোকের লক্ষ্য অন্য কাহারও স্বার্থ নহে।—নিজেদের স্বার্থই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য।

নানা ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় ভারতবর্ষের জনসাধারণ অনেকদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আছেন। বহুদিন ধরিয়া সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে বাস করিবার ফলে সকলেই প্রথমতঃ নিজেদের বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। জনসাধারণের অভ্যাসজাত এই ধারণাকে প্রতি সম্প্রদায়েরই সুবিধালাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজে লাগাইতেছেন। যে সকল ব্যবস্থা হইলে বা যে সকল কথা বলিলে নিজেদের নেতৃত্ব ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে—চাকরি ও প্রভুত্ব পাইবার অথবা রাখিবার সুবিধা হইবে, নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও নিরাপত্তার নাম করিয়া তাঁহারা সেই সকল কথা বলিতেছেন অথবা সেই সকল ব্যবস্থার সমর্থন করিতেছেন।

নিখিল ভারত বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতি

বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতির উদ্ভব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সর্ব্বজন স্বীকৃত এবং বাংলাভাষার শক্তি ও সম্ভাব্যতা সন্দেহাতীত হইলেও অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলাভাষার বিস্তৃতি অতিশয় সামান্য। নিজেদেরই দেশের একটি সমৃদ্ধ প্রাদেশিক সাহিত্যের সহিত পরিচয় না থাকা অবাঙ্গালীদের পক্ষে লজ্জার কারণ হইতে পারে কিন্তু ইহার জন্য বাঙ্গালীদের দায়িত্বের অংশ কম নহে। সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতীয় উপনিবেশ সমূহে যে হিন্দী ভাষার এত প্রসার তাহার প্রধান কারণ, হিন্দীভাষী লোকেরা নানাবিধ ব্যবসা ও শ্রমের কার্য্যে সর্ব্বত্র জড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং কোথাও নিজেদের মাতৃভাষা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা অন্যদের সহিতও কাজকর্ম্ম হিন্দীতে চালাইয়া আসিয়াছেন। অন্য ভাষা গ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হিন্দীভাষীদের সহিত কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য বাধ্য হইয়া ভারতের সকল প্রদেশের লোকেরই হিন্দীর সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় করিতে হইয়াছে। ইহাই হিন্দী ভাষার প্রসারের মূল কারণ। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টাটা অবশ্য কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক।

বাঙ্গালীরা যদি সজাগ ও সচেষ্ট হইতেন, তাহা হইলে বাংলা ভাষার প্রসার বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিশেষ করিয়া হিন্দীভাষী উত্তর ভারতে শিক্ষিত লোকদের বাংলার যথেষ্ট প্রচলন হইত। বাঙ্গালীরাই এই সকল প্রদেশে শিক্ষার বাণী ও উন্নততর সামাজিক জীবনের আদর্শ বহন করিয়া গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র উচ্চপদে ও সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের সংস্পর্শে আসিবার এবং ঐ সকল স্থানের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যদি ঐ সময়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশের সমাজের উচ্চস্তরে বাংলার প্রচলন হইত এবং ক্রমে তাহা শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। বাংলার ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও মাধুর্য্যের সহিত পরিচয় ঘটিলে বাংলাকে সহজে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত না এবং এইভাবে বাংলা ভাষা সহজেই নিজের পথ করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু এই অতি স্বাভাবিক কাজটি হয় নাই এবং তাহার জন্য আমাদিগকে আজ ফলভোগ করিতে হইতেছে।

কিন্তু অতীতের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। বর্ত্তমানের জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্য এই চেষ্টারই ফল। আমরা এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিতেছি এবং বিস্তৃততর আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতেছি।

শ্রীসুশীলকুমার বসু



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট-গল্প

(১২৯১ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

[অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম, এ]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট-গল্পের আলোচনা করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে, তিনি কবিত্বে যেরূপ দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন, ছোট-গল্প লেখকরূপেও সেরূপ হইয়াছেন। তাঁহার ছোট-গল্পের সংখ্যাধিক্যের ও জনপ্রিয়তার বিষয় চিন্তা করিলেই এই মন্তব্যের সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট-গল্পের জনক বা উদ্ভাবক নহেন; তাঁহার পূর্বে বাংলা ভাষায় অনেক ছোট-গল্প রচিত হইয়াছে। উহাদের সমস্তই যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা নহে। উহাদের অধিকাংশ ছোট-গল্প-নামের অযোগ্য এবং অল্পই ছোট-গল্প-পদবাচ্য।

পূর্বে "অজ্ঞাতনামা ছোট-গল্প লেখক" ও "উপন্যাস ও ছোট-গল্পে অভেদ" পরিচ্ছেদদ্বয়ে বলা হইয়াছে উপন্যাস ও ছোট-গল্পে কোনও ভেদ না করিয়া অসংখ্য অজ্ঞাতনামা লেখক অগণিত ছোট-গল্প রচনা করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাস ও ছোট-গল্প স্বতন্ত্র বস্তু জ্ঞান করিয়া এবং ছোট-গল্পে রচয়িতার নাম প্রকাশিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন।

যদিও তিনি ছোট-গল্পের জনক বা উদ্ভাবক নহেন তথাপি তিনি ছোট-গল্পের শৈশবকালে উহার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে, এই গ্রন্থে যে সকল ছোট-গল্প-লেখকের বিষয় আলোচনা করা যাইবে তাঁহাদের আদিতেও তিনি, মধ্যেও তিনি, শেষেও তিনি, কারণ যে সময়ের সীমার মধ্যে তাঁহাদিগকে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছে তাঁহাদের সকলের পূর্বে তিনি ছোট-গল্প রচনা করিয়াছেন এবং পরেও রচনায় নিরত এবং ছোট-গল্পের সংখ্যার দিক দিয়াও তিনি অন্যান্য লেখকদের অতিক্রম করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এক ছোট-গল্প দ্বারা তাঁহার প্রতিভার পরিমাণ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমস্ত দিকের প্রতিভার বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও আংশিকভাবেও আলোচনা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট-গল্পে স্থান নির্দেশ করিতে গেলে তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনী, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, কবিত্ব, নাট্যকারত্ব, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, স্বদেশ-প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ সাধনা করিয়াছেন,—যে সাধনা যজ্ঞ, তপঃ, দান, ক্রিয়া বিষয়ক নহে, তাহা অন্তর্জগতের সাধনা,-বহির্জগতের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, স্বদেশের কীট পতঙ্গ, অণু-পরমাণু লইয়া। তাহাতে বাংলার জল, মাটি, ফুল, ফল, মাতা, বধূ, সুখ, দুঃখ, নীতি, গৌরব, সমাজ, রাজনীতি, প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দেশেরই সমস্ত তিনি শব্দে, ছন্দে, তালে, মূর্ছনায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তা শক্তিকে যে এই দেশেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি বিদেশ হইতে ভাব ও ভাষা লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া বাংলার বাজারে নিজেদের বিপণির উপযোগী করিয়া বাংলার খরিদ্দারদের নিকট বেসাতি ধরিয়াছেন, কারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দান করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথের লেখনী এই হিন্দুস্থানের তত্ত্বকথায়, দর্শন উপনিষদ বেদ বেদান্তের জ্ঞানে ভরপুর হইয়া রহস্যময় হইয়াছে। জাগতিক সংস্কৃতি ও বিশ্বের কৃষ্টি তাঁহার বাংলার চিন্তার, অনুভূতির ও সাধনার উৎস।

সত্য অর্থে যাহা বোঝা যায় অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃতির সহিত

চিন্তার সামঞ্জস্য, তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা, ছোট-গল্প, নাটক প্রভৃতিতে অনেক বিষয় দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি জগৎ সমক্ষে দেখাইতে গর্ব অনুভব করিয়াছেন যে বাংলার সাহিত্য সত্য, বিশ্বের সাহিত্য ও জীবন্ত। ইহাতে যে সত্যের বাণী বিঘোষিত হইয়াছে, তাহা বিশ্ব-প্রকৃতির বাণী। বাংলার স্থান যেমন বিশ্বে, তেমন বাংলা ভাষার মাতৃত্বে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের ভাবধারা, স্বভাবগুণ আশ্রয় লইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের রূপ খাঁটি এদেশীয় হরফে বটে, কিন্তু সে রূপের ভিতর উদারতা আছে, তিনি উহাতে ভারতীয় সমস্ত ভাষার, এমন কি বিদেশীয় ভাষার ঔদার্য টানিয়া আনিয়াছেন। ভাষা জননীর ভূষণ বৃদ্ধিতে গুণ, অপহ্নবে দোষ।

সুতরাং যে লোক বিশ্বের দরবারে মাতাকে উপস্থাপিত করিতে চান যে, এ মা শুধু আমার মা নহে, সকলের মা, সার্বজনীন মাতৃশক্তি, সে লোক শুধু পীতবাস-বল্কলে, শাড়ী-সিন্দুরে মাতাকে সজ্জিত করিয়া সুখী থাকিতে পারেন না।

১। বিশ্ব মানবত্ব :

এই পৃথিবীবাসী, যে পৃথিবী এখানকার কেহ দেখে নাই সেই পৃথিবীবাসী, সমস্ত বিশ্ববাসী, সকলের প্রতি সনজ্ঞান, সকলেই যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার প্রজা, তাহার অনুভূতি, ইহা রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে পরম লক্ষণীয় বস্তু।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব কর্মে মানুষের মন নিয়োজিত হয়, কারণ উহা তাহাদের মনোরাজ্যের কন্দরে কন্দরে আঘাত করে, তাই মানুষ কোনও বিষয়ে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে। সুন্দর মূর্তি, সুমধুর সঙ্গীত, সুগন্ধি হিল্লোল, সুমিষ্ট আহার্য্য, সুকোমল স্পর্শ যদি চিত্ত বিনোদন করে, তবে উহাদের বিপরীত ধর্মযুক্ত বস্তু হৃদয় গ্লানিতে পূর্ণ করিবেই। ইহা কোনও ব্যক্তি বা দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় না। সে জন্য উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রকাশ এই দেশবাসী যেরূপ অনুভব করিতে পারে, বিশ্ববাসী সকলেই সেরূপ অনুভব করিতে পারে। রবীন্দ্র-সৃষ্টির মাহাত্মই সেখানে যে, বিশ্বমন্দিরের পূজার প্রসাদ বিশ্ববাসী সকলেই সানন্দে গ্রহণ করে। তাঁহার সাহিত্যের ও কাব্যের বিকাশে সঙ্কীর্ণতার সম্পূর্ণ অভাবে। এই জন্যই উহা জগৎ সমক্ষে স্থান পাইয়াছে।

ভাষার মধ্য দিয়া জীবনের প্রকাশ সাহিত্য, অর্থাৎ সাহিত্য জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। এজন্য উহার আদর চিরকাল জগতে থাকিয়া যাইবে। সেই জীবনের অভি-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে দেখা যায় বলিয়া তিনি বিশ্বের সাহিত্যিক, বিশ্বের কবি।

"সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্চে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোন্ স্থানে, যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আন্ত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়।"

রবীন্দ্রনাথ দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, জগতের মানবের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া তাহারই অভিজ্ঞতা তাঁহার সাহিত্যে প্রবেশ করাইয়াছেন তাই তাঁহার নানা অভিজ্ঞতা-পূর্ণ ছোট-গল্প পাওয়া যায়। উহা শুধু বাংলার অভিজ্ঞতার ফল নহে, উহাতে বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"লেখকের জীবনের মূল তত্ত্বটি বড়ই ব্যাপক হবে, মানব সমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুকরো টুকরো করে না ভেঙ্গে ফেলবে, আপনার জীবনের দশ দিক উন্মুক্ত করে নিখিলের সমগ্র-তাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্র বিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই জন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বার করা যায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘর-গড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করচে সেটি হচ্চে লেখকের মর্মস্থান, অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য।......কিন্তু

যতই আলোচনা করচি ততই অধিক অনুভব করচি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুকরো সাহিত্য তুলে নিয়ে বল, এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা, তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে দেখ, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে, তার সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না, কেবল সাহিত্যে থাকবে। এই জন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশী অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।"—সাধনা, ১ম বর্ষ।

২। বিশ্বধর্মত্ব :

বিশ্ব মানবত্বের ভিতর বিশ্ব ধর্মত্ব আসিয়া যায়। বিশ্ববাসীর মহাসাম্রাজ্যে যাঁহার স্থান, তাঁহাকে বিশ্ববাসীর মহারাধ্যকে সাদরে বরণ করিতে হয়। তিনি দেহ মন বাক্যদ্বারা সেই বিভূতিমান ভগবানের গীতি গাহিবার অবসর পাইয়াছেন, স্থান-মূল্য আরোপ না করিয়া তিনি নিখিল বিশ্বরূপে সর্বসমন্বয় করিয়া এক সুরে, সুরে, তালে, লয়ে অমর গীতি গাহিয়াছেন। তিনি কোন সঙ্কীর্ণতার পূজারি নহেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমানবত্ব ও বিশ্বধর্মত্ব তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির বর্গফল।

বিশ্ব মানবত্ব ও বিশ্বধর্মত্ব শিরোনামদ্বয়ে যে দুইটি বৈশিষ্ট রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখ করা গেল উহার মূলে এক এবং উভয়ে অপরিহার্য্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক। যাঁহার বিশ্বমানবতা লাভ করিতে হইবে, তাঁহাকে বিশ্বধর্মতাও অর্জ্জন করিতে হইবে। এই চলমান জগতের মূলাধার তেজ উহাদের সচল রাখিয়াছে। যে রূপ দেখিলে একে মুগ্ধ, সে রূপে জগতের সকলে মুগ্ধ হইবে। যে রসে একে রসিক, সে রসে জগতের সকলে রসময়। এই ভুবনের সুগন্ধে, সুস্পর্শে ভুবনবিহারী গন্ধিত, স্পৃষ্ট ও শব্দিত। সুতরাং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পঞ্চাত্মক বস্তু পঞ্চভূতাত্মকের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঐ সমস্ত দেশ, বর্ণ, জাতি, জীবেতর, স্ত্রী-পুরুষ বিভেদে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য হয় না। হৃদয়ের কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া সকলকে লইয়া ক্রীড়া করে।

কিন্তু তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়। তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে ভুলেন নাই। তিনি অখিলের প্রীতি লইয়া ক্রীড়া করিলেও বঙ্গপ্রীতি তাঁহার অণুপরমাণুতে মিশিয়া আছে। প্রকৃতি, পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা প্রণালী, ব্যবহারে যেমন তিনি বাঙ্গালী, তেমন তিনি বৈদেশিক ভাবধারা বাংলার উপযোগী করিয়া রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই তিনি সাত সাগরের পারের নারীকে কল্পনার দৃষ্টিতে যখন পুরিয়াছেন, তখন সেই নারী আর "ওগো বিদেশিনি" থাকে নাই। মনে হইয়াছে সেই তরুণীটি অভিমানিনী বঙ্গবাসিনী। এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব-মানবতা, বিশ্বধর্মত্বের বিষয় বলা হইয়াছে। উহাদের ভিতরই রবীন্দ্রনাথের Realism বস্তুতন্ত্রবাদ, Idealism আদর্শতন্ত্রবাদ প্রভৃতি পড়িয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মনোদুর্গই সকলের আলোচ্য, তাঁহার সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ছোট-গল্প প্রভৃতি নহে। সেই দুর্গে অভিযান করিতে পারিলেই তাঁহার সমস্তের প্রতি অধিকার জন্মে। নতুবা একবার তাঁহাকে Realistic বস্তুতন্ত্রবাদী, আর একবার Idealistic আদর্শতন্ত্রবাদী, ইত্যাদি বলা হইবে।

Realism বা বস্তুতন্ত্রবাদ :

এখানে পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পালের ১৩২৮ বঙ্গাব্দের "যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র" প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"ইংরাজীতে দুইটি শব্দ আছে Fancy এবং Imagination. বাঙ্গালাতে এই দুইটি ইংরাজী শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না; অন্ততঃ এখন মনের মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা সচরাচর ঐ দুইটি ইংরাজী শব্দকেই বাংলায় কল্পনা বলি, কিন্তু "ফ্যান্সি" যে জাতীয় কল্পনা, "ইমাজিনেশন" সে জাতীয় কল্পনা নহে। দুইয়ের পার্থক্য এই যে "ফ্যান্সী" বস্তুতন্ত্র নহে, "ইমাজিনেশন" সর্ব্বদাই বস্তুতন্ত্র হইয়া থাকে। সাহিত্য

সমালোচনায় যখন আমাদের মধ্যে প্রথম এই বস্তুতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন অনেকেই ইহার সম্যক অর্থ গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। বস্তু বলিতে তাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ- বিষয়কেই বুঝিয়াছিলেন। কবি কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জগতেই বিহার করেন। কাব্য সৃষ্টি অতীন্দ্রিয়; সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার পরশ পাথর দিয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করা যায় না। কিন্তু আমাদের কোষে বস্তু শব্দ কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়েই প্রযুক্ত হয় নাই; ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যায় বারবার ব্রহ্ম "বস্তুর" উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডও "বস্তু" আর ব্রহ্ম ও "বস্তু", দুইই প্রত্যক্ষ। তবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রামাণ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মের প্রামাণ্য অপরোক্ষ অনুভূতি কিংবা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। এইজন্য আমাদের প্রাচীন চিন্তা ও সাধনাতে বাস্তব বলিতে কোন দিন কেবল এই বিষয়-জগৎকে বুঝায় নাই। কোন কোন পণ্ডিত লোকেও দেখিলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় এই বস্তুতন্ত্র শব্দটিকে বিদেশের আমদানী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে বস্তুতন্ত্র কথাটা আধুনিক বাঙ্গালী সমালোচকের নিজের সৃষ্টি নহে। যদিও ইংরাজীতে যাহাকে Realism বলে, বস্তুতন্ত্র বলিতে সাহিত্য সমালোচনায় অনেকটা তাহাই বুঝায়, তথাপি এ শব্দটা আমাদের চিন্তা ও সাধনাতে অতি প্রাচীন। ভগবান ভাষ্যকার বেদান্ত ভাষ্যে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। জ্ঞানের প্রকৃতি বিচার করিতে যাইয়া শঙ্কর বলিয়াছেন, জ্ঞান মাত্রেই বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর অধীন। বস্তু সাক্ষাৎকার ব্যতীত জ্ঞান হয় না। বিষয় সাক্ষাৎকার হইতে বিষয় জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। জ্ঞান যেরূপ বস্তুতন্ত্র, রস বা ভাবও সেইরূপ বস্তুতন্ত্র। দর্শনের বিষয় জ্ঞান, কাব্যের বিষয় রস বা ভাব; দুইটিই বস্তুতন্ত্র। অবশ্য জ্ঞানের সঙ্গে ভাব অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ; জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের সঞ্চার হয়। জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই রসের স্ফুর্ত্তি হইতে থাকে। অতএব জ্ঞান যেমন বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তু প্রামাণ্যের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ রসও বস্তুতন্ত্র, বস্তু প্রত্যেকের কিংবা বস্তুর জীবন্ত স্মৃতির অধীন। এবং সে বস্তু বা স্মৃতির প্রামাণ্যের উপরেই রসের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অর্থে রস-সাহিত্যে আলোচনায় বস্তুতন্ত্র শব্দের প্রয়োগ সত্য ও সার্থক হইতে পারে অন্য অর্থে নহে। কিন্তু রস সৃষ্ট বস্তুতন্ত্র হইলেও সর্ব্বদাই বস্তু প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করিয়া যায়। ইহা রসেরই ধর্ম। বস্তুজ্ঞানের উপরে যখন রসের আলোকপাত হয়, তখন সেই বস্তুই রূপান্তরিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে যাইয়া দাঁড়ায়।

"জগতের পুরোহিত তুমি
তোমার জগত মন্দিরে
একে চায় অন্যেরে পাইতে
দুই চাহে এক হইবারে
ফুলে ফুলে করা কোলাকুলি
গলাগলি অরুণ উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে
তারাটি তারার পানে ধায়।"

এখানে প্রাকৃত জনে প্রাকৃত চক্ষু দিয়া যাহা দেখে, কবি তাহার চাইতে ঢের বেশী দেখিয়াছেন। আমরা চোখ দিয়া ফুল দেখি, কিন্তু ফুলের কোলাকুলি তো দেখি না। অরুণও দেখি, উষাও দেখি, কিন্তু অরুণ ও উষার গলাগলি তো দেখি না। খণ্ড খণ্ড মেঘ বায়ু-তাড়িত হইয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তারা যে রস-লীলায় নিযুক্ত হইয়া রাসলীলার অভিনয় করে; ইহা তো দেখি না। আর তারা আকাশে ছুটে বটে, কিন্তু তার ছুটা যে পন্থ বিপথ জ্ঞান-বিহীনা অনুরাগিণীর অভিসার, এতটা প্রত্যক্ষ করি না। এটা প্রত্যক্ষ করেন কবি। যাহা দেখা যায় তারই সঙ্গে যাহা দেখা যায় না চোখে, যাহা শুনি তারই মধ্যে যাহা শোনা যায় না কাণে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেই যে, অতীন্দ্রিয়ের সাড়া জাগিয়া আছে, আমরা তার সন্ধান পাই না। কবির অন্তরের অনুভূতিতে সে বস্তু কবির অজ্ঞাতসারেই জাগিয়া উঠে। ইহা রস বস্তু। এই অতীন্দ্রিয় রসই কাব্য সৃষ্টির প্রাণ। ইহা "ফ্যান্সী" নহে, কিন্তু "ইমাজিনেশন"। "ফ্যান্সিকে" যদি কল্পনা বলি, তবে ইহা কল্পনা নহে। "ইমাজিনেশনকে" যদি অতীন্দ্রীয় বস্তুর

অনুভূতি বলি, তাহা হইলে কবির রসসৃষ্টিই এই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বলিতে পারি। কবি শব্দকে বাহন করিয়া ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিবিধ বস্তু বা বিষয়ের জাল বুনিয়া তাহারই আশ্রয়ে ও মধ্যে সেই রসকে বোধের ও ভোগের বিষয় করিয়া তুলেন।"

উপরোদ্ধৃতাংশ হইতে Realism বা বস্তুতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। উহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার প্রতিও প্রযোজ্য।

Idealism বা আদর্শ তন্ত্রবাদ :

শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় উহাকে বলিয়াছেন "শ্রেয়ঃ পন্থা।" তিনি বলিয়াছেন :

"সংসারে যা দেখি এবং শুনি, বস্তুজগতে যা অনবরত ঘটিয়া চলিয়াছে, তাকে কল্পনার সামগ্রী করিয়া তোলাই, বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলকে অন্তরেন্দ্রিয়ের রসায়নাগারে সূক্ষ্ম রূপান্তরিত করাই, এক কথায় মাটির পৃথিবীকে মনের পৃথিবী করিয়া তোলাটাকেই হইয়াছে শ্রেয়ঃ পন্থার কাজ। রূপ রস গন্ধ স্পর্শের বস্তুলোক হইতে মানবের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে মনোলোকে তুলিয়া ধরার রীতিকেই, মানব জীবনের প্রাত্যহিক হাসি কান্নার তুচ্ছতাকে একটি সুচিরোজ্জল জ্যোতির্গোলকে মণ্ডিত করিয়া দেখিবার মনোভঙ্গীকেই সাহিত্যে শ্রেয়ঃপন্থা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেয়ঃপন্থার কল্যাণেই তুচ্ছ এবং সুন্দর, ক্ষুদ্র এবং বৃহতের মিলন ঘটিয়াছে। ইহার কল্যাণেই প্রতি দিন চিরদিনের দিকে অনন্ত অভিসারে ছুটিয়াছে, যা কিছু সীমাবদ্ধ সীমাহীনতায় দিগন্তলীন অনির্দেশ্যতার মধ্যে তা আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে; ইহার কল্যাণেই কালো আপনার গায়ে মাখিয়া লয় আলোকের অঞ্জন, চির-পরিচয়ের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে চির-অপরিচয়ের সুদূরতা, ইহার প্রসাদেই বিশেষ হইয়া ওঠে বিশ্বতোমুখ, বিশ্ব আপন বক্ষে বহিয়া আনে ফেনোর্মিরাশির সুগম্ভীর আরাব, ক্ষুদ্র আপন সঙ্কীর্ণ সীমায় প্রকাশ করিয়া তোলে তরঙ্গায়িত বিরাটের বিপুল প্রসার। এই শ্রেয়ঃপন্থার আলোক লইয়াই মানবের হাসি এমন অম্লানোজ্জল হইয়া তার ঠোঁটে ফুটিয়া রহে, তার অশ্রু এমন আশ্চর্য রকম করুণ কোমল হইয়া দেখা দেয়, তার চক্ষে নামিয়া আসে নভোনীলের চিন্তার লহরী এবং অতলস্পর্শিতা, তার বক্ষে বিকসিত হইয়া ওঠে গিরি-শৃঙ্গের সমুচ্চ মহিমা, বাজিয়া ওঠে মহাসাগরের তরঙ্গ গর্জন। এই শ্রেয়ঃপন্থাই ব্যক্তিগত স্নেহ প্রেম ও সুখ দুঃখকে সর্বজনের রাজ্যে তুলিয়া ধরে, একলার জিনিষকে সমগ্রের করিয়া দেয়, লোকালয়ের বিচিত্র জীবন ব্যাপারের মধ্যে লোকাতীতের অস্ফুট লীলা ফলাইয়া তোলে। এই শ্রেয়ঃপন্থারই আলো পানে প্রকৃতি এমন স্নিগ্ধশ্যামল, এমন অনন্তযৌবনা, ইহারই পরিব্যাপ্ত পুণ্যাভিসিঞ্চনে আকাশ এমন সুনীল ও সুচিরোজ্জল, ইহারই স্পর্শ পরিবহন করিয়া বাতাস এমন পুলকদায়ী, এমন হৃদয়াভিরাম। ইহারই আলোককে লক্ষ্য করিয়াই, কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ লিখিয়াছিলেন :

"The light that never was on
land or sea"

শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়ঃপন্থা অর্থাৎ Idealism সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লইতে এইমাত্র আপত্তি যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিজনোচিত মনের অবস্থা হইলেও, তিনি স্বপ্নেজাগরণে ভাবোন্মত্ত হইলেও এবং তাঁহার মন কল্পনার জগতে সর্বদা বিচরণ করিলেও তিনি ঐহিক বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ও বাস্তব জগতে বাস করেন। তাই গগনে মেঘ গর্জন করিলে তিনি ভরসাহারা হইয়া অকূলের পানে তাকাইয়া কূলে বসিয়া আছেন, সাধ, যদি নেহাৎ ভরাডুবি না হয়, তবে ঐ তরীতেই নদী পার হইবেন। এ নদী ভবনদীও যেমন, সংসারীর এবং পার্থিব জগতের স্রোতস্বতীও তেমন, এখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শতন্ত্রবাদ বা কল্পনাবাদ। এখানেই তথাকথিত শ্রেয়ঃপন্থা লঘু হইয়া পড়ে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার রচনায় ভরপুর।

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি!
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ কর নি॥"

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা, বাঙ্গালী শব্দটি যাহা অমানুষ অর্থেই আজকাল প্রযুক্ত, সে মনুষ্যপদ-বাচ্য হউক, অর্থাৎ মানুষের মত বীর্যপূর্ণ কার্য করুক, নতুবা এদেশের মঙ্গল নাই। সে কারণ কল্পনাপ্রবণ কবিকে কাল্পনিক মানুষ বলিতে পারা

যায় না। তিনি যেন বাস্তব বা পার্থিব জগতে সদাকাল বিহার করিতে ভালবাসেন।

বরং রবীন্দ্রনাথকে Realistic Poet বা Literateur অর্থাৎ বস্তুতন্ত্রবাদী কবি বা সাহিত্যিক বলিলে অধিক শোভন হয়। বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) আদর্শতন্ত্রবাদ (Idealism) হইতে যে স্বতন্ত্র, তাহা তাঁহার কাব্য, সাহিত্য, নাটক প্রভৃতিতে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেরূপ অন্য কোনও কবির বা সাহিত্যিকের রচনায় হয় নাই।

তাঁহার একটা চরিত্রকেও কায়াবিহীন ছায়া লইয়া ঘুরিতে দেখা যায় না। যেটি, ঠিক সেটি, সে অন্য হইতে চাহে না, জানে না, বা পারে না। রবীন্দ্রনাথের যত ছোট-গল্প আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ক্ষুধিত পাষাণ"ই সকলের চেয়ে অধিক কাল্পনিক। তাহাতে কবি দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, জন্মান্তর, প্রাক্তন, ভগবান প্রভৃতি সমস্তই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঐ ছোট-গল্পটির প্রারম্ভে স্বীকার করিয়াছেন এইটি শোনা গল্প, বরীচের তুলার মাশুল আদায়কারীর জীবনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহারই গল্প তিনি লিখিতেছেন। ইহাকে যে ইচ্ছা সে কাল্পনিক মনে করিয়া ভৌতিক বা দানবিক বা যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন।

ইহাতে স্বতঃই কবিকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে তিনি যেন কাল্পনিক এমন কিছু না লেখেন, যাহা বস্তু-জগতের জিনিস হইতে পৃথক হইয়া থাকে। তাই তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়-সাহায্যে পঞ্চভূতের যে বিজ্ঞান, তাহাতেই তাঁহার কল্পনাশক্তি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন।

বরং রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অনেক সময় রহস্যময় মনে করা যায়। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে এমন অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা পাঠক পাঠিকার সম্মুখে রহস্যাবৃত বোধ হয়। যেন উহা কুয়াসাচ্ছন্ন, ঝাপসা। উহা যেন ভারতীয় দর্শন উপনিষদের বর্মে আচ্ছাদিত। মনে হয় উহা বেদান্তের অবিদ্যা।

এযাবৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার বৈশিষ্ট্য, ধারা, বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, এখন তাঁহার পল্লীচিত্র, নগর চিত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, স্বাদেশিকতা, স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র, রস, কল্পনা, ভাষা, ঘটনা সংস্থান প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচ্য এবং উক্ত বিষয়াবলীর আলোচনা ততদূরই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, যতদূর তাঁহার খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে রচিত ছোট-গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এখানে বলা হইতেছে, তাঁহার প্রতি ছোট গল্প আলোচনার সময় উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যাহা আলোচনার পথে নিপতিত হয়, সেখানে তাহার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

ঘাটের কথা। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘাটের কথা" নামক ছোট-গল্প ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা ভাষার ন্যায্য দ্বিতীয় ছোট-গল্প। অন্য যে ছোট-গল্পগুলি "আলোচিত গ্রন্থ-তালিকায়" দেখানো যাইবে, সেগুলিকে আলোচনার মধ্যে ধরা হয় নাই, সুতরাং উহাদের লেখকদেরও পরিচিত লেখকদের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই। ইহার পূর্বে ১২৮০ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শনে" 'মধুমতী' নামে যে ছোট-গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল উহার রচয়িতা শ্রীপূঃ সাংকেতিক নাম হইলেও উহাকে অজ্ঞাতনামা ছোট-গল্প লেখকের লেখা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয় নাই, উহা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরই ছোট-গল্প বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাহাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প বলিয়া সম্মান দেওয়া হইতেছে।

"ঘাটের কথা" পূর্ণাঙ্গ ছোট-গল্প। একত্ব বা এক-মুখিতা, করুণতা, প্রধান বিষয়ের পুনরুক্তি প্রভৃতি ছোট-গল্পের বিধিসমূহ ইহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান।

ছোট-গল্পের আদি কালের আদি ছোট-গল্প লেখক এডগার এলেন পো-এর A Tale of Ragged Mountains ছোট-গল্পটি যে মহিমময় গুণে গুণান্বিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘাটের কথা" সেই মাধুর্যে মণ্ডিত। উহার আরম্ভের প্রথম কয়েকটি পংক্তি :

"পাষাণে ঘটনা......এইখানে বস"

পড়িলেই "ঘাটের কথা" কি জাতীয় ছোট-গল্প তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে

তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিগত জীবনের ছিন্নপত্র সংযোজনা করিবার ছলে এই মূর্ত্তিটির (কুসুম) অবতারণা করিয়াছেন। তাহার জীবনের প্রচ্ছদপটে ভূষিত নাট্য-লীলাই তাঁহার ঘাটের প্রস্তরশিলায় খোদিত গল্প।

"ঘাটের কথায়" রবীন্দ্রনাথ কি প্রমাণিত করিতে চান, তাহা লক্ষনীয়। ইহাতে কুসুমের বিয়োগ ব্যথাপূর্ণ মনটি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

"পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসরের মেয়ে মাথার সিঁদুর মুছিয়া আবার তাহার দেশের সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

"একজন মেয়ে আর একজনের গা টিপিয়া বলিল 'এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী !'

স্বামী জীবিত, স্ত্রী জানিল স্বামী মৃত, এই ভাবে স্ত্রী স্বামীর আঘাত বুকে করিয়া জীবন কাটাইল। ইহা বড় দারুণ ছবি।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ইহা বলিতে চান যে হিন্দু-সমাজের এই বাল্যবিবাহ দূষনীয়, কারণ উহা নারীজাতির সর্বনাশকর।

কুসুমকে বালবিধবা করিয়া রবীন্দ্রনাথ কুসুমের পরবর্ত্তী জীবনে দেখাইবেন যে কুসুম কখনও সেই বৈধব্যের ব্রহ্মচারিনী-জীবন পালনে সমর্থা হইবে না, সে নিশ্চয়ই যৌবন-কালোচিত বহ্নিতে ঝাঁপ দিবে। সত্যই তিনি কুসুমকে দিয়া এক সন্ন্যাসীর পায়ে সে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াইলেন, যাহাকে কুসুম গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার কৌশল, তাই তিনি সন্ন্যাসীকে সৃষ্টি করিলেন আর কেহ নহে, কুসুমেরই ছদ্মবেশী স্বামী।

রবীন্দ্রনাথের দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কুসুমকেও পতিতা করিলেন না, সমাজকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন বালবিবাহ কিরূপ দোষাবহ।

কুসুম যে সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়াছিল, সে কুসুমের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি, তাহার স্বামী নহে, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার প্রকৃত স্বামী হইয়া কুসুমের মনের দৌর্ব্বল্য, যে সে ব্যভিচারিণী, লক্ষ্য করিয়া বলিল: 'আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে, আমি আজই এখান থেকে চলিলাম।"

ঘাটের প্রস্তর-শিলা এই দুঃখের স্মৃতি বুকে খোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাই সে আজ আকাশে বাতাসে বলিতেছে "নারীর মন হায় !"

কুসুম যখন বুঝিল, এই সন্ন্যাসীই তাহার স্বামী, কিন্তু সে অ-স্বামীজ্ঞানে তাহাকে পায়ে আত্ম-নিবেদন করিয়াছে যে, সে তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, প্রাণে-মনে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে এবং এই প্রকৃত স্বামী তাহা বুঝিয়া চির-কালের জন্য বিদায় লইতেছে, তখন ব্যভিচারিণী কুসুমের গঙ্গার জলে আত্ম-বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ, তখন সে মাতা ভাগীরথীর কোলে ডুবিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখের বার্ত্তা জানাইয়া পরম সুখী হইলেন, কারণ তিনি তো অসামাজিক কাজ করিবেন না, যাহা একটা উদাহরণ স্বরূপ রহিয়া যায়।

এই ছোট-গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে অংশগুলির পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহা সেই Parable of the Prodigal son এর পুনরুক্তির ন্যায় সার্থক হইয়াছে।

"ঘাটের কথা" মনস্তত্ত্বমূলক ছোট-গল্প। ইহাতে যে সামাজিক ত্রুটির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ইহার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মাতাল ও স্বপ্ন

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সেনের ওখান থেকে ডিনার খেয়ে ফিরতে আমার বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল আর মাত্রাটা যে একটু অতিরিক্ত রকম হয়েছে কলিংবেল্ টিপতে টিপতে সে কথা বিলক্ষণ বুঝতে পারলুম। সেনের ওখান থেকে রাত করে ফেরা আজ আমার প্রথম নয় কিন্তু এমনি অবস্থা পূর্বে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

কি আশ্চর্য্য! কারুর দরজা খোলার নাম নেই। প্রভু-ভক্ত ভৃত্যটির আজ হ'ল কি! আমার প্রতীক্ষায় প্রতি রাত্রে জেগে থাকার পর আজ তো তার ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়। অধৈর্য্য হয়ে দরজায় প্রচণ্ড কিক্ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ কিক্ করাও সম্ভব নয়। মাথার ভেতর কি যেন হ'তে লাগল। আমার সমস্ত আস্তে আস্তে গোলমাল হয়ে গেল।

অকস্মাৎ এক সময় দরজাটা গেল খুলে। একটা কড়া কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রভুভক্ত ভৃত্য নয়—সুসজ্জিতা সপ্রতিভ কোন মহিলা। মুখ তার ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না—ধোঁয়ার মত কি যেন অনবরত উড়ছিল তার মুখের সামনে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এসো মুখার্জ্জি', সে আমার হাত ধরে নিয়ে এল বসবার ঘরে। মন্ত্রচালিতের মত তাকে অনুসরণ করে এলাম। আমার চোখে যেন ঘোর লেগেছিল। কে এ মহিলা? বাড়ী ভুল করিনি তো? কিন্তু আমাকে তো নাম ধরেই ডাকছে।

একই সোফায় বসলাম আমরা দু'জন। আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ও চুপ করে বসে আছে আমার পাশে। চুপ করেই কাটল খানিকক্ষণ।

'আবার ড্রিঙ্ক্ আরম্ভ করেছ না?' ও জিজ্ঞাসা করল। চমকে উঠলাম। সে-খবরও পেতে এর বাকি নেই। কিন্তু এ এল কোথা থেকে এত রাত্রে?

আর আমার কাছে কি-ই বা চায়? কে জানে! ওর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না। একটা সিগারেট ধরালাম।

আবার ও বলল, 'Shame! তোমাদের কথারও কি কোন দাম নেই?'

'দেখ,' এবার আর কিছু না বলে থাকতে পারলাম না, 'আমি তোমার কথার মানে বুঝতে পারছি না। কে তুমি? তোমায় চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না। বোধ হয় ভুল ক'রে তুমি এখানে এসেছ', এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে ফেললাম।

ও হাসল, 'ভুল আমার হয় নি, বরং তোমারই হচ্ছে। তুমি আমায় চিনতে পারছ না—এ রকম কথা তোমাদের মুখ থেকে শোনা কিছু আশ্চর্য্যের নয়। আমার কিন্তু তোমাকে চিনতে মোটেই কষ্ট হয় নি।'

'থাক ওসব বাজে অর্থহীন কথা', সিগারেটে টান মেরে বললাম, 'কি বলছিলে একটু আগে—shame! আমাদের কথার কোন দাম নেই—তার মানে?'

'তার মানে খুব সোজা। তুমি একদিন আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে জীবনে আর কোনদিন ড্রিঙ্ক করবে না—সে প্রতিজ্ঞা তুমি রেখেও ছিলে যতদিন আমি ছিলাম কিন্তু আমি চলে যাবার পর—'

'কি বলছ তুমি?' বাধা দিয়ে বললাম, 'কবে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কবে তুমি আমার কাছে ছিলে আর কবেই বা চলে গেলে? আমি তো তোমার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমায় সত্যি করে বলবে কে তুমি? কেননা সত্যিই আমি তোমায় কিছুতেই চিনতে পারছি না।'

'চিনতে কষ্ট হবে জানি', ও বলতে লাগল, 'একে পুরুষ মানুষ তার ওপর পুরোমাত্রায় ড্রিঙ্ক্ করেছ—যাক্, ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ তো চিনতে পার কি না।'

তাকালাম ভাল করেই। কিন্তু যে তিমিরে সে-ই তিমিরে। কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলাম।

'চিনতে পারলে ?'

'না।'

'আবার দেখ অনেকক্ষণ ধরে।'

বেশ অনেকক্ষণ ধরেই দেখলাম। সহসা আমার মনে হল একে যেন কোথায় দেখেছি। এর ভাবভঙ্গী আমার একেবারে অপরিচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে করতে পারলাম না। আর ওর মুখের সামনে ধোঁয়া উড়ছিল অনবরত—মুখ তাই কোন মতেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এবার আর থাকতে না পেরে অধৈর্য্য হয়ে বললাম, 'তুমি আমায় বল কে তুমি ? আমি কিছুতেই আজ তোমায় চিনতে পারছিনা কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় যেন তোমায় দেখেছি। বল, বল আমায় কে তুমি ?'

ও হাসল। তারপর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি লিলি—তোমার স্ত্রী।'

'য়্যা।' আমার হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল। সভয়ে দূরে সরে বললাম, 'তুমি লিলি! আরে তাইতো! কিন্তু তুমি এলে কোথা থেকে ?' আমার কপাল ঘামতে সুরু করেছে. 'আজ অনেক বছর হল তুমি মরে গেছ—'

'আমি কোথা থেকে এসেছি সে-খবরে তোমার প্রয়োজন নেই,' লিলি রুমালে মুখ মুছে বলে চলল, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি এসেছি কেন জান তোমার ড্রিঙ্কের মাত্রা সহ্য হল না বলে। মনে পড়ে একরাত্রে আজকের মত পুরোমাত্রায় ড্রিঙ্ক্ করে তুমি বাড়ী ফিরেছিলে আর আমি দরজা খুলে ঠিক আজকের মতই এই ঘরে তোমায় হাত ধরে এনে বসিয়েছিলাম। তারপর সে-রাত্রে আমায় স্পর্শ করে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর কখনও ড্রিঙ্ক করবে না—হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা তুমি রেখেও ছিলে। আমি জানতাম প্রতিজ্ঞা না করিয়ে শুধু মুখে বললেও আমার বারণ তুমি শুনতে তবু প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম কেননা ভেবেছিলাম তা হ'লে কোনমতে তুমি আর ভাঙবে না। আর একথা অতি সত্য যে আমায় খুব বেশী ভাল তুমি বাসতে। কিন্তু কোথা থেকে কি যেন হঠাৎ হয়ে গেল—আমি তোমায় ছেড়ে গেলাম—' লিলি থামল।

ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মত সহসা আমার মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার আবছা স্মৃতি। হ্যাঁ, এই ঘরে এমনি অবস্থায় লিলির পাশে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বটে আর কোনদিন ড্রিঙ্ক করব না।

মনে পড়ল আমার অনেকদিন আগেকার কথা। লিলি একদিন আমার স্ত্রী ছিল। আর লিলির প্রতি আমার দুর্ব্বলতা একটু বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হত—সে কথা বন্ধুদের অবিদিত ছিল না। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে একটু বেশী সুখী ছিলাম আমরা। পৃথিবীতে শুধু একটি মাত্র মানুষ ছিল···সে লিলি, যার কাছে আমার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হত। আমি ওর প্রত্যেকটি কথা শুনতাম প্রতি পদে পদে ওকে মেনে চলতাম। বিগত দিনের অনেক রঙীন ছবি আজ রাত্রে অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ছে। কি সুন্দর ছিল আমাদের সংসার! কী সুখী যে ছিলাম আমরা দু'জন! কিন্তু সেদিন আর আজ! মনে হল কবে যেন কোন গল্প পড়েছিলাম···কবে যেন কোন স্বপ্ন দেখেছিলাম।

'কি ভাবছ ?' লিলির কণ্ঠস্বর।'

কোন উত্তর দিলাম না।

'শোন,' লিলি বলল, 'আজ তোমার কাছে কেন এসেছি জান ?'

'না; তুমি তো এখনও কিছু বল নি,' বললাম।

'একটা অনুরোধ করতে, বল রাখবে।'

'কি তোমার অনুরোধ ?'

'আগে কথা দাও রাখবে,' লিলি আমার কাছে সরে এল।

'না শুনে কথা দেব কেমন করে ?'

লিলি একটু দুঃখিত হয়ে বলল, 'এ ধরণের কথা তোমার মুখ থেকে আমি আশা করিনি···আগে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তো কথা দিতে।'

সে কথায় কান না দিয়ে বললাম, 'বল, কি তোমার অনুরোধ ?'

একটু থেমে লিলি বলল, 'তোমার মদ ছাড়তে হবে।'

'অসম্ভব,' সঙ্গে সঙ্গে বললাম।

লিলি বেশ একটু আশ্চর্য্য হল, 'বলল, তার মানে ?'

'মানে মদ ছাড়া আজ আমার পক্ষে অসম্ভব···উঃ, সে কি হয় !'

'তুমি কি আমার কথাও আজ শুনবে না ?'

'লিলি, ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছনা, মদ ছাড়লে আমার ভয়ানক কষ্ট হবে।'

'ও' লিলি চুপ করল।

আমার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। লিলি তখন আমার স্ত্রী ছিল। আমি ভয়ানক সিগারেট খেতাম। একটু মজা করবার জন্যেই হয়তো, লিলি আমায় বলল, তোমায় সিগারেট খাওয়া ছাড়তে হবে। সে-দিন থেকে সিগারেট খাওয়া ছাড়লাম।

অবশেষে লিলিই আবার জোর করে আমায় সিগারেট ধরায়। আজ ভাবি কেমন করে ছেড়েছিলাম। সিগারেট না খেয়ে থাকা—উঃ কী ভয়ানক !

'তা হ'লে আমার কথা তুমি আজ শুনবে না ?' লিলির কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল।

'কেমন করে শুনব বল ? এ তোমার অন্যায় অনুরোধ।'

'কিছু অন্যায় নয়—'

'ও ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

'আমি তোমায় ছাড়তে বলছি।'

'জানি, কিন্তু সত্যি আমি ছাড়তে পারব না লিলি।'

লিলি একটু দূরে সরে বসল। অনেকক্ষণ চুপ চাপ। চারদিকে তাকিয়ে লিলি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এই ঘরের চারদিকে আমার ছবি টাঙানো ছিল সেগুলো গেল কোথায় ?'

বললাম, 'বড় বিশ্রী দেখায় তাই খুলে রেখেছি।'

আবার চুপচাপ। বলবার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। অথচ একদিন ছিল যখন আমাদের কথা শেষ হত না। লিলিকে এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করা আমার পক্ষে সুকঠিন ছিল। আজ কিন্তু আমার লিলিকে মোটেই ভাল লাগছে না। মরে তো গিয়েছিল কিন্তু আবার এল কোথা থেকে ও ?

'আচ্ছা,' খুব আস্তে আস্তে লিলি বলল, 'কি পরিবর্ত্তন হয়েছে আমার যার জন্যে তুমি আজ আমার অবাধ্য হচ্ছ ?'

দু'জনেই এক সঙ্গে রিষ্টওয়াচ দেখলাম। আর হঠাৎ ঘড়িগুলো খুব জোরে টিক্‌টিক্ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে শব্দ যেন বেড়ে যাচ্ছে। জোরে...খুব জোরে...আরও জোরে। আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে সুরু করল। চোখ আমার ঘড়ির দিকে আর কাণে তার অসহ্য আওয়াজ। লিলি কি যেন বলতে চাইল কিন্তু ভীষণ শব্দে তার প্রত্যেকটি কথা চূর্ণ হয়ে গেল···কিছুই শুনতে পেলাম না। লিলি মিলিয়ে যাচ্ছে···অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আমার রিষ্টওয়াচ প্রকাণ্ড হয়ে আমার চোখের সামনে চলে এল কেমন করে ? আর লিলি পড়ে থাকল তার পেছনে···ওকে আর দেখা গেল না। আমার চোখের সামনে শুধু ঘড়ি। সময়ের কাঁটা দু'টো ঘুরে যাচ্ছে অনবরত বোঁ বোঁ করে।

* * * *

পরদিন দেখলাম আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। সমস্ত শরীর একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

যথাসময়ে সে ঘরে চা এনে প্রভুভক্ত ভৃত্যটি বলল, 'কাল রাত্তিরে সিঁড়ির কাছে আপনি পড়ে গিয়েছিলেন, আমি আর ড্রাইভার ধরাধরি করে···'

'চুপ কর', প্রভুভক্ত ভৃত্যটিকে তাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে কাপ নিঃশেষ করলাম।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা কবি ৺মুরলীধর দাস

শ্রীতিলক (জ্যোতির্ব্বিদ)

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ৺মুরলীধর দাসের নাম এখনও অজ্ঞাত আছে। ইনি পদাবলীর সংগ্রাহক ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে আজ আমি কয়েকটি রহস্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশিত করিব। এবং ইঁহার সংগ্রহ ও রচনা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাজনগর এককালে এক সুবৃহৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লী ছিল। রাজা বীর সিংহের (ক্ষত্রীয়) মৃত্যু হওয়ার পরে মুসলমান দেওয়ানের অধিকারে রাজনগর শাসিত হইয়াছিল। রাজা বীরসিংহের রাজধানীর ভগ্নস্তূপ এবং মুসলমান রাজাগণের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

অখ্যাতনামা বৈষ্ণব ৺মুরলীধরের জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল, মুসলমান শাসনের সময়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ৺মুরলীধরের জন্ম হই ।ছিল রাজনগর পল্লীতে কুলীন বংশে (মুরলীধরের বংশের এখন অষ্টম পুরুষ চলিতেছে—বীরভূম জেলার উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে এই বংশ এখনও পরম সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী কায়স্থ বংশ বলিয়া সমগ্র জেলায় সুপরিচিত)।

৺মুরলীধর অসীম শক্তিশালী বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি যে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারিয়াছি তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণনা করিলাম। এই বৈষ্ণব কবির রচনা ও সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা কোন পুস্তকে এ যাবৎ কোন ইতিহাস পাই নাই। কিন্তু, ইনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের রচনা সম্বন্ধে অনেক কিছুই সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের লীলা কীর্ত্তনগুলিও ইহার সংগ্রহ হইতে পাওয়া যায়। কীর্ত্তন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত সংগ্রহ ইনি রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৈষ্ণব মুরলীধরের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা জানিতে পারি নাই। কিশোর কাল হইতে ইনি মুরলীধর নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন—ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে। মুরলীধরের হস্ত লিখিত পুঁথি হইতে তাঁহার বিষয় জানিবার পূর্ব্বে আমি আমার জ্যাঠা মহাশয়ের (১৪ বৎসর বয়সে ইনি মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ছিল ৭০ সত্তর বৎসর) নিকট হইতে গল্প প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম। বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺মুরলীধর ঠাকুরের বিগ্রহ মূর্ত্তি ছিল। প্রত্যহ মুর্ত্তি পূজা হইত। কবি মুরলীধর স্বয়ং এই মুর্ত্তির পূজা না হইলে সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন না। কখনও কোন কারণে অনুপস্থিতিতে পাছে বিগ্রহ মূর্ত্তির পূজার কোনরূপ অঙ্গহানি হয় এই ভয়ে কোলে করিয়া স্বয়ং মূর্ত্তিখানি লইয়া যাইতেন। মূর্ত্তিখানি ছিল স্বর্ণময়। মালার মত ইহা তিনি গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন; নিয়মিত পূজা করিবার নিমিত্ত কবি মূর্ত্তিখানি বক্ষে ধারণ করিয়া বাহিরে যাইতেন। নিয়ত মুরলীধরের বিগ্রহ মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল "মুরলীধর"।

কথিত আছে, ইনি একবার ইষ্টদেবের সঙ্গে ঢাকা সহরে এক ব্রাহ্মণ সভায় গিয়াছিলেন। কবির নিমন্ত্রণ ছিল না। ইষ্টদেবের আদেশে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া, ইষ্টদেবের আদেশেই তাঁহার পাশে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ সভায় কায়স্থের বসিবার অধিকার ছিল না। মুরলীধর কায়স্থ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সভার বাহিরে বসিতে আদেশ করেন। কিন্তু ইষ্টদেবের অনুমতি না পাইলে বা ইচ্ছা না হইলে তিনি তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিবেন না এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তখন ইষ্টদেব সভায়

অন্যান্য পণ্ডিতগণের নিকট শিষ্যের ধর্ম্মপ্রবণতার কথা ব্যক্ত করিলেন। পণ্ডিতগণ তাহাতেও মুরলীধরের ব্রাহ্মণ সভায় আসন গ্রহণের অনুমতি দিলেন না। তখন শিষ্য ইষ্টদেবের ইঙ্গিতে বক্ষস্থিত শ্রীশ্রী৺মুরলীধরের বিগ্রহ মূর্ত্তি এবং ছুরিকা দ্বারা বক্ষের একটু অংশ চিরিয়া সাত গাছি স্বর্ণময় উপবীত বাহির করিয়া দেখাইলেন। সভাস্থ সমগ্র ব্রাহ্মণ মণ্ডল এই ব্যাপারে চমৎকৃত হইয়া মুরলীধরকে সশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাদের মাঝে আসন দান করিলেন—এবং সভা শেষ হইলে ঢাকা সহরের পাঁচশত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মুরলীধরের শিষ্য হইলেন।

শোনা যায় ভক্ত মুরলীধরের এইরূপে কঠিন পরীক্ষা হইলে পর তিনি আর সংসার বাস করেন নাই। বিগ্রহ মুর্ত্তিখানি লইয়া দেশে ভক্তি প্রচার করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুরলীধরের এইরূপ বৈষ্ণব ভক্তির কথা আমি আমার জ্যাঠামহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। লিপিবদ্ধ কোন প্রমাণ নাই; প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার স্বরচিত দুই এক খানি পুঁথি ও বৈষ্ণব সংগ্রহ পাওয়া যায়।

উক্ত বিষয়টি আমি পুনরায় শুনিয়াছিলাম আমার মায়ের কাছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সন ১৩৪৪ সালের শ্রাবণমাসে আমি জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথিগত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম। সাধারণতঃ পুঁথিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইলে মা অথবা জেঠাই মায়ের অনুমতি লইতে হয়—অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে কেহ পুঁথি লইয়া আলোচনা করিবার যোগ্য না হইলে বা সেগুলি অর্থ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, তাহা স্পর্শ করিতে পর্য্যন্ত দিবেন না। অতঃপর আমি মায়ের অনুপস্থিতিতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই পুঁথিগুলি খুলিয়া ছিলাম এমন সময় আমারই অনুসন্ধানে, মা আসিয়া পুঁথি হাতে আমায় দেখিলেন। আমাকে কিছু না বলিয়া বা পুঁথি পড়িতে বাধা না দিয়া, মুরলীধর সম্বন্ধে উক্ত গল্পটি তিনিও বলিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথিগত বিশেষ কিছু না পাইলেও আমি মুরলীধর সম্বন্ধে যে সামান্য প্রমাণটুকু পাইলাম আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইল।

বীরভূম জেলার বিখ্যাত পল্লী রাজনগর নিবাসী মুরলীধর দাস নামক কোন কায়স্থকুলজাত বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রাহকের নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। নবাবী আমলের সময় হইতে বা তার কিছু পূর্ব্ব হইতে বীরভূম রাজনগর মুসলমানদের দখলে ছিল, সেই সময় এই বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়। মুরলীধরের আবির্ভাবের প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আমার ও পিতামহের সময় পর্য্যন্ত পুঁথি লেখা ও সংগ্রহ চলিয়াছিল। শুনিতে পাই বাংলায় বর্গী হাঙ্গামার সময় অনেক পুঁথি চুরি, হইয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীমুরলীধর ঠাকুরের বিগ্রহ মুর্ত্তিও সেই সময় চুরি হইয়াছিল। পুঁথিগুলি অগ্রাহ্য করিয়া বর্গীরা বাড়ীর পশ্চাতে জঙ্গলে বিগ্রহ মূর্ত্তি সমেত—ফেলিয়া গিয়াছিল—পরে জঙ্গল হইতে মূর্ত্তিখানি উদ্ধৃত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব মুরলীধর বহু বৎসর পূর্ব্বে গত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-সঙ্গী শ্রীশ্রীমুরলীধরের বিগ্রহ পূজা এখনও নিত্য নিয়মিত সুসম্পন্ন হয়।

কবির বৈষ্ণব সংগ্রহ বারান্তরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতিলক

জানালা-প্রেম

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক এম-এ

পাশাপাশি বাড়ী—
এ-বাড়ীতে বাদল, পারুল ও-বাড়ীতে।
সেকেণ্ড ইয়ার বাদলের,
আর পারুলের ক্লাশ নাইন।
বাবা রিটায়ার্ড জজ
তেতলা মস্ত বড় বাড়ী নিজেদের।
ডাক্তারের ছেলে বাদল
ভাড়াটে বাড়ীতে এসেছে মাস দুই।
পরিপূর্ণ চোখে
পারুলকে ও দেখেছে কয়েকবার;
কিন্তু প্রেমের 'বল' গড়িয়েছে।
পারুলদের ড্রয়িং রুম
আর বাদলের ঘর
মুখোমুখী।
বাদল পড়ে, শোয়,
প্রায় সব সময়ই থাকে সেই ঘরে।
কিন্তু পারুল
ড্রয়িং রুমে আসে কখনও প্রকাশ্যে, লুকিয়ে কখনও।
চুপি চুপি আসে,
লঘু পায়ে এসে দাঁড়ায় ঘরের মধ্যখানে।
বাদল যদি না চায়,
যদি বইয়ের মধ্যে থাকে ডুবে,
সন্তর্পণে আসে জানালায়।
ওর ছবি
বাদলের টেবিলে আয়নায় গিয়ে পড়ে,
আয়না এই জন্যই রাখা।
আর বাদল চমকে ওঠে,
ওঠে চেয়ার ছেড়ে।

দরজায় খিল দিয়ে
যেই ছোটে ওর জানালায়
ওদিকে পারুল তখন পালিয়ে গেছে হায়।
গোড়ায় পারুল আর আসত না
কিন্তু এখন আবার আসে ফিরে।
তখন তর্জ্জনীটা নেড়ে
বাদল যেন শাসন করে।
তখন টানা দু' চোখ টেনে
মধুর ভঙ্গিমায় পারুল আধেক পাক খায়
—ও থোড়াই কেয়ার করে।
তারপর বাদল একটা খাতা নেয়—
রঙিন পেনসিল দিয়ে
খুব বড় করে লিখে
জানায় ওর নিবেদন,
নিজের লেখা দু' লাইন কবিতা,
কখনও কোটেশন রবিবাবু থেকে।
উঁচু করে পারুলকে দেখায়।
উত্তরে পারুল হাসে
পাতলা ফুরফুরে লাল ঠোঁট
মাঝে মুক্তার সারি দাঁত।
সে বড় সুন্দর।
আবার রাগেও
—তেমন লেখা হলে—
ভুরু ধনুর ছিলায় দেয় টান
আর চোখ থেকে তীর এসে
বাদলের বুকের মধ্যে লাগে।
ছুটির দুপুরে
দু'জনের গোপন আসর খুব জমে।

সকলে ঘুমিয়ে দু' বাড়ীর।
পারুল এসে জান্‌লায় বসে ;
দরজায় খিল দিয়ে
বাদলও এসে সামনে দাঁড়ায়।
আর মুহূর্ত্তে
দু'জনের চোখে মুখে
খুসীর বিদ্যুৎ যায় খুলে, উপচে ওঠে।
তারপর ওপক্ষে একটু হাসি
বেণীটা নিয়ে আঙুলে নাড়াচাড়া
আড় চোখে একটু চাওয়া
ছোট্ট মুখের ঝামটা কখনও।
আর এ পক্ষে বাদল
যথাক্রমে হাসে,
কচি নবোদ্‌গত গোঁফে দেয় তা
আঙুল দিয়ে ঠোঁটে আঘাত করে
তর্জ্জনী নাড়ে বা শূন্যে দেখায় কীল।
যদি আশেপাশে
কেউ জেগে নেই বোঝে
ফিস্ ফিসিয়ে
ওদের চলে নিভৃত আলাপন।
ড্রয়িং রুমে কেউ এলে
বা বাদলের দরজায় বৌদি আঘাত দিলেই
আলাপে পড়ল যবনিকা।
আর তা না হলে
ওরা চোখে চোখে চেয়ে থাকে।
সূর্য্য সরে,
সূর্য্যমুখী ঘাড় ফিরায়
কিন্তু ওরা অচঞ্চল, দৃষ্টি অপলক।

পারুল যদি না ইস্কুলে যায়
গাড়ী যায় ফিরে।
বাদলেরও সেদিন কলেজ কামাই
অন্ততঃ দুপুরে
বাড়ীতে ও থাকবে ঠিক।
অন্ততঃ ঘণ্টা দুই
পারুলের সঙ্গে আলাপ করে
ও কলেজ যাবে
যদি পার্সেণ্টেজের থাকে খুবই টানাটানি।
পারুলের যখন গাড়ী আসে
বাদল এসে দাঁড়ায় বারান্দায়।
পা দানিতে পা দিয়েই
পারুল চাইবে উপর দিকে
আর বাদল হাসবে ফিক্।
মেয়েরা বলে পারু ও কে ?
পারুল বলে চিনি না ত !
কিন্তু ওর হাসির ঝিলিক দিয়ে
যে ওর আছে চেনার চেয়েও বেশী।
গাড়ীতে বসে অনেক আলোচনা
পারুলকে খেতে হয় তীক্ষ্ণ মধুর হুল
কিন্তু ও যেন খুসীই হয় তাতে।

একদিন পারুলদের দরজায়
একটা মোটর এসে দাঁড়াল, দামী এবং ভারী।
পারুলকে দেখতে এসেছে,
বাদলের শুকিয়ে গেল মুখ
অকস্মাৎ যেন একটা তীর এসে
লাগল বুকের মধ্যে ঠিক।
কলেজ গেল না সেদিন
মলিন মুখে
ও-বাড়ীর দিকে চেয়ে রইল দীর্ঘ দৃষ্টি দিয়ে।
স্থির কান পেতে
প্রতিটি পায়ের শুনল আনাগোনা।
একটা অস্বস্তি আর বেদনায়
বিঁধতে লাগল বুক।
সেই থেকে
পারুলদের ড্রয়িং রুমের জানালা আর খুলল না।
চোখের দেখাও দেয় না পারুল,
যায় না ইস্কুলে

দু'জনের মধ্যে পড়ল এক ঘন যবনিকা।
বাদল আঘাত যত পেল
বিস্মিত হল তার চেয়েও বেশী।
এই পারুল!
ওর মনের সাত রঙা রামধনু
মূর্ত্তিমতী মধুরতা, কল্পাকাশের রাণী
সমস্ত গেল ভুলে?
ম্লানমুখে ও দিন কাটায়
পড়াশোনা খেলাধুলা
সব বিরস হয়ে গেল।
সিনেমায়ও যায় না বাদল
অনেক বিজ্ঞাপিত, অনেক ভাল বই
এলো এবং গেলো,
প্রায় সারা দিন থাকে ঘরের মধ্যে বসে।
কী হোল তোর বাদল?
ভারী গলায় বলেন মা হাত বুলিয়ে গায়ে।
দাদা বল্লেন রেগে
গোল্লায় গেছে।
মুচকি হেসে বল্লেন বৌদি,
না গো না, ধরেছে বিষম রোগে।

ভেবে চিন্তে শেষে
বাদল লিখল এক চিঠি
পারুলকে ওর প্রথম চিঠি—
হৃদয় ক্ষতের রক্ত দিল ঢেলে,
আর ওর গভীর প্রেমের করুণ বিবরণ
শেষে
তিন তারিখের রাত্রি বারোটায়
ওরা পালিয়ে যাবে কাশী
পারুল যেন দাঁড়ায় পূবের বারান্দায়।
দিদিমা ওর কাশী আছেন,
অনেক পয়সা হাতে
বাদলকে ভালবাসেন প্রাণের চেয়েও বেশী
সেখানে একবার গিয়ে পড়লেই হোল
সব সহজ হয়ে যাবে।
কিন্তু চিঠি কেমন করে দেওয়া যায়
বাদল শুধু ভাবে
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় যখন ধৈর্য্য গেছে টুটে
এক নিথর দুপুর বেলা
ড্রয়িং রুমের জানালা খুলে পারুল দাঁড়ায় এসে
স্বর্গ দুয়ার খুলল যেন।
ব্যস্ত হ'য়ে খুসী হয়ে হারায়ে সম্বিৎ
বাদল দিল চিঠি ছুঁড়ে।
কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল পারুল
দুল দুলিয়ে হেলিয়ে মাথা
জানাল সম্মতি?
রূপের তরঙ্গ সমস্ত ঘরে তুলে
পালিয়ে গেল বাদলের মুগ্ধ চোখ থেকে
হাত তুলে ও ডাকতে গেল।

তিন তারিখের রাত্রি বারোটায়
গলির মোড়ে ট্যাক্সি রেখে খাড়া
বাদল এলো
পূবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই কেউ।
সেই দিকে চোখ রেখে
গলিতে ও পায়ে পায়ে হাঁটে।
পায়ের তালে নাচের ছন্দ জাগে।
আবার গভীর নিরাশায়
হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়
পারুল কি ভুলে গেল?
না ঘুমিয়ে আছে, জাগতে হোল ভুল;
কিন্তু এ যে অসম্ভব!
বারান্দার দিকে চায়
চায় সমস্ত খোলা জানালায়
কিন্তু কোথাও নাই প্রাণের সাড়া
ঘুমন্ত নিঝুম পুরী।
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হোল পা
রাতও হোল ভারী,

ক্ষোভে দুঃখে হৃদয় ওর পূর্ণ হয়ে যায়।
পারুল যে-ঘরে শোয়
একটা গ্যাসের আলো তারই গায়ে।
পাইপটা ধরে
বাদল দাঁড়িয়ে থাকে একটা অর্দ্ধ চেতনায়।
তারপর একটু উঠেছে যেই
'চোর চোর'
উঠল একটা প্রবল ভীত চীৎকার।
পারুল উঠে বারান্দায় এলো।
সেই গ্যাসেরই আলোয় হোল দু'জনের দৃষ্টি বিনিময়।
পারুল একটা চিঠি দিল ছুঁড়ে,
পড়বার তখন সময় নেই—
শত শত জানলা গেছে খুলে
আর তাতে নারী মুখ ফুটে উঠল রাতের ফুলের মত
মেয়েলী কোলাহল চুড়ির রিনি ঠিনি।
পুরুষরা সব গলিতে নামল ছুটে।
একটা অন্ধ গলি দিয়ে,
দৌড়ে হোঁচট খেয়ে
বাদল বসল গিয়ে গাড়ী।
তারপর ষ্টেশন, এবং রাতের একটা ট্রেণ।
পারুল লিখেছে, সাহস পাই না
দু'দিন ভেবে দেখব, মাপ করো।

দিদিমা দেখে অবাক্!
হঠাৎ বাদল কাশী এলি!
দু' এক কথাতেই তাকে চুপ করিয়ে রাখে।
স্নেহান্ধ দিদি!
কিন্তু বিস্ময় তার কমলনা।
এবার কাশী এসে
একেবারে বদলে গেছে বাদল।
দিদিমাকে নিয়ে ঠাট্টা নেই
টাকা নিয়ে জ্বালানো নেই তাঁকে
নেই বেড়ানো খেলা,
কেমন উদাসীন!

কিন্তু কয়েক দিনের মাঝেই
নিজেকে ও করল সম্বরণ।
আবার যখন জিজ্ঞেস করেন, কেন এলো কাশী?
বাদল হেসে বলে,
তোমায় এলাম নিতে
এই ফাল্গুনে বিয়ে যে আমার!
পাশের বাড়ীর মেয়ে পারুল
তারই সঙ্গে বিয়ে।
'লভ ম্যারেজ' বুঝলে দিদি!
এখন খোল কিছু টাকা,
নাত বৌকে দিতে হবে ভারী রকম কিছু।
গল্প পরিহাসে
আবার নাচিয়ে তোলে দিদিকে ওর।
হৃদয়-ক্ষত শুকাতে চায় হাসির প্রলেপ দিয়ে।

অপরাহ্ণ বেলা
ইজি চেয়ার হেলান দিয়ে বাদল আছে শুয়ে।
দুপুর বেলার মধুর স্মৃতি
আসে যায় মনের আঙ্গিনায়।
কাগজ নিয়ে হাতে
স্মিত হাস্যে এলেন দিদি,
বাদল এই কি পারুল তোর?
কার সঙ্গে যে বিয়ে হোল
ছাপিয়েছে ছবি!
কই দেখি, না না।
হেসে উড়িয়ে দ্যায়।
দিদিকে বিদায় করে তখন
কাগজ নিয়ে দেখে
পারুল ও তার বরের ছবি,
নীচে বিয়ের বিবরণ।
পাত্র বড় বড় ডিগ্রীধারী, বড়লোকের ছেলে!
—হ্যাঁ হেসেই ত পারুল বেশ আছে।
জলে ওর ভরে এলো চোখ।
কাগজটাও দূরে দিল ছুঁড়ে,

পরক্ষণেই
ধূলা ঝেড়ে যত্নে এলো নিয়ে।
এবার ছবির দিকে চেয়ে
নিশুতি রাতের ঝড়ো হাওয়ার মতো
হু হু করে উঠল কেঁদে।
সবার চেয়ে হতভাগা
নিজেকে ও মনে করলে আজ।
কিশোর বাদল জানো নাকি
যে বাল্যপ্রেমে আছে অভিশাপ!

অশ্রুসিক্ত ভালবাসার প্রথম পাঠ।
অনেকেই একদিন
আকুল হয়ে কেঁদেছে তোমার মত!
আর মেয়ে
স্বামীর ঘরে চলে গেছে
হয়ত একটু কেঁদে।
কিন্তু শেষে ভুলেছে নিঃশেষে
যাহার ভালবাসায়
ফুটেছে হৃদয় কুসুম গন্ধে রূপে রসে।

শ্রীহৃষিকেশ মৌলিক

বৈদেশিক

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

মহাসমর—

চেকোশ্লোভাকিয়া বলির প্রাক্কালে, ইউরোপে যে সমরাগ্নি আশঙ্কা করা হইতেছিল, তাহাই এক বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই সমর আরম্ভ হইয়াছে ১৯৩৯ সালে—কারণ, যে ন্যায়, নীতি, শান্তি প্রভৃতি মুখরোচক কথার উপর ভিত্তি করিয়া চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন সেগুলি বহুপূর্ব্ব হইতেই ইউরোপে ও অন্যত্র ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি কর্ত্তৃক পদদলিত হইতেছে। আরো বিস্ময়ের বিষয়, হঠাৎ মিঃ চেম্বারলেন উপলব্ধি করিলেন অহিংস "শান্তি" নীতি মানিলে চলিবে না, জার্ম্মানীকে সশস্ত্র বাধাদান প্রয়োজন (যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেও নিজের নীতি ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত (?) মিঃ চেম্বারলেন একখানা মোটা বই লিখিয়াছেন)।

কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল কেন? আবিসিনিয়া গেল, অষ্ট্রিয়া গেল, চেকোশ্লোভাকিয়া গেল, স্পেন গেল, চীনে বর্ব্বরতার নৃশংস অভিযান চলিতেছে, এ অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল কেন? পোল্যাণ্ডও না হয় যাইত! যাহা হউক পোল্যাণ্ড তো গিয়াছে, কিন্তু জার্ম্মানী যদি যুদ্ধে হারে তাহা হইলে যে নীতি রক্ষার জন্ত গ্রেট

বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে নামিয়াছে সেই নীতির দ্বারা পোল্যাণ্ড পুনর্গঠিত হইবে তো? আবিসিনিয়া, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি পুনর্গঠিত হইবে? চীন ও ভারতবর্ষের কথা না হয় নাই বিচার করা হইল—অন্ত সমস্যাগুলির সমাধান পাওয়া যাইবে তো! ১৯১৪ সালের "war to end wars" যে ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা দেখিয়াই প্রশ্নগুলি মনে জাগে!

যুদ্ধ কতদিন চলিবে?

নীতির কথা এখন বাদ দেওয়াই ভাল, কারণ সেগুলি রক্ষা করা উচিত বা প্রয়োজন কিনা সে কথা বিবেচনা করা হইবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। অতএব, কতদিন যুদ্ধ চলিবে সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ধারণা যুদ্ধ অন্ততঃ তিন বৎসর চলিবে, সমরায়োজনও নাকি সেই অনুপাতে করা হইতেছে। ওদিকে হিটলার আবার গোয়েরিংকে পাঁচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধায়োজন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু, মুখ্যতঃ যে পোল্যাণ্ডকে লইয়া যুদ্ধারম্ভ সে পোল্যাণ্ডের শেষ ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে। পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর যুক্ত সীমানাতে যুদ্ধ চলিয়াছে ঢিমে তেতালায়। ব্যাপার এই রকম দাঁড়াইয়াছে যে সমরবিদরা নাকি বলিতেছেন, মাথা পাগলা হিটলার হঠাৎ খেয়ালের বশে একটা কিছু না করিলে, বসন্তকালের আগে পশ্চিম সীমান্তে বড় একটা কিছু ঘটিবে না। আবার, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সাথে সাথে ব্রিটিশ রাজনীতিক ও পত্রিকায় ভারতবর্ষের প্রতি যে স্নেহের সুর শুনা গিয়াছিল, তাহাও হঠাৎ আবার শ্বেত মনিব কালা ভৃত্যের প্রতি যে সুরে কথা বলেন সেই সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ব্যাপী নাও চলিতে পারে।

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের যুদ্ধমান রাষ্ট্রের ভিতর ভিতর শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে যুদ্ধমান জাতিগুলি যত না উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তাহার চেয়েও উদ্বিগ্ন হইয়াছে যুদ্ধমান জাতিগুলির মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড প্রভৃতির উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণও রহিয়াছে। পর্ব্বত সংকুল পশ্চিম সীমান্তের সুদৃঢ় ম্যাজিনট ও সিগফ্রিড লাইনের মধ্যে যুদ্ধ খুব বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। যুদ্ধ দীর্ঘ দিন চলিলে, মধ্যবর্ত্তী এই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্য দিয়াই যুদ্ধমান জাতিগুলিকে পরস্পরকে আক্রমণের বা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই আশঙ্কা এতই স্বাভাবিক যে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে কড়া সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও ঐ দুই রাষ্ট্র নাকি ইতিমধ্যেই পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য আয়োজন করিতেছে।

হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিন্ ও বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের ভিতর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। অবশ্য, এই আবেদনের কোনও ফল না হওয়াই সম্ভব। এই আবেদন সত্ত্বেও, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্য আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত দ্রুত আয়োজন করিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ বেলজিয়ামের মধ্য দিয়াই জার্ম্মানী সৈন্য চালনা করিয়াছিল। এবার নাকি হল্যাণ্ডের পালা। হিটলারের উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ, এবং এই আক্রমণের জন্য উত্তর সাগরে বিমান ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন। হিটলারের এই উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা, তাহা বলা সম্ভব নহে। তবে প্রকাশ রাশিয়া হিটলারের এই সংকল্প অনুমোদন করে নাই।

আমেরিকার 'নিরপেক্ষতা' বিধি রদ—

সম্প্রতি আমেরিকা নিরপেক্ষতা বিধি (Neutrality Act) রদ করিয়াছে। নিঃসন্দেহ ইহার পিছনে অন্ততঃ কিছুটা মিত্রপক্ষের প্রচার কার্য্য রহিয়াছে। কারণ ইহার দ্বারা যাহা কিছু সুবিধা তাহা লাভ করিবে বৃটেন ও ফ্রান্স। এবার, আমেরিকার ধারে কারবার নাই—যুদ্ধের সরঞ্জামাদি ক্রয় করিতে হইবে। নগদ মূল্যে। ফ্রান্স ও বৃটেন অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্তও নগদ মূল্য দিতে সমর্থ হইবে বটে, কিন্তু জার্ম্মানী আদৌ সক্ষম হইবে না। জার্ম্মানীতে স্বর্ণের এতই

অনটন যে জার্ম্মানী বহুপূর্ব্ব হইতেই বিনিময় প্রথায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে বাধ্য হইয়াছে। এই বিনিময় প্রথায় আমেরিকার কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং, যদিও আমেরিকা হইতে জার্ম্মানীর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কোনও বাধা রহিল না, তথাপি প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মানী তাহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না।

বৃটেন-ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি—

চেম্বারলেন ও দালাদিয়ারের ধারাবাহিক অসফলতা ও অষ্টিক নীতির ইতিহাসে প্রথম সফলতা দেখা দিয়াছে বৃটেন ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তিতে। একপক্ষ বৃটেন ও ফ্রান্স ও দ্বিতীয়পক্ষ রাশিয়া এই দুই পক্ষ চেষ্টা করিতেছিল তুরস্কের সহিত একটা বুঝাপড়ায় আসিবার জন্য। রাশিয়ার চেষ্টা সফল হয় নাই বটে, কিন্তু এই নূতন চুক্তিতে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে পূর্ব্ব সম্বন্ধ কোনদিকেই ক্ষুণ্ণ হইবে না, এইরূপ বিধান রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে যে সমর আরম্ভ হইয়াছে তাহার কথা না ধরিলেও এই চুক্তি দ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্সের যেরূপ সুবিধা হইল, ঠিক সেইরূপ অসুবিধা হইল জার্ম্মানী ও ইটালীর। এক দিকে বৃটেন ও ফ্রান্সের দুর্ব্বলতা, চেষ্টাহীনতা, অন্যদিকে জার্ম্মানী ও ইটালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির ফলে বলকান্ রাজ্যগুলিতে ধীরে ধীরে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এই চুক্তির ফলে, জার্ম্মানীর প্রভাব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে ইটালীর একাধিপত্য বিস্তারের স্বপ্নও সফল হইবে না। ফলে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তুরস্কের প্রতি ইটালীর ক্রোধোদয় হইয়াছে, তেমনি বলকান্ রাজ্যগুলিতে জার্ম্মান প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ দু' চার দিনের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়ার যেরূপ অসুবিধা হইল বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার সেরূপ অসুবিধা হইবে না। সুতরাং বিখ্যাত সাংবাদিকা মাদাম ট্যাবুই আর্ম্মেনিয়ার ছুতা দিয়া রাশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করিবে বলিয়া যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রহেলিকাময় (?) রাশিয়ার প্রতি ফ্রান্স ও বৃটেনের লোকের ক্রোধোদয় হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয় সুতরাং যে সংবাদ আমরা বিটিশ ও ফ্রেঞ্চ সাংবাদিকদের মারফৎ পাই তাহা অসত্য প্রচার কার্য্য হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

পোল্যাণ্ড বিভাগই হউক বা তুরস্কর সহিত চুক্তি প্রচেষ্টাই হউক, রাশিয়ার পূর্ব্ব লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাশিয়ার পক্ষে পরম প্রয়োজন শান্তি ও ফ্যাসিষ্ট নীতির প্রসার বন্ধ ; এবং এতদ্‌কল্পে রাশিয়া বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বলকান্ রাজ্যগুলিতে ইতিপূর্ব্বে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব বিস্তৃত ছিল ; পোলাণ্ড বিভাগ ও বাল্‌টিক্ চুক্তির দ্বারা মর্য্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া বলকান রাষ্ট্রগুলিতে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করা রাশিয়ার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং তুরস্কের সহিত চুক্তির প্রচেষ্টা সফল না হইলেও যে রাশিয়ার উদ্দেশ্য কিয়দংশ সফল হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রজ্জ্বলিত সমরানল ইউরোপের সকল রাষ্ট্রেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। রাশিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের সুনজরে নাই ; সুতরাং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্যও হয়ত তুরস্কের সহিত রাশিয়ার চুক্তি প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য। এদিক দিয়া হয়ত রাশিয়া বিফল হইয়াছে। কিন্তু, এজন্য রাশিয়া যে তুরস্ক আক্রমণ করিয়া ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধের প্রধানতম কারণ ও আসামী হইবে, ইহা মনে করা যায় না।

সংবাদপত্রে প্রকাশ জার্ম্মানী সুয়েজখাল আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া প্রথমে তুরস্ক আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে ও এতদর্থে রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। এ সংবাদ কতদূর সত্য বলা দুরূহ ; কিন্তু আপাতত মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কারণ চুক্তি যাহাই হউক না কেন রাশিয়া জার্ম্মানীকে এই সঙ্কল্পে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে বাধাই প্রদান করিবে। বলকান্ ও বালটিকে রাশিয়ার যে মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা রাশিয়ার পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং উহা রাশিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না।

রাশিয়া ও ফ্যাসিষ্ট নীতি

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট নীতি প্রসারের বিশেষতঃ

জার্ম্মানীকে সাহায্য করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইতেছে। এমন কি আমাদের দেশের কোন কোন সংবাদপত্র রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু সত্যি কি তাহাই? পোলাণ্ড বিভাগ দ্বারা জার্ম্মানীর পূর্ব্বদিকে কি প্রসার বন্ধ হইল না? বালটিক রাষ্ট্রগুলির প্রায় সব কয়টির সহিতই রাশিয়া যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইল তদ্বারা কি বালটিক রাষ্ট্রগুলিতে ফ্যাসিস্ত নীতি প্রচারের পথ রুদ্ধ হইল না। সত্য বটে রাশিয়া জার্ম্মানীর সহিত নির্ব্বিরোধ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু প্রথমতঃ বৃটেন ও ফ্রান্সের 'ধরি মাছ না ছুই পানি' নীতির ফলেই রাশিয়াকে এরূপ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া এই চুক্তি দ্বারা এ্যান্টি-কমিণ্টারেন প্যাক্ট বা রোম-বার্লিন-টোকিও এ্যাক্সিস্‌ ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং, রাশিয়ার বর্ত্তমান পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা নাজী জার্ম্মানীকে সাহায্য তো করা হইতেছেই না, বরঞ্চ ফ্যাসিস্ত-বাদ প্রসারের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইল

চীন

ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চীন জাপান সংঘর্ষের সংবাদ বিরল হইয়াছে। চীন সম্বন্ধে লোকের উৎসাহও যেন স্তিমিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনের উপর যে বর্ব্বরতার অভিযান চলিয়াছে তাহা ইউরোপের উপর যাহা চলিয়াছে তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।

জাপান নাকি চীনরাষ্ট্র গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় চীন-জাপান যুদ্ধ যেন শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু মাদাম চিয়াং কাইশেক ডাঃ দেবেশ মুখার্জ্জির নিকট ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় জাপান যতই চেষ্টা করুক, চীন শেষ পর্য্যন্ত জাপানের সহিত যুঝিবে।

জাপানের পক্ষে হয়ত তাহার তাঁবেদারীতে চীনের নামে রাষ্ট্রগঠন করিতে স্বীকৃত এমন চীনা পাওয়া কষ্ট হইবে না। চীনের জনগণের জাপানের বিরুদ্ধে যে তীব্র ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব সর্ব্বদা জাগরূক তাহাই জাপানের নিজের অধীনে কোনও চীনা রাষ্ট্রগঠনে বাধা দিবে। যিনিই জাপানের পক্ষে যাউন তাঁহারই উপর চীনের জনগণের আস্থা রহিবে না আর এরূপ লোককে দিয়া হয়ত বাহিরের লোকের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ সম্ভব, কিন্তু রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নহে।

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র



ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার ধারা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

আধুনিক যুগে যে সমস্ত কলাচর্চ্চা সম্ভব হচ্ছে সে সব বহুপরিমাণে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এ যুগের বিশ্বাস স্কুল তৈরী ক'রে ও শিক্ষক নিযুক্ত করে ঘণ্টা হিসাবে পড়িয়ে কলাবিদ্যা শেখান যায়। আধুনিক ইউরোপে তাই হচ্ছে সন্দেহ নেই—সেখানকার পদ্ধতিই হল এ রকমের ঠিকে ব্যাপার। অথচ যেখানকার শিল্পকলাদি সাময়িক দু'চার দিনের মজলিসী ব্যাপার নয় সে সব এ রকমের স্কুলের চুক্তিতে তৈরী হয় না।

এটা বিশেষভাবে মনে করতে হবে যে উচ্চশিল্প হঠাৎ তৈরী হয় না। বহু শতাব্দীর ধ্যানেই তা মূর্ত্ত হয়। চিত্রকলায় একটি নিখুঁত রেখা টানতেই শত বছরের পক্ক হাতের পেশী প্রয়োজন হয়। চীনের চিত্রকরেরা অক্ষর রচনা বিদ্যায় দীক্ষা লাভ করে বহু বংশ হ'তে শিক্ষানবিশী করে। এক মুহূর্ত্তে সশস্ত্র হয়ে কেউ জন্মায়নী। আধুনিক ইউরোপে গুরুবাদ নেই—অতীতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে সেখানকার নব্য-শিল্প মুকুলিত হয়। প্রত্যেক প্রতিভাবান্ শিল্পী কি করে প্রাচীন রীতিতে খুঁত ধরবে কি করে সে রীতি তছনছ করবে এটাই ভাবে বেশী। সে রীতিকে ধূলিসাৎ করার নামই হল সেখানকার সৃষ্টি। কিছু নূতন যোগ করা নয়—নিজের সাধনায় প্রাচীনের সহিত কোন নতুন সঙ্গীত যোজনা সেখানকার লক্ষ্যই নয়। কায়দা করে অতীতের দৃঢ় ভিত্তি ভাঙাই হল সেখানকার সাময়িক সফলতার উপাদান। এমনি ক'রে সঙ্গীত কলার ইতিহাসে Strauss, ব্রাহ্‌ম প্রভৃতি বার বার ভেঙে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রয়োজন মত ভাঙবার জন্যই আফ্রিকার নিগ্রোকলাকেও আহ্বান করেছে।

ভারতের ওস্তাদবাদ ও গুরুবাদ এখনও বহুপরিমাণে অক্ষুণ্ণ। ধর্ম্মচক্র স্থাপনে যেমন একটা পরম্পরার ইতিহাস তৈরী হয় এবং আদি সিদ্ধ সাধুর সহিত ধারা রক্ষা ক'রে পরবর্ত্তী যুগের শিষ্য ও শিষ্যান্তরের একটা ক্রমিক পর্য্যায় সৃষ্ট হয়, সঙ্গীতকলায়ও তাই হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আধুনিক সঙ্গীতকার বা বাদ্যকারদের ভিতর যারা দীর্ঘকালের ধারার দোহাই দিতে পারেন সঙ্গীতের দরবারে তাদের মূল্য প্রচুর। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার তানসেন হ'তে আজ পর্য্যন্ত প্রায় চতুর্দ্দশ পুরুষের ধারাবাহী যে ক্রম আছে আধুনিক বিখ্যাত সঙ্গীতকারগণ এই ক্রমেরই লোক। এই রকমের ধারা প্রাচীন সম্পদ রক্ষা করে। বেদ যেমন ধারাবাহী হয়ে গুরুকণ্ঠ হ'তে কণ্ঠান্তরে সংক্রামিত, আজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নি, তেমনি সুরের আলাপও বহু যত্নে রক্ষিত হয়েছে সঙ্গীতকারদের ধারায়। গ্রামোফোন রাখতে পারে ধ্বনির যান্ত্রিক বা Physical দিক মাত্র—রসের বা ভাবের দিক নয়। সে দিক ওস্তাদেরা বিকশিত ক'রে সমগ্র প্রাণের হিল্লোল দিয়ে—আসন, অবয়ব, ভ্রূভঙ্গী, দৃষ্টি ও মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে। এসব রক্ষা গ্রামোফোনের কাজ নয়। গ্রামোফোন অঙ্গহীন ইন্দ্রিয়মূলক ধ্বনির রেখাটি প্রতিধ্বনিত করে, ধ্বনির প্রাণ নয়। এটা Soulএর কাজ—সঙ্গীতের গূঢ় প্রেরণা আত্মার দান। উন্মেষিত ও অনুকূল আত্মার আধারেই তা করজোড়ে সংগ্রহ করা চলে।

বস্তুতঃ ভাবতে হবে ভারতীয় সঙ্গীতের মুখ্য দান কি? ভারতীয় চিত্রাদির মত ভারতীয় সঙ্গীতও বহিরঙ্গ ধ্বনি সংগ্রহ মাত্র নয়। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এ জিনিষকে অনুভবই করা যায় না। প্রত্যেক রাগ বা রাগিণী একটি বিশিষ্ট রসশ্রী সৃষ্টি করে—এটাই হ'ল অন্তরঙ্গ ব্যাপার—অনেক সময় সাধকেরা এই রসের মূর্ত্তি কল্পনা করেছেন। এসব মূর্ত্তিতে একটা আবহাওয়া ও আবেষ্টনের ভিতর মানুষের নিবিড় অনুভূতি একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করে।

উদ্যান, মেঘপুঞ্জ, প্রসাধন, বাপী, বারিধারা এসব নিয়ে রাগিণী-মূর্ত্তি মানব হৃদয়ের অফ্‌রন্ত ভাবজগতকে জাগ্রত করে। তাতে উপচিত হয় হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি অসীম ভাব-লোক। যে লোকসকলকে স্পর্শ করে নিজের বাণীতে শ্রোতারা আবিষ্ট হয় সে সমস্ত সুরের নাগপাশে। তাতে ক'রে এক অভূতপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সৃষ্ট হয়।

বস্তুত এসব উপাখ্যান। হাতের কারিগরীতে মেসমেরিজম্ হয় সুরের কালোয়াতীতে হয় তার চেয়েও বেশী মতিভ্রম। কথিত আছে দীপক রাগিণী গান করে তানসেন চারিদিকে একটি দাহ সৃষ্টি করেন। গৃহে ফেরবার পর তাঁর সাধিকা রূপবতী একটি মেঘরাগে গান সুরু করে। তাতে করে সমগ্র আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ হল, ঝড়ের সূত্রপাত হল, এমন কি প্রবল বজ্র গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বারিধারায় তানসেনকে স্নিগ্ধ ও শীতল করা হ'ল। এর মানে এটি নয় যে গৃহে জল ছিল না এবং তা'তে করে দগ্ধ তানসেনকে রক্ষা করা যায় নি। সমগ্র আখ্যানটির মূলে আছে সমগ্র আবেষ্টনের ভিতর একটা বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করা। "Alexender's feast" নামক কবিতায় যেমন আছে সঙ্গীতের সাহায্যে রাজসভায় সভাসদগণের ভিতর হিংসা, ক্রোধ বিষাদ, আনন্দ প্রভৃতি জাগ্রত করে শিল্পী জয়লাভ করে এও কতকটা তেমনি। বস্তুতঃ মানুষের প্রাণরাজ্যই বাইরের রাজ্য সৃষ্টি করে। ইউরোপীয় Popeleyসাহেব তাঁর বইতে সঙ্গীতের এই Conditional প্রভাবকে উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেন; "Once the celebrated Tansen was ordered by the Emperor to sing mighty Raga at noon. As he sang darkness came down on this place where he stood and spread around as far as the sound reached.

এসব আখ্যান বার বার ভারতীয় সঙ্গীতকে অন্তরঙ্গ ব্যাপার বলেই সূচনা করে, বহিরঙ্গ নয়। অন্তরঙ্গ হল cratioe—তা অহরহ নূতন ভাব সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার প্রয়াস করে। কিছু ভেঙে বা অঙ্গীকার করে নয় কিছু দান করে। এ দানের মূলে আছে সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টির রহস্য সাধকদের যুগযুগান্তের ধারাবাহী সাধনার পশ্চাতে আছে। ধ্বনির গদ ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করা স্কুলে পড়ে' হয় না—গুরুর পদতলে উপবিষ্ট হয়ে তুরীয়ভাবে তা গ্রহণ করতে হয়। এজন্য জাপানের চিত্রশিল্পে এই ভাবটিকে Subliminal Cnscioueness' বলা হয়েছে। এটা রহস্য-বাদেরই অন্তর্গত। সে হিসেবে ভারতীয় সঙ্গীতকলার রহস্য এই গুরুসান্নিধ্য ও অবক্তু গম্য দানের ভিতর লক্ষ্য করতে হবে।

এই রহস্য ধারার ভিতরই রক্ষিত হয়ে আসছে, জন-সাধারণের নিকট বা হাটে বাজারে তা পাওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত তানসেনের বংশধরেরা তানসেনের অধ্যাত্ম-দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে সযত্নে। তাঁর বংশধরেরা দু'ভাগে বিভক্ত—কেউবা "রবাবিয়া" কেউবা "বীণকার।" রবাব বা রুদ্রবীন তানসেনের সৃষ্টি। এ যন্ত্রটির সহিত তানসেনের সাধনা যেন একাত্মক হয়ে আছে। বস্তুত এটা ত' যন্ত্র নয়—সুরেরই প্রতীক। ধ্যানলব্ধ সুরমাধুর্য্য দান করার পাত্র'ত চাই ? সে পাত্র এই শিল্পগুরু পরবর্ত্তীদের দান করে গেছেন। এমনিভাবে ভারতের দরবারে আমির খসরু 'সেতার' যন্ত্রটি দান করেন।

বস্তুত পূর্ব্ববর্ত্তীদের দান গ্রহণ করার সে অধিকারও আধুনিক কলাবিদদের নেই। যন্ত্রের সাহায্যে সে সব গ্রহণ অসম্ভব। এজন্য সে শিল্পীর সংখ্যাও সামান্য হয়ে পড়েছে এবং অনুকূল সমজদারও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না। নূতন যুগ এই প্রাচীন ধারাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এমনি করে কলাগোষ্ঠী, গুরু পরম্পরা ও ভারতের অন্তরঙ্গ সঙ্গীত কলা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে। সূত্রপাত হচ্ছে বহিরঙ্গ বাদ্যোচ্ছাসের, ইন্দ্রিয়জ ধ্বনিচক্রের যাতে উত্তেজনা আছে কিন্তু আবেশ ও মায়া বা স্বপ্ন ও কল্পনার ইন্দ্রধনু নেই। গাঢ় কালো মেঘে তা এ যুগে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছান্দসিকী

অবতরণিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

"Der Rhythmus hat etwas Zauberisches, sogar macht er uns glauben, das Erhabene gehoere uns zu."......Goethe.

"ছন্দ-ইন্দ্রজালে
মহিমা অপার হয় আপনার
নৃত্যের তালে তালে।"
—গেটে

ঐতরেয় উপনিষদে একটি চমৎকার গল্প আছে। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি": সৃষ্টির প্রাক্কালে ছিলেন একা—আত্মা। না ছিল তখন সময়, না ক্রিয়া। হঠাৎ কি খেয়াল চাপল—"সৃষ্টি কিছু করলামই যা"—বললেন তিনি।

যে কথা সেই কাজ: তিনি লেগে গেলেন, রচলেন জল, আগুন, মর্ত্ত...জন্ম মৃত্যুশীল এই গতি লীলাভূমি।

তারপরে রচলেন প্রতি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরকে: অগ্নি, বায়ু, দিক, বনস্পতি, মন, মৃত্যু ইত্যাদি। "তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টাঃ অস্মিন্ মহতী অর্ণবে প্রাপতন্": এহেন সদ্যোজাত দেবতারা পড়লেন এই মহান্, ভবার্ণবে—দিশেহারা।

কারণ, তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি যখন রয়েছে ইন্দ্রিয়ের কাজ চাই তো: বললেন স্রষ্টাকে; সৃষ্টি যখন আমাদের করেছেন তখন গতি করতেই হবে, "আয়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদাম": এমন কোনো আধার দিন যেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ভোগ সম্ভব হবে।

ধাতা বললেন, তথাস্তু। ধরলেন তাঁদের সামনে গরু। দেবতাদের মন উঠল না, বললেন: "ন বৈ নোঽয়মলম্"—এ চলবে না।

ধাতা তখন ধরলেন তাঁদের সামনে অশ্বের আধার। "এ-ও অচল"—বললেন দেবতারা।

তখন বিধাতা রচলেন নরমূর্ত্তি। দেবতারা আহ্লাদে আটখানা: "সুকৃতং বত,"—হয়েছে, সুন্দর বটে।

ধাতা বললেন: "আচ্ছা, তাহ'লে আর কেন? 'যথায়তনং প্রবিশ'—করো নিজের নিজের কাজ।"

অমনি অগ্নিদেব বাক্ হ'য়ে মুখে প্রবেশ করলেন, পবনদেব প্রাণ হ'য়ে ঠাঁই নিলেন নাসিকায়, সূর্যদেব চোখের মধ্যে জ্বালালেন তাঁর আলো...ইত্যাদি। এম্নি করে সুরু হ'ল সুন্দরের উদ্বোধন।

* * * *

এই রূপকটিতে ঋষি আমাদের কাব্যে ধ্বনিত ক'রে তুললেন যেন দুটি অপরূপ আকাশ বাণী: প্রথম, সৃষ্টির একটা গোড়াকার কথা হ'ল সৌন্দর্য, সুষমা, সুমিতি, রূপশ্রী, কেননা মানুষের জৈবলীলার পিছনে রয়েছেন যে-দেবতারা —তাঁরা তাঁদের দৈবশক্তির রাশ ঠেলছেন ব'লেই আজো চলছে এ বিশ্বলীলা—ফুরোচ্ছে না; দ্বিতীয়, তাঁরা এ লীলার রাজিনামায় সই দিলেন শুধু এইজন্যে যে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুন্দরের ছন্দে। এই জন্যেই বেদে আরো বলছে যে মানুষের প্রতি শিল্পেরই স্বভাবগতি দেব শিল্পকে প্রদক্ষিণ করে—"শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি।" দেবতারা স্বভাব সুন্দর যে—কাজেই "এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পমধিগম্যতে"—কি না মানুষের শিল্প হ'ল আসলে এই সব দৈবী শিল্পের প্রতিচ্ছায়া—অনুকৃতি।

কিন্তু এ অনুকৃতির পদ্ধতি কী? দেবতারা শিল্পের প্রেরণা অধিষ্ঠাতা সবই বুঝলাম কিন্তু দৈবী দীপ্তিকে মানুষ তার মর্ত্যলীলায় দর্শন করল কোন্ কৌশলে। তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—তাঁর আলোতেই জগৎ

আলো বটে—কিন্তু আলোর প্রকাশ হয় তো কোনো-না-কোনো অ'লে ওঠার রহস্যে। কাজেই মনের কৌতূহল মেটে না—"কোন পদ্ধতিতে মর্ত্যশিল্পের আলো? বাহন হ'ল কে?"

সে-ই ছন্দ। সুন্দর ধরা দেন কেবল এই ছন্দের ফাঁদে—চাঁদকেও মা তাইতো ডাকে ছন্দে:

"আয় চাঁদ আয় রে
টিপ দিয়ে যা রে।"

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—মুক্তিপর্ণা দুর্লভার জয়টীকা পাওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নাই। সে যে সুষমা—এলোমেলো অগোছালো ডাকে সাড়া দেবে কেন—বীণাপাণির ঝঙ্কার বেসুর তন্ত্রীতে ফুটবে কেন? আলো-কে ফলিয়ে তুলতে হ'লে পটকেও ক'রে তুলতে হবে নির্মল, ঝকঝকে। সুন্দরকে পেতে হলে নিজের অশুদ্ধি ক্ষালন ক'রে সংস্কৃত ক'রে তবে তো চাইতে হবে তার সাধর্ম্য—সেই তো শিল্প "আত্মসংস্কৃতি বাব শিল্পানি। শ্রুতি আরো বলছেন: "ছন্দোময় বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"—কি না আগে আত্মাকে সংস্কৃত করতে হবে—আর যজমান নিজেকে ছন্দোময় করা ছাড়া আর কোন উপায়েই বা আত্মসংস্কৃতি সাধন করতে পারে?

এ ভূমিকায় সংস্কৃতি মানে চেতনার বিকাশ। গতিকে বুঝতে হ'লে নিজে জড়তাধর্মী হ'লে হয় না। চিন্ময়স্বরূপকে বুঝতে হলে নিশ্চেতন থাকা চলবে না। ছন্দকে বুঝতে হ'লে সব আগে নিজের আত্ম চেতনাকে করে তুলতে হবে ছন্দ-সুন্দর—অসীমকে ছুঁলে তবে সীমাকে পাওয়া যায় পরম ক'রে। অসীম তাঁর সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন ব'লেই না খসল সীমার চোখের ঠুলি, সে দেখতে পেল অদেখাকে রূপে, শুনতে পেল অশ্রুতকে ছন্দে মাত্র। এই জন্যেই ছন্দের দিব্যরূপ যে মন্ত্র তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "Supreme rhythmic language which seizes hold upon all that is finite and brings into each the light and voice of its own infinite.

সীমায় ঘুমে ঘুমিয়ে যারা আছে
ছন্দ যখন আসে তাদের কাছে
ছোঁয়ায় যে সে আপন মন্ত্র মোহন
আকাশ আকুলতার পরশমণি
আলোর সুরে—ভাষায় কলধ্বনি'
চিরন্তনীর নৃত্য অবতরণ।

* * * *

কিন্তু এ হ'ল ছন্দের প্রেরণার দিকের কথা—যে চিরদিন ধরা দিয়েও থাকে অধরা—অথচ অধরা হ'য়েও নিজে ধরা দেয় ব'লেই জীবনে বেজে উঠল সুন্দরের বোধন। শ্রীঅরবিন্দ তাই তো rhythm কে বলেছেন—"Somebody dancing upstairs". এ হ'ল চেতনার শিখর লোকের কথা, উৎসের দিকের কথা—যার নাম রহস্য, mystery—ছন্দের চিন্ময় বাণী যাকে সব আদিম স্পন্দনের মতই ছোঁওয়া যায় কিন্তু ধরা যায় না, বোঝা যায় কিন্তু বোঝানো যায় না—আকারে ইঙ্গিতে বড় জোর একটু আভাষ দেওয়া যায় মাত্র। এই আকার ইঙ্গিতেই একটা গোড়াকার চাতুরী হ'ল গানে—সুর তাল, চিত্রে—রেখা রঙ, ভাস্কর্যে—রূপ, কাব্যে—ভাব ছন্দ। এর যে আনন্দ সে বচনীয় হ'য়েও রইলে অনির্বচনীয়

Not for this alone do I love thee. .but
Because infinity upon thee brooks,
And thou art full of whispers and of shadows...
Thou meanest what the sea has striven to say
So long, and yearned up to the cliffs to tell.
Thou art what the winds have uttered not,
What the still night suggests to the heart
Thy voice is like to music heard ere birth
Some spirit lute touched on a spirit sea...

Thy face remembered is from other worlds.
It has been died for though I know not where,
It has been sung of though I know not when.

(Stephen Philips)

শুধু এইটুকু তবে ভালোবাসি না তো।
ভালোবাসি—তব চারিধারে পাখা মেলি'
অশান্ত মৌনতা রহে থমকিয়া বলি...
তোমার সত্তার মাঝে কানে কানে কথা
রাজে. অন্তলীন বলি। ছায়ার কল্লোল
দেহে তব ঢেউ তোলে। যুগ যুগ ধরি'
সাঙ্কমূলে সিন্ধু তার যেন গূঢ় আকুতি
চাহিয়াছে উচ্ছলিতে প্রণতি উচ্ছ্বাসে—
বাঙময়ী সে তব মাঝে। পারেনি পবন
বলিতে যে কথা—সেই নিগূঢ় আবেগ
তুমি হ'য়ে মূর্ত্তি নিল। তুমি সে-ই বাণী
বিশ্ব তটে স্তব্ধ রাত্রি আনে যারে বহি।'
তব কণ্ঠস্বরে ও কী ওঠে কাঁপি কাঁপি।—
জন্ম পূর্বে এসেছিল যে আবেশ কানে
ছায়ার বীণারেশে ছায়া কালোর্মির বুকে!
ও আনন স্মৃতিখানি ভেসে আসে যেন
লোক লোকান্তর হ'তে। যেন···হয় মনে···
ওরি তরে কত প্রাণ বরিল মরণ—
শুধু নাহি জানি কোথা! মনে হয় কত
কত গান ওর তরে গেয়েছে প্রেমিক···
শুধু নাহি জানি কবে! (অনামী ৮৩ পৃঃ)

এ ভাবের পিছনে যে অনুভাব—অমেয় জ্যোতির্মণ্ডল রচেছে সে মণ্ডলের আভা রচেছে ছন্দ ভাব ছুয়ে মিলে। এর নাম ব্যঞ্জনা। একে পেলেও যায় না বিলোনো—জানলেও যায় না জানানো। একে বুঝে সেই যে জানে সন্ধান—যাকে বাণ ঋষি বলেছেন চিত্তবান্। বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন রসিক—উপনিষদে বলেছে দ্রষ্টা—গভীরের সন্ধানী। এ যে আত্মার রূপবাণী—সুতরাং অপরূপ—অপরিমেয়।

অথচ এই অমিতাভাও স্বকীয় অসীমাকে প্রকাশ করে কোন সীমার পরিমিতিকে আশ্রয় করে তবে। ছন্দের প্রেরণায় যে আলো, তার বেলাও ঐ কথা: ওর আত্মার আকুতিও নিজেকে জানান দেয় কোনো না কোনো কাঠামোয়। আত্মাকে বোধে বোধ করি কিন্তু মেপে পাই নে। এ হ'ল তার চিন্ময় দিকটার কথা। কিন্তু তার প্রকাশের একটা বাহ্য দিকও তো থাকবেই—কি না তার দেহ। একে মাপাজোপা গোনাগুন্তি কাটাকুটি চলে বৈ কি। ছন্দের বেলাও তাই তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক—rhythm ওরফে ছন্দ-স্পন্দ, দুই—metre ওরফে ছন্দোবন্ধ। প্রথমটা হ'ল ছন্দের আত্মার দিক, দ্বিতীয়টা—দেহের। ছন্দোবিশ্লেষে অবশ্য আত্মার বিচার একেবারে বাদ দিলেও ছন্দকে বোঝা যায় না, যেমন দেহব্যবচ্ছেদেও প্রাণ শক্তির ক্রিয়াকে নামঞ্জুর ক'রে যায় না দেহকে বোঝা। কিন্তু তবু বলতেই হবে যে এ কথার বিচার যে ভাবে বর্ণনীয় অপরটার বিচার সে ভাবে বর্ণনীয় নয়। এ কথার মানে: কাব্যের ছন্দস্পন্দনের দিকটাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝানো গেলেও তার দেহগত ছন্দোবন্ধের দিকটা যে ভাবে ব্যবচ্ছেদসহ সে ভাবে ব্যবচ্ছেদ ক'রে জানা যায় না। চেতনা ও দেহের উপমা নিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে একথার মর্ম—তাই এ নিয়ে বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক। শুধু ব'লে রাখা—ছান্দসিকের কাজ গৌণভাবে ছন্দস্পন্দনেরও বিচার বটে, কিন্তু তাঁর মুখ্য আলোচ্য হচ্ছে ছন্দোবন্ধের বিচার—কেননা ধরতে গেলে ছন্দের আত্মা যথাযথ ব্যাখ্যার বাইরে।

এক্ষেত্রে প্রায়ই তিনটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম: কী হবে ছন্দব্যবচ্ছেদে—যখন এতে ক'রে আসল জিনিষেরই নাগাল মেলে না মিলতে পারে না।

একথার উত্তর পড়েই রয়েছে। সৃষ্টিলীলাকে যারা খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখেন তাঁদের দেখায় খুঁৎ থাকবেই। যদি কেউ বলেন "যেহেতু আত্মা অতীন্দ্রিয় সেহেতু তার দেহের দেহাঙ্গের ইন্দ্রিয়বোধের পর্যালোচনা কেনই বা?" তাহ'লে বেশ বোঝা যায় কেন এ-ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে—শুধু একপেশে নয় ভ্রান্ত। কেন না ইন্দ্রিয়বোধ সব নিয়ে

তবেই আত্মার অখণ্ড লীলা। খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখি আমরা বুদ্ধির এই-ই ধর্ম ব'লে—জীবনের প্রকৃতি খণ্ডিত বলে নয়। তাই প্রতি অংশকে আলাদা আলাদা দেখে তবে পূর্ণতার সমগ্র আকৃতি বোধে বোধ হয়। বস্তুতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ভ্রান্তিবিলাস হ'য়ে ওঠে যখন সে চেতনাকে এক ঘরে করে বুঝতে চায় চেতনার যন্ত্রকে—বস্তুকে, তেমনি অধ্যাত্মতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গী হ'য়ে পড়ে মায়া-বিলাসী যখন সে জাগতিক সত্যকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে বুঝতে চায় জগতের যন্ত্রীকে—চেতনাকে। এই জন্তেই পরমহংসদেব বলতেন "জ্ঞানের পরম কথা বুঝতে হলে নিত্য লীলা উভয়কেই নেওয়া চাই—যেমন বেলটাকে ওজন করতে হ'লে তার শাঁস খোল উভয়কেই নেওয়া চাই—নইলে ওজনে কম পড়ে।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন—বিশেষ ক'রে কাব্যের ক্ষেত্রে—শোনা যায় এক শ্রেণীর উল্লাসিক ক্রিটিকের মুখে। তাঁরা বলেন—কী হবে কাব্যের ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, কবি তো ওসব ভেবেচিন্তে ছন্দের ছক কেটে মাত্রা গুণে কাব্য রচনা করেন না।

এ কথার উত্তর দেওয়া যায় দুটো দিক থেকে। এক হ'ল—কবির দিক থেকে। কবি ছন্দ গুণে কবিতা লেখেন না একথা পুরো সত্য নয়। কারণ একটা দোলা তিনি অনুভব না করলে কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবই হত না—যেমন গানে একটা তালের দোলা অনুভব না করলে গুণীর পক্ষে গানে তাল রক্ষা সম্ভব হ'ত না। হ'তে পারে যে কবি খুব সজাগ ভাবে এ গোনাগুন্তির কাজ করেন না—অলক্ষ্যলোক upstairs থেকে যে নৃত্য আসে তার তালে পা ফেলেই চলেন। কিন্তু তবু পা তাঁকে যে তালে তালে ফেলতে হবে এ বোধ যদি তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক না থাকে তবে তাল কাটবেই। কারণ ছন্দের দোলা মানেই একটা ঝোঁকালো নিয়মের পিলপেগাড়ি করা। কোন ঝোঁকেরই নিয়ম না মেনে কাব্য ছন্দ রাখা ঠিক তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব কোনো মাত্রা ব্যবধান না মেনে গানে তাল রাখা। তবে একথা সত্য কবি ছন্দ বাঁধেন অলক্ষ্য লোক থেকে এ-বাবুনির হুকুম আসে ব'লে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে কবির মনের একটা অংশ থাকে সাক্ষী দ্রষ্টা অনুমন্তা যে দেখে হুকুম তামিল ঠিক হচ্ছে কি না। এই দেখাটাই হ'ল ছন্দ সচেতনতা। যাঁরা বলেন যে এ সচেতনতা কবির থাকে না তাঁরা হয় কখনো ছন্দের প্রেরণায় কবিতা লেখেন নি, না হয় জানেন না ছন্দ বলতে কী বোঝায়। একথা বলবার তাৎপর্য এই যে কবির পক্ষেও ছন্দবোধ বেশি সজাগ হ'লে তাঁর লাভ বই লোকসান নেই—যেহেতু কোনো কাজ অন্ধ ভাবে করার চেয়ে যে সজাগভাবে করা ভালো এ বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে না। সংসারে পরম বাঞ্ছনীয় যত কিছু আছে তার মধ্যে জ্ঞানের স্থান কারুর চেয়েই কম নয়।

অন্য উত্তরটা হ'ল কাব্যরসিকের তরফ থেকে। এখানে ছান্দসিকের জোর আরো বেশি। কারণ তাঁর ব্যবসাই হ'ল কাব্যের ছন্দোবদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের শ্রুতিবোধকে উস্কে দেওয়া। প্রকৃত কবি লাখে না মিলয় এক। কিন্তু কাব্যরসিক অনেকেই হ'তে পারে। তারা—এটা দেখা গেছে বার বারই—ছন্দজ্ঞ হ'লে কাব্যও বেশি বোঝে, মানে কাব্যেও গভীরতর তথা সূক্ষ্মতর আনন্দ পায়। তাই একজন ইংরাজী ছান্দসিক লিখেছেন:—"Most of us approach poetry not as makers, but as readers. And it is with the reader that the function of prosody lies, as an aid to criticism, and to the keener enjoyment of exact appreciation." যিনিই মিলিয়ে দেখেছেন ছন্দোবোধের আগে কবিতার কি ধরণের আনন্দ পেতেন—আর ছন্দোবোধের পরে কী ধরণের রস পেয়েছেন তিনিই একথা কবুল ক'রে ছান্দসিকের কার্যে কৃতজ্ঞবোধ করবেন, সায় দেবেন ছান্দসিকের একথায়:—"No work of art can be truly enjoyed till we experience in regard to it that sense of possession which comes of knowing *why* we enjoy and *how* the artist has achieved certain effects upon the mind and senses." এ-উক্তির সারবত্তায় সংশয় আসতে পারে

কেবল তাঁদের মনে যাঁরা কোনো শিল্পেরই আঙ্গিক (technique) কখনো আয়ত্ত করেন নি। একথা সত্য যে এঁরাও শিল্পে আনন্দ পান। কিন্তু এ-ও সমান সত্য যে শিল্পের আঙ্গিক জানলে তাঁদের শিল্পবোধের আনন্দ গভীরতর হ'তে বাধ্য।

এখানে বক্তব্যটি একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে যদি আঙ্গিক বলতে শুধু শিল্পের নিছক কাঠামোটুকুই বোঝা যায়। বলেছি জৈবলীলার অখণ্ডতার কথা। কাব্য শিল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ-আঙ্গিকে বিচার ওরই গোনাগুন্তি—ওরফে ছন্দোবন্ধের বিচার নয়। এ বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, থাকবেই ছন্দস্পন্দের বিচার যেহেতু কাব্যের আঙ্গিক বলতে ধ্বনির সংস্মৃতি (association), আবহ (atmosphere) চলতি আবেশ, আনন্দ সৌরভ সবই বোঝায়। কেননা শিল্পের মধ্যে কাব্যই সব চেয়ে সমৃদ্ধ তার আনন্দলোকে রকমারি আবেদন মিশে আছে ব'লে। এদের প্রত্যেকটিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে দেখলে হবে না। শ্রীঅরবিন্দ তাই এ-সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "I do not see how the metre aspect by itself can really be taken apart from other more subtle elements—I do not mean the bhava of the sense only, though without it metrical melody is merely a melodious corpse—but the bhava or subtle not intellectual elements of rhythm." ছন্দো বিচারে এই ভাবগত পলাতক সুরটির টেকনিককেও ধরতে পারা চাই। এখানে সঙ্গীতের আঙ্গিক-বিচারের সঙ্গে কাব্যের আঙ্গিক-বিচারের একটা তফাৎ আছে এই-ই আমার বক্তব্য।

তৃতীয়টি ঠিক প্রশ্ন নয়—তার নামকরণ হওয়া উচিত "আবদার"। আবদারটি হ'ল এই—যেহেতু ছন্দের প্রিভি কাউন্সিল হ'ল কান, সেহেতু ছন্দোবিশ্লেষের অত শত হাঙ্গাম কেন পোহাব বাপু? এ-শ্রেণীর সংশয়ীদের ভাবখানা এই যে ছন্দচর্চা নিষ্ফল যেহেতু ছন্দের উৎকর্ষ গোনাগুন্তিতে নির্ণীত হয় না—তার শেষ আপীল কানেরই দরবারে।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় এ আবদারের অসঙ্গতি। ছন্দের উৎকর্ষ সম্বন্ধে জজ কানই বটে, কিন্তু কার কান? রাম শ্যাম যদু হরির? তা যে হ'তে পারে না সেটা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যদি একটু তলিয়ে ভাবা যায়—জগতে চেতনার বিকাশ কোন্ পথে সচরাচর হ'য়ে থাকে। গুণীরা সবাই জানেন শিশুর কণ্ঠে সুর কখনই ঠিক ওজনের হয় না—বহু কণ্ঠসাধনায় তবেই সুরের কণ্ঠ ও শ্রুতি সাধা হয়। চিত্রীরা সবাই জানেন রেখা রঙ সম্বন্ধে ভূয়োদর্শীর চোখই প্রামাণ্য, একদিনে চিত্রের গভীর রসবোধ হয় না। কাব্যেও ছন্দের উদ্ভব যিনিই আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন কত ছন্দসাধনার তবে এক একটা ছন্দ নিটোল, আরো নিটোল, আরো নিটোল হ'তে হ'তে নিখুঁৎ হ'তে পেরেছে। এর দৃষ্টান্ত অজস্র। তবু দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই। প্রথম ধরা যাক আমাদের পয়ার। মহাকবি কৃত্তিবাসের একটি পয়ার নিই।

তারা মোকে নিবেদিল বিবিধ বিধানে
তোমা হেন ধার্ম্মিক চণ্ডালে প্রতীত গেলাঙ কেনে।

পাশাপাশি তুলনা করা যায় রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যে:

এ কী জ্যোতি, এ কী ব্যোমদীপ্ত দীপ জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা।

পাশাপাশি পড়লে কী বোঝা যায় এঁরা দুজন একই কাব্যলোকের নাগরিক?

ইংরাজি অমিত্রাক্ষরে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে হেনরি হাওয়ার্ড লেখেন (Aeneid এর অনুবাদে)

Who can ı expresse ı the slaugh ı ter of ı that night...
Eche pa ı lace and ı sacred ı porch of ı the Gods

এর শেষ লাইন পড়াই যায় না তৃতীয় চতুর্থ পর্বে ঠোকের যন্ত্রনায়। এর পাশাপাশি ধরা যাক শেলির প্রমেথিয়াসে:

And beatings haunt the desolated heart
Which should have learnt repose: thou hast descended
Cradled in tempests; thou dost wake, O spring!

A child of many winds! As suddenly
Thou comest as the memory of a dream,
Which now is sad because it hath been sweet;
Like genius or like joy which riseth up
As from the earth, clothing with golden clouds.
The desert of our life."

এদের দু'জনের কান কি এক শ্রেণীর কান ?

সবাই জানে যে সব বোধেরই উৎকর্ষ হয় চর্চায়। ঘটিটাও না মাজলে ঝকঝকে থাকে না আর কাব্যমার্জনা বিনা শ্রুতি হবে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ? ইংরাজী ছন্দে মডুলেশনের বৈচিত্র্য একদিনে আসে নি। এমন যুগ ছিল যখন ইংরাজ কবিরা খুব সাজ নিয়মিত আয়াম্বিক বই কিছু সইতে পারবেন না। এইজন্যেই শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন। "English poetry of to-day luxuveates in movements which to the mind of yesterday would have been archaic license—ছন্দোভঙ্গ—yet it is evident that this has led to Discoveries of new rhythmic beauty with a very real charm and power."

একথার মর্ম উপলব্ধি করতে বেশি দূর যাবারও দরকার নেই—এই সেদিনো মহাকবি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-কল্লোল সইতে পারত না কান। তাই তাঁরা মেঘনাদবধ কাব্যের নালিকা লিখেছিলেন ছুছুন্দরিবধ কাব্য-বিদ্রূপে। বৃত্রসংহার রচয়িতা হেমচন্দ্রের কাণে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মাত্রাবৃত্ত।

একদা তুমি। অঙ্গ ধরি'। ফিরিতে নব। ভুবনে
মরি মরি অ। নঙ্গ দেব। তা

কি ছন্দের আদ্যশ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু মনে হত ? বিশেষ ক'রে "অ" এবং "দেব" মধ্যখণ্ডনে ? শুধু হেমচন্দ্রই বা কেন রবীন্দ্রনাথেরই আজকের কানের সঙ্গে কি তুলনা হয় তাঁর প্রাক্ মানসী (১৮৯১) যুগের কাব্যশ্রুতির, যার কাছে এ-ছন্দও খারাপ লাগেনি :

তুই ত আমার বন্দী অভাগিনী
বাঁধিয়াছি কারাগারে
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে

(রাহুর প্রেম—ছবি ও গান)

না, কেউ মনে করবেন যে এ-যুগের রবীন্দ্রনাথের কান কখনো এ ছন্দে সায় দিতে পারে ? কিন্তু কেন পারে না ? কারণ এ যুগে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের চল হওয়ার পর থেকে আমাদের কাণের জন্মেছে এক নব সূক্ষ্মশ্রুতিবোধ—যে বোধের নিকোষ নৈমাত্রিক ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা ধরলে কান দুঃখ পেতে বাধ্য। সবাই জানে বোধশক্তির যত বিকাশ হয় মানুষ তত অল্পে আঘাত পায়। আর ছন্দ চর্চা মানেই তো ছন্দ শ্রুতিবোধের বিকাশ, তাছাড়া কি ? একথা যদি নেওয়া যায় তাহ'লে এ-ও মানতেই হবে যে ছন্দের বিচারক কান একথা সত্য হ'লেও মূল্যহীন—যেহেতু (১) যে-সে-কান কখনই ছন্দ বিচারের অধিকারী নয় (২) কবির কানও ছন্দসাধনায় সূক্ষ্মতর হ'য়ে উঠে। সুতরাং ছন্দ চর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে শুধু যে কাব্য রসিকের ক্ষতি তাই নয়—কবির নিজেরও লোকসান যথেষ্ট। আর একজন ইংরাজি ছান্দসিকের কথা মনে পড়ে :

"Poetry is a divine form of human expression, of emotion and thought (যোগ দেওয়া উচিত ছিল and perception) but it is a controlled, not free, form of expression; and while the tendency of emotion is to escape from control, the tendency of art is to control it—and there is an Art of Poetry".

ছন্দোবিজ্ঞান তো আর কিছুই না—ছন্দকারের ওই নিয়ম তথা নিয়ামক নীতিগুলির নির্ধারণ। এক কথায়, ছন্দোবন্ধের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ক'রে ইণ্ডাকশন পদ্ধতি অবলোকন ক'রে শ্রুতিসিদ্ধ বিধানগুলির খবর নেওয়া। আর বলাই বাহুল্য এ খবর নেওয়া হ'ল ছন্দ সাধনার একটা গোড়াকার কথা। কবি কাব্য-রচনা করতে করতেও এই সব নিয়ম ও নিয়ামক বিধান আবিষ্কার করেন—না ক'রেই পারেন না ব'লে। কাজেই কবি ও ছান্দসিক আসলে

একই লক্ষ্যপথের যাত্রী—উভয়েই পান কাব্যেরসবোধের গভীরতা, উভয়েরই চান শ্রুতিস্পন্দনভারে শান দিয়ে ক্ষুরধার করতে। ভুল হয় তখনই যখন ছন্দোবিচারকে আমরা মনে করি শুধু তার দেহ ব্যবচ্ছেদ। মনে রাখতে হবে ছন্দের আঙ্গিককে জানতে যাওয়ার মানে শুধু তার "কৌশলের" পরিচয় চাওয়া নয়—"সৌষ্ঠবেরও" ঔৎসুক্য রয়েছে এ-বীক্ষনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন এদের তফাৎ কী:

"ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড় জিনিষ যেটাকে বলে সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্য সৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে উহা উদ্ভব।

প্রকৃত ছন্দজ্ঞান হয় তখনই যখন ছন্দের শুধু কৌশলই নয় সৌষ্ঠবকেও আমরা জানি ছন্দসাধনায়। আর একের জ্ঞান অপরের বোধকে গভীরই করে—যদি জিজ্ঞাসাকে ঠিক পথে চালানো যায়।

দীলিপকুমার রায়

পাদটীকা: দিলীপকুমার ছান্দসিকী নামে বাংলা প্রসতির বই লিখেছেন। বইটি যন্ত্রস্থ। তার অবতরণিকা এখানে ছাপানো হ'ল।



তিন-অধ্যায়

শ্রীমতী রত্নাবলী দেবী এম-এ

"এই যে মিস্ ব্যানার্জি, আমরা আপনার সামনেই পড়ে গেলাম দেখছি। তাহলে আপনার পরিচয়টা আমার এই বন্ধুটিকে দিলে বোধ করি অসঙ্গত কিছু হবে না। ভাই দীপেন্দু, ইনি আমাদের ক্লাসের মিস্ ধীরা ব্যানার্জি—পদার্থ বিজ্ঞানে এঁর ধারণা ভাল বলে সুনাম আছে।" অতিশয় ব্যস্ত সহকারে এই কথাগুলি বলে অবনীন্দ্র তার বন্ধুকে টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। ক্লাসের পর কষ্টেলে ফিরবার পথে এই অপ্রত্যাশিত কথাগুলিতে ধীরা প্রথমটা একটু থমকে গেল কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বলল, "এটা কেমন এক তরফা পরিচয় করান হ'ল। আমার পরিচয় দিয়ে সারলেন, কিন্তু আপনার বন্ধুর নাম ধাম তো কিছুই বল্লেন না।"

"ওঃ দুঃখিত, এঁর নাম দীপেন্দু দত্ত—দমদম ফ্লাইং ক্লাব হতে এ-লাইসেন্স নিয়েছেন, সম্প্রতি বি-লাইসেন্সের চেষ্টায় আছেন। আচ্ছা, এখন নমস্কার।"

অতঃপর নমস্কার ও প্রতি নমস্কারে সেদিনের আলাপ সেখানেই পর্যবসিত হয়।

বিদ্যার মন্দিরে যাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছে তাদের ধীরা [illegible] সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখত। ব্যবহারে প্রকাশ না পেলেও অবনীন্দ্র এইজন্য তার কাছে একটু বিশেষ স্থান পেয়েছিল।

এর প্রায় দিন পাঁচ সাত পর একদিন পদার্থ-বিজ্ঞানের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ তাদের লেকচারার সদ্য-এডিনবরা-ফেরত বিশেষ প্রশংসাপ্রাপ্ত ডাঃ সান্যালের সম্মানার্থে অবনীন্দ্রের বাড়ীতে একতলার হলে সম্মিলিত হয়েছে। দোতলার দক্ষিণ-পূবের ঘরে অবনীন্দ্র থাকে ও পড়ে, তার পশ্চিমের ঘরে থাকে অবনীন্দ্রের ছোট ভাই অহীন্দ্র। বাকী ঘরগুলো আবশ্যক ও অনাবশ্যক আসবাবে পরিপূর্ণ। একতালার হলটি বেশ বড়, ছেলেরা আজ এটাকে বেশ করে সাজিয়েছে। সম্মুখে কতকটা যায়গা জুড়ে একটা ভাল বাগান।

সেদিন ছাত্রেরা শিক্ষক মহাশয়ের সাথে চা, বিস্কুট, চপ, কাটলেটের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে অনেক বাজে ও কাজের কথা আলোচনা করে সভা ভঙ্গ করল। ডাক্তার সান্যালের মোটর ছেড়ে গেলে ধীরা ছাত্রদের কাছে একটু এগিয়ে এসে বলল, "আমি এখন আসি তবে।"

"চলুন, গাড়ী প্রস্তুত আছে", বলে অবনীন্দ্র দ্রুতপদে গিয়ে মোটরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি ট্রামেই যাচ্ছি। আমার কোন অসুবিধা হবে না।"

"আপনার অসুবিধার কথা বলা হচ্ছে না। যদিও এটা আমাদের সবারই আয়োজন এবং আপনারও, তবুও আমার বাড়ীতে যখন হচ্ছে তখন সবাইকে পৌঁছিয়ে দেবার সেবা কর্মটা আমাকেই নিতে দিন।"

"আচ্ছা, চলুন" বলে ধীরা গিয়ে মোটরে উঠল।

"তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি আসছি।"

সমপাঠীদের এই কথা বলে রামসিংহকে গাড়ী ছাড়তে আদেশ দিয়ে অবনীন্দ্র ধীরাকে বলল, "দয়া করে আপনার বাড়ীর রাস্তাটা একটু বলে দেবেন।" ধীরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। প্রায় দশ মিনিট পরে মোটরটা উত্তর কলকাতার এক বড় রাস্তায় এক বড় বাড়ীর দরজায় এসে থামল। ধীরা "আচ্ছা আসি" বলে নেমে এল, গাড়ী ফিরে চলে গেল।

বলা বাহুল্য অন্য ছেলেরা অবনীন্দ্রের কথামত তার অপেক্ষায় ছিল, তবে মোটরের অপেক্ষায় না 'একজি' অর্থ কতক্ষণ তা দেখবার জন্য তা বলা সহজ নয়, কারণ অহনী-

দ্রের চট করে চলে আসার পর তারা যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল তার অর্থ যেন মনে হচ্ছিল যে তাদের উপহাসের সুযোগটা ভাল করে জুটল না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ধীরা ঝিকে জানিয়ে দিল যে সে আজ খেয়ে এসেছে। বিশেষ কোন কাজের তাড়া ছিল না, তাই বিছানা ঢাকা চাদরটা উঠিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক কিছুর মাঝে অবনীন্দ্রের কথা তার মনে হল—অবনীন্দ্রের আতিথ্যের মধ্যে সে যেন একটু আগ্রহ দেখেছে। কত কি ভাবতে ভাবতে ধীরা একবার বিছানার উঠে বসল। তখন প্রায় সব ঘরের আলোই নিবে গেছে, ছাত্রীরা নিদ্রা দেবীর সাধনা করবার উদ্যোগ করছে, কেউ কেউ বিছানায় শুয়ে পরস্পর কথা বলছে। ধীরা আবার শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ বাদে আবার উঠে লিখবার কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল, তখন চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, নিঝুম। হাত দুখানা টেবিলে রেখে তার ওপর মাথা রেখে কতক্ষণ কি ভাবল। তারপর লিখল,

প্রিয় অবনীন্দ্রবাবু,

আপনাকে একবার এখানে আসতে অনুরোধ করতে ইচ্ছা করি। যদি নিমন্ত্রণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর করব, বিশেষ কিছু নয়। তবে একটু বলতে পারি, এতে কোন ভদ্রব্যক্তির সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

আর কিছু নেই। নমস্কার। ইতি

ধীরা ব্যানার্জি

একটা লেপাফায় চিঠিটা ভরে অবনীন্দ্রের ঠিকানা লিখে ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই চিঠির কথা মনে পড়ল, তখন সূর্য্যদেব পূর্বদিক রাঙ্গা করে ফেলেছেন, দিনের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে যে ভাব মানুষের মধ্যে বেশ সহজভাবে জাগে, দিনের প্রখর রৌদ্রে অনেক সময়ে তাকে সাময়িক দুর্বলতাই মনে হয়। কোন কারণ উল্লেখ না করে কি করে একজন স্বল্প পরিচিত ভদ্রছেলেকে আসতে বলা চলে! কাল রাত্রিতে কি করে এটা সম্ভবপর বলে মনে করেছিল ধীরা আজ তা ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সেদিন চিঠিটা ডাকে দেওয়া হ'ল না।

অন্যান্য দিনের মত সেদিন সে নিয়মিত ক্লাস করে হোষ্টেলে ফিরল। বিশেষ করে লক্ষ্য করেও অবনীন্দ্রের মধ্যে বিশেষ কিছু লক্ষ্যনীয় পেল না। আরও দুদিন এমনি করে কাটল। সেদিন ছিল শনিবার, কলেজ থেকে ফিরে সে চিঠিটা ছেড়ে দিল ডাকবাক্সে নিজ হাতে।

অবনীন্দ্র রবিবার এল না, সোমবার সকালেও না। ধীরা সোমবার ক্লাসে গিয়ে দেখে অবনীন্দ্র ক্লাসে আসেনি—তার ভাল লাগল না। পরদিনও এল না, তারপর দিনও না। অবনীন্দ্র এখানে আছে কি নেই বা তার কি হয়েছে ধীরা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না। সপ্তাহখানেক পর একদিন কোন লেকচারার-এর অনুসন্ধানে অন্য একজন সমপাঠীর উত্তরে সে জানল যে অবনীন্দ্র এখন এরোড্রোমে যায় উড়তে শিখতে। শুনে ধীরার ভাল লাগল—দেশের স্বাস্থ্যবান্, অর্থবান্ ছেলেরা একঘেয়ে কলেজ রেখে, ব্যবসা বাণিজ্য—বিশেষ করে একটু বিপদসঙ্কুল কাজে গিয়েছে জানলে তার ভালই লাগে।

প্রায় মাস দেড়েক পর ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে অবনীন্দ্রকে আবার তার পুরাণ জায়গায় বসে থাকতে দেখে ধীরার বুকটা একবার কেমন করে উঠল। যা হো'ক সে শিগ্‌গীরই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে অবনীন্দ্রের পাশে তার ডেস্কে এসে বসল। চিঠির জবাব দেয়নি কেন, জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা তার অনেকবারই হয়েছে। ভাবল ছুটীর পর জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু পারল না সেদিনকার মত। পরদিন সে স্থির করে এসেছে যে জিজ্ঞাসা করবেই এবং তাই সে একটু সকাল করে কলেজে এসেছে। তিনতলা থেকে অবনীন্দ্রকে মোটর থেকে নামতে দেখে, হ্যাণ্ড ব্যাগটা বগলতলায় চেপে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগল—দেখা হল মাঝপথে। অবনীন্দ্র মাথা নীচু করে উঠছিল, ধীরা বেশ একটু জোরের সাথে বলল, 'নিমন্ত্রণ করলে যেতে নেই, এই বুঝি আপনাদের এ্যারিষ্টক্র্যাসিতে বলে?" মাথা তুলে ধীরাকে দেখে একটু অপ্রস্তুতের মত অবনীন্দ্র বলল, "কি বলছেন? আমাদের এ্যারিষ্টক্র্যাসিতে বলে কি? ও—আপনি যেতে বলেছিলেন, তা যাওয়ার কোন কারণ না থাকাতে যাই নি।"

ধীরা ছিল অবনীন্দ্রের দুই সিঁড়ি ওপরে। অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দে সে এতক্ষণ অবনীন্দ্রের চোখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অবনীন্দ্রের উত্তরের পর তাকে কিছু বলতে হবে বা বিদায় নিতে হবে তা যেন সে এক মুহূর্তের জন্ম ভুলে গিয়েছিল। যাহো'ক পরমুহূর্তে সে বলল, "সব কাজেরই কি একটা প্রকাশ্য কারণ থাকতে হবে?"

"থাকে বলে তো মনে হয়। আমরা খাই, ঘুমাই, লেখা-পড়া শিখি, টাকা উপার্জন করি—এ সব কিছুরই একটা প্রয়োজন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। দেখুন, আমি সাধারণ মানুষ, বিনা প্রয়োজনে বা নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করা এ সব বড় কথা আমি বুঝি না।"

"মনের প্রয়োজনকে কি প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য করেন না?"

অবনীন্দ্রের যেখানে তৃষ্ণা নেই, বরং বিরাগ আছে, ধীরা সে স্থানের তৃষ্ণাকে শ্রদ্ধা করতে অবনীন্দ্রকে বলল। তার কথা শুনে অবনীন্দ্রের একটুও ভাল লাগল না। তবুও সে সংযত হয়ে উত্তর করল, "আমি সে প্রয়োজন বুঝতে পারি না।"

কাল রাত্রিতে ধীরা যেন কত কি ভেবেছে—হয়তো একটা কিনারায় আসবার জন্য তার মন অসম্ভব ব্যস্ত। সে টক করে বলে ফেলল, "আপনার দিককার প্রয়োজন বোঝা না বোঝা আপনার ব্যাপার, ধরুন না আমার প্রয়োজনের জন্যই আপনাকে যেতে অনুরোধ করেছিলাম।"

অবনীন্দ্র আর সহ্য করতে পারল না, সে একটু কড়া করে বললে, "আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন না", বলেই অবনীন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে বরাবর চলে গেল।

অবনীন্দ্রের সাথে কথা বলবার সময় ধীরা উত্তেজনার মধ্যে বুঝতে পারেনি যে কথায় ধারা তাকে কোনদিকে নিয়ে চলল। সারাদিন সে কেমন একটা অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করেছে, ক্লাস ছুটির পর যখন বাসে গিয়ে উঠল, তখন বুকের ভেতর একটা ব্যথার স্পষ্ট অনুভূতি হ'ল। দৈন্যে তার মন ছেয়ে গেল,—'অন্তরের ভেতর হতে যে অর্ঘ্য দিতে চেয়েছিলাম, তা সে অবজ্ঞা করল? আমি তার যোগ্য নই?'

হষ্টেলে ফিরে গিয়ে সে দেখে মায়ের একখানা ভারী চিঠি টেবিলে চাপা দেওয়া রয়েছে। মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি আসে বলে খবরের পরিমাণ পরিমিত থাকে। আজ তাই কৌতূহলের সহিত ধীরা চিঠিখানা খুলল। বিয়ে প্রকৃতির নিয়ম প্রথমে একথা একটু ভাল করে বুঝিয়ে তিনি লিখেছেন যে পাশের গ্রামের পরাশর গাঙ্গুলীর ছেলে যোগেশ্বর আট বৎসর আগে ব্যারিষ্টারি পাশ করেন, এখন পাটনাতে তাঁর বেশ ভাল প্র্যাকটিস্। ধীরার কাকাবাবু যোগেশ্বরের সাথে ধীরার কথা তুলতে চান। ভদ্রলোকটি দেখতে সুশ্রী, কিন্তু ধীরার চেয়ে সম্ভবতঃ পনের ষোল বৎসরের বড় হবেন। এজন্য ধীরার মায়ের সম্পূর্ণ মত হচ্ছে না। তবে নানাদিক ভেবে ও তাঁদের অবস্থার কথা মনে করে ধীরার মা সম্বন্ধটিকে অবহেলা করবার মত বলে মনে করেন না। পরাশর গাঙ্গুলী বেশ উদারচরিত্র, ধীরার বিদ্যাচর্চাতে তিনি নিশ্চয়ই বাধা দিবেন না। উপসংহারে তিনি জানিয়েছেন যে ধীরার কাকাবাবু তার সম্পর্কে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পড়তে পড়তে ধীরা অসম্ভব রকম উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার হাত পা কেঁপে কেঁপে উঠল। চিঠিখানা রেখে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল। বাবার অবর্তমানে কাকাবাবুই তার অভিভাবক, আপত্তি জানালে তিনি খুবই রাগ করবেন, মাও বড় ব্যথা পাবেন। কিন্তু এ যে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। নানা চিন্তা ক্রমাগত এলোমেলোভাবে এসে ধীরাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। একবার কাগজ কলম নিয়ে মাকে লিখতে বসে, তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ে, শুয়ে থাকতে না পেরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। আহারের ঘণ্টা বাজল, ধীরা বলল সে খাবে না, অসুখ করেছে। নিকটে কোন ঘড়িতে সে রাত্রিতে সে দেড়টা পর্যন্ত বাজতে শুনেছিল।

ভোরে জাগতেই বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা বেজে উঠল, পর মুহূর্তে সব কথা মনে হওয়ায় মনটা আবার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। ভুলবার জন্য ইলেকট্রিসিটি নিয়ে বসল, কিন্তু মনকে খুঁজে পেল না বই-এ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা লেক হ'তে বেড়িয়ে আসবার কথা ভাবল,

কিন্তু সেখানে তো হৃদয়ের কাঁটা আরও সজাগ হ'য়ে উঠবার সহায়তা পাবে। খিদিরপুর ডকের মানুষের কর্ম-প্রবাহ মনের মধ্যে কর্মোদ্যম জাগিয়ে তুলে হৃদয়ের ক্ষতকে একটু কমাতে পারে, কিন্তু আরও একটু ভেবে মনে হ'ল যে এরূপে কোন মীমাংসায় পৌঁছবার আশা খুবই কম। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে বসে শান্তি খুঁজবার কথাও মনে হয়েছে, কিন্তু সে স্থান হ'তেও আলো পাওয়ার স্পষ্ট আশা না পাওয়াতে সেখানে যাওয়ারও উদ্যম দেখা গেল না। মনটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, চোখ দিয়ে অজস্র জল গড়িয়ে পড়ল বালিশে। অনেকক্ষণ এমনি ভাবে কাটল। সিনিয়র ষ্টুডেণ্ট বলে ধীরা একা থাকত, তাই রক্ষা। সেদিন রবিবার ছিল, এগারটায় স্নানাহার করে বেরিয়ে পড়ল হষ্টেল থেকে—উঠল গিয়ে শ্যামবাজারের এক সাবেক রাস্তায় সাবেক ধরণের এক তিনতলা বাড়ীর দোরগোড়ায়। ধাক্কা দিতে এক অতি সাবেক কালের দাসী এসে দরজা খুলল। বড়মা ভিন্ন বাড়ীতে আর কেউ নেই, সবাই বেড়াতে গিয়েছেন, বলে গেছেন ফিরতে রাত হ'তে পারে, ইত্যাদি খবর জিজ্ঞাসিত না হয়েই ঝি বলে গেল। এ সংবাদে ধীরা একটু সুখী হল। তিন তলার কোনের এক ঘরে ঢুকে একটা চৌকীর ওপর বড়মাকে শুয়ে থাকতে দেখে ধীরা নিঃশব্দে তাঁর পাশে গিয়ে বসল। ইনি ধীরার ছোট পিসিমার বড়জা, শুভ্র থান ধুতির মধ্যে ধীর সৌম্য দেহে যেন শান্তির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক সময় সম্ভ্রান্তঘরে অল্পশিক্ষিত প্রৌঢ়া মহিলা দেখা যায়, যাঁরা জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হ'য়ে সংসারের বহুরূপ অবস্থা-বিপর্যয় দেখে রঙিন সুখের মোহ কাটিয়ে একটি স্বচ্ছন্দ প্রশান্তি প্রাপ্ত হন, এবং যাঁরা অন্যের দুঃখকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে সহায়তা করতে চেষ্টা করেন। ধীরার এ পিসিমাকে সে শ্রেণীভুক্ত করা চলে। আজ বাড়ী শূন্য থাকায় স্নানাহার শীঘ্র সমাপন করে বিশ্রাম করছিলেন। আন্দাজ পনের মিনিট পর তিনি চোখ খুলে ধীরাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফিরে কখন এসেছিস্?'

ধীরা আস্তে আস্তে উত্তর করল "এই কয়েক মিনিট হ'ল।"

"জামাইএর সাথে বেবি কাল মুঙ্গের থেকে এসেছে। তোর পিসিমা তাদের নিয়ে চড়ুইভাতী করতে গিয়েছে। ফিরতে হয়তো রাত হবে।"

"শুনেছি, কিন্তু আমি তাদের কাছে আসিনি।"

"তবে কার কাছে এসেছিস্? আমার কাছে? কেন? কি ব্যাপার?"

ধীরা মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

"কেন এসেছিস্? কথা বলছিস্ না যে।"

ধীরা তবুও কিছু বলিল না। একটু লক্ষ্য করে তিনি দেখলেন যে ধীরার সমস্ত মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে, চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন "কি ভাবছিস্ তুই? মনে হচ্ছে তোর বড্ড কষ্ট হচ্ছে। একটু বলতে পারলে হয়তো মনটা একটু হালকা হ'ত।"

ধীরা হঠাৎ পিসিমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল, তিনিও ওর মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পিসিমার কাপড় ভিজিয়ে গায়ে লাগতে তিনি অসম্ভব ব্যথিত হ'য়ে উঠলেন। ধীরাকে আরো জোরে বুকের মধ্যে চেপে রইলেন, দু'এক ফোঁটা জল তাঁর চোখ দিয়েও গড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ এমনিভাবে কাটবার পর পিসিমা আস্তে আস্তে ধীরার মুখ তুলে ধরে আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন। ধীরা আস্তে আস্তে উঠে বসে মায়ের চিঠিটা পিসিমার হাতে দিল পড়ে দেখতে।

পড়া হ'য়ে গেলে তিনি বল্লেন, "তোর মত নেই বুঝি এ সম্বন্ধটাতে?"

ধীরা বললে, "না"।

"তাতে আর কি হয়েছে? তুই লিখেদে মাকে বুঝিয়ে। কিন্তু আমার কাছে মন্দ ঠেকছে না, তবে বয়সটা একটু বেমানান হয় লিখেছে।"

ধীরা আস্তে আস্তে বলল, "না তার জন্য নয়।"

"তবে?"

ধীরা নিরুত্তর রইল। পিসিমা অভিমান প্রকাশ করে বল্লেন, "বলবি না তো এসেছিস্ কেন ?"

ধীরা মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনি তাকিয়েই বলল, "অন্য কোথাও হ'তে পারে না।"

"কেন ? কোথাও বুঝি ঠিক করেই রেখেছিস্ ?"

"না।"

"তবে শিগ্‌গীর ঠিক হবার আশা আছে।"

"না।"

"কোনদিন ঠিক হবার আশা করা যায়।"

"না তাও নয়।"

"তবে কি তার স্মৃতি মনে মনে পূজা করা হবে ? বাবা, একেবারে দেখি উপন্যাসের নায়িকা এসে উপস্থিত ?" বলে আহ্লাদ সহকারে তিনি ধীরার গালটা একটু টিপে দিলেন। কিন্তু সে পূর্ব্বের মত গম্ভীরভাবেই বলল, "তা পারব কিনা ঠিক বুঝে উঠতে না পারাতে মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে।"

"তা ঠিক বলেছো। যাঁরা কোন বিষয়ে আদর্শ দেখাবার জন্য কোমর বেঁধে লাগেন তাঁরা সব সময় মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা রক্ষা করতে পারেন কি না সন্দেহ।"

একটু চুপ থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সে পাত্রটি কে ?"

"যখন অসম্মতি জানিয়েছেন তখন আর তার কথা জেনে কি লাভ ? তবে একটু বলব যে তাঁরা ব্রাহ্মণ নন, এ ছাড়া অন্য কোন কারণে তোমাদের অপছন্দ হ'তে পারে না বলে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

"স্পষ্ট অসম্মতি জানিয়েছে ? তুমি তাকে পরিষ্কার করে বলেছিলে ?"

"পরিষ্কার করে বলবার দরকার হয়নি, অল্প আভাসেই তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।" একটু নীরব থেকে ধীরা আবার বলল, "আমি ভাবছিলাম, কেন সে অন্তরের ভেতরটা দেখবার এতটুকু চেষ্টা করল না। তা—সে সুখী হো'ক," বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসাতে সে আবার পিসিমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল। পিসিমা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তুমি কি তোমার বুদ্ধি ও বিদ্যা দিয়ে তাকে চমৎকৃত করে তার মন পেতে পার না ?"

"ভরসা খুবই কম, কারণ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের এত প্রশংসা পেয়েছে যে চমৎকৃত করা সহজসাধ্য হবে না। তারপর ছেলেরা অনেক সময়ই মেয়েদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিদ্যাকে শ্রদ্ধা করে দূর থেকে কিন্তু কাছে আসতে ভয় পায়। সে কোন্ ধরণের হবে বলতে পারিনা।'

'তুই কি খুবই মিশেছিলি ? ভুলতে পারিস না কি ?'

"একেবারেই মিশিনি বলা চলে, কিন্তু খুবই শ্রদ্ধা করেছিলাম। আর ভুলবার কথা বলছ ? ভুলবার চেষ্টা করলে ব্যথা আরও দ্বিগুণ জোরে আত্মপ্রকাশ করে। ভেবেছি, পেয়েছি মনে করে বিষয়টাকে সহজ করবার চেষ্টা করব।'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে মন্দ নয়" একটু উচ্ছ্বাসের সহিত পিসিমা বলে উঠলেন। "আরও একটা কাজ করবার চেষ্টা করিস্। ক্ষুদ্র পতঙ্গটি হ'তে পশু-পক্ষী, প্রাণী-অপ্রাণী আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাইকে একটু ভালবাসার একটা সেবার ভাব দিয়ে দেখবার চেষ্টা করিস্। আমি আর তোকে কি বলব ? তোরা কত লেখাপড়া শিখেছিস, কত জানিস্, কত বুঝিস্। আমার মনে হয় একমাত্র এমনিভাবে সংসারকে দেখলেই মানুষ শান্তি পাবার আশা করতে পারে। নিজের মধ্যে গুমরে থাকিস না যেন।"

প্রত্যেকটি শব্দ ধীরার অন্তরে প্রবেশ করে তাকে ধীরে ধীরে একটু শান্ত করল। চতুর্দ্দিকে আলো যখন জ্বলে উঠছে তখন সে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করতে উদ্যত হ'ল।

আজ রাত্রিতে ধীরা যেন একটু শান্ত হ'ল। বুকের ভেতর যে ব্যথাটা বদ্ধ হাওয়ায় গুমরে মরছিল, আজ যেন সে বাইরের মুক্ত বাতাসের আমেজ পেয়েছে। সে ভাবছিল— দুঃখ ! হ্যাঁ, দুঃখ অনেকই আছে। মাঝে মাঝে সে দুঃখ এমন মর্মান্তিক হয়, যে মানুষ তার তীব্রতায় [illegible]মান হ'য়ে পড়ে। পেতে ইচ্ছা করাটাই যে লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, একথা আজও যদি না বুঝি তবে আর বুঝব কবে ? পূজার দিনে ময়রার দোকানের সামনে যে দরিদ্র বালকটি সতৃষ্ণনয়নে সন্দেশের দিকে তাকিয়েছিল একটি সন্দেশ

পেতে কি তার খুবই ইচ্ছা করছিল না? যে যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করতে হয় তার অভাব যদি আমার থেকে থাকে, তবে পেতে ইচ্ছা করতে লজ্জা করে না আমার—হো'ক না সে ইচ্ছা সমুদ্রতলের মতই গভীর? সহ্য করবার মধ্যে যে বীর্য, সেই বীর্য আমাকে সজীব রাখুক—দেবতার কাছে আজ এই প্রার্থনা।

দুই

সম্পূর্ণ সাড়ে চার বৎসর কেটে গেছে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে উড়তে পারদর্শী হ'যে দেশে ফিরেই অবনীন্দ্র মোটা মাহিনায় কাজ পেয়েছে। বৎসরের মধ্যে ছয়মাসই থাকতে হয় কলকাতার বাইরে, আর কলকাতায় থাকাকালীনও বাড়ীর সহিত সম্পর্ক কেবল আহার ও নিদ্রা নিয়ে—তাও অনেক দিন লাঞ্চ হয় ফ্লাইং ক্লাবে, দমদমে। চা, বিস্কুট, লুচী তরকারীর অভাব না থাকায় বন্ধু-সমাগমে সময় যায়। সময় একেবারেই কাটতে না চাইলে হয়তো সে চৌরঙ্গী রাস্তাটা বার দুই মোটর হাঁকিয়ে এল, নয়তো উড়ো-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত নিয়ে বসল। হাল্কা বই তার ধাতে বড় একটা মিল খায় না। সেদিন বন্ধু সুধীন বলছিল সে একটা খুব চমৎকার বই আজ দুপুরে শেষ করেছে। ফরাসী লেখক, লেয়ঁ উচুদরের। কোন্ এক মিঃ রোলার সাথে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মিস্ জিনকিনের বিয়ে হওয়া স্থির ছিল, কিন্তু কোন এক বিশেষ রকম 'লাভে'র এক্সপেরিমেন্ট করবার ইচ্ছায় কি আশ্চর্য রকম ডিগ্নিফাইড্ ওয়েতে তাঁরা উভয়ে সে বিয়ে বন্ধ করলেন। কিছুদিন পর মিঃ রোলা এক ধনী বিধবাকে বিয়ে করেন এবং মিস্ জিনকিন তাঁর বাল্যবন্ধু এক মালীকে বিয়ে করেন। অবনীন্দ্রের মুখে আনন্দের কোন প্রকাশ না দেখে সুধীন বলল, "তোমার ভাল লাগল না?" অবনীন্দ্র বোচারীর মত মুখ করে বলল, "কি জানি ভাই, রাগ ক'র না। একজন মিষ্টার একজন মিস্‌কে বিয়ে না করে আর একজন মিসেস্‌কে করেছেন, এর মধ্যে আশ্চর্য কি থাকতে পারে? বরং কোন মিষ্টারের সাথে অন্য একটি মিষ্টারের বা কোন মিসের সাথে আর একজন মিসের যোগ ঘটেছে সে রকম একটা খবর দিতে পারলে খোরাক জুটত ডাক্তারদের ও বৈজ্ঞানিকদের।"

"দূর বেরসিক। তোর হৃদয়টা একেবারে খালি।"

খালি কিনা কে বলবে? বন্ধু বান্ধবেরা মনে করত খালি, নিজেও হয়তো তাই মনে করত। কোনদিন অবসর মত নিজের ভেতর ঢুকে দেখেনি আরও কিছু আছে কিনা।

সেদিন অবনীন্দ্র হ্যাঙ্গার থেকে ক্লাবের ঘরের দিকে ফিরবার পথে ক্লাবের মিঃ অমুক একটু বীরত্বব্যঞ্জক চালে তার কোন বিশিষ্ট বান্ধবীকে হাতে ধরে উড়ো-জাহাজ হ'তে নামতে সহায়তা করছে দেখতে পেল। কেন অবনীন্দ্রও ঠিক ঠাহর করতে পারল না, তার শরীরটা একটু শির-শিরিয়ে উঠল। দুপুরে বিশ্রামের সময় সে কথা মনে হতেই সে নিজেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল যে এটা একটা 'পাসিং মুড'। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে না যে যুগপৎ একটা চাপা আনন্দ ও দুঃখের ভাব তার মনে তখন পর্যন্ত অবস্থান করছিল। পরদিন সে ছুটোর সময় বাড়ী ফিরেছে কিন্তু আবার তাকে পাঁচটায় যেতে হবে—পরশু নাকি তাদের ক্লাবের মানুষ-পাখীদের একটা শো আছে। অবনীন্দ্র যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে হলটা অতিক্রম করতে গিয়ে তথাকার বড় আয়নায় এক সুন্দরী আধুনিকার প্রতিবিম্ব দেখে একটু চিন্তিত হ'ল, এগিয়ে গিয়ে মহিলাটিকে পরিচয় ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক মনে করে, একটু দাঁড়িয়ে থেকে গিয়ে উঠল মোটরে।

অবনীন্দ্রের ইউরোপ হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর আধুনিকাদের নিকট হ'তে ঘন ঘন বন্ধুত্ব এসেছে, কিন্তু অবনীন্দ্রের অনৌৎসুক্যে তা এখন একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে বলা চলে। আজ তার বাড়ীতে স্বেচ্ছাগতাটিকে বন্ধুরূপে পাওয়ার ও তাকে আকাশে উড়িয়ে বীরত্ব প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেছে দেখে অবনীন্দ্র একটু অপরিস্ফুট সুখ অনুভব করল। ছোট ভাই অহীন্দ্র ছাড়া নিকটবর্ত্তী আত্মীয় তার কেউ ছিল না। অহীন্দ্র আজ ছয়মাস হয় লণ্ডন থেকে ফিরেছে ব্যারিষ্টার হ'য়ে, হাইকোর্টে সে যায় ও আসে, বালিগঞ্জের ছোট ছোট ড্রইংরুম-কোর্টেও তার যাতায়াত চলে। দাদাকে উড়ো-জাহাজের হৃদয়হীন যন্ত্র-বিশেষ ঠাওরিয়ে নিজের সম্পর্কে শৈথিল্য করা অনুচিত

বিবেচনা করে উপরি-উক্ত মেয়েটির সাথে সে কথা প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল। অবনীন্দ্র যখন দমদম থেকে ফিরল তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হবে, অহীন্দ্র তখনও বাড়ী আসে নি। একজন চাকরকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে, বিকালে যে মেয়েটি বাগানে হাঁটছিলেন, তিনি কে, কোথায় থাকেন বলতে পারিস ?"

"না বাবু, তবে রামসিং বাড়ী চেনে।"

পরের দিন ভোরে অবনীন্দ্র ল্যান্স-ডাউন্ রোডে এক বাড়ী গিয়ে উঠল, দ্বারে লেখা আছে, 'মিঃ এ, পি, দত্ত, রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট'। সামনের ঘরটাতে ঢুকে অবনীন্দ্র এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বেশ মনোযোগের সাথে ষ্টেটসম্যান পড়তে দেখে বলল, "আপনিই কি মিঃ দত্ত ?" ভদ্রলোকটি মাথা নাড়লেন। অবনীন্দ্র বলল, "কাল মিস দত্ত আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে তখনই বেরিয়ে যেতে হ'ল বলে তাঁকে যথোচিত সমাদর করা হয়নি। আজ রবিবার, তিনি যদি আজকে একবার যান, এবং আপনিও যদি—"

"ও সুনন্দার কথা বলছেন ? তা যাবে'খন। তবে আমি, আচ্ছা যদি ভাল থাকি তবে যাব।"

অহীন্দ্রের সাথে সুনন্দার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা মিঃ দত্ত জানতেন। অহীন্দ্রকে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করায় এ বিয়েতে তাঁর আপত্তি ছিল না। তিনি মনে করেছিলেন অহীন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'য়ে অবনীন্দ্র তাঁকে ও সুনন্দাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। কাজটা এত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে পেরে অবনীন্দ্র একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল। "তবে আজ পাঁচটায় আপনাদের অপেক্ষায় থাকব", বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেল।

বিকালে চা খেতে নেমে এসে অহীন্দ্র দেখে টেবিলে চা প্রস্তুত নেই। একজন চাকর বলল, "আজ ল্যান্স-ডাউন্ রোডের দিদিমনি ও তার বাবা আসবেন—"

"ল্যান্স-ডাউন্ রোডের দিদিমনি আসবেন ? কে বলেছে ?"

"বড় বাবু বলেছেন। তাই খাবার তৈরী করতে দেরি হয়ে গেল।"

"আচ্ছা, তা কর। কি খাবার করছিস দেখি।" বলে অহীন্দ্র রান্না ঘরে ঢুকে খাবারের আতিশয্য ও পারিপাট্য দেখে একটু আশ্চর্য হ'ল।

সুনন্দা ও তার বাবার প্রতি অবনীন্দ্রের সমাদর অহীন্দ্রের নিকট নূতন রকমের ঠেকল। সুনন্দার সহিত সহাস্য সোৎসুক আলাপে ও মাঝে মাঝে অবনীন্দ্রের বাড়ী পদার্পণ করে অনুগ্রহ করার অনুরোধে অহীন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হ'ল।

নয় বৎসর বয়সের সময় অবনীন্দ্রের বাবা মা তিরোহিত হয়েছেন, যে বৃদ্ধ কর্মচারী তাদের পুত্রতুল্য মানুষ করেছিলেন তিনিও আজ চার পাঁচ বৎসর হয় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আর দুজন ব্যক্তি যাঁদের অবনীন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধা করত এবং যাঁরা তার জীবন-নির্মাণে বড় সহায়ক ছিলেন তাঁদের একজন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ও অন্যজন দীপেন্দু। স্বাভাবিক, স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যপূর্ণ গতি তার, প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সহায়তা পেয়ে তা ক্রমশঃ সুন্দর ও বিরাট হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করছিল।

সুনন্দার প্রতি তার মনের ভাবটি বুঝতে পেরে নিজেকে সে তিরস্কার করেনি। তারা যাবার মিনিট কুড়ি পরে অবনীন্দ্র বেরিয়ে পড়ল মোটরে। সংসারে এমন একরোখা চরিত্র মেলে, যারা যখন যে বিষয়ে মন দেন তাকেই অতীব উদ্যমে আঁকড়িয়ে ধরেন। পৃথিবীতে দুরূহ কর্ম এঁরা সম্পাদন করেন, আবার সামান্য ভুল করে প্রকাণ্ড ক্ষতি এঁরাই অনেক ঘটিয়েছেন। তার জীবনের যে অংশের শূন্যতার খবর অবনীন্দ্র অতি-অল্প দিন হয় পেয়েছে, তাকে পূর্ণ করবার প্রচেষ্টায় সে আজ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অবনীন্দ্র গিয়ে বরাবর সুনন্দার কাছে উপস্থিত হ'ল। কাল প্রদর্শনীতে সুনন্দাকে যেতে হবে ও প্রদর্শনী সমাপ্ত হবার পর তাকে মুক্ত আকাশে বেড়িয়ে আনবার আনন্দ হ'তে সুনন্দা যেন তাকে বঞ্চিত না করে—অবনীন্দ্রের সুনন্দার কাছে এই দুই অনুরোধ। এ অনুরোধে আপত্তি থাকবার কোন হেতু না পেয়ে তার স্বভাব-সুলভ বিনয়ের সহিত সুনন্দা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

• একটু হালকা আমোদ দিয়ে মাথা ও মনকে আলকের

কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবার অভিপ্রায়ে অবনীন্দ্র নয়টায় এক হালকা ইংরাজী ছবি দেখতে গেল। বুঝতে ভুল করল যে এতে তার নূতন ভাবে 'ওভার ডোজ' হয়ে যেতে পারে। গল্পে ছিল, এক রূপকন্যা এক রূপবান বীর পুরুষকে রূপ ও যৌবনের অর্ঘ্য দিতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে মনের দুঃখে দেহত্যাগ করেন। কন্যার শোকে অধীরা বৃদ্ধা মায়ের অভিশাপে অভিশপ্ত হ'য়ে সেই যুবা পক্ষি-যোনিতে জন্ম নিয়ে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সে রূপকন্যার কবরকে চুম্বন করে যায়। সে রাত্রির শেষ ভাগে স্বপ্নে অবনীন্দ্র শয্যাশায়িতা তার রূপসীকে চুম্বন করতে গিয়ে মানসিক ও শারীরিক একটা উত্তেজনার মধ্যে জেগে ওঠে। একটা অস্বস্তির মধ্যে বিছানা হ'তে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। অবনীন্দ্রের হৃদয়ের অভাব বোধটা একটু হঠাৎ এসেছে, এবং খুব তাড়াতাড়ি তীব্র হ'য়ে উঠেছে; আর সে সময়ে দেখা দিল সুনন্দা—রূপ ও রং নিয়ে দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে। সুনন্দাই এসেছে তার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এইটে স্থির করে ফেলে মনে-প্রাণে সে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। সকাল বেলার গরম চায়ের সঙ্গে তার দেহ ও মনের উত্তাপ আরও গেল চড়ে। এমন সময় বেহারা এসে জানাল যে ল্যান্স-ডাউন রোড থেকে বাবু এসেছেন।

এমন মানুষ দুর্লভ নয় যাঁরা মনে করেন যে তাঁদের গোচরীভূত সমস্ত কর্মই মুখ্যতঃ তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে হচ্ছে। জন্মগত প্রকৃতি ও অবস্থাগত শিক্ষার দরুণ অবনীন্দ্রকে এ পর্যায়ভুক্ত করা চলে। ল্যান্স-ডাউন রোডের বাবুটি হয়তো তার সাথে সুনন্দার শুভ-কর্মের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তা অতি-সহজে স্থির করে অবনীন্দ্র অতিশয় উল্লাস সহকারে নীচে নেমে এল।

ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে মিঃ দত্ত বল্লেন,—

"তাহ'লে অহীন্দ্র ও সুনন্দার শুভ-কর্মটা সেরে ফেলাই ভাল।"

ধাঁ করে অবনীন্দ্রের মাথাটা ঘুরে গেল।

অসম্ভব রকম ব্যস্ত এ অজুহাতে সে কোনমতে তখন মিঃ দত্তের নিকট বিদায় নিল। সাড়ে এগারটায় অবনীন্দ্রের ক্লাবে যাওয়ার কথা ছিল, পৌঁছতে দেরি হবে বলে সে ফোন করে দিল। বিকালে দমদমে পৌঁছে মোটর থেকে বরাবর তাকে পরীক্ষাস্থলে যেতে হ'ল। সব প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার যেন কেমন একটু ভয় হচ্ছিল, যেন তার মাথাটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। গ্রাহ্য না করে অনেকটা জোরের সাথেই সে প্লেনে লাফিয়ে উঠল। প্লেনটা অনেকটা উঠে গেছে; এমন সময় নীচের দিকে একবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেল—সারি সারি মিষ্টাররা তাঁদের মিসেস্ বা মিসদের পাশে বসে শো উপভোগ করছেন—এ দৃশ্য অবনীন্দ্রের ভেতরকার শূন্যতা পুনরায় জাগিয়ে তুলল। সংসারটা কেমন যেন একটু এলোমেলো বোধ হতে লাগল তার কাছে, মস্তিষ্কের সমতা রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

মিনিট পাঁচেক পর প্রায় আড়াই হাজার ফিট ওপর হ'তে উড়ো-জাহাজটা ধড়াস করে ধানক্ষেতের ওপর পড়ে গেল। দর্শকবৃন্দ ছুটে গেল, জন দশেক আরোহী ছিল, কেহ মাথায়, কেহ বুকে, কেহ পেটে অসম্ভব রকম আঘাত পেয়েছেন, একজন আরোহী প্রাণ হারিয়েছেন। তখনই সকলকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

তিন

ধীরা মা ও ভাইকে নিয়ে বালিগঞ্জের কোন দোতলা বাড়ীর একতলা ফ্ল্যাটে থাকে। আজ বৎসর দেড়েক হয় সে সহরের এক বিশিষ্ট কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করে আসছে। সংবাদপত্রে উড়ো-জাহাজ দুর্ঘটনা ও অবনীন্দ্রের বিপদের কথা জেনে সে বরাবর হাসপাতালে এসে উপস্থিত হ'ল। অবনীন্দ্রের কেবিন খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। কেবিনে ঢুকতে অহীন্দ্রের সাথে দেখা—সে ধীরাকে চিনতে পেরে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ঘটনা ও বর্তমান অবস্থা কতক পরিমাণে বর্ণনা করল। দাদার কথাবার্তার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংলগ্নতা পাওয়া যাচ্ছে না, চিকিৎসার জন্য রাঁচি নেওয়া প্রয়োজন হ'তে পারে, সর্বশেষ এই কথা কয়টা অহীন্দ্র অত্যন্ত

দুঃখের সহিত বলল। অহীন্দ্রের পেছনে ধীরা ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় অস্বাভাবিক কণ্ঠে অহীন্দ্রকে বলতে শুনল, "নার্স ছাড়া আর কেউ যেন তার পরিচর্যা না করেন।" অহীন্দ্রের ইসারায় একজন কেবিনের বাইরে এলে, "ইনি মিস্ সুনন্দা দত্ত, আমার বিশেষ বন্ধু" বলে অহীন্দ্র তাকে ধীরার সহিত পরিচয় করিয়ে দিল।

সেদিন বেলা এগারটা পর্যন্ত ধীরা অবনীন্দ্রের কেবিনে দাঁড়িয়ে বিশেষ মনোযোগের সহিত অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করছিল, এমন যায়গায় দাঁড়িয়েছিল যে অবনীন্দ্র তার উপস্থিতি বা অবস্থিতি একেবারেই জানতে পারে নি। বারে বারে অবনীন্দ্র তার প্লেনের আহত আরোহীদের অবস্থা জানতে চাইছে; ঘরে কেহ এলেই সে চীৎকার করে বলতে থাকে 'আমিই দায়ী।' ধীরা বিকালেও এসে তেমনিভাবে তেমনি যায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। পরদিন ডাক্তারকে বলতে শুনল, 'শারীরিক আরোগ্য করা হয়তো সম্ভবপর হবে, কিন্তু……' 'কিন্তু'র অর্থ বুঝতে পেরে অহীন্দ্র গম্ভীর হ'য়ে রইল, ধীরার বুকটা কেঁপে উঠল। ফিরবার সময় ধীরা অহীন্দ্রকে একটু আড়ালে নিয়ে বলল,

"আপনার দাদার সমপাঠী ও পুরাতন বন্ধু হিসাবে তাঁর সম্পর্কে আমি একটু জানতে ইচ্ছা করতে পারি কি?"

'নিশ্চয়। কি বিষয়ে বলুন?'

'ওঁর বিকারের কারণ কি কিছু নির্দ্ধারিত হয়েছে?'

'ডাক্তারেরা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। হয়তো রাঁচি নিয়েই যেতে হবে।'

'আচ্ছা, বলতে পারেন, উনি শেষ কখন বেশ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করেছেন?'

"গত রবিবার মিঃ দত্ত ও সুনন্দাকে দাদা নিজে হঠাৎ চায়ের নিমন্ত্রণ করে আসেন। সেদিন তো সবার সাথে বেশ আনন্দের সাথে কথাবার্ত্তা বলেছেন। সোমবার সকালে চায়ের সময়ও বিকারের কোন পরিচয় পাই নি। সেদিনই বেলা নয়টায় মিঃ দত্ত দাদার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"আপনি কি জানেন তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল এবং আমি কি তা শুনতে পারি?"

মিঃ দত্তের আগমনের কারণটা অহীন্দ্র জানত, সে তা অল্প কথায় ধীরার নিকট বর্ণনা করল। ধীরা খানিকবাদে বলল, "আচ্ছা, উনি ডায়েরী বা কোন রকম নোট বই লিখতেন কি?"

"হয়তো লিখতেন।"

"আপনাদের প্রতি শুভ-ইচ্ছা বশতঃই আমি সেগুলি দেখতে ইচ্ছা করি।"

ধীরার সেদিন কলেজে যাওয়া হ'ল না। সমস্ত দুপুর অবনীন্দ্রের কাগজপত্র ঘেঁটেছে। পূজার বন্ধ হবার আর দিন দশ বাকী ছিল। এই কয়দিন তাকে কলেজ থেকে ছুটি নিতে হয়েছে। অবনীন্দ্রকে ইচ্ছামত পরিচর্যা করবার অনুমতি সে অহীন্দ্রের কাছ থেকে নিয়েছে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে সে সেখানকার নার্সের তালিকায় নাম লিখিয়েছে।

পরদিন খুব ভোরে নার্সের বেশে ধীরা অবনীন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করে শিয়রে বসে নিদ্রিত অবনীন্দ্রের চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা পর অবনীন্দ্র চোখ মেলল। ধীরা একটু স্নেহের স্বরে বলল, "তুমি আজ কেমন আছ?" অবনীন্দ্র প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ধীরার দিকে তাকাল। ধীরা বলল, "চিনতে পারছ না, আমি বাচ্চু"। বাচ্চুর নাম শুনে কোন উচ্চবাচ্য না করে অবনীন্দ্র তার দিকে চেয়ে আছে দেখে ধীরা বলল, "এ তোমাদের ভারী অন্যায়, আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দাও নি। আমি খবরের কাগজে দেখে সেদিনই দিল্লী থেকে রওনা হই।"

অবনীন্দ্র তেমনিভাবেই তাকিয়েই রইল।

"বা তুমি কি ভুলে গেছ যে আমি ছয় সাত বৎসর হয় দিল্লীতে নার্সের কাজে আছি? সে—ই আমি যখন ছোট দশ বৎসরের ছিলাম, তোমাকে বলেছিলাম আমি নার্স হব। আমি এ কাজ খুব ভালবাসি।"

একমাত্র বোন বাচ্চুর সাথে যে একদিন এ রকম কথা হয়েছিল, অবনীন্দ্রের তা একটু একটু স্মরণ হচ্ছিল এবং তাকে যে দু'ভাই কাঁধে করে কেওড়াতলায় নিয়ে যায় সে কথাও তার একটু মনে ভাসছিল। কিন্তু তার সম্বিত

স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়েছে, এ দুর্বলতা সে আপনার কাছে স্বীকার করতে এখন আর কুণ্ঠা বোধ করে না। বিশেষতঃ একজন যখন একান্ত আন্তরিকতার সহিত নিজেকে তার বোন যাচ্ছ্ বলে পরিচয় দিচ্ছে তখন তার কথার সত্যতা যাচাই করবার মত মনোবৃত্তি ও শক্তি তার ছিল না। ধীরা বলতে লাগল, "তুমি বলেছিলে আমাকে মোটর চালান শিখিয়ে দেবে, তাও শেখালে না।" অভিযোগে অবনীন্দ্রকে একটু ব্যথিত হ'তে দেখে ধীরা আবার বলল, "তা তুমি দুঃখিত হয়ো না। আগে ভাল হ'ও, তারপর এবার আমাকে এরোপ্লেন চালাতে শিখিয়ে দেবে, কেমন?"

এরোপ্লেন শিখিয়ে মোটর্ না শেখাবার অপরাধ মার্জনা পাবার আশায় অবনীন্দ্র বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা। এরোপ্লেন শিখিয়ে দেব তোকে। কয়জন মেয়ে এরোপ্লেন চালাতে জানে?"

ধীরা মনে মনে একটু খুশী হ'ল। "এবার হাত মুখ ধুয়ে নাও" বলে ধীরা মুখ ধোওয়ার সরঞ্জাম কাছে এনে ধরল ও কার্য্যসম্পাদনে সহায়তা করল। চুল আঁচড়িয়ে দিতে দিতে বলল, "তোমার মনে আছে আমরা যে সবাই একত্র ফটো তুলেছিলাম? আমার কাছে এক কপি আছে, দেখবে?" বলে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বাবা মা ও তিন ভাই-বোনের সম্মিলিত ফটোখানা অবনীন্দ্রের সম্মুখে তুলে ধরল। অবনীন্দ্র একবার ফটো ও একবার ধীরার দিকে তাকাচ্ছিল, তখন ধীরা বলল, "তুমি ভাবছ আমি কেমন বদলিয়ে গিয়েছি, তা তুমি সেই কবে দেখেছ, আমার কথা তোমার মনেই নেই দেখছি।"

অনুযোগে অবনীন্দ্র তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, মনে আছে নিশ্চয়ই।"

"আমার নার্সের বেশ তুমি কখনও দেখনি বলে তোমার কাছে এমনিভাবেই এসেছি। আচ্ছা, বলত আমাকে কেমন লাগছে দেখতে। কিন্তু ঐ ডাক্তার বাবু আসছেন, তুমি বসে আছ দেখলে তিনি খুব রাগ করবেন," বলে ধীরা অবনীন্দ্রকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে অবনীন্দ্র চীৎকার করে উঠল, "আমিই দায়ী"। ডাক্তার চলে গেলে ধীরা একান্ত মিনতির সুরে বলতে লাগল, "তুমি নিজেকে কেন এত তিরস্কার করছ? যা হয়েছে তা তো হয়েই গিয়েছে। মানুষমাত্রেই ভুল করে। আজ পর্য্যন্ত কত মানুষ কত রকম ভুল করেছে। সে জন্য এত দুঃখ পেতে আছে? কিন্তু তুমি যে আর এক ভুল করতে চলেছ আমি তাই ভাবছি। এমনি করে বোকার মত কষ্ট পেয়ে নিজেকে সারতে দিচ্ছনা। এমনটি কর না, তোমার হাতে ধরে বলছি," বলে কাকুতিকণ্ঠে অবনীন্দ্রের হাত চেপে ধরল। অনেকক্ষণ কি ভেবে অবনীন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর করল, "আচ্ছা"।

"জান এবার দিল্লীতে একজন বাঙ্গালী মেয়ের সাথে আলাপ হ'ল। ২১৩ বৎসর হয় ফিজিক্স্এ এম্-এস্-সি পাশ করেছে। নাম ধীরা ব্যানার্জি। বেশ লাগল আমার ওকে। সে বলছিল—"

"কি? কি নাম বললি? ধীরা ব্যানার্জি?"

"হ্যাঁ, সে বলেছিল তোমাকে চেনে।" তার নামে অবনীন্দ্রকে বিরক্ত ভাবাপন্ন মনে হ'ল না দেখে ধীরা সাহস পেয়ে বলল, 'তোমার সাথে নাকি পড়েছে? তুমি নিশ্চয় জান ওকে?"

"হ্যাঁ।"

"সে যে অপ্টিক্সএ থিসিস্ লিখে ডক্টরেট পেয়েছে, তুমি জান?"

"তাই নাকি? বেশত! তাকে একবার আসতে বললে—"

"আচ্ছা, আমি তাকে আসতে বলে পাঠাব।"

'না থাক্।'

'কেন? তাতে দোষ কি?'

'না সে হয় না।'

'আচ্ছা আমার নাম করে ডাকব। সে তো আমার দিদির মত, সে কিছু মনে করবে না। আমি তো চলে যাব, বলে যাব সে যেন মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে যায়।'

'তুই চলে যাবি? কোথায়? কবে?'

'আমাকে পরশুদিন সকালে যে আমার কাজে উপস্থিত

থাকতেই হবে। তুমি তো এখন একটু ভালো আছ। আর আমি ধীরাদিকে বলে যাব, তোমার যা দরকার সে যেন সব ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া ছোটদা তো আছেনই। তুমি কিছু ভেবো না। এখন বরং একটু ঘুমাও।"

দুপুরে ধীরা অবনীন্দ্রের কেবিন হ'তে বার হ'য়ে নার্সের বেশ পরিত্যাগ করল। অহীন্দ্রের সাথে অনেকক্ষণ কি সব পরামর্শ করে তাকে নিয়ে সে ডাক্তার সান্যালের বাড়ী গেল। ডাঃ সান্যাল অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সহানুভূতি সম্পন্ন হ'য়ে জানালেন যে তাদের কার্যে তিনি তাঁর সাধ্যমত সহায়তা করবেন। অবনীন্দ্রের কয়েকটি সমপাঠী খুঁজে বার করতে হ'ল এবং কলেজের পুরাতন বেহারাটাকেও যেন কি বলতে হ'ল।

দিন সাত পর বেলা নয়টায় অহীন্দ্রের মোটর তার বাড়ী ঢুকল, অহীন্দ্র ও একজন ডাক্তারের সঙ্গে অবনীন্দ্র মোটর থেকে নেমে আসতে ধীরা ঘর থেকে বার হ'য়ে এসে বলল, "নমস্কার। চিনতে পারেন? বাচ্চুর কাছে আপনার কথা শুনে দেখতে এলাম।"

অবনীন্দ্র প্রথমটা নমস্কার করতে গিয়ে পরে ডান হাতখানা এগিয়ে দিল করমর্দন করবার জন্য। ধীরার একটু ভাল লাগল। অবনীন্দ্র বলল, "অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"হঠাৎ অভিনন্দনের কারণ?"

"শুনলাম আপনি ডি, এস্ সি নিয়েছেন।"

"বাচ্চু বলেছে বুঝি?"

অবনীন্দ্রের নিরুত্তর দৃষ্টিতে যেন মনে হ'ল যে সাতদিন আগেকার বাচ্চু ও আজকের ধীরা ব্যানার্জির কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা ঐক্য সে পেয়েছে। ধীরা তাই এড়িয়ে যাবার জন্য বলল, "আচ্ছা, আপনি ওপরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমরা নীচে অপেক্ষা করছি।"

একটু ব্যস্ততার সহিত অবনীন্দ্র বলল, "না না, সে হয় না, ওপরেই চলুন।"

আন্দাজ সাড়ে দশটায় ড্রাইভার রামসিং এসে অবনীন্দ্রকে জানাল গাড়ী প্রস্তুত। সে জিজ্ঞাসু নয়নে অহীন্দ্রের দিকে তাকাতে অহীন্দ্র বুঝিয়ে বলল, কলেজের সময় হয়ে গিয়েছে, রামসিং তাই প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। অবনীন্দ্র শশব্যস্ত হ'য়ে বলল, "হ্যাঁ, আজ তো শুক্রবার, এগারটায় ক্লাস। আমার নোট খাতাটা গেছে কোথায়?" গম্ভীর ভাবে ধীরা অহীন্দ্রের দিকে তাকাল; অহীন্দ্র এইটে নিয়ে যাও বলে তাড়াতাড়ি একটা খাতা ও কলম অবনীন্দ্রের হাতে গুঁজে দিল।

গাড়ী কলেজে থামতে কোথা থেকে সমপাঠী ক'দিন এসে কথা বলতে বলতে অবনীন্দ্রকে ক্লাসে নিয়ে গেল। ধীরা লক্ষ্য করেছে যে অবনীন্দ্র ডাঃ সান্যালের লেকচার বেশ মন দিয়ে নোট করছে, তবে মাঝে মাঝে যেন অবনীন্দ্র কেমন শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের এক কোনের দিকে তাকিয়ে ছিল। প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে আবার অবনীন্দ্র ধীরার পাশের ডেস্কে দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশের সহিত কাজে রত।

ধীরার প্ল্যান কতটা কার্যকরী হ'ল, অহীন্দ্র ফোনে ধীরাকে জিজ্ঞাসা করল। ধীরা জানাল যে আরও পনের কুড়ি মিনিট পরে বোঝা যাবে। তার দাদা এক্সপেরিমেন্ট-টাতে বেশ মত্ত হ'য়ে গিয়েছেন, শুদ্ধ ফল বার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এমন সময় অবনীন্দ্রের উৎফুল্ল কণ্ঠে "মিস্ ব্যানার্জি, মিস্ ব্যানার্জি" শুনতে পেয়ে ধীরার হৃদয়টা খুশীতে ভরে উঠল। মাসের পর মাস যে এক্সপেরিমেন্ট করে ধীরা থিসিস তৈরী করেছিল, সে এক্সপেরিমেন্টে অবনীন্দ্রের কৃতকার্যতা যদি অবনীন্দ্রের প্রাণে একটা গভীর আনন্দ জাগিয়ে তাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করতে পারে তবে ধীরার থিসিসের বাস্তব সার্থকতা হবে। ধীরা কোন রেখে দ্রুতপদে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। মিনিট পাঁচের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত ফল বেরিয়ে পড়াতে অবনীন্দ্র হঠাৎ 'হুর্‌রা' বলে চীৎকার করে উঠল। ডাঃ সান্যাল এসে অবনীন্দ্রের কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, "কি হে রায় চৌধুরী?"

"স্যর, দেখুন, কেমন ঠিক ঠিক ফল বার করে ফেলেছি।"

"বেশ বেশ, খুব খুশী তো?"

"নিশ্চয়। অবিশ্যি, আপনি ক্লাসে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন এবং মিস ব্যানার্জি গাড়ীতে

আমাকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাই আমি এত সহজে পেরে গিয়েছি। সুর, ফলটা ভারী মজার, নয় কি?"

অবনীন্দ্র জানে না যে তাকে নিয়েই আজ সব চেয়ে বড় এক্সপেরিমেণ্ট চলেছে।

রাত্রিতে অহীন্দ্রের সাথে শোবার ঘরে ঢুকে ধীরাকে বিছানা ঝাড়তে দেখে অবনীন্দ্র একটু ব্যস্ত হ'য়ে বলল, "এ কি? আপনি করছেন কি? চাকরদের বল্লেই তো হ'ত।" বাধা দিয়ে অহীন্দ্র বলল, "দাদা, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ধীরাদি এতে কিছু মনে করবেন না।"

"তিনি মনে না করুন, আমি করতে পারি।"

বিনীত কণ্ঠে ধীরা বলল, "আমার অনুরোধ আপনিও যেন কিছু মনে না করেন।"

অবনীন্দ্র ধীরার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে কতক্ষণ কি ভেবে চোখ সরিয়ে নিল। অহীন্দ্র বলল, "দাদা, তুমি যে কয়দিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'ও, সে কয়দিন আমার অনুরোধে ধীরাদি এখানে থাকবেন রাজী হয়েছেন।"

"কি বল্‌ছিস্ তুই?"

"কেন? আমাদের এখানে দেখাশুনা করবার কেউ নেই তো? তা ছাড়া আজকে আমি ধীরাদির মাকেও ধরে এনেছি। তুমি রাগ ক'র না যেন।" অবনীন্দ্রের দৃষ্টিতে আপত্তি প্রকাশ পেল, যদিও বাক্যে আত্মপ্রকাশ করল না।

ভোরে অবনীন্দ্র চোখ মেলে দেখে, টেবিলের ওপর একটা রেকাবে বেল ফুল রয়েছে, আলনায় জামাকাপড় পরিপাটি-রূপে সাজান হয়েছে। একটু নড়বার শব্দ পেয়ে ধীরা খাটের কাছে এসে মশারীটা খুলে ফেলে বলল, "কেমন আছেন আজ? ভাল ঘুম হয়েছে তো?"

উত্তর না দিয়ে একটু বিরক্তির সুরে অবনীন্দ্র বলল, "নটবরটা এখানে শুয়ে ছিল, ওটা গেল কোথায়?"

"দরজা খুলে দিয়ে ও বেরিয়েছে। আপনার কি দরকার বলুন না আমাকে।"

"আপনি কেন এত কষ্ট করছেন বলুন তো।"

"কষ্ট? এতটুকুতেই? না, অহীন্দ্রবাবু, আমি—তিন জনে, তা ছাড়া চাকরেরা তো আছেই। আপনি জানেন না গত গ্রীষ্মের বন্ধে আমাদের দেশের বাড়ীতে দুজন বড় রোগীকে কেবল আমি ও আমার ভাই কি করে ভাল করেছিলাম।"

শুদ্ধবিস্ময়ে অবনীন্দ্র ধীরার চোখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল।

* * * *

হাওয়া পরিবর্তন করবার কথা উঠতে অহীন্দ্র প্রস্তাব করল, নাইনিতাল, ডেরাডুন, শ্রীনগর। অবনীন্দ্রের মনঃপুত হল না। ধীরা বলল যে, হোটেল-জীবন কলকাতা-জীবন থেকে বিশেষ ভিন্ন হবে না, বরং লক্ষ্যায় বড় একটা বজরাতে থাকলে ভাল লাগতে পারে—বাংলার প্রাকৃতিক শোভা ও গ্রাম্য লোকের সুখদুঃখমিশ্রিত জীবন একটা নূতনতা দিতে পারে। ধীরার প্রস্তাব কার্যকরী হয়।

তিন সপ্তাহ পরের কথা। বজরার একতলার ছাদে একটা মাদুরে শুয়ে ধীরা চিন্তামগ্ন হ'য়ে সান্ধ্য আকাশের বিরাটত্ব উপভোগ করছিল, পাশে বসে তার মা প্রদীপের সলতা তৈরী করছিলেন; নটবর এসে জানাল দিদিমনিকে বড়বাবু একটু ডাকছেন।

ঘরে ঢুকে অবনীন্দ্রকে শুয়ে থাকতে দেখে ধীরা কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অবনীন্দ্র বলল,—

"কাজের ব্যাঘাত করলাম কিছু?"

"না, আমি এমনি শুয়েছিলাম।"

একটু সময় কেটে গেল বিনা কথায়। তারপর অবনীন্দ্র বলল, "বোস না।"

ধীরা পাশে খাটের ওপর বসল।

"তোমার টেবিলের ওপর একটা ফটো দেখলাম। আচ্ছা ও রকম একটা ফটো রেখেছ কেন সাথে?"

মুখ তুলে ধীরা অবনীন্দ্রের চোখের দিকে তাকাল।

"বলতে কোন আপত্তি থাকলে অবিশ্যি শুনতে চাই না।"

"এ বলতে আপত্তি কি থাকতে পারে?" একটু থেমে তারপর ধীরে ধীরে বলল, "শ্মশানে ধ্যানস্থ মহাদেবের কথা বলছ তো? আমার ও রকম উদাস ভাব বেশ লাগে।"

ঘরে কোন আলো জলছিল না। শুক্লপক্ষ হ'লেও চাঁদের আলো সামান্য ছিল, ঘরের আসবাবপত্র দেখা যায় মাত্র।

এরূপ নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় আরও খানিকটা সময় কেটে গেল নীরবতায়। সে নীরবতা ভঙ্গ করল অবনীন্দ্র;

"তুমি আমার ওপর খুব চটেছিলে না?"

ধীরা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

"তুমি ডেকেছিলে আমি যাই নি বলে।"

"কবে?"

"অনেকদিন আগে, কলেজে থাকতে।"

শান্তস্বরে ধীরা জবাব করল, "না, রাগ করি নি।"

"আজ যদি আমি তোমাকে ডাকি, আসবে?"

অবনীন্দ্রের বাম হাতখানা ধীরার ডান হাতের ওপর ছিল, সেখানা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ধীরা বলে উঠল, "তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাকে ডেক না।"

মিনিটখানেক বাদে অবনীন্দ্র বলল,

"এ অনুরোধে কি আমার ওপর একটা বড় রকম শাস্তি চাপান হ'ল না?"

ব্যথিত কণ্ঠে ধীরা বলল, "ভুলে যেতে পার না কি?"

"সম্ভব নয়।"

ধীরে ধীরে ধীরা নিজেকে অবনীন্দ্রের বুকের ওপর এলিয়ে দিল। মাথাটা অবনীন্দ্রের বুকের ওপরে রেখেই আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "ক্ষমা কর। যে শাস্তি একদিন নিজে পেয়েছি, তা আজ তোমাকেও নিতে বলতে হচ্ছে। স্বর্গের পদার্থকে আর মাটিতে টেনে আনতে বলছ কেন? রাগ করে নয়, অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়েই বলছি।" অবনীন্দ্র রুদ্ধ আবেগে নির্বাক হ'য়ে রইল, ব্যথিত ধীরা মৌন হ'য়ে রইল।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে কাটল। হাওয়ায় উত্তাপকে নাবিয়ে আনবার অভিপ্রায়ে ধীরা কথা বলল,

"একদিন ইউনিভারসিটি ইন্‌সটিটিউটের দোতলার বারান্দায় তোমার সাথে দেখা—আমি ফিরছিলাম তুমি যাচ্ছিলে। তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"আমি একটু হাসলাম তুমি হাসলে বেশ একটু পরে যেন হাসবে না ভেবে রেখেছিলে। তবুও সেদিন আমার সম্মান রেখেছিলে তাই তোমায় ধন্যবাদ। তখন কিন্তু আমার ভারী রাগ হয়েছিল—একবার ইচ্ছা হ'ল এগিয়ে গিয়ে বলি ইস্কুলে থাকতে শিখেছিলাম যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচিত কাউকে দেখলে একটু না হাসা অভদ্রতা। কিন্তু গায়ে পড়ে আর ঝগড়া করতে ইচ্ছা হ'ল না। আমি কেমন ভাল, না?"

"তোমার ভালত্বের কি এই শ্রেষ্ঠ পরিচয়?"

সেদিন আর বেশি কথা হ'ল না, সম্ভবতঃ সে জীবনেও কম হয়েছে, কারণ ছুটি শেষ হ'য়ে আসাতে ধীরাকে শিগ্‌গীরই বালিগঞ্জে ফিরে আসতে হয়েছিল।

অবাক হয়েছি যেখানে এত আবেগ সেখানে এত শক্তি কোথা থেকে আসে—সম্ভবতঃ অভাবের প্রশান্তি হ'তে।

শ্রীমতী রত্নাবলী দেবী



অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীলীলাময় দে, প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্র ঘোষ। ২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত লীলাময় দে বঙ্গ সাহিত্যে নবাগত নহেন। যাঁহারা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইঁহার কবিতা গল্প এবং উপন্যাসের সহিত অপরিচিত নহেন। লীলাময়বাবু বহু পুর্ব্বেই সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে গ্রন্থকার 'অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা' উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে আটটী গল্প গ্রথিত হইয়াছে। সাহিত্যের একটি নিত্যলক্ষণ আছে। 'বর্ত্তমান সময়ের মূলতত্ত্ব এবং লেখকের মূলতত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আমরা সে লক্ষণের পরিচয় পাইতে পারি। আলোচ্যগ্রন্থে সে লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উপরন্তু একখানা গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না, তাহারও পরীক্ষার একটা মাপকাঠি আছে—মনুষ্য জীবনের গভীরতম ভাবের সম্বন্ধে আমাদের সমবেদনা উদ্রেক করে কি না।' 'অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা', 'স্বস্তি সেন', 'বিথিকা মিত্তির', 'পাথের', প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে মনুষ্য জীবনের গভীরতম ভাবের অনুশীলনী আছে এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ আছে। এই সব গুলির ভিতর দিয়া আমাদের সমবেদনা উদ্রেক করে গল্পগুলির নায়ক নায়িকার চারিত্রিক পরিণতির উপর। এজন্য নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, লীলাময় বাবুর 'অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা' স্থায়ী সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবে। 'অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা গল্পে লেখক অমিতাভের চরিত্রের অপূর্ব্ব রূপ দিয়েছেন। লেখক যেখানে বলিতেছেন—'মহিতোষ আর অমিতাভের বৌদি ছাড়া আর কেউ তাকে তার এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ক্ষমা করিতে পারেনি, সেখানে আমাদের চিত্ত অমিতাভের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। আমাদেরও ইচ্ছা হয় সমাজের সর্ব্বপ্রকার শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অমিতাভকে ক্ষমা করি,—কারণ অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকৃত উচ্ছৃঙ্খলতা নহে,—স্বর্গীয় প্রেম। 'বীথিকা মিত্তির' জীবনকাব্য খানিকে লেখক অশ্রুকাব্য করিয়া তুলিয়াছেন। বীথিকার কথা আমরা সহজে ভুলিতে পারিব না।

ছোট গল্প লিখিতে হইলে কলমের রাশ টানিয়া রাখিতে হয়—কবিতায় সনেট এবং গদ্যে ছোটগল্প একই প্রকার। উপন্যাসে যেমন ঘটনাকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং চরিত্রের সমাবেশে কথা-শিল্পের বিরাট রূপ দেওয়া যায়, ছোট গল্পে তেমন চলে না। সংক্ষেপে কথা-শিল্পের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এজন্য ছোট-গল্প লেখা সহজ-সাধ্য নহে। গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিভাবলে যে সব ছোট গল্প লিখিয়াছেন সেগুলি সুন্দর এবং উপভোগ্য হইয়াছে ও বস্তুতান্ত্রিকতার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই। লেখকের প্রকাশ ভঙ্গিমা এবং লিখনরীতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম, এ,
ব্যারিষ্টার এট্-ল

কাব্য-কাহিনী—মৌলবী গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি, মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—মখদুমী লাইব্রেরী ও আহসানউল্লাহ বুক হাউস লিমিটেড।

বাংলা দেশের একটা 'শাহ্‌নামা' রচনা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সরল ভাষায় সহজ ছন্দে বাংলা দেশে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল রাজাবাদশা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী হৃদয়গ্রাহীভাবে, জাতীয়তা-বোধ জাগরিত করিবার জন্য, রচনা করা নিতান্তই প্রয়োজন। কেননা ইতিহাস বোধ ব্যতিরেকে জাতীয়তা জন্ম লাভ করিতে পারে না। মৌলবী গোলাম মোস্তফা বাংলা দেশের ও অন্যান্য মুসলমানী কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া মনোহর ভাষায় ললিত ছন্দে এই কাব্যকাহিনী রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ কবিতা আবৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থের বহুল প্রচলন হইলে হিন্দু মুসল-মানের বিরোধ বিদূরিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি। সুলেখক গোলাম মোস্তফা সুদীর্ঘ কাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া বাংলা ভাষার সমূহ উন্নতি সাধনে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত। তাঁহার সাহিত্য সাধনা আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি সবল করুক ইহাই দয়াময় আল্লাহতায়ালার নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করি।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

"দত্তা" পরিচয়—শ্রীপ্রমথনাথ পাল, বি-এ প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি আজও সকলের মনে জাগরূক রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন, এ বিষয়ে ইদানীং আর কেহ সন্দেহ পোষণ করেন না। ভবিষ্যতে করিবে কি না সে বিষয়ের বিচারের ভার নিরপেক্ষ কালের উপর নির্ভরে নির্ভর করা চলে। এককালে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি বাঙ্গালীর অসাধারণ প্রিয় কবি ছিলেন, তাঁহাদের রচনা বহুল পঠিত ছিল, আজকাল আর তাঁহাদের রচনা জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত নহে। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের জীবনী ও রচনার নিতান্তই অভাব। বাংলা সাহিত্যকে বলশালী ও গতিশীল করিতে হইলে ইহার সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের ইতিবৃত্ত রক্ষা করা প্রয়োজন। সমালোচনা সাহিত্যের বিরলতা আমাদের মানসিক অপরিপক্বতার পরিচায়ক, প্রকাশকের ক্ষতির ভীতি সূচক এবং বাঙালী পাঠকসাধারণের পরম ঔদাসীন্য ও কৌতূহল-হীনতা-সূচক। সাহিত্য স্রষ্টা, সাহিত্য পাঠক এবং সাহিত্য প্রকাশক এই তিনের মধ্যে একটা জীবনময় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন নতুবা কোন সাহিত্য বড় হইতে পারে না। শরৎচন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিক। সুতরাং তাঁহার রচনা সম্পর্কে আলোচনাগ্রন্থের অভাবের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপে সমীচিন নহে। কিন্তু কথা হইতেছে ইংলণ্ডের অতি আধুনিক রচনার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ সাহিত্যসমালোচকেরা ও অধ্যা-পকেরা দিয়াছেন। আমাদের দেশে সেই সুযোগ পাওয়ার কি হেতু আছে? শুধু রাজনৈতিক সত্ত্ব গ্রহণ করিলে চলিবে না। রাজনীতি জীবনের একটী অংশ মাত্র, জীবনের অন্যান্য অংশের বিকাশের ও পরিণতির দিকে সতর্ক জাগ্রত দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এদিকে যে জাতি হিসাবে আমাদের দৃষ্টি নাই তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য। আলোচ্য গ্রন্থখানা একেবারে নতুন অনভিজ্ঞ রচনা। ইহা পাঠ করা কষ্টকর; আলোচনা নিরতিশয় অপরিপক্ব ও কৌতুহল-হীন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

কেয়ার কাঁটা (গল্প)
সাঁঝের মায়া (কবিতা) } সুফিয়া এন হোসেন প্রণীত

মূল্য প্রত্যেকখানি এক টাকা। মখদুমী লাইব্রেরী ও আহসান উল্লাহ বুক হাউস লিমিটেড, কলিকাতা।

মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত মতিচুর প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মিসেস হোসেনের পরে মিসেস সুফিয়া এন্

যোগের অসাধারণ শক্তি লইয়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আধুনিক জীবিত কবিদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম দুইজন যথার্থ প্রতিভাবান কবি। মিসেস সুফিয়ার রচনায় মধ্যে মজুমদারের গভীরতা এবং কাজীর বেগবানতায় অলৌকিক সম্মিলন ঘটিয়াছে। বাংলা দেশের অভিজাত মুসলমান অন্তঃপুরিকা যে এমন মনোহর, গভীর, বেগবান এবং স্বচ্ছ ভাব ভাষা ও প্রকাশের অধিকারিণী, তাহা সত্যই আমার নিকট আশ্চর্য্য লাগে। তাঁহার সমকক্ষ লেখিকা বাংলা সাহিত্যে আধুনিকদের মধ্যে বিরল। তাঁহার কবিতা প্রত্যেকটী শব্দ ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিপুন এবং উপযোগী। কবিতা এবং গল্পের প্রত্যেকটী ছত্র বেদনায় শারদীয় শিশিরের ন্যায় টল টল করিতেছে। উভয়ক্ষেত্রেই মানবদিগের গভীরতর এবং জটিলতর ভাব অনন্যসাধারণ স্বচ্ছতা কিন্তু হৃদয়গ্রাহী ও সার্থকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের ও কল্পনার অনুভূতি এবং ভাব যে শুচিতা ও স্বাভাবিকতার সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে তাহা এই নবীনা লেখিকার পক্ষে গৌরবের ও সংযমের পরিচায়ক। মাঝে মাঝে দুই একটী অপরিচিত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,—যথা আগরবাতি ইত্যাদি—অতিশয় ব্যঞ্জনাময় ও রসময় হইয়াছে। বাংলা দেশের মুসলমান চিত্তের অন্তর্গূঢ়, নিবিড় পরিচয় ইঁহার মত আর কোথাও কেহ দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। সাহিত্য জীবনে তিনি কামাল লাভ করুন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

হাদিসের গল্প গুচ্ছ
কোরাণের গল্প গুচ্ছ
} মৌলবী মুহম্মদ আবিদ আলী এম-এ, বি-টি, প্রণীত।

মূল্য প্রত্যেকখানি বার আনা। প্রকাশক: মহসীন কোম্পানী, ৬৮।১ এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

রত মুহম্মদ যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তাহার নাম বিচিত্রায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৌলবী আজহার এ প্রণীত 'হাদিসের আলো' নামক যে হাদিস সমালোচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে হাদিসের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাইবেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনের কতগুলি ঐতিহাসিক ও সত্য ঘটনা হাদিসের গল্প গুচ্ছে স্থান পাইয়াছে। মুসলমানদের ধর্মগুরুর এত ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ পরিচয় অন্য কোন পুস্তকে পাইবার সুযোগ নাই। পরলোকগত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় হাদিসের সুবিখ্যাত সঙ্কলন "মিশকাত অল মেসাবিহ" আরবী হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার মধ্যের কিছু কিছু গল্প ইহার মধ্যেও পাওয়া যাইবে। কোরাণের গল্পগুচ্ছ নামক গ্রন্থে কোরাণশরীফে উল্লিখিত ঐতিহাসিক লোকের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। নানাস্থানে নানাভাববাদীর—যথা হজরত ইসা, হজরত মূসা, হজরত দায়ুদ প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনী কোরাণের বাক্যাবলী অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। কোরাণের নানাস্থানে নানা উপলক্ষে বর্ণিত আয়াতগুলি একত্রীভূত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে মুসলমানদের সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা বিদূরিত হইবে। লেখকের ভাষা অনাড়ম্বর এবং ঝরঝরে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

Maxims of Ali by J. A. Chapman. Oxford University Press. Calcutta, Price Rs 1/4/- only.

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি আমাদের জাতীয় ও মানসিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমানী নানাগ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদন করিতেছেন। আমাদের বাংলা ভাষায় এই সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। হজরত আলী মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদের প্রিয় পার্শ্বদ এবং জামাতা ছিলেন। হজরত আলী অতিশয় জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন। পণ্ডিত বলিলে যাহা বুঝায় তৎকালীন আরবে তিনি তাহাই ছিলেন। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার যে চারিজন উত্তরাধিকারী হয় হজরত আলী তাঁহাদের অন্যতম। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম আততায়ীর (Terroristএর) হস্তে প্রাণ দান করেন। তাঁহার বাণীগুলি মহৎ উদার ও জ্ঞানবান হৃদয়ের পরিচায়ক। এই বহিখানির একটী বাংলা অনুবাদ করিলে বড়ই ভাল কাজ করা হইবে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

আধুনিকী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ; কলিকাতা, ৭নং মুরলীধর লেনস্থ সংহতি পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ; মূল্য একটাকা।

গ্রন্থকার ইহাকে একখানি নাটক বলিয়াছেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা একখানি সিনারিও ; সিনেমাটেক্‌নিক খেলাইবার প্রচুর অবসর আছে এবং গ্রন্থের লিখন রীতিটাও সেইপ্রকার। মহাভারত নয় যে দীর্ঘকালব্যাপী চলিতে থাকিবে ; বহুদিনের ঘটনা নয়। ঘটনাক্রম বেশ ঘনসন্নিবিষ্ট। প্রথমেই একটি মেসের দৃশ্য—আংশিক দৃশ্য। তখনও সকলের ঘুম ভাঙে নাই— চারিটি নিদ্রিত দুঃস্থ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্য-বণ্ড। ঘুম ভাঙিতেই অভাব। টিউসানিও পাওয়া দায়। যাহা ছিল তাহাও গেল। টিউটার কত সস্তা হইয়া গিয়াছে ; কেবল সস্তা নহে, পড়ানো, গান শিখানো, ব্যায়াম ইত্যাদি এক ব্যক্তিতে একাধারে চাই ; নতুবা চাকরী রাখা দায়। ইহাই দুঃখ—ইহাতেই দুঃখের রসসিঞ্চন। লেখকের রস সংগ্রহের নিপুণতা আছে। এই হাভাতের প্রাণেই প্রেম রূপ পাইতে চাহে ; সাধারণ ভাত ডালের সমস্যা মিটে, প্রেম রূপ পাইতে চাহে—কিন্তু থাকে কুৎসীত অতীত—অভাবের অতীত, তাহা লইয়া দয়িতার কাছে যাইবার লজ্জায় যে করুণ রস, তাহা হইতেও নাট্যকার রস আহরণে ব্যস্ত। শেষে, প্রেমের পরিণতি ঘটে—কিন্তু একটু অভিনব পন্থায়। আমাদের ধারণায় মনে হইয়াছে, ইহা একখণ্ড চমৎকার সিনারিও। কোনো সিনেমা-পরিচালকের দৃষ্টিতে ইহা পড়িলে ইহা আদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীলীলাময় দে

মৌলিক পদার্থের রূপান্তর

এফ, রহমান এম-এস-সি

বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে যে সকল মৌলিক উপাদান পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা অধিক নয়। অদ্যাবধি কয়েক লক্ষ যৌগিক পদার্থ (compound) বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ফলে দেখা গেছে যে এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপাদান মাত্র ৯২টী। অর্থাৎ এই ৯২টী মৌলিক উপাদানের একাধিক সংখ্যকের সংযোগে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। এই ৯২টী মৌলিক পদার্থকে elements বলে। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটী সহজবোধ্য হবে। উক্ত ৯২টী পদার্থের মধ্যে আমরা তিনটী মনোনীত করে দেখব তাদের সাহায্যে কতগুলো যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হতে পারে।

মৌলিক পদার্থত্রয়

১। কার্বন
২। হাইড্রোজেন
৩। অক্সিজেন

যৌগিক পদার্থ

১। জল
২। কার্বনডাইঅক্সাইড নামক গ্যাস
৩। ফরমিক এসিড
৪। এসেটিক এসিড
৫। মিথাইল এলকোহল
৬। ইথাইল এলকোহল
৭। মিথেন
৮। ইথেন
৯। বেঞ্জিন
১০। ইথার
১১। এসিটন
১২। গ্লিসারিন
১৩। অ্যাস্পিরিন
১৪। টলুয়েন
ইত্যাদি ইত্যাদি

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল, মৌলিক পদার্থ (element) সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কণায়

ক্রমাগত বিভাজিত হতে হতে যখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছায় অথচ ঐ সূক্ষ্ম কণাটিতে ঐ elementএর যাবতীয় গুণই বিদ্যমান থাকে এবং ঐ কণাটিকে ছেড়ে দিলে তার কোন পরিবর্ত্তন না হয়ে সেটা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে তখন উহাকে অণু (molecule) বলা হয়। অণু বিভাজনের ফলে পরমাণুতে (atom) পরিণত হয়। কিন্তু কোন মৌলিক পদার্থের atom সচরাচর স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে না, দুই বা তদধিক এক জাতীয় পরমাণু একত্র মিলে উক্ত মৌলিক পদার্থের 'অণু'তে পরিণত হয় কিম্বা অন্য কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটী যৌগিক পদার্থের অণুতে পরিণত হয়।

বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণিত করেছেন যে পরমাণু অবিভাজ্য নহে। এবং আরও একটী আশ্চর্য্য আবিষ্কার এই হয়েছে যে অদ্যাবধি যে ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পরমাণু ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হলেও তা'রা মাত্র গোটা তিন চার ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট জড় কণার সমবায়ে গঠিত। তবে পরস্পরের মধ্যে যে গুণের বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় তা' নির্ভর করে প্রত্যেকটীর মধ্যে যে জড়কণা সমূহ রয়েছে তাদের সংখ্যার উপর। পূর্ব্বোল্লিখিত কার্ব্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভাজিত হলে প্রত্যেকটির মধ্যেই 'ইলেকট্রন' 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' এই জড়কণাত্রয় পাওয়া যাবে। প্রকৃত পক্ষে ৯২টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিনটি জড় কণায় গঠিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এদের সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। নিম্নোক্ত উদাহরণে ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

মৌলিক পদার্থের নাম	ইলেকট্রন সংখ্যা	প্রোটনের সংখ্যা	নিউট্রনের সংখ্যা
১। কার্ব্বন	৬	৬	৬
২। হাইড্রোজেন	১	১	০
৩। অক্সিজেন	৮	৮	৮
৪। ক্লোরিন	৯	৯	১০
৫। সুবর্ণ	৭৯	৭৯	১১৮
৬। পারদ	৮০	৮০	১২০

উপরোক্ত উদাহরণ দৃষ্টে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক জড়কণা তিনটি। এই তিনের বিভিন্ন সংখ্যায় সংযোগেই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ৯২টী মৌলিক পদার্থ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই উৎপন্ন হয়েছে। এই তিনই বস্তুতে আত্ম প্রকাশ করেছে। অবশ্য পরমাণু ভাঙ্গলে তার থেকে এই তিনটী ছাড়াও 'পজিট্রন' নামক একটী জড়কণার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পজিট্রন atom এর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোটনের অঙ্গীভূত হয়ে বিদ্যমান থাকে বলে মৌলিক জড়কণা তিনটী বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করছি। একটী পরমাণুতে দুইটী অংশ রয়েছে,—একটী তার কেন্দ্র অপরটী কক্ষ। কেন্দ্রে রয়েছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার প্রোটন ও নিউট্রনসমূহ আর ঐ কেন্দ্রকে আবর্ত্তণ করছে লঘুভার ইলেকট্রন সমূহ। সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অণুই দৃষ্টিগোচর হয় না সুতরাং পরমাণু কিম্বা ইলেকট্রন প্রোটনাদি চর্ম্ম-চক্ষুর গোচরীভূত হওয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। তবে বেগবতী বায়ু প্রবাহ চক্ষুতে না দেখেও কার্য্যদৃষ্টে যেমন তার অস্তিত্ব বুঝতে পারি তেমনি এদের কার্য্যদৃষ্টে আমরা এদের অস্তিত্ব বুঝি। এ সম্বন্ধে মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত আমার "পরমাণু জগত" নামক প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

উপরোক্ত উদাহরণে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে যদি কোনও ক্রমে পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটনাদির সংখ্যা প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রিত করা যায় তা' হলে এক মৌলিক বস্তু থেকে অন্য মৌলিক বস্তু উৎপন্ন করা সম্ভব হবে অর্থাৎ একটি মাত্র সুবিধাজনক element থেকে অপর ৯১টী element প্রস্তুত করে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হবে। এক elementকে অন্য একটী পদার্থের elementএ রূপান্তরিত করা আংশিক ভাবে সম্ভবপর হয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহাই সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

মৌলিক পদার্থের এই রূপান্তর দ্বিবিধ উপায়ে হয়ে থাকে,—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। প্রথমোক্তটী Disintegra-

tion এবং শেষোক্তটী Transmutation নামে পরিচিত। পাঠকগণ নিশ্চয়ই মহার্ঘ্য রেডিয়াম নামক ধাতুটীর নাম শুনেছেন। এর গুণ হল এই যে, এ থেকে স্বভাবতঃই "আলফা" ও "বীটা" নামক জড়কণা ও "গামা" নামক জ্যোতি নির্গত হতে থাকে। এই তিনটী কি তা' যথা সময়ে বলা হবে। যা হোক এই বিকীরণের ফলে ঐ মূল্যবান রেডিয়াম কালক্রমে নিকৃষ্ট সীসায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। রেডিয়াম ছাড়াও ইউরানিয়ামাদি অন্যান্য স্বতঃবিকীরক পদার্থ নিয়ে (Radioactive elements) কালক্রমে সীসা নামক নিকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত হয়।

পরলোকগত লর্ড রাদারফোর্ড এই সকল স্বতঃবিকীরক পদার্থ নিয়ে গবেষণা কালে পরমাণুর (element) গঠন তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যের আবিষ্কার করেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবে রেডিয়মাদি- পদার্থ সমূহের সীসায় রূপান্তর দৃষ্টে উৎসাহ প্রণোদিত হন এবং কৃত্রিম উপায়ে অন্যান্য মৌলিক পদার্থকে স্বতঃবিকীরক পদার্থের ন্যায় গুণবিশিষ্ট করে তাদেরকে ভিন্ন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। অক্লান্ত সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করার প্রথম সাফল্য গৌরব অর্জ্জন করেন। এইরূপে তাঁর দ্বারায়ই transmutationএর অপূর্ব্ব বিস্ময় জগৎ সমক্ষে প্রকটিত হয়।

কৃত্রিম উপায়ে সাধারণ পদার্থের পরমাণুকে স্বতঃ বিকরীক (Radio-active) করণ সম্পন্ন হয়—তাকে নিউট্রন-প্রোটনাদি জড় কণা দ্বারা আঘাত করলে অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র সাহায্যে প্রোটন বা নিউট্রন কিম্বা 'আলফা কণা' ভীষণবেগে একটী সাধারণ পরমাণুর দিকে বিচ্ছুরিত হয়। সংঘর্ষের ফলে উক্ত পরমাণুটী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তা' থেকে 'আলফা', বীটা কিম্বা অন্য জড় কণা বা জ্যোতিঃ নির্গত হয়। ফলে ঐ পরমাণুটী অন্য একটী পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়।

লর্ড রাদারফোর্ড সর্ব্বপ্রথম 'আলফা' কণাকে পরমাণু চূর্ণী করণের জন্যে ব্যবহার করেন। তারপর কক্রফ্ট এবং ওয়াল্টন সর্ব্বপ্রথম 'প্রোটন' উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। তারপর 'নিউট্রন' ও 'ডিউটারণ' ইত্যাদিও ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়েছে। যখন বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ সাহায্যে একটী 'ডিউটারণ'কে শক্তি-শালী করে উহাদ্বারা অন্য একটী ডিউটারণকে আঘাত করা হয় তখন হিলিয়াম নামক গ্যাসের একটি পরমাণু এবং একটী নিউট্রন উৎপন্ন হয়।

পরমাণু যদিও ক্ষুদ্র তথাপি একে চূর্ণীকৃত করে এর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যে সেন্টিগ্রেড স্কেলের ১০০ ডিগ্রী উত্তাপে জল ফুটিতে থাকে তার ৬০০০ ডিগ্রী উত্তাপেও পরমাণু চূর্ণীকৃত হয় না। এমন কি লক্ষ লক্ষ মন ওজনের গুরুভার পদার্থের নিস্পেষণেও উহা সাধিত হয় না। পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র জড়কণা সাহায্যে কিম্বা অদৃশ্য গামা রশ্মি বা মহাশূন্য থেকে আগত ব্যোম-রশ্মি (cosmic ray) সাহায্যে পরমাণু চূর্ণীকরণ সম্ভবপর।

উক্ত জড়কণাসমূহের নাম 'আলফা কণা,' 'ডিউটারণ,' 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' ইত্যাদি। গামারশ্মির এক একক পরিমাণকে বলা হয় 'ফোটন'। ব্যোম রশ্মির সহিত আগত- 'ব্যারাইট্রন' নামক জড় কণা দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধি হয়।

মজার ব্যাপার এই যে, এদের সাহায্যে কোনও পরমাণু চূর্ণীকৃত হলে ঐ পরমাণুটী নতুন কোন পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থল বিশেষে 'আলফাকণা' 'প্রোটন' 'নিউট্রন', 'ইলেকট্রন', 'পজিট্রন' ও 'ফোটন ইত্যাদি উৎপন্ন হবে।

সম্প্রতি এই শেষোক্ত শ্রেণীর জড় কণা ব্যতীত আরও একটী জড়কণার অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু এর অস্তিত্ব পরীক্ষালব্ধ প্রমাণে প্রমাণিত হয় নি। এদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা' নিরূপিত হয় প্রধানতঃ এদের ওজনের বিভিন্নতা এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুতের প্রকৃতি ও পরিমাণের পার্থক্য দ্বারা। নিম্নোক্ত উদাহরণে এটা বোধগম্য হবে?

(এখানে ইলেকট্রনের বিদ্যুতের পরিমাণকে এক একক এবং প্রোটনের ওজনকে এক একক হিসাবে ধরা হয়েছে)

জড়কণার নাম	ওজন	সংশ্লিষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণ	সংশ্লিষ্ট বিদ্যুতের প্রকৃতি	মন্তব্য
১। প্রোটন Proton	১ একক	১ একক	ধনাত্মক (Positive)	সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে বা nucleusকে প্রোটন বলে।
২। নিউট্রন Neutron	১ ,,	০ ০	বিদ্যুৎ বিহীন	প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংযোগে এটা উৎপন্ন হয়।
৩। ইলেক্ট্রন Electron	১/১৮৪৪ ,,	১ ,,	ঋণাত্মক (negative)	হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে যে জড়-কণা প্রদক্ষিণ করছে তার নাম ইলেকট্রন। বীটা-কণাও ইলেকট্রন মাত্র।
৪। ডিউটারণ Deuteron	২ ,,	১ ,,	ধনাত্মক	একটী প্রোটন ও একটী নিউট্রন সম্মিলিত হয়ে এর উৎপত্তি হয়।
৫। আলফা কণা Alpha particle	৪ ,,	২ ,,	,,	একজোড়া প্রোটন ও একজোড়া নিউট্রন সম্মিলিত হয়ে প্রোটনের উৎপত্তি হয়।
৬। পজিট্রন Positron	১/১৮৪৪ একক	১ ,,	ধনাত্মক	একে পজিটিভ ইলেকট্রন বলা হয়।
৭। মেসোট্রন Mesotron, Meson or Barytron		১ ,,	ঋণাত্মক	এর ওজন ইলেকট্রন ও প্রোটনের ওজনের মধ্যবর্ত্তী। একে 'ব্যারাইটন', 'মেসন' বা ভারী ইলেকট্রনও বলা হয়।
৮। নিউট্রিনো Neutrino	১/১৮৪৪ ০	০	বিদ্যুৎবিহীন	এর অস্তিত্বের প্রমাণ শুধু গণিতসিদ্ধ, পরীক্ষাসিদ্ধ নহে।
৯। বীটা-কণা	,,	১	ঋণাত্মক	দ্রুতগতি ইলেক্ট্রনকেই বীটা-কণা বলা হয়।

উপরোক্ত জড়কণা সাহায্যে পরমাণুর রূপান্তরের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার করব।

(১) আলফাকণা সাহায্যে পরমাণুর রূপান্তর

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড (লর্ড) আলফা-কণা সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর রূপান্তর সাধন করেন। "সোডিয়াম" নামক মৌলিক ধাতব পদার্থকে আলফা-কণার আঘাত দ্বারা "ম্যাগ্নেসিয়াম" নামক অন্য একটী মৌলিক ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায় এবং একটী "প্রোটন" নির্গত হয়। পক্ষান্তরে "এলুমিনিয়াম" নামক ধাতুর পরমাণু চূর্ণীকৃত হলে উহা "ফস্ফরাস" নামক অতি দাহ্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং একটী নিউট্রন উৎপন্ন হয়।

(২) প্রোটন সাহায্যে পরমাণুর রূপান্তর—

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কক্রফ্ট এবং ওয়াল্টন নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় সর্ব্বপ্রথম প্রোটন ব্যবহার করেন। "লিথিয়াম" নামক ধাতুকে প্রোটন দ্বারা চূর্ণীকৃত করলে তা' "হিলিয়াম" নামক গ্যাসের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং একটী আলফা-কণা নির্গত হয়। "অঙ্গার" পরমাণুকে প্রোটন সাহায্যে নাইট্রোজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত করা যায় এবং ফলে "ফোটন" নির্গত হয়।

(৩) ডিউটারণ সাহায্যে পরমাণুর রূপান্তর—

লরেন্স (Lawrence) সিক্লোট্রোন এবং Lewis নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় সর্ব্বপ্রথম ডিউটারন ব্যবহার করেন।

"নাইট্রোজেন" গ্যাসের পরমাণুকে ডিউটারন সাহায্যে "কার্ব্বন" নামক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত করলে আলফা-কণা নির্গত হয়। "নিকেল" নামক ধাতুর পরমাণুকে চূর্ণীকৃত করলে উহা "তামা" নামক ধাতুতে রূপান্তরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে "নিউট্রন" বহির্গত হবে। "প্লাটিনাম" নামক ধাতুকে এই উপায়ে "ইরিডিয়াম" নামক ধাতুতে রূপান্তরিত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রন ও আলফা-কণা নির্গত হয়। কিন্তু স্বর্ণ পরমাণু এই উপায় অবলম্বনে "ইরিডিয়াম" পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে এবং প্রোটন ও আলফা-কণা নির্গত হবে।

(৪) নিউট্রন সাহায্যে পরমাণুর রূপান্তর

Chadwick কর্ত্তৃক নিউট্রনের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হওয়ার ঠিক পরেই Feather নামক একজন বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম নিউট্রন ব্যবহার করেন। 'নিওন' নামক পরিচিত গ্যাসকে নিউট্রনের আঘাতে 'অক্সিজেন' নামক গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আলফা-কণা নির্গত হয়।

যে সকল যন্ত্র সাহায্যে জড়কনাসমূহকে কৃত্রিম উপায়ে শক্তিশালী করে পদার্থ বিশেষের পরমাণুকে চূর্ণী করণের জন্যে ব্যবহৃত হয় সে গুলির মধ্যে cyclolron নামক যন্ত্রই প্রধান। এই যন্ত্র সাহায্যে লক্ষ লক্ষ ভোল্টের চাপবিশিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

যদিও কৃত্রিম উপায়ে এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর তথাপি আমরা কেন যে নিকৃষ্ট ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে পরিণত করে রাতারাতি বড়লোক হতে পারছিনে তার কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান পদ্ধতিতে এই রূপান্তর করণ অতীব ব্যয়সাধ্য। দ্বিতীয়তঃ কোন পদার্থের অতি সামান্য অংশই অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে মীথে নামক একজন বৈজ্ঞানিক পারদ থেকে স্বর্ণ প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যাহোক এমন দিন হয়ত আসবে যে দিন বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষাগারে বসে ইচ্ছানুযায়ী সহজে ও সুলভে এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হবেন। যেদিন এটা সত্যে পরিণত হবে সেদিনই বৈজ্ঞানিকের পরশ পাথর লাভ হবে। আমরা সেই শুভদিনের অপেক্ষায় রয়েছি।

এফ, রহমান

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২৭নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিভূপদ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

উপনিষদের আলো—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ, পি, এইচ, ডি। ইহাতে উপনিষদের সারগর্ভ কথাগুলি সহজ ও সরলভাবে বলা হইয়াছে, ডিমাই ৮ পেজী, ১০৭ পৃঃ ৳৹।

গিরিশচন্দ্র—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গিরিশ-লেকচারাররূপে" গিরিশচন্দ্র ও নাট্যকলায় তাঁহার চিত্র বিকাশ সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ করেন এই পুস্তকে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে জগতের নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজী ২৬৫ পৃঃ ২৲ টাকা।

বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষার ক্রম পরিবর্তন ও বর্তমান চলতি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা। ডিমাই ৮ পেজী ১৯২ পৃঃ ৷৹।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও প্রসার সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা। ৩য় সংস্করণ (৫½" × ৪½") ২৩৩ পৃঃ ২৲ টাকা।

সহজিয়া সাহিত্য—শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ। শতাধিক সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের তিনখানি আদি গ্রন্থের বিবরণ, প্রয়োজনীয় টীকা সহ সঙ্কলিত। ডিমাই ৮ পেজী, ২০১ পৃঃ ২৲ টাকা।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে চৈতন্যের পরবর্তী যুগের কবি দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাসহ প্রমাণিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড, ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩৪৮ পৃঃ ৫৲ টাকা, ২য় খণ্ড ৫২২ পৃঃ ৬৲ টাকা।

বৃহৎ-বঙ্গ—রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট্। প্রাচীনকাল হইতে পলাশীর যুদ্ধকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস।

রয়াল ৮ পেজি, ১২৭৪ পৃষ্ঠা, দুইখণ্ডে সমাপ্ত, প্রায় ৩০০ চিত্র সম্বলিত। দাম ১২৲।

বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট্, সম্পাদিত।

প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গভাষার লেখকগণের নমুনা সংগ্রহ। পুরাতন ও দুরূহ শব্দের অর্থ পাদ-টীকায় দেওয়া হইয়াছে।

রয়াল ৮ পেজি, ২০৪৭ পৃষ্ঠা, দুই খণ্ডে সমাপ্ত; দাম ১৬৷৹।

বাণী-মন্দির—শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্।

সাহিত্যের আদর্শ, ইহার আকৃতি প্রকৃতি ও সত্য-সাধনা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা। গ্রন্থকার ইহাতে ভারত ও ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন।

ডিমাই ৮ পেজি, ৮৩২ পৃষ্ঠা, দাম ৬৲।

সত্যপীরের কথা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। ডিমাই ৮ পেজি, ৭৩ পৃষ্ঠা, দাম ।০

রবি-রশ্মি (পূর্ব্ব ভাগ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

১৩০৭ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সকল কাব্য ও কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্ত রচনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

রয়াল ৮ পেজি, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, দাম ৯৲।

সাঙ্গীতিকী—দিলীপকুমার রায়।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২৪৫ পৃষ্ঠা, দাম ২৲।

মানুষের ধর্ম্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কমলা লেকচার"রূপে পঠিত।

ডিমাই ৮ পেজি, ১৩৪ পৃষ্ঠা, দাম ১।০।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। ভারতীয় মধ্যযুগের সাধকদিগের ধারাবাহিক বিবরণ। ডিমাই ৮ পেজী, ১৩৫ পৃষ্ঠা। ১৷০ আনা।

গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—শ্রীঅমরেন্দ্র রায়। ১৷০ আনা।

শিক্ষার বিকিরণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় অভিভাষণ। ডিমাই ৮ পেজী। ।০ আনা।

বঙ্কিম-পরিচয়—বঙ্কিমের রচনাসমুদ্র মন্থন করিয়া কতকগুলি রচনামৃত বঙ্কিম-শততম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের নাতিদীর্ঘ জীবন-কথা এবং পরিশিষ্টে তাঁহার জীবন, কর্ম ও সমকালীন ঘটনাবলীর একটি বিস্তৃত পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজী, ২১২ পৃষ্ঠা। ।০ আনা।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ। ডিমাই ৮ পেজী, ১৩২ পৃষ্ঠা। ৷৹ আনা।

হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ডিমাই ৮ পেজী, ২৪৮ পৃষ্ঠা। ১।০ টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের কথা—শ্রীসুকুমার সেন। এম এ, পি, এচ, ডি। ডিমাই ৮ পেজী, ২০০ পৃষ্ঠা। ৷৹ আনা।

বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ—ক্রাউন ৮ পেজী, ৭৫২ পৃষ্ঠা। ২৲ টাকা।

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ— সরকার। ডিমাই ৮ পেজী, ১৬০ পৃষ্ঠা। ১ টাকা।